CUK-Ho5882-6-024964

শারদীয়
প্রীতি
সম্ভাষণ

রসে ভরে
সার্থক হোক্ ম

এনামেলের বাসন

খাস
(ট্রাউজার)

খাস জনতা

দীপ্তি

দি ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাই

৬৭, ৭৭ বিপিন বিহা

কলিকাতা-১২ ফোন

যুগলমূর্ত্তি ত্রিগুণ তৈল একটি অনন্যসাধারণ কেশতৈল। ইহা আয়ু
আধুনিক বিজ্ঞানের সমন্বয়ে প্রস্তুত। ত্রিগুণ তৈলের সুনাম আজ
প্রবাদে পরিণত হয়েছে। দীর্ঘকাল ধরে লক্ষ লক্ষ নরনারীর অখণ্ড বি
ও অনুরাগের দৃঢ় ভিত্তির উপর গড়ে উঠেছে এই সুনাম এবং এর
মূল্য দিতে হয়েছে একাগ্র সা
তৈল চুলের সর্বাঙ্গীন শ্রীবৃদ্ধি করে এবং মাথাধরা, মাথাঘোরা, অনিদ্রা
প্রভৃতি যাবতীয় শিরোরোগ দূর করে।

যুগলমূর্ত্তি
ত্রিগুণ তৈল *কেশবিন্যাসে অপরিহার্য…*

জুয়েল অফ ইণ্ডিয়া পারফিউম কোং প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা-৩৪

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
দেবী দুর্গা—		৯
ছড়া—		
মুষিকপর্ব	অন্নদাশঙ্কর রায়	১৫
উপন্যাস—		
আলো আরো আলো	সুজাতা	৯৪
শ্বাসবদন্তা	বারীন্দ্রনাথ দাশ	১৭০
দ্বিতীয় বর্ষণ	নমিতা চক্রবর্তী	২২৭
নিবন্ধ		
পুরানো মামলার কাহিনী	তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়	৩১
ভূজগোপাখ্যানম	বাসুকি	৫৩
সিংভূমের সাঁওতাল কাহিনী	অমরেন্দ্রনাথ মুখো[illegible]	১৫৮
রম্যরচনা—		
প্রতিবাদ করবেন না	নীলকণ্ঠ	
সুদীর্ঘ গল্প—		
দুই পুরুষ	কালপুরুষ	৪৩

বিষয়	লেখক
বিবিধ বিষয়ক রচনা—	
শ্রীশ্রীদুর্গা	বিশ্বেশ্বর বিদ্যাভূষণ কা[illegible]
বঙ্কিমচন্দ্রের উইল	
ভারতীয় ভাস্কর্যে কামকলা	সুধীরচন্দ্র সরকার
সাহিত্যচিন্তা	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
সাহিত্যের সমৃদ্ধি	মনোজ বসু
কোম্পানীর আমলে কলকাতার সংবাদ ও সাময়িকপ[illegible]	
সরকারী সেন্সর	জুলফিকার
প্রাচীন ভারতের শিক্ষা সমস্যা	ত্রিদিবনাথ রায়
রবীন্দ্রসঙ্গীতের তত্ত্বোপলব্ধি	প্রফুল্লকুমার দাস
মুখোস	[illegible] বসু
বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ—	
মস্তিষ্ক রহস্য	বসুবন্ধু
অকালে ভূমিষ্ঠ শিশু সমস্যা	তরুণ চট্টোপাধ্যায়

'আনন্দ আজ দিকে দিকে আলোর বাণী দিল লিখে'

আনন্দের আমন্ত্রণ এলো। পাখীর গানে, নদীর কলস্বরে জলতরঙ্গ। আকাশ খুশি-খুশি, প্রকৃতির প্রাঙ্গনে উৎসবের 'সাজো, সাজো' রব। নিজেকে সুন্দর ক'রে তোলার এইতো সময়।

উৎসবে ও প্রতিদিনের প্রসাধনে হিমানী খো

হিমানী প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-২

Progressive/HS-58

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
ছোট গল্প—		
তীর্থ জীবন	অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	১৭
পুরুষের কাণ্ড	বনফুল	২৯
চিত্রের বদলে	সুনীল রায়	৫৫
লা ভাঙার খেলা-	পার্থ চট্টোপাধ্যায়	
ভ	হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়	৬৪
তিলমণীয়া	প্রেমেন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৬৯
চূড়া	ছবি বসু	৭৩
চনীয়	বাণী দেবী	৭৬
সৌধ	ধর্মদাস মুখোপাধ্যায়	৭৯
নাথের রথ	মহাশ্বেতা দেবী	১২৩
াস নাই করলেন	বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়	১৩১
দিন	সরোজকুমার রায়চৌধুরী	১৪৯
নর নাম বেদনা	জয়ন্তী সেন	১৬৪
ফুল	গজেন্দ্রকুমার মিত্র	১৯৫
	বাণী রায়	২০২
	বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়	১২

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
কবিতা—		
তিনটি যুবকের কোকাকোলা পান	ঊর্মি দেবী	৪২
শ্রীশ্রীপূজা	বুমুদরঞ্জন মল্লিক	৮৮
তবে কেন	বিষ্ণু দে	ঐ
[illegible]জের [illegible]মে	কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত	ঐ
আলোর মরাল	জগদীশ ভট্টাচার্য	৮৯
সনেট	শুদ্ধসত্ত্ব বসু	ঐ
ঝড় উঠলে	ধীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	ঐ
সন্ধ্যা	বাসব ঠাকুর	ঐ
নিপুণ মৃগয়া	রামেন্দ্র দেশমুখ্য	ঐ
সন্ধ্যা দীপের শিখা	মৃণালকান্তি দাস	৯০
স্মৃতির পাখীরা	বীরু চট্টোপাধ্যায়	ঐ
নির্লিপ্ত	মাণিক মুখোপাধ্যায়	ঐ
এখনো আমার প্রেমে	সুশীলকুমার গুপ্ত	ঐ
দুটি কবিতা	অমলকান্তি ঘোষ	ঐ
ফোনে	মঞ্জুলিকা দাস	৯১
একটি আশ্চর্য কণ্ঠস্বর	করুণাময় বসু	ঐ

দূরকে নিকট করিয়া দেশবাসীর সুখ ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিয়াছে

"ডাক ও তার" বিভাগ

আর

তাহাকে আধুনিক দেশী যন্ত্র-সরঞ্জামে স্বচ্ছন্দ ও নিরপেক্ষ করিবার ভার লইয়াছে—

রিপাব্লিক্ ইঞ্জীনীয়ারিং কর্পোরেশন্ লিঃ

রেজিস্টার্ড অফিস ঃ
৭ নং চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা—১৩
ফোন নং ঃ ২৩-১৩০১
(এক্সটেন্‌শন্—২৬)

কারখানা ঃ
বেহালা
লিঃ ৩৪

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সমর্পিতা	মায়া বসু	৯১
বিষকন্যা	সুনন্দা দাশগুপ্ত	ঐ
শাঙন অভিসার	শান্তি পাল	২২১
সন্ধান	সাধন চৌধুরী	ঐ
স্বর্গ বহু দূর	বিমলাংশু মতিলাল	ঐ
প্রত্যয়	সুধীরকুমার গঙ্গোপাধ্যায়	ঐ
স্মৃতিগন্ধা	বটকৃষ্ণ দে	ঐ
যখন রব না আমি	অমিতা পালিত	ঐ
পুষ্পসাধ	বন্দে আলী মিয়া	২২২
টেলিফোন	শান্তনু দাস	ঐ
রাত্রির হৃদয় হয়ে	নীহারকান্তি ঘোষদস্তিদার	ঐ
টুকরো	নন্দগোপাল সেনগুপ্ত	ঐ
এখনো সময় আছে	গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়	ঐ
মহালয়া	বিমলচন্দ্র ঘোষ	২২৩
সেতু	রমেন্দ্র ঘটকচৌধুরী	ঐ
হেঁ হেঁ আলীর ছড়া	সুভাষ মুখোপাধ্যায়	ঐ
শেষোক্ত	গোপাল ভৌমিক	২২৫
ছাতিটা খোলো	মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়	
যখন তাকেই দেখি	আবুল কাশেম রহিমউদ্দীন	২২৫
তিন শূন্য	ভক্তি দেবী	
[illegible]	নচিকেতা ভরদ্বাজ	
হৃদয় হৃদেই	রমেন্দ্রনাথ মল্লিক	
কোথাও আশ্রয় নেই	মৃত্যুঞ্জয় মাইতি	
বিদ্রোহী	অনুবাদ : সজল বন্দ্যোঃ	
পিপাসা	ইলা বসু	
সুন্দর	সুধীর বেরা	
পত্রগুচ্ছ—		
প্রতিভা পরিচিতি—		
এডিসন	সমীরণ চৌধুরী	
নাট্যাচার্য শিশিরকুমার	অশোক সেন	
শিল্পী রবি বর্মা	বিশু মুখোপাধ্যায়	
সংগ্রহ—		
একটি গান		

প্রতিরক্ষা ও উন্নয়নের জন্য জাতির সেবায়—

জাতির দুর্বার অগ্রগতির সঙ্গে সমান তালে···

পূর্ব রেলওয়ে

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
ছোটদের পাতা :—		
বন্দনা—		
শারদীয়া	বিষ্ণুশর্মা	২০৮
কথা ও কাহিনী—		
ভিত	ধীরেন্দ্রলাল ধর	২০৯
মশাই	শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	২১২
রসগোল্লায় স্বর্গলাভ	পুষ্প বসু	২১৩
কাকের কষ্ট	স্বপনবুড়ো	২১৪
এক চাষী ও তার বলদ	খগেন্দ্রনাথ মিত্র	২১৫
রেনি-ডে	সুধাংশু গুপ্ত	২১৮
পুরা কাহিনী	বেলা দে	২২০
ছড়া—		
হালচাল	মৌমাছি	২১৬

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
কবিতা—		
জানতে চাই	নরেন্দ্র দেব	২১১
চিকিৎসা	পূর্ণব রায়	ঐ
পুজোর ছুটি	[illegible]রেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	২১৭
রামগরুড়ের [illegible]	শুভ্রা ঘোষ	২১৯
দেশের কাজ	সুকোমল বসু	২২০
বিবিধ নিবন্ধ—		
প্রাগে শিশু রংমহলের ছেলেমেয়ে	সমর চট্টোপাধ্যায়	২১৩
মোরগের লড়াই	পরিতোষকুমার চন্দ্র	২১৮
চিংড়ির স্বভাব মোটেই শান্ত নয়	সুনীল সরকার	২১৯

বস্ত্রশিল্পে অগ্রগতি

বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলসের পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। গত ৫০ বছরেরও উপর বঙ্গলক্ষ্মীর ধুতি শাড়ী আর নানারকম বস্ত্রসম্ভার লক্ষ লক্ষ গৃহের শুধু চাহিদা মেটাইনি সেইসঙ্গে আনন্দও বিতরণ করেছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের রুচি আর প্রয়োজনও বদলেছে আর সেইমত বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলস ও নিজেকে সম্প্রসারিত করেছে। সম্প্রতি নানারকম নূতন যন্ত্রপাতি আমদানী করে দেশের ক্রমবর্দ্ধন চাহিদা মেটাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

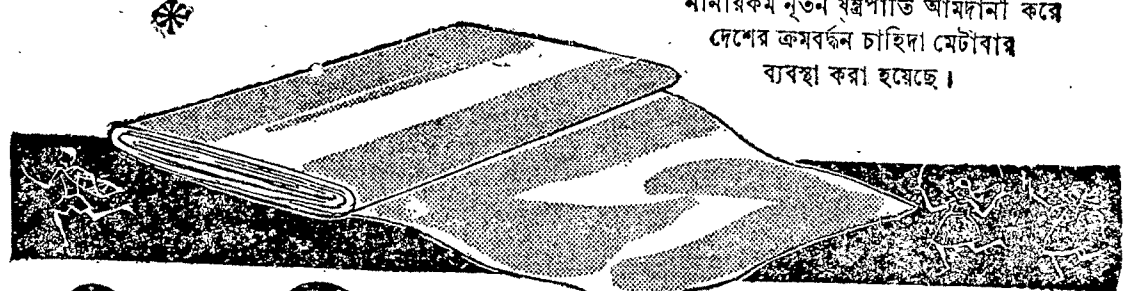

বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলস্ লিমিটেড্

৬, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৩

পশ্চিমবঙ্গের আধুনিকতম
ও
অগ্রণী টাইপ নির্ম্মাতা

ইউরেকা টাইপ ফাউণ্ড্রী লিঃ

২১, গিরি বাবু লেন

কলিকাতা—১২

ফোন ৩৪-৩৩৫৬

আপনাদের আনন্দমুখর উৎসবে আমরাও যোগ দেবো তো ?

আপনাদের মন্ত্রোচ্চারণ আর ভূরিভোজনে, হাস্যোচ্ছল কলকণ্ঠের গুঞ্জরণে, ভবিষ্যতের আশা ও আনন্দের স্বপ্নেরা এই উৎসব দিনে আমরাও এই কামনা জানাই—আপনাদের ভবিষ্যৎ শুভ হোক—সুখে ও সৌভাগ্যে, নিবিঘ্ন পরিতৃপ্তিতে মধুময় হয়ে উঠুক অনাগত দিনগুলি। আর এই আনন্দোজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন আপনার সার্থক ক'রে তুলতে পারে ব্যাঙ্ক অব বরোদায় একটি সেভিংস অ্যাকাউন্ট।

আমাদের ভারতস্থিত ২২৯টি এবং বহির্ভারতের ১৬টি শাখার সঙ্গে সমবেতভাবে আমরা আপনাদের শারদীয় উৎসবের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি।

দি ব্যাঙ্ক অব বরোদা লিঃ

(স্থাপিত : ১৯০৮) হেড অফিস : বরোদা

বিশেষ উৎসবে
বিশিষ্ট জিনিসটিই চাই

কেয়ো-কার্পিন
একটি বিশিষ্ট কেশ তৈল

Dey's

দে'জ মেডিকেল ষ্টোর্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা, বোম্বাই, দিল্লী, মাদ্রাজ, পাটনা, গৌহাটি,
কটক, জব্বলপুর, কানপুর, সেকেন্দ্রাবাদ, আম্বালা, ইন্দোর

দৈনিক বসুমতী
শারদীয়া, ১৩৭২

শ্রীশ্রীদুর্গা
—শ্রীমহীতোষ বিশ্বাস অঙ্কিত

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

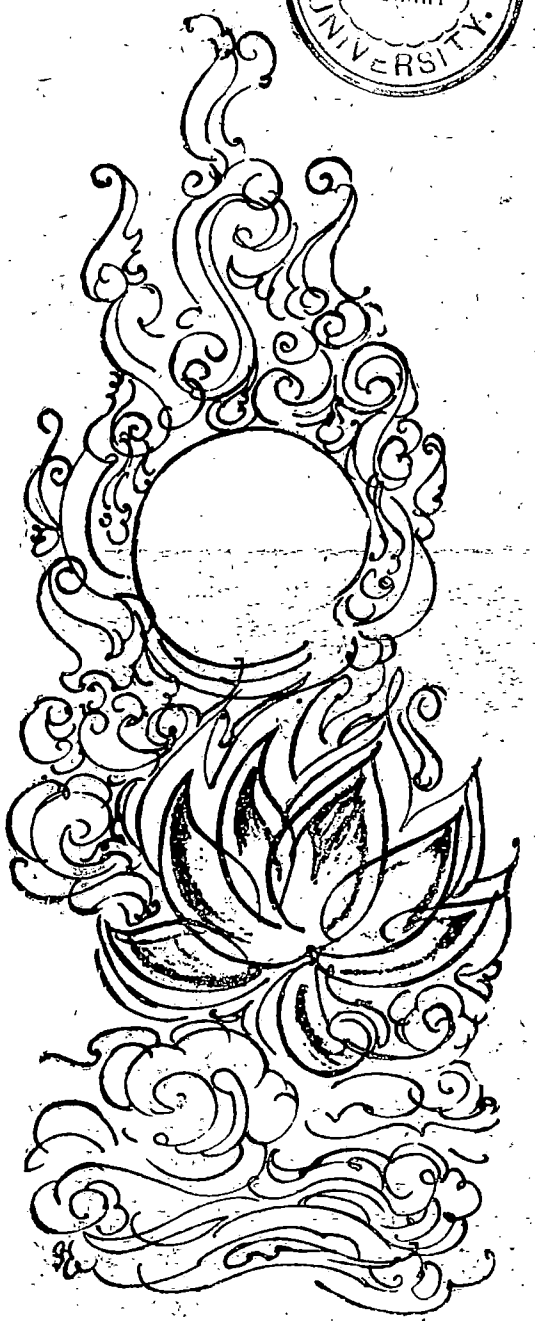

158.3
603/3

শারদীয়া

দৈনিক বসুমতী

॥ ১৩৭২ ॥

॥ দুর্গা-স্তবরাজঃ ॥

নমস্তে শরণ্যে শিবে সানুকম্পে
নমস্তে জগদ্ব্যাপিকে বিশ্বরূপে।
নমস্তে জগদ্বন্দ্য-পাদারবিন্দে
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে।
নমস্তে জগচ্চিন্ত্যমানস্বরূপে
নমস্তে মহাযোগিনি জ্ঞানরূপে।
নমস্তে সদানন্দনন্দস্বরূপে
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে।
অনাথস্য দীনস্য তৃষ্ণাতুরস্য
ভয়ার্ত্তস্য ভীতস্য বদ্ধস্য জন্তোঃ।
ত্বমেকা গতির্দ্দেবি নিস্তারদাত্রী
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে।
অরণ্যে রণে দারুণে শত্রুমধ্যে-
ঽনলে সাগরে প্রান্তরে রাজগেহে।
ত্বমেকা গতির্দ্দেবি নিস্তারহেতু-
র্নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে।
অপারে মহাদুস্তরেঽত্যন্তঘোরে
বিপৎসাগরে মজ্জতাং দেহভাজাম্।
ত্বমেকা গতির্দেবি নিস্তারনৌকা
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে।
নমশ্চণ্ডিকে দণ্ডদোর্দ্দণ্ডলীলা-
লসৎখণ্ডিতাখণ্ডলাশেষভীতে।
ত্বমেকা গতির্বিঘ্নসন্দোহহন্ত্রী
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে।
ত্বমেকাজিতারাধিতা সত্যবাদি-
ন্যমেয়াজিতা ক্রোধনা ক্রোধনিষ্ঠা।
ইড়া পিঙ্গলা ত্বং সুষুম্না চ নাড়ী
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে।
নমো দেবি দুর্গে শিবে ভীমনাদে
সরস্বত্যরুন্ধত্যমোঘস্বরূপে।
বিভূতিঃ শচী কালরাত্রিঃ সতী ত্বং
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥
শরণমসি সুরাণাং সিদ্ধবিদ্যাধরাণাং
মুনিদনুজনরাণাং ব্যাধিভিঃ পীড়িতানাম্।
নৃপতিগৃহগতানাং দস্যুভিস্ত্রাসিতানাং
ত্বমসি শরণমেকা দেবি দুর্গে প্রসীদ॥
ইদং স্তোত্রং ময়া প্রোক্তমাপদুদ্ধারহেতুকম্।
ত্রিসন্ধ্যমেকসন্ধ্যং বা পঠনাদেব সঙ্কটাৎ॥
মুচ্যতে নাত্র সন্দেহো ভুবি স্বর্গে রসাতলে।
সমস্তশ্লোকমেকং বা যঃ পঠেৎ ভক্তিতঃ সদা॥
স সর্ব্বদুষ্কৃতিং তীর্ত্বা প্রাপ্নোতি পরমাং গতিম্।
পঠনাদস্য দেবেশি কিং ন সিধ্যতি ভূতলে।
স্তবরাজমিমং দেবি সংক্ষেপাৎ কথিতং ত্বয়ি॥
ইতি শ্রীবিশ্বসারে আপদুদ্ধারকল্পে শ্রীদুর্গা-স্তবরাজঃ সম্পূর্ণঃ।

শারদা

শ্রীবিশ্বেশ্বর বিদ্যাভূষণ কাব্যতীর্থ

শরতের কনকরৌজ্জ্বল প্রভাত, মেঘমুক্ত নীলাকাশ এবং শেফালিকা-পদ্ম-বকুলের সৌরভস্নিগ্ধ মলয়প্রবাহ—এই রমণীয় শুভ পরিবেশে জগজ্জননী মহামায়ার অর্চনা হইয়া থাকে। বসন্তের অনুকূল আনন্দ-সমুজ্জ্বল দিবসত্রয়েও মহাশক্তি দুর্গা পূজিতা হন। দুর্গাপূজা মহাপূজা—"চতুরঙ্গময়ী শুভা"—নানাবিধ সুরভিদ্রব্য মিশ্রিত শীতল সলিলে অভিষেক, ষোড়শোপচারে অর্চনা, বলিদান ও হোম—এই চতুরঙ্গযুক্তা পূজা মহোৎসবরূপে প্রতিপালিত হয়। সৃষ্টি-স্থিতিলয়কারিণী ভগবতী—দুর্গা নারায়ণী ও শঙ্করী উভয় নামেই প্রসিদ্ধা, দুর্গা এই নামটি সুপ্রাচীন। দুর্গা—এই নামে নিখিল ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরী জগদম্বিকাকেই বুঝায়। শরৎকালে মহাশক্তির পূজা সর্বাধিক সমারোহে অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া—এই অর্চনোৎসব শারদীয়া মহাপূজা নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

দুর্গা বৈদিক দেবতা। বেদে ইনি অম্বা, অম্বিকা, অম্বালিকা ইত্যাদি বহু নামে আখ্যাত হইয়াছেন। বেদের দেবীসূক্ত ও রাত্রিসূক্তে দুর্গার পরিচয় পাই। মহর্ষি অম্ভৃণ ঋষির বাক্ এই নামে প্রখ্যাতা ঋষিরূপে ভগবতী স্বমুখে স্বীয় বিভূতি প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন—"অহং রুদ্রেভির্বসুভি-শ্চরাম্যহমাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ। অহং মিত্রাবরুণোভা বিভর্ম্যহমিন্দ্রাগ্নী-মহমশ্বিনোভা" ইত্যাদি। আমি (ভগবতী স্বয়ং) রুদ্র ও বসুরূপে বিচরণ করি। আমি আদিত্য ও বিশ্বদেবরূপে সঞ্চর-মানা। মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র, অগ্নি ও অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে আমিই ধারণ করি। তৃতীয় মন্ত্রে বলিতেছেন—"অহং রাষ্ট্রী সংগমনী বসূনাং চিকিতুষী প্রথমা যজ্ঞীয়ানাম্। তাং মা দেবা ব্যদধুঃ পুরুত্রা ভূরিস্থাত্রাং ভূর্য্যাবেশয়ন্তীম্॥" আমি বিপুল বিশ্ব-রাষ্ট্রী তথা রাজ্যসমূহের সর্বাধীশ্বরী এবং সম্পদবিধায়িনী। আমি ব্রহ্মজ্ঞানরূপা ব্রহ্মবিদ্যা এবং দেবশ্রেষ্ঠা। বহুরূপে সর্বত্র বিরাজমানা আমার আরাধনাই সাধকগণ করিয়া থাকেন। এইরূপ আটটি মন্ত্রে ভগবতী যথাক্রমে বলিতেছেন যে, জীবগণ তাঁহারই শক্তিতে দর্শন, শ্রবণ, মনন, আহার্য গ্রহণ এবং প্রাণধারণাদি কর্ম নির্বাহ করিয়া থাকে। তিনি সর্বশক্তিময়ী সর্বাধারস্বরূপা, কর্ত্রী ও কারয়িত্রী। তাঁহারই অমৃতময় স্পর্শে নিখিল জগৎ বিধৃত এবং প্রতিষ্ঠিত। দ্যুলোক-ভূলোক—ঊর্ধ্ব অধঃ সর্বত্র তিনি পরিব্যাপ্ত। রাত্রিসূক্তের দুইটি মন্ত্র স্তবমাধ্যমে প্রচলিত ও প্রণিধানযোগ্য। যথা—

"স্তোষ্যামি প্রযতো দেবীং শরণ্যাং
বহ্বৃচপ্রিয়াম্।
সহস্রসম্মিতাং দুর্গাং জাতবেদসে
সুনবাম স্তোমম্॥"

"তামগ্নিবর্ণাং তপসা জ্বলন্তীং
বৈরোচনীং কর্মফলেষু জুষ্টাম্।
দুর্গাং দেবীং শরণমহং প্রপদ্যে
সুতরসি তরসে নমঃ॥"

মরীচিকল্পে দুর্গাসপ্তশতীর পুরশ্চরণ প্রয়োগে এই সূক্তদ্বয় পাঠপূর্বক হোমের বিধান আছে—

"রাত্রিসূক্তং প্রতিঋচং তথা দেব্যাশ্চ
সূক্তকম্।
হুত্বান্তে প্রজপেৎ স্তোত্রমাদৌ
পূজাদিকং মুনে॥"

দ্বিতীয় মন্ত্রের অনুবাদ—যিনি অগ্নিবর্ণা, স্বকীয় তেজে যিনি দীপ্যমানা, যিনি বৈরোচনী অর্থাৎ পরমাত্ম পরিদৃষ্টা, যিনি উপাসকদিগকে যজ্ঞাদি কর্মের ফল প্রদান করেন, সেই দুর্গা দেবীকে আশ্রয় করি। হে অসুরনাশিনী, তোমাকে নমস্কার।

বাজসনেয় সংহিতায় (শুক্ল যজুর্বেদ) 'অম্বিকা' শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়—"এ ষ তে রুদ্রভাগঃ সহ স্বস্রাম্বিকয়া তং জুষস্ব স্বাহা" ইত্যাদি।

উপনিষদে দেবী 'হৈমবতীর' মহিমা প্রকাশিত। জয়গর্বে অভিমানী দেবগণের অজ্ঞতা-দূরীকরণজন্য মহাদেবী স্বীয় শক্তি প্রত্যাহার করিলে ইন্দ্র প্রমুখ সকলেই তৃণসঞ্চালন ও দহনাদি সর্বকার্যে অসমর্থ হইলেন। তখন "স তস্মিন্নেবাকাশে স্ত্রিয়মাজগাম বহুশোভমানাম্ উমাং হৈমবতীম্।" ব্রহ্ম নারী মূর্তি উমা হৈমবতীরূপে আত্মপ্রকাশ করিলেন। কেনোপনিষদে এই কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। উমা হৈমবতী অর্থাৎ ব্রহ্মশক্তি মহাদেবী। কৈবল্যোপনিষদেও এই উমার উল্লেখ পাই—

"উমাসহায়ং পরমেশ্বরং প্রভুং
ত্রিলোচনং নীলকণ্ঠং প্রশান্তম্।"

তৈত্তিরীয় আরণ্যক ভাষ্যে "অম্বিকা জগন্মাতা পার্বতী" ইত্যাদি ব্যাখ্যা আছে। উক্ত আরণ্যকে মন্ত্র "কাত্যায়নায় বিদ্মহে কন্যাকুমারীং ধীমহি তন্নো দুর্গা প্রচোদয়াৎ" এই দুর্গা গায়ত্রী নারায়ণোপনিষদেও উল্লিখিত।

বহ্বৃচোপনিষদে ভগবতীর তত্ত্ব প্রসঙ্গ, যথা—"দেবী হ্যেকাগ্র আসীৎ সৈব জগদণ্ডমসৃজৎ তস্যা এব ব্রহ্ম অজীজনৎ বিষ্ণুরজীজনৎ রুদ্রো অজীজনৎ ----------সৈষা পরা শক্তিঃ"

ইত্যাদি বাক্যে মহাশক্তি ভগবতীর মহিমা প্রকটিত।

এখন অনন্ত পুরাণরত্নজলধিতলে প্রবেশ করি। প্রায় সকল পুরাণ, মহাপুরাণ, উপপুরাণাদিতে জগন্মাতা জগদীশ্বরীর মাহাত্ম্য কোথাও মুখ্যভাবে, কোথাও প্রসঙ্গতঃ কিংবা সংক্ষেপভাবে পর্যালোচিত ও সমুপদিষ্ট হইয়াছে। তন্মধ্যে সর্বজনবিদিত মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত "দেবীমাহাত্ম্য" (চণ্ডী) সমধিক প্রসিদ্ধ এবং সর্বাধিগম্য। রাজ্যভ্রষ্ট নির্বেদপ্রাপ্ত মহারাজ সুরথ তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া মহর্ষি মেধসকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"ভগবন্ কাহি সা দেবী মহামায়েতি যাং ভবান।
ব্রবীতি কথমুৎপন্না সা কর্মাস্যাশ্চ কিং দ্বিজ ॥

রাজর্ষি মহামায়ার তত্ত্ব ও স্বরূপাদি প্রশ্ন করিলেন। মুনিবর বলিলেন—

"নিত্যৈব সা জগন্মূর্তিস্তয়া সর্বমিদং ততম্।
তথাপি তৎসমুৎপত্তির্বহুধা শ্রূয়তাং মম ॥"

--- --- ---

দেবানাং কার্য্যসিদ্ধ্যর্থমাবির্ভবতি সা যদা।
উৎপন্নেতি তদা লোকে সা নিত্যাপ্যভিধীয়তে ॥

এই প্রসঙ্গে প্রলয়মহার্ণবে যোগনিদ্রামগ্ন নারায়ণের নয়নকমলাদি হইতে মহাশক্তির আবির্ভাব, মহিষাসুরাদি দৈত্যবিনাশ এবং কালী প্রভৃতি বিচিত্ররূপে মহাদেবী ভগবতীর লীলা বিকাশ ও প্রণত দেবগণের মাতৃবন্দনা ও দেবীর অভয়বরদান প্রভৃতি অমৃতময়ী কথামালিকা সপ্তশতী চণ্ডীর শ্লোকে শ্লোকে মধুক্ষরণ করে।

এই মহামায়াই দেবী দুর্গা। "দুর্গা দেবীতি বিখ্যাতং তন্মোনাম ভবিষ্যতি।" —চণ্ডী।

দেবী পুরাণ—"স্মরণাদভয়ে দুর্গে ------তেন দুর্গা প্রকীর্তিতা।"

কাশীখণ্ডে—"অদ্যপ্রভৃতি মে নাম দুর্গেতি খ্যাতি মেষ্যতি"—ইত্যাদি বহু মন্ত্রে ভগবতীর মাহাত্ম্য প্রকটিত।

পরমামৃত রসায়ন শ্রীমদ্ভাগবতে যোগমায়া কৃষ্ণশক্তি-নারায়ণী, কাত্যায়নী, অম্বিকা, ভদ্রকালী ও চণ্ডিকা ইত্যাদি বহু নাম এবং নানা কামনায় জগদম্বিকার অর্চনা বিবরণ উল্লিখিত হইয়াছে। দুর্গাই এই সকল নামে উপলক্ষিত। এই মহাপাবন গ্রন্থে উমা সতীর উপাসনা, দক্ষযজ্ঞোপাখ্যান এবং নানা প্রসঙ্গে কৃষ্ণশক্তি যোগমায়ার মাহাত্ম্য বর্ণিত। ব্রজধামে নন্দালয়ে যোগমায়ার আবির্ভাব, কংসদর্পহরণ, কৃষ্ণপ্রণয়ার্থিনী রুক্মিণীর ব্রতচর্যা ও অম্বিকা মন্দিরে গমনপূর্বক উমা মহেশ্বরের অর্চনাদি ভাগবতে মধুরভাবে বিবৃত। বিলমধ্যে প্রবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণের অনিষ্টাশঙ্কায় তাঁহার মঙ্গলার্থে ও প্রিয় বাসুদেবের দর্শন জন্য ব্যাকুল দ্বারকাবাসিগণ মহামায়া শ্রীদুর্গার পূজা করিলেন।

নন্দাদি ব্রজবাসিগণের গোযানারোহণে বৃন্দাবনের অম্বিকাবনে গমন ও তীর্থনীরে স্নানান্তে পশুপতি ও দেবী অম্বিকার অর্চনা প্রসঙ্গ এই পবিত্র গ্রন্থে বর্ণিত। এইভাবে কি বৃন্দাবনে, কি বিদর্ভ মহানগরীতে এবং দ্বারকায় সর্বত্র দুর্গাপূজার চিরন্তন বিধান ও অনুষ্ঠান বৃত্তান্ত শ্রীমদ্ভাগবতের সৌষ্ঠব বর্ধন করে। কিন্তু এই মহাসুধারসায়নরূপ গ্রন্থে সর্বাপেক্ষা আস্বাদ্য দেবীমাহাত্ম্য বিষয়ক বিবরণ, ব্রতপরায়ণা ব্রজকুমারীগণের কাত্যায়নী অর্চনা প্রসঙ্গ। বিমলানন্দপ্রদ পরম মনোহর এই বর্ণনা ভক্তজনের পরম সুখপ্রদ এবং নির্মল প্রেম ও মাধুর্যরসের এই ললিত উচ্ছ্বাস মহর্ষি দ্বৈপায়নের অমর কীর্তি বহন করে।

যথা, দশমস্কন্ধ দ্বাদশ অধ্যায়ে—

"হেমন্তে প্রথমে মাসি নন্দব্রজকুমারিকাঃ
চেরুর্হবিষ্যং ভুঞ্জানাঃ কাত্যায়ন্যর্চনব্রতম্ ॥
আপ্লুত্যাম্ভসি কালিন্দ্যা জলান্তে
— চোদিতেঽরুণে।
কৃত্বা প্রতিকৃতিং দেবী মার্চুর্নৃপ
সৈকতীম্ ॥"

কী আকুল তাঁহাদের আকুতি—তাঁহাদের একমাত্র প্রার্থনা—

"কাত্যায়নি মহামায়ে
মহা যোগিন্যধীশ্বরী।
নন্দগোপসুতং দেবি পতিং মে
কুরুতে নমঃ ॥

এইরূপে—"এবং মাসং ব্রতং চেরুঃ
কুমার্যঃ কৃষ্ণচেতসঃ।
ভদ্রকালীং সমানর্চুর্ভূয়ান্নন্দসুতঃ
পতিঃ ॥"

ইত্যাদি বিবৃতি রাজর্ষি সুরথ কর্তৃক নদীপুলিনে মৃন্ময়ী দেবীমূর্তি রচনাপূর্বক ভগবতীর বিশেষ আরাধনা "পুষ্পাধূপাগ্নিতর্পণৈঃ" ইত্যাদি বর্ণনার অপূর্ব সাদৃশ্য বহন করে। বস্তুতঃ বৈষ্ণবগ্রন্থসমূহেও কৃষ্ণ ও শক্তির অপূর্ব অভেদ-সমন্বয় প্রতিপাদিত। যথা কূর্মপুরাণ—

"অহং নারায়ণো গৌরী জগন্মাতা সনাতনঃ।
বিভজ্য সংস্থিতো দেবঃ স্বাত্মানং বহুধেশ্বরঃ।
একোঽয়ং দেবদেবাত্মা ভবানী
--- --- ---
বিষ্ণুরেব চ।
অহং হি নিষ্ক্রিয়ঃ শান্ত কেবলো নিষ্পরিগ্রহঃ ॥
মামেবং কেশবমাহুর্দেবমাহু-
র্দেবীমথাম্বিকাম্ ॥"

ইহা বৈষ্ণব ও শাক্ততত্ত্বের অপূর্ব সমন্বয়। শক্তি শক্তিমতোরভেদঃ—এই তত্ত্বই ফুটিয়া উঠিয়াছে।

তন্ত্র এবং তন্ত্রানুগ পুরাণাদি গ্রন্থসমূহে তো মহাশক্তিরই চিরন্তন প্রাধান্য। তন্ত্রেও এই অমৃতমধুর সমন্বয়ের বাণী ধ্বনিয়া উঠিয়াছে—"যঃ কৃষ্ণ সৈব দুর্গাস্যাৎ, যা দুর্গা কৃষ্ণ এব সঃ ॥"—গৌতমীয় মহাতন্ত্র বচন। ফলতঃ তন্ত্রের শিব-শক্তি ও নারায়ণ-নারায়ণী একই তত্ত্ব---একই চিন্ময়ের অভেদ অদ্বৈত বিলাস। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে দেবী দুর্গাকে কৃষ্ণ দেহসমুদ্ভূতা, বিষ্ণুমায়া, কৃষ্ণাধিষ্ঠাত্রী ঈশ্বরী, পরমা প্রকৃতি নারায়ণী ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হইয়াছে।

তাই তো আবার পঞ্চমবেদ মহাভারতেও দেখিতে পাই, কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গনে শ্রীভগবান বিজয়ার্থী অর্জুনকে একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশ প্রদান করিতেছেন —

(২২৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

হানাদার

বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়

অকস্মাৎ
ভূ-স্বর্গ থেকে খবর এলো :
পারিজাত বনে নতুন জানোয়ার!
ঝোপে ঝাড়ে আড়ালে আবডালে কোথায় লুকিয়ে ছিল
হঠাৎ শিং উঁচিয়ে দাঁত নের করে তাড়া করে এলো।
কিন্তু পিঠে দুই ঘা পড়তেই
পা ছড়িয়ে চীৎ হয়ে পড়ে গেল নর্দমায়
মুখোস গেল খসে
তখন দেখা গেল জানোয়ার নয়, হানাদার।

কোথায় যুদ্ধ-বিরতির সীমা?
মানচিত্রের গায় পেন্সিলের দাগ কেটে কেটে
গুলীবন্ধের সীমানা যদিও বা আঁকা যায়
দুষমনের মন-চিত্রকে কোন্ পেন্সিলের রেখায় আটকে রাখবে?
মানচিত্র আর মন-চিত্র তে এক নয়
এক নয় তরোয়াল ও তুলি।

তার চেয়ে
ধরো কোন চিত্রশিল্পী
আপেলের মত নিটোল
কিম্বা বেদানার মত ভিতর ভিতরে দানাদার
কোন স্বাস্থ্যবতী যুবতীর
কোমরের রেখায়
কিম্বা ছবির তলায় যদি লিখে দেয়ঃ
'এখানে সীজ্ ফায়ার্ লাইন্'
তা' হলে কি প্রেমের রণাঙ্গনে
সব যুদ্ধ স্তব্ধ হয়ে যাবে?
ভূ-স্বর্গ সেই আপেলের দেশ
রাজেন্দ্রাণীর মত আশ্চর্য সুন্দর
ইন্দ্রনীল প্রজাপতি তার পারিজাত বনে।

আর অপ্সরাদের কোমল নিঃশ্বাস
যেন কান পেতে শুনা যায়
দেওদার আর চেনারের ছায়া স্নিগ্ধ পথে
সেখানেও হানাদার?
হাতে তার রাইফেল
না, মোহন বাঁশী?

না, মোহন বাঁশী নয়।
এরা জীবন-যুদ্ধের কোন জেনারেল নয়
প্রেমের সংগ্রামে কোন সংগ্রামীও নয়
অথবা বিরহের ঠাণ্ডা লড়াইয়ে
কোন অভিমানী কাপ্তেনও নয়।
এরা হানাদার
এরা ধর্ষণকামী
ভূ-স্বর্গের পবিত্রতায় এরা অবিশ্বাসী
নন্দনবনবাসিনীকে নরকবাসিনী করার জন্য
এদের অনুপ্রবেশ।
এরা হানাদার
এরা 'কিডনেপার'!

সুতরাং জাগো জওয়ান্
আনো হাতিয়ার
মারো যত হানাদার!
অবরোধ করো সমস্ত পার্বত্য পথ
জঙ্গল জলা আর কণ্টক-লতার অন্ধকার গর্ত
সমস্ত অবরোধ করো।
প্রতিরোধ প্রতিজ্ঞায় জেগে উঠো
আনো বন্দুক, মেসিন গান্ আর হাতবোমা
তাজা কার্তুজ, আর বিস্ফোরকের গন্ধে
আর বারুদের ধোঁয়ায়
উপত্যকায় কী এক অদ্ভুত মৃত্যুর স্বাদ'

অরণ্য পথে পরিপুষ্ট আপেলের রঙীন আভা
যেন আত্মদানের তপ্ত শোণিতে জীবনের মহিমা রঞ্জিত।
না, ভূ-স্বর্গের মৃত্যু নাই,
সেখানে আছে অসংখ্য 'অভিজিৎ'
অভয় মন্ত্রে যারা জয় করেছে মৃত্যুকে
পাথরের বুকে যারা নক্ষত্রের-দীপ্তি এনেছে
আপন রক্তের স্বাক্ষরে।
না, ভূ-স্বর্গের মৃত্যু নাই।

হানাদার,
তোমায় আমি ভয় করি না
আমি তোমায় করুণা করি।
কার আজাদীর জন্য গিরিকন্দরে এই গেরিলা বৃত্তি?
কেন এই মুখোসপরা বর্বরতা আর খুন-খারাবি?
চেয়ে দেখ তোমার নিজের ঘরের দিকে
যেখানে তুমি জন্মেছ—
সেই ভিটায় আজ ঘুঘু চরছে।

তোমার সন্তান উপবাসী
তোমার বউ অর্ধমৃত
কে তোমার সংসারে হানা দিয়েছে?
চেন সেই হানাদারকে?
তোমার জীবন
তোমার মনুষ্যত্ব
তোমার বাঁচার অধিকার
তোমার মাটী, ফুল, ফসল, পাখী
মাথার উপর আশ্চর্য নীলাকাশ
আর সূর্যের অপূর্ব আলো
এবং ঘাসের উপর শিশির বিন্দুর ঔজ্জ্বল্য
আর রাত্রিবেলা দূর নক্ষত্রের স্পন্দন
আর ঝর্ণাধারার সোনালী সঙ্গীত—
এই সমস্ত অদ্ভুত সম্পদ ও সৌন্দর্য
যে সমাজ, যে রাষ্ট্র, যে গবর্নমেন্ট কেড়ে নিল,
এবং তার বদলে তোমার হাতে দিল
মানুষ মারার কল
আর পাঠিয়ে দিল অপরের আজাদীকে হত্যা করার জন্য
হে হানাদার, হে মূর্খ,

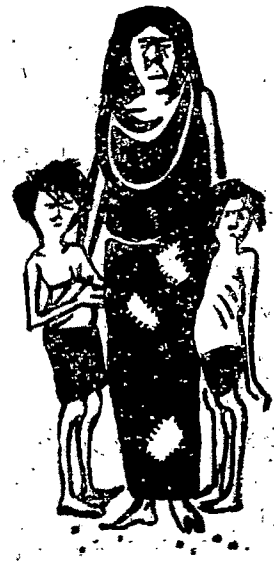

সেই আসল শত্রুকে ঘায়েল না করে
তুমি নিজের বুকে নিজেই ছুরি মারছো!
এই অপঘাত মৃত্যু
তোমার পৌরুষের অসম্মান।

হানাদার,
তোমার বন্দুকের নল ঘোরাও
শেষ গুলী বর্ষণ করো
এবং শেষ বারের মত তোমার হাতবোমা নিক্ষেপ করো
সেই শত্রুর দিকে—
যারা তোমার ও আমার মধ্যে
হানাহানি ঘটিয়েছে
পার্টিশান করেছে আমাদের জননী-জঠর
(যেখানে তুমি আর আমি জন্মেছিলাম
এক সূতিকাগারে
দুই ভাইয়ের মত)
এবং প্রতিদিন জীবন-যন্ত্রণার আবর্তে ফেলে দিয়ে
যার কাগজে যুদ্ধ-বিরতির সীমারেখা টেনেছে—
সেই তোমার ঘরের আসল দুষমনের বিরুদ্ধে
হে গেরিলা,
হে হানাদার
জীবন-যুদ্ধের হে নয়া সর্দার
তুমি আঘাত করো, আঘাত করো, আঘাত করো!!

বঙ্কিমচন্দ্রের উইল

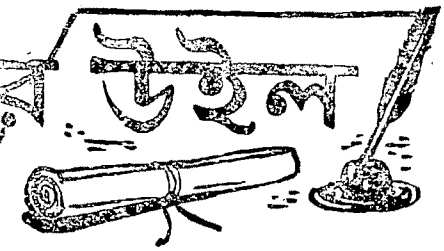

[জাতীয়তার মন্ত্রস্রষ্টা ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা শুধু বাঙলার নয়, ভারতের এক অসামান্য সম্পদ। বাঙলার জাতীয় জীবনে তাঁর রচনার প্রভাব সম্বন্ধে নতুন করে আজ বলার কিছু নেই। তাঁর রচনার সঙ্গে সারা জাতির ব্যাপক এবং ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকলেও তাঁর চরমপত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা মহিলাবর্গ ছাড়া জনসাধারণের পরিচয় বোধ করি নেই। বলা বাহুল্য, এই চরমপত্রের জন্মও তাঁরই অমর লেখনী থেকে। নিম্নে তাঁর চরমপত্রটি প্রকাশ করা হল। এতে তাঁর সহধর্মিণী, তিন কন্যা এবং জ্যেষ্ঠ জামাতার নাম উল্লিখিত আছে। এটি সর্বসাধারণের সামনে সর্বপ্রথম তুলে ধরেন স্বর্গত হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত এবং শ্রীসুধীরকুমার মিত্র। —স।]

১৮৮৭ খৃস্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র একখানি দলিল সম্পাদন করিয়া তাঁহার সম্পত্তি কিভাবে বণ্টন করা হইবে তাহার নির্দেশ দিয়া যান। তাঁহার স্বহস্তে লিখিত এই দলিলখানি এ-যাবৎ লোকচক্ষুর অন্তরালে ছিল। ডঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত এই দলিলখানি বঙ্কিমচন্দ্রের দৌহিত্র স্বর্গীয় ব্রজেন্দ্রসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট হইতে সংগ্রহ করেন।

লিখিতং শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সাং কাঁটালপাড়া, থানা নৈহাটী। জেলা ২৪ পরগণা, সবরেজিস্ট্রি নৈহাটী হাল মোকাম শহর কলিকাতা ৫নং প্রতাপচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গলি কস্য উইল পত্রমিদং কার্যঞ্চোগো যে হেতু আমার প্রাচীন বয়স উপস্থিত এক্ষণে আমার সম্পত্তি সম্বন্ধে আমার উইল করা বিধেয় এজন্য আমি স্বেচ্ছাক্রমে সুস্থ শরীর সজ্ঞানে নিম্নালিখিত মত উইল করিতেছি ঃ

১। আমার মৃত্যুর পর আমার যা কিছু স্থাবর অস্থাবর পুস্তকের কপিরাইট বা অপর যেকিছু সম্পত্তি আছে যা থাকিবে তাহাতে আমার বনিতা শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী দেবী সম্পূর্ণ অধিকারিণী হইবেন। এবং তাহাতে দান বিক্রয় হস্তান্তর করার তাঁহার সম্পূর্ণ অধিকার থাকিবে। এবং ঐ সকল সম্পত্তি সম্বন্ধে তিনি নিজে উইল করিতে পারিবেন।

২। কেবল এই সকল সম্পত্তির মধ্যে শহর কলিকাতার পটলডাঙার অন্তর্গত প্রতাপচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গলিতে ৫ নম্বরের যে খরিদা পোক্তা বাটী ও ৪ নম্বরের যে খরিদা জমি আছে তাহা আমার উক্ত বনিতা শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী দেবী দান, বিক্রয় অথবা হস্তান্তর করিতে পারিবেন না। বা তৎসম্বন্ধে উইল করিতে পারিবেন না। তাঁহার মৃত্যুর পর ঐ ৫ নম্বরের বাটী ও ৪ নম্বরের ভূমি আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী শরৎকুমারী দেবী প্রাপ্ত হইবেন। তখন উক্ত শরৎকুমারী দেবী উহাতে সম্পূর্ণ স্বত্বশালিনী হইবেন। এবং তাঁহার উহাতে দান, বিক্রয় বা অন্য প্রকার হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে। যদি আমার বনিতা শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী দেবীর মৃত্যুকালে আমার জ্যেষ্ঠ কন্যা (ঈশ্বর না করুন) বিদ্যমান না থাকেন, তবে উক্ত ৫ নম্বরের ভবন ও ৪ নম্বরের ভূমি শরৎকুমারী দেবীর জ্যেষ্ঠপুত্র প্রাপ্ত হইবেন।

৩। যদি আমার মৃত্যুর পর ভোগ সময়ে আমার বনিতা শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী দেবী বিবেচনা করেন যে, উক্ত ৫ নম্বরের বাটী বা ৪ নম্বরের ভূমি বিক্রয় করা আবশ্যক তবে আমার উক্তা জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী শরৎকুমারী দেবীর লিখিত সম্মতি লইয়া বিক্রয় করিতে পারিবেন নচেৎ পারিবেন না। ঈশ্বর না করুন, ঐ সময়ে যদি শরৎকুমারী দেবী বিদ্যমান না থাকেন তবে শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী দেবী আপন স্বেচ্ছাক্রমে ঐ ৫ নম্বরের ভবন ও ৪ নম্বরের ভূমি বিক্রয় করিতে পারিবেন। কাহারও সম্মতির অপেক্ষা করিবেন না।

৪। যদি আমার মৃত্যুর পূর্বেই আমার উক্তা বনিতা শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী দেবীর মৃত্যু হয় তবে আমার মৃত্যুর পরে আমার ত্যক্ত সম্পত্তিতে যে যে প্রকারে অধিকারী ও স্বত্ববান হইবে তাহা নিম্নে ক, খ, গ, ঘ দফাওয়ারিতে লিখিলাম।

(ক) আমার সমস্ত সম্পত্তির মধ্যে যাহা স্থাবর সম্পত্তি তাহাতে আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী শরৎকুমারী দেবী সম্পূর্ণ স্বত্বাধিকারিণী হইবেন। তাঁহার দানবিক্রয়ের অধিকার থাকিবে। ইহার মধ্যে আমার কাঁঠালপাড়ায় যে পৈত্রিক ভদ্রাসন বাটী আছে তাহাতে আমার দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী নীলাব্জকুমারী দেবী এবং আমার তৃতীয়া কন্যা শ্রীমতী উৎপলকুমারী দেবীর যাবজ্জীবন বাস করিবার অধিকার রহিল।

(খ) আমার অস্থাবর সম্পত্তির মধ্যে আমার শাল, রুমাল, ইলবাস, পোষাক, গাড়ি, ঘোড়া, ঘড়ি, ঝাড়, লণ্ঠন, আসবাব ও লাইব্রেরী আমার জ্যেষ্ঠ জামাতা শ্রীমান রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রাপ্ত হইবেন। অবশিষ্ট অস্থাবর সম্পত্তি আমার তিন কন্যা তুল্যাংশে পাইবেন।

(গ) আমার লিখিত পুস্তকের কপিরাইটে আমার যে স্বত্ব তাহা আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী শরৎকুমারী দেবী প্রাপ্ত হইবেন। তাহাতে যে লভ্য হইবে অর্থাৎ পুস্তক ছাপানো ও বিক্রয় করার খরচ-খরচা বাদে যে লাভ থাকিবে তাহার মধ্যে ফি টাকায় তিন আনা তিনি আমার দ্বিতীয় কন্যা শ্রীমতী নীলাব্জকুমারীকে দিবেন এবং ফি টাকায় তিন আনা আমার কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী উৎপলকুমারীকে দিবেন। এবং তাঁহারা চাহিলে তিন মাস অন্তর তাঁহাদের এক একখণ্ড হিসাব দিবেন। শরৎকুমারী স্বয়ং ফি টাকায় দশ আনা লইবেন।

(ঘ) ঈশ্বর না করুন যদি আমার মৃত্যুকালে আমার বনিতা শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী দেবী এবং আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী শরৎকুমারী দেবী উভয়েরই অভাব হয় তবে এই উইলের দ্বারা যে অধিকার আমি শ্রীমতী শরৎকুমারীকে দিলাম তাহা তদ্ভাবে তাঁহার পুত্রগণ প্রাপ্ত হইবেন। আর এই উইলের দ্বারা যে অধিকার আমার অপর দুই কন্যাকে

(২১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

অন্নদাশঙ্কর রায়

জানতে না তো হাল কী হবে
হটিয়ে দিলে হিন্দুরে।

ও মিঞা—

খুলনা শহর ছেয়ে গেছে
হাজার হাজার ইন্দুরে।

দিনে-রাতে খাজনা নিতে
সদলবলে উৎপাত হে।

ও মিঞা—

ঢাকনা খুলে খাবার সরায়
হাঁড়কুঁড়ি লুটপাট হে।

আলমারিতে রাখলে পোশাক
রাখলে কেতাব সিন্দুকে।

ও মিঞা—

দেখলে খুলে কেটেকুটে
গেছে, যেমন হিন্দুকে।

হল্লা করে দৌড়ে বেড়ায়
কিচমিচিয়ে আহ্লাদে
ও মিঞা—
ভয় করে না, ডর করে না
বেড়াল-হেন জল্লাদে।
ধাড়ি ধাড়ি ইঁদুর কিসে
বেড়াল হতে কম বা সে।

ও মিঞা—
ইয়া ইয়া বদন দেখে
বেড়ালই দেয় লম্বা সে।
হামেলিনের হাল মনে হয়
হাল আমলের খুলনারে।
ও মিঞা—
বেহালা আজ কে বাজাবে?
কোথায় সে জন?
কোন্ পারে?

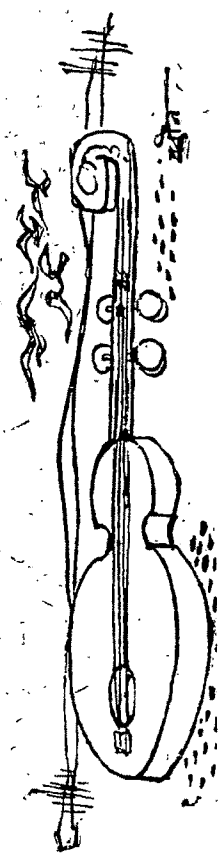

দ্বিতীয় জীবন

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

মারপিট, দাঙ্গা সুরু হয়ে গেছে। আগুন লেগেছে বস্তিতে। দোকান-পাট লুট হচ্ছে। পুলিশ টিয়ারগ্যাস ছুঁড়ছে। জনতা পাল্টা ইট-পাটকেল ছুঁড়ছে। পুলিশ এবার বুঝি গুলী চালাল।

পালাও! পালাও!

যে-যেদিকে পারল ছুট দিল। নরহরি আর হিমানীও ছুটল।

কাছেই একটা নতুন বাড়ি তৈরী হচ্ছে, দিকবিদিক না তাকিয়ে তার মধ্যে ঢুকে পড়ল হিমানী। পিছনে নরহরিকে উদ্দেশ করে বললে, 'চলো এটার মধ্যে ঢুকি।'

হঠাৎ এই জনতার মধ্যে জড়িয়ে পড়েছিল তারা। ভেবেছিল বুঝি মামুলি মিছিল। কিন্তু হঠাৎ যে এমন প্রলয় কাণ্ড করে তুলবে হিসেবের মধ্যেই আনেনি।

নরহরিই এদিকে নিয়ে এসেছিল বেড়াতে। হিমানী তো অন্য প্রস্তাব এনেছিল। বলেছিল, চলো আজই রেজিষ্ট্রীটা করে ফেলি।

আজই? তুমি বলছিলে না একটা দিন দেখতে পাঁজিতে—পর্শু খুব ভালো দিন।

দরকার নেই দিনে। ঝলসে উঠেছিল হিমানী। এখুনি চলো। শুভস্য শীঘ্রং। সব পাকা করে ফেলি। বাবা-দলিলটা দেখাই। ওদের স্তব্ধ করি। চলো আর দেরি নয়। যা অবধারিত তাকে স্থগিত রাখবার কোনো মানে হয় না।

কিন্তু আজ এক্ষুণি, সাক্ষী কই?

রাস্তার থেকে দুটো লোক ডেকে নিলে হয় না?

কী যে বলো। আমার কলেজের দুই 'কলিগ' সাক্ষী হতে রাজী হয়েছে। পর্শু তাদের পাওয়া যাবে।

উঃ, পর্শু। আরো দুটো দিন!

দুটো দিন আর কতটুকু!

না, আমার আর দেরি সইছে না। আমার নির্বাচনই যে চূড়ান্ত, তার উপর যে আর কারু বিচার চলে না। এটার সরকারী প্রমাণ না দেওয়া পর্যন্ত আমার শান্তি নেই। না, সে ব্যারিষ্টার নয়, এঞ্জিনিয়র নয়, বড় কোনো চাকুরে বা ব্যবসাদার নয়, সে একজন সাধারণ প্রফেসর, হ্যাঁ, দেখতে সে রাজপুত্র নয়, অবস্থাও তার বড় নয়, হ্যাঁ, তার নাসটাও খারাপ—তবু সেই আমার সমস্ত—এটা আর মুখের কথায় নয়, কাগজে-কলমে দাখিল করতে চাই বাড়িতে। আমি যা প্রতিজ্ঞা করি তা যে রাখি, আমার যে যেমন কথা তেমন কাজ, তার যে নড়চড় নেই, তার সার্টিফিকেটটা হাতে পেলে পর আমার জ্বালা মিটবে। হ্যাঁ, আর দু-দিন। দেখতে-দেখতে কেটে যাবে, কী বলো!

চলো আজ তবে একটা অন্য দিকে যাওয়া যাক।

ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যে হয়ে গিয়েছিল, আর কী কক্ষণেই যে হাঁটা ধরে-

ছিল তারা। বুঝতে পারেনি কু'ঘণ্টার মধ্যে কী সব ঘটে যেতে পারে।

'চলে এস।' পিছনের লোককে আবার তাড়া দিল হিমানী।

যে এসে হিমানীর পাশে এসে দাঁড়াল, অন্ধকার হলেও বেশ ঠাহর হল সে নরহরি নয়। একটা প্যান্ট-শার্ট পরা অচেনা ভদ্রলোক।

'এ কী! আপনি ? আপনি কে?' হিমানীর মুখ-চোখ বিবর্ণ হয়ে গেল।

'আমি।' সঞ্জয় বললে, 'কেন আমাকে কি ঠিক মানুষ বলে মনে হচ্ছে না?'

'কিন্তু আপনি এখানে কেন?' হিমানীর প্রায় কান্না-কান্না।

'এ তো আমারও প্রশ্ন হতে পারে, আপনি এখানে কেন?'

'আমি আশ্রয়ের জন্য ঢুকেছি।'

'আমারও সেই কথা।'

'এখান থেকে বেরুব কী করে?'

'এখন বেরুনো ঠিক নিরাপদ নয় —এখনো গুলী ছুড়ছে। পুলিশ টহল দিচ্ছে। এখন চুপচাপ গা ঢাকা দিয়ে থাকাই মঙ্গল।'

'বা, এখানে থাকব কী।'

'বিপদে পড়ে মানুষ আরো কত জঘন্য জায়গায় থাকে, বনেবাদাড়ে, স্লিট ট্রেঞ্চে, ড্রেনে-নর্দমায়—'

'কিন্তু আমার সঙ্গে যে ছিল সে কোথায় গেল?'

'আমিই তো আপনার সঙ্গে ছিলাম—'

'আপনি তো এই শেষকালে এসে জুটলেন।'

'শেষকালে যে জোটে সেই-ই তো আসল। শেষের সঙ্গীই সঙ্গী।'

'কিন্তু কী হবে?' ছটফট করে উঠল হিমানী।

'রাত ভোর হবে। কেন ভয় পাচ্ছেন? চলুন না—সব বাড়ি—দেখি না এখানে কী আছে। কী করা যায়।'

'না।' হিমানী স্বর দৃঢ় করবার চেষ্টা করল।

'না কী! আপনি এমনি দাঁড়িয়ে থাকবেন?' সঞ্জয় শাসনের সুরে বললে, 'ভেতরে চলুন।'

'আমি আপনাকে চিনি না।'

'দুনিয়ায় কে কাকে চেনে? আমিই কি আপনাকে চিনি? কিন্তু বাইরে থেকে আপনাকে দেখে ফেললে বিপদ আছে, পুলিশ ধরে নেবে। শুধু আপনাকে নয়, আপনার জন্যে আমাকেও। আমরা দুজনে এখন এক নৌকোর সোয়ারী।'

'আমাকে ধরবে কেন? ধরলে আপনাকে ধরবে।'

'আমাকে ধরলে তো এই এম্পটি হাউসে অন্য চার্জে ধরবে। আপনার জবানবন্দি লাগবে। তাতেও আপনার রেহাই নেই। তাছাড়া পুলিশ কেন, গুণ্ডারাও হয়তো ঘোরাফেরা করছে, তারা এমন জিনিস দেখলে কী করবে কে জানে।'

ভিতরের দিকে সরে গেল হিমানী।

দেখা গেল নিচের কোণের দিকের ঘরে কটা নেপালী ছোকরা দিব্যি সংসার সাজিয়ে বসেছে। খিলখিলে হাসিতে গুলতানি করছে প্রাণ খুলে।

ওরা কারা?

ওরা বললে, ওদের একজন এ বাড়ির দারোয়ান, বাড়ির মালামালের তদারকি করে আর দুজন ওর জ্ঞাত-ভাই। আপনারা কে?

'দুজনে বাড়ি থেকে বেরিয়ে-ছিলাম সিনেমা দেখব বলে।' স্বচ্ছ মুখে বললে সঞ্জয়, 'হঠাৎ এই ভিড়ের মধ্যে আটকে পড়েছি। এখন ফিরি কী করে?'

'রাতে বাইরে বেরুনো যাবে না। এ অঞ্চলে কার্ফু পড়েছে।'

'কার্ফু! কই জানি না তো।'

'হ্যাঁ, সন্ধ্যে সাতটা থেকে সকাল ছটা পর্যন্ত।'

'সর্বনাশ! আজ তাহলে বাড়ি ফেরাই বন্ধ।' যেন সমস্ত অপরাধ সঞ্জয়ের, এমনি ভ্রূকুটিভয়াল চোখে তাকাল হিমানী।

'তাতে কী। একটা রাত একটু অন্য রকম করে কাটিয়ে দেব।' সঞ্জয় সুখী উদাসীনের মত বললে। তারপর লক্ষ্য করল দারোয়ানকে: 'কোন্ জায়গাটা ভালো হবে বলো তো?'

'উপরে যান। এই টর্চটা নিন।' ছোট একটা টর্চ দিল দারোয়ান।

'উপরে ঘর আছে?'

'ঘর মানে ছাদ-দেয়াল আছে।' যেন সব বুঝতে পেরেছি, এমনিভাবে হাসল দারোয়ান: 'জানলা-কপাট বসেনি এখনো। ঐ সিঁড়ি—'

'এই যে, এস, চলে এস—' উপরে উঠতে লাগল সঞ্জয়।

তবু দ্বিধা করতে লাগল হিমানী। উপরের সঙ্গীটা বাঞ্ছনীয়, না নিচের এই লোকগুলো, স্থির করবার আগেই দারোয়ান বললে, 'যান উপরে।'

অগত্যা উপরেই উঠল হিমানী। ক্রুদ্ধ মুখে বললে, 'আমাকে তখন 'তুমি' বললেন কোন্ হিসেবে?'

'তাতে কী হয়েছে!' একেবারে উড়িয়ে দিতে চাইল সঞ্জয়, 'আপনি তো আমার চেয়ে বয়েসে ছোটই হবেন—ছোটকে 'তুমি' বলা যায় না?'

'না। ভদ্রমহিলার মান রেখে কথা বলা উচিত।'

'আপনি বুঝছেন না, মানের জন্যেই তো তুমি বললাম। ওরা বুঝল আপনি আমার আত্মীয়, বাড়ি থেকে এক সঙ্গে বেরিয়েছি—এসঙ্গে বেরুবার মত আত্মীয়—'

'তাহলে 'তুই' বললেই পারতেন—ছোট বোনটোন ভাবত।'

'তুই! ওরে বাবা, ওটা সব সম্পর্কেই চলে, প্রেমের সম্পর্কে তো ওটার নিদারুণ ব্যঞ্জনা। তারপরে ছোট বোন! ছোট বোনকে নিয়ে সিনেমা যাবার দিন আর আছে নাকি? যাক, আপনার যখন আপত্তি, 'আপনি' করেই বলব। কিন্তু দেখুন তো—এ ঘরটাই বুঝি ভালো—ভালো মানে দেয়ালের অংশ বেশি, ফোকরের অংশ কম—'

হিমানীর মায়ের কথা মনে পড়ল। কী একটা সমান বয়সী ছেলেকে বিয়ে করবার জন্যে ঝুঁকেছিস? বয়েসে বেশ একটু বড় না হলে কি শ্রদ্ধা আসে? আর মূলে শ্রদ্ধা একটু না থাকলে কি ভালো-বাসাটা টেঁকসই হয়? এক সঙ্গে এক ক্লাসে যে পড়ে তার সঙ্গে বন্ধুতাটা যেমন স্বাভাবিক, তুইতোকারিও স্বাভাবিক। হিমানী বলেছে এ সব বিবেচনা বৃথা, আমার নির্বাচনে চল-বিচল নেই।

'কী ভাবছেন?' হিমানীকে চিন্তিত দেখে সঞ্জয়ই আবার জিজ্ঞেস করল।

'আপনার সঙ্গে আমি এই ঘরে থাকব নাকি?'

'না, না, আপনি একা থাকবেন, আমি অন্য ঘরে থাকব।'

'যেখানে জানলা-দরজা নেই সেখানে আবার আলাদা ঘর কী। আপনি তো অনায়াসে হেঁটে চলে আসতে পারেন।'

'তা তো পারিই। না হেঁটে উপায় কি। বসবার জায়গা-টায়গা তো দেখতে পাচ্ছি না। মেঝেও তৈরি নেই—'

'সারা রাত আপনি হেঁটে বেড়াবেন?'

'আপনাকেও হেঁটে বেড়াতে হবে। কেননা থামলেই, বসলেই তো এক ঘরে থাকা হয়ে যাবে।'

'সত্যি,' শিউরে উঠল হিমানী, আকুল স্বরে বললে, 'দেখুন না বাইরে বেরুনো যায় কিনা।'

'শুনলেন না কার্ফু—'

'ওরা কী জানে। বানিয়েও বলতে পারে।'

'দেখছেন না রাস্তাঘাট নিঝুম, গাড়ি-টাড়ি তো নেই-ই, একটা রিক্‌শাও যাচ্ছে না। লোকজন সমস্ত উধাও, বাড়িঘর বন্ধ, শুধু মিলিটারি জিপ যাচ্ছে আর পুলিশের বুটের শব্দ।'

'কী হবে।'

'যা হবার তাই হবে।'

যেন আরো ভয় পেল হিমানী। 'আমি তাহলে নিচে যাই।'

'নেপালীদের আড্ডায়? ওদের কাছে কুরকি আছে।'

'সত্যি, যদি ওরা আমাদের আক্রমণ করে?'

'করলে আমাকে করবে। আপনার কেশস্পর্শও করবে না। মানে, যদি করে, আমাকে মেরে ফেলে পরে করবে।'

'কী বলছেন, আমার জন্যে আপনি প্রাণ দেবেন?'

'মানে, মুখে বলতে, মুখে-মুখে দিতে বাধা কী। সত্যিকার বিপদ এলে উপস্থিত বুদ্ধিতে কী করে বসব তা কে জানে।'

'দেখুন, সত্যি, একটু কাছে-কাছে থাকবেন, খুব বেশি দূরে যাবেন না।'

'বুঝেছি। কদাচ এক ঘরে নয়।'

'আচ্ছা,' হিমানী গা ঝাড়া দিয়ে উঠল; 'বাইরে বেরিয়ে পড়লে ক্ষতি কী।'

'মিলিটারি গুলী করতে পারে।'

'যদি হাত তুলে সারেণ্ডার করি, এরেষ্ট করতে পারে না?'

'তাও পারে। ধরে নিয়ে যেতে পারে থানায়।'

'তাই চলুন না। এর চেয়ে থানায় থাকা অনেক নিরাপদ।'

'আপনার যদি তাই মনে হয় আপনি যান।'

'আমি একা যাব?'

'আপনি বেশ।' সঞ্জয়ের স্বরে বুঝি একটু অভিমান লাগল; 'যাবার বেলায় একসঙ্গে আর থাকবার বেলায় অন্য ঘর। আপনি তো স্বাধীন, আপনি চলে যান না নিজের পথে। আমি এমন আশ্রয় ছাড়ি কেন? একা আছি একাই কাটিয়ে দিতে পারব।'

'কী সাংঘাতিক!' হিমানী একটা আতঙ্কিত আওয়াজ করলে। সঞ্জয়ের প্রস্তাব শুনে নয়, দুটো নেপালী নিচের থেকে একটা দড়ির খাটিয়া উপরে তুলে এনেছে দেখে।

'খুব ভালো! খুব আচ্ছা।' সঞ্জয় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। হিমানীকে বললে,' আর চাই কী। এবার বোসো পা তুলে। ইচ্ছে করলে গা মেলে শুয়েও পড়তে পারো।'

নেপালী দুটো হি-হি করে হাসতে লাগল।

'আচ্ছা ভাই একটা ক্যাণ্ডেল হবে?' সঞ্জয় হাত পাতল, 'আমার সঙ্গে দেয়াশলাই আছে।' সিগারেটের প্যাকেট থেকে দুটো সিগারেট বের করে এনে দিলে দুজনকে।

'আমাদের হেরিকেনটাই আপনাদের দিচ্ছি।'

'আর ভাই, একটা চট দিতে পারো?'

'দরজার ফাঁকে ঝোলাবেন? দেখি—'

একজন হেরিকেন, আরেকজন একটা চট দিয়ে গেল।

'বসুন।' বললে হিমানীকে।

'তার মানে চট টাঙিয়ে আপনি দরজার ফাঁক ঢাকবেন?'

'না, না, ভাঁজ করে নিয়ে মেঝের উপরে পেতে বসব। ঐ একটা খাটে দুজনে তো বিশ্রাম করা যাবে না।'

চট পেতে যোগাসনে বসে থাকবে, ভাবতে কী রকম যেন একটু মায়া হল হিমানীর। বললে, 'কিন্তু বসতে আপত্তি কী। বসুন না।' হিমানী পা তুলে বেশ আরাম করে বসল দেয়ালে হেলান দিয়ে।

'না বাবা, দরকার নেই। আপনিই বসুন। খাটটা ছোট।'

'আহা, দিব্যি বসা যায় দুজনে।'

বসল সঞ্জয়। বললে, 'বসলে দোষ কী জানেন? বসলেই শুতে ইচ্ছে করে।'

'না, বিলাসিতা অতদূর প্রসারিত করলে চলবে না।'

'বিলাসিতা! কিন্তু ক্লান্তিকে আপনি কী বলবেন? ক্লান্ত মানুষকে প্রশ্রয় না দিয়ে উপায় কী। ক্লান্ত ঘুমন্ত মানুষ তো একটা শিশুর মত নিষ্পাপ।'

'বেশ তো শোবেন, আমি মেঝেতে চটের উপর বসে থাকব।'

'তার মানে আপনার কথামত কাছাকাছিই থাকবেন। কিন্তু আমার কী রকম ঘুম তা তো জানেন না।'

'কী রকম ঘুম?'

'মড়ার মত ঘুম। শত চিৎকারেও আমি জাগি না।'

'তার অর্থ?'

'তার অর্থ, আমাকে ঘুমন্ত দেখে কেউ যদি আপনাকে চুরি করে নিয়ে যেতে চায়, আপনি চেঁচামেচি করলেও আমি জাগব না।'

'কিন্তু গায়ে জোরে ঠেলা মারলে?'

'তাহলে জাগতে পারি বটে; কিন্তু ওরা কি আপনাকে সেই চান্স দেবে?'

'তাহলে কারুরই শুয়ে দরকার নেই। আমরা দুজনেই জেগে থাকব।'

'দুজনে জেগে থেকেই বা করবেন কী?'

'গল্প করব।'

'গল্প করারও বিপদ আছে—আপনি কখন আপনা থেকেই তুমি-তে

চলে আসা। কিন্তু তার আগে কিছু খাবার জোগাড় করা যায় কিনা দেখা যাক।' উঠে পড়ল সঞ্জয়।

হিমানীর মনে হল আপনি থেকে তুমিতে আসার মধ্যে একটা নতুন রকম আস্বাদ আছে। অচেনা দুজনের যখন বিয়ে হয় তখন গোড়াগুড়ি থেকেই তুমি বলে আর নরহরি ও তার মত এক কুলের ছাত্র হলে সেই তুমিই, নয়তো তুই—কখনো আপনি নেই, আপনি থেকে তুমিতে হঠাৎ ঘনীভূত হওয়া নেই—না এ পক্ষে, না বা ও-পক্ষে।

সঞ্জয়কে সত্যি সিঁড়ির দিকে এগুতে দেখে হিমানী বাধা দেবার মত করে বললে, 'কে খাবে?'

সঞ্জয় ফিরল। বললে, 'তুমি ছেলেমানুষ, তোমাকে খিদে পেয়েছে নিশ্চয়ই, তুমি খাবে।'

আশ্চর্য কেমন অবলীলায় ছেলে-মানুষ বলল। নরহরি কোনোদিন তাকে ছেলেমানুষ বলেনি, বলবেও না, পারেও না বলতে। কেউ কাউকে বলবে না। তাদের অভিধানে ও সুন্দর শব্দটা নেই। তারা সমান-সমান।

'থাক, বাহাদুরীতে কাজ নেই।' দিব্যি বলতে পারল হিমানী।

'বাহাদুরি মানে? কত দূর দুর্গম জায়গায় কনষ্ট্রাকশনের কাজ করেছি, রাতে ফিরতে পারিনি, সাইটেই রাত কেটেছে না খেয়ে—'

'কী কাজ কর হয়?'

'এই মিস্ত্রির কাজ—হেড মিস্ত্রি।'

'আপনি এঞ্জিনিয়র?'

'যাদের দিন পড়েছে আজকাল অথচ যাদের কেউ দেখতে পারে না, অর্ধশিক্ষিত মনে করে—'

'বাজে কথা। আমার বাবা খুব এঞ্জিনিয়রের ভক্ত আর আমার মা ব্যারিস্টারের। এ কী, আপনি উঠলেন কেন? বসুন।'

সঞ্জয় আবার বসল এক কোণে। জিজ্ঞেস করলে, 'আপনি কার ভক্ত?'

'আমি কারু ভক্ত নই। আচ্ছা আপনি যে বাড়ি ফিরছেন না আপনার স্ত্রী ভাববেন না?'

'যেমন আপনার স্বামী ভাববেন।'

দুজনেই হেসে উঠল একসঙ্গে।

'আমার জন্যে আমার বাবা-মা ভাববেন।' হিমানীর কেন কে জানে আর কারু কথা মনে এল না।

'আমার জন্যে তাও নেই।'

'কেউ নেই?'

'এই মুহূর্তে আপনি ছাড়া কেউ নেই। যাই ওদের কাউকে ডাকি। ওদের তো একটাই নাম—বাহাদুর।' সঞ্জয় উঠে পড়ল। সিঁড়ির কাছে গিয়ে ডাকল—বাহাদুর!

দারোয়ান এসেই হাসল। 'কী, চট টাঙাননি?'

'না। শোনো, কিছু খাবার জোগাড় হবে? দোকান তো সব বন্ধ।'

'হ্যাঁ, আপনাদের জন্যে রুটি আনছি। রুটি আর ভাজি—'

'আর দুটো গ্লাস আর এক কুঁজো জল।'

'গ্লাস একটাই যথেষ্ট।' হিমানী বললে।

যা বলে তাতেই দারোয়ান রাজি। আর সেই আকর্ণবিস্তৃত হাসি।

'উঃ, তুমি কী ভালো! ইনি উলটে কেবল তোমাদেরই ভয় করছেন।'

'না, না, কিছু ভয় নেই। আপনারা নিশ্চিন্ত হয়ে থাকুন। খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়ুন। চট টাঙাবার দড়ি-পেরেক লাগবে?'

হিমানীর দিকে চেয়ে হাসল সঞ্জয়। বললে, 'চট না টাঙালেই বা কী। উপরে তো কেউ আসবে না।'

'না, না, কেউ না। আমরা নিচে সারা রাত পাহারা দিই। আপনারা নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমুবেন।'

দুটো প্লেটে করে রুটি আর ভাজি নিয়ে এল দারোয়ান আর তার এক ভাইয়ের হাতে জলভর্তি কুঁজো আর গ্লাস। কুঁজো-গ্লাস মেঝেতে নামিয়ে রেখে প্লেট দুটো দুজনের হাতে তুলে দিয়ে চলে গেল দুজন।

'আর কী চাই। খাদ্য, পানীয় আর শয্যা—আর কী চাই!' খেতে সুরু করল সঞ্জয়।

'আচ্ছা আপনাকে কে বলেছে আমি আপনার চেয়ে নেপালীদেরই বেশি ভয় করছি?'

'না, কে বলেছে? আমাকেই তো বেশি ভয় করা উচিত। তাই যা বলছি শুনুন। খেয়ে নিন। খাওয়া পর্যন্ত ভয় নেই। তার পরেই ভয়।'

'মানে?'

'মানে ঘুমুনো নিয়ে ভয়।'

'দেখছেন না সব ওরা কেমন সমান-সমান ভাগ করে দিয়েছে আলাদা-আলাদা প্লেটে দুখানা করে রুটি। যার যা, তার তা।'

'কিন্তু দেখছেন তো,' সঞ্জয় জিৎ-পার্টির মত হেসে উঠল, 'খাটের বেলায় দুখানা নয়, খাটের বেলায় এক-খানা। আপনি যেমন গ্লাস একটা চেয়েছেন, খাটও একখানা। তার মানে আধখানা আমার, আধখানা আপনার।'

'অসম্ভব।' প্লেটটা হাত থেকে নামিয়ে রাখল হিমানী: 'আমি হেঁটে বেড়াব।'

'বেশ তো, খেয়ে নিয়েও তো হেঁটে বেড়ানো যায়। তুমিও হাঁটো আমিও হাঁটি।'

খেতে লাগল হিমানী। ভরামুখে বললে, 'আপনি সাংঘাতিক লোক।'

'আর এ একটা নির্জন পুরী। অন্ধকার। একটিমাত্র হেরিকেন নিবে গেল বলে। রাস্তায় লোকজন নেই, আলো নেই, আশেপাশে বাড়ি সব বন্ধ, পুলিশ ডাকা যাবে না—'

'ভালো হচ্ছে না কিন্তু।'

'ভালোর তো কিছুই দেখছি না।'

'আমাকে ভয় পাইয়ে দেবেন না।'

'তাহলে লক্ষ্মীটির মত শুয়ে পড়ো। ঘুমোও।'

'আর আপনি?'

'আমি চটের আসনে চটে-মটে বসে থাকব।'

'ওরে বাবা! আমি ঘুমুব আর আপনি দেখবেন। সেটা ভীষণ অসহায় লাগবে।'

'জেগে থেকেই বা তুমি এমন কী সসহায়? বেশ তো, তবে খাটটা ছেড়ে দাও, আমি ঘুমুই, তুমি জেগে থাকো।'

'এখন মনে হচ্ছে সে আরো ভয়ের।'

'তা হলে, শোনো, যার জন্যে,

যে কথা ভেবে এত ভয়, সেই ভয়টাকে দুজনে শেষ করে দি। তার মানে খাটটাকে আধখানা আধখানা করি। অবশ্যি মনে মনে, কাটাকাটি না করে। এক আধখানায় আমি শুই আর আধখানায় তুমি শোও। মানুষ দুজন হলে যেমন শোয় আর কি।' দিব্যি হাসতে লাগল সঞ্জয়: 'তাহলে আর ভয়টয় কিছু থাকে না। ভয়ই তখন ভয় পায়।'

'বলিনি আপনি ডেঞ্জেরাস—'

'বলছি তো সব মুখে। তাই সমস্ত খাটটাই আপনাকে ছেড়ে দিই।' এক খটকায় উঠে পড়ল সঞ্জয়: 'আপনি লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ুন। এখনো অনেক রাত পাড়ি দিতে হবে।'

বাহুতে মাথা রেখে কাৎ হয়ে পা গুটিয়ে শুয়ে পড়ল হিমানী। ভাবল বোধহয় কতক্ষণ পরে ভদ্রলোকও আস্তে আস্তে শুয়ে পড়বে। কিন্তু না, লোকটা একটা সিগারেট ধরিয়ে ঘরে-বাইরে পাইচারি করতে লাগল। এতক্ষণ হিমানী জেগে ছিল বলেই বুঝি তার সামনে সিগারেট ধরায়নি। কিন্তু কী আশ্চর্য, লোকটা বারে বারে ঘুরে ঘুরে এসে তাকে দেখে যাচ্ছে না? খানিক-ক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকছে না? তার চেয়ে দেয়ালের ফাঁক দিয়ে তারাভরা শুভ্র আকাশ দেখতে বুঝি বেশি সুখ।

কতক্ষণ পরে ঘরে ফিরে আসতেই সঞ্জয়ের উপর হিমানী ঝামটে উঠল: 'চুপ করে বসুন না এই খাটের কোণে। বলেছি না কাছাকাছি থাকবেন।'

'তুমি এখনো ঘুমোও নি!'

'কী করে ঘুম আসে যদি ভূতের মত পায়চারি করে বেড়ান।'

'আচ্ছা আচ্ছা বসছি খাটের কোণে।' সঙ্কীর্ণ হয়ে পায়ের প্রান্তের কাছে বসল সঞ্জয়।

'পা যদি গায়ে লাগে আমাকে কিন্তু কিছু বলতে পারবেন না।'

'না, না, বলব না কিছু। তুমি মনের সুখে পা লম্বা করে দাও।'

ঘুমের মধ্যে এক সময়ে পা বুঝি লম্বাই করে দিয়েছিল হিমানী কিন্তু কোথাও একটু বাধা পেল না বলে চোখ চেয়ে দেখল লোকটা মেঝের উপর চট পেতে বসে দেয়ালে ঠেস দিয়ে দিব্যি ঘুমুচ্ছে।

নরহরি কি কখনো পারত অমন ঘুমোতে? কিন্তু হিমানীর কোনো সাড়াশব্দ করতে ইচ্ছে হল না। যদি ওর ঐ ঘুমটুকু নষ্ট হয়। আহা, ঘুমুচ্ছে, ঘুমোক। ক্লান্ত ঘুমন্ত মানুষ একটা শিশুর মত নিষ্পাপ।

আবার ঘুমিয়ে পড়ল হিমানী।

জেগে উঠতেই তার ভয়-ভয় করতে লাগল। ঘরে কেউ নেই, আলো জ্বলছে না, শুধু ভাঙা রোগা চাঁদের পাণ্ডুর মুখটা দেখা যাচ্ছে।

নাম জানে না ধাম জানে না হিমানী হঠাৎ ডেকে উঠল: 'তুমি—তুমি কোথায়?'

'এই তো এখানে।' পাশের ঘর থেকে চলে এল সঞ্জয়।

'আপনি শোন নি?' উঠে বসল হিমানী।

'আহা, কী আপনার প্রশস্ত খাট—প্রশস্ত হৃদয়।'

'এবার আপনি একটু শোন, আমি জাগি।' হিমানী খাট থেকে নেমে পড়ল।

'আহা কী দয়া। কী স্নেহ।'

'আপনি কী! এরকম করে বুঝি বলে! আমাকে দেখলে হৃদয়হীন নির্দয় মনে হয়?'

'কিছুই মনে হয় না। মনে হয় পৃথিবীতে এ এক দ্বিতীয় জীবন।'

এক মুহূর্ত চুপ করে রইল হিমানী। ভাবল, নরহরিকে কি সে বলতে পারত দয়া বা স্নেহের কথা? নরহরিই কি দিতে পারত দ্বিতীয় জীবনের সংবাদ।

'এখন কটা?' জিজ্ঞেস করল হিমানী।

'প্রায় পার করে এনেছি। আর একটা ষ্টেশন।'

'ষ্টেশন?'

'মানে আর এক ঘণ্টা।' সঞ্জয় হাসল: 'পৃথিবীটা ট্রেণ আর ঘণ্টাগুলি ষ্টেশন।'

চুপ করে বসে থাকতে থাকতেই ভোর হল। কাক ডাকল। বাহাদুর এখ মুখ হাসি আর দু বাটি গরম চা নিয়ে এল।

ছটা বেজেছে।

বেরিয়ে পড়ল দুজনে।

'ওদের কিছু বকশিস করলে হত না?' হিমানী নিজের ব্যাগেই হাত দিল।

'না, কিছু ঋণ থাক।' বাধা দিল সঞ্জয়। বললে, 'সব একেবারে শোধবোধ করে যাওয়া ঠিক নয়। ওরা কি ঐ সব পয়সার জন্যে করেছে?'

'সত্যি। মানুষ এমনিতেই কত সুন্দর কত ভালো।' হিমানী পূর্ব পেলব চোখে তাকাল: 'আপনার নামটাও জানা হল না। আর আমার নাম—'

'না, না, থাক। সব এক রাত্রেই রেখা টেনে সমাপ্ত করে দেবার অর্থ নেই। আরো আছে। পরে হবে।'

'পরে হবে?'

'যা হয় কিছুই হয় না। সব পরে হয়। দ্বিতীয় জীবনে হয়।' সঞ্জয় চলে গেল অন্যদিকে।

দ্বিতীয় জীবনে হয়। হিমানীর মনে হল তার দ্বিতীয় জীবন শেষ হতে আর শুধু দুই দিন বাকি।

বঙ্কিমচন্দ্রের উইল

(১৪ পৃষ্ঠার পর)

দিলাম তাঁহাদের অবর্তমানে তাঁহাদের পুত্রগণ আপন আপন মাতার অংশ তুল্যাংশে পাইবেন। যদি (ঈশ্বর না করুন) ঐ দুই কন্যার কাহারও পুত্র বর্তমান না থাকে তবে সেই কন্যার অবর্তমানে শ্রীমতী শরৎকুমারী দেবীর পুত্রগণ তাঁহার স্বত্বে স্বত্ববান হইবেন। ইতি—১৮৮৭, ২১ ফেব্রুয়ারী।

স্বাঃ শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

Executed in my presence.
Bepin Chandra Chatterjee
of Kantalpara.
Anukul Chadra Chtterjee of
Kantalpara.

আমার সম্মুখে দস্তখত হইল
শ্রীউমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
সাং ভাটপাড়া
শ্রীবিনয়কৃষ্ণ দাস
সাং অম্পষ্ট, জেলা বাঁকুড়া

ঃ ভারতীয় ভাস্কর্যে কামকলা ঃ

প্রাচীন ভারতের দেবদেউলের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য ভালো ক'রে অনুশীলন করলে আমরা দেখতে পাই, নানা প্রকার বিচিত্র শিল্প ও ভাস্কর্য মন্দির-গাত্রের বাইরে ভিতরে এবং অলিন্দের উপরে পাহাড়ে বিরাট স্তূপে ইত্যাদি নানারকম স্থানে খোদিত দেখতে পাই। মন্দিরগুলি রক্ষা করছে স্ফীত উদরযুক্ত ভূতপ্রেত যক্ষরক্ষ, হাতী, ময়ূর ও-নানা-রকম জীবজন্তু ইত্যাদি। এখানে মন্দির-গাত্রে এইসব বিভিন্ন জিনিসের খোদিত চিত্রাবলী আছে। শত শত বৎসর ধরে আমরা এইসব স্থাপত্যকে দেখে এসেছি। স্থাপত্য-শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন-রূপে এই খোদিত চিত্রগুলিকে আমরা কোনদিন প্রকৃত শিল্পীর চোখ দিয়ে দেখি নি।---এইসব মন্দিরগাত্রে যে যক্ষী, যক্ষ, অপ্সরা, নাগ, নাগিনী গন্ধর্ব, বিদ্যাধরী ইত্যাদি আছে তা' আমরা কোনদিনই প্রীতির চক্ষে বোঝবার চেষ্টা করিনি। নরনারীদের এমন চমৎকার ও সুন্দর-স্বচ্ছন্দ গতির ভঙ্গী---যথা, অজন্তার বেণুবাদিনী ব আকাশপথে স্বচ্ছন্দগতিতে অপ্সর-অপ্সরার উড়ে যাওয়া, আমাদের চোখে এত প্রীতিপ্রদ---যে আমরা সকলে এই চিত্র দেখে মুগ্ধ হয়ে যাই।

আমরা দেখতে পাই অপ্সরাদের বা দক্ষদক্ষীর মানুষ ও নারীর বিচিত্র মিথুন ক্রীড়া। কল্পনাতীত বিচিত্র কামকলার অপূর্ব সম্ভার পর পর কোনার্কের ও খাজুরাহোর কয়েকটি মন্দিরে চিত্রিত করা আছে। ইউরোপের কোনো মন্দির-গাত্রে এই শ্রেণীর চিত্র দুর্লভ। ইউরোপীয় গাইফে গীর্জায় বেশীর ভাগ চিত্রই মার্জিত ও রুচিসম্মত—এসব দেখলে মানুষের মন গাম্ভীর্য্য ও পবিত্রতায় ভরে যায়। সেইজন্য

শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার

সমুদ্রের ধারে এমন কি যেখানে মন্দিরের গায়ের উপর সমুদ্রের ঢেউ উচ্ছ্বসিত হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে সেখান-কার সৌন্দর্য্য ও বিশালত্ব এতদিন আমাদের মুগ্ধ করতে পারেনি। মহাবলী-পুরম ও পুরীর কোনার্কের সূর্য্যমন্দিরের কথা ভাবলে পরেই এর সৌন্দর্য ও বিশালত্ব এখন আমাদের মনকে একেবারে মুগ্ধ করে দেয়। কোনার্কের সূর্য্যমন্দির হ'তে সমুদ্র অনেকটা দূরে স'রে গিয়েছে কিন্তু সমুদ্রের লোনা জল বালি, অবিশ্রান্ত ঝোড়ো হাওয়া সমস্ত মন্দিরটাকে যেন পুড়িয়ে দিয়েছে।

ভারতবর্ষের মন্দির-শিল্পের স্থাপত্যের কথা চিন্তা করলে আমাদের এই প্রশ্নই মনে জাগে কেন কয়েকটি মন্দিরের যৌন-লীলার অফুরন্ত চিত্র?—যেমন কোনার্কের সূর্যমন্দির, বুন্দেলখণ্ডের খাজুরাহোর কয়েকটি মন্দির, ভুবনেশ্বরের মন্দির, পুরীর মন্দির ইত্যাদি। এই সঙ্গে আমরা অজন্তায় অঙ্কিত অপ্সরা, গন্ধর্ব ও স্বপ্নবিলাসী নরনারীর চিত্রের কথা উল্লেখ করতে পারি।

উড়িষ্যার পরশুরামেশ্বর মন্দিরের একটি প্রাচীন ভাস্কর্যের নিদর্শন

ভাস্করের ধ্যানে অপ্সরা (উড়িষ্যার মুক্তেশ্বর মন্দিরের একটি অপূর্ব ভাস্কর্য)

ইউরোপীয় চিত্র-শিল্পীরা এদেশে এসে ভারতের মন্দিরগাত্রে এইরূপ মিথুনচিত্র দেখে হতবাক হয়ে যেতেন। অবশ্য ভারতবর্ষে যতগুলি স্থান আছে তার মধ্যে অজন্তার চিত্র-গুহায় নারীদের সবচেয়ে মনোমুগ্ধকর ও নিখুঁত চিত্র চমৎকারভাবে অঙ্কিত করা হয়েছে। এইসব প্রাচীরচিত্র এবং পট-ভূমির মধ্যে প্রোথিত—এমনভাবে গঠিত মূর্তিকে বলা হয়েছে A poem of hindu woman.

এখানে ভালোবাসা অত্যন্ত নম্র, বিষাদাচ্ছন্ন।

কোনার্কের সূর্যমন্দিরের গাত্রে এবং খাজুরাহোর কয়েকটি মন্দিরে যৌন-ক্ষুধা বা ভোগবাসনা চরিতার্থকরণের ছবি এত বেশী বাস্তব ও ক্রিয়াশীল যে, অনেক সময় আমাদের মনকে চঞ্চল করে তোলে বা ঘৃণায় এড়িয়ে যেতে হয়। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত ইংরাজ প্রত্নতত্ত্ববিদ জেমস ফার্গুসন কোনার্কের স্থাপত্য শিল্পকে অকুণ্ঠ প্রশংসা করেন কিন্তু মিথুনের চিত্রগুলিকে তিনিও অশ্লীলতা-দুষ্ট বলে ঘোষণা করেছিলেন। এইসব উৎকীর্ণ করা ভাস্কর্যশিল্পের অঙ্গচ্ছেদ কেবল যে ঝড়বৃষ্টি সৌম্যুমী প্লাবন করেছে তা নয়, আমাদের মনে রাখতে হবে, ৭০০ বৎসর ধরে মুসলমানরা এই দেশ শাসন করেছিল।

এটাও আমাদের মনে হয়, খৃষ্টান পাদ্রীরা এদেশে ধর্মপ্রচার করতে এসে এসব ভাস্কর্য প্রীতির চক্ষে দেখেনি বলে আমাদেরও মনে বিতৃষ্ণার ভাব এসে গিয়েছিল। আমরা সবাই জানি কেবলমাত্র বিধর্মীদের অন্য ধর্মে দীক্ষিত করার প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছাড়াও পাদ্রী-দের মনে ছিল—খৃষ্টীয় নৈতিকতা ও অহেতুক শুদ্ধতা।

এইবার মন্দির-গাত্রের বাস্তবচিত্র কোনও প্রতীকমূলক অর্থ প্রকাশ করে কি না, সেইটাই এখন আমরা ভালভাবে বিবেচনা করবো। এই চিত্রগুলি কি সত্য সত্য মানুষের সহিত দেবতার আধ্যাত্মিক মিলন বা স্বর্গীয় সৃষ্টি? বা মানুষের মুক্তির ভাব প্রকাশ করছে?

এইবার আমরা মন্দির-গাত্রে খোদাই করা ও অঙ্কিত চিত্রগুলি

● প্রাচীন ভারতের ভাস্করের অনবদ্য কীর্তি : "লক্ষ্মী-নারায়ণ" (খাজুরাহো)

ভালো ক'রে বোঝবার জন্য বা বিচার করার জন্য তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করছি। এইসব শিল্পী মন্দির-গাত্রে মিথুনের চিত্র অঙ্কিত করার সময় মানুষ, দেবতা ও উপদেবতার মধ্যে পার্থক্য রেখেছেন অর্থাৎ মিথুনক্রিয়া তিন শ্রেণীর করা হয়েছে। প্রথম শ্রেণীতে আছে দেবতা ও দেবীর কামকলার চিত্র—বিষ্ণু ও লক্ষ্মী এবং শিব ও পার্বতী।

এখানে আমরা দেখি বিষ্ণু লক্ষ্মীকে প্রেম নিবেদন করছেন। কিন্তু এটা এত শুদ্ধ, রুচিসম্মত ও নম্র যে আমাদের মনকে স্নিগ্ধ ও মুগ্ধ করে দেয়। এই চিত্রে বিষ্ণু যে সূক্ষ্ম সংযমের ভাব দেখিয়েছেন তাতে দেব-দেবীর মনে যে কোনরূপ যৌনভাব ফুটে উঠেছে তা মনেই হয় না। বিষ্ণু দেবীর বক্ষে যে করতল ও অঙ্গুলি রেখেছেন তা এতই সংযত ভাবের বিকাশ যা আমাদের মনকে মুগ্ধ করে। এই ভাস্কর্যে দেব-দেবীর আন্তরিক মনের ভাব প্রকাশ পায়—মুখের সৌকুমার্য, পবিত্র ধ্যান এবং পবিত্র মিলন, এই চিত্রে কোনো যৌনমিলনের ভাব নেই। শিব ও পার্বতীরও এইরূপ সুকুমার ও শুদ্ধ ভাস্কর্যে ভারতের অনেক মন্দির-গাত্রে দেখা যায়। বিশেষত খাজুরাহোয় অনেক আছে। যথার্থ বলতে গেলে এখানে দেবী লক্ষ্মী বিষ্ণুর বা পার্বতী শিবের নববধূ নয়, এই দুই দেবী দুই দেবতার প্রবাহ। অর্থাৎ তাঁরা দুই দেবতার 'নারী শক্তি' প্রকাশ করেছেন। অতএব দেবতা বা দেবীর মধ্যে কোনরূপ দ্বিত্বভাব প্রকাশ পায় নি। এঁরা এখানে দু'জনে মিলিত হয়ে এক ভাবই প্রকাশ করছেন—হিন্দু ধর্মের অদ্বৈতবাদ এই দেব-দেবীর মিলনে প্রকাশ পেয়েছে।

এইবারে আমরা দ্বিতীয় স্তরে আসি। দেবতাকে ছেড়ে অর্ধদেবতা অর্থাৎ অপ্সরা, গন্ধর্ব ইত্যাদির কথা বলি। প্রস্তরগাত্রে এদের খোদিত ও অঙ্কিত চিত্র কোনার্কে খাজুরাহো ছাড়া অনেক মন্দিরে দেখতে পাই। বিশেষত অপ্সরা ও গন্ধর্বের বিচিত্র লীলাখেলা আমরা অজন্তার গিরিগুহায় বেশী দেখতে পাই। বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ হেনরিচ জিমারের কথায় বিশ্বাস করলে আমাদের

কোণার্কের এক সুপ্রাচীন ভাস্কর্য : দানব ও সিংহ কর্তৃক আক্রান্ত

স্বীকার করতে হবে, এইসব গন্ধর্বরা ও অপ্সরা ইন্দ্রের অমরাবতীর অধিবাসী ও অধিবাসিনী।

এরা স্বর্গের চির যৌবনসম্পন্ন ও সম্পন্না গায়ক-গায়িকা ও নর্তক-নর্তকী এবং চিরস্থায়ী সৌন্দর্যের আধার। এই অপ্সরা প্রকৃতির সরলতার এবং দ্বন্দ্বহীন আনন্দের অন্তহীন প্রতীক। কোনরূপ দুঃখ-কষ্টের বাইরের মিথুনের ভাবকে এরা প্রকাশ করে।

অন্যজগতের অপ্সরারা ইন্দ্রিয়-গত ভালোবাসার প্রতীক হলেও পার্থিব সৌন্দর্যের তীব্রতা এদের বিদ্যমান আছে। এই সৌন্দর্য তারা ভঙ্গী ক'রে নত হয়ে বেঁকিয়ে পূর্বভাবে বাড়াবাড়ি ক'রে দেখায় যেগুলো অনেক সময় চলচ্চিত্রের ভঙ্গীর মত মনে হয়। এবারে আমরা তৃতীয় স্তর সম্বন্ধে আলোচনা করি। আমরা পূর্বেই বলেছি দেবতা এবং উপদেবতা হ'তে সাধারণ মানুষের ভালবাসার চিত্রের মধ্যে একটা স্পষ্ট বাস্তবতার ছাপ আছে। এইসবের মধ্যে এমন কয়েকটি চিত্র আছে যা মিথুন হিসাবে এত জটিল, বিজড়িত ও কুন্তলিত যে আমাদের বেশীক্ষণ সেই চিত্রের ওপর দৃষ্টিপাত করা সম্ভব নয়। খাজুরাহোর বিভিন্ন মন্দিরে পরস্পর আলিঙ্গন চুম্বন ও আদরের ছবি এত আছে যে, আমাদের অনেক সময় এদের অশ্লীলতা-দুষ্ট বলতে হয়। অনেক শিল্প সমালোচকরাও বলেছেন, এই পাথরের খোদিত গাত্রে যেসব মিথুনের চিত্র আছে তাতে এত বিভিন্ন দেহভঙ্গীর অঙ্গবিন্যাস দেখা যায় যে, এগুলিকে যোগের পূর্বাভ্যাস বলা যেতে পারে। অর্থাৎ এই ধরণের প্রেমমূলক অঙ্গবিন্যাসে যোগের আনন্দের উচ্চস্থানে পৌঁছানো যায়।

সেইজন্য একজন ইউরোপীয় চিত্র সমালোচক বলেছেন পূর্বে যোগী না হ'লে পরে এইরূপ চিত্রের যৌন আনন্দ পাওয়া যায় না। এর সত্যতা ছান্দোগ্য উপনিষদ পড়লে বোঝা যায়।

অতএব আমরা বলতে পারি,-এই-রূপ খোদিত-গাত্র দুই রূপে আমাদের সম্মুখে প্রকটিত হচ্ছে। এই চিত্রগুলি অপবিত্র ও পবিত্র এই দুই ভাবই আমাদের সম্মুখে তুলে ধরছে।

আমাদের এটাও বিশ্বাস করে নিতে হবে যে, কামকলার স্বরূপ এবং প্রচার বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন প্রভাবের উপর পরিবর্তিত হয়েছে। সেইজন্য তান্ত্রিক প্রভাবান্বিত স্থানে উৎকট কামকলার দৃশ্য দেখা যায়। কোনার্কে বৌদ্ধযুগের পর যে যৌন-শুদ্ধতা ও রুক্ষতা দেশে এসেছিল এবং যে জন্য সমস্ত দেশের মিথুনতা একেবারে বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল সেটাকে পুনরায় জাগরিত করার জন্যেই কি কোনার্কের গাত্রে এইসব কামকলার চিত্রাবলীর সৃষ্টি কিংবা উড়িষ্যাবাসী কোনো রাজার যৌন আকাঙ্ক্ষা উদ্রেকের জন্য এই কোনার্ক মন্দিরের সৃষ্টি ?

আমরা তো জানি যে আমাদের হিন্দুধর্মে স্বর্গে মহাপ্রস্থান ছাড়া মানবাত্মা পাপ-পুণ্যের ভার অনুসারে নরকেও যায়। সাধারণ লোকের মনে অস্পষ্ট ধারণা আছে—এটা একটি যৌন আনন্দের স্থান এবং ইন্দ্রিয়গত সুখ ভোগের স্থান।

ইউরোপের চিত্রকলায় এবং প্রস্তরগাত্রে শালীনতার ভাণ আছে। ভারতবর্ষের চিত্রশিল্পে এইরূপ কোন ভাণ নেই।

সাহিত্য চিন্তা

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

টেলিফোনের মধ্যেই ভেসে এল পরম সমাদরপূর্ণ সস্নেহ স্বাগত সম্ভাষণ।

আমি টেলিফোনে বলেছিলুম—একদিন আপনার ওখানে যাব দাদা, কিছু আলোচনা আছে ঘণ্টাখানেক সময় আপনার আমি নেব।

—উত্তর এল—নিশ্চয়, নিশ্চয়। তুমি অবশ্যই আসবে ভাই, একশোবার আসবে।

টেলিফোনের অপর প্রান্তে যিনি, অর্থাৎ অগ্রজসুলভ পরম স্নেহের আহ্বান এল যাঁর কাছ থেকে—তিনি শুধু বাংলা বললে ভুল হয় সারা ভারতের একজন শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী, মহৎ স্রষ্টা, এশিয়ার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকারদের আলোকোজ্জ্বল দরবারেও একটি বিশিষ্ট আসন যাঁর জন্যে সসম্মানে নির্ধারিত। বাংলা দেশ, তার সমাজ, তার মানুষ, তার নরনারীর অন্তর্বর্তী সম্পর্ক, তার বৈচিত্র্য, তার বৈশিষ্ট্য, তার ব্যবহারিক জীবন, তার একটি একটি বিশেষ যুগের, বিশেষ ভাবধারার, বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়ের অন্তরঙ্গ আলেখ্য, সর্বোপরি তাঁর বীরভূমের লালমাটি যা তাঁর অনবদ্য লেখনীর মাধ্যমে এক অপরূপ মহিমায় উদ্ভাসিত হয়ে, অফুরন্ত দীপ্তিতে উজ্জ্বল হয়ে, প্রাণের স্পর্শে ভরপুর হয়ে সাহিত্যের পৃষ্ঠায় ক্ষণকালের নয়, নিত্যকালের দাবীতে স্থানলাভ করল। নিচের তলার মানুষরা বিশেষ করে যাঁর কল্যাণে সাহিত্যের মাধ্যমে সর্বসাধারণের কাছে পরিচিত হল (তাঁর শুভ নাম) তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

শুধু শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী বললে সব বলা হয় না। বাংলাদেশ সাহিত্যের জন্মভূমি, অগণিত সাহিত্যাচার্যদের লীলাভূমি, তার মাটিতে মাটিতে কত মহান স্রষ্টার গৌরবময় পদচিহ্ন পড়েছে, তাঁদের পবিত্র পদরজে বাংলার মাটি ধন্য, কিন্তু এক-একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের—বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের এবং সাপুড়ে বেদে তথা সমগ্র তথাকথিত নিচের তলার অধিবাসীদের জীবনের সুখ, দুঃখ, হাসি, কান্না, আনন্দ, বেদনা, আবেগ, অনুভূতি তিনি যেভাবে চিত্রিত করেছেন, তাদের মনের ভাষার যেভাবে পাঠোদ্ধার করেছেন, তাদের জীবনের সুরের যেভাবে স্বরলিপি রচনা করেছেন, সর্বোপরি সাহিত্যে যেভাবে তাদের প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন সেইখানেই তাঁর কৃতিত্ব বোধ করি সর্বাধিক। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের পর জনপ্রিয়তার বিচারে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ই প্রথম নাম। তারাশঙ্কর বহু গ্রন্থের রচয়িতা—অভিজ্ঞ পাঠকের তা অজানা নয়। কিন্তু, আমাদের মনে হয় যে তারাশঙ্কর তাঁর সমগ্র জীবনে—ধাত্রীদেবতা, গণদেবতা, কালিন্দী, সন্দীপন পাঠশালা, পঞ্চগ্রাম, হাঁসুলিবাঁকের উপকথা, নাগিনীকন্যার কাহিনী, রাইকমল—এই কয়খানি মাত্র গ্রন্থই যদি শুধু রচনা করতেন তা হলেও আন্তর্জাতিক সাহিত্যসমাজে আজ যে খ্যাতি, যশ, তিনি পেয়েছেন — সেই খ্যাতি, সেই যশই তিনি পূর্ণমাত্রায় পেতেন। তা থেকে একবিন্দু কম সম্মান তিনি পেতেন না।

টেলিফোনেই সময় ও তারিখ নির্দিষ্ট হয়ে গেল। নির্দিষ্ট দিন ও সময়ে টালা পার্কের তাঁর ভবনে পৌঁছলুম। ঘর বিদেশী প্রথায় সাজানো নয়, দেশীয় প্রথায় ঘরটি সাজানো, ভূমিশয্যায় লেখকের আসন, অতিথিদেরও। চারদিকে তাকিয়ে দেখি স্ব-অঙ্কিত চিত্রে ঘরটি সাজানো। হঠাৎ চোখ পড়ল একটি শ্মশ্রুযুক্ত যুবকের, ছবি তলায় লেখা—কৃষ্ণেন্দু। দেখলুম শুধু লেখনীতেই নয়, তুলির টানেও কৃষ্ণেন্দুকে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন।

ঘরে ঢুকতেই সেই সস্নেহ সম্ভাষণ। ক্ষণকালব্যাপী এ-কথা, সে-কথার পর উদ্দেশ্য ব্যক্ত করি। প্রথমে প্রশ্ন করি—সাহিত্যের প্রতি আপনার এই আকর্ষণের উৎস কি—কোথা থেকে প্রেরণা পেলেন, কোন দখিনা হাওয়া কোথা থেকে আপনার মনের রুদ্ধ অর্গলগুলো খুলে দিল। একটি চুরুটে অগ্নিসংযোগ করে উত্তর দিলেন এ যুগের অপরাজেয় কথাশিল্পী —বললেন, এটা সহজাত বলতে পার, এটা আপনা থেকেই এল। আরও বলতে থাকেন লেখক,—সে সময়ে বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসে কল্লোলগোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটেছে, তাঁরা সবই দিয়েছিলেন, পাঠক অনেক নতুন জিনিস তাঁদের কাছ থেকে পেল, অনেক নতুন দিগন্ত তাঁরা উন্মোচন করলেন নানাদিক দিয়ে মানুষের নতুন কিছু পাওয়ার তৃষ্ণাও তাঁরা ভরালেন, সমাজের ভুলভ্রান্তি, নরনারী, ধনী-দরিদ্রের সম্পর্ক সবই তাঁরা দেখালেন কিন্তু রাজনীতি তাঁদের সাহিত্যের সীমানা থেকে দূরে রইল। সে সময়ে একমাত্র সরোজকুমার রায়চৌধুরীর লেখার মধ্যেই কিছু রাজনৈতিক চেতনা দেখা দিয়েছিল, তবে আগেকার দিনে অবশ্যই রাজনীতি সাহিত্য থেকে নির্বাসিত ছিল না। যেমন ধর—বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ, রবীন্দ্রনাথের গোরা, শরৎচন্দ্রের পথের দাবী। তারপর অনেক কাল এক ছেদ পড়ে যায়। সমকালীন সাহিত্যের এই শূন্যতার দিকটিই তাঁকে সাহিত্যে আরও বেশি আকর্ষণ করে। তাঁর জীবনেতিবৃত্তের সঙ্গে যাঁদের অপরিচয় নেই এ কথা তাঁদের বিশেষভাবেই জানা আছে যে, তারাশঙ্কর শুধু সাহিত্যের মাধ্যমেই রাজনীতির সেবা করেন নি, প্রত্যক্ষভাবেও তিনি রাজনীতির সঙ্গে জড়িত। ১৯১৭ সাল থেকে রাজনৈতিক জীবনের তাঁর সূচনা। বয়স তখন আর কত—উনিশ কি বড় জোর উনিশ পেরিয়ে কুড়িতে পা দিয়েছেন। দেশের রাজনৈতিক সংগ্রামের সঙ্গে জড়িত থাকার জন্যে একবার তাঁকে কারাবাসও করতে হয়েছে।

তথাকথিত নিচের সমাজেরই রূপকার বলে তারাশঙ্করকে ভাবলে তাঁর বহুমুখী প্রতিভা, বহুদূরগামী দৃষ্টি, সূক্ষ্ম দৃষ্টিকোণ সম্বন্ধে ভুল বোঝা হবে। মধ্যবিত্ত সমাজ এবং বাংলার অভিজাত বনেদী জমিদার পরিবারও যথেষ্ট উজ্জ্বল এবং গভীরভাবে চিত্রিত হয়েছে তাঁর লেখনীতে। সেখানেও তাঁর সৃজনীশক্তি, সৃষ্টি-কুশলতা ও রূপসৃষ্টির অনন্যতা অপূর্বভাবে ধরা পড়েছে। তাঁর নিজের লেখা সম্বন্ধে তাঁর বর্তমান পরিকল্পনা বা চিন্তাধারা সম্বন্ধে তাঁকে প্রশ্ন করা হলে তিনি জানালেন যে, বর্তমানে দুটি পরিকল্পনা রূপ নিয়ে চলেছে—দুটি উপন্যাসের আকারে। প্রথমটি হিন্দু-মুসলমান সমস্যাকে পটভূমি করে, দ্বিতীয়টি বাংলাদেশের

● কথাশিল্পী তারাশঙ্কর

সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পটভূমিতে একটি জমিদার পরিবারকে কেন্দ্র করে।

আজকের দিনের বাংলাসাহিত্য-সমাজের অধিনায়কস্বরূপ সর্বজনশ্রদ্ধেয় কথাশিল্পীকে সমকালীন সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর অভিমত জিজ্ঞাসা করি। জিজ্ঞাসা করি—এ যুগের সাহিত্যের মান কি আপনার মতে নিম্নমুখী—উত্তরে জানা গেল—এ যুগের সাহিত্য সম্বন্ধে সব খবর তিনি রাখতে পারেন না সেই জন্যেই কোন নির্দিষ্ট মত দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভবপর নয়—তবে যুগের অগ্রগতি অনুসারে যা আসছে তাকে মেনে নেওয়া উচিত—অন্য সাহিত্যের মান সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তরে তিনি স্পষ্ট বললেন—এ প্রশ্নের উত্তর আমি দেব না।

পূর্বাচার্যরা সকল সময়েই আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র, সাহিত্যচর্চার প্রতি মুহূর্তেই তাঁদের প্রত্যেককেই আমরা—'নিত্য তোমারে চিত্ত ভরিয়া স্মরণ করি।' আমাদের হৃদয়ের মন্দিরে চিরকালের পটভূমিতে নিত্য তাঁদের বন্দনা, আরতি। জিজ্ঞাসা করি লব্ধকীর্তি সাহিত্য-স্রষ্টাকে—পূর্বাচার্যদের প্রভাব কি সকল সময়েই আমাদের জীবনে সুফলদায়ী হয় বলে আপনার ধারণা?

বাইরে কিসের একটা শব্দ হয়—ক্ষণকালের জন্য লেখকের দৃষ্টি সেইদিকে আকৃষ্ট হয়—তারপর—আবার আলোচনার মধ্যে মন ও চিন্তাকে ফিরিয়ে আনেন, বলেন—বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, বিভূতিভূষণ—এঁদের মত পূর্বাচার্যদের প্রভাব সর্বদাই সুফলদায়ী। তাঁরা সারাজীবন মানুষের কল্যাণই কামনা করেছেন। মানুষের সর্বাংগীণ শুভ ছাড়া আর কিছু চান নি, তাই তাঁদের প্রভাব নিঃসন্দেহে মঙ্গলদায়ক।

সাহিত্য মানুষের প্রাণ। চাল, ডাল নিবারণ করে জঠরের জ্বালা, কিন্তু উদরের ক্ষুধা আর হৃদয়ের ক্ষুধা এক নয়। শুধু দুবেলা দু'মুঠো অন্ন কারো কারো জীবনের পরম পাওয়া হলেও সকলের জীবনের তা একটা 'সব পাওয়া' নয়—প্রথম দলের সংখ্যাও যেমনই অল্প নয় তেমনই দ্বিতীয় দলের সংখ্যাও অনন্ত। তারা আরও চায়। দু'মুঠো অন্ন, পরিধানের একখানি বস্ত্র, বাসের জন্য একটি গৃহ আর কিছু আর্থিক সঙ্গতিই তাদের জীবন-পিপাসা মেটাতে পারে না। সেই পিপাসা নিবারণের প্রতিশ্রুতি বহন করে সাহিত্য। সাহিত্যের মধ্যেই সেই তৃষ্ণানিবারণের পথ সে খুঁজে, জীবনের কত প্রশ্নের উত্তর দেয় সাহিত্য, কত জটিলতর গ্রন্থিমোচন করে সাহিত্য। কত মাধুর্যের, কত রসের, কত আনন্দের দুয়ার উন্মোচন করে সাহিত্য, জীবনে তাই সাহিত্যের আবেদন, জীবনের বোধনলগ্ন থেকে বিসর্জনের মুহূর্ত পর্যন্ত ওতপ্রোতভাবে যে সাহিত্য থাকে নিবিড়ভাবে বেষ্টিত হয়ে—সেই সাহিত্যের শেষ কথা কি—সে সম্বন্ধে প্রশ্ন করি তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে। উত্তরে তিনি বলেন—মানুষের জীবনের যেমন শেষ কথা নেই, সাহিত্যেরও তেমনই শেষ কথা নেই অথবা বলা যায় এক এক ব্যক্তির জীবনের মত এক একটি লেখার মধ্যেও শেষ কথার ইঙ্গিত আছে।

প্রশ্ন করি—আজকাল আর ছোট গল্প আপনি আর লিখছেন না কেন—কারণ ব্যক্ত করে বললেন—সময় পাচ্ছি না, বড় লেখার চাপ।

'সাহিত্যধর্ম' বলে একটি কথার সঙ্গে আমাদের নিবিড় পরিচয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কথাটির অর্থ কি এ সম্বন্ধে নানা জনের নানা মত। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে জিজ্ঞাসা করি যে কথাটির আসল অভিহিতি আপনার মতে কি?—বাইরে উন্মুক্ত আকাশ, স্বচ্ছ, স্পষ্ট দৃষ্টি লেখক একবার মেলে দিলেন সেদিকে। জানলার গরাদ ভেদ করে, চতুষ্পার্শ্বের সীমা অতিক্রম করে সেই দৃষ্টি তখন পাড়ি জমিয়েছে অসীম মহাশূন্যে, নিঃসীম নীলে। ধীরে ধীরে লেখক বলতে থাকেন—জীবনে সত্য, শিব ও সুন্দরের প্রতিষ্ঠা ঘটানোই সাহিত্যের ধর্ম। তবে বীভৎসরসকে সত্য, শিব ও সুন্দরের সঙ্গে সুন্দর বলে কেউ উদ্ধতশক্তির সঙ্গে বসাতে চান, আমি সেখানে লড়াই করব না, সেটা মদ্যপের মত্ততার মতই নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী।

জিজ্ঞাসা করি,—আপনার নিজের সৃষ্ট চরিত্রগুলি কি সৃষ্টির পরেও আপনার মন জুড়ে থাকে—বললেন—কিছু কিছু থাকে বৈকি, আছেও।

ব্রাহ্মমুহূর্তে, ভোর চারটেয় শয্যাত্যাগ করেন ব্রাহ্মণ কথাশিল্পী। উপাসনা, ডায়েরি লেখা এবং ডায়েরি ইষ্টনাম লেখা সমাপ্ত করে লেখক বসেন তাঁর সাধনায়। তাঁর সৃষ্টির সাধনায়। তখন তাঁকে যাত্রীও বলা চলে। সৃষ্টির সপ্তস্বর্গের তখন দুঃসাহসী যাত্রী। মানবজীবনের ভরন্ত সমুদ্রে অনন্ত আগ্রহ নিয়ে দুরন্ত নাবিকের মত তখন তিনি ডুব দিয়েছেন, সেই সমুদ্র থেকে কর্দম বা পাঁক বা লবণ নয়, তুলছেন মুঠো মুঠো সোনা, অফুরাণ অমৃত—আর তা ছড়িয়ে দিয়েছেন অকৃপণ হাতে মানুষেরই দরবারে। তা ছড়িয়ে দিচ্ছেন দিক থেকে দিগন্তরে, শহরে, প্রান্তরে, গ্রামান্তরে। সেই দুষ্কর সৃজনীতপস্যার সাধক সমাপ্তি ঘটান দ্বিপ্রহরে—বারোটার সময়ে।

সময় এগিয়ে চলে। এসেছিলাম যখন সকাল, এখন শোনা যাচ্ছে মধ্যাহ্নের পদধ্বনি। বিদায় নিই অগ্রজ-সাহিত্যকারের কাছ থেকে। সেদিনকার সেই আলোচনা বা সাক্ষাৎকার লিপিবদ্ধ করার সময় আজ একটি প্রশ্নই শুধু মনের মধ্যে উঁকি-ঝুঁকি মারছে। আমার সকল প্রশ্নের সদুত্তরই তো তাঁর কাছে পেলুম। কিন্তু সাহিত্যের মানসম্পর্কিত যে প্রশ্ন তাঁকে করেছিলুম সেই প্রশ্নের উত্তর তিনি দিলেন না কেন—কেন—কেন—কেন—সাহিত্যনায়ক এ প্রশ্নের উত্তর দিতে অনিচ্ছুক কেন? হয়তো সাহিত্যের পবিত্র অংগনে অশ্লীলতার ব্যাপক প্রাদুর্ভাব এবং বৃহৎ পত্রিকাগোষ্ঠী ও প্রকাশক-সম্প্রদায় কর্তৃক তার পৃষ্ঠপোষণা এবং ঐতিহাসিক রচনার নাম করে সাহিত্যক্ষেত্রে চরম ব্যভিচার ও ইতিহাসের বিকৃতিসাধন রূপ, রস, রেখা, রঙের একনিষ্ঠ পূজারী সুন্দরের পরম উপাসক দেশ-দিত সাহিত্যিকের মন বেদনায় ভারাক্রান্ত করে তুলেছে বলে। হতেও পারে।

সাহিত্যের সমৃদ্ধি

মনোজ বসু

সে এক উজ্জ্বল সকাল। আকাশে মেঘের চিহ্ন নেই। বর্ষার ঘনঘোর ভ্রূকুটি নেই, আকাশে নেই ঘনকৃষ্ণ মেঘের মিছিল, প্রসন্ন সূর্যের আশীর্বধারায় আকাশ নীলে নীলে ঘননীল, পরিপার্শ্ব উজ্জ্বল রৌদ্রে দাহ নেই, আছে দীপ্তি, সেই দীপ্তি মাটিকে করে তুলছে উর্বর, চারপাশে এক সজীব প্রাণের স্পর্শ মনে এনে দিচ্ছে রসের প্রলেপ, যে রসের স্পর্শে মানুষের মন এক নতুন অনুভূতিতে হয়ে উঠছে প্রাণবন্ত।

সামনে খোলা আকাশ, কোথায় এর সুরু কেউ জানে না, কোথায় এর সমাপ্তি তাও অজানা, শুধু জানা এই যে, এ আকাশ অসীম অনন্ত। রহস্যময় বলেই তা সুন্দর। শুধু আকাশই নয়, খোলা মাঠও চোখের সামনে যা মনকে নিয়ে যাচ্ছে অনুভূতির গহন সীমায়। এই পরিপার্শ্বে আর চোখের সামনেই বসে আছেন একজন লব্ধ-প্রতিষ্ঠ কথাশিল্পী। যাঁর লেখনীর আঁচড়ে এই আকাশ, মাটি, প্রকৃতি কত সুন্দর হয়ে পাঠকমনে অনুভূতির জাল বিস্তার করেছে তা ভাবলেও বিস্মিত হতে হয়।

বর্তমান যুগে বাঙলাদেশের সাহিত্যের দিগন্তে অত্যুজ্জ্বল তারকার মত অসীম দীপ্ততে যাঁরা শোভা পাচ্ছেন সেই তারার মেলায় মনোজ বসু একটি অম্লান নাম।

পূর্বাহ্নে কোন অ্যাপয়েন্টমেন্ট করি নি। সোজা গিয়ে হাজির হয়েছি তাঁর লেক রোডের বাড়িতে। মোটামুটি একটা আশ্বাস ছিল সকালে তাঁকে পাবই। এ নিশ্চয়ই লেখার সময় তাঁর। না, বিধি বাম হলেন না। কানে ভেসে আসে তাঁর কণ্ঠস্বর, সোপানশ্রেণী বেয়ে তাঁর অবতরণের শব্দ।

কথা শুরু হল। এ কথা, সে কথা, মামুলি কুশল প্রশ্ন,—আস্তে আস্তে উদ্দেশ্য ব্যক্ত করলুম, জানি, সে সময় তাঁর লেখার সময়। বেশীক্ষণ তাঁকে আটকে রাখা উচিত নয়। আসল কাজ শুরু হয়ে গেল।

আজকের দিনের সাহিত্য ও সাহিত্যিক ছিল আমাদের আলোচনার উপজীব্য। আজ প্রায় চল্লিশ বছর পূর্বে বাঙলা সাহিত্যের আকাশে তিনি উদিত হয়েছেন, তারপর দীর্ঘ সাধনায় এবং সময়ের ব্যবধানে সে আকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্রকুলে আজ এক মুখ্য আসন তিনি অধিকারভুক্ত করতে পেরেছেন। তাঁর চোখের সামনে সাহিত্য জগতে কত কি ঘটে গেল, তাঁর অভিজ্ঞতাপ্রসূত সাহিত্য সম্বন্ধীয় মতামত তাই যথেষ্ট গুরুত্বের দাবীদার।

মনোজ বসুর সাহিত্যাসক্তির পিছনে পট-ভূমি আছে। তাঁর বাবারও লেখার হাত ছিল চমৎকার। সে যুগের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁর রচনা প্রকাশিত। তিনি কবিতাও লিখতেন, প্রবন্ধও লিখতেন। যশোহর জেলার অন্তর্গত ডোঙাঘাটায় তাঁর জন্ম, ছেলেবেলা ডোঙাঘাটাতেই কেটেছে। তার নিসর্গশোভা, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, শান্ত, স্নিগ্ধ পল্লী পরিবেশ তাঁর ভাবনেত্র খুলে দেয়। অভিজ্ঞ পাঠক এইবার বুঝতে পারবেন যে, মনোজ বসুর সাহিত্যে গ্রামবাঙলা এতখানি প্রাধান্য পেল কি করে, শুধু প্রাধান্য পাওয়াই নয়, উজ্জ্বল দীপ্ততে এবং এক অনবদ্য মহিমায় রূপ পেল তাঁর লেখনীতে। গ্রাম-বাঙলার একটি অন্তরঙ্গ আলেখ্য উন্মোচনে তাঁর খ্যাতি অনস্বীকার্য।

সাহিত্যের অনুপ্রেরণা তিনি কোথায় পেলেন সর্বপ্রথম এই প্রশ্নই তাঁকে করা হল। পিতৃপ্রসঙ্গ ছাড়াও এর উত্তরস্বরূপ আরও একটি বক্তব্য তিনি পেশ করলেন। তাঁর চিন্তায় সেদিন এই সত্যটি পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল যে, লেখককে একদিন না একদিন চলে যেতেই হবে, নরজন্ম তো ক্ষণস্থায়ী। ক্ষণস্থায়ী এই নরজন্মকে মহৎ মর্যাদা দান করে সৃষ্টি—সাহিত্য সৃষ্টি। সাহিত্যের মধ্যেই অমরত্বের চাবিকাঠি। স্থায়ী সৃষ্টির মধ্যেই স্রষ্টার স্থায়িত্ব। এই চিন্তাই সেদিন মনোজ বসুর মনে বিশেষভাবে ঘা দিতে থাকে।

প্রবীণ কথাশিল্পীর সামনে নবীনকালের কথাশিল্পের অবতারণা করা হল। মনোজ বসু একালের সাহিত্য ও সাহিত্যিক সম্বন্ধে যথেষ্ট আশা পোষণ করেন। তিনি বলেন, প্রকৃত ভাল কাজ কিছু তো নিশ্চয়ই হচ্ছে, ছোট গল্পের অভূতপূর্ব উন্নতি হচ্ছে। তবে উপন্যাস সম্বন্ধে মনোজ বসুর মন ক্ষোভ-শূন্য নয়। একালের সাহিত্যে আঙ্গিকের যেমন যথেষ্ট উন্নতি হচ্ছে, তেমনই ভঙ্গী-প্রবণতাও যথেষ্ট পরিমাণে পরিলক্ষিত হচ্ছে। তিনি বললেন, ঝোঁকটা যেন সেইদিকেই বেশী, এ যেন আত্মা ছেড়ে দেহের কথা ভাবা।

প্রবীণ ও নবীন কথাকারদের সৃষ্টির মধ্যে তুলনামূলক ভালমন্দ গুণাগুণ নিয়ে যে তর্ক ওঠে, যে আলোচনা রূপ নেয়, সে সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য জিজ্ঞাসা করা হল। তিনি দীর্ঘ আলোচনার পথ না বেছে সংক্ষিপ্ত অথচ প্রাঞ্জলভাবে সে সম্বন্ধে আপন বক্তব্য পেশ করলেন। তাঁর মতে প্রবীণ লেখকদের জীবনতরণী সহজভাবে এগোতে পারে নি, শান্ত স্নিগ্ধ নদীর উপর তাঁদের সেই তরণী ভাসে না। সেই তরণী ভাসাতে হয়েছে এক অস্থির তরঙ্গসঙ্কুল নদীর ভিতর দিয়ে।

● কথাশিল্পী মনোজ বসু

মুখোমুখি হতে হয়েছে অনেক উন্মত্ত কল্লোলের। অনেক উদ্দামতা, অনিশ্চয়তা, অস্থিরতা তাঁদের পথরোধ করেছে। অনেক আঁকাবাঁকা পথ তাঁদের সতর্কতা সহকারে অতিক্রম করতে হয়েছে। জীবনযুদ্ধে তাঁদের আপ্রাণ সংগ্রাম নিরবচ্ছিন্নভাবে করে যেতে হয়েছে। তারপর তাঁদের জীবনে এসেছে স্থিতি, লক্ষ্যে পৌঁছেছেন, সংগ্রামের হয়েছে সার্থক অবসান। তাই আজ তাঁরা কিছু ভাল দিতে পারছেন। অনিশ্চয়তা, উদ্বিগ্নতা, প্রতিকূলতা আজ তাঁদের দ্বারা অতিক্রান্ত। কিন্তু যাঁরা তরুণ তাঁদের এখন সংগ্রামের পালা, অনেক সংঘর্ষের ভিতর দিয়ে তাঁদের এগোতে হচ্ছে।

লেখকরা জাতিকে অনেক কিছু দেন। জাতীয় জীবনে উৎকর্ষসাধনে তাঁদের অবদানের অন্ত নেই। তেমনি জাতিরও লেখককে দেবার আছে। নবীন লেখকরা যথাযোগ্য সহানুভূতি ও পৃষ্ঠপোষণা পাচ্ছেন কি-না জিজ্ঞাসা করলে নেতিবাচক উত্তর আসে মনোজ বসুর কাছ থেকে।

সাহিত্যের ধর্মকে নিয়ে এবার আমাদের আলোচনার মোড় ঘুরল। মধ্যে মধ্যে দু'-একটি ব্যক্তিগত প্রসঙ্গও এসেছে। কথার ফাঁকে দেখলুম চায়ের পেয়ালাও এল। আমি কথা বলতে যাচ্ছি, বাধা দিলেন কথা-শিল্পী, থামিয়ে দিয়ে বললেন—ওটা আগে শেষ কর, ওটাকে ঠাণ্ডা করে খেয়ে কোন লাভ নেই। চায়ের পেয়ালার দিকে অঙ্গুলি-সঙ্কেত করলেন লেখক।

আমি প্রশ্ন করি যে, সাহিত্য এগিয়ে যাচ্ছে এবং মানুষকেও এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, নতুন নতুন পথ দেখাচ্ছে। কিন্তু এই যে সাহিত্যের বিবর্তন, এই বিবর্তন কোন্ নিয়ম অনুসারে চলবে? জবাব আসে, যুগের সঙ্গে তাল রেখে। সাহিত্য এগোবে, সাহিত্য থামবে না, তবে প্রতিটি যুগের সঙ্গে সে তাল দিয়ে চলতে থাকবে, সেই যুগের দৃষ্টিভঙ্গী, বক্তব্য, ধর্ম তার ভিতর দিয়ে প্রকাশ পাবে, প্রতিষ্ঠা পাবে। এইভাবেই তার রূপগঠন চলবে। লেখক তাঁর বক্তব্যকে আরও অলঙ্কৃত করেন—বলেন, একটা সময় ছিল, যে সময় সাহিত্যকে নির্ভর করতে হত বিত্তবান সম্প্রদায়ের প্রতি, তাঁদের মর্জি, অভিরুচি অনুযায়ী তার রূপদান হ'ত, আজ এ যুগে সাহিত্যের পাতায় পাতায় ছাপ পড়েছে গণ-মানসে, তাই তার অস্তিত্বও আজ নির্ভর করছে তাদের রুচির উপর।

যুগ এগোয়, সাহিত্যও এগোয়, সাহিত্য মনের দর্পণ, প্রতি যুগে মানুষ সম্মুখীন হয় নব নব চিন্তাধারার, তার ধ্যান-ধারণায়, চিন্তা-কল্পনায় লাগে পরিবর্তনের ছোঁয়া। সেই নব নব ধ্যান, চিন্তা, ভাব, ভাবনার প্রতিফলন হয় তার সৃষ্টিতে, তার মনের ছায়া পড়ে তার রচনায়, তাই এক যুগের সঙ্গে আর এক যুগের সাহিত্যের পার্থক্য, তাই সাহিত্যের আসরে পালাবদল হয়। এই কারণেই লেখকের উক্তিতেই—"পুরানো সাহিত্য ক্লাসিক হিসাবেই গণ্য, আলমারীতে সাজানো, জীবনে তাদের আজ আর কোন আবেদন নেই।" আসলে আমাদের জীবনের "সহিত" যা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে, যাদের স্পর্শে মানুষের চিন্তা, দৃষ্টি, ধ্যান, ভাবনা রূপ নেয়-তাদের যেখানে প্রতিফলন হয়—তাকেই "সাহিত্য" বলা যায়। প্রতি যুগেই মানুষ বদলায়। সাহিত্যও বদলায়—তাই তার রূপান্তর অবশ্যম্ভাবী।

লেখকের ব্যক্তিগত গণ্ডীর মধ্যেই এবার আলোচনাকে সীমাবদ্ধ করি। বিরাট পরিসর থেকে আলোচনাকে গুটিয়ে আনি শুধু লেখকের নিজস্ব জীবনের পটভূমিতে। জিজ্ঞাসা করি—আপনি যখন কোন চরিত্র চিন্তা করেন বা যে সময় তার রূপ দেন তখন আপনি তার মধ্যে ডুবে যান। লেখকের সম্বন্ধে পাঠকের এ এক চিরন্তন প্রশ্ন। অনেক চরিত্রের মধ্যে মানুষ বহু প্রকৃত চরিত্রের ছবি দেখতে পায়। অনেক সময় পাঠক ঘোষণা করে—এ চরিত্র লেখকের নিজের। তাই এই প্রসঙ্গটি সেদিন তাঁর কাছে উত্থাপিত করি। উত্তরে বললেন, কখনও ডুবে যাই। কখনও আত্মসচেতন থাকি।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি প্রশ্ন চিন্তায় উদিত হয়—লেখক যদি চরিত্রের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়েন তার পরিণাম কি? ফল শুভ, না অশুভ, লেখকের চিন্তা শেষে চরিত্রের প্রভাবে বিপরীত দিকেও তো মোড় নিতে পারে। এই প্রশ্ন সেদিন তাঁর সামনে তুলে ধরায় তিনি জানান—তাও হয়, চরিত্র কখনও নিজের বেগেই চলে। উপমাস্বরূপ তিনি "বকুল"-এর কথা তুললেন (পাঠক-পাঠিকার স্মরণ থাকতে পারে, কয়েক বছর পূর্বে দৈনিক বসুমতীর এই শারদীয় সংখ্যাতেই ঐ উপন্যাসটি আত্মপ্রকাশ করেছিল)। বললেন—ডাক্তার চরিত্রটিকে আমি চেয়েছিলাম ভিলেন করতে, কিন্তু ঘটল এক আশ্চর্য ব্যাপার। যতবারই তাকে ভিলেন করতে চাই, সে হয়ে যায় ভাল। আবার চেষ্টা করলুম, একই ফল। শেষে "ভাল" হয়েই সে আত্মপ্রকাশ করল।

সাহিত্য হচ্ছে সৃষ্টি আর লেখক হচ্ছেন স্রষ্টা। লেখকের ধ্যান-ধারণা—পূর্বেই বলা হয়েছে—ছায়া ফেলে তাঁর রচনায়, সেখানে তাঁর পরিবর্তন এ প্রসঙ্গে অনেকখানি গুরুত্ব বহন করে। সে সম্পর্কে প্রশ্ন করি—লেখক কি বদলায়? উত্তর দেন—নিশ্চয়ই। আমিও বদলাই, যদি না বদলাতাম, তা হলে এগোতে পারতুম না। একটি বিন্দুতে স্থির হয়ে থাকতুম। যত বয়েস বাড়ছে, তত দেখাও তো বাড়ছে। যত দেখছি, তত নতুন নতুন চরিত্রের জন্ম হচ্ছে। অর্থাৎ পরিবর্তনের মধ্যেই বহমানতা, পরিবর্তনের অভাব মানেই স্তব্ধতা।

মনোজ বসুর লেখক জীবনের একটি বিশেষত্ব—তিনি দেখেন সর্বত্র, উপকরণ সংগ্রহ করেন সব জায়গা থেকেই, যেখানে যার মধ্যে সৃষ্টির বীজ থাকে, তা তাঁর নেত্রপথে পতিত হলেই তাঁর সঞ্চয়ের ঝুলিতে জমা হয়ে যায়, তারপর একদিন কোন এক বিশেষ মুহূর্তে হয়তো বৈশাখের কোন রুদ্র মধ্যাহ্নে, হয়তো শ্রাবণের কোন প্রমত্ত বর্ষণমুখরিত রাত্রে, হয়তো ফাল্গুনের কোন এক আকাশ তারা-ভরা পূর্ণিমার চন্দ্রালোকিত সন্ধ্যায়, হয়তো শীতের কোন উজ্জ্বল প্রভাতে—তা লেখকের অনবদ্য লেখনীর টানে অমরত্বের সম্ভাবনায় দীপ্ত হয়ে আত্মপ্রকাশ করবে সাহিত্যের পাতায়। কিন্তু বিশেষত্ব এই যে সঞ্চয়, দর্শন লেখক যে কোন জায়গায় করে থাকেন, কিম্বা তার চূড়ান্ত রূপায়ণ তাঁর নিজস্ব গৃহের নির্দিষ্ট রচনাস্থলে।

পৃথিবীর বহু দেশ ঘুরেছেন তিনি, অনেক দেখেছেন, অনেক জেনেছেন, অনেক শুনেছেন, কিন্তু এ নিয়মের ব্যতিক্রম কোথাও হয় নি।

সবশেষে প্রশ্ন করি—আপনার নিজের লেখা সংক্রান্ত ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কিছু আছে? একবাক্যে উত্তর আসে—গতানুগতিক কিছু লিখব না, নতুন কিছু লিখব।

ক্ষণকালের নীরবতা। লেখক চিন্তামগ্ন। আমার লেখনীও স্থির। ঘড়ির দিকে তাকাই। ঘড়ি অনেক দূর এগিয়ে গেছে। এবার সাঙ্গ করতে হবে আলোচনার পালা। স্তব্ধতা ভঙ্গ করে এমনই সময় লেখক বলে উঠলেন—হ্যাঁ, দেখ, একটা কথা এই প্রসঙ্গে তোমায় বলে রাখি—গল্পের আবেদন বয়সের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, তার গতি অবারিত, সকল বয়সের নরনারীর মনে সে সমানভাবে ঘা মারে, গল্পের প্রতি শিশুরও যেমন আসক্তি, বয়স্কেরও তেমনই আসক্তি। শিশুর পিপাসা মেটায় রূপকথা, বয়স্কের পিপাসা মেটায় সাহিত্যগ্রন্থ। অবশ্য পার্থক্য থাকে পট-ভূমিতে। বিষয় নির্বাচনে, বর্ণনভঙ্গীতে কিন্তু প্রবৃত্তিটি মূলে এক। ভেবে দেখলুম, শিশুরাই বড় হয়ে গল্পের পিপাসায় রূপকথা থেকে সাহিত্যগ্রন্থ ধরে। রূপকথায় বা শিশু-সাহিত্যে সে শুনে এসেছে বাঘের উপাখ্যান, চোরের গল্প, ভূতের কাহিনী। বড় হয়েও সে কি এদের কাহিনী আর শুনতে চাইবে না, এদেরই গল্প তখন তার প্রাপ্ত-বয়সের উপযোগী করে পরিবেশন করলে পারবে সে মুখ ফিরিয়ে থাকতে? আরম্ভ করলাম তারই ফল জল-জঙ্গল, তারই ফল নিশিকুটুম্ব, তারই ফল আমার ফাঁসী হল।

পূর্বপুরুষের বনবাড়ি

সাধারণত যা হয় এক্ষেত্রেও তাই হল। যদিও আমার নিজের কাছে ব্যাপারটা হাস্যকর এবং অসম্ভব মনে হচ্ছিল, কিন্তু গিন্নী যখন জেদ ধরলেন এটা করতেই হবে, বললাম বেশ কর। সমস্যা হনুমান। তাদের জ্বালায় জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। আমার গোলাপ ফলের শখ আছে। খানিকটা জায়গা লোহার তার দিয়ে ঘিরে খাচার মতো করে তার মধ্যে গোলাপ গাছ লাগিয়েছি কয়েকটা। হনুমানরা আমার চেয়েও বেশী গোলাপ-রসিক। সুযোগ পেলে গোলাপের কুঁড়িগুলিও খেয়ে ফেলে। যতদিন জাল দিয়ে ঘিরতে পারি নি ততদিন অশান্তির অন্ত ছিল না।

কিন্তু সমস্ত বাড়ি ছাদ হাতা, উঠোন এ সব তো আর জাল দিয়ে ঘেরা যায় না তাই সমস্যার সমাধান হয় নি। আমার গিন্নী অনেক মেহনত করে রোদে বসে' বসে' বড়ি দিয়েছিলেন, তা হনুমানের পেটে গেছে। রান্নাঘর থেকে তরি-তরকারি সুযোগ পেলেই নিয়ে যাচ্ছে। উঠোনে একটা পেয়ারা গাছ আছে, অজস্র মিষ্টি পেয়ারা হয় তাতে, কিন্তু হনুমানের উৎপাতে তা আমরা একটি খেতে পাই না। ওদের হুড়োহুড়ি আর লাফালাফিতে দুপুরের বিশ্রামটা বিঘ্নিত হয় কেবল। বুড়ী দাই হনুমান তাড়াতে গিয়ে পিছলে পড়ে' পা ভেঙেছে। হাতায় আমগাছ আছে দুটো। ভাল জাতের আম। কিন্তু সে সব হনুমানের সম্পত্তি। মুকুল হওয়া থেকে খেতে শুরু করে। একটা শরবতি লেবুর গাছও আছে কিন্তু থাকলে কি হবে, ও-লেবুর শরবৎ খাওয়ার সৌভাগ্য আমাদের হয় না। কচি লেবুই ছিঁড়ে খেয়ে ফেলে ওরা।

একজনের পরামর্শে ওদের তাড়াবার জন্যে নানা ধরণের 'কাক-তাড়ুয়া-জাতীয় জিনিস তৈরি করিয়েছিলাম। ভীষণ-দর্শন মুখোশ কিনে বাঁশে টাঙিয়ে দিয়েছিলাম। কোনও ফলই হয় নি।

আমার ষোল বছরের মেয়ে নন্দিতাকে একদিন একটা 'খাটাস' (পুরুষ হনুমান) দাঁত খিঁচিয়ে তাড়া করেছিল।

আমার অ্যালসেশিয়ান কুকুর 'রকেট' হনুমান এলেই চীৎকার করে বটে, কিন্তু হনুমানরা গ্রাহ্য করে না তাকে। উঁচু পাঁচিলে বা গাছে বসে' তার দিকে সিমিমিটি করে চাইতে চাইতে মনের আনন্দে লুট-পাট-করা পেয়ারা খেতে থাকে। রকেট শুধু চেঁচিয়ে মরে।

নিমগাছের আমগাছের কচি কচি পাতাগুলোকে পর্যন্ত চিবিয়ে খেয়ে ফেলে হনুমানরা।

একটিমাত্র উপায় বন্দুক চালিয়ে ওদের মেরে ফেলা। কিন্তু তা করতে ইচ্ছা হয় না। কুসংস্কার আছে। তাছাড়া এদেশে হনুমান মারলে রাম-ভক্ত লোকেরা ক্ষেপে ওঠেন। গভর্ণমেণ্ট আশ্বাস দিয়েছিলেন হনুমানের হাত থেকে আমাদের বাঁচাবেন। কিন্তু সে আশ্বাস কাগজে-কলমেই নিবদ্ধ থেকে গেছে। কোনও ফল প্রসব করে নি।

এমন সময় আমাদের প্রতিবেশী হিমাংশুবাবু বললেন একদিন—"একটা উপায়ের কথা শুনেছি। যদি করে' দেখতে পারেন কাজ হ'তে পারে।'

"কি উপায়?"

"খানিকটা মদ কিনে এনে, তাতে ছোলা ভিজিয়ে রেখে দিন সমস্ত রাত্রি। মদে ছোলাগুলো যখন বেশ ফুলে ফুলে উঠবে তখন সেগুলো ছাতে রেখে আসুন। হনুমানগুলো এসে খাবে সে ছোলা। খেয়ে তাদের নেশা হবে, পা টলতে থাকবে। তাড়া দিলে লাফাতে গিয়ে পড়ে' যাবে। তারপর দেখবেন আসবে না আর আপনার বাড়িতে।"

"কেন?"

"লাফাতে গিয়ে কোনও হনুমান যদি পড়ে' যায়, তাহলে সমাজ-চ্যুত হয় সে। অন্য সব হনুমান তাড়া করে তাকে। সুতরাং কোনও হনুমানই এরপর আর আপনার বাড়িতে আসতে চাইবে না।"

হিমাংশুবাবু বহুদর্শী প্রবীণ লোক। তাঁর কথার প্রতিবাদ করলাম না। তিনি চলে যাওয়ার পর গিন্নী বললেন, "করেই দেখা যাক না। খরচ তো খুব বেশী নয়। কতই বা দাম এক বোতল মদের। ছোলা তো বাড়িতেই আছে—"

হেসে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করলুম। "পাগল হয়েছ।"

তার পরদিন হনুমানরা এসে আমার বাড়ির উঠোনে যে যুঁইগাছটা ছিল সেটাকে মুড়িয়ে খেয়ে গেল। পেঁপে-গাছের চারা ছিল একটা। সেটারও ঘাড় মটকে খেয়ে গেল কচি পাতা-গুলো।

গৃহিণী জেদ ধরলেন, "আজই মদ নিয়ে এস। আজ রাত্রেই তাতে ছোলা ভিজিয়ে রাখব আমি। হিমাংশুবাবু বাজে কথা বলবার লোক নন।"

অবশেষে আনতে হ'ল এক বোতল মদ। গৃহিণী বললেন, "এক বোতল মোটে ওইটুকু! অনেক হনুমান যে। অন্তত পোয়াটাক ছোলা ভিজাতে হবে তো। আর এক বোতল আন।"

নিয়ে এলাম আর এক বোতল।

পরদিন সকালে মাটির একটি বড় গামলায় মদ্য-স্ফীত ছোলাগুলি ছাতে রেখে এলেন গৃহিণী। হনুমানও এল একটু পরে। তারপর খ্যাক্ খ্যাক্ উপ্-উপ্ শব্দ শুনতে পেলাম। মনে হল কতকগুলো হনুমান ভয়ে পালাচ্ছে। গোদা হনুমানের তাড়নায় ছোট হনুমানরা পালায় অনেক সময়। তারপর সব চুপচাপ। ঘণ্টাখানেক কেটে গেল। কোনও সাড়াশব্দ নেই।

আমার মনে একটা বৈজ্ঞানিক চিন্তা এল। ডারবিনের মতে হনুমানরাই আমাদের পূর্বপুরুষ। কিন্তু আমরা বিজ্ঞানের সহায়তায় সমস্ত প্রকৃতির উপর জবর-দখল জারি করে' বসে আছি। নিজেরাই সব লুটেপুটে খাচ্ছি। আর কাউকে কিছু দিচ্ছি না। আমাদের পূর্বপুরুষদের বঞ্চিত করতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ নেই আমাদের। এটা কি উচিত - - - - - -

চিন্তাস্রোতে বাধা দিয়ে নন্‌তি এসে বলল,—"সব হনুমানগুলো ওদিকের গাছে বসে আছে। গোদা হনুমানটা খালি নেই। ছাতে গিয়ে দেখে আসি কি হল?"

চলে গেল সে ছাতে।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আমরাও গেলাম। গিয়ে যা দেখলাম, তা অপ্রত্যাশিত। গোদা হনুমানটাই ছাতে বসেছিল। গামলায় একটি ছোলা নেই। নন্‌তিকে দেখেই হনুমানটা টলতে টলতে তার দিকে এগিয়ে এল, তারপর তার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে' হাত জোড় করে' করুণ-দৃষ্টিতে চেয়ে রইল তার মুখের দিকে। "ওগো মা গো"—বলে' নন্‌তি ছুটে পালিয়ে এল সঙ্গে সঙ্গে। হনুমানটা কিন্তু পালাল না। সে করুণ-দৃষ্টিতে নন্‌তির প্রস্থান-পথের দিকে চেয়ে রইল। আমরা তাড়া করলাম। নড়ল না। দেখলাম তার চোখ দিয়ে জল পড়ছে।

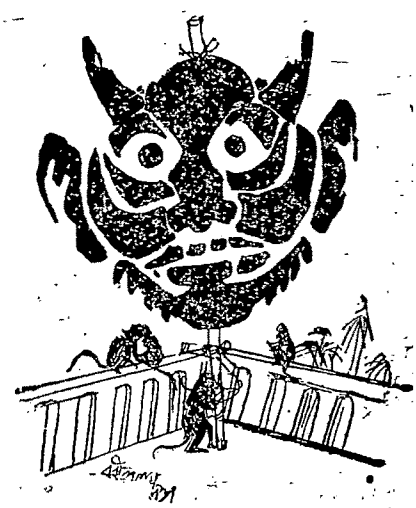

পুরানো মামলার কাহিনী

আলিবর্দী খাঁ সুবে বাংলার—অর্থাৎ বাংলা বিহার উড়িষ্যার—নবাবী করেন ষোল বছর ধরে, ইংরিজি ১৭৪০ সাল থেকে ১৭৫৬ সাল তক, তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত। নবাব মুর্শিদ কুলী খাঁর দৌহিত্র নবাব সরফরাজ খাঁকে গিরিয়ার যুদ্ধে হারিয়ে দিয়ে তিনি বাংলার মসনদ দখল করে নেন। সরফরাজ খাঁ যুদ্ধতেই মারা যান।

বাংলার মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকেরা আলিবর্দী খাঁর ঐ রকম জোর করে বাংলার গদি ছিনিয়ে নেওয়াটাকে একটুও ভালো চোখে দেখেন নি। আর, আলিবর্দী খাঁ নিজে তুর্কীদেশীয় মুসলমান হওয়ায় এ-দেশীয় মুসলমানদের তিনিও মন থেকে বিশ্বাস করে উঠতে পারেন নি। তাই রাজকার্য চালাবার জন্যে তিনি বিদেশী মুসলমান আর বাঙালী হিন্দুদেরই উপর বেশি করে নির্ভর করতেন। ফলে তাঁর আমলে বহু বাঙালী হিন্দু ছোট-বড়ো-মাঝারি সব রকমেরই সরকারী কাজে এক এক করে ঢুকে পড়তে পেরেছিলেন।

সেকালের ঐ রকম একজন কর্মচারী—জানকীরাম। আলিবর্দী খাঁ তাঁকে অত্যন্ত বিশ্বাস করতেন। তাঁর কৃপায় জানকীরাম সরকারী কাজে উন্নতি করতে করতে প্রথমে উড়িষ্যার আর তারপর বিহারের নায়েব নাজিম-পরিচিত ভাষায় ছোটলাট পর্যন্ত উঠেছিলেন। ছলনা করে বর্গীদের সর্দার ভাস্কর পণ্ডিতকে মুর্শিদাবাদের কাছে মনকরা গ্রামে আনানো; আর ভুলিয়ে সেখানে আনিয়ে তাঁকে খুন করানোর ব্যাপারে জানকীরাম একজন বড়ো গোছের পাণ্ডা ছিলেন।

জানকীরাম দক্ষিণ রাঢ়ী কায়স্থ-সমাজের বাহাত্তর ঘরের লোক। তাঁর কৌলিক উপাধি সোম। চুঁচড়োয় আদি নিবাস। তাঁর কাজে খুশি হয়ে নবাব আলিবর্দী খাঁ দিল্লীর বাদশার কাছ থেকে তাঁকে মহারাজা খেতাব আনিয়ে দিয়েছিলেন। জানকীরামের ছেলে দুর্লভরামের মাথা বাপের মতো ততটা সাফ না হলেও, তিনি বাপকো ব্যাটাই তো বটেন? সুতরাং কুছ নেই তো থোড়া থোড়া। চাড় দিয়ে দিয়ে জানকীরাম ছেলেকে অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে দিতে পেরেছিলেন। দুর্লভরামও শেষ পর্যন্ত নবাবের বক্সীর পদ পেয়ে মহারাজও হয়ে গিয়েছিলেন।

তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়

দুর্লভরামের কাল হয়েছিল বিশ্বাস-ঘাতক মীরজাফরের হাতে হাত মিলিয়ে। তবে, তাতে তাঁকে পুরো দোষটুকু দেওয়া চলে না। কি কারণে জানি নে, নবাব সিরাজদৌল্লা তাঁর উপর নাখুশ হয়ে তাঁকে চাকরিতে অনেকটা নীচে নামিয়ে দিয়েছিলেন। তাইতেই তিনি মীরজাফরের বন্ধু ব'নে গিয়ে সিরাজের বিরুদ্ধে গিয়েছিলেন। দুর্ভাগ্য বড়ো মজার মজারই বন্ধু জুটিয়ে আনে। কিন্তু মুশকিল এই যে, ঐ রকম বন্ধুত্ব টাঁকে খুবই কম দিন, কার্যোদ্ধার হয়ে গেলেই ব্যস—তখন কে তুমি, কে তোমার?

ইংরেজদের সহায়ে নবাব ব'নে মীরজাফর চক্ষুলজ্জার খাতিরেই দুর্লভরামকে মুখ্যমন্ত্রীর পদে বসাতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু দু-বছরও কাটল না। মীরজাফর আর তস্য পুত্র মীরনের হাতে তাঁর প্রাণ যাবার উপক্রম হল। দুর্লভরাম ভাগ্যিস শুরু থেকেই মহাত্মা ক্লাইভের অনুগত

● রাজা রাজবল্লভ রায়

হয়ে পড়েছিলেন, তাই ইংরেজদের কৃপায় কোনো রকমে পৈতৃক প্রাণটা হাতে নিয়ে কোলকাতায় পালিয়ে যেতে পেরেছিলেন। পরিবারবর্গকে মুর্শিদাবাদেই ফেলে রেখে আসতে হয়েছিল। পরে ইংরেজরা অনেক সুপারিশ করে নিজেদেরই হেফাজতে তাঁদের সবাইকে কোলকাতায় এনে ফেলতে পেরেছিলেন। সেই থেকে মৃত্যু পর্যন্ত (১৭৭২ সাল) দুর্লভরাম সপরিবার ইংরেজদেরই আশ্রয়ে বাস করেছিলেন।

দুর্লভরামের ছেলে রাজবল্লভ। এই রাজবল্লভকে অনেক প্রবীণ ঐতিহাসিকও তাঁর চেয়ে ঢের বেশি বিখ্যাত, ঢাকার বৈদ্যকুলের রাজা রাজবল্লভের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলে ভুল করে বসেন। তিনি কোলকাতার রাজা রাজবল্লভ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা লোক, বয়েসেও অনেক বড়ো। তখনকার দিনে বাঙালীরা ইংরেজদের অনুকরণে ততটা গোত্ত হয়ে উঠেন নি। তাই তখনো তাঁরা নামের পিছনে সারনেম, অর্থাৎ কৌলিক উপাধি ব্যবহারে অভ্যস্ত ছিলেন না। ব্রাহ্মণরা তাঁদের নামের পর জাতিগত শর্মা পদবী লিখতেন বটে, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে টোল-চতুষ্পাঠী থেকে পাওয়া অ্যাকাডেমিক টাইটলই ব্যবহার করতেন। অন্য বর্ণের সবাই পিতৃদত্ত নিজের নামেই সন্তুষ্ট থাকতেন। চাইতেই তো অত গোলোযোগ। কে যে আসলে কোন্ জন, তার ঠাওর না পাওয়াটা বিচিত্র কি?

রাজা রাজবল্লভ কিন্তু তাঁর পিতামহ জানকীরামের চোখা বুদ্ধি উত্তরাধিকারী-সূত্রেই পেয়েছিলেন বলে মনে হয়। তাঁর উপর কাজ শেখার প্রচুর আগ্রহ তাঁর থাকায় তিনি সহজেই রাজস্ব-সংক্রান্ত সব বিষয়েরই হাড়হদ্দ দু-দিনে হজম করে নিতে পেরেছিলেন। অতি অল্প দিনের মধ্যেই রাজবল্লভ সবার কাছে এক চৌকস ব্যক্তি বলে প্রতিপন্ন হয়ে গেলেন। বুদ্ধির জোরে তিনি বেশ বুঝতে পেরেছিলেন, বাংলা দেশের ভবিষ্যৎ ইংরেজদেরই হাতে। দুর্লভরামের সঙ্গে তিনিও ইংরেজ-মহলে যাতায়াত করে সেখানকার কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে দহরম-মহরম লাগাতে লাগলেন।

১৭৬৫ সালে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী দিল্লীর বাদশা শা আলমের কাছ থেকে বাংলা বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানী পরোয়ানা পেয়ে গেলেন। তবে, সাহস করে তখন তখনি তাঁরা রাজস্ব আদায়ের ভার স্বহস্তে নিলেন না, মহম্মদ রেজা খাঁ বলে এক খানদানী মুসলমানকে নায়েব-দেওয়ান করে তাঁরই মারফত কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন। তার ফলে রাজস্বের অধিকাংশ নায়েব-মশায়েরই পেটে যেতে লাগল আর কোম্পানীর ভাগে ক্রমশই টান পড়তে লাগল। শেষে এমন হল যে, কোম্পানীর খরচ আর তাতে কুলিয়ে ওঠে না। ওদিকে যে-রেটে মহম্মদ রেজা খাঁর শ্রীবৃদ্ধি হতে থাকল, দুর্ভাগ্য প্রজাদের ঠিক সেই হারেই দুর্গতির পরিমাণ বেড়ে চলতে লাগল। অবশেষে সন ১১৭৬ সালের মন্বন্তরে দুর্ভিক্ষ মহামারীরূপে এসে বঙ্গদেশের এক-তৃতীয়াংশ লোককে যমের বাড়ী পাঠিয়ে তবু খানিকটা ভার লাঘব করল।

এবার কোম্পানী-বাহাদুরেরও টনক নড়ল। এর অল্প পরেই হঠাৎ একদিন জেগে উঠে তাঁরা কোলকাতায় লিখে পাঠালেন যে, তাঁরা আর শুধু নামেই দেওয়ান থাকতে চান না, কাজেও দেওয়ান হতে চান। মহম্মদ রেজা খাঁকে নায়েবগিরি থেকে বরখাস্ত করা হল। ছোকরা ইংরেজ সিভিলিয়নরা মফস্বলের জেলায় জেলায় খাজনা আদায়ের ভার পেলেন। খালসা অর্থাৎ সেণ্ট্রাল রেভিনিউ ডিপার্টমেণ্ট মুর্শিদাবাদ থেকে তুলে নিয়ে এসে কোলকাতায় বসানো হল। গভর্নর ওয়ারেন হেষ্টিংস বেশ বুঝলেন, ঐ রকম হাত বদলানোর বাজারে রাজস্ব ব্যাপারে পাকা মাথাওয়ালা একজন বিশ্বাসী দিশী লোকের সহায় না পেলে, কাজের ভয়ানক ছরকটই হতে থাকবে। হাতের কাছেই রাজবল্লভ ছিলেন। হেষ্টিংস তাঁকে ডাকিয়ে পাঠিয়ে, খালসার রায়রায়ান, অর্থাৎ রেভিনিউ ডিপার্টমেণ্টের সুপারিনটেণ্ডেণ্ট করে বসিয়ে দিলেন। কালক্রমে রাজবল্লভ গভর্ণর জেনারেলের কাউন্সিলে একটা আসনও পেয়ে গিয়েছিলেন, যদিও তার জন্যে তাঁর আলাদা কোনো মাইনে ছিল না।

কিন্তু তাতে কিছু এসে গেল না। কারণ, রাজবল্লভের দু-পুরুষের জমানো প্রচুর সম্পত্তি। অবশ্য নগদ টাকার অধিকাংশই মীরজাফর আর মীরনে মিলে দুর্লভরামের কাছ থেকে কেড়েকুড়ে নিয়েছিলেন, তবুও জমিজমা ছিল অনেক। তাঁদের জমিদারি সেই উত্তরপ্রদেশ থেকে আরম্ভ করে বিহার উড়িষ্যা বঙ্গদেশ পর্যন্ত ছড়ানো। এইবার ইংরেজের অধীনে চাকরি নিয়ে রাজবল্লভ নগদ টাকাও কিছু সঞ্চয় করে তুলতে পেরেছিলেন। বাগবাজারের ভদ্রাসন ছাড়াও কোলকাতায় ভাড়া দেবার বাড়িও পাঁচ-সাতখান করে ফেলেছিলেন। কোলকাতার সমাজে রাজবল্লভের খুবই প্রতিষ্ঠা। লোকে তাঁর আসল টাইটল রাজবাহাদুরকে এককাঠি উপরে চড়িয়ে তাঁকে মহারাজা বলে ডাকতে শুরু করে দিল। রাজবল্লভ নিজে তাঁর কৌলিক সোম-উপাধি ত্যাগ করে জমিদার-জাইগিরদার-তালুকদার-জোতদারদের রায়-পদবী গ্রহণ করেছিলেন।

রাজা রাজবল্লভ রায় মারা গেলে তাঁর ঐ বিশাল সম্পত্তি নিয়ে মস্ত মামলা বেধে গিয়েছিল। তখনকার দিনে এই আজব শহর কোলকাতায় এমন কোন ভাগ্যবান ব্যক্তি ছিলেন না, যাঁর ত্যক্ত সম্পত্তি একবার-না-একবার সুপ্রীম কোর্ট ঘুরে গিয়ে বেশ ক্ষীণ হয়েই ঘরে ফিরেছে। কোম্পানী-সাহেব আচ্ছা একটা মজার কল বানিয়ে ছিলেন এই সুপ্রীম কোর্ট দিয়ে। গোলক-ধাঁধার মতো তাতে ঢোকা খুবই সোজা, কিন্তু তার থেকে বেরোতে জেরবার। পুরনো সেল-রিপোর্টে রাজবল্লভের সম্পত্তি নিয়ে ঐ মামলার যা বিবরণ দেওয়া আছে, তার একটা চুম্বক এখানে তুলে দিচ্ছি। পাঠকদের হয়তো সেটা মনোগ্রাহী হতে পারে।

রাজবল্লভের একটিমাত্র ছেলে, মুকুন্দবল্লভ। ১৭৯৫ সালে বাপের

(২২৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

কোম্পানীর আমলে

কলকাতার সংবাদ ও সাময়িকপত্র এবং সরকারী সেন্সর

(১৭৮০—১৮৩০)

সে কালে যে সব ইংরেজ এদেশে আসতেন, তাঁরা দেশের খবর পেতেন বহুদিন বাদে। যে সব চিঠিপত্র ও খবরের কাগজ বিলেত বা ফ্রান্স থেকে আসত, তাতেই পেতেন দেশের সমাচার। একে পালের জাহাজ, তাও আসত আফ্রিকা ঘুরে।

বিলেতী ও ফরাসী কাগজে ইউরোপের সরকারী খবর থাকত বটে, কিন্তু অনেক দিনের বাসি খবর। ওঁরা কিন্তু ওতেই সন্তুষ্ট ছিলেন।

সে যুগে সিমাফোর কি টেলিগ্রাফ কিছুই আবিষ্কার হয়নি, তখনকার যুগে দু'চারখানা সংবাদপত্র যা কলকাতা থেকে প্রকাশিত হত, তাদের প্রতিনিধিরা দ্রুতগামী নৌকো ভাড়া করে খেজুরী পর্যন্ত ছুটতেন সদ্যাগত বিলেতের জাহাজ থেকে ইউরোপের হালফিল খবর---latest intelligence সংগ্রহের আশায়।

খেজুরী থেকে গঙ্গার মোহনার চড়া এড়িয়ে কলকাতা বন্দরে এসে ভিড়তে জাহাজগুলোর চার-পাঁচ দিনেরও বেশী লেগে যেত। সেই ফাঁকে কোন্ কাগজ সব চাইতে আগে খবরগুলো ছেপে বাহাদুরী নিতে পারে সেজন্যে খবরের কাগজের লোকদের মধ্যে রীতিমত হুটোপুটি লেগে যেত।

●

= ইণ্ডিয়া গেজেট =

১৭৯২ খৃষ্টাব্দে কলকাতার প্রথম সংবাদপত্র ইণ্ডিয়া গেজেটের ১৯শে এপ্রিল সংখ্যায় যে সব উল্লেখযোগ্য সংবাদ ছাপা হয়েছিল, সেগুলো হচ্ছে:

।। ইংরেজ সৈন্য কর্তৃক ব্যাঙ্গালোর ও শ্রীরঙ্গপত্তন অধিকার ।।

— টিপু সুলতানের সঙ্গে সন্ধি —

(লর্ড কর্ণওয়ালিশ কর্তৃক ইংল্যাণ্ডে প্রেরিত ডেসপ্যাচের অনুলিপি)

প্যারিতে অশান্তি ও গোলযোগ

(ফরাসী গণ-বিপ্লবের পূর্বাভাষ : ১৭৯১ খৃষ্টাব্দের খবর)

।। ফ্রান্সে বিক্ষোভ ।।

= বার্মিংহাম দাঙ্গাকারীদের বিচার =

।। মরক্কোর সুলতান কর্তৃক স্পেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ।।

এ সব খবরই ১৭৯১ সালের শেষের দিককার ঘটনা। তখনকার দিনে ইণ্ডিয়া গেজেটই ছিল সরকারী মুখপত্র। এই কাগজখানি ঠিক যে কবে প্রথম প্রকাশিত হয়, সেটা বলা মুস্কিল, তবে ১৭৭৪ সালেরও যে আগে---সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কাগজখানি প্রথম দিকে ছিল সাপ্তাহিক।

জুল্‌ফিকার

তারপর ১৮২২ খৃষ্টাব্দে সপ্তাহে দুইবার এবং ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে সপ্তাহে তিনদিন ছাপা হত। পরে অবিশ্যি এটা দৈনিকে রূপ নেয়। ইণ্ডিয়া গেজেট ছিল উদারনৈতিক হুইগপন্থী পত্রিকা। সে যুগের এটা খুব নামকরা কাগজ ছিল। এর সম্পাদকীয়গুলো ছিল সুচিন্তিত ও পক্ষপাতশূন্য।

●

হিকি সাহেবের

= বেঙ্গল গেজেট =

কলকাতার প্রথম বেসরকারী পত্রিকা হচ্ছে বেঙ্গল গেজেট। এর সম্পাদক, মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী ছিলেন বিখ্যাত হিকি সাহেব, ----M (J. A. ?) Hickey.

গভর্ণমেণ্টের (কোম্পানীর) তদানীন্তন উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের প্রতিকূল সমালোচনার জন্য হিকিকে সরকারের বিরাগভাজন হতে হয়েছিল এবং বহুবিধ নির্যাতন ও কারাবাস ভোগ করবার পর, শেষটায় কাগজ তুলে দিয়ে, দেশে ফিরে যেতে হয়। হিকির গেজেটের প্রথম প্রকাশ ১৭৮০ সালের ১৯শে জানুয়ারী।

হিকির বিষয়ে আজ পর্যন্ত অনেকে অনেক কথা লিখেছেন, কাজেই সে সবের বিস্তারিত পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন। প্রসঙ্গক্রমে এইটুকু বলা যেতে পারে যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে কোম্পানীর ইংরেজ কর্মচারীদের মধ্যে যে নৈতিক অধঃপতন দেখা দিয়েছিল, তারই নগ্ন রূপকে হিকি সাহেব তুলে ধরেছিলেন তাঁর বেঙ্গল গেজেটের পাতায়।

কোম্পানীর এইসব ক্ষুদে নবাব আমলাদের লাম্পট্য, স্বেচ্ছাচারিতা, অর্থগৃধ্নুতা ও অন্যান্য দুর্নীতি নিয়ে তাঁর পত্রিকায় প্রায়ই ব্যঙ্গ নাটিকা ও শ্লেষাত্মক ছড়া (Lampoon) ছাপা হত। কোন কোন ঘটনাকে আবার বিজ্ঞাপনের আকারে বার করা হত।

বেঙ্গল গেজেটের উদ্দেশ্য অনেকটা বুধ-সন্ধানী মক্ষিকার মত হলেও এবং অনেক সময় রসিকতাগুলো স্থূল ও অশ্লীল হয়ে উঠলেও, এই কাগজটির নির্ভীকতা ও স্পষ্টভাষণ যে প্রশংসনীয় ছিল সে কথা কেউই অস্বীকার করতে পারবেন না। সে যুগে এই পত্রিকাখানি অসম্ভব জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। বেঙ্গল গেজেটের সরস ও চটুল লেখাগুলির জন্য পাঠক-পাঠিকারা অধীর আগ্রহে পরবর্তী সংখ্যার জন্য অপেক্ষা করতেন।

Allusion না জানা থাকায়, আজকালকার পাঠকদের কাছে বেঙ্গল গেজেটের লেখাগুলির বেশীর ভাগেই দুর্বোধ্য ঠেকবে। তাঁরা ঠিক ঠাওর করে উঠতে পারবেন না, নাট্যোল্লিখিত কুশীলবদের কে কোন্ ব্যক্তি।

হিকির শ্লেষের উদ্যত বর্শার লক্ষ্য ছিলেন প্রধানত গভর্ণর জেনারল ওয়ারেন হেষ্টিংস। সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি স্যার এলিজা ইম্পে, জাষ্টিস হাইড, রেভারেণ্ড জনসন, মিঃ চেম্বার্স প্রভৃতি হেষ্টিংসের অন্তরঙ্গ অনেকের ওপরেই তাঁর বিদ্রূপ বাণ নিক্ষিপ্ত হয়েছে।

হিকির কাগজে অনেক সময় ব্যক্তিগত চরিত্রের ওপর হীন আক্রমণ চালানো হত এবং অনেক নোংরা কেলেঙ্কারীর কেচ্ছা (Personal Slander) ফলাও করে ছাপা হত। এই ধরণের লেখা সত্যিকার

সাংবাদিকতার দিক থেকে বিচার করতে গেলে, নিন্দনীয় এবং পরিহার্য সন্দেহ নেই। শোনা যায় স্যার ফিলিপ ফ্রান্সিস ও হেষ্টিংস বিরোধী দু'একজন ওপর মহালের লোক পত্রিকাটির পৃষ্ঠপোষকতা করতেন এবং অনেক গোপন তথ্য সরবরাহ করতেন।

●

= ক্যালকাটা গেজেট =

১৭৮৪ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা মার্চ তারিখে ক্যালকাটা গেজেট নামে আধা-সরকারী একখানা সাপ্তাহিক কাগজ বার করা হয়। এর প্রথম সম্পাদক ছিলেন ফ্র্যান্সিস গ্ল্যাড্উইন। স-কাউন্সিল মহামান্য গভর্ণর জেনারল (হেষ্টিংস)। 'under their sanction and authority' এই পত্রিকাখানি প্রকাশিত হল বলে ঘোষণা করেন। ---অনেক ঝড়-ঝাপটা কাটিয়ে উঠে পত্রিকাখানি অদ্যাবধি চালু আছে। বহুদিন যাবৎ এটা বাংলা সরকারের মুখপত্র। সরকারী অফিস সংক্রান্ত যাবতীয় ঘোষণা এরই মাধ্যমে হয়ে থাকে। এই সাপ্তাহিক বিজ্ঞপ্তি পত্রিকা পুরোপুরি গভর্ণমেণ্টের খরচে ছাপা হয় এবং এর স্বত্বাধিকারী বাংলা (পশ্চিমবঙ্গ) সরকার।

●

১৭৮৫ সালের ৬ই এপ্রিল তারিখে মিঃ গর্ডন ও মিঃ হেস্ব যুগ্ম সম্পাদনায় একখানা মাসিক পত্রিকা বার হয়, নাম---ওরিয়েণ্টাল ম্যাগাজিন অব ক্যালকাটা এ্যামুজমেণ্টস্। ওতে বেশীর ভাগ সহরের বিভিন্ন প্রকার আমোদ-প্রমোদ, ম্যাচ, ভোজ ইত্যাদির বিবরণ ছাপা হত। মিঃ হোয়াইটের সম্পাদনায় ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে (৩রা অক্টোবর) 'ক্যালকাটা ম্যাগাজিন এ্যাণ্ড ওরিয়েণ্টাল ম্যুজিয়াম' নামক একখানা মাসিক পত্র প্রকাশিত হয়। এরপর ১৭৯৪ সালের ১লা নভেম্বর নতুন একখানা মাসিক সংবাদপত্র ---ক্যালকাটা মান্থলী জার্ণাল বার হল। কাগজখানা বিভিন্ন সংবাদপত্র থেকে আহরিত খবরের সংক্ষেপিত সংকলন। ২নং ওয়েষ্টন লেন থেকে জে হোয়াইট নামক একজন ভদ্রলোক এই পত্রিকাটি বার করেছিলেন। এই পত্রিকার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছিল---'to give the whole of Indian news of the month in as condensed a form as possible, for transmission to England. ইংল্যাণ্ডের লোকদের ভারতীয় সংবাদ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করার জন্যই এর প্রকাশ।

●

= বেঙ্গল হরকরা =

ওরিয়েণ্টাল প্রেস অফিস থেকে একখানা সাপ্তাহিক কাগজ ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দের ২০শে জানুয়ারী প্রকাশিত হল, এই পত্রিকাখানির নাম রাখা হয়েছিল BENGAL HIRCARRAH. ৭নং পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীটে ছিল এই কাগজের দপ্তর। বেঙ্গল হরকরা বহুদিন ধরে চলেছিল এবং ওর কাটতিও ছিল বেশ। এটা প্রথমে ছিল সাপ্তাহিক, পরে ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে এটা দৈনিকে রূপ নেয়। ১৮২৪ সালে এর প্রতিদ্বন্দ্বী 'ক্যালকাটা জার্ণালের' অকাল মৃত্যু ঘটায়, এই কাগজের গ্রাহক সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়।

সংবাদ পরিবেশন ছাড়া জনমত সৃষ্টিতে এর অবদান আদৌ উল্লেখযোগ্য ছিল না। পত্রিকাটির কোন দৃঢ় বা নির্দিষ্ট মতবাদ ছিল না। ক্ষেত্র ও অবস্থা অনুযায়ী এর অভিমতের পরিবর্তন হত।

গোল্ডস্মিথের কথায় বলা যেতে পারে, 'doctrines fashioned at the varying hour. হরকরা সর্বদা গভর্ণমেণ্ট ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের মন যুগিয়ে চলত; জনগণের আপত্তি ও অভিযোগ তুলে ধরার চেয়ে তার নিজের ব্যবসায়ী স্বার্থের দিকে দৃষ্টি বেশী ছিল--- যা হোক লর্ড ওয়েলেসলী কর্তৃক সেন্সর বিধি উঠিয়ে দেবার পর, এর সুর বদলে যায় এবং জনকল্যাণ ও শিক্ষা বিস্তার প্রভৃতি বিষয়ে লেখালেখি সুরু করে।

●

১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে আরো একখানা নতুন সাপ্তাহিক INDIAN APOLLO আত্মপ্রকাশ করে। প্রতি রবিবারে কাগজখানা ছেপে বের হত ১৫৮নং চিৎপুরের মিরর প্রেস থেকে।

১৭৯৯ সালের ৪ঠা এপ্রিল তারিখে একখানা অর্ধ-সাপ্তাহিক (Bi-Weekly), —THE RELATOR-এর প্রকাশনের বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হয়। সে যুগের ইংরাজী কাগজের লেখার ঢং ও ধরণের কিছুটা আভাস এই বিজ্ঞপ্তিতে পাওয়া যাবে। নীচে কিছুটা উদ্ধৃতি দেওয়া গেল:

To The Public,

It is an eventful period indeed, at which we solicit your patronage of a work for the early and faithful communication of those events, which not only interest the feelings and occupy the attention of mankind, but astonish and terrify the world, when in the heeght of an universal war, NATURE seems to have alloted her sea for the theatre of gallant and unexamplified victories; when FATE resigned the land to the sanguinary and immensurable ravages (তখন রক্তক্ষয়ী ফরাসী বিপ্লবের প্রতিক্রিয়ায় ইউরোপের শান্তি ব্যাহত); when ANARCHY has supplanted ORDER and REASON fled before the frenzy of INFIDELITY and CAPRICE; when the hue of living manners is changable as the chamelions..... not only the materials for a periodical publication abound but the vehicles for disseminating them are naturally multiplied. This has been the case in Calcutta, yet we propose to offer another NEWS PAPER to your attention, trusting etc.....

●

১৭৯৮ সালে ASIA MAGAZINE বলে একখানা মাসিক কাগজ হরকরা আফিস থেকে ছাপা হয়ে বাজারে বেরিয়েছিল। এই পত্রিকাখানির প্রতি সংখ্যার মূল্য নিয়মিত গ্রাহকদের জন্য ছিল চার সিক্কা টাকা, খুচরা বিক্রি হয় ছ' টাকায়, আজকালকার বাজারে এর দাম হত প্রায় চল্লিশ টাকার কাছাকাছি। এটা সত্যিই অচিন্তনীয় বলেই মনে হয়।

১৮১৫ সালের ২৫শে মে তারিখের ক্যালকাটা গেজেটের এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় যে, আগামী জুন মাসে যে নতুন পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে, এখন থেকে সরকারী যাবতীয় খবর ঘোষণা তাতেই ছাপা করা হবে। এই কাগজখানার নাম হবে 'গভর্ণমেণ্ট গেজেট' এবং এই কাগজের কাজ ও অন্যান্য সরকারী ছাপার কাজ এখন থেকে ক্যালকাটা গেজেটের প্রেসে না হয়ে, মিলিটারী অরফ্যান সোসাইটির প্রেস থেকেই হবে। এই কাগজখানি বহুদিন হল উঠে গেছে, কিন্তু ক্যালকাটা গেজেট এখনও টিকে আছে,---গত দীর্ঘ একশো আশী বছর ধরে।

●

১৮১৭ সালে 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' নামে একখানা পত্রিকা শ্রীরামপুর থেকে প্রকাশিত হয়। এই কাগজই শেষ পর্যন্ত বর্তমানের বিখ্যাত ষ্টেটসম্যানের রূপ পরিগ্রহ করেছে। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে CALCUTTA EXCHANGE PRICE CONTROL বলে বাণিজ্য বিষয়ক একখানা পত্রিকা বার হয়। ব্যবসায়ী মহলে এইরূপ একখানা কাগজের খুবই অভাব ছিল।

●

ক্যালকাটা জার্নাল ও মিঃ বাকিংহাম

ক্যালকাটা জার্নাল ভারতীয় সংবাদপত্রের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় নাম। এই পত্রিকাটির প্রথম প্রকাশের সংবাদ গভর্ণমেণ্ট গেজেটে বার হয়, ১৮১৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। এতে বলা হয়েছিল যে, ক্যালকাটা গেজেট ও মণিং পোষ্টের স্বত্বাধিকারী কাগজ দু'খানা তুলে দিয়ে সেই জায়গায় 'ক্যালকাটা জার্নাল' নামক নতুন একখানা অর্ধ-সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশনের ব্যবস্থা করছেন।

এই পত্রিকা সম্পাদনার ভার পড়ল মিঃ বাকিংহাম নামক একজন সুযোগ্য ব্যক্তির ওপর।

বাকিংহাম নির্ভীক, দৃঢ়চিত্ত ও কৃতিসম্পন্ন ছিলেন। লিখতেনও খুব জোরালো। বছর না ঘুরতেই কিন্তু বাকিংহাম সরকারী রোষে পতিত হলেন। তাঁর অপরাধ,—মাদ্রাজের গভর্ণর এলিয়ট সাহেবের পুনর্নিয়োগ বিষয়ে বিরূপ মন্তব্য প্রকাশ।

বাকিংহাম লিখেছিলেন,

'This appointment is regarded as a public calamity in Madras and we fear it will be looked upon in no other light throughout India generally....

এখনকার কথা ছেড়েই দিলুম, বছর পঞ্চাশেক আগে হলেও এ ধরণের টিপ্পনী নেহাৎ ঝাঁজহীন ও নির্দোষ বলেই বিবেচিত হত। ক্যালকাটা জার্ণাল বাজারে বেরোনোর অল্পদিনের মধ্যেই খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং গ্রাহক সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে।

এই কাগজখানা ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে বৃহস্পতি ও রবিবার ছাড়া সপ্তাহে পাঁচ দিন বার হত। পরে এটা দৈনিকে রূপান্তরিত হয়। এর মূল্যের হার ছিল মাস মাস আট সিক্কা টাকা। পত্রিকাখানি সচিত্র ছিল; ভারতবর্ষে এটাই ছিল প্রথম ছবিওয়ালা কাগজ। প্রতি মাসে অবিশ্যি চারখানার বেশী ছবি ছাপা হত না এবং ছবি প্রিণ্ট করবার খরচা বাবদ ছবি পিছু আট আনা অতিরিক্ত চার্জ করা হত।

বাকিংহামের নিরপেক্ষ ও নির্ভীক মতবাদ সে-যুগে সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে একটা ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছিল। স্পষ্টভাষণের জন্য কোম্পানী সরকারের তরফ থেকে তাঁকে বহুবার সতর্ক করা হয়েছিল।

বাকিংহাম একবার কলকাতার বিশপের বিরুদ্ধে লেখনী চালনা করেন। ক্রুদ্ধ বিশপ সুপ্রীম কোর্টে ওঁর বিরুদ্ধে মানহানির অভিযোগ আনলেন। বিচার চলবার সময় বিচারক অন্যত্র বদলী হয়ে যাওয়ায় এবং পরবর্তী জজ হঠাৎ কোন কারণবশত স্বদেশে প্রত্যাগমন করায়, মামলাটি অনির্দিষ্টকাল মুলতুবী রইল। বাকিংহাম সাহেব কিন্তু অকুতোভয়; জোর কলমে সরকারী অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে লিখেই চলেছেন। এরপর নতুন জজ এলে পুনরায় কেসের শুনানী আরম্ভ হল, কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে তাঁর লোকান্তর ঘটল, মামলাটাও স্থগিত রইল বেশ কিছুদিনের জন্য।—

১৫ই মার্চ ১৮২৩ সালে কোম্পানীর ট্যাক্সিং কাউন্সিল মিঃ মানি মহামান্য গভর্ণর জেনারল কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে, তাঁর কাউন্সিলে অনুমোদিত সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ আইনের খসড়া সুপ্রীম কোর্টে রেজিষ্ট্রেশনের জন্য দাখিল করলেন। এই রুল আদালতে পাঠ করে শোনানোর পর, ক্যালকাটা জার্ণালের তরফের এ্যাডভোকেট মিঃ ফার্গুসন এই রেজিষ্ট্রেশনে আপত্তি তুললেন। ৩১শে মার্চ তারিখে দুই পক্ষের কাউন্সিলদের যুক্তি-তর্ক শোনবার পর, জজ স্যার ক্র্যান্সিস ম্যাকনটেন (Macnaghten) প্রেসের স্বাধীনতা ও ভারতে তার প্রয়োগ প্রযুক্তি কিনা সে বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করে, উপসংহারে বললেন—

This Government and a Free Press are incompatible and cannot be consistant. আইনটি যথারীতি সুপ্রীম কোর্টের অনুমোদন পেয়ে রেজিষ্ট্রী হয়ে গেল।

ক্যালকাটা জার্ণাল ও তার রবিবাসরীয় ক্রোড়-পত্রের প্রকাশকদের ওপর নব বিধান অনুযায়ী, ১৮২৩ সালের ৬ই নভেম্বর নোটিশ দেওয়া হল এবং তাঁদের লাইসেন্স বাতিল করে দেওয়া হল। ছয় ছয়জন গভর্ণমেণ্ট সেক্রেটারী তথা গভর্ণমেণ্টকে জনসাধারণের চক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করবার উদ্দেশ্যে সম্পাদকীয় লিখবার অভিযোগে (for publishing article intending to bring the Government into hatred and contempt) বাকিংহামকে অপরাধী সাব্যস্ত করা হল এবং শেষ পর্যন্ত ভদ্রলোক ভারতবর্ষ থেকে বিতাড়িত হলেন। বাকিংহামের সুযোগ্য সহকারী মিঃ আর্ণট বাকিংহাম চলে যাবার পরও তাঁদের কাগজে গভর্ণমেণ্টের স্বৈরাচার ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করতে লাগলেন। বাকিংহামের জায়গায় নতুন সম্পাদক নিযুক্ত হয়েছিলেন মিঃ স্যাণ্ডিস (Sandys)। লেখার ব্যাপারে আর্ণটই সব করতেন, যদিও আইনত লেখার দায়িত্ব পুরোপুরি ছিল স্যাণ্ডিসের। স্যাণ্ডিস সাহেব ছিলেন ভারতীয়-ভাবাপন্ন এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান (ওঁকে ঠাট্টা করে বলা হত—হিন্দু বিটন)। কোন ইংরেজকে বা ইউরোপীয়কে যদি ভারতে এসে কিছুদিন বসবাস করতে হত, তবে তাঁকে কোম্পানী সরকারের কাছ থেকে লাইসেন্স নিতে হত। গভর্ণর জেনারেল কাউকে অবাঞ্ছিত মনে করলে সেই লোকের লাইসেন্স বাতিল করে, তাঁকে ইংল্যাণ্ডে ফিরে যেতে বাধ্য করতে পারতেন। কিন্তু এই ক্ষমতার প্রয়োগ স্যাণ্ডিসের ওপর প্রযোজ্য হতে পারত না, কারণ জন্মসূত্রে তিনি ছিলেন ভারতবাসী। বহিরাগত ইউরোপীয় বলে তাঁকে গণ্য করা যেত না।

গভর্ণর জেনারেল আমহার্ষ্ট এটা বুঝতে পেরেই স্যাণ্ডিসের বদলে আর্ণটকেই এদেশ থেকে বহিষ্কৃত করলেন।

It was quite evident that Mr. Arnot was selected a victim to deter any other European from acting on behalf of Mr. Buckingham.

১৮২৪ সালের শেষের দিকে ক্যালকাটা জার্ণালের লীলা সাঙ্গ হল। রূপক দিয়ে বলতে গেলে বলা যেতে পারে, একে গলা টিপে হত্যা করা হল।

●

১৮১৮ সালে মিরর প্রেস থেকে আরও একখানা পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এর আলোচ্য বিষয়বস্তুগুলোর ধারণা এর নাম থেকেই অনুমান করে নেওয়া যেতে পারে। মস্ত লম্বা-চওড়া নাম,—এশিয়াটিক ম্যাগাজিন এ্যাণ্ড রিভিয়ু এ্যাণ্ড লিটারারী এ্যাণ্ড মেডিক্যাল মিসলেনী। গরু হারালে গরু পাওয়া যায় গোছের ব্যাপার।

●

= জনবুল ও ইংলিশম্যান =

১৮২১ সালের ২রা জুলাই জেমস ম্যাকাস্কির সম্পাদনায় JOHN BULL IN THE EAST নামক একখানা সাপ্তাহিক পত্রিকা বার হল হিন্দুস্থান প্রেস থেকে। কাগজখানা শেষে দৈনিকে পরিণত হয়েছিল, নামটাও সংক্ষিপ্ত হয়ে দাঁড়াল 'জন বুল।' বাকিংহামের ক্যালকাটা জার্ণালে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলিতে জনসাধারণের মনে যে উত্তরোত্তর সরকার বিরোধী ভাবের সৃষ্টি করছিল, তারই প্রশমনকল্পে এই পত্রিকাটির আবির্ভাব।

It came professedly as an antidote to the poison disseminated by Calcutta Journal.

কাগজখানা ছিল টোরী ভাবাপন্ন গোঁড় এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান (ভারতের ইংরাজ সম্প্রদায়) সমাজের মুখপত্র। ক্যালকাটা জার্ণালে মন্তব্যের পাল্টা মন্তব্য বার হত জন বুলে। এই পত্রিকাটির সঙ্গে সমসাময়িক কয়েকজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীর স্বার্থ জড়িত ছিল। হিউম সাহেব ইণ্ডিয়া হাউসে ১৮২১ সালের জুলাই মাসে বাকিংহাম বিতাড়ন বিষয় বিতর্কে এই তথ্য প্রকাশ করেন। জন বুলে প্রচার সংখ্যা ক্রমশ হ্রাস পাওয়ায় শেষে কাগজখানা হাত বদলে আসে Mr. Stocqueler এর কাছে। The change was a violen one—no less than a complete transition from Tory to Whig parties but it was justified by its success এই জন বুলই শেষটায় ষ্টেটসম্যানের ভূতপূর্ব প্রতিদ্বন্দ্বী অধুনালুপ্ত ইংলিশম্যান পত্রিকায় রূপান্তরিত হয়েছিল।

●

১৮২৪ সালের ৩১শে অক্টোবর তারিখে Weekly Gleaner-এর প্রথম প্রকাশ। মফস্বলের যাঁরা সহরের সব কাগজ দেখবার সুযোগ পান না, তাঁদের জন্য বিভিন্ন পত্রিকা থেকে সপ্তাহের যাবতীয় জ্ঞাতব্য সংবাদ সংগ্রহ করে, এই নতুন পত্রিকা সংকলনের পরিকল্পনা করা হয়েছিল, অথচ মূল্য সুলভই ছিল।

ক্যাপ্টেন ডি এল রিচার্ডসন (সে যুগের একজন খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ) তাঁর সম্পাদনায় ১৮২৫ সালে ক্যালকাটা লিটারারী গেজেট নামে মুখ্যত একখানা সাহিত্য পত্রিকা বার করেন। ক্যালকাটা ক্যুরিয়র নামে আরও একখানা কাগজ ১৮২৫ সালের মে মাসে আত্মপ্রকাশ করে। এর প্রকাশক ছিলেন Messers Hollingbery and Knelen। আপিস ছিল ৩নং মীরাজানি গলিতে। এখানা দৈনিক পত্রিকা ছিল।

১৮৩১ সাল পর্যন্ত ক্যালকাটা ক্যুরিয়ার সরকারী গেজেট হিসাবেই গণ্য হয়ে এসেছে। ঠিকমত ব্যবসা-বাণিজ্য বা জাহাজের খবর দিলেও এবং সংখ্যাতত্ত্বে নির্ভুল হলেও, পত্রিকাটির কোন সুচিন্তিত রাজনৈতিক মত ছিল না এবং স্থানীয় সংবাদ পরিবেশনেও বিশেষ তৎপর ছিল না।

= বেঙ্গল ক্রনিকেল =

আরও একখানা পত্রিকা ১৮২৫ সালে জন্ম নেয়, বেঙ্গল ক্রনিকেল। ক্যালকাটা জার্ণালের মত এও সরকারী কৃপাপ্রত্যাশী ছিল না, অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামেও পশ্চাৎপদ হয়নি। সংবাদ-পত্রের স্বাধীনতা হরণে এই পত্রিকার প্রতিবাদ উচ্চকিত হয়ে উঠেছিল। হরকরার বাছা বাছা লেখা এই কাগজে পুনর্মুদ্রিত হত। এই পত্রিকাটির সঙ্গে বেঙ্গল হেরাল্ড বলে আরও একখানা পত্রিকার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল।

বেঙ্গল ক্রনিকেলের সম্পাদক সাদারল্যাণ্ডের ওপরেও সরকারের কোপদৃষ্টি পতিত হয়। তবে তাঁকে বাকিংহামের মত এ দেশ ছেড়ে চলে যেতে হয় নি। কর্তৃপক্ষ তাঁকে সম্পাদক পদ থেকে অপসৃত করে, তাঁর জায়গায় মিঃ এ্যাডামসকে কাগজ চালাবার ভার দিলেন।---সাদারল্যাণ্ড অবিশ্যি লেখা বন্ধ করেন নি। এই পত্রিকাটির স্বত্বাধিকারী ছিলেন সে যুগের প্রসিদ্ধ পুস্তক ব্যবসায়ী রোজারিও সাহেব (P. S. D' Rozario)।

●

১৮২৯ সালের আগষ্ট মাসে ক্যালিডোস্কোপ (Kaleidoscope) নামক একখানা বিবিধ বিষয়ক মাসিক পত্র প্রকাশিত হয়। এই একই বছর, বেঙ্গল এ্যানুয়ালেরও প্রথম সংখ্যা ও আরও দু'খানা খৃষ্টধর্ম বিষয়ক পত্রিকা (ক্যালকাটা ক্রিশ্চিয়ান অবজার্ভার ও ক্যালকাটা ক্রিশ্চিয়ান ইনটেলিজেন্সার) বার হয়েছিল।

●

জ্ঞানান্বেষণ ও রিফর্মার নামক দু'খানা সাপ্তাহিক কাগজেরও বেশ কাটতি ছিল ভারতীয় পাঠকদের মধ্যে। এই কাগজ দু'খানি সর্বপ্রকার স্থানীয় সংবাদ পরিবেশন করত ও জনসাধারণের সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনা করত। রিফর্মার ছিল ইংরাজী কাগজ। জ্ঞানান্বেষণ ছিল Bi-lingual—অর্ধেক ইংরেজী, অর্ধেক বাংলায় লেখা দ্বিভাষী পত্রিকা।

●

বাংলা ও পারসী কাগজ

বাংলা সংবাদপত্রের ইতিহাস নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন স্বর্গত ব্রজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরো অনেকে। এর পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন না থাকলেও, মোটামুটি কয়েকখানা নামকরা বিখ্যাত পত্রিকার কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে।

বাংলা ভাষার প্রথম সংবাদপত্র 'দিগ্‌দর্শন' ১৮০০ সালে শ্রীরামপুরের মিশনারীদের উদ্যোগে প্রকাশিত হয়। সম্পাদক ছিলেন জন ক্লার্ক মার্শম্যান। পত্রিকাখানি মাসে মাসে প্রকাশিত হত। ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক, বৈজ্ঞানিক প্রভৃতি নানা বিষয়ক প্রবন্ধ এতে থাকত। এ ছাড়া ছিল দেশ-বিদেশের সমাচার। কাগজখানির উদ্দেশ্য ছিল মুখ্যত জনশিক্ষা। এর পরমায়ু অবিশ্যি বেশীদিন ছিল না। অল্পদিন চলেই বন্ধ হয়ে যায়।

এরপর মার্শম্যান সাহেব সমাচার দর্পণ বলে নতুন একখানা কাগজ বার করলেন (১৮১৪, ১০ই মে)। তদানীন্তন বড়লাট মারকুইস অব হেষ্টিংস এই পত্রিকার প্রকাশনায় যথেষ্ট উৎসাহ ও সাহায্য দান করেন। প্রথম সংখ্যায় সম্পাদকের নিকট তাঁর স্বহস্তে লিখিত চিঠিখানা ছাপা হয়েছিল। সম-সাময়িক আর একখানা পত্রিকা হচ্ছে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের বেঙ্গল গেজেট। গঙ্গাকিশোরই ধরতে গেলে প্রথম বাঙালী সম্পাদক। ১৮২১ সালে রাজা রামমোহনের কাগজ ব্রাহ্মণ সেবধি (Brahminical Magazine) প্রকাশিত হয়। এতে বস্তু যত না ছিল, তার চেয়ে বেশী ছিল উত্তাপ---জ্বালাময়ী আবেগ। কিছুদিন এটা মন্দ চলেনি; তারপর বন্ধ হয়ে যায়। এই কাগজখানির সম্বন্ধে একজন সুন্দর একটা উক্তি করেছেন:

'It's carrier was rapid, fiery, meteoric and both from want of solid substance and through excess of inflamation it soon exploded and disappeared'.

১৮২১ সালে আরও একখানা বাংলা কাগজ বার হয়েছিল,---নাম, 'সমাচার চন্দ্রিকা'; সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। সনাতন হিন্দুধর্মের সংরক্ষণকল্পে এই কাগজখানা বার করা হয়েছিল। 'সম্বাদ কৌমুদী' বলে নতুন একখানা কাগজ রামমোহনের সম্পাদনায় প্রকাশিত হল ১৮২৩ সালে, চন্দ্রিকার গোঁড়ামীর পাল্টা জবাব দেবার জন্য।

১৮২৯ খৃষ্টাব্দে মিঃ আর মার্টিন, প্রিন্স দ্বারকানাথ ও প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও রাজা রামমোহন রায়ের সমবেত প্রচেষ্টায় 'বঙ্গদূতের' প্রকাশ। জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার ও অজ্ঞতা এবং কুসংস্কারের উচ্ছেদ---এই সঙ্কল্প নিয়ে কাগজখানার জন্ম হয়েছিল। কিন্তু এটাও বেশীদিন চলেনি।

১৮৩০ সালে বাংলা ভাষায় বেশ কয়েকখানা সংবাদ ও সাময়িকপত্র কলকাতায় চলছিল। মোট ষোলখানা বাংলা পত্রিকার মধ্যে তিনখানা ছিল দৈনিক, একখানা সপ্তাহে তিনবার প্রকাশিত হত, দু'খানা ছিল অর্ধ-সাপ্তাহিক, দু'খানা পাক্ষিক ও একখানা মাসিক। এই কাগজগুলোর মোট গ্রাহক-সংখ্যা ছিল বিশ হাজারেরও বেশী।

দু'খানা পারসী কাগজও কলকাতা শহর থেকে বার হয়েছিল। দি ভকিল ১৮১৩ খৃষ্টাব্দের পয়লা জানুয়ারী ট্যাঙ্ক স্কোয়ারের (ড্যালহাউসী স্কোয়ার) টেলিগ্রাফ অফিস থেকে প্রকাশিত হয়। এটা ছিল পাক্ষিক পত্রিকা, প্রতি ইংরাজী মাসের ১লা ও ১৫ই তারিখে বার হত। কতদিন এটা চলেছিল সেটা জানা যায় না। যতদূর মনে হয়, আবির্ভাবের অনতিকালের মধ্যেই এর তিরোভাব ঘটেছিল। শামসুল আখ্‌বার নামক একটি পারসী খবরের কাগজ সম্ভবত ১৮২২ সালে প্রকাশিত হয়েছিল, ১৮২৭ সালে এটা বন্ধ হয়ে যায়। কাগজ উঠে যাবার ঠিক আগটায়, ওর শেষ সংখ্যায় সম্পাদক একটি পারসী কবিতার উদ্ধৃতি দিয়ে যে সখেদ মন্তব্য করেন, তা' সত্যিই মর্মান্তিক।

●

সরকারী সেন্সরশিপ্

১৭৯৮ সাল পর্যন্ত ভারতীয় সাময়িক পত্রিকাদিতে প্রকাশিত কোন প্রবন্ধ বা সম্পাদকীয় মন্তব্যের ওপর সরকারী কোন বিধি-নিষেধ বা নিয়ন্ত্রণ ছিল না।

তখনকার দিনে কাগজে ইচ্ছেমত সরকারী কার্যের সমালোচনা করা চলত। ইংল্যাণ্ডের ন্যায় এদেশের সাংবাদিকদেরও নিজ নিজ মত প্রকাশের স্বাধীনতা তখনও অক্ষুণ্ণ ছিল। তবে গভর্ণর জেনারল ইচ্ছে করলে যে কোন ব্যক্তির লাইসেন্স বাতিল করে দিতে পারতেন। তিনি যদি কোন পত্রিকার সম্পাদকের লেখা অবাঞ্ছিত ও জনসাধারণের মধ্যে সরকার-বিরোধী উত্তেজনা সৃষ্টি করছে বলে মনে করতেন, তবে সম্পাদকের লাইসেন্স বাতিল করে তাকে এদেশ ছাড়া করতে পারতেন। কিন্তু কাগজের প্রেস লাইসেন্স বন্ধ করবার তখন পর্যন্ত কোন আইন চালু হয়নি।

লর্ড কর্ণওয়ালিশের আমলে সরকার বিরোধী লেখার জন্য সাংবাদিক Col. Duaneকে এদেশ থেকে বহিষ্কৃত করা হয়েছিল। এরপর লর্ড ওয়েলেসলীর সময় ডাঃ ম্যাকনীলের মত একজন বিদ্বান ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তিকে সরকারী কোপে পড়ে এদেশ ছেড়ে চলে যেতে হয়। এই সময় সেন্সর আইনকে সুপ্রীম কোর্টে রেজিষ্ট্রী করবার প্রচেষ্টা চলেছিল গভর্ণর জেনারেলের তরফ থেকে, কিন্তু জজেরা তাতে সম্মতি দেন নি।

১৮১১ সালে হাউস অব কমন্সে ভারতে সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেন লর্ড হ্যামিল্টন। এ নিয়ে বেশ জোর বিতর্ক চলে। উল্লেখযোগ্য বক্তাদের মধ্যে প্রেসের স্বপক্ষে বলেন স্যার টমাস টারটন ও বিপক্ষে বক্তৃতা দেন মিঃ ডাণ্ডাস (Dundas)। স্যার টমাসের দৃপ্ত ভাষণ ভারতবাসী মাত্রেরই সোচ্চার প্রশংসা ও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা পাবার যোগ্য। স্যার টমাস বলেছিলেন---

A plant as liberty of press could never flourish on the sterile soil of despotism.

Why should you give the Indian the advantages of knowledge? You should only thereby be giving them means of detecting your own

Injustice..You have ransacked the country. You have despoiled its people, you have murdered their princes and of course for your own protection we must keep them deluded, decieved and ignorant... According to the Right Hon'ble gentleman (মিঃ ডাণ্ডাস) the people of India are considered as nothing. If such is your principle, to keep them ignorant is as much your policy as to keep them enslaved has been your crime.'

একজন সদস্য তাঁর বক্তৃতার বেশ একটি মজার যুক্তির অবতারণা করেছিলেন :

'The liberty of the press was for the preservation of freedom but as there was no freedom in India to preserve, there was no occassion for liberty of the press.'

যা হোক, লর্ড হ্যামিল্টনের প্রস্তাবের পক্ষে আঠার ও বিপক্ষে তিপ্পান্ন ভোট পড়ায়, সেটি না-মঞ্জুর হয়ে যায়।

৫

বাজারে কাগজ বার করবার আগে, লেখাগুলির একপ্রস্থ কপি গভর্ণমেণ্টের সেক্রেটারীর অনুমোদনের জন্য পাঠাতে হত। তাঁর বিবেচনায় যে সব লাইন বা প্যারাগ্রাফ আপত্তিকর ও বর্জনীয় সেগুলো কেটে বাদ দিতে বলতেন। সম্পাদকদের অনেকেই ইচ্ছে করে সে সব জায়গায় ফাঁক রেখে দিতেন বা তারকা চিহ্ন দ্বারা পূরণ করতেন, যাতে পাঠকেরা অনুমান করে নিতে পারেন, সরকারী কাঁচি কোথায় কোথায় চালানো হয়েছে।

সবচেয়ে মজার কথা এই যে, বিলাতের কাগজে যে সব লেখার ওপর আদৌ সেন্সর করা হয়নি, সেই সব লেখার উদ্ধৃতি এদেশের কাগজে ছাপবার জন্য অনেক সম্পাদককে, সরকারের কাছ থেকে সতর্কীকরণ নোটিশ পেতে হত।

১৮১৮ খৃষ্টাব্দে মার্কুইস অব হেষ্টিংস সেন্সরশিপ একরকম তুলেই দিয়েছিলেন। তাঁর আমলে সরকারের বিরুদ্ধে সমালোচনা করতে কোন বাধা ছিল না পত্রিকা সম্পাদকদের। তাঁর সময়ে সাত সাতখানা নতুন কাগজ বাজারে বেরিয়েছিল। যতদিন উনি বড়লাট ছিলেন, লেখার প্রুফ সরকারী দপ্তরে পাঠিয়ে অনুমোদন নেবার দরকার হত না।

পূর্বেই বলা হয়েছে, ক্যালকাটা জার্ণালের সম্পাদক বাকিংহাম সাহেবের বিরুদ্ধে মামলা যখন সুপ্রীম কোর্টে চলছিল, সেই সময় অর্থাৎ ১৮২৩ সালে, সেন্সার আইন সুপ্রীম কোর্টে রেজিষ্ট্রী হয় এবং বাকিংহাম ও তাঁর সহকারী আরনট দুজনই পিঠ পিঠ এদেশ থেকে বিতাড়িত হন। বাকিংহাম ও আরনটের বিতাড়নের ব্যাপার নিয়ে ১৮২৪ সালের জুলাই মাসে ইষ্ট ইণ্ডিয়া হাউসে তুমুল বাক্‌বিতণ্ডার সৃষ্টি হয়। মিঃ কিনেয়ার্ড এদেশের শাসকদের স্বেচ্ছাচার ও জবরদস্তিপনার তীব্র সমালোচনা করেন। আর একজন খ্যাতনাম সদস্য হিউম সাহেবও তাঁর বক্তৃতায় ভারত সরকারের যথেষ্ট নিন্দা করেন এবং সমসাময়িক জন বুল কাগজের ওপর সরকারী পক্ষপাতিত্ব যে কর্মচারীদের স্বার্থপ্রণোদিত সেটাও বুঝিয়ে দেন। তাঁর ভাষণ থেকেই আমরা জানতে পাই যে, সে সময় কোন কাগজে বা পত্রিকায় ছাপার জন্যে কেউ কোন লেখা বা চিঠি পাঠালে খামের পিছনে প্রেরকের নাম, ঠিকানা লিখে দিতে হত, যাতে সরকার বুঝতে পারেন কে কোন্ কাগজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। যে সময়ের কথা বলছি, তখন ভারতীয়দের মধ্যে ইংরাজী জানাশোনা লোকের সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য। কাজেই বিধানটি পুরোপুরি শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়ের উপরই প্রযোজ্য ছিল।

সেন্সর আইন পাশ হবার পর বিরুদ্ধ সমালোচনার অপরাধে কাগজের প্রকাশ বন্ধ করে দেওয়া যেত। ১৮২৭ সালে ৩১শে মে তারিখে গভর্ণমেণ্ট কাউন্সিল চেম্বারের চীফ সেক্রেটারী সি লাশিংটনের ঘোষণা অনুযায়ী ক্যালকাটা ক্রনিকেলের প্রকাশ নিষিদ্ধ হয়ে যায়।

৬

স্যার চার্লস মেটকাফ ও প্রেসের স্বাধীনতা

স্যার চার্লস মেটকাফ এদেশে শিক্ষাবিস্তার বিষয়ে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন এবং ইংরাজেরা যে নিজেদের স্বার্থে ভারতবাসীকে অজ্ঞ ও নিরক্ষর করে রাখছে, এটা তিনি কোনদিনই সমর্থন করতে পারেন নি। সংবাদপত্রে সরকারী নীতির বিরুদ্ধে সমালোচনাও তিনি উদার দৃষ্টিতে দেখতেন। গায়ের জোরে যুক্তিকে অস্বীকার করবার প্রবৃত্তি তাঁর ছিল না।

১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে যখন তিনি সুপ্রীম কাউন্সিলার নিযুক্ত হন, তখন তিনি তাঁর ভাষণে বলেছিলেন :

'Admitting that the liberty of the Press like the liberties of the subject may be suspended when the safety of the requires such a sacrifice. I cannot as a consequence acknowledge that the present instance ought to be made an exception to the usual practice of the Government; for if there was danger to the state either way, there would be more danger, I should think, in supressing the publication of opinions, than in keeping the v lve open by which bad humours might evaporate. To prevent man from thinking and feeling is impossible and I believe it to be wiser to let them give vent to their temporary anger in anonymous letters in the newspapers.. than to make that anger permanent, by forcing them to smother it within their own breasts, ever ready to burst out. It is no more necessary to take notice of such letters than it was before'.

১৮৩৫ সালে লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্কের কাছে কলকাতাবাসীরা এক মিলিত আবেদনপত্র পেশ করলেন, সংবাদপত্রের ওপর কঠোর নিয়ন্ত্রণের প্রত্যাহার দাবী জানিয়ে। কিন্তু কাউন্সিলে এই দরখাস্তের বিষয় নিয়ে কোন আলোচনা হবার পূর্বেই বেণ্টিঙ্কের কার্যকাল শেষ হওয়ায়, তিনি ইংল্যাণ্ডে প্রত্যাবর্তন করলেন। বেণ্টিঙ্ক চলে গেলে অস্থায়িভাবে মেটকাফ গভর্ণর জেনারল তথা সুপ্রীম কাউন্সিলের প্রেসিডেণ্ট নিযুক্ত হলেন। তিনি এই দরখাস্তটি বিবেচনা করে মেকলের সাহায্যে ১৮৩৫ সালের এপ্রিল মাসে ভারতে মুদ্রণ যন্ত্রের স্বাধীনতা বিলের খসড়া প্রণয়ন করে প্রকাশ করলেন।----

স্যার চার্লসের মহানুভবতায় বিমুগ্ধ কলিকাতার জনসাধারণ তাঁর প্রতি তাদের অন্তরের শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে এক অভিনন্দনপত্র দিয়েছিল। এই অভিনন্দনের প্রত্যুত্তরে মেটকাফ যা বলেছিলেন তা ছিল সত্যিই অভাবনীয়।

This address he answered.. with such freedom of utterance as must have shocked the conventional reserve and exclusiveness of Indian statesmanship.

এই ঘটনাটিকে স্মরণীয় করে রাখবার জন্য কলকাতাবাসীরা চাঁদা সংগ্রহ করে, গঙ্গার ধারে একটা নাতিবৃহৎ সৌধ নির্মাণ করলেন,—নাম দেওয়া হল মেটকাফ হল। এই হলে একটি সাধারণ পাঠাগার বা পাবলিক লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হল এবং স্যার চার্লসের একটি আবক্ষ মূর্তি সংস্থাপিত হল।

সে যুগে যে সব ইংরেজ ভারতের সত্যিকার কল্যাণ কামনা করতেন এবং যাঁদের অবদান ভারতীয় শিক্ষা ও কৃষ্টি বিস্তারে এবং ভারতবাসীদের অন্তরে দেশাত্মবোধ জাগিয়ে তুলতে সাহায্য করেছেন মেটকাফের স্থান তাঁদের মধ্যে সত্যিই খুব উচ্চে।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে স্যার চার্লস মেটকাফ একটি অবিস্মরণীয় নাম।

মস্তিষ্ক রহস্য

জীবজগতে একমাত্র মানুষেরই মাথা নিয়ে মাথাব্যথা। কেন না এর জন্য যেটুকু মগজ থাকা প্রয়োজন তা' একমাত্র মানুষেরই আছে। অথচ এই মাথা থেকে মানব সভ্যতার সব উপকরণ একে একে প্রকাশ পেলেও মাথার খোঁজ নেওয়ার কোন বিশেষ চেষ্টা ছিল না কিছুদিন আগে পর্যন্ত। মস্তিষ্ক-রহস্য উন্মোচনের চেষ্টা প্রায় সাম্প্রতিক। কিন্তু অনেক কনিষ্ঠ মানব সন্তানের মতই এর পরিপক্কতা কিঞ্চিৎ আগেভাগে ঘটেছে বলেই মনে হয়।

এই তো সেদিন ইংলণ্ড-এর বার্ডেন নিউরোলজিক্যাল ইনস্টিট্যুট-এ জনৈক গবেষকের মাথার চাঁদিতে আর্দ্র তড়িৎ দণ্ড লাগান হয়। ওগুলো প্রবাহহীন, কেবল মস্তিষ্কজাত নগণ্য বিদ্যুৎছন্দ প্রবহমান। এইসব পরিচিত 'মস্তিষ্ক-তরঙ্গ' তড়িৎ দণ্ড থেকে সংবেদনশীল যন্ত্রে পৌঁছে ছাপ রেখে যায়।

তারপর সেকেণ্ড-এ দশ থেকে কুড়িবার গবেষকের চোখে একটা উজ্জ্বল সাদা আলো জ্বলতে থাকে পর্যায়ক্রমে। যতক্ষণ না মস্তিষ্কজাত কোন প্রধান ছন্দের সঙ্গে এর মিল ঘটে ততক্ষণ অদৃশ্যভাবে আপনা হতে সংবেদনশীল যন্ত্রগুলো আলোর ছন্দ পাল্টে যায় অবিরাম।

হঠাৎ গবেষকের কেমন যেন অস্বস্তি লাগে, মাথা ঘোরে: হয়ত তাঁর চামড়া টন্‌টন্ করে ওঠে: লাফাচ্ছেন বা বন্‌বন্ করে ঘুরছেন—এমনটা মনে হওয়াও বিচিত্র নয়। রহস্যলীন দৃশ্য এবং কিম্ভূত সব রং ভাসতে থাকে চোখের সামনে। অবর্ণনীয় কোন সুখানুভূতি বা বিরক্তিতে হয়ত মন ভরে ওঠে। শেষে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে খিঁচ ধরা বা মৃগী রোগীসুলভ আক্ষেপ হওয়াও আদৌ অসম্ভব নয়। আলো নেভানোর সঙ্গে সঙ্গে আবার সব স্বাভাবিক।

কিন্তু আগের কয়েক মুহূর্তে যা' করা হল বিজ্ঞানের ইতিহাসে তা' অভূতপূর্ব। শুধু চোখেই নয়, মস্তিষ্কের গভীরেও আলো জ্বালান হয়েছিল ও সময়ে। মানুষের মগজ উত্তেজিত করে জানা গেল বহু তথ্য, অথচ কোন ক্ষতিই হ'ল না। অস্ত্রোপচারে এ-কাণ্ড যে ঘটানো যায় নি তা নয়, তবে তা খুব অল্পবারই সম্ভব হয়েছে।

তরুণ ইংরেজ শরীরতত্ত্ববিদ ডবলিউ গ্রে ওয়াল্টার-এর নেতৃত্বে মানুষের মগজ টুঁড়ে দেখা এই নতুন পদ্ধতি গড়ে উঠেছিল। উজ্জ্বল আলোর ঝলকে যে 'কাঁপা কাঁপা মূর্চ্ছনা'-র

বন্ধুবন্ধু

সৃষ্টি হয় তা' জানার ফলে বনের মধ্যে গাছের পাতার মধ্যে থরথর-কাঁপা সূর্যরশ্মিজাত যে ভ্রান্তি বা মায়া ফুটে ওঠে চোখের সামনে তার স্বরূপ বোঝা সম্ভব। এ-অবস্থা মৃগী কিম্বা তড়িৎশক্-এও হয়, কোন ক্ষতি না করে। ফলে মানসিক রোগে এবং তার চিকিৎসার ব্যাপারে চিকিৎসকরা যথেষ্ট উপকৃত হচ্ছেন। শুধু এইটুকুই নয়, শিক্ষা-পদ্ধতি, মনস্তত্ত্বর নানা ধরণ এবং সাময়িক অসুবিধা ইত্যাদি বিভিন্ন রকম ক্ষেত্রে কেঁপে ওঠা মূর্চ্ছনা কাজে লাগছে।

কিন্তু সব থেকে বড় বিস্ময় মানব মস্তিষ্কের অজানা, যবনিকার অন্তরালবর্তী অংশটুকু সম্বন্ধে কাণ্ডজ্ঞান। এতকাল মগজ সম্বন্ধে নির্দিষ্ট জানাশোনা ছিল খুবই সামান্য। শব্দ, দৃশ্য বা স্পর্শ ইত্যাদি যা মাথায় ঢোকে এবং মাংসপেশী আঙুল বা স্বরযন্ত্রে যে আদেশ এসে পৌঁছোয় সেখান থেকে এ সব সংবাদ আদান-প্রদান দেহতাত্ত্বিকরা জেনেছেন খুঁটিয়ে। কিন্তু সংবাদ পাওয়া এবং নির্দেশ আসার ফাঁকটুকুতে কী হয় তা ছিল অজানা। সত্যি বলতে কি, খুলির মধ্যে কী ঘটছে—তা জানার বিরুদ্ধে রীতিমত সংস্কারের বাধা ছিল। মানবদেহ কাটাকোটার ঢের ঢের পরেও সজীব মানুষের মস্তিষ্ক ঘেঁটে দেখা আদৌ ভাল চোখে দেখা হ'ত না। কিন্তু এখন এর ছন্দ-প্রবাহ, যা' কি না প্রকৃতপক্ষে আমাদের চিন্তা এবং মেজাজের প্রতিফলন, তার নমুনাই কেবল নেওয়া হয় নি, তাকে উত্তেজিত করা হয়েছে, পরিবর্তিত করা হয়েছে এবং পরীক্ষা করা হয়েছে খুঁটিয়ে।

যেন চিন্তার ছবি তোলা হচ্ছে। টোপোস্কোপ-এর সাহায্যে মস্তিষ্কের কুড়িটিরও বেশী জায়গার তড়িৎ অবস্থার নমুনা নিয়ে ইলেকট্রনিক নলের পরিবর্তনশীল ঔজ্জ্বল্যে আবার ধরে রাখা যাচ্ছে। ঠিক মস্তিষ্কের নানা অংশের মত করে এগুলো সজ্জিত। টোপোস্কোপ-এর ভেতর দিয়ে দেখা যেন ওপর থেকে মগজ পর্যবেক্ষণের মত। যেমন, এতে কোন শান্ত মস্তিষ্কের সামনের দিকে অন্ধকার এবং পেছন দিকে ছন্দোময় আলোর ঝলক দেখা যায়। ক্রোধান্বিত মস্তিষ্কের সব জায়গায় ক্ষীণ কল্পিত আলো এবং চোখের ওপর ফেলা আলোয় উত্তেজিত হ'লে মস্তিষ্কে দেখা যায় মোটামুটি সুসম ঔজ্জ্বল্য।

কল্পন এবং টোপোস্কোপ তা' হ'লে মানব-মস্তিষ্কর বিশেষ কী জানিয়ে দিল এবং ইঙ্গিতই বা কতটুকু দিতে পেরেছে? অবাক-করা সব খবর পেয়েছি আমরা। যেমন, নির্দিষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেছে যে, টেলিভিশনের আলোকরশ্মি যেমন কোন দৃশ্যকে ভাগ করে দেয় ঠিক তেমনিভাবে মানব মস্তিষ্কের কোন কোন অংশ অন্যান্য অংশ বিভক্ত করে। মস্তিষ্ক অপারেশনের ফলে একটু একটু করে জানা গেছে যে, মস্তিষ্কের পশ্চাদ্ভাগ দৃষ্টিশক্তি নিয়ন্ত্রণ করে। চোখের মণির পেছনের ঝিল্লীতে যে নানা ছবি গড়ে ওঠে সেগুলো ওই জায়গায় মিশে যায় এবং মস্তিষ্কের স্নায়ুগুলোর বৈদ্যুতিক নক্শার আকারে থাকে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে মগজের অন্যান্য অংশ, বিশেষ করে যে অংশে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় তা কী করে এই বৈদ্যুতিক নক্শা সম্বন্ধে অবহিত হয়। কল্পন পরীক্ষায় মনে হয় আলুফা নামে মস্তিষ্কের অন্যতম প্রধান ছন্দ (যা সেকেণ্ডে ১০ বার আসে) মোটামুটি ইংগিত দেয় যে মগজের অন্যান্য অংশ নক্শার সন্ধানে সদা তৎপর। নানা পরীক্ষা থেকে চুক্তিসংগত ভাবেই অনুমিত হয় যে, আলুফা ছন্দগুলো সমস্ত মস্তিষ্কে নক্শা হাতড়ে বেড়ায়।

কেবল আলুফাই নয়, মন্দগামী থিটাও রয়েছে। এদের গতি সেকেণ্ডে পাঁচবার মাত্র। মনে হয় এরা মস্তিষ্ক চুঁড়ে বেড়ায় আনন্দর খোঁজে, কোন সুখকর সংবাদের সন্ধানে। এগুলো খিটখিটে মেজাজের লক্ষণবাহী। তা বাপু কোন তৃপ্তিজনক খবরই যদি না মেলে, তা' হ'লে কেই বা দন্তরুচি কৌমুদী বিকিরণ করতে পারে?

ডেল্টা ছন্দও রয়েছে। সেকেণ্ডে মাত্র দু বার ওদের আনাগোনা। ঘুমোবার সময় এবং শৈশবে এদের প্রতাপ অসীম। মনে হয় এরা শুধু অসাড় করতেই পারে, চেতনা লোপ করে দেয় ডেল্টার দলা। বিশেষ করে যখন মস্তিষ্ক রিপুর অতিরিক্ত উত্তেজনার ফলে। অসুস্থ অবস্থায়, কিম্বা মস্তিষ্ক আহত হ'লে এদের তৎপরতা বেড়ে ওঠে।

এ ছাড়া ঘুমের সময় কখনও কখনও সমস্ত মস্তিষ্ক থেকে আকস্মিক বিদ্যুৎ প্রবাহ সঞ্চারিত হয়। এদের বলে কে-কমপ্লেক্স। ডেল্টার মত এগুলোও সম্ভবত মস্তিষ্ককে শব্দ, গণ্ডগোল এবং অন্যান্য উত্তেজক ব্যাপার থেকে নিরাপদ রাখে, অসাড় করে দিয়ে।

এগুলো যে কেবল মস্তিষ্কর খবর দিচ্ছে তাই নয়, এদের সাহায্যে ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্য এবং মানবিক সম্পর্কর ওপরও আলোকপাত করা সম্ভব হয়েছে। সে আলোচনা ভিন্ন প্রবন্ধের এক্তিয়ারে।

মাথা যে ব্যথা হয় নানা ব্যাপারে তা অনস্বীকার্য। কিন্তু যে বস্তুটি সব দায় বয়ে চলেছে হাজার হাজার বছর ধরে তার দায় এবার সে নিজেই সামলাতে সুরু করেছে। মস্তিষ্ক-রহস্যর যবনিকা উত্তোলিত হচ্ছে ক্রমানুয়ে। এমন দিন হয়ত খুব বেশীদূরে নয় যখন পরীক্ষা করে অনায়াসে বলে দেওয়া যাবে কারও মাথায় আলুফা, থিটা, ডেল্টা ইত্যাদিরা কেমন সক্রিয় এবং কী কাজ করলে তার সামর্থ্য অনর্থক অপচয়িত হবে না। সেই শুভদিনের আশায় রইলাম।

অকালে ভূমিষ্ঠ শিশু সমস্যা

তরুণ চট্টোপাধ্যায়

পূর্ণাঙ্গ শিশুতে পরিণত হওয়ার আগেই অর্ধগঠিত অবস্থায় যদি সন্তান ভূমিষ্ঠ হয় তাকে বাঁচানো কঠিন। আর যদি বাঁচেও তার বিকলাঙ্গ হবার সম্ভাবনা খুব বেশী। তাছাড়া ঐ ধরণের শিশুর নানারকম ব্যাধি দেখা দিতে পারে।

অনেকে বলতে পারেন যে অপরিণত শিশুকে বাঁচিয়ে রেখে লাভ কি, কারণ তাতে শুধু দুনিয়ায় বিকলাঙ্গদের বাড়বে। সমস্যাটির সুরাহা করা না গেলে অবশ্য তাঁদের কথার যৌক্তিকতা অস্বীকার করা যায় না। মানুষ গ্রহ-নক্ষত্র জয় করতে চলেছে, তার পিছনে খরচ করছে কত কোটি টাকা তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু এইসব দেন-দিন জীবনমরণের সমস্যা। কি মহাজগৎ বিজয়ের চেয়ে কম জরুরী?

বৈজ্ঞানিকরা অবশ্য বসে নেই। তাঁরা মনে অনুভব করছেন যে বিজ্ঞানের এত উন্নতি হলেও শিশু-মৃত্যুর হার গত ১০।১৫ বছর যাবৎ মোটামুটি একই আছে। তাঁরা এই সমস্যার মূলে প্রবেশ করবার চেষ্টা করছেন। শিশুর ভ্রূণের মধ্যেই নিহিত তার ভবিষ্যৎ। তাই ভ্রূণ নিয়ে গবেষণা করছেন। ১৯৪৬ সালে আচার্য আনোখিনের গবেষণাগারে মানব শিশুর একটি ভ্রূণকে পাত্রের মধ্যে জীবন্ত অবস্থায় লালন করা হয়। তারপর ইতালীর প্রখ্যাত বিজ্ঞানী দানিয়েল পেক্রুচ্চি একটি ডিম্বকোষে কৃত্রিম কৌশলে গর্ভাধান করে দুই মাস বয়েস পর্যন্ত তার পুষ্টি ও শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যবস্থা করে তাকে বাঁচিয়ে রাখেন। তখন তার ওজন হয় আড়াই গ্রাম।

ছয় মাসে ভূমিষ্ঠ হলেও শিশুকে অনেক সময় বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব যদিও গর্ভের মধ্যে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গর গঠন সবচেয়ে দ্রুততালে হয় শেষের দুই মাসে। আড়াই গ্রাম থেকে হাজার গ্রাম বা এক কিলো-গ্রাম পর্যন্ত ওজন বাড়ার যে সময় সেটি সম্পর্কে এখনো সেরকম বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়নি। অথচ সেই সময়েই ভাবী শিশুর ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হয়ে যায়।

কোনো বোতলের মধ্যে ৯ মাস ধরে ভ্রূণকে লালন পালন করা কি সম্ভব? যদি তা পারা যায় তাহলে চোখের সামনে আমরা ভ্রূণের পূর্ণাঙ্গ শিশুতে রূপান্তরিত হবার ধারাবাহিক চিত্র দেখতে পাব। গবেষণাগারে কোনো আধারের মধ্যে জরায়ুর মত পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারলে আমরা শুধু যে অবয়বের উৎপত্তি ও বিকাশ চাক্ষুষ দেখতে পাব তাই নয়, সেই সঙ্গে কিভাবে জৈব বিবর্তনের প্রত্যেকটি পর্যায়ের পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে তার জাতি-গত চরিত্র বৈশিষ্ট্যগুলি বিকশিত হয় তাও দেখতে পাব। সুতরাং মানুষের আবি-র্ভাবের আগে মাছ, উভচর ও সরীসৃপের জন্ম ও বিকাশের চিত্র, সোজা কথায় পৃথিবীতে জৈব জগতের কোটি কোটি বছরের ইতিহাস আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠবে।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিকাশের রহস্য চোখের সামনে ধরা পড়লে বহু রোগের কারণ জানা যাবে, বিশেষ করে সেই সব রোগের যেগুলি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গঠনের গণ্ডগোলের সঙ্গে জড়িত।

ভ্রূণে জৈবরাসায়নিক পরিবর্তনের প্রাধান্য নাকি গঠন ক্রিয়ার প্রাধান্য সেটা জানার জন্য ইতিমধ্যে হাঁস-মুর্গী ইত্যাদির ভ্রূণ নিয়ে পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে যে, অঙ্গবিশেষের জন্য যেসব প্রোটিনের (অ্যান্টিজেন) দরকার সে-গুলিই অঙ্গটির গঠনের আগে দেখা দেয়, অঙ্গটি গড়ে ওঠে পরে। কাজের দিক থেকে বিবেচনা করে অ্যান্টিজেন-গুলিকে তিনটি ভাগে ফেলা যেতে পারে :—(১) জাতিগত চরিত্র নির্ধারক, (২) অঙ্গবিশেষের গঠন নির্ধারক, (৩) পর্যায় বিশেষে সক্রিয়, যেগুলি ভ্রূণ সেই পর্যায় পার হয়ে গেলেই বিলুপ্ত হয়ে যায়। যেমন ধরুন মুর্গীর ভ্রূণে নলের আকারে যখন হৃৎপিণ্ডের আবির্ভাব হয় তখন একটি অ্যান্টিজেন দেখা দেয়। তারপর হৃৎপিণ্ডে যখন চারটি কামরায় ভাগ হয়ে পূর্ণাঙ্গ রূপ নেয় তখন ঐ অ্যান্টিজেনটি গঠন নির্ধারক অ্যান্টিজেনের জন্য জায়গা ছেড়ে দিয়ে নিজে মিলিয়ে যায়। এইসব তথ্যের সাহায্যে আমরা অ্যান্টি-জেনগুলির জৈব ভূমিকা জানতে পারি। কোনো এক গবেষক, মুর্গীর ভ্রূণের ঝিল্লীর উপর জোয়ান মুর্গীর প্লীহার কিছু কোষ লাগিয়ে দেন। ঝিল্লী ও কোষ-গুলির মাঝখানে এমন ফিল্টার দিয়ে দেওয়া হয় যা অ্যান্টিজেন ছাড়া অন্য কিছুর পক্ষে অতিগম্য নয়। পরে দেখা গেল ভ্রূণের প্লীহা ৬ গুণ বড় হয়ে গিয়েছে। গঠন নির্ধারক অ্যান্টি-জেনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা তিনি এই-ভাবে প্রমাণ করেছেন।

ভ্রূণের বিপাকক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণ করে অবয়ব গঠন আয়ত্তে আনা যায় কি না,

এটা পরীক্ষা করা হচ্ছে। যেমন ধরুন—যকৃৎ রোগীর যকৃতে মৃত্যুমুখী কোষগুলির ক্ষতিপূরণের জন্য সুস্থ লোকের যকৃৎ-সারের সাহায্যে বাকি কর্মঠ কোষগুলির সংখ্যা বাড়িয়ে দেওয়া যায় কি না, এই নিয়ে বিজ্ঞানীরা কাজ করছেন।

ভ্রূণের অবয়ব ও জাতিগত চরিত্র বিকাশের সময়ে মায়ের সঙ্গে তার সম্পর্ক নিয়ে বিজ্ঞানীরা নানা পরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছেন। এটা জানা গিয়েছে যে গর্ভবতী অবস্থায় মায়ের দেহের কোনো ক্ষতি হলে ভ্রূণ সেই ক্ষতির কিছুটা পূরণ করে। গর্ভে ভ্রূণ থাকার অবস্থায় একটি ইঁদুরের একদিকের ফুসফুস কেটে বাদ দেওয়া হয়। পরে দেখা গেল যে ভ্রূণের ফুসফুসের আয়তন দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছে। এই ব্যাপার থেকে শল্য-চিকিৎসকরা বুঝতে পেরেছেন যে গর্ভবতী অবস্থায় কোনরকম অস্ত্রোপচার করার আগে ভ্রূণের উপর তার কী প্রভাব হতে পারে, তার কোনো অঙ্গের গঠন অস্বাভাবিক দাড়াতে পারে কিনা সেটা আগে বিচার করে দেখতে হবে।

অন্তর্মৃত সন্তান প্রসব, বন্ধ্যাত্ব ইত্যাদি রোগের এক অন্যতম কারণ হচ্ছে মা ও ভ্রূণের টিস্যু ও অবয়বের মধ্যে অসামঞ্জস্য এবং রক্তের গঠনের অমিল। পরীক্ষা থেকে জানা গিয়েছে যে, যে সমস্ত অ্যান্টিজেন এই সব অসামঞ্জস্যের জন্য সেগুলির আগে ভ্রূণের ঝিল্লীর মধ্যে উদয় হয় এবং সেখান থেকে সেগুলি ভ্রূণের মধ্যে হানা দেয়। সেই সঙ্গে ঝিল্লীতে সেই অ্যান্টিজেনগুলির নাশক অ্যান্টিবডিও তৈরী হয়যেগুলির পাঁচিল ভেদ করে অ্যান্টিজেন-গুলি ভ্রূণের মধ্যে প্রবেশ করে। বাইরে থেকে ভ্রূণ ঝিল্লীতে নাশক অ্যান্টিবডির পরিমাণ বাড়িয়ে এক অ্যান্টিজেন প্রতিরোধী দুর্গ-প্রাকার নির্মাণ করা যায় কি না বাঁদরের ভ্রূণের উপর সেই পরীক্ষা করা হচ্ছে।

মা ও ভ্রূণের রক্তের ও টিস্যুর গঠনের মধ্যে উল্লেখিত পার্থক্য থাকলে ভমিষ্ঠ হবার বহু আগে থেকে জরায়ুর মধ্যে শিশুর অবস্থা খারাপ হতে থাকে। এইসব ক্ষেত্রে গর্ভাধানের পর ভ্রূণকে যদি বাইরে এনে বোতলে লালন করতে পারা যায় তাহলে ৯ মাস পরে মায়ের কোলে সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান শিশু তুলে দেওয়া সম্ভব হবে। এই কাজের গবেষণার জন্য তিন রকম যন্ত্র-কৌশল উদ্ভাবিত হয়েছে:— ডাঃ পেক্রচ্চির জৈব লালনাধার ডাঃ আনানিয়েভের 'কৃত্রিম জরায়ু' এবং ডাঃ নাদিরাশ্‌য়েভিলির, "কৃত্রিম ফুল।" এই সঙ্গে এক কৃত্রিম রক্তেরও সৃষ্টি হয়েছে। সুইডেনে, ওয়েস্টিন, নিয়েবের্গ ও এঙ্গানিং নামে তিনজন বৈজ্ঞানিক এই সব যন্ত্র ব্যবহার করে ৪।৫ মাস বয়েসের ভ্রূণকে কৃত্রিম রক্ত সঞ্চালনের দ্বারা কয়েক ঘণ্টা বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছেন। ক্যানেডিয়্যান বৈজ্ঞানিক আচার্য ক্যালাধ্যান প্ল্যাষ্টিকের বোতলের মধ্যে মেষ ভ্রূণকে পূর্ণাবয়ব জীবে পরিণত করেছেন। সোভিয়েট জর্জিয়ায় আচার্য আনোখিনের গবেষণাগারে ৫০০ থেকে হাজার গ্রাম পর্যন্ত ওজনের ভ্রূণ লালন করবার জন্য কৃত্রিম ফুল তৈরি করা হয়েছে।

রোগগ্রস্ত বা জখম হওয়া ভ্রূণ

(১৬১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

● ভ্রূণ লালনাধারে খরগোসের ভ্রূণ পরীক্ষা করা হচ্ছে

তিনটি যুবকের কোকাকোলা পান

উমা দেবী

আট নম্বর রুটে যখন মোড় নেয় আটের বি বাস
তখন মাণিকতলা পিছনে ফেলে দক্ষিণে ছুটতে ছুটতে চলে
গজরাতে থাকে ধামসাতে থাকে চারদিকের যানবাহনের সমুদ্র,
যখন লাল-সবুজ-হলদে আলোর ধ্রুব-ইশারায় ইঙ্গিতে
তরঙ্গের পর তরঙ্গ আসে,
জনসংঘের ওঠা আর নামায়—
যখন সতর্কে কোমরে কোমর ঠেকিয়ে নাচের ভঙ্গিতে
নামতে থাকে যাত্রীরা ইস্ক্রুপের প্যাঁচের মতন ঘুরে ফিরে
গাড়ীর পা-দানি থেকে পথে,
পথ থেকে ফুটপাথে,—
আর সেই ফুটপাথে নিশ্চিন্ত হয়ে তখনো
তিনটি যুবক কোকাকোলা পান করে।

তিনটি যুবক কোকাকোলা পান করছে।
তাদের কালো রঙের ড্রেনপাইপ প্যাণ্ট
সুঠাম জঙ্ঘা ঘিরে ঢিলে হয়ে উঠেছে কোমরের দিকে,
সেখানে নাইলনের সুতোবোনা একটু শিথিল কোমরবন্ধে
মুক্তো-রঙ প্ল্যাসটিকের আঁটনীতে ঘষা ঝিনুকের জৌলুষ,
তাদের ঘি-রঙা গোলাপি-ডোরা-কাটা শার্টের হাতা
কনুই থেকে খানিকটা চিরে এসে
ভারি হয়ে ঝুলে নেমে এসেছে—
তিনটি যুবক করছে কোকাকোলা পান—
দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে।

তাদের ফাঁপানো চুল দুটি তিনটি তরঙ্গে
ভেঙে পড়েছে কানের পিছনে।
তিন জনের হাতে তিনটি লাল-পাথরের আংটি
সিগারেটের মুখে আগুনের সঙ্গে জ্বলছে।

তাদের রোদে-পোড়া তামাটে রঙে
সুর্বগন্ধি দক্ষিণের ইঙ্গিত,
চশমাহীন তাদের চোখে
কুচকুচে কালো-তারার অপাঙ্গভঙ্গি
স্থির অথচ তির্যক।

তারা কোকাকোলা পান করছে
ধীরে ধীরে—পাইপ দিয়ে—
গলনালীতে তাদের মৃদু কম্পন শুধু।

এদিকে ডানদিকের কষা মাংসের দোকানে
ভিড় জমিয়েছে সিনেমাফেরত তরুণ-তরুণী,
আর বাঁ দিকের ডাক্তারখানায়
বড় বড় লাল-রঙা ক্রশ-দাগা কাঁচের ওধারে
বসে আছে সার সার রোগিণীর দল।
তাদের চোখ নীরক্ত, অধর বিরস আর আঙুল শিরাময়।

জ্বলছে নিভছে নিওন আলোর বিজ্ঞাপন;
আর তারই সামনে পান-লিমনেডের দোকানের কাছে
তিনটি যুবক করছে কোকাকোলা পান।
আর কীই বা করতে পারে ওরা!

দক্ষিণে ও বামে কষা মাংস আর ডাক্তারখানার মাঝখানে,
আর সম্মুখে দাঁড়িয়ে
কোমরে কোমর ঠেকিয়ে নাচের ভঙ্গিতে
নামছে যখন ট্রামবাস-আরোহীর দল—
ইস্ক্রুপের প্যাঁচের মতন গলে গলে।

কীই বা করতে পারে ওরা—ঐ তিনটি যুবক—
যাদের সামনে কলেজের দরোজা বন্ধ,
বন্ধ আপিসের দরোজা,—

যাদের বান্ধবী নেই ড্রয়িংরুমের ফিকে বেগুনি দেয়ালের ধারে
তোতা-পাখির মতন বসে,
যাদের অন্নে নেই ঘৃত আর সব্জিতে নেই মাছ,
যাদের বৈকালীন দাঁড়াবার জায়গা ফুটপাথ—
দৃষ্টির বিলাস যান-বাহনের স্টপেজে দাঁড়িয়ে থাকা অপেক্ষাকারিণী
ওরা ঐ তিনটি যুবক তাই কোকাকোলা পান করে।
ঘন খয়েরি রঙের ঠাণ্ডা পানীয়
ধীরে ধীরে বড় ধীরে নিঃশেষ হয়ে যায়—
ওদের ড্রেনপাইপ প্যাণ্ট আর
কনুইয়ের কাছে কাটা জামার ঝোলানের হাতার বাহার,
ওরা ফুটপাথের আসর জমিয়ে—
ঐ তিনটি যুবক কোকাকোলা পান করে—
পায়ের ওপর পা রেখে
তিনজনে তিন মুখো হয়ে।

ওদের দৃষ্টিভঙ্গী তির্যক কিন্তু স্থির,
গলনালী কম্পিত—
ওদের নাইলনের কোমরবন্ধনীর আঁটনীতে ঝলকায়
প্ল্যাসটিকের ঘষা মুক্তোর জৌলুষ।

(বড় গল্প)

কালপুরুষ

অলকানন্দা---নামটা দেখেই মনে হয় বেশ সৌখীন সে বাড়ীর অধিবাসীরা। বাস্তবিকপক্ষে তাই। বিরাট কম্পাউণ্ডওয়ালা দোতলা বাড়ী। সামনে তিন ফুট উঁচু পাঁচিল-ঘেরা ফুল-বাগান। মাঝখানে লাল সুরকির রাস্তা। গেটে দুই স্তম্ভশীর্ষে দুই পশুরাজের ক্ষুধ মূর্তি।

বাড়ীর বনেদিয়ানাটুকু এখনও কিছু কিছু বজায় আছে, চালচলনে সে-ভাবটা ধরা পড়ে। বর্তমান স্বত্বাধিকারী অহীন্দ্র সেনের নিজস্ব আরও কতকগুলি গুণে তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয় হতেপেরে-ছিলেন। ছোট-বড় সবার সঙ্গে তিনি সহানুভূতির সঙ্গে কথাবার্তা বলতেন, অনেকের বিপদে-আপদে একলা সাধ্যাতিরিক্ত করতেন।

অহীন্দ্রের সব চাইতে ঘনিষ্ঠতা ছিল স্থানীয় ডাক্তার নীরদ দাশগুপ্তের সঙ্গে, যদিও বয়সে অহীন্দ্র বেশ কিছু ছোট ছিলেন। যেদিন তাঁর বাড়ীতে ভাল লাগত না, সেদিন তিনি বেরিয়ে পড়তেন; হাঁটতে হাঁটতে ভাগীরথীর তীর ধরে অনেক দূর পর্যন্ত চলে যেতেন। পরিচিত কেউ পথে দেখা হলে হাত তুলে নমস্কার করত---কর্তামশায়, এধারে? কতদূর যাবেন?

প্রতি-নমস্কার করে অহীন্দ্রবাবু হেসে উত্তর দিতেন---কোথায় আর যাব। দেখি, নীরদ ডাক্তারের ওখানে একটু বসব মনে করছি।

---নদীর ধার দিয়ে কেন? লোকটি হয়ত বিস্মিত হত।

দাঁড়িয়ে পড়তেন অহীন্দ্রবাবু---কেন, দোষ আছে কিছু?

জিভ কেটে লোকটি বলত---কি যে বলেন হুজুর।---এ জমি-জায়গা অর্ধেকই তো আপনার। যেখান দিয়ে খুসী, যখন খুসী আপনি যাবেন---কার ঘাড়ে ক'টা মাথা আছে আপনার দোষ দেখবে তাতে?

বলবার ধরণে অহীন্দ্রবাবু না হেসে থাকতে পারতেন না। বলতেন---তাই নাকি? ও, আচ্ছা। তারপর তিনি এগোতেন নিজের পথ ধরে।

সেদিনও বিকেলে তিনি এমনই চলেছেন নদীর ধার দিয়ে---একটু চিন্তিত, বিমর্ষ। পথে গোপালের সঙ্গে দেখা হতেই শুধালেন তাকে---তোদের পাড়ার নবনের ছেলেটা কেমন আছে রে?

---আজ্ঞে, সেই রকমই তো শুনেছি। অহীন্দ্রবাবু অতঃপর চিন্তিত মুখে এগোতে থাকেন।

গোপালও ধীরে ধীরে তার গন্তব্যপথে চলতে লাগল বিপরীত দিকে।

নবনে ওরফে নবীন অহীন্দ্রবাবুর ভাগীরথীর তীরবর্তী বিস্তীর্ণ জমিজমা দেখাশুনা করে। গত দু-দিন ধরে সে কাজে না-আসায় অহীন্দ্রবাবুর সন্দেহ হওয়াতে তার বাড়ীতে লোক পাঠিয়ে জানতে পারেন, তার ছেলের খুব জ্বর। সেইজন্যে সে কাজে আসতে পারে নি। আজ সকালবেলা তাঁর প্রেরিত লোকের সামনে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠে নবীন বলেছে---কত্তাবাবুকে একবার বোলো। ছেলে আমার বোধহয় এ-যাত্রা আর---

বাকীটা আর শেষ করতে পারে নি নবীন, গলার স্বর রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল।

অহীন্দ্রবাবুর মনটা এ-খবর পেয়ে একান্তভাবেই বিষণ্ণ হয়েছিল, তাই বিকেল না-হতেই তিনি বেরিয়ে পড়েছেন ডাক্তার নীরদবাবুর উদ্দেশে। নীরদবাবু আবার সন্ধ্যের একটু আগে ছাড়া আসেন না। সুতরাং তাঁকে এই ঘোরা-পথে এসে সময়টার একটু বৃথা অপব্যয় করতে হয়েছে।

নীরদবাবু অহীন্দ্রবাবুরই সতীর্থ বলা চলে। কিছুদিন একসঙ্গে ডাক্তারীও পড়েছিলেন। অহীন্দ্রবাবু ডাক্তার হতে পারেন নি, কারণ হঠাৎ তাঁর বাবা মারা যাওয়াতে সংসারের সকল দায়িত্ব তাঁর উপর এসে পড়ে। তবু দু'জনের অন্তরঙ্গতায় মোটেই ভাঁটা পড়ে নি সেজন্য। বরং তারপর থেকেই এ বাড়ীতে চিকিৎসার ক্ষেত্র বিস্তৃত হয়েছে নীরদ-বাবুর। ফল দাঁড়িয়েছে এই যে, অহীন্দ্রবাবুর কোন কথা তিনি আর ঠেলতে পারেন না---এমনই একটা স্নেহের আর নিকট-আত্মীয়তার বন্ধন যেন নীরদবাবুকে জড়িয়েছে ঐ পরিবারের প্রতিটি লোকের সঙ্গে---এমন কি অহীন্দ্রবাবুকে কেন্দ্র করে যারা আবর্তিত হচ্ছে, অলক্ষ্যে এবং অজানিতে তাদের সঙ্গেও তাঁর যেন এক অদৃশ্য বন্ধন রচিত হয়ে গেছে।

অহীন্দ্রবাবুর সঙ্গে তাই তাঁর কোনরকম আলাপ-আলোচনা বাদ যায় না। সুখ-দুঃখের কথাও হয়। এখানে বসেই অহীন্দ্রবাবু নীরদবাবুর মুখে শুনেছেন নিজের পিতার মৃত্যুকালীন চিকিৎসা-বিড়ম্বনার ইতিহাস। সে প্রায় বছর কুড়ি আগের কথা। নীরদবাবু আবার শুনেছেন তাঁর মায়ের মুখে। এদিকে তখন ভাল ডাক্তারও ছিল না, ওষুধ তো নয়ই। ভাল ডাক্তার যত সব ভিড় জমাত শহর কলকাতায়। কিন্তু রোগটা তো আর রাজধানীর মুখ চেয়ে বেছে বেছে হানা দিত না। ফল যা হবার তাই হত---পয়সা থাকলেও সকলের পক্ষে চিকিৎসার সুযোগ মিলত না। তবে, ---বলতেন নীরদবাবু,---তোমার বাবার বেলায় তা হয় নি। তোমার বাবার হয়েছিল ষ্ট্র্যাংগুলেটেড হার্ণিয়া। তখনই কলকাতায় নিয়ে যেতে হবে। হলও তাই। ট্যাক্সি করে কলকাতায় নিয়ে যেতে হয়েছিল তাঁকে।

কলকাতায় নিয়ে এসে দেওয়া হল মেডিকেল কলেজে ভর্তি করে। আমার বাবার এক জানাশোনা প্রফেসর ছিলেন বলে ঝামেলা বেশী পোয়াতে হয় নি; না হলে হয়ত 'ইমার্জেন্সী' নামক পরপারের যে শর্ট-কাটটি রয়েছে, সেখান থেকেই রিক্তহাতে ফিরতে হত।

নীরদবাবু বলতেন---তখনই অপারেশন হল। বাবা সেদিন রইলেন কলকাতাতেই। বিকেলের দিকে রোগীর জ্ঞান হলে বাবাকে বললেন---এত সব ঝামেলা কেন করতে গেলে ভাই একটা স্তিমিত দীপের জন্যে?

হেসে নাকি বলেছিলেন আমার বাবা---দীপের প্রয়োজনীয়তা তো দীপ নিজে বোঝে না।

---এই কথা। হার মানলাম। যাক, টাকা-পয়সার কোন অসুবিধা হচ্ছে না তো?

---কিছুমাত্র না।

কিন্তু, বাবা বলেছিলেন, অসুবিধাটা যখন সত্যিই ঘটল, তখন আর কূল পাওয়া গেল না। ঘাটের কাছে এসেই তরী ডুবল। বাড়ী আসার দিন সাত-আট পর হঠাৎ জোর করে উঠতে গিয়েই সম্ভবত খাট থেকে গড়িয়ে পড়ে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে হার্ট-ফেল করেন তোমার বাবা।

অহীন্দ্রবাবু এবার ভাগীরথীর তীর ছেড়ে ডাক্তারখানামুখো পথ ধরলেন। ডাক্তার আসবার সময় হয়ে এসেছে। নবীনের ছেলেটাকে দেখাতে হবে। যদি হয় আজই। খরচপত্র সব তাঁর।

প্রসে... নেন, ডাক্তার তাঁর পৌঁছানোর আগেই এসে গেছেন আজ। শুধালেন তিনি---কি ডাক্তার, আজ এত সকাল-সকাল?

---একটা 'কল্' আছে ভাই, একটু দূরে যেতে হবে, তাই। তোমার কি খবর? মাঝে ক'দিন আসনি যে।

---আমিও তো একটা 'কল্' দিতে এসেছিলাম।

---কেন---কেন? তোমার আবার কি হল?

---আমার নয়, আমাদের বাড়ীতেও নয়। আমাদের নবীনকে হয়ত দেখেছ। ঐ যে ভৈরব-নগরের মোড়লদের বাড়ীর নবীন, তারই ছেলেটার আজ দু-দিন যাবৎ জ্বর। যদি দেখে আসতে একটু---বলে ডাক্তারের মুখের দিকে সাগ্রহে চেয়ে রইলেন।

ডাক্তার কি যেন একটা লিখছিলেন, মুখ না তুলেই উত্তর দিলেন---কিন্তু ভাই, আজ তো মাফ করতে হচ্ছে। ন'কড়ি আগাম কি দিয়ে গেছে; তার ওখানে আগে আমাকে যেতেই হবে। তারপর যদি সময় পাই, তবে যাব নবীনের ছেলেকে দেখতে। না যদি পাই, কাল সকালে অবশ্যই যাব---কেমন? ডাক্তার মুখ তুলে তাকালেন।

অহীন্দ্রের কাছ থেকে কোন জবাব এল না দেখে, ডাক্তার আবার লেখায় মন দিলেন। অহীন্দ্র সেই দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে ভাবতে লাগলেন---নীরদ তো কই এমন ছিল না আগে। ওঁর অনুরোধ কোনদিন যে ফিরিয়ে দিয়েছে, তা ওঁর মনে পড়ে না। হ্যাঁ, তিনি শুনে আসছিলেন বটে যে, আজকের ডাঃ দাশগুপ্ত আর সে নীরদ দাশগুপ্ত নেই। পসার এখন তার পর্বতপ্রমাণ, খ্যাতি তার বিপুলকায়। লক্ষ্মীঠাকরুণ দু' হাত উপুড় করে ঢেলে দিয়েছেন তার ঘরে। যশ, খ্যাতি, অর্থ, অহঙ্কার---সমানভাবে পাল্লা দিয়ে চলেছে ডাঃ দাশগুপ্তের জীবনে।

অহীন্দ্রবাবু আর কোন কথা বললেন না। খানিক পরে ডাক্তার উঠলেন, বললেন---তা হলে এবার উঠতে হয়, কি বলো?

অহীন্দ্রবাবুর মন তখন এক অব্যক্ত বেদনায় টন্‌টন্ করছে। এতবড় পরাজয় যেন তাঁর একেবারেই অপ্রত্যাশিত। এত প্রচণ্ড আঘাত এমন অন্তরঙ্গ বন্ধুর কাছ থেকে তিনি ধারণাই করতে পারেন নি। প্রত্যাঘাত হানার সঙ্কল্পে তিনিও যেন অকস্মাৎ কঠোর হয়ে উঠলেন। দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে তিনি শুধালেন---কত কি পেলে তুমি যেতে পারো ডাক্তার?

সম্বোধনের নূতনত্বটা প্রথমেই কানে বাজল ডাক্তারের। এতদিনকার ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের কি এই পরিণাম? বিস্মিত হয়ে শুধালেন তিনি: কি বলছ তুমি, অহীন!

অহীন্দ্র তখন কম্পিতস্বরে বলে ফেললেন, যা বলছি, তা তুমি বেশ বুঝতে পেরেছ। যাক, তোমার যেয়ে কাজ নেই; যেখান থেকে আগাম কি নিয়েছ সেখানেই যাও তুমি।---বলে উত্তরের অপেক্ষা না করে দ্রুতবেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। ডাক্তার খানিকক্ষণ সেদিকে চেয়ে থেকে ডাক্তারখানা বন্ধ করে মোটর বাইকে চেপে বসলেন---ন'কড়ির 'কলে' যাবেন।

অহীন্দ্রবাবু সেদিনই সন্ধ্যের গাড়ীতে সহরে চলে যান এবং পরদিন সকালে ডাক্তার সঙ্গে নিয়ে একেবারে গিয়ে ওঠেন নবীনের বাড়ীতে। বেলা তখন প্রায় আটটা।

ডাক্তার রোগী দেখা সারা করে কি নিয়ে চলে গেলেন,---আশা-ভরসা দিতে পারলেন না; বললেন---বড় দেরী করে ফেলেছেন। আর দু-একদিন আগে হলে হয়ত এ-যাত্রা রক্ষা পেতে পারত। দেখুন, এখন ভগবানের হাত।

ডাক্তার চলে গেলেন। অহীন্দ্রবাবু শুধু একবার নবীনের মুখের দিকে তাকালেন। তারপর চীৎকার করে বলে উঠলেন---হতভাগা কোথাকার! ছেলেটার যে এমনধারা একটা কঠিন অসুখ, তা আমাকে একবার খবর দিতে তো!

উচ্ছ্বসিত কান্নায় ভেঙে পড়ে নবীন প্রায় আছড়িয়ে পড়ল অহীন্দ্রবাবুর পায়ের উপর, বলল---বুঝতে পারি নি, বাবু। দরগার ফকির সাহেবের 'জল-পড়া' দু'তিনদিন খাইয়ে কিছুতেই কম পড়ল না, ভাবছিলাম আপনার কাছে যাব, এমন সময় আপনি-ই তো লোক পাঠালেন। তা ছাড়া, ডাক্তারের অত টাকা কোথায় পাব?

হাত ধরে তাকে উঠিয়ে দাঁড় করিয়ে দিয়ে অহীন্দ্রবাবু বললেন---কোথায় পাব? কেন, আমরা কি মরে গেছি? না কি তোর ছেলের বিষয়ে কোন কথা বলবার অধিকার নেই?---গলার স্বরটা শেষের দিকে কেমন যেন ভারী হয়ে এল।

ধীর-গম্ভীর পদক্ষেপে অহীন্দ্রবাবু বেরিয়ে গেলেন।

সেইদিনই দুপুরবেলার কিছু পরেই, সশব্দে তাঁর বাড়ীর সদর দরজার কড়া নড়ে উঠল। চাকর দরজা খুলে দিতেই ডাঃ নীরদ দাশগুপ্ত শুধালেন---বাবু কোথায়?

---দোতলায়। আপনি যাবেন?

---বলো, ডাঃ দাশগুপ্ত এসেছেন।

দুপুরের কাছাকাছি সময়ে, আগের দিনের কথামত, ডাঃ নীরদ দাশগুপ্ত নবীনের ছেলেকে দেখতে গিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁকে আর রোগী দেখতে হয় নি, রোগীর নিশ্চল দেহখানা দেখেই তিনি ফিরে এসেছিলেন। আর ফেরবার পথে ভাবছিলেন---একঢিলে দুই পাখী মারবেন। খবরটাও দেওয়া হবে, কালকের অপ্রীতিকর বোঝাটাকেও প্রীতিপূর্ণ করে নেওয়া যাবে এই ফাঁকে; তাই নেমে পড়েছিলেন অহীন্দ্রবাবুর বাড়ীর সামনে।

খবর পৌঁছানোমাত্রই অহীন্দ্রবাবু আসতে বলে দিলেন উপরে।

লোকটা চলে যাবার পর তিনি সিন্দুক খুলে মুহূর্তের জন্য কি ভাবলেন, তারপর চক্ষের নিমেষে ক্যাশবাক্সে হাত দিয়ে, হাতের মাথায় যা উঠে এল, তাই মুঠোর মধ্যে লুকিয়ে নিয়ে চলে এলেন।

ডাঃ দাশগুপ্ত এসে বসতেই তিনি শুধালেন---অসময়ে যে ডাক্তার?

ডাক্তার বুঝলেন---অহীন্দ্রের বিরূপতা আজও তেমনি রয়েছে। কিন্তু একে অসময়, তাতে আবার তাঁর স্নানাহার হয় নি এ-পর্যন্ত, তাই কোনরকম ভূমিকা না করেই তিনি বলে ফেললেন---নবীনের ছেলেকে দেখতে গিয়েছিলাম, কিন্তু---

---বেঁচে নেই, এই তো? এ আমি জানতাম। সকালেই টের পেয়েছি যে, এ ছেলে বাঁচবে না। যাক্।---ধরো,---বলে ডাক্তারের দিকে এগিয়ে ধরলেন দু'খানা দশ টাকার নোট।

----এ কি অহীন্দ্র! অসীম বিস্ময়ান্বিত কণ্ঠে ডাক্তার বললেন---এইজন্যে কি আমি এসেছি? তারপরই হঠাৎ নিম্নস্বরে বললেন---আজ এতদিন পর সত্যি তুমি আমার অপমানের চূড়ান্ত করলে ---বেশ, ভালোই করলে। মনে থাকবে।

অহীন্দ্রের মনটা তখন ব্যথাতুর হয়ে এসেছে নবীনের খবর শুনে। মাথার মধ্যে খালি একটা কথাই ঘুরছে তাঁর তখন---কেন, দু-দিন আগে তিনি তার ছেলের অসুখের খবরটা পান নি! সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ল অনুপস্থিত নবীনের উপর, আর তার বিকৃত রূপের বহ্নিজ্বালাটুকু গিয়ে স্পর্শ করল ডাক্তারকে।

ডাক্তারের মন্তব্যে তাঁর মনটা ক্ষোভে, দুঃখে যেন আরও জ্বলে উঠল; তবু তিনি শান্তকণ্ঠে বললেন---অপমান করি নি ডাক্তার, অপমানের খেসারত দিলাম। ---নাও, ধরো।

ডাক্তার নিঃশব্দে উঠে পড়লেন।

অহীন্দ্র এবার দ্বিগুণ বিরক্তি সহকারে নোট দু'খানা দলা পাকিয়ে ছুঁড়ে দিলেন ডাক্তারের দিকে। ডাক্তার সেদিকে না তাকিয়ে তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে এলেন। পিছন দিকের জানালা দিয়ে এলোমেলো বাতাস এসে নোট দুখানাকে কখনও দেয়ালের কিনারা ঘেঁষে নিয়ে যাচ্ছে, কখনও-বা ডাইনে-বাঁয়ে চালিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। অপলকদৃষ্টিতে সেদিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থাকবার পর অহীন্দ্রবাবু একবার অকারণেই হেসে উঠলেন। তারপর ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলেন, প্রায় চারটে বাজে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি উঠে পড়লেন। নোট দুখানা কুড়িয়ে নিয়ে রাখলেন বালিশের তলায়।

নবীনের বাড়ী যাবার জন্যে তৈরী হয়ে নিলেন, বালিশের তলা থেকে নোট দুখানা বের করে পকেটে রাখলেন। তারপর বেরিয়ে পড়লেন। পথে যেতে-যেতে তাঁর কত কথা মনে পড়তে লাগল। নীরদ ডাক্তারের ব্যবহার সবচেয়ে বেশী ব্যথা দিয়েছে তাঁকে। গতকাল ও যদি ছেলেটাকে দেখতে যেত, হয়ত বেঁচে যেত ছেলেটা এ-যাত্রায়। বন্ধুত্বের কোন খাতিরই সে করে নি, পরিচয়ের কোন মূল্যই সে দেয় নি, ঘনিষ্ঠতার কোন মর্যাদাও সে রাখে নি। ন'কড়ির অর্থ-সম্পদই তার কর্তব্যের ইঙ্গিত দিয়েছে। অহীন্দ্রের অনুরোধ-কান্নাকড়ির

মূল্য বহন করেছে। আলসার হাতছানি আন্তরিকতাকে উপহাস করেছে।

পথ চলতে-চলতেই তিনি মনে-মনে স্থির করলেন—যে দেশে ডাক্তারের বিপুল খ্যাতি সহায়-সম্পদহীন দরিদ্র-সন্তানের মৃত্যুর পথ সুগম করে দেয়, যেখানে অর্থই চিকিৎসকের পক্ষে মানুষের সেবার পথটিকে রুদ্ধ করে দাঁড়ায়, সেইখান থেকেই সুরু করতে হবে তাঁর কাজ। তাঁর ছেলেকে তিনি ডাক্তারী পড়াবেন। কিন্তু অর্থ তার পায়ে যেন শিকল এঁটে তার চিকিৎসক-জীবনের গতিপথ কণ্টকিত না করে, তা তিনি অবশ্যই দেখবেন।

নবীনের বাড়ী পৌঁছেই তিনি দেখতে পান—শ্মশানযাত্রীর দল তৈরি। নবীনকে একান্তে ডেকে নিয়ে তার হাতে নোট দুখানা গুঁজে দিয়ে বললেন—ধর, এ টাকা আর ঘরে নিতে নেই।

হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠে নবীন বলল—এখন আমি টাকা নিয়ে কি করব কর্তা! যার জন্যে প্রয়োজন ছিল, সেই-ই তো চলে গেল।

কর্তা তখন অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন—তবু রেখে দে। ঘরে নেয় না ও-টাকা।

অনেক রাত্রে শ্মশানযাত্রীর দল ফিরে এলে পর অহীন্দ্রবাবু সেদিন বাড়ী এসেছিলেন।

সেদিন দুপুর বেলার ঘটনার পর থেকেই দুই বন্ধুর মধ্যে ব্যবধান দীর্ঘতর হতে থাকে। যে-লজ্জা দুজনের মনে অবসরসময়ে চিন্তার ফলে গভীরভাবে মুদ্রিত হয়েছিল, সেটাকে কেউই কাটিয়ে উঠতে পারেন নি; ফলে, লজ্জা আরও নিবিড় হতে হতে এক সময়ে উভয়ের বাক্যালাপ পর্যন্ত প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

এ সব অনেকদিন আগেকার কথা হলেও অহীন্দ্রবাবুর একমাত্র ছেলে অনুপমের ডাক্তারী পড়ার পিছনের ভূমিকাটুকু সেদিনই অহীন্দ্রের মানসলোক থেকে নেমে এসে কঠোর সঙ্কল্পের মৃত্তিকাভূমি স্পর্শ করেছিল।

অনুপম এদেশে ডাক্তারী পড়ার শেষ ধাপটা পেরোবার আগেই অহীন্দ্রবাবুর ডাক এসে যায় পরপারের। তিনি চোখ বুজে সেই ডাকে সাড়া দিলেন। মরণের আগে একবার দেখতে চেয়েছিলেন নীরদ দাশগুপ্তকে—পেতে চেয়েছিলেন বুক ভরে অন্তরঙ্গতার ভুলে যাওয়া স্বাদটুকু। ডেকে পাঠিয়েছিলেন তাঁকে নিজে থেকে।

অনুপম গিয়েছিল তাঁকে ডাকতে; বলেছিল, জ্যাঠামশায়, বাবা একবার আপনাকে দেখতে চেয়েছেন। তাঁর খুব অসুখ।

—তাই নাকি!—বলে লাফ দিয়ে উঠে পড়েছিলেন ডাঃ দাশগুপ্ত। রোগীদের দিকে চেয়ে বললেন—তোরা বরং কাল সকাল করে আসিস। আজ আমার সবচেয়ে জরুরী 'কল' এসেছে।

আজ অনেকদিন পর আবার দুই বন্ধুর মিলন হতে চলেছে।

অহীন্দ্রবাবুর বিছানায় এসে নীরদবাবু বসতেই অহীন্দ্রবাবু ছেলেকে ইসারা করলেন। অনুপম চেয়ারখানা টেনে এনে খাটের কাছে দিল। কিন্তু নীরদবাবু সেটাকে ঠেলে দিয়ে বিছানার পরেই বসে রইলেন।

অহীন্দ্রবাবু নীরদের একখানা হাত নিজের দু'হাতের মধ্যে নিয়ে, একদৃষ্টে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন,—দু চোখ বেয়ে জলের ধারা গড়িয়ে যেতে লাগল। নীরদবাবু নিজের রুমাল দিয়ে তা মুছতে গেলে তিনি শিশুর মত অভিমান-ভরে তাঁর সে-হাতটাকে সরিয়ে দিয়ে বললেন—কেন তুমি এতদিন আস নি? আমি তোমাকে অপমান করেছিলাম, কিন্তু সে যে অভিমানবশেই, আর তার লজ্জা আমাকে কি কম আঘাত দিয়েছে?—তাকেই তুমি সত্যি বলে মেনে নিয়েছ!—এইটুকু বলেই যেন হাঁপাতে লাগলেন। নীরদবাবু তা লক্ষ্য করেছেন; বললেন—থাক, বেশী কথা বলতে হবে না।

নীরদবাবুও ভাবছিলেন সে-কথা। সত্যই তো। নবীনের ঐ অবস্থায় হয়ত তাঁর মাথার ঠিক ছিল না। তাই তাঁকে ঐভাবে বলে ফেলেছিলেন আর পরের দিন টাকা ছুঁড়ে দিয়েছিলেন তাঁর দিকে। তাঁরও একবার ইতিমধ্যে খোঁজ নেওয়া উচিত ছিল, অবশ্য মাঝে যুদ্ধের কয়েক বছর তিনি ছিলেন না এখানে। তবু তাঁর কৈফিয়ৎ দেওয়ার কিছু নেই। তবে কি এতকালের ঘনিষ্ঠতা এমন শূন্যতার উপরই এতদিন বাসা বেঁধে ছিল?

হঠাৎ নীরদবাবুকে সচকিত করে টেনে টেনে ক্লান্তস্বরে অহীন্দ্রবাবু বলতে লাগলেন—তোমার অভিমান নিয়েই তুমি থাকো ভাই। আমি তো চললাম। ওকে একটু দেখো। ওর বিলেত যাওয়ার ব্যবস্থাটা করে দিও।—বলে অনুপমকে দেখিয়ে দিলেন।

আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন নীরদবাবু—সেজন্যে তোমাকে একটও ভাবতে হবে না। কোন অসুবিধা ওর হবে না।

—বেশ। বলে একটু তৃপ্তির হাসি হেসে যেন চোখ বজলেন অহীন্দ্রবাবু। নীরদবাবুর হঠাৎ কি মনে হতেই হাতটা টেনে নিয়ে নাড়ী ধরলেন; সঙ্গে সঙ্গেই চমকে উঠে ইঙ্গিতে ডাকলেন অনুপমকে—শীগ্‌গির শীগগির, একটু গঙ্গাজল দাও মুখে।

অনুপম ত্বরিতগতিতে গঙ্গাজল এনে মুখে ঢেলে দিল। কিন্তু তা গলার ভেতর পৌঁছুল না। পৃথিবীর আলো-বাতাসের ঋণমুক্ত হয়ে অহীন্দ্রবাবুর পঞ্চভূতে গড়া দেহখানি ধীরে ধীরে নিশ্চল হয়ে আসছে। অনুপম কান্নায় ভেঙে পড়ল। নীরদবাবু অনুপমের মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে শোকবিহ্বল কণ্ঠে বললেন—ওঠ বাবা, কেঁদে আর তাঁর আত্মার অকল্যাণ করে কি হবে? যে গেল, সে তো আর ফিরবে না। এখন যে তোমাকে আরও শক্ত হয়ে দাঁড়াতে হবে। মনে রেখো, সব দিক এখন তোমাকেই সামলাতে হবে।

শ্রাদ্ধ-শান্তি চুকে গেলে পর অনুপম একদিন কি ভেবে পুরাণো দলিলপত্র ঘাঁটতে বসেছিল। হঠাৎ একটা দলিলের ভিতর থেকে টুপ করে যেন একটা মাটিতে পড়ে গেল।

তাড়াতাড়িতে সেটা কুড়িয়ে নিয়ে দেখল—যুবতী এক নারীর ফটো। অবাক চোখে সেদিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে তার মুখখানা গম্ভীর হয়ে গেল। এ ছবি তার মায়ের নয়,—তবে? ফটোখানা পকেটে পুরে বাক্সটা আরও হাতড়ে দেখবার জন্যে যখন সে একটু ঝুঁকে পড়েছে, তখনই বাইরে নীরদবাবুর ডাক শোনা গেল, বাবাজী বাড়ী আছ নাকি?

দ্রুতহস্তে বাক্সের ডালাটি ধপ করে সশব্দে বন্ধ করে দিয়ে অনুপম উত্তর দিল—আছি জ্যাঠামশায়, আসুন।

অনুপমও বসবার ঘরে দাঁড়িয়েছে, নীরদবাবু ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়ালেন।

চেয়ারে বসে পড়ে বিনা ভূমিকাতেই নীরদবাবু সুরু করলেন—বলছিলাম কি, তোমার ফাইনাল পরীক্ষার তো বেশী দেরী নেই আর। পাশপোর্টের ব্যবস্থার তদ্বির-তদারক এখন থেকেই আরম্ভ করতে হয় তা হলে।

—কিন্তু—

—কিন্তু আবার কি। এদিকে ওতে টাইমও তো কম লাগবে না। একটু আগে থেকেই করতে চাই আমি—সময় যেন না অপব্যয় হয়। তা তুমি দাঁড়িয়ে রইলে কেন? বসো না।

অনুপম সামনের চৌকিটার উপরে বসে পড়ল।

কিন্তু তাকে অন্যমনস্ক দেখা গেল। অকারণে একবার বুক-পকেটে বাঁ হাতখানা বুলিয়ে নিল অনুপম।

নীরদবাবু আবারও শুধালেন—কি বলো তুমি? কি যেন একটা চিন্তা করছ মনে হচ্ছে আমার।

—আমি আর কি বলব? এতক্ষণে যেন সচেতন হয়েছে অনুপম—ভাবছিলাম; ভাবছিলাম—এই আর কি, রেজাল্ট বেরোবার পর ওসব করলে ভালো হত না? যুক্তিটা অবশ্য নিজের কানেও খুব জোরালো ঠেকল না—তবু একটা-কিছু না বললে ভাল দেখায় না বলেই অনুপমকে উত্তর দিতে হল এইভাবে।

—পাগল আর কা'কে বলে? রেজাল্টের জন্যে অপেক্ষা করতে গেলে আরও তিন-চার মাস দেরী হয়ে যাবে।

—কিন্তু—

—আর কিন্তু নয়। আরে তোমার রেজাল্ট কি আর জানতে হয়। তোমাদের রেজাল্ট নিজে জানান দেয়। সূর্যের কি কোন পরিচয়ের প্রয়োজন হয়? —বলে প্রাণময়তার দীপ্ত হাসিতে ঘরখানা ভরিয়ে তুললেন।

এরপর অনুপমের বলবার কিছুই ছিল না। তাই সে শুধু বলল—বেশ, আপনি যা ভালো বুঝবেন, তাই করবেন।

—নিশ্চয়, নিশ্চয় করব। তোমাকে

বিলাতে পাঠিয়ে আরও বড় ডাক্তার করিয়ে আনব। তোমার বাবার শেষ ইচ্ছা জেনে-শুনে কি আমি অপূর্ণ রাখতে পারি? তোমার বাবার ডাক্তার হওয়াটা ভাগ্যচক্রে হয়ে ওঠে নি, তাই বলে তুমি হবে না সেরা এবং আদর্শ ডাক্তার? যাক, আজ চলি। আমি কিন্তু কাল থেকেই তদ্বির-তদারক আরম্ভ করে দেব।

নীরদবাবু ঘরের বাইরে যেতেই অনুপম আবার বসল সেই পুরাণো দলিলের বাক্সটা নিয়ে। অনর্থক একটা যুবতী নারীর ছবি এই পুরাণো দলিলের মধ্যে বন্দী হয়ে থাকার পিছনে কোন রহস্য আছে বলে তার মনে হল। কিন্তু বিস্তর ঘাঁটাঘাঁটি করেও আর কোন সূত্র পাওয়া গেল না। বাক্সটি বন্ধ করে যথাস্থানে রেখে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ালো অনুপম। নানা বিকৃত সন্দেহে, বিরূপ অস্বস্তিতে, এলোমেলো চিন্তায় তার সুস্থ মস্তিষ্কে জ্বালা ধরিয়ে দিল। দোতলার বারান্দায় একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত পায়চারী করেই কাটিয়ে দিল। অবশেষে সন্ধ্যের অন্ধকার ঘনিয়ে আসতেই ঐ বারান্দাতে একখানা ইজি-চেয়ার এনে বসে রইল সন্ধ্যাকাশের দিকে তাকিয়ে।

নীরদবাবুর আজকের কথাগুলো তার মনে পড়ল। তার বাবা তাকে আদর্শ ডাক্তার---সেরা ডাক্তার তৈরি করবেন বলে মনে মনে ধারণা পোষণ করতেন। তার একটা কারণও সে অনুমান করতে পারে। তিনি একদিন গল্পচ্ছলে বলেছিলেন সে-কথাটা :

"এক প্রচণ্ড বর্ষার রাতের ঘটনা। আকাশ ভেঙে সেদিন বৃষ্টিই শুধু নামে নি,---ইন্দ্র সেদিন অবাধ অধিকার পেয়েছিলেন বিশ্বসৃষ্টি কম্পিত করে প্রলয়ের বার্তা অগণিত নিশ্চিন্ত মানুষের মধ্যে সঞ্চারিত করতে। বরুণদেবের সহযোগিতায় সেদিন প্রকৃতির যে ভয়ঙ্করী রূপ প্রত্যক্ষ করেছিলাম, তা আর কোনোদিন দেখি নি।"

পিতা বলে চলেছেন---ঘরের দরজা-জানালা সব বন্ধ করেও নিশ্চিন্ত হতে পারছিনে, বজ্রপতনের শব্দে দরজা-জানালা সব কেঁপে উঠছে ঘন-ঘন। ঘুম আসছে না মোটেই। বিছানায় শুয়ে খালি এপাশ-ওপাশ করছি। আমি নীচতলাতেই শুতাম তখনও। হঠাৎ দরজায় করাঘাত। অশ্রান্ত, অস্থিরভাবে কে যেন অত্যন্ত ব্যস্তসমস্তভাবে দরজায় আঘাত করছে। ভয়ার্ত নারীকণ্ঠের আওয়াজ একবার যেন কানে এল। সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিয়ে উঠে দরজা খুলে দিতেই সর্বাঙ্গ সিক্তবসনা এক ভয়-ব্যাকুলা নারী একেবারে প্রায় আমার কোলের মধ্যে এসে পড়ল। আমি তাকে বসতে বলে দরজাটা বন্ধ করে দিলাম; না হলে ঘরখানা জলের ঝাপটায় জলময় হয়ে যেত।

সেই অবস্থাতেই মেয়েটি বলল---মায়ের আমার শেষ অবস্থা। এখনই যদি আপনি দয়া করে একবার যেতে পারেন---কান্নায় ভেঙে পড়ল মেয়েটি---আর কেউ নেই যে আমার ঐ মা ছাড়া।

কি করি, তাই ভাবছি। বাইরে দুর্যোগ সমানে তাণ্ডবলীলা চালিয়েছে। মানুষ, পশু-পাখী, কীট-পতঙ্গও এহেন সর্বনাশা রাত্রিতে নিরাপদ আশ্রয়ের বাইরে কোনক্রমে বেরোবে না। তা ছাড়া, আমার ডাক্তারী-বিদ্যাই বা কতটুকু! অসুস্থ রোগী তো দূরের কথা, এ তো একেবারে মৃত্যুর মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে! আমি মেয়েটিকে জানালাম সে-কথা। কিন্তু মেয়েটি নাছোড়বন্দা। যেতেই হবে আমাকে। মায়ের পরমায়ু থাকে বাঁচবে,---না হলে সে আমাকে দোষ দেবে না কোনদিন---করুণ সকাতর মিনতি মেয়েটির।

কেন যে তার মিনতি দৃঢ়তার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করতে পারি নি জানি না; কিন্তু পারলে বোধ হয় ভাল হত। যাক---বেরিয়ে তো পড়লাম। বৃষ্টির প্রচণ্ডতা তখন একটু কমে এসেছে। আমি একটা রেন-কোট নিলাম। মেয়েটাকে একটি ছাতা দিলাম।

বাড়ী ওদের বেশী দূর ছিল না।

যতটা দ্রুত সম্ভব, পা চালিয়ে এগিয়ে গেলাম। মৃত্যুর সঙ্গে তখন ওর মা যুদ্ধ করে চলেছেন। সমস্ত শরীরটা থেকে থেকে যেন ধনুষ্টঙ্কারের রোগীর মত বিকৃত হয়ে উঠছে। একেবারে শেষ সময়---ওষুধ কোন কাজ করবে না, দেখে বুঝলাম।

মেয়ে অদূরে দাঁড়িয়ে পলকহীন দৃষ্টিতে কি দেখছে, সেই-ই জানে। আমার মনে হল, সে বোধ হয় মনে মনে যমরাজের দূতগুলোকে অভিশাপ দিচ্ছে---এমন দুঃসময়ে তার মায়ের এইভাবে মর্ত্যভূমির ঋণমুক্তি উপলক্ষে।

আমার ডাক্তারী বিদ্যায় যতটা সম্ভব করেছিলাম, তবু যমরাজের হাতের মুঠি থেকে আমার রোগীর আয়ু কেড়ে নিতে পারিনি। মৃত্যুপথযাত্রিণী মনে মনে হতাশ ও ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন কিনা জানি না; তবে এক সময় দেখলাম দেহখানি অপেক্ষাকৃত নিশ্চল হয়ে আসছে, আর তিনি তাঁর মেয়ের দিকে দুর্বল আঙুল তুলে আমাকে লক্ষ্য করে কি যেন বলতে চেয়েছিলেন; শক্তিহীনতার দরুন তা বলা হয়নি। আমি কিন্তু না-বুঝেই ঘাড় নেড়েছিলাম। আর তাতেই লক্ষ্য করেছিলাম তাঁর মুখে স্বর্গীয় দীপ্তি ও অবর্ণনীয় তৃপ্তির আভাস।

কি একটু ভেবে নিয়ে, একটু থেমে অতঃপর পিতা বলেছিলেন, যাই হোক, মীনাক্ষীর মা মারা যাওয়ার পর আমি তার দেখাশুনা করতাম। ঐ বাড়ীতেই সে থাকত। একদিন আমি হঠাৎ গিয়ে দেখি, সে নেই। শুনলাম, এখানকার বাড়ী বেচে দিয়ে সে কোথায় চলে গিয়েছে, কেউ জানে না।

তার মাকে না বাঁচাতে পারার দুঃখ আমার মনে চিরদিন গাঁথা থাকবে। বিনা চিকিৎসায় চোখের সামনে মানুষকে এমনভাবে মরতে দেখি নি---চিকিৎসকের উপস্থিতি যেখানে উপহাসেরই নামান্তর।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে পিতা বলেছিলেন ---তোমাকে এর প্রতিকার করতে হবে। ডাক্তারী-বিদ্যা সম্পূর্ণ আয়ত্ত করে এ-অবস্থায় মানুষের মরণকে ঠেকিয়ে রাখতে হবে। নিরুপায় দর্শক হয়ে যেন না এমন ঘটনার সাক্ষী হতে হয় আমার মত। নির্ভাবনায় তুমি চালিয়ে যাও তোমার পড়াশুনা। প্রয়োজন হয়, বিদেশেও পাঠাব তোমায়।"

এ-পর্যন্ত পিতার মনোবাসনাকে অক্ষরে অক্ষরে রূপদান করে এসেছে। কিন্তু এতদিন পর কেমন যেন সব এলোমেলো মনে হচ্ছে, শ্রদ্ধার মূলে ভাঙনের ঢেউ এসে লাগছে; আন্তরিকতায় সন্দেহ জেগে উঠছে বিষাক্ত ফণা ধরে। ফটোখানা কার হতে পারে---এ বাড়ীর কারো নয়। মায়ের চেহারার সঙ্গে কোন মিল নেই। তবে কি মীনাক্ষীর? কিন্তু তার পিতায় বাক্সে গোপন মর্যাদায় রক্ষিত হচ্ছিল কেন?

অনুপমের সকল সিদ্ধান্ত ওলোট-পালোট করে দিল এই চিন্তা। সে স্থির করল, বিলাত যাবে না। নীরদবাবুকে সে কথা জানাতেই তিনি আশ্চর্য হয়ে যেন আকাশ থেকে পড়লেন---সে কি! তোমাদের মত ছেলেরা যদি এদেশের মাটিতেই তাদের শিক্ষাটাকে সম্পূর্ণ হয়েছে বলে মনে করে, তবে তো শিক্ষার গৌরব বাড়বে না। বিদেশী শিক্ষাটা সবার জন্যে নয়, সবাই তা পায়েও না।

হাসল অনুপম---বিদেশে গিয়ে শিক্ষার ঔজ্জ্বল্যটা কতটুকু বাড়ে জানি না, তবে এটুকু জানি, বাড়ে ডিগ্রির বোঝা আর আত্মস্ফীতির অহঙ্কারটুকু।---আমার ওতে দরকার নেই।

---কিন্তু, আমি যে এদিকে অনেকটা এগিয়েছিলাম।

---কি আর করবেন। এটুকু পণ্ডশ্রম বলেই মনে করবেন। বসুন জ্যাঠামশায়, আপনার চা বলে আসি।

মিনিট পনেরো পর চা এল। চা-এর ফাঁকে ফাঁকে নীরদবাবু বারবার দুঃখ প্রকাশ করলেন, এমন কি অনুপমকে আরও একবার এ-বিষয়ে ভেবে দেখবার জন্যে অনুরোধ জানালেন। কিন্তু অনুপমের একই কথা---কি হবে বিলেত গিয়ে? অযথা ডিগ্রির ঔজ্জ্বল্যে লোকের চোখ ধাঁধিয়ে?

সেদিন এর বেশি আর কথাবার্তা অগ্রসর হয় নি।

এরপর বেশ কয়েকটা বছর কেটে গিয়েছে। বিলেতে অনুপম যায় নি। আর নীরদবাবু নিজের মোটর-বাইক এ্যাকসিডেণ্টে মারা গেছেন।

অনুপম এদেশীয় বিদ্যার জোরেই সরকারী হাসপাতালের একটা বড় পদে এখন বহাল হয়ে আছে। অনুপমকে চাকরি খুঁজে নিতে হয় নি; চাকরিই অনুপমকে খুঁজে বার করেছে।

হাসপাতাল-সংলগ্ন কোয়ার্টারেই অনুপম থাকে একা। আর থাকে একটা চাকর; একজন

পাচক। মাঝে মাঝে বাড়ী যায়, সাত-আট দিন কাটিয়ে আসে।

বিয়ে-থা এখনও করে নি অনুপম, কিন্তু সে-খবরটা যোগ্য ও বয়স্থা মেয়েদের মায়ের কানে বাতাসের আগে-আগে ধেয়ে এসেছে। এমন পাত্র বিয়ে করবে না—এতবড় কু-কথা আর ভূ-ভারতে আছে নাকি? ধর্ণা দিতে কসুর করেন নি কন্যাদায়গ্রস্ত পিতারা বা অভিভাবকেরা। বহুজনহিতায় চা-জলখাবারের শ্রাদ্ধই হয়েছে শুধু অনুপমের পক্ষ থেকে, কিন্তু আসল কথাটি কেউ আদায় করে নিয়ে যেতে পারেন নি। ব্যর্থ-মনোরথ মেয়ের মায়েরা ক্ষীণ আশাও পোষণ করেছেন কেউ কেউ। কেউ—এখন না করলে কি হবে, বাছাধনকে মত করতেই হবে দুদিন পরে। কারো কারো আবার সেই মুহূর্তে নিজের মেয়ের রূপ-গুণ সম্বন্ধে অতিমাত্রায় সচেতনতা জেগে উঠেছে, বলেছেন—অত খোশামোদ কিসের? মেয়ে কি আমার ফেলনা? কোন-কোন মায়ের এমন মন্তব্যও শোনা গেছে—ঐ হাসপাতালেরই কোন ছুকরী নার্সকে হয়ত ভালবাসে; তাই কথাটা ঘুরিয়ে বলেছে বিয়ে করবে না।

বাড়ীতে এলেই এসব কথা বেশি শুনতে হয়।

এবার দিন-সাতেকের ছুটি নিয়ে এসেছে। অন্যদিন সাধারণত রাত দশটার মধ্যে শুয়ে পড়ে। কিন্তু আজ অনুপমের কেন জানি ঘুম আসছে না। একখানা মোটা ডাক্তারী বই খুলে সেই দিকে চেয়ে বসে আছে। কখনও বা বাইরের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছে—সারা আকাশ বুঝি কালো মেঘে ছেয়ে ফেলেছে, কাচের জানালায় ক্ষণে বিদ্যুতের ঝলক। হঠাৎ নামল প্রচণ্ডবেগে বারিধারা। ক্রমেই তার বেগ বেড়ে চলল। বই বন্ধ করে একদৃষ্টিতে বাইরের দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে রইল অনুপম। এই অশ্রান্ত বারিবর্ষণের মাঝে মাঝে অকস্মাৎ তার বাবার সেই একদিনের গল্পটা মনে পড়ল। এমনই এক ঘন দুর্যোগ-ময়ী রাত্রিতে এক আর্ত, অসহায় নারী ছুটে এসেছিল তার রোগক্লিষ্ট মাতার জন্যে এক অর্ধ-চিকিৎসকের কাছে—দেবতার দূত মনে করে কিন্তু তার বাবার যাওয়াই শুধু সার হয়েছিল। রোগী তো বাঁচেই নি, উপরন্তু মৃতের উত্তরাধিকারী হিসাবে যাকে পেয়ে-ছিলেন, তাকেও তিনি রাখতে পারেন নি তাঁর দুর্বল প্রতিশ্রুতির বন্ধনে।

বাইরে বিরামহীন বর্ষণ। মুহুর্মুহু মেঘে মেঘে সংঘাত। মেদিনী প্রকম্পিত হচ্ছে যেন সেই নিদারুণ বজ্র-নির্ঘোষে। অনুপমের কেমন যেন ভয় ভয় করতে লাগল। তাই সে হঠাৎ উঠে একশ পাওয়ারের বাতিটা জ্বালিয়ে দিয়ে ঘরের মধ্যে পায়চারি সুরু করে দিল। এক সময় জানালার কাছে এসে দাঁড়াতেই চোখে পড়ল একখানা গাড়ী ঢুকছে তার বাড়ীর কম্পাউণ্ডের মধ্যে। গাড়ীখানা বাড়ীর নীচে এসে দাঁড়াল। জানালা দিয়ে দেখে অনুপম, কান খাড়া করে রইল।

নীচের তলায় দরজার কড়া নড়ে উঠল বলে অনুপমের মনে হল—একবার, দুবার, তিনবার। বেশ জোরে এবং অতি দ্রুত। নিশ্চয়ই জরুরী।

ভৃত্যেরা অগাধ ঘুমে আচ্ছন্ন, হয়ত এ শব্দ এই সশব্দ বর্ষণ এবং গর্জনের মধ্যে তাদের সুপ্ত চেতনা স্পর্শও করবে না।

একটু কান পেতে শুনে শব্দ লক্ষ্য করে তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে এল অনুপম। দ্রুতহস্তে দরজা খুলে আগন্তুকের মুখোমুখি প্রায় দাঁড়িয়ে শুধাল—কাকে চান?

আগন্তুক একবার অনুপমের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে বলল—আমি ডাক্তারবাবুর কাছে এসেছি। ডাক্তার অনুপম সেনকে দরকার—বিশেষ জরুরী প্রয়োজন।

—আমি-ই। বলুন আপনার কি প্রয়োজন।

—একজন রোগিণীকে দেখতে যেতে হবে বেশী দূরে নয়।

—কিন্তু—

—দোহাই আপনার ডাক্তারবাবু, লোকটি কাঁদো কাঁদো হয়ে অনপমের হাত দুটো জড়িয়ে ধরে বলল—অপত্তি করবেন না। তা'হলে হয়ত আর তাকে বাঁচাতে পারব না। জ্বরের ঘোরে কেমন যেন আচ্ছন্নের মত পড়ে আছে—ঘণ্টা দুয়েক হল। দেখে ভয় হতে লাগল। তাই ছুটে এলাম এ দুর্যোগ মাথায় করে। আপনার কোন ভয় নেই ডাক্তারবাবু। সঙ্গে আমার গাড়ী আছে, আপনাকে আবার পৌঁছে দিয়ে যাব।

—আচ্ছা, আপনি বসুন। মিনিট দশেকের মধ্যে আমি আসছি।

উপরে চলে গেল অনুপম। একটা ঘরে জামা-কাপড় বদলাতে বদলাতে অনুপম আশ্চর্য হল এই ভেবে যে, ঠিক এমনই এক রাতে এমনই এক পরিস্থিতিতে অনুরূপ এক রোগিণীর চিকিৎসা করতে গিয়েছিলেন তার পিতৃদেব। কি অদ্ভুত সাদৃশ্য। সে রোগিণী তার পিতার প্রচণ্ড অক্ষমতাকে উপহাস করে গিয়েছে। আর সেই রাত্রিতেই বোধ করি তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, ছেলেকে তিনি আদর্শ সর্বগুণান্বিত চিকিৎসক করে তুলবেন। ভগবান জানেন, স্বর্গত পিতৃদেব আজ তাঁর পুত্রের সাফল্য ও সুনামে উৎফুল্ল হয়ে উঠছেন কি না; কিন্তু বাইরের লোকে জানে, অনুপম একজন ধন্বন্তরী। এই তো সেদিনও জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের মেয়ের অসুখের জন্য তারই ডাক পড়েছিল, সদরে অন্য অনেক নাম-করা ডাক্তার থাকা সত্ত্বেও। অনেক রোগী তো তার হাতে চিকিৎসিত হবার জন্যেই ওখানকার হাসপাতালে ভর্তি হয়। ডিবল ফী কেবুল করে বাড়ীতেও ডেকে নিয়ে যায় অনেকে তেমন প্রয়োজন হলে।

হঠাৎ ঘড়ির দিকে নজর পড়তেই চমকে উঠল সে—আধঘণ্টা পার হয়ে গেছে। বাইরে ভদ্রলোককে বসিয়ে রেখেছে।

তাড়াতাড়ি হাতব্যাগে কিছু দরকারী ওষুধ ভরে নিয়ে নীচে নেমে এসে চাকরটিকে জাগিয়ে বলল—'কলে' বেরোচ্ছি। শীগগির ফিরে আসব।

এমন জমাটি ঘুম বাধা পাওয়ায় চাকরটি একটু ক্ষুণ্ণমনে চোখ কচলাতে কচলাতে উঠে কোনমতে দরজা পর্যন্ত এসে বাইরের দিকে তাকিয়ে বলল—এর মধ্যে মানুষ বেরোয়! তারপর শিথিল দেহে ও ততোধিক শিথিল হস্তে দরজাটা অতি কষ্টে বন্ধ করে নিজের বিছানায় এসে আবার শুয়ে পড়ল।

কাছেই ছিল রোগিণীর বাড়ী। অল্প-ক্ষণের মধ্যে পৌঁছে গেল দুজনে।

রোগিণীর ঘরে পৌঁছেই তার মুখের দিকে তাকিয়েই অবাক হয়ে গেল অনুপম। সেই ফটোখানার কথা মনে পড়ল। বয়সের অগ্রগতিতে সামান্য পরিবর্তন হলেও মোটামুটি মুখের চেহারার বৈশিষ্ট্যটুকু বজায় আছে। সুঁচলো নাক, পাতলা ঠোঁট, ছোট্ট সরু কপালটুকু—কিছুই বদলায় নি।

আচ্ছন্নের মত রোগিণী পড়ে আছে—একরাশ অবহেলিত পুষ্পগুচ্ছের মত।

অনুপম ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে হাতটি খুব সাবধানে তুলে ধরে নাড়ীর স্পন্দন অনুভব করল—নাঃ ঠিকই আছে।

গাড়ীতে বসেই রোগিণীর রোগের একটা প্রাথমিক বিবরণ সংগ্রহ করেছিল অনুপম তার স্বামীর কাছ থেকে। এখন একটা ইনজেকসন দিয়ে অনুপম বলল তার স্বামী অরুণকে—এখন উনি কিছুটা আচ্ছন্নের মত পড়ে আছেন। ওষুধ দিলাম; আমি এইখানেই পাশের ঘরে অপেক্ষা করছি—আধ ঘণ্টা খানিক। এ-ভাবটা না কাটলে আর একটা ইনজেকসন দিতে হবে। আপনি বরং পাশে বসুন। আমি উঠে যাচ্ছি।

নীরবে উঠে গেল অনুপম। পাশের ঘরে বসে ভাবতে লাগল। ফটোর চেহারার সঙ্গে রোগিণীর চেহারার এমন আশ্চর্য মিল কি করে সম্ভব হল? না কি এরই নাম মীনাক্ষী? কিন্তু বাবার মুখে তো শুনেছে যে, মাতৃবিয়োগের পরই এখানকার বাড়ী বিক্রি করে দিয়ে কোথায় যেন চলে গিয়েছে সে। এতদিন পর তার পক্ষে এখানে আবার ফিরে আসার হেতু কি—যদি সত্যিই এ মীনাক্ষী হয়! এখানকার মাটিতে তার আকর্ষণ-ই বা কি? কোন মোহ আছে এখানকার আকাশে-বাতাসে? কী সান্ত্বনার প্রলেপ আছে এখানকার জল-হাওয়ায়? প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর মনে মনে হাতড়াতে থাকে অনুপম। উত্তর ফিরে আসে সেই একই কেন্দ্রে—নেই,

কিছুই নেই। রোগিণীকে ঘিরে এখন যেন রহস্য জাল ঘনীভূত হচ্ছে তার মনে। পিতার কাছ থেকে যেটুকু তার শোনা ছিল তাতে বোঝা গিয়েছিল, মীনাক্ষী সম্ভবত তখন পর্যন্ত অবিবাহিতা। তবে মীনাক্ষীর মা মারা যাওয়ার আগে বাবার দিকে চেয়ে কি বলতে চেয়েছিলেন? বাবাই বা ঘাড় নেড়ে উত্তর দিয়ে কি বোঝাতে চেয়েছিলেন?

---ডাক্তারবাবু! অরুণ ডাকল।

তড়াক করে চেয়ার থেকে প্রায় লাফ দিয়ে উঠে বলল অনুপম----বলুন।

----মীনার জ্ঞান ফিরেছে।

---কি বললেন?---মীনা নামটা শুনেই ডাক্তার কেমন যেন শক পেয়েছে; শেষের কথাগুলো তার কানেই যায় নি।

---মীনাক্ষীর চেতনা ফিরেছে। চোখ চেয়েছে।

এবার স্পষ্ট নামটা শুনলো---মীনাক্ষী। বললে জ্ঞান হয়েছে---চলুন। যাক, বাঁচা গেল। সন্দেপতে ফাঁড়া কাটল। ভয় নেই কিছু।

রোগিণীর ঘরে এসে বসল অনুপম।

একদৃষ্টে অনুপমের দিকে তাকিয়ে আছে মীনাক্ষী। তার দৃষ্টি চলে গিয়েছে অনুপমকে ভেদ করে, অনতি-পুরাতন অতীতে যেখানে অনুপম ছিল নগণ্য পার্শ্ব চরিত্রের ভূমিকায়, অহীন্দ্রবাবুই ছিলেন যেখানে মুখ্য অভিনেতা।

আর-ও খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকবার পর অনুপম শুধাল---আমার দিকে চেয়ে কি দেখছেন বলুন তো!

---দেখছি?---একটু মুচকি হেসে মীনাক্ষী উত্তর দিল---না থাক। আর একদিন বলব।

দুজনেই কিছুক্ষণ চুপচাপ।

হঠাৎ অরুণ শুধাল---কিছু মনে করবেন না ডাক্তারবাবু, আপনার পিতার নাম কি অহীন্দ্র ছিল?

অনুপম হেসে ঘাড় নেড়ে জবাব দিল।

---অহীন্দ্রবাবুর কথা ভিন্ন মীনা খুব বলত। তিনি নাকি ওর অসহায় অবস্থায় দেখাশুনা করতেন। ওর মায়ের অসুখে তিনি নাকি প্রচণ্ড ঝড়-জল উপেক্ষা করে শুধু মানবতা-বোধে উদ্বুদ্ধ হয়েই তাকে দেখতে এসেছিলেন। আপনার সম্বন্ধেও কত কথা শুনেছি মীনার মুখে। আপনার চিকিৎসার খ্যাতির প্রশংসায় ও পঞ্চমুখ। এই যাঃ---এক মিনিট, আসছি ডাক্তারবাবু!---বলে বেরিয়ে গেল অরুণ।

অনুপমের কানে কোন কথা যাচ্ছিল না। হঠাৎ সে দাঁড়িয়ে উঠে বলল---আচ্ছা, আমি আসি। এই বড়ি ক'টা রেখে গেলাম, তিন ঘণ্টা অন্তর দুটো করে খাবেন। কাল আবার আমি আসব।

কিন্তু মীনাক্ষী ইঙ্গিতে তাকে বসতে বলল। হাসল---এর মধ্যে যাবেন কি করে? বসুন, ও আসুক। গাড়ী করে পৌঁছে দিয়ে আসবে।

নিজের প্রস্তাবের অসম্ভাব্যতার দিকটা অনুপম এতক্ষণ আদৌ ভেবে দেখেনি---এ দুর্যোগে গাড়ী ছাড়া যাওয়ার উপায় নেই।

অরুণ এসে দু'খানা দশ টাকার নোট এগিয়ে দিয়ে বলল---আপনার ফী, আর---

তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলল অনুপম---থাক, ওর প্রয়োজন নেই।

স্বামী-স্ত্রী দুজনে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। অনুপম বলল---চলুন অরুণবাবু আমায় পৌঁছে দিয়ে আসবেন। আচ্ছা আসি। নমস্কার!---বলে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই অরুণও তার পিছন পিছন গেল।

অনুপমের সে-রাত্রিতে ঘুম হল না। মীনাক্ষী যেন কোন গোপন কথা বলতে চায়। কি বাধা ছিল তার আজ বলতে? কেন সে তাকে এমন দুর্ভাবনার মধ্যে ফেলে রাখতে চায়? কি এমন তার বক্তব্য।

পরদিন সন্ধ্যার পর অনুপম গেল মীনাক্ষীকে দেখতে।

মীনাক্ষী একটা বালিশে ঠেস দিয়ে বসে আছে। একটু পরেই অরুণ এসে অনুপমের পাশে বসল। বলল---ডাক্তারবাবু, আপনার ওষুধে ওর নাকি খুব ভাল কাজ করেছে, মাত্র একদিনেই বেশ সুস্থ বোধ করছে।

---না ডাক্তারবাবু, ওর কথা শুনবেন না। বাড়িয়ে বলছে আপনাকে।

---আচ্ছা দেখি আপনার হাতখানা।

হাতটা এগিয়ে দিয়ে স্বামীর প্রতি একটা কপট কটাক্ষ হানল মীনাক্ষী। এরপর অরুণ আর কোন কথা বলল না।

এই সময় অরুণ হঠাৎ উঠে বাইরে চলে গেল।

মিনিট দুই তিন অনুপম হাত ধরেই আছে। মীনাক্ষীর কথায় চমকে উঠল---এতক্ষণ হাত দেখতে লাগে? আমি পরীক্ষক হলে আপনি ডাক্তারী পাশের সার্টিফিকেট পেতেন না। কি দেখলেন বলুন!

---ভালই, শরীরগত কোন দুর্লক্ষণ নেই।

এমন সময় চা জল খাবার ইত্যাদি নিয়ে একটা চাকরের পিছনে ঢুকল অরুণ।

---ডাক্তারবাবু, একটু চা এনেছি আপনার জন্যে।

---ওঃ আচ্ছা, বসুন আপনি।

অরুণ বসল। চায়ের টেবিলটা এগিয়ে দিয়ে চাকরটি চলে গেল।

চা-পানান্তে একটা প্রেসক্রিপসন লিখে দিয়ে যথাযথ নির্দেশ দিয়ে অনুপম যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়াল।

---আপনার ফী-টা, মৃদুকণ্ঠে বলল অরুণ।

গম্ভীরভাবে অনুপম বলল---থাক।

এই সময় মীনাক্ষী বলল---চলতি কথায় আছে, ডাক্তারকে ফাঁকি দিলে রোগীও ফাঁকে পড়ে। আর তাতে ডাক্তার পায় পেয়ে যায়, রোগী কল হারায়।

অনুপম ফিরে দাঁড়িয়ে বলল---আমাকে ফাঁকি দিলেও আমার রোগী ফাঁকে পড়ে না---এই আশ্বাসটুক অন্তত আমার দেওয়ার অধিকার আছে। আচ্ছা, নমস্কার---বলে ত্বরিতপদে বেরিয়ে গেল অনুপম।

ছুটি অন্তে অনুপম ফিরে গেল কর্মক্ষেত্রে।

অনুপম কর্মস্থলে ফিরে গেলেও কি যেন এক চিন্তা তাকে সর্বক্ষণ ঘিরে থাকে। মীনাক্ষীর না-বলা কথাটা কি হতে পারে? কেন সে বলতে গিয়েও বলেনি তাকে? কাজে-কর্মে তার আর মন বসতে চায় না। অবশেষে সে এক মাসের ছুটি নিয়ে এসে বাড়ীতে বসল।

প্রায় প্রতিদিনই সে একবার করে যায় মীনাক্ষীর বাড়ীতে---তাকে দেখার অজুহাত নিয়ে নয়, তার বলতে-চাওয়া বক্তব্যটা শুনতে। কিন্তু নিরাশ হতে হয়। মীনাক্ষীই তাকে নানা প্রশ্ন করে---এতদিন ও বিয়ে করেনি কেন? এবার করা প্রয়োজন মনে করে কি না? বাবা কতদিন মারা গিয়েছেন?

অথচ এদিকে বাড়ীতে এসেই আবার সেই একই চিন্তা বোঝার মত চেপে থাকে মনের উপর। কথাটা না-শোনা পর্যন্ত দিনে দিনে তার অস্থিরতা ক্রমেই যেন বেড়ে চলেছে। তার ছুটিও এদিকে শেষ হয়ে আসছে।

সেদিনও এমনই মীনাক্ষীর বাড়ীতে গিয়েছে অনুপম। নিজেই বলল---এবার ডাক্তারের কবল-মুক্ত হতে পেরেছেন। আর আমার কোন প্রয়োজন নেই। তা ছাড়া, ছুটিও শেষ হয়ে এল।

---কিন্তু এবার আমার প্রয়োজন আছে। মীনাক্ষীর স্থির ও দৃঢ় কণ্ঠস্বরে চমকে উঠে অনুপম তাকাল তার দিকে। এ তো বিদ্রূপ নয়,---এ যেন সৈনিকের প্রতি সেনাপতির আদেশ, দুর্বলের প্রতি সবলের সাবধান-বাণী। প্রতিটি বাক্য স্পষ্ট উচ্চারণে ধ্বনিত হল এর পর---ডাক্তারের প্রয়োজন নয়, তা ছাড়া কি অন্য কোন দরকার মানুষের থাকতে নেই?

খানিকক্ষণ মীনাক্ষীর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে অবশেষে অনুপম বলতে বাধ্য হয়---আপনি বুঝতে পেরেছেন কি বলছেন?

---বুঝেছি, বুঝেছি! বুঝেছি বলেই বলছি এ কথা। হঠাৎ দুহাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল মীনাক্ষী।

অত্যন্ত অপ্রস্তুত বোধ করল অনুপম। কিন্তু কি করা যায় এখন! চাকরটিরও দেখা নেই; অরুণও বাড়ী নেই যে, তাকে ডেকে দেবে। শনিবার বিকেল হলেই সে বাড়ী থাকে না। কয়েকবারই সে তা দেখেছে। শুনেছে, সে 'রেস' খেলতে যায়। দ্রুত ধাবমান অশ্বকুলের পদশব্দে বাতাস শুধু ভারী হয়ে ওঠে না, মানুষের মুঠিও ভরে ওঠে আকস্মিক অর্থ-সমাগমে,---সেই নেশা মরীচিকার মত টানে অরুণকে।

অনুপম উঠে দাঁড়ালো যাওয়ার জন্য। কিন্তু মীনাক্ষী অকস্মাৎ তার বিছানা থেকে নেমে এসে অনুপমের হাত ধরে ভিজে ভিজে গলায় বলে উঠল—বোসো অনুপম, যেও না। কথা আছে।

অনুপমও বসে পড়ল। মীনাক্ষীও ফিরে গেল নিজের জায়গায়।

অনুপম দেখছে মীনাক্ষীর মুখের চেহারার অদ্ভুত পরিবর্তন। কিন্তু কোন মন্তব্য করার আগেই কোনরকম ভূমিকা না করেই মীনাক্ষী বলল—প্রথম দিন দেখেই আমি চিনেছিলাম—অহীন্দ্রবাবুর ছেলে তুমি। তুমি যে এত বড় ডাক্তার হয়েছ, সেকথা জেনে আজ আমার চেয়ে সুখী এ-জগতে বোধহয় আর কেউ নেই। একথা অবশ্য তোমার জানবার কথা নয়—জানতেন তোমার বাবা, যিনি দিনের পর দিন রঙীন ছবি ফুটিয়ে তুলেছিলেন আমার চোখের সামনে? অত্যন্ত দুঃখের কথা, যে-নাটক অনায়াসে সফল হতে পারত, অদৃশ্য বিধাতার অলক্ষ্য হস্তক্ষেপের ফলে অকালেই নেমে এল তার যবনিকা। এতদিন পরে সে যবনিকা তুলে দিয়ে কেন তুমি এলে আমার জীবন-নাট্যে? বিস্মৃতির অবরুদ্ধ দুয়ারে ঘা দিয়ে কেন তা খুলে দিলে? কেন উত্তাল তরঙ্গ তুলে দিলে আমার মন্থরগতি জীবন-ধারায়?

—কি বলতে চাইছেন, বুঝতে পারছি না তো।

—আপনি নয়, আমি তোমার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট। সুতরাং আমাকে তুমিই বলো। যাক—আমি যা বলতে চাই, তার কাহিনীগত দিকটা রোমাঞ্চকর হলেও তোমার পক্ষে শ্রুতি-সুখকর হবে না। অথচ তোমার তা শোনা দরকার, অন্তত আমি শান্তি পাব তাতে। আজ আর বলতে বাধা নেই, আজ আমার ছাড়পত্র আছে—অরুণ।

অনুপম নির্বাক।

—তুমি হয়ত জানো, আগে আমরা এখানেই থাকতাম, নিজেদের একখানা বাড়ীও ছিল—

মাঝপথে বাধা দিয়ে বলল অনুপম—জানি, তোমার মায়ের মৃত্যুর পর সে বাড়ী বেচে দিয়ে কোথায় যেন তুমি চলে যাও।

—হ্যাঁ। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে তারপর হঠাৎ উত্তেজিত স্বরে প্রশ্ন করে বসল—কিন্তু কেন জানো? তোমার বাবারই জন্যে বাধ্য হয়ে চলে যেতে হয় এবং কোন চিহ্ন না রেখে—

মাত্রাজ্ঞান হারিয়ে ভৎর্সনার স্বরে অনুপম বলল—কি বলছ তুমি পাগলের মত।

—ঠিকই বলছি। একবর্ণ মিথ্যে নয়। অবশ্য একথা জানে না কেউ—এমন কি অরুণও নয়। কিন্তু তোমাকে বললাম কেন জানো—যশ, খ্যাতি, অর্থ, কিছুই তোমার আজ অ-পাওয়া নেই; তোমার ভাণ্ডার আজ সব দিকেই পরিপূর্ণ। কাছে থেকেও তোমার নাগাল পাওয়া আমার কাছে আজ অসাধ্য। তুমি আজ আদর্শ ডাক্তার, চরিত্রবান পুরুষ—কিন্তু আমার ভাগ্য কেন এমন হল, কেন এবং কার জন্যে আমি আজ এতবড় বঞ্চনা বুকমাঝে বয়ে বেড়াচ্ছি, সেকথা আজ তোমাকে সব বলব। তোমার তা জানা দরকার না থাকতে পারে কিন্তু আমার জানানো প্রয়োজন।

তোমার বাবার দেওয়া প্রতিশ্রুতিতে বৈচিত্র্য এবং বৈপরীত্য দেখা দিল কিছুদিন যেতে-না-যেতেই। দিনে তো বটেই, রাত্রিতেও দীর্ঘ সময় তিনি কাটাতেন আমার বাড়ীতে।

—বিশ্বাস করি না। দ্বিগুণ চীৎকার করে উঠল অনুপম।

বিদ্রূপের হাসি হেসে বলল মীনাক্ষী—চেঁচিও না অনুপম। এর প্রমাণ চাও, দেখাব। শোনো আগে। তাঁর এই আচরণের আমি একদিন স্পষ্টই বলেছিলাম তাঁকে—আপনি আর আসবেন না এখানে। উত্তরে তিনি কি বলেছিলেন জানো—কেন, ভয় হয়? আমি বলেছিলাম—ভয় নয়, ভাবনা। তাঁর আসা কিন্তু বন্ধ করতে পারিনি। কিন্তু সেই আসা তাঁর একদিন আপনিই বন্ধ হয়ে গেল, কেন বলো তো? বললে বিশ্বাস করবে না, অথচ সত্যি—বোধহয় কোন নেশা করেছিলেন সেদিন—এসেই তিনি আমাকে হঠাৎ জড়িয়ে ধরে বললেন—তোমাকে একদিন না দেখলে যে জগৎ আমার অন্ধকার হয়ে যায়, রাণী।

এক ঝটকায় আমি তাঁকে ঠেলে দূরে সরিয়ে দিয়েছিলাম। এর পরদিনই তিনি একটা চিঠি লিখে পাঠিয়েছিলেন—দাঁড়াও, আনছি চিঠিখানা।

কোন এক ড্রেসের কোন এক গোপন স্থান থেকে বের করে আনল এক চিঠি।

অনুপমের হাতে দিল চিঠিখানা। অনুপম পড়তে লাগল: "মীনা, তোমার মায়ের মৃত্যু-শয্যায় তোমাকে দেখব বলে তাকে কথা দিয়েছিলাম। কিন্তু সে-যে কত কঠিন, তা আজ বুঝতে পারছি। ভেবেছিলাম, তোমাকে পুত্রবধূ করে ঘরে স্থান দেব, কিন্তু দিনে-দিনে সে সঙ্কল্প থেকে বিচ্যুত হয়ে আমি যে কত নীচে নেমে যাচ্ছি, তার প্রমাণ কলকে পেয়েছ। এ-অবস্থায় আমাদের দুজনের আর কাছাকাছি থাকা চলে না, একজনকে দূরে সরে যেতেই হবে, না হলে ----" পড়তে পড়তে কেমন যেন তার মাথাটা ঘুরে উঠল, পায়ের তলায় মাটি দুলে উঠল, থরথর করে শরীর কাঁপতে লাগল,—পড়ে গেল সে চেয়ার থেকে।

বিদ্যুৎ গতিতে চিঠিখানা অনুপমের হাত থেকে ছোঁ মেরে নিয়ে মীনাক্ষী বিছানার এক গোপন ভাঁজে রেখে দিল। পরমুহূর্তেই চীৎকার করে উঠল।

চীৎকারে আকৃষ্ট হয়ে অরুণ ছুটে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল, বিব্রত হয়ে শুধাল—কি হল? আঙুল দিয়ে মীনাক্ষী দেখিয়ে দিল।

দুজনে মিলে ধরাধরি করে তাকে শুইয়ে দিল মীনাক্ষীরই বিছানায়। চোখে-মুখে জলের ঝাপটা দিতে দিতে খানিক পরে চোখ মেলে তাকাল অনুপম।

অতঃপর গাড়ীতে করে অনুপমকে পৌঁছে দিল অরুণ। মীনাক্ষীও সঙ্গে গেল।

দু-তিন দিন পরে সুস্থ হল বটে অনুপম; কিন্তু সব সময় একটা বিষণ্ণ, বিমর্ষ ভাব; কারো কথার উত্তর দেয় না বড় একটা। কোন চিঠিপত্র দেখলেই বিড় বিড় করে বলে—সব মিছে কথা, সব বানানো গল্প। অন্য কাজে কেউ গেলেও শুধায়—চিঠি এনেছ? মিথ্যে কথা।

অরুণ মাঝে মাঝে যাচ্ছে তাকে দেখতে। একদিন অরুণকেই বলে বসল জানো, সবচেয়ে বেশি মিথ্যে কথা শিখতে হলে চিঠি লিখো।

আবার একদিন শুধাল—মীনাক্ষী চিঠি দিয়েছে?—ওঃ দেয়নি বুঝি। বলে কেমন একটা বিভ্রান্তিকর হাসি হেসে বলল—বুঝেছি, কেন দেয়নি। সে চিঠি তো মিছে কথায় ভর্তি। অরুণ এসে মীনাক্ষীকে বলতে মীনাক্ষীর মুখখানা শুকিয়ে গেল। তখনই সে অরুণকে বলল—চলো, আমি একবার দেখে আসব তাকে। কতদিন এমন হয়েছে? আমাকে কেন বলোনি।

ইতিমধ্যে অন্য ডাক্তার এসে তাকে পরীক্ষা করে বলেছেন—পাগলের লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে। পাগলা গারদে পাঠানো দরকার।

মীনাক্ষী এখানে এসে একথা শুনেই বাধা দিল—দরকার নেই। এখানেই চিকিৎসা হবে—আমার চোখের সামনে। যত টাকা লাগে আমি দেব।

অরুণ বুঝি কি একটা বলতে গিয়েছিল। মীনাক্ষী এক ধমক দিয়ে বলে উঠল—পাগলা গারদে গেলেই পাগল সেরে যায়? তুমি কথা বলতে এসো না এর মধ্যে। আমাদের বাড়ীতেই নিয়ে চলো এঁকে। চাকর-বাকরের হাতে ওঁর চিকিৎসা, সেবা-শুশ্রূষার ভার আমি ছেড়ে দিতে পারব না।

মীনাক্ষীর বাড়ীতেই আছে এখন অনুপম। পাগলামির চিকিৎসা চলছে, কিন্তু উন্নতির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। মীনাক্ষী তাই বলে হাল ছেড়ে দেয়নি। তার সঙ্কল্প আছে, এদেশে না হলে বিলেতেও ওকে পাঠাবে চিকিৎসার জন্যে।

লোকে এখনও অনুপমকে ডাক্তার বলে, কিন্তু একটা বিশেষণ জুড়ে দেয় তার আগে—'পাগলা' ডাক্তার।

॥ শেষ ॥

এডিসন

॥ সমীরণ চৌধুরী ॥

হাজার হাজার বছর পায়ে পায়ে এগিয়ে আজ সভ্যতার যে স্তরে মানুষ উপনীত তার প্রতি পর্বে মানুষের কল্পনা, চিন্তা এবং কর্মকুশলতার বিস্ময়কর পরিচয় ছড়িয়ে রয়েছে। দার্শনিক জোড-এর সংগে কেবলমাত্র বিলাসবহুল জীবনযাত্রাকে সভ্যতার চিহ্ন বলে না মানতে পারি, কিন্তু যাঁরা এই এগিয়ে চলার উপকরণ যুগিয়েছেন প্রতি পদে তাঁদের শ্রদ্ধা না জানিয়ে উপায় নেই। মানি, যাঁরা মানুষের কল্পনার জানলাগুলো খুলে দিয়ে হৃদয়ের দিকচক্রবাল রেখার পরিধি বাড়িয়ে গেছেন যুগে যুগে, যাঁরা বিশুদ্ধ চিন্তার সোনার ফসলে ভরিয়ে তুলেছেন সভ্যতার সোনার তরী—তাঁরা নমস্য। আমাদের খুঁটে-খাওয়া জীবনের গ্লানি অন্তত সাময়িকভাবে ভুলে যাওয়া যায় তাঁদের সংস্পর্শে। কবি, দার্শনিক, বিজ্ঞানী— কালিদাস, রবীন্দ্রনাথ, শেক্সপীয়র, গ্যয়টে, প্লেটো, বৈদিক ঋষিকুল, আরিস্ততল, শোপেনহাওয়ার, মিল, কোঁতে, আর্যভট্ট, কণাদ, নিউটন, আইনস্টাইন—এঁরা সমস্ত মানব জাতির নমস্য। ভাবতেও ভয় হয় এঁরা যদি না জন্মাতেন।

কিন্তু এঁদের পাশাপাশি আর এক জাতের মানুষ সাধনামগ্ন, কর্মযোগে উৎসর্গীকৃতপ্রাণ। এঁরা মানব সভ্যতার ইঁট-কাঠ-পাথর জুগিয়ে যাচ্ছেন প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে। জীবজগতে যোগ্যতমের উদ্বর্তন, এ যুদ্ধে মানুষ যে আজ একচ্ছত্রাধিপত্য স্থাপন করেছে তার মূলে এঁদের অবদান লঘু করে দেখার চেয়ে হাস্যাস্পদতর কিছু ভাবা সম্ভব কি?

প্রাণের প্রথম আবির্ভাবের পর কত লক্ষ যুগ কেটে গেল—চরম শীতল এবং উষ্ণ পরিবেশের নাগরদোলায়

● টমাস এ. এডিসন (১৮৪৭—১৯৩১)

দুলতে দুলতে, বিবর্তনের ধাপগুলো পেরিয়ে পেরিয়ে এক শুভক্ষণে ধরাপৃষ্ঠে দেখা দিল মানুষ। আদিম মানুষ। যার প্রাথমিক কাজ নিজেকে টিকিয়ে রাখা। তার মগজের কোষে কোষে যে চিন্তার ঢেউ উঠত, তা' রূপ পেত তার কায়িক শ্রমে। নিজেকে শুধু বাঁচিয়ে রাখাই নয়, অস্তিত্বকে মধুরতর করে তোলার আকাঙ্ক্ষা দেখা দিল তার মনে। প্রকৃতির মহলে মহলে তোলপাড় সুরু করল সে সাধ্যমত। সেই অজ্ঞাত, অখ্যাত আদি মানবের ধারা আজও প্রবহমান। প্রকৃতির ভাণ্ডার লুটে মানব-মঙ্গল কর্মে তার আহুতি দেওয়ার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ক্ষান্তিহীন।

এতে অগৌরবের স্থান কোথায়? একদিকে এ আমাদের যেমন জীবন-যুদ্ধে জয়ী করেছে, অপরদিকে তেমনি অস্তিত্বকে কেবল অসহনীয় বোঝায় পরিণত হতে দেয় নি। তা' ছাড়া ভোলা উচিত নয় প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ আজও মুষ্টিমেয় কয়েকজনের জন্যই শ্রেষ্ঠ, অধিকাংশ মানুষই সাধারণ অতি সাধারণ—গড্ডলপ্রবাহে ভাসমান। সুতরাং এই কর্মোদ্যম তাদের বাঁচিয়ে দিয়েছে, কিছু করার অন্তহীন সুযোগ এনে দিয়েছে তাদের জীবনে। আর, স্বপক্ষে নজীর দেবো গীতার। কর্মেই মানুষের অধিকার। কাজের যে অসাধারণ মহিমা গীতায় কীর্তিত তার বাস্তব ভিতটুকু অস্বীকার করা খুব সুবুদ্ধির পরিচায়ক নয়। বিশেষত আধুনিক যুগে, যখন মানুষ নিজের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হয়ে শুধু নানা স্বার্থের গোলকধাঁধায় দিশে হারিয়ে ফেলছে ক্ষণে ক্ষণে, তখন কর্মই তার বিশ্বস্ত দিশারী। 'কর্মযোগে

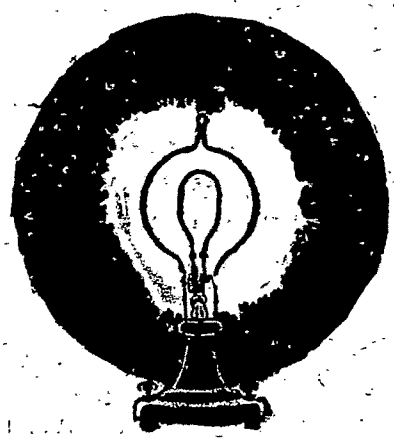

● এডিসনের শ্বেতোত্তাপদীপ্ত বা ইনক্যানডিসেণ্ট আলো

তাঁর সাথে এক হয়ে' যাওয়া সম্ভব কি না তা তর্কসাপেক্ষ। কিন্তু ওটা যে আমাদের মুক্তির একটা পথ তা' অস্বীকার করি কোন্ মুখে?

সাধারণ মানুষ এর প্রেরণা পায় কোন অসাধারণ কর্মযোগীর কাছ থেকে প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে। প্রেরণা দেন কবিরাও কখনও কখনও অস্বীকার করি না। স্বপ্ন বাসরের বিরহিণী বাতির তারা রাত পথ চাওয়া তাদের কাছে কোন বিশেষ আবেদন পৌঁছে দিতে পারে না, সময় নেই, সময় নেই। তবুও----। তবুও একটা রোমাণ্টিকতার মেদুর ছোঁয়া লেগে থাকে সৃষ্টির সর্বাংগে ওতঃপ্রোতভাবে। আসলে কবির কাজ মানুষকে উত্তেজিত করা নয়, তাকে পথে টেনে নাবান নয়, সে কথা কখনও ভুললে চলে না।

এইজন্যই প্রয়োজন কর্মবীর—যিনি নিজের জীবন মানবকল্যাণকর্মে উৎসর্গ করেছেন এবং অন্যের মনে জ্বালিয়েছেন আলো, যে-আলো তাকে পথ দেখাবে আজীবন, তাকে পৌঁছে দেবে কল্যাণকর্মের পূত তীর্থে। এদের জীবনেতিহাস তাই আজও আকর্ষণীয়, মূল্যবান। মহাজন যে পথে হেঁটেছেন সে পথে পা ফেলা নিরাপদ; আমাদের মত যারা অতি সাধারণ তাদের অন্য পন্থাঃ।

(২)

প্রকৃতিতে দিনরজনী কর্মস্রোত বয়ে চলেছে নীরবে, এই নীরব কর্মদীক্ষা চেয়েছিলেন কবি। কেন না, বিরাট এই পৃথিবী থেকে যে মানুষ স্বার্থপরতায় নিজেকে বিমুখ করে রাখে তার বাঁচার শিক্ষা নিতান্ত অসম্পূর্ণ। জগদ্ধিতায় নিজেকে উৎসর্গ করা সম্ভব চিন্তায় এবং কর্মে। এই জাতের কর্মযোগীদের মধ্যে টমাস আল্‌ভা এডিসন-এর নাম অবিস্মরণীয় মহিমায় উজ্জ্বল।

বিজ্ঞান এবং যন্ত্রবিদ্যার প্রগতিতে কে বড়—তাত্ত্বিক না হাতে-কলমে যাঁরা কাজ কচ্ছেন তাঁরা—সে প্রশ্ন আজও অমীমাংসিত। বিজ্ঞানের ঐতিহাসিক এবং দার্শনিকদের মধ্যে এ নিয়ে বিতর্কের অন্ত নেই।

● এডিসনের বৈদ্যুতিক ইঞ্জিন (মেনলো পার্ক, ১৮৮২ খৃষ্টাব্দ)

প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞান মন্দিরে প্রকোষ্ঠ অসংখ্য, সেখানে সব ধরণের বৈজ্ঞানিক প্রতিভারই সাদর আমন্ত্রণ। নিউটন, জগদীশচন্দ্র, আইনষ্টাইন বা অধ্যাপক রোর-এর প্রতি এ যুগের ঋণ অপরিসীম; কিন্তু যারা কর্মের চাকা সচল রেখেছেন, চিন্তার তত্ত্ব বাস্তবায়িত করেছেন এবং করে চলেছেন অহরহ তাঁদের কাছেও আমাদের ঋণের পরিমাণ স্বল্প নয়, এদের মধ্যে 'মেনলো পার্ক-এর যাদুকর' টমাস আল্‌ভা এডিসন তার প্রতিভায়, প্রভাবে অতুলনীয়। ১৮৪৭-এর ১১ই ফেব্রুয়ারী তাঁর জন্মদিন, ঠিক ৮৪ বছর পরে ১৯৩১-এ তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

দীর্ঘ জীবনে প্রায় দু' হাজার পেটেণ্ট নিয়েছিলেন এডিসন; অনেকের ধারণা পেটেণ্ট না করেই তিনি বিলিয়ে দেন সাধারণের কল্যাণার্থে।

তাঁর চিন্তাশক্তি এবং কার্যক্ষমতা এত বিস্ময়কর যে আজও কেউ সব কিছু গুছিয়ে বলতে পারেননি। বৈদ্যুতিক আলো, ছবি, মূক এবং সবাক গতিময় ছবি, বহুগুণিত তড়িৎ-বার্তা বিজ্ঞান, কার্বন টেলিফোন প্রেরক-যন্ত্র, বৈদ্যুতিক রেল—কেবল এই কটিই যে-কোন মানুষকে বৈজ্ঞানিক এবং যন্ত্রবিদ্যার আবিষ্কারকদের মধ্যে প্রথম সারিতে জায়গা করে দেয় চিরকালের জন্য। এবং এ সবই এডিসন-এর আবিষ্কার।

এ ছাড়াও ডুপ্লিকেটিং যন্ত্র প্রথম কার্যকরী লাউড স্পীকার, মেগাফোন, খনিজ লোহার চৌম্বক ঘনীকরণ, বিদ্যুত-চৌম্বক ব্রেক, নিকেল-লোহা, স্টোরেজ ব্যাটারী, সিমেণ্ট উৎপাদনের সুদীর্ঘ চুল্লী এবং আরও অসংখ্য আবিষ্কার তাঁর নামের সঙ্গে জড়িত। মানুষের জীবনযাত্রার প্রায় প্রতি ক্ষেত্রে তাঁর চিন্তা এবং কর্মের ছোঁয়া।

কেবল অবাক করা আবিষ্কারই নয়, আবিষ্কারের যন্ত্রও তাঁরই অবদান—যন্ত্রবিদ্যার আধুনিক গবেষণাকেন্দ্র। পৃথিবীতে তিনিই প্রথম চিন্তাকে প্রয়োজনীয় দ্রব্যোৎপাদনে নিয়োজিত করার উদ্দেশ্যে সত্যিকারের গবেষণাগার তৈরী করেছিলেন।

এমন মানুষ যে উপকথার নায়ক হয়ে উঠবেন তা' খুবই স্বাভাবিক। শোনা যায়, বাবা-মা'র দারিদ্র্য তাঁকে কর্মক্ষেত্রে ঠেলে দিয়েছিল। অথচ তা' নয়, তাঁরা দরিদ্র ছিলেন না। তাঁর বাবা ওহিও-র একজন সফল কাষ্ঠ ব্যবসায়ী ছিলেন, ঘরের ছাউনি দেওয়া কাঠ নিয়ে ছিল তাঁর ফলাও ব্যবসা।

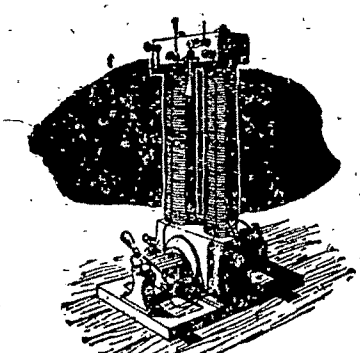

● এডিসন আবিষ্কৃত একটি ডায়নামো

তাঁর সাত বছর বয়সে তাঁরা সকলে হুরোন বন্দরে উঠে এলেন; তাঁর বাবা এখানে শস্য ও নানা আপ্‌ডম-বাগড়ম জিনিষের বেশ সমৃদ্ধিশালী কারবারী হয়ে ওঠেন। ইনি যে ১৩ বছরের আগেই গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রেলওয়েতে খাগজ বিক্রী করেন এবং মিছরির টুকরো, তার কারণ নিজস্ব কুঠরীতে যে সুন্দর গবেষণাগার তৈরী করেছিলেন তিনি, তার জন্য পয়সা দরকার ছিল রীতিমত।

এ কথা মানতেই হয় যে, তিনি ভাল ছাত্র ছিলেন না এবং তাঁর শিক্ষা মা'র কাছে এবং বাড়ীতে বসে পড়া-শুনার ফল। এ ক্ষেত্রে ফল হয়েছিল ভাল। কেন না, ফলত অত্যন্ত জেদী হ'লেও তাঁর স্বাতন্ত্র্য গড়ে ওঠায় এ শিক্ষার অবদান ছোট করে দেখা চলে না।

মাত্র উনিশ বছর বয়সে তিনি প্রথম আবিষ্কার করলেন—কংগ্রেস-এ ভোট টোকার যন্ত্র। বিশেষ পাত্তা পান নি এডিসন।

ভালমত শিক্ষা হ'ল তাঁর। এর পর তিনি এমন কোন জিনিস আবিষ্কারে মনোযোগ দেন নি যার কাটতি নিয়ে চিন্তিত হওয়ার সম্ভাবনাও বর্তমান। এ ব্যাপারে তাঁর বিবেচনা ছিল অসাধারণ।

১৮৭৬-এ মেনলো পার্ক-এ উঠে এলেন। অল্প দিন পরেই তিনি তাঁর একজন প্রধান সহকর্মী জন ক্রুয়েসি-র হাতে একটা নক্‌শা দিয়ে স্থানীয় কোন দোকান থেকে নির্দেশমত যন্ত্র তৈরী করে আনতে বললেন। ক্রুয়েসি কল্পনাও করতে পারেননি যন্ত্রটা কী কাজে লাগতে পারে।

ওটা নিয়ে এডিসন লম্বা গোলাকৃতি নলটি যত্ন করে মুড়লেন টিনের পাত দিয়ে, একটা ছোট নল ঠিক করলেন যাতে করে টিনের পাতের ওপর একটা সূঁচ রইল। এবার পাক দেওয়ার দণ্ডটির দিকে ফিরে আবৃত্তি করলেন, 'মেরী-র ছিল ছোট্ট ছাগলছানা,' ছোট্ট নলটির অপর প্রান্তে পৌঁছে গেল কথা ক'টি। যখন তিনি অন্য সূঁচটি সরু খাতে ঘুরিয়ে দিয়ে পাক দেওয়ার দণ্ডটি ঘোরালেন, 'মেরীর ছিল ছোট্ট ছাগলছানা' প্রতিধ্বনিত হ'ল গবেষণাগারের জনৈক কর্মীকে অবাক করে দিয়ে। ফোনোগ্রাফ এ ভাবেই আবিষ্কৃত হয়।

এ যন্ত্রটি তাঁর বড় প্রিয় ছিল। কিঞ্চিৎ কালা ছিলেন তিনি। শোনা যায়, যখন কাগজ বেচতেন তখন ট্রেণের কামরায় তাঁর গবেষণাগারে রাসায়নিক পদার্থ পড়ে গিয়ে আগুন ধরে যায়, ফলে জনৈক ট্রেণ-চালক এমন চপেটাঘাত লাগিয়েছিল তাঁর কানে যে তিনি শ্রবণশক্তি হারান অনেকখানি। অবশ্য তিনি বলেছেন, একদিন জনৈক রেল কর্মচারী তাঁকে বাঁচানোর জন্য কান ধরে টেনে তুলেছিল কামরায়, তাই কানের এই অবস্থা। ট্রেণে উঠতে গিয়ে পা পিছলিয়ে গিয়েছিল, আর একটু হ'লেই চাকার তলায় গিয়েছিলেন আর কি!

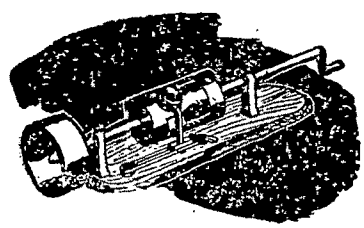

● একটি টিনের তৈরী ফোনোগ্রাফ যন্ত্র

যাই হোক, এর ফলে কেবল যে একাগ্র হ'তে সুবিধে হয়েছিল তা' নয়, ফোনোগ্রাফ-এর ব্যাপারেও সুবিধে হচ্ছিল বহুল পরিমাণে। এ ধরণের অনেক মানুষের মত তাঁরও "S" জাতীয় ধ্বনি শুনতে অসুবিধে হ'ত রীতিমত, ধ্বনিটির প্রক্ষেপও অসুবিধেজনক। অনেক চেষ্টার পর তিনি সফলকাম হন। উল্লসিত এডিসন বলেছিলেন 'যখন এটা করা হয়ে গেল, বুঝলাম আর কোন কিছুই আটকে থাকবে না।'

ফোনোগ্রাফ বাদ দিয়ে বৈদ্যুতিক আলোর কথা ভাবা যায় না। কারণ, ওর জন্য যে পরিমাণ আর্থিক সাহায্য প্রয়োজন তা' তিনি ফোনোগ্রাফ-এর আবিষ্কারক হিসেবে পেয়েছিলেন।

আগেই আবিষ্কৃত হয়েছিল আর্ক বাতি। কিন্তু ওগুলো আকারে বেশ বড়; সুতরাং রাস্তায় বা বিরাট কোন সমাবেশে কার্যকর। এডিসন ঠিক করলেন বাড়িতে ব্যবহার করা সম্ভব এমন কোন আকারে ছোট বৈদ্যুতিক বাতি বের করবেন।

সামান্য কিছু পরীক্ষা তাঁর করা ছিল। ডেভির পদ্ধতি ঘেঁটে তিনি বুঝলেন কাজটা বেশ শক্ত ধরণের। তাই, ৩০০,০০০ ডলার তুললেন এই উদ্দেশ্যে। এডিসন ইলেকট্রিক কোং প্রতিষ্ঠিত হ'ল।

সুরু হয়ে গেল বিরাট গবেষণা। দেখা গেল প্রজ্জ্বলিত সরু তার খোলা হাওয়ায় তেমন কার্যকর নয়। প্রায় সবটুকু পদার্থই জারণের ফলে কাজে আসে না। কাজেই তারটা কোন বায়ুশূন্য কাঁচের আধারে রাখা দরকার।

প্রথম পরীক্ষাগুলো সফল হয়নি। প্লাটিনাম-ইরিডিয়াম-এ তৈরী তার জ্বলল মাত্র কয়েক মিনিট। কাঁচের আধারে বায়ু থেকে যাচ্ছিল কিছু পরিমাণে; তা' ছাড়া তারেও কিছুটা বায়ু মিশে থাকত।

তিনি আবিষ্কার করলেন আধারে বায়ু নিষ্কাশনের সময় মিশে থাকা বায়ু তারের মধ্য দিয়ে সামান্য বৈদ্যুতিক প্রবাহ চালিয়ে এবং উত্তপ্ত করে বের করে দেওয়া যায়। এ সময় অনেক বেশী উন্নত এক ধরণের বাতি তিনি তৈরী করেছিলেন। মনে হ'ল তিনি ঠিক পথেই এগোচ্ছেন।

এর পর সুরু হ'ল তার তৈরীর সঠিক উপাদান সংগ্রহ। অসংখ্য বস্তু পরীক্ষিত হওয়ার পর ১৮৭৯-র ২১শে অক্টোবর ঘোষিত হ'ল প্রজ্জ্বলিত বৈদ্যুতিক আলোর শুভ জন্ম—কার্বনাইজড্ সূতোয় মোড়া বাল্‌বটি জ্বলেছিল মাত্র ৪০ ঘণ্টা। অনুসন্ধান থেমে রইল না। পাওয়া গেল কার্বনাইজড্ বাঁশের তন্তু। মাত্র তিন দশক আগে পাওয়া গেছে টাণ্ট্যালাম্ এবং টাংস্টেন জাতীয় ধাতু থেকে তৈরী সূক্ষ্ম তারের সন্ধান।

শুধু বাতিই নয়, বাতি জ্বালাবার অন্যান্য হাজারো সরঞ্জাম আবিষ্কার করেছিলেন এডিসন; কোন কোনটার নক্‌শা। কার্যোপযোগী ডায়নামো

(১৬১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

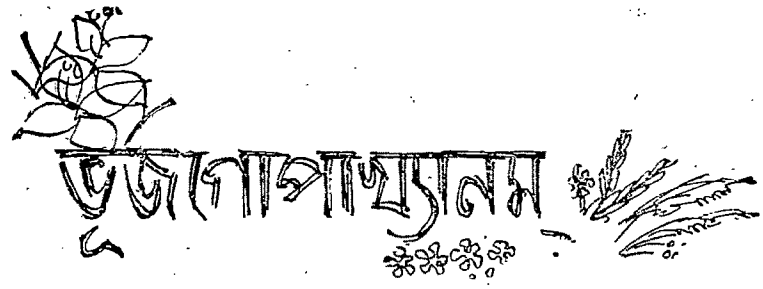

লৌকিক দেবী মনসার অনুচরদের নিয়ে পৃথিবীর নানা দেশে নানা গল্প-কথা গড়ে উঠেছে। দেবীকে নিয়ে কাব্য আর তাঁর বাহনদের নিয়ে সম্ভব-অসম্ভব বহু বিচিত্র আসর জমানো টুকিটাকি। আগে দেবী, তারপর বাহন।

মনসা সম্বন্ধে ভারতোপাখ্যান সুপরিচিত, সুতরাং শুধু ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে বর্ণিত উপাখ্যান অল্প কথায় বলা যাক। সর্পদেবী মনসার সৃষ্টি করেন মহর্ষি কশ্যপ। ব্রহ্মার উপদেশে ইনি সর্পমন্ত্র সৃষ্টি করার পর তপো-প্রভাবে মানস প্রক্রিয়ায় যে দেবীকে সেই সব মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে জন্ম দেন, তিনিই মনসা---কশ্যপ মুনীর মানসী কন্যা। সর্পভয়ভীত মানুষকে অভয় দেওয়ার উদ্দেশ্যে মনসার সৃষ্টি। কুমারী মনসা দেবাদিদেবের কাছ থেকে স্তব, পূজা, মন্ত্র ইত্যাদি শিখে নিয়ে সিদ্ধযোগিনী হন; পরে পূজো পান সকলের কাছ থেকে। মানুষই তাঁকে সব থেকে বেশী অবজ্ঞা করেছিল---চাঁদ সদাগর। অনেক ঘটনা এবং দুর্ঘটনা ঘটিয়ে তবে অনিচ্ছুক সদাগরের পূজো পেয়েছিলেন দেবী; বাঁ হাতে তাঁর ঘটে ফুল ছুঁড়ে দিয়েছিলেন চাঁদ সদাগর। সে অন্য কাহিনী। কাব্যকথা।

শহুরে মানুষের সাপ সম্বন্ধে কৌতূহল নেই বললেই চলে। কারণ অনেক। কিন্তু গেঁয়ো লোকের পক্ষে সম্পূর্ণ নিরাসক্ত থাকা অসম্ভব; কেন না, তাদের নিয়ে যে বাস করতে হয়। শহরে যেহেতু সাপ চোখেও পড়ে না এবং তার উৎপাতের কোন বালাই নেই, তাই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় কিম্বা ও নিয়ে মাথা ঘামানো হয়ে ওঠে না। কাজেই সখ মেটাতে মানান গল্প মুখে মুখে ফেরে---কাল্পনিক, চমকে দেওয়া বেজায় উমদা বহু আধাসত্য সাপের গল্প। এত বিচিত্র গল্প বোধহয় আর কোন জন্তু সম্বন্ধে শোনা যায় না। এবং চট করে এমন বিশ্বাস জন্মে যায় সর্পঘটিত গল্পে।

যারা ভূত-প্রেত-দত্যি-দানো-য় বিশ্বাসী, কিম্বা যাদুবিদ্যায় তাদের অমরা উপহাস করি কুসংস্কারাচ্ছন্ন বলে, অথবা তাদের মূর্খামীর সমালো-চনায় মুখর হয়ে উঠি। অথচ, আমরাই আবার জলজ্বলে চোখ আর অদম্য কৌতূহল নিয়ে সম্ভাব্য অসম্ভাব্য সব রকম সাপের গল্প শুনতে নিতান্ত উৎসুক, বিশ্বাস করতেও।

যেমন, শোনা যায় এক জাতের সাপ নিজের লেজ মুখে পুরে দেয়, লম্বাভাবে গোল হয়ে উঠে দাঁড়ায়, তারপর পাহাড়ের গা বেয়ে নীচে গড়িয়ে নামে। গল্প আছে যদি এ জাতের সাপ কাউকে তাড়া করে

'বাসুকি'

এবং তিনি কৌশলে পাশ কাটিয়ে যান, তা' হ'লে সাপটি গড়িয়ে পাহাড়ের তলায় নেমে এসে হঠাৎ সোজা হয়ে ওঠে এবং বর্শার মত সোজা নিকটতম গাছের ওপর চলে যায়। এর বিষ এত তীব্র যে শোনা যায় তক্ষুণি গাছটির সব পাতা ঝড়ে পড়ে এবং শুকিয়ে মরে বেচারা।

এমন কদ্ভূত গল্প যে কী করে চালু হ'ল তা' বলা দুঃসাধ্য। আর, সমতল ভূমিতে, যেখানে পাহাড়ের চিহ্নও নেই, সেখানেই এ গল্প বারবার কাণে আসে। সাধারণত প্রায় সব সাপের গল্পরই মূল কারণটুকু বোঝা সম্ভব, কিন্তু এই গল্পটার হেতু যে কি তা' বোঝা যায় নি আজও।

কোন কোন সাপের সত্যিই শক্ত, শিঙেল হয় লেজের প্রান্তটুকু, কিন্তু ওগুলো একেবারে নীরেট, কোনমতেই জোর আঘাত দেওয়া চলে না ওর সাহায্যে। কোন কোন বড় জাতের সাপের যেমন, লাল-পেট পাঁকের সাপ এবং রামধনু সাপের লেজ শক্ত, হাত দিয়ে তা' ঠেকাতে গেলে হাতের চামড়া ফুটো হওয়া বিচিত্র নয়। এর থেকেই অনুমান করা যায় কেমন করে শক্ত, জোরালো আঘাত দেওয়ার শক্তিসম্পন্ন লেজওলা সাপের গল্প চালু হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এমন কোনও সাপের কথা জানা যায়নি যা লেজের প্রান্ত দিয়ে মারাত্মক ঘা দিতে পারে, অথবা যার লেজের শেষ অংশ বিষাক্ত।

গোলাকারে লম্বভাবে অবস্থান কোন সাপের পক্ষে শারীরিক কারণে অসম্ভব। তবে মনে হয়, মাটির ওপর কুণ্ডলী পাকানো বড় সাপ দেখে হয় ত কল্পনা-প্রবণ মন এই গল্পটি তৈরী করেছে।

আর একটি গল্পও প্রায়ই শোনা যায়। এক জাতের সাপ না কি বিপদের সময় বাচ্চাগুলোকে মুখের ভেতর পুরে ফেলে। মা সাপ না কি হাঁ করে এবং বাচ্চারা ভেতরে ঢুকে পড়ে হামাগুড়ি দিয়ে। বিপদ কাটলে সে আবার হাঁ করে, আর ওরা বেরিয়ে আসে মুখের ভেতর থেকে।

গল্পটি খুব চালু, ফলে প্রতিবাদ করা একটু মুস্কিল। কিন্তু এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি এখনও যা এই অদ্ভুত গল্পটির স্বপক্ষে নজীর হিসেবে তুলে ধরা যায়। অবশ্য গল্পটি চালু হওয়া এবং লোকমুখে ছড়িয়ে পড়ার দু'টি বেশ জোরালো কারণ পাওয়া সম্ভব।

প্রধান কারণ ওদের মাংসলোলুপতা। অনেক জাতের সাপ অন্য সাপ মারতে বা খেয়ে ফেলতে বিন্দুমাত্র ইতস্তত করে না, স্বগোত্রের ছোটখাট প্রাণীরাও রেহাই পায় না এদের হিংস্রতার হাত থেকে। শহরতলীর মানুষ আমরা। বড় জাতের সাপ ছোট সাপ খাচ্ছে—এ দৃশ্য আমাদের কাছে অপরিচিত নয়। সাপের খাদ্য সম্পর্কে অজ্ঞ কোন কল্পনাপ্রবণ মানুষ এই দৃশ্য দেখে যদি ভেবে থাকেন মা'র মুখে বাচ্চা ঢুকছে বিপদ বুঝে, তবে তাকে খুব বেশী দোষ দেওয়া উচিত নয়।

এ ছাড়া, অনেক জাতের সাপের বাচ্চা জ্যান্ত অবস্থায় প্রসূত হয়। পেটে বাচ্চা সমেত কোন সাপিনী যদি হঠাৎ চাপা পড়ে, তা' হ'লে ব্যাপারটা অনেকখানি সীজারিয়ান অস্ত্রোপচারের মত হয়ে দাঁড়ায় কার্যত। তখন চারদিকে কিলবিল করবে ক্ষুদে বাচ্ছার দল এবং কল্পনা করে নেওয়া আদৌ অসম্ভব নয় যে মা-সাপ ওগুলো গিলে ফেলেছিল আগেভাগে। যাই হোক, সাপের পরিপাক রস বেশ শক্তিশালী কাজেই যদি তার অন্ননালীতে ওরা ঢুকে পড়ত তা' হ'লে হজম হয়ে যেত অন্য যে-কোন খাদ্যের মতই।

অনেকে মনে করেন সাপ ক্ষীণদেহী। এ ধারণা ঠিক নয়। কোন সাপই স্বভাবত ক্ষীণ হ'তে পারে না। সদ্য জল থেকে ওঠা কোন সাপ দেখে তা' মনে হওয়া সম্ভব; কয়েক জাতের সাপ এত চকচকে যে মনে হয় ওদের দেহ তৈলাক্ত, পিচ্ছিল। আসলে ওদের গা নরম চামড়ার মত।

কারোর কারোর বিশ্বাস যে চাবুক সাপ শিকার জড়িয়ে ধরে পাকে পাকে এবং তার পেষণের ফলে বেচারার প্রাণান্ত হয়। কিন্তু এরা আদৌ সংকুচিতও হয় না, শিকারকে পেঁচিয়ে ধরা ত দূরের কথা। কাজেই গল্পটি আকাশকুসুমমাত্র। চাবুক সাপের লেজের সঙ্গে বিনুনী করা চাবুকের সাদৃশ্য আছে, তাই এই মিলটুকুর সূত্র ধরে গল্পটি সুরু হওয়া খুবই সম্ভব।

আগষ্ট মাসের ভীষণ গরমের দিনগুলোয় সাপ না কি দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলে। এ গল্পও বহুল প্রচলিত। এর মধ্যে খানিকটা সত্যি, যদিও নিছক কল্পনার খাদ মিশেছে তার সঙ্গে। বেড়ে ওঠার তাগিদে সাপ নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর খোলস ছাড়ে, ফলে আর একটা সুবিধেও হয়, কোন আগাছা গায়ে লেগে থাকলে তা' খসে পড়ে খোলসের সাথে।

খোলস ছাড়ার কয়েকদিন আগে সাপের চামড়ার ধরণ পালটায়, চোখ হয়ে ওঠে নীলাভ কিম্বা ধূসর। কিছু পরে যখন চামড়ার স্বাভাবিক রং ফিরে আসে এবং চোখও স্বাভাবিক হয়, তখন ঠিক খোলস ছাড়ার সময়। এর পর সাপটি পাথর বা কাঠের গুঁড়ি জাতীয় কোনও শক্ত জিনিষে মাথা ঘসে চিবুকের তলার এবং মাথার ওপরকার চামড়া ঢিলে করে নেয়, তারপর নিজের চর্মখোলস ত্যাগ করে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে পড়ে।

গরম আবহাওয়ায় এদের খোলস ছাড়ার সম্ভাবনা বেশী, কেন না, বসন্ত বা শীতের তুলনায় এ সময় ওদের দৈহিক ক্রিয়া দ্রুততর হয়ে ওঠে। কাজেই বছরের অন্যান্য সময়ের তুলনায় আগষ্ট মাসে সাপের চোখ নীলাভ কিম্বা ধূসর হয়ে ওঠার সম্ভাবনা বেশী।

এ অবস্থায় ওরা ভাল দেখতে পায় না। কারণ, ওদের চোখের ঢাকনা অস্বচ্ছ হয়ে ওঠে, এবং আলো-ছায়ার পার্থক্য ধরতে পারলেও স্পষ্ট করে দেখা সম্ভব হয় না ওদের পক্ষে। সুতরাং ছায়ার ওপর ছোবলানো এ সময় স্বাভাবিক। যদি বিষাক্ত সাপ হয় তা' হলে অন্য সময়ের তুলনায় বেশী বিপজ্জনক হয়ে ওঠাও বিচিত্র নয়।

আরও আছে। কেউ বা বিশ্বাস করেন শিকারকে সম্মোহিত করে সাপ। এর কারণ সম্ভবত এই যে, যখনই কোন শত্রু বাসার কাছাকাছি আসে তখনই অনেক পাখি নিজেদের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করার উদ্দেশ্যে অদ্ভুত ভঙ্গীতে ওড়ে কিম্বা ছোটে। অনেক পাখিই ডানাভাঙ্গায় ভান করে পড়ে থাকে, উড়তে পারছে না—ভাবটা এই রকম। ফলে, শত্রু শাবকদের ভুলে ধাড়িটার দিকে এগোতে থাকে। এভাবে ধাপ্পা দিয়ে পাখিটি উড়ে পালায়। বড় বড় সাপের সামনে কোন পাখিকে এই অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে অনেকেরই মনে হতে পারে যে সাপটা সম্মোহিত করছে পাখিটাকে।

মেরে ফেলার পর সূর্যাস্ত পর্যন্ত নাকি সাপের লেজ নড়তে থাকে। এ বিশ্বাস অনেকের আছে। আসলে নিষ্ঠুরভাবে নিহত হওয়ার পরও বেশ খানিকক্ষণ স্নায়ুর উত্তেজনাবশত আক্ষেপ থেকে যেতে পারে। মৃত্যুর পর কিছুক্ষণ লেজ নড়তে পারে, কিন্তু সূর্যাস্তের সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক নেই।

আবার এও শোনা যায় যে সাপ গোলা ঘরে ঢুকে গরুর বাঁট থেকে দুধ খায়। দুধ টেনে খাওয়ার উপযোগী নয় ওদের মুখ; এদের সূচীতীক্ষ্ণ দাঁতের সারি, যার ফলে অত্যন্ত নিরীহ গরুও অস্বস্তি বোধ না করে পারবে না। গোলাঘর ইত্যাদি প্রায়ই ইঁদুর রোয়াই হয়ে থাকে, আর এদের লোভেই সাপ ঢোকে, গরুর দুধ টেনে খাওয়ার সদিচ্ছা নিয়ে নয়।

প্রাচীনকাল থেকে পৃথিবীর নানা অংশে এই বিশ্বাসটি প্রচলিত যে, টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলা সাপের দেহাংশ আবার জোড়া লেগে যায়। এই উপকথাটি গ্লাস সাপের ওপর ভিত্তি করে রচিত। আসলে এ জাতের সাপ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গহীন গিরগিটি বিশেষ। অনেক রকম টিকটিকি গিরগিটির লেজ চাপ দিলে খসে পড়ে। লেজের যে-কোন অংশই বিচ্ছিন্ন হ'তে পারে, আর যেহেতু গ্লাস সাপের লেজ দেহের তুলনায় বৃহত্তর, মনে হওয়া অসম্ভব নয় যে সাপটির দেহাংশ খসে পড়ছে। কাঠ জাতীয় শক্ত কোন কিছু দিয়ে আঘাত করলে নানা জায়গায় খসে পড়া স্বাভাবিক এবং কয়েকটা টুকরোও হ'তে পারে। লেজটি, অথবা টুকরোটা বাঁচে না, কিন্তু গিরগিটি সড়সড় করে পালিয়ে যায়, কাজেই

(১৬১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বৈচিত্র্যের বদলে

সুশীল রায়

"লাইফটা একেবারে একঘেয়ে হয়ে গেল" আক্ষেপ করে বলল উপানন্দ, "জীবনে যদি কোনো রোমাঞ্চ না থাকল, বৈচিত্র্য না থাকল, তাহলে জীবনের মানে কি হে, বটব্যাল?"

উপানন্দকে এ রকম আক্ষেপ করতে প্রায়ই শোনে মিহির, তার কাছে ও-ধরণের কথা গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে, তাই এর কোনো উত্তর সে দিল না।

কিন্তু একটা উত্তর উপানন্দ যেন চায়ই, একটা অন্তত উত্তর পেলেই সে খুশি হয়ে যেতে রাজি আছে। অথচ মিহির বটব্যাল মানুষটা যেন কেমন, একটা মানুষের একটা মেজাজকে সে তাজা রাখতে পারে না, তাজা রাখতে বুঝি চায়ই না সে।

বাইরে বেশ বৃষ্টি পড়ছে। অনেকক্ষণ থেকেই বৃষ্টি পড়ছে। কয়েক দিনের কড়া রোদ্দুরের পর এই নতুন বৃষ্টি পেয়েও উপানন্দের কাছে এটা মোটেই বৈচিত্র্য বলে নিশ্চয় বোধ হচ্ছে না। নইলে নতুন করে এখনও সে বৈচিত্র্যের জন্যে আক্ষেপ করবে কেন।

চিৎপাত হয়ে শুয়ে দেয়ালের উপর একটা পা তুলে দিয়ে একটা বিচিত্র ভঙ্গিতে গা মোড়ামুড়ি দিল উপানন্দ, হাই তুলল। আবার বলল, "একেবারে একঘেয়ে হয়ে গেল লাইফটা।"

তবু কোনো মন্তব্য করল না মিহির, তার হাতে একটা স্বরলিপির বই, একটা পাতা মেলে ধরে নিয়ে মনে-মনে গেয়ে গেয়ে সে বোধহয় নতুন একটা গানের সুর তুলে নিচ্ছে।

মাথার নীচে দুই হাত দিয়ে শুয়ে আছে উপানন্দ। মাথাটা একটু তুলে সে মিহিরের মুখটা দেখে নিল। স্বরলিপি নিয়ে সে যে বিভোর, এমন মনে হল না তার। অথচ কেন যে সে এমন নীরব তারও মানে সে বুঝতে পারল না।

এই একটি ঘরের মালিক উপানন্দ এখানে সে থাকে একা। এটাকে সে বলে হটমন্দির। কাজ করে সরকারী আপিসে। খাওয়া দাওয়া করে হোটেলে—কোনো বাঁধা হোটেলে নয়, যখন যেটাকে তার পছন্দ হয়তখন সেইটেতে ঢুকে পড়ে।

ছোট এই ঘর। উপকরণ সামান্য। আসবাবপত্রও যৎকিঞ্চিৎ। চৌকির পাশেই একটি চেয়ার। চৌকির নীচে একটি স্টোভ; আর ওদিকে দেয়ালের গায়ে দাঁড় করানো একটা ইকমিক কুকার।

হোটেলে-হোটেলেই খেয়ে বেড়ায় সে। কিন্তু ঐভাবে খেয়ে বেড়ানোও যখন একঘেয়ে মনে হয়, তখন কখনো কখনো সে রান্না করে নেয় ঐ কুকারে। কখনো চা করে নেয় ঐ স্টোভে।

বড় একা-একা ঠেকে উপানন্দের। তার মনে হয় তার বন্ধুরা কত সুখী, বৈচিত্র্য আছে তাদের জীবনে।

কিন্তু তারবন্ধুদের ধারণা আবার আলাদা। তারা মনে করে উপানন্দ কেমন আনন্দে আছে, কেমন নিঝঞ্ঝাট তার জীবন। যেমন খুশি চলা, যেমন খুশি বলা, যখন খুশি ঘরে থাকা, যখন খুশি ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়া—অন্তত আরামে আছে উপানন্দ।

এ সব নিয়ে অর্কবিতর্ক তাদের হয়েছে কিন্তু কোনরকম রফা তাদের কখনো হলো না।

এ ভাবে চিৎপাত শুয়েই দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল আবার উপানন্দ, বলল, "ওহে বটব্যাল, এত চুপ করে আছ কেন? কিছু অন্তত বলো। না হয় একটু শব্দ করেই গান গাও। একটানা একঘেয়ে বৃষ্টির এই ঝর ঝর শব্দ, কান পচে গেল। গাও, গানই গাও একটা।"

হাতের বইটা বন্ধ করে মিহির এবার একটু হাসল। একটু নড়ে বসল, বলল, "বিচিত্র মানুষ তুমি হয়ে উঠছ হে মিহির। জীবনে বৈচিত্র্যের জন্যে যে পাগল হয়ে উঠলে। কিন্তু বুঝতে পারছ না কি রকম রাজার হালে তুমি আছ। তোমার জীবন দেখে আমাদের হিংসে হয় আর নিজের জীবন নিয়ে তুমি একেবারে ইয়ে—"

একটু থেমে মিহির বলল, "বুঝেছি,

বিয়ে করার ঝোঁক হয়েছে নিশ্চয়। কিন্তু ভাই শোনো, দু রকম জীবনই আমাদের জানা। অবিবাহিত জীবন জেনে এসেছি আগে, বর্তমানে টেনে চলেছি বিবাহিত জীবনটাও। সুতরাং অভিজ্ঞ ব্যক্তির কাছ থেকে এই উপদেশ নাও—বিয়ে কোরো না।"

উঠে বসল উপানন্দ, এতক্ষণ মিহিরকে দিয়ে কথা বলানো গিয়েছে, এতক্ষণ একটা আলোচনার মধ্যে আনা গিয়েছে তাকে, এ'তেই বুঝি তার মনে অনেকটা স্বস্তি এসে গেল।

উপানন্দ বলল, "অবিবাহিত লোকদের একটা মস্ত অসুবিধে আছে, একটা আপশোসও আছে। তারা কোনো আক্ষেপ জানালেই লোকে মনে করে তার বিয়ে করার ঝোঁক হয়েছে। বিয়ে ছাড়া অন্য-কোনো বাসনা তাদের থাকতে পারে এটা কেউ বিশ্বাসই করে না।"

"বিয়ে বাদে তা হলে কি চাই তোমার?"

"বিয়ে বাদে? বিয়েটা একেবারে বাদ দিয়ে দিতে চাচ্ছি নে অবশ্য, কিন্তু যা চাই—তার নাম বৈচিত্র্য। একটা অঘটন ঘটে যাক, একটা অবিশ্বাস্য রকমের বিপদের মধ্যেই না হয় পড়তে হোক।"

উপানন্দের কথাগুলো শুনে মিহির কিছুক্ষণ কি সব ভাবল। মনে-মনে একটু বুঝি হাসল সে। বিপদ? একটা বিপদ চায় উপানন্দ? কিছুদিন থেকেই এই চাহিদা সে জানাচ্ছে এবং কিছুদিন থেকেই এসব নিয়ে সে জ্বালাচ্ছে মিহিরদের। কিন্তু উপানন্দের জন্যে কি রকম বিপদ তৈরী করা যায়, তা মিহিররা ভেবে পায়নি। উপানন্দই তাই তাদের কাছে একটা বিপদ হয়ে উঠেছে। উপানন্দই বিপন্ন করে তুলেছে তাদের।

উপানন্দ আবার বলল, "বিপদ কথাটার একটা এমন মানে হয়ে গিয়েছে যা নেহাতই একঘেয়ে। বিপদ মানেই অন্নকষ্ট, বিপদ মানেই অর্থকষ্ট, বিপদ মানেই মাথার উপর বাড়ি ভেঙে পড়া।"

"তাই।" মিহির বলল, "ঠিক বলেছ। এটাও একটা মস্ত বিপদ।"

"আরে, ইয়ে।" উপানন্দ বলল, "বিয়ের কথা বলছ? শুর মধ্যেই-বা নতুনত্ব কি আছে? নিয়ে করিনি বটে, কিন্তু এটা নিশ্চয় বুঝি যে, ওর চেয়ে চরম একঘেয়ে জীবন আর নেই। একবার ঐ ফাঁদে পা দিলে জীবনের সব ফন্দি-ফিকির একেবারে—"

শব্দ করে হেসে উঠল মিহির। হঠাৎ হাসিটা থামিয়ে উঠে গিয়ে উঁকি দিল জানলা দিয়ে। ইস্, আবার নতুন করে বৃষ্টি নামল। হাত ঘড়িটা দেখে মিহির বলল, "এবার পালাব ভাবছিলাম, আর অমনি জোর দিয়ে নামল জল।"

একটা চোখ একটু ছোট করে উপানন্দ বলল, "মাত্র ন'টা এখন। নাইট ইজ স্টিল ইয়ং, রাত্রি এখনো যৌবনবতী। আশা করি, আধ ঘণ্টা দেরি হলে, তার মধ্যে তোমার স্ত্রীও স্টিল ইয়ংই থাকবেন। তা হলে এত ব্যস্ত কেন।"

উপানন্দর মুখের দিকে চেয়ে মিহির বলল, "বা, বেশ বলেছ।"

"বলেছি তো বেশ। কিন্তু মহিলাটিকে তো একদিনও দেখলাম না। আমার ধারণার সঙ্গে তাঁর মিল কতটা তা তো পরখই করা হল না হে, বটব্যাল।"

"হবে, হবে। অচিরেই হবে। সবুরে মেওয়া ফলে হে মিত্তির।"

মনে মনে হাসতে লাগল মিহির এবং মাঝে-মাঝেই ঘড়ি দেখতে লাগল। তার এত ঘড়ি দেখারই বা মানে কি, তার ওভাবে হাসবারই বা অর্থ কি, তা বোঝা গেল না। উপানন্দ মিহিরের মুখের দিকে তাকাতে লাগল।

উপানন্দের এই যে আক্ষেপ এবং এই যে অনুশোচনা—এর মাত্রা বেড়েছে কিছুদিন থেকে খুবই বেশি। মিহিররা নিজেদের মধ্যে এ নিয়ে আলোচনা করেছে এবং অনেক হাসাহাসিও করেছে। অনেক রকমের প্ল্যান করারও চেষ্টা করেছে। অপরেশ, মনোরঞ্জন, বিনয়, তপেশ আর মিহির অনেকদিন এসব নিয়ে অনেক রকম পরামর্শও করেছে। এমন আলোচনায় ও পরামর্শে কখনো-কখনো যোগ দিয়েছে ওদের স্ত্রীরাও।

মনোরঞ্জন একদিন একটা প্রস্তাব দিয়েছিল। বলেছিল, এইভাবে উপানন্দের জীবনে একটা বৈচিত্র্য, বিকল্পে একটা বিপদ এনে দেওয়া যায় কি না। তার প্রস্তাবটা নিয়ে হাসাহাসি হয়েছিল খুব। হাসাহাসি হয়েছিল বটে, সেইসঙ্গে প্রস্তাবটা সকলে গ্রহণও করেছিল। কিন্তু প্রস্তাব গ্রাহ্য হলেই তো হল না, তদনুযায়ী কাজ করতে অগ্রসর হবে কে—অর্থাৎ যাকে বলে, বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধা সেই কাজটা করবে কে—এ কথা নিয়ে অনেক জল্পনাকল্পনা হল। অবশেষে সকলকে আশ্চর্য করে দিয়ে কথা বলে উঠল বন্দনা—সে বলল, "আমি। আমি রাজী আছি।"

মিহিরের স্ত্রীর কথা শুনে সকলে অবাক। তার মুখের দিকে সকলে তাকাতে লাগল, তারপর সকলে বলল, "শেষ পর্যন্ত সাহসে কুলাবে তো?"

বন্দনা সংক্ষেপে বলল, "দেখা যাক।"

এদিকে সাড়ে নটা প্রায় বাজে। বৃষ্টির তোড়ও একটু যেন কমেছে। মিহির উঠে দাঁড়াল, বলল, "চলি ভাই মিত্তির।"

"থেকে গেলে হত না?" উপানন্দ বলল, "স্টোভে একটু খিচুড়ি ফুটিয়ে নিয়ে দু'বন্ধুতে খেতাম। তাতে দু'জনের একটু মুখবদল হত, একটু নতুনত্বও হত।"

মিহির বলল, "সত্যি বেশ হত তা হলে। কিন্তু কে জানে ওদিকে গৃহিণীও ঘরে খিচুড়ি ফুটিয়ে তৈরি হয়ে আছেন কি না। সে খিচুড়ি যদি না খাই তাহলে বরাতে খিঁচুনি আছে যে।"

উপানন্দ করুণার সুরে বলল, "বেচারা একটা মেয়েমানুষের কাছেই এমন কাবু হয়ে আছ। মেয়েরা কত দুর্বল জীব জান না? তাদের দেখে অত ভয় পাবার আছে কি। একেবারেই জাহান্নমে গিয়েছ, একেবারেই স্ত্রৈণ হয়ে গিয়েছ হে বটব্যাল।"

"আর বলো কেন!" বলতে-বলতে রেন-কোটটা গায়ে দিয়ে নিল মিহির। দরজাটা খুলে অন্ধকারে বৃষ্টির মধ্যে নেমে গেল সে।

উপানন্দের চোখের সম্মুখ থেকে অল্পক্ষণের মধ্যেই অদৃশ্য হয়ে গেল মিহির বটব্যাল।

(১৬১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

প্রাচীন ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা

শ্রীত্রিদিবনাথ রায়

আমরা বর্তমানে যে অর্থে "শিক্ষা" শব্দটি ব্যবহার করি প্রাচীন ভারতে উহা কিন্তু সেই অর্থে ব্যবহৃত হইত না। শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ এই ছয়টিকে 'বেদাঙ্গ' বা বেদের অবয়ব বলা হইত। "শিক্ষা" বলিতে বৈদিক শব্দের উচ্চারণ-বোধক একটি শাস্ত্রকে বুঝাইত। বেদাধ্যয়ন-কামী ছাত্রগণ বেদাধ্যয়নের প্রথমে বেদের শব্দগুলি কি ভাবে উচ্চারণ করিতে হইবে তাহা গুরুর নিকট হইতে শুনিয়া অভ্যাস করিত। ইহা হইতেই ক্রমশঃ সমস্ত বিষয়ের পাঠাভ্যাসকে 'শিক্ষা' বলা হয় এবং পরে অধ্যয়ন বা জ্ঞানার্জন এই ব্যাপক অর্থে "শিক্ষা" শব্দের ব্যবহার হইতে লাগিল।

প্রাচীন ভারতে 'অধ্যয়ন' শব্দটির ব্যাপক ও সঙ্কীর্ণ উভয়বিধ অর্থ ছিল। বহুদিন পর্যন্ত ভারতে অধ্যয়নের উদ্দেশ্য কেবল মাত্র জ্ঞানার্জন ছিল না, ধর্মের সঙ্গে ইহাও ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। ব্যাপক অর্থে ইহা আত্মোৎকর্ষ বা আত্মোন্নতিকে বুঝাইত। বিদ্যার্জনের উদ্দেশ্য ছিল 'মুক্তি' বা মোক্ষ লাভ তাহার ফলে ধর্ম হইতেই সাহিত্যের উৎপত্তি হইয়াছিল। প্রাচীন পণ্ডিতগণ বিদ্যার গুণ বর্ণনায় বলিয়াছেন—অধ্যয়ন বা বিদ্যাসাধন দ্বারা অন্তরের বিকাশ হয়, বহু সংশয়ের উচ্ছেদ হয়, অপ্রত্যক্ষকে প্রত্যক্ষ করা যায়, ইহা মানবের তৃতীয় নয়নস্বরূপ এবং 'যা বিদ্যা সা বিমুক্তয়ে' অর্থাৎ বিদ্যার দ্বারাই মোক্ষলাভ হয়। জীবনের সহিত মরণ একসঙ্গে গ্রথিত। জন্ম হইলে মৃত্যু হইবে ইহা ধ্রুব সত্য সুতরাং ভারতবাসী জীবনকে বাস্তব বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে নাই, সমস্ত সৃষ্টির উদ্দেশ্যটি না জানিলে জীবনের উদ্দেশ্যকে জানা যায় না তাহাই ভারতবাসী মনে করিত। জীবন ও মরণ যে সত্যের বিভিন্ন অংশ ও দশা সেই সত্যের জ্ঞান লাভ করিলে মরণের সমস্যার সমাধান করা যায়। ভারতবাসী মনে করে ব্যষ্টিগত ব্যক্তির মৃত্যু হয় কিন্তু সমষ্টি বা অসীমের মৃত্যু নাই সুতরাং পরিবর্তন, ক্ষয় ও বিলুপ্তির অনুভূতি হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ব্যষ্টিগত ব্যক্তিকে অসীম ব্যক্তির মধ্যে মিশিয়া যাইতে হইবে। নিরঞ্জনের পরিবর্তন নাই। ব্যক্তিকরণ অর্থাৎ নিলঞ্জন হইতে চ্যুতিই মৃত্যু। বিষয়াত্মক জ্ঞানের অনুসরণের ফলেই ব্যক্তিত্ব আসে সুতরাং বিদ্যার উদ্দেশ্য হইতেছে "চিত্তবৃত্তি নিরোধ" অর্থাৎ যে সকল কার্যকলাপের ফলে মন বিষয়াত্মক জগতের প্রতি আকৃষ্ট হয় সেইগুলির নিরোধ। এই উদ্দেশ্যে মুমুক্ষু ব্রাহ্মণ আজীবন অধ্যয়ন করিতেন "যাবজ্জীবমধীতেবিপ্রঃ"।

সঙ্কীর্ণ অর্থে অধ্যয়ন বলিতে গার্হস্থ্য জীবনের উপযোগী হইবার জন্য বালক-বালিকাগণ গুরুগৃহে গিয়া গুরুর উপদেশ শুনিয়া ও তাহা অভ্যাস করিয়া জীবিকার্জনের উপযোগী বিভিন্ন বৃত্তির জন্য যে জ্ঞানার্জন করিত তাহাকে বুঝাইত। বিদ্যালাভের উদ্দেশ্য যে শুধু জীবিকার্জনই ছিল তাহা নহে, বিদ্যা লোককে পরহিতার্থে নিয়োজিত করে। অন্তরের উৎকর্ষ সাধন করে। আচার ও ব্যবহার মার্জিতত্ব আনয়ন করিয়া সকলের প্রীতিভাজন করে, কুসংস্কার দূর করে, অপরের দৃষ্টিভঙ্গী বুঝিতে সাহায্য করিয়া মনকে উদার করে, লোককে বিনয়ী সংযত ও চরিত্রবান করে। ইহাই ভারতবাসী মনে করিত। যে শিক্ষার দ্বারা উচ্ছৃঙ্খলতা, ঔদ্ধত্য, অবিনয় ও অহঙ্কার সৃষ্টি হয় ভারতবাসী তাহাকে বিদ্যা বলিয়া মনে করিত না। আবার বিদ্যার্জন কেবলমাত্র পুথিগত বিদ্যালাভকেই বুঝাইত না। শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াও লোকে মূর্খ থাকিয়া যায়, যে ব্যক্তি অধীত শাস্ত্র কর্মে প্রয়োগ করিতে পারে সেই পণ্ডিত। রোগীর নিকট কেবল ঔষধের নাম করিলেই সে আরোগ্য লাভ করে না—ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয় [১]। আবার যে বিদ্যার একমাত্র উদ্দেশ্য কেবল জীবিকার্জন তাহাকে জ্ঞান পণ্যের দ্বারা বাণিজ্য বলা যাইতে পারে [২]।

প্রাথমিক শিক্ষা—অতি প্রাচীন কাল হইতে আনুমানিক ১০০০ খৃষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত ভারতবর্ষে কি ভাবে শিক্ষা দান করা হইত আমরা তাহার সুস্পষ্ট চিত্র না পাইলেও এইটুকু জানিতে পারি যে গুরুগৃহে গিয়া বালক-বালিকাগণ কিভাবে বৈদিক মন্ত্র পড়িতে বা লিখিতে হয় তাহা প্রথমে শিখিত না। প্রথমে তাহারা প্রত্যেক শব্দ কি ভাবে উচ্চারণ করিতে হয় মুখে মুখে তাহা শিখিত। এই সময়ে তাহাদিগকে স্বরবর্ণের হ্রস্ব ও দীর্ঘের মধ্যে কি প্রভেদ, শব্দ কোন অংশে জোর দিয়া উচ্চারণ করিতে হয়, বিভিন্ন স্বরবর্ণের ও ব্যঞ্জনবর্ণের কিভাবে সন্ধি হয় ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া হইত ও অভ্যাস করান হইত। তাহার পর দুইটি শব্দের মিলনে বা সমাসে কি পরিবর্তন হয় তাহা শিক্ষা দেওয়া হইত [৩]। উপনয়নের সময় হইতেই বৈদিক যুগে বিদ্যা শিক্ষার আরম্ভ হইত। স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণের বিশুদ্ধ উচ্চারণ, সন্ধি ও সমাস শিক্ষার পরে ছাত্র-ছাত্রীগণ গুরুগৃহে গিয়া বৈদিক মন্ত্র কণ্ঠস্থ করিত। বৈদিক যুগে এইভাবেই প্রাথমিক শিক্ষা দান করা হইত। এই প্রাথমিক শিক্ষা লাভের পর ছাত্রগণ সহজেই বেদাধ্যয়ন করিতে পারিত। পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করাইয়া গুরু শিষ্যদিগকে বৈদিক মন্ত্র কণ্ঠস্থ করাইতেন। ভবিষ্যতে কোন বিষয়ে সে উচ্চ শিক্ষা লাভ করিতে পারিবে তাহা বুঝিয়া ছাত্রকে প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হইত।

অন্ততঃ খৃষ্টপূর্ব ১০০০ বৎসর পূর্বে ভারতবাসীর নিকট লিপি-কৌশল সুপরিজ্ঞাত ছিল সে বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ আছে। সুতরাং ক্রমশঃ লিখন ও পঠন প্রাথমিক শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ হইয়া উঠিয়াছিল।

প্রাথমিক শিক্ষার আরম্ভের সময়, সাধারণতঃ পঞ্চম বর্ষে, 'বিদ্যারম্ভ' বা 'অক্ষর স্বীকরণ' সংস্কার অনুষ্ঠিত হইত। যদি কোনও কারণে তাহা স্থগিত থাকিত তাহা হইলে অন্ততঃ উপনয়নের পূর্বে তাহার অনুষ্ঠান অবশ্যম্ভাবী ছিল [৪]। একটা শুভদিন দেখিয়া এই অনুষ্ঠানটি করা হইত। বালকটিকে দিয়া প্রথমে গণেশ, সরস্বতী ও ইষ্ট দেবতার পূজা করাণ হইত, তাহার পর শিক্ষক অথবা পিতা বা অন্য কোন অভিভাবক সোনার বা রূপার লেখনী দিয়া বালকটির হাত ধরিয়া চালের গুঁড়ার উপর বর্ণমালা লেখাইতেন। যে সকল বালকের বিলম্বে অর্থাৎ উপনয়নের অব্যবহিত

---

১ "শাস্ত্রাণ্যধীত্যাপি ভবন্তি মূর্খা যস্তু ক্রিয়াবান্‌পুরুষঃ সবিদ্বান। সুচিন্তিতম্ চৌষধমাতুরাণাং ন নামমাত্রেণ করোত্যরোগম্ ॥" (সুভাষিত রত্ন ভাণ্ডাগারম্ ৭ম সং পৃঃ ৩৯)।

২ মালবিকাগ্নিমিত্রম্ ১।১৭।

৩ তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্য অঃ ২৪।

৪. "দ্বিতীয় জন্মনঃ পূর্বমারভেতক্ষরস্মৃতিঃ" বৃহস্পতি—বীরমিত্রোদয়, সংস্কার প্রকাশঃ

পূর্ব অক্ষর পরিত্যাগ করিয়া তাহাকে 'দণ্ড-গ্রাহক' বলা হইত।

বৈদিক যুগে ছাত্র জীবনের তিনটি সংস্কার ছিল—উপনয়ন, ব্রহ্মচর্য ও সমাবর্তন। কিন্তু বৈদিক যুগের পর বিদ্যারম্ভকেই ছাত্র জীবনের প্রথম সংস্কার মনে করা হইত। বৈদিক যুগে এই সংস্কারটি ছিল না বলিয়াই মনে হয়। প্রাচীন যুগে উপনয়নই বিদ্যা শিক্ষার প্রাথমিক সংস্কার ছিল তাহার পরবর্তীকালে 'চৌল' বা 'চূড়াকরণ' সংস্কারের সহিত একসঙ্গেই এই 'বিদ্যারম্ভ' সংস্কারটি সংযুক্ত হইয়াছিল ৫। চার হইতে সাত বৎসর বয়সের মধ্যেই 'চৌলকর্ম' ও বিদ্যারম্ভ অনুষ্ঠিত হইত, তাহার পর বর্ণভেদে বিভিন্ন বয়সে উপনয়ন হইত। রঘুবংশ ৬ উত্তররাম-চরিত ৭ ও ললিতবিস্তরে ৮, রঘু লব কুশ ও গৌতম বুদ্ধের বিদ্যারম্ভ এই বয়সেই হইয়াছিল বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

বৈদিকোত্তর যুগে ব্যাকরণ, দর্শন, গণিত, জ্যোতিষ ও ছন্দঃ যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছিল। লিপিজ্ঞান না থাকিলে ঐ সকল বিষয়ে সুদৃঢ় বুনিয়াদ স্থাপন করা সম্ভব ছিল না। যদিও পূর্ব সংস্কার বশে বেদের শিক্ষা মুখে মুখেই দেওয়া হইত তথাপি লিখন ও পঠন প্রাথমিক শিক্ষার অঙ্গীভূত ছিল। প্রাথমিক গণিত, ব্যাকরণ, স্বরবিজ্ঞান ও ছন্দঃ অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে এগুলিও এই প্রাথমিক শিক্ষার পঠিতব্য বিষয়গুলির অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই শিক্ষা অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিজ নিজ গৃহেই বালক-বালিকাগণ পিতা বা অন্য কোন অভিভাবকের নিকট বা শিক্ষকের নিকট প্রাপ্ত হইত। কোন কোন স্থানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ও ছিল। জাতক হইতে আমরা জানিতে পারি অবস্থাপন্ন ব্যক্তিদিগের পুত্রেরা যখন বিদ্যালয়ে যাইত তাহাদের ভৃত্যগণ তখন তাহাদের লিখিবার কাষ্ঠফলক বহন করিয়া লইয়া যাইত ৯।

সাধারণ দরিদ্র বালক-বালিকাগণ ভূমিতে ধূলি অথবা বালুকা ছড়াইয়া তাহার উপর অঙ্গুলী অথবা সূচ্যগ্র কাষ্ঠদণ্ড দিয়া অক্ষর লিখিত। ধনী বা অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণের ছাত্রদের কাষ্ঠফলকের উপর খড়ি, কাঠ কয়লা বা অন্য কোন প্রকার রঞ্জক শলাকা দ্বারা বর্ণমালা লেখার অভ্যাস করিত। পেশাবরের চিত্রশালায় বুদ্ধের একটি প্রস্তর চিত্র আছে, তাহাতে বালক বুদ্ধ বিদ্যালয় পাঠকালে বাম হস্তে একটি চতুষ্কোণ ফলক লইয়া তাহার উপর শলাকা সাহায্যে লিখিতেছেন। শিক্ষক একটি ভিত্তিগাত্রে বিলম্বিত বৃহৎ কাষ্ঠফলকে এক একটি অক্ষর লিখিতেন আর ছাত্রগণ উচ্চৈস্বরে তাহা উচ্চারণ করিয়া নিজ নিজ কাষ্ঠফলকে বা ভূমিতে সেই অক্ষরটি লিখিত ১০। এখন হইতে বিশ বৎসর পূর্বেও পল্লীগ্রামের পাঠশালায় এই ভাবে লিখিতে ও নামতা মুখস্থ করিতে শিখান হইত।

কাষ্ঠের ফলকে বা ভূমিতে লেখা অভ্যাস হইবার পর শিক্ষক তালপাতার উপর সূচ্যগ্র লৌহ শলাকা দিয়া কয়েকটি শব্দ লিখিয়া দিতেন ছাত্রগণ তাহার উপর কাঠ কয়লা বুলাইয়া লিখিতে শিখিত। দিনান্তে ঐ তালপাতা ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া রাখা হইত। এইভাবে তালপাতার উপর কয়লা দিয়া অক্ষর বুলাইয়া যখন হাত পাকিত তখন তাঁহাকে কলা পাতার উপর খাপের কলম ও কালি দিয়া লিখিতে দেওয়া হইত তাহার পর তালপাতায় ময়ূর হাঁসের পালকের কলম দিয়া লিখিতে দেওয়া হইত। এই পদ্ধতি কিছু দিন আগে পর্যন্ত পল্লীগ্রামের পাঠশালায় অনুসরণ করা হইত।

প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিকে সাধারণতঃ 'লিপিশালা' বলা হইত এবং শিক্ষকদিগকে বলা হইত 'দারকাচার্য'।

বৈদিক যুগের বহু পরে যখন সংস্কৃত ভাষা সৃষ্টি হইল ও তাহার অনুশীলন আরম্ভ হইল তখন উপনয়নের পর সকল ছাত্রকেই যাহা নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াকর্মে আবশ্যক হইত এইরূপ কয়েকটি বৈদিক মন্ত্র কণ্ঠস্থ করান হইত, তাহার পর তাহারা চার-পাঁচ বৎসর প্রাথমিক সংস্কৃত ব্যাকরণ ও নীতিমূলক সাহিত্য বিষয়ক পাঠ্য-পুস্তক পাঠ করিত। এইরূপে ১৩।১৪ বৎসর বয়সে সংস্কৃত ভাষায় দখল হইলে এবং তর্কশাস্ত্র, দর্শন, কাব্য, জ্যোতিষ, গণিত প্রভৃতি বয়স্কীয় গ্রন্থাদি পড়িয়া বুঝিতে সক্ষম হইলে ইহার মধ্যে যে কোন একটি বিষয় বাছিয়া লইয়া ন্যূনাধিক দশ বৎসর ধরিয়া সেই বিষয়ে তাহারা উচ্চশিক্ষা লাভ করিত।

এমন কি উচ্চশিক্ষার জন্যও সাধারণ বিদ্যালয় খৃষ্টীয় চতুর্থ শতক পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিক্ষকগণ নিজস্ব বিদ্যালয়ে ছাত্রগণকে শিক্ষাদান করিতেন অথবা কোন ধনী ব্যক্তি নিজ গৃহে শিক্ষক দ্বারা পুত্র-কন্যাকে শিক্ষা দিতেন। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতব্দী হইতে রাজার অর্থানুকূল্যে প্রাথমিক ও উচ্চ শিক্ষার জন্য কতকগুলি সাধারণ বিদ্যালয় ও চতুষ্পাঠী স্থাপিত হইয়াছিল।

উচ্চশিক্ষা—ভারতের শিক্ষার ইতিহাস কয়েক শতাব্দী ধরিয়া বিস্তৃত সুতরাং এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে পাঠ্য বিষয়ের বহু পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। প্রাচীন বৈদিক যুগে অর্থাৎ আনুমানিক ১৫০০ খৃষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত উচ্চ শিক্ষার বিষয় ছিল বৈদিক সাহিত্য। অথর্ব বেদ হইতে জানা যায় বেদ ছাড়াও ইতিহাস পুরাণ বীরত্বব্যঞ্জক গাথা প্রভৃতিও ছাত্রগণ কণ্ঠস্থ করিত। তাহারা ছন্দঃসূত্র শিক্ষা করিত; কবিতা রচনা করিতে শিখিত। যাহারা পৌরোহিত্য বৃত্তি অবলম্বন করিতে ইচ্ছা করিত তাহারা যাগযজ্ঞের বিধি, বেদী নির্মাণ করিবার উপযোগী জ্যামিতি ও যজ্ঞের উপযুক্ত তিথি, নক্ষত্র নির্ধারণ করিবার জন্য জ্যোতিষ শিক্ষা করিত। এ যুগের ছাত্রগণ ব্যাকরণ ও নিরুক্ত লইয়া বেশী মাথা ঘামাইত না; কারণ এ দুইটি বিষয়ের তখনও ততটা উন্নতি হয় নাই। সাধারণতঃ নয় দশ বৎসর বয়স হইতে বেদাধ্যয়ন সুরু হইত এবং তাহার পূর্বেই উপনয়ন সংস্কারটি অনুষ্ঠিত হইত। যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ অবশ্য বৈদিক মন্ত্রগুলি সম্পূর্ণরূপে কণ্ঠস্থ করিত। কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে যুদ্ধজীবী ক্ষত্রিয়, কৃষিজীবী ও শিল্পী বৈশ্যগণ কেবলমাত্র কয়েকটি আরণ্যকীয় বৈদিক মন্ত্র কণ্ঠস্থ করিত।

পরবর্তী যুগে অর্থাৎ ১৫০০ হইতে ১০০০ খৃষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে বৈদিক মন্ত্রগুলি বিভাগ হইয়াছিল এবং তাহার ফলে প্রথমে তিনটি পরে চারিটি বেদের সৃষ্টি হইয়াছিল। বৈদিক সাহিত্যের বিশেষ অনুশীলনের ফলে ব্রাহ্মণগুলির উৎপত্তি হইয়াছিল সেগুলিতে বৈদিক যাগযজ্ঞের সহিত সংযুক্ত বিশেষ বিশেষ সিদ্ধান্ত, তত্ত্ব এবং অনুষ্ঠানগুলির ব্যাখ্যা থাকিত। ক্রমশঃ যজ্ঞের অনুষ্ঠানগুলি জটিল হইয়া উঠিল এবং যাজ্ঞিক পুরোহিতগণকে তাহা শিক্ষা ও আয়ত্ত করিতে বহুদিন ধরিয়া পরিশ্রম করিতে হইত।

বৈদিক ভাষা ও চলতি সংস্কৃত ভাষার মধ্যে পার্থক্য ক্রমশঃ বাড়িতে থাকিলে পাছে বৈদিক মন্ত্রগুলি বিকৃত হয় সেই জন্য তাহার পবিত্রতা ও যাথার্থ্য রক্ষা করিবার জন্য যত্ন লওয়া হইতে লাগিল। বৈদিক মন্ত্রগুলি শুধু কণ্ঠস্থ করা হইত না। তাহার প্রকৃত উচ্চারণ, যতি ও সুর যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা হইত। মন্ত্রগুলি কেবল কণ্ঠস্থ করা হইত না তাহার অর্থবোধও থাকা আবশ্যক ছিল। যাহারা তাহা পারিত না তাহারা উপহাসাস্পদ হইত।

ইহার পরবর্তী যুগকে উপনিষদ ও সূত্রের যুগ বলে। খৃষ্টপূর্ব ১০০০ অব্দের পর হইতে বৈদিক সাহিত্যের শিক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। বৈদিক সাহিত্যকে সকলেই অপৌরুষেয় বা ঈশ্বরাদিষ্ট বলিয়া মনে করিত এবং ক্রমে ব্রাহ্মণ ও উপনিষদগুলিও সেইরূপ সম্মানিত হইতে লাগিল। বৈদিক সাহিত্য যাহাতে ভবিষ্যতে বিকৃত না হয় সেই জন্য সাবধানতা অবলম্বন করা হইল, পদপাঠ, ক্রমপাঠ, জটাপাঠ ও ঘনপাঠের সাহায্যে বৈদিক মন্ত্রগুলিকে অক্ষুণ্ণ রাখা হইল। যাহারা বৈদিক

---

৫ "বৃত্তচৌলকর্মা লিপিং সঙখ্যানং চোপযুঞ্জীত" (অর্থশাস্ত্র ১।৫)

৬ রঘুবংশ (৩।২৮); ৭ উত্তর-রাম-চরিত (৩য় অঙ্ক); ৮ ললিতবিস্তর (১০ম খঃ)।

৯ কটাহক জাতক ১২৫। ১০ "তত্রবোধিসত্ত্বাধিষ্ঠানেন তেষাং দারকানাং হাতৃকাং বাচয়তাং যদা অকারং পরিকীর্তয়ন্তিস্ম তদা অনিত্য সংস্কারশব্দো নিশ্চরতিস্ম"। (ললিতবিস্তর ১০ম অঃ)।

সাহিত্যে পণ্ডিত বলিয়া বিবেচিত হইতেন. তাঁহাদিগকে ঐগুলি কণ্ঠস্থ করিতে হইত। ক্রমশঃ একজন বৈদজ্ঞের পক্ষে এই সমস্ত ক্রম-বর্ধমান সাহিত্য কণ্ঠস্থ রাখা ও তাহার অর্থ বোধগম্য করা কঠিন হইয়া পড়িল, তখন ঠিক হইল কতকগুলি বৈদিক ছাত্র এই বিপুল সাহিত্য যন্ত্রচালিতবৎ কেবল কণ্ঠস্থ করিবে এবং অপর কয়েকজন টীকা শব্দের ব্যুৎপত্তি তত্ত্ব শব্দ-কোষ ইত্যাদি বিষয়ে ব্যুৎপন্ন হইয়া বৈদিক সাহিত্যের সমস্যাসমূহেও ব্যাখ্যায় কুশলতা লাভ করিবে।

এই যুগে দর্শন, ব্যাকরণ, জ্যোতিষ এবং ভাস্কর্য, স্থাপত্য, ধনুর্বেদ, আয়ুর্বেদ, পোত নির্মাণ কৌশল প্রভৃতি বহু শিল্প শাস্ত্রে অভূতপূর্ব উন্নতি হইয়াছিল। এক দিকে যেমন এই সকল বিভাগের পরিস্ফুরণ হওয়ায় ছাত্রদের পক্ষে নূতন আকর্ষণ সৃষ্টি করিয়াছিল তেমনি অপর দিকে উপনিষদের মতবাদ, জৈন ও বৌদ্ধধর্মের অভ্যুত্থানের ফলে বৈদিক সাহিত্য ও বৈদিক কর্মকাণ্ডের জনপ্রিয়তা যথেষ্ট ক্ষুণ্ন হইয়াছিল। প্রচলিত ভাষা ও বৈদিক ভাষার মধ্যে ব্যবধান অত্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং এই যুগের শেষ ভাগে পূর্বোক্ত শাস্ত্রসমূহের অনুশীলনের প্রতি লোকের আগ্রহও যথেষ্ট বাড়িয়া গিয়াছিল। সমসাময়িক সাহিত্য হইতে জানিতে পারা যায় যে, যে শিক্ষার দ্বারা মনের বিস্তার হয়, যেমন বৈদিক ও দার্শনিক শিক্ষা তাহার সহিত কার্যকরী শিক্ষার একটা সমন্বয় করার চেষ্টা হইয়াছিল। এই যুগের স্নাতক (Graduate) গণ বেদ এবং অষ্টাদশ শিল্পে পারদর্শী হইত।

বৈদিক সাহিত্য ও অন্যান্য শাস্ত্র শিক্ষার জন্য পৃথক বিদ্যালয় ছিল। ঐ সকল বিদ্যালয়ের শিক্ষা পদ্ধতিও বিভিন্ন ছিল। বৈদিক বিদ্যালয় পাঠ্য পুস্তকের সাহায্য ব্যতীত মুখে মুখে শিক্ষা দান করা হইত। শিক্ষক বা গুরু কোন বৈদিক মন্ত্রের কেবলমাত্র দুইটি পদ উচ্চারণ করিতেন শিষ্য বা ছাত্র তাহা শুনিয়া ঠিক সেই ভাবে তাহা উচ্চারণ করিত। এই ভাবে যখন একটা সম্পূর্ণ মন্ত্র একজন ছাত্রকে শিখান শেষ হইত তখন অন্য আর একজন ছাত্রকে ঠিক ঐ ভাবে মন্ত্রটি শিক্ষা দেওয়া হইত।

যেখানে অন্যান্য শাস্ত্র পড়ান হইত সেখানে শিক্ষক পাঠ্য পুস্তকের অল্প অংশ পড়িয়া ব্যাখ্যা করিয়া দিতেন; যখন ছাত্রগণ তাহা বুঝিতে পারিত তখন তাহারা তাহা কণ্ঠস্থ করিত। এই ভাবে পাণিনি ব্যাকরণ, অমরকোষ, অভিধান, মনুর ধর্মশাস্ত্র, সম্মট ভট্টের অলংকার-শাস্ত্র প্রভৃতি অধ্যয়ন করান হইত। কণ্ঠস্থ করিবার সুবিধার জন্য পাঠ্য পুস্তকগুলি কবিতায় রচিত হইত এমন কি শেষগ্রন্থ এবং প্রাথমিক ব্যাকরণ পর্যন্ত কবিতায় রচিত হইত। সূত্র-পদ্ধতি প্রচলিত হইলে সিদ্ধান্তগুলি সংক্ষিপ্ত বাক্যে নিবদ্ধ হইয়াছিল তাহাতে কণ্ঠস্থ করিতে সুবিধা হইত।

প্রাচীন কালে উচ্চবর্ণের বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে উচ্চশিক্ষা বহু প্রচলিত ছিল। তিন বেদ ও অষ্টাদশ শিল্পবিদ্যা ইহাই ছিল পড়িবার বিষয়। এই অষ্টাদশ বিদ্যার মধ্যে ছিল বেদাঙ্গ, দর্শন, পুরাণ, স্মৃতি, আয়ুর্বেদ, গন্ধর্ববেদ, অর্থশাস্ত্র, গজশাস্ত্র, ধনুর্বেদ ইত্যাদি। বারাণসী ও তক্ষশিলা প্রভৃতি স্থানে চতুষ্পাঠী বা মহাবিদ্যালয় ছিল। ইহার মধ্যে তক্ষশীলাই অধিক বিখ্যাত হইয়াছিল। বারাণসীর রাজপুত্র ও ব্রাহ্মণ কুমারগণ ষোড়শ বৎসর বয়স পর্যন্ত স্বগৃহে পড়িয়া তক্ষশীলায় উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য যাইত। বিদ্যাভ্যাস শেষ না হইলে উচ্চ বর্ণের যুবকগণ বিবাহ করিতও না বা কোন বৃত্তিকে নিযুক্ত হইত না।

পঠদ্দশায় ছাত্রগণ সাধারণতঃ গুরুগৃহে বাস করিত। দরিদ্র ছাত্রগণ দৈহিক পরিশ্রম দ্বারা সেবা করিয়া আচার্যকে সন্তুষ্ট করিত তাহাদিগকে বলা হইত 'ধর্মান্তেবাসিক।' ধনী ব্যক্তির পুত্রগণ বিদ্যারম্ভের পূর্বেই 'আচার্য-ভাগ' দান করিত তাহাদিগকে বলা হইত 'আচার্যভাগ দায়ক'। অনেক দরিদ্র বালক ভিক্ষা করিয়া গুরুদক্ষিণা সংগ্রহ করিত।

শিক্ষিত শিষ্যগণের মধ্যে অনেকে অধ্যাপনা কালে গুরুকে সাহায্য করিত, তাহাদিগকে বলা হইত 'পৃষ্ঠাচার্য'। গুরু বৃদ্ধ বা অপারগ হইলে ঐরূপ উপযুক্ত শিষ্যের উপর চতুষ্পাঠীর ভার অর্পণ করিতেন।

যে ছাত্রের শিক্ষা শেষ হইত তাহাকে পণ্ডিত-গণের একটা সভায় পরীক্ষা দিতে হইত। সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে তাহাকে স্নাতক বলা হইত। সে যজ্ঞ করিবার অধিকার লাভ করিত, যাহারা অক্ষম হইত তাহাদিগকে ব্রাহ্মণ হইতে বৈশ্যবর্ণে নামাইয়া দেওয়া হইত (ঋ১০।৭১; ৭।১০ ত)।

শিক্ষা সমাপনান্তে সমাবর্তনের পর বিচার যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া খ্যাতি অর্জনের আশায় ছাত্রগণ বিভিন্ন দেশে যাইতেন। এই সমস্ত বিচারের পণ হইতে অর্থ অথবা পরাজিত ব্যক্তির উপর কোন অধিকার। বৈশালীর শিক্ষিতা কুমারীগণ পণ করিয়াছিলেন যে যদি তাঁহারা কাহারও নিকট বিচারে পরাস্ত হন তাহা হইলে বিজেতা গৃহী হইলে তাহাকে বিবাহ করিবেন এবং পরিব্রাজক হইলে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিবেন। জাতক হইতে জানা যায় যে, শ্বেতকেতু এক চণ্ডালের নিকট পরাজিত হইয়া তাহার পদদ্বয়ের মধ্য দিয়া গমন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

সূত্রযুগের পর যদিও ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে অনেকে বংশ পরম্পরায় বেদের চর্চা করিয়া দ্বিবেদী, ত্রিবেদী, চতুর্বেদী প্রভৃতি উপাধি লাভ করিয়াছিলেন তথাপি ক্রমশঃ বৈদিক সাহিত্যের অনুশীলন কমিয়া আসিতে লাগিল। উপনিষদ ও সূত্রযুগের পরবর্তীকালে গণিত জ্যোতিষ, ফলিত জ্যোতিষ, ছন্দঃ, কাব্য, ধর্মশাস্ত্র, তর্কশাস্ত্র এবং বিভিন্ন দর্শনের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। বৌদ্ধ, জৈন ও চার্বাক দর্শন ব্যতীত বৈদিক সূত্রগুলি হইতে ছয়টি দর্শনের উদ্ভব হইয়াছিল কপিলের 'সাংখ্য' পতঞ্জলির 'যোগ', গৌতমের 'ন্যায়', কনাদের 'বৈশেষিক', জৈমিনীর 'কর্ম' বা 'পূর্ব মীমাংসা' এবং বাদরায়ণের 'শারীরিক', বা 'উত্তরমীমাংসা' বা 'বেদান্ত'।

এই সকল দর্শন মুক্তির পথ প্রদর্শন করিয়াছে। অধিকারী না হইলে কেহ এই সকল দর্শন অধ্যয়ন করিতে পারিত না। বর্ণাশ্রম ধর্মের উপর এই অধিকার নির্ভর করিত। দর্শন অধ্যয়ন করিবার ইচ্ছা থাকিলেই হইত না, দর্শন অধ্যয়ন করিবার উপযুক্ততা থাকা আবশ্যক ছিল—ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করিয়া প্রথমে বেদ অধ্যয়ন করিতে হইত।

এই যুগের প্রথম ভাগেই সাতবাহন ইক্ষ্বাকু এবং পল্লব বংশীয় নৃপতিগণ প্রাকৃত ভাষার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, তাঁহাদের রাজকীয় কার্যকলাপ প্রাকৃতেই হইত কিন্তু তাহার পর সংস্কৃত ভাষা অত্যন্ত লোকপ্রিয় হইয়া উঠিল এমন কি গুপ্ত, বাকাটক প্রভৃতি বংশীয় রাজাগণের অন্তঃপুরে পর্যন্ত সংস্কৃত ভাষা ব্যবহৃত হইত। বৌদ্ধ ও জৈনগণও সংস্কৃত ভাষায় ধর্মপুস্তক রচনা করিতে আরম্ভ করিলেন। ইহার ফলে কথ্যভাষা অনাদৃত হইল। এই কথ্যভাষার মাধ্যমে জনসাধারণের সহিত সংযোগ সম্ভব সুতরাং পরিণামে উচ্চ শিক্ষা কেবলমাত্র ধনী ও উচ্চ বর্ণের মধ্যেই নিবদ্ধ রহিল।

সংস্কৃত ভাষা শিখিতে হইলে ব্যাকরণে যথেষ্ট জ্ঞান থাকা আবশ্যক সুতরাং উচ্চ শিক্ষা বিদ্যালয়সমূহে বহু বৈয়াকরণিক নিযুক্ত হইতে লাগিলেন। ব্যাকরণে ব্যুৎপত্তি লাভের পর ছাত্রকে কোষগ্রন্থ পড়িয়া শব্দসম্ভার সঞ্চয় করিতে হইত ও ব্যাস, কালিদাস, ভর্তৃহরি, বাণ প্রভৃতি বিখ্যাত কবিগণের কাব্য অধ্যয়ন করিতে হইত। ছন্দ্য ও অলংকার শাস্ত্রের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হইত। ছাত্রগণ কেবল কাব্যপাঠই করিত না, বিখ্যাত কবিগণের অনুকরণে কবিতা রচনা করিত। তাহারা রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ ও কথা সাহিত্যও পাঠ করিত।

দর্শন পাঠেচ্ছু ও তাহাতে অধিকারপ্রাপ্ত ছাত্রগণ ব্যাকরণ ও সাহিত্যে কতকটা ব্যুৎপত্তি লাভ করিলে তর্কশাস্ত্র অধ্যয়ন করিত তাহার পর ইচ্ছা অনুযায়ী যে কোন দর্শন গুরুর নিকট হইতে শিক্ষা করিত। বিভিন্ন দার্শনিকদের মধ্যে মতভেদ ছিল ও তাহার ফলে বহু বাক্ বিতণ্ডা হইত এই সকল বিতর্ক হইতে আন্বীক্ষিকী বা অধ্যাত্মবিদ্যার অনুশীলন আরম্ভ হইল।

বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন বিদ্যালয়ে কি পাঠ্য-পুস্তক নির্দিষ্ট ছিল সে বিষয়ে আমাদের কোন সঠিক ধারণা নাই। খুব সম্ভবতঃ যুগপরিবর্তনে

সঙ্গে সঙ্গে পাঠ্যপুস্তকের পরিবর্তন হইত। শিক্ষার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অধিকতর উত্তম পুস্তক রচিত হইয়াছিল। কেবলমাত্র গুণ-বিচার করিয়া পাঠ্যপুস্তক নির্ধারিত হইত। গ্রন্থকারকে তাঁহার রচিত পুস্তক পাটলিপুত্র, বারাণসী বা তক্ষশিলা এইরূপ কোন শিক্ষা কেন্দ্রের পণ্ডিত সমাজের নিকট বিচারের জন্য অর্পণ করিতে হইত এবং যদি সেই পণ্ডিত সমাজ উৎকৃষ্ট বলিয়া মনে করিতেন তাহা হইলে তাহা গ্রহণ করিতেন এবং তাহা প্রচারের অনুমতি লাভ করিত ও অন্যান্য বিভিন্ন নগরে প্রচারিত হইত।

নালন্দা, বলভী প্রভৃতি শিক্ষাকেন্দ্রে গ্রন্থ-শালা ছিল। বৌদ্ধ বিহার, জৈন মঠ প্রভৃতিতে গ্রন্থাগার ছিল। নৃপতিগণ নিজ নিজ রাজ্যে গ্রন্থাগার স্থাপন করিতেন। গুজরাটের নৃপতি-কুমার পাল বহু অর্থ ব্যয়ে তাঁহার রাজ্যে ২১টি গ্রন্থাগার স্থাপন করিয়াছিলেন। বহু মহারাষ্ট্রীয় নৃপতি নিজ রাজ্যে 'সরস্বতী ভবন' স্থাপন করিয়াছিলেন।

স্ত্রী শিক্ষা—খৃষ্টপূর্ব ২০০ অব্দ পর্যন্ত নারী-দিগের বেদ পাঠের ও যজ্ঞ করিবার অধিকার ছিল তাহার নিঃসংশয় প্রমাণ আছে। ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই কারণ বিশ্ববারা-শিকতা, নিবাবরী, ঘোষা, রোমশা, লোপামুদ্রা, অপালা, উর্বশী প্রভৃতি বহু নারীর রচিত মন্ত্র ঋগবেদে স্থান পাইয়াছে। সস্ত্রীক না হইলে পুরুষের যজ্ঞ করিবার অধিকার ছিল না (শতপথ ব্রাহ্মণ ৫।১।৬।১০) উভয়কে যজ্ঞের সময় বিশেষ দীক্ষা গ্রহণ করিতে হইত এবং সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে হইত। মৌর্যযুগ পর্যন্ত গৃহস্বামীকে পতির সাহায্য ব্যতীত গার্হপত্যাগ্নি বা গৃহ্যাগ্নিতে প্রতি সন্ধ্যায় কখন কখন প্রভাতেও হব্যদান করিতে হইত। (গোভিলগৃহসূত্র ১।৩)।

উপনয়ন ব্যতীত কাহারও বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করিবার বা যজ্ঞ করিবার অধিকার ছিল না সুতরাং ইহা মনে করা স্বাভাবিক যে প্রাচীনকালে বালকদিগের ন্যায় বালিকাদিগেরও উপনয়ন হইত। অথর্ববেদে সুস্পষ্টভাবে লিখিত আছে যে কুমারীগণকেও ব্রহ্মচর্য পালন করিতে হইত। এবং খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর সূত্র সাহিত্যে এই সম্বন্ধে কৌতূহলোদ্দীপক বর্ণনা আছে। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর পর বালিকা-দিগের উপনয়ন অপ্রচলিত হইয়া পড়িয়াছিল। পরবর্তী যুগের স্মৃতিশাস্ত্রকারগণ স্বীকার করি-য়াছেন যে পূর্বে ইহা প্রচলিত ছিল।

বৈদিক যুগে বালিকা বিবাহ ছিল না। অধিকাংশ নারীর ১৬ অথবা ১৭ বৎসর বয়সে বিবাহ হইত। তাহার পর অতি অল্প সংখ্যক তরুণীই অধ্যয়ন করিতে পারিত। যাহারা ঐ বয়সে বিবাহ না করিয়া অধ্যয়ন করিয়া যাইত তাহাদিগকে "ব্রহ্মবাদিনী" বলা হইত। ব্রহ্মবাদিনীগণ শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া বিবাহ করিত।

এই সমস্ত অবিবাহিতা শিক্ষিতা নারীগণ বৈদিক সাহিত্যে সম্পূর্ণ পাণ্ডিত্য অর্জন করিত এবং তাহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও রচিত মন্ত্র বেদের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। যখন বৈদিক তথ্যসমূহ এবং যাগযজ্ঞ জটিল হইয়া উঠিয়াছিল তখন একটা নূতন শাস্ত্রের উদ্ভব হইয়াছিল তাহার নাম "মীমাংসা"। ইহা অত্যন্ত নীরস ও দুরূহ তৎসত্ত্বেও শিক্ষিতা রমণীগণ এই বিষয়ে যথেষ্ট অনুরাগ প্রদর্শন করিতেন। কাল-ক্রমে যখন উপনিষদের যুগে দর্শন অধ্যয়ন লোকপ্রিয় হইয়াছিল তখনও রমণীগণ সে বিষয়ে প্রগাঢ় অনুরাগ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। মৈত্রেয়ী, গার্গী, সুলভা, বড়বা, প্রথিতেয়ী প্রভৃতি তাঁহা-দের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। রাজা জনকের সভায় যখন বিখ্যাত দার্শনিকদিগের সম্মেলন হইয়াছিল তখন বাচকনবী ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যকে বিচারদ্বন্দ্বে আহ্বান করিয়া জয়লাভ করিয়া-ছিলেন।

নারীগণ যখন বৌদ্ধ সঙ্ঘে প্রবেশাধিকার লাভ করিল তখন হইতে অভিজাত ও শ্রেষ্ঠী কুলজাতা নারীগণের মধ্যে উচ্চশিক্ষা ও দর্শনচর্চা অধিকতর বৃদ্ধিলাভ করিয়াছিল। ব্রহ্মবাদিনীদিগের ন্যায় অনেক বৌদ্ধ পরি-বারের মহিলাগণ ধর্মের ও দর্শনের মূলতত্ত্ব অনুসন্ধান করিবার উদ্দেশ্যে আজীবন কুমারী থাকিয়া যাইতেন। তাহাদিগের মধ্যে শুভা, অনোপমা, সুমেধা প্রভৃতি অভিজাত বংশীয়া রমণীগণ আচার্যানীরূপে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। বহু নৃপতি ও শ্রেষ্ঠী তাঁহাদের পাণিপ্রার্থী হইয়াছিলেন।

বালকদিগের ন্যায় বালিকাগণ শৈশবে গৃহে পিতা বা অন্য কোন অভিভাবকের নিকট প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিত। বালিকা-দিগের বিদ্যালয় ছিল তাহাতে উপাধ্যায়গণ শিক্ষা দিতেন। বিদ্যালয়ের সঙ্গে ছাত্রীশালা বা বোর্ডিংও ছিল। ঐ সকল ছাত্রীশালা কোন উপাধ্যায়ার তত্ত্বাবধানে থাকিত।

সংস্কৃত সাহিত্যের কুমার ও কুমারীর একত্র অধ্যয়নের বহু দৃষ্টান্ত আছে। মহাভারতের রুরু ও প্রমদ্বরা এবং কহোড় ও সুজাতার কাহিনী ইহার প্রমাণ। উত্তররাম-চরিতে লব ও কুশের সহিত আত্রেয়ীর এবং 'মালতী-মাধবে' ভূরিবসু ও দেবরাতের সহিত কামন্দ-কীর একত্র অধ্যয়নের কথা সংস্কৃতি সাহিত্যের পাঠক মাত্রেই জানেন। অনেক সময় বয়ঃ-প্রাপ্ত তরুণ-তরুণীগণের একত্র পাঠের ফলে প্রণয় সঞ্চার ও গান্ধর্ব বিবাহ হইত। ত্রিবিক্রম ভট্টের "পঞ্চায়ুধ প্রপঞ্চ" নামক ভানে এইরূপ প্রণয়নের একটা কৌতুকপ্রদ কাহিনী আছে।

খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের পর হইতে স্ত্রীলোকদিগের উচ্চ শিক্ষার হার অত্যন্ত কমিয়া যায় তাহার কারণ এযুগে ধর্মক্ষেত্রে নারীদিগের মর্যাদা হীন হইয়া পড়িয়াছিল। উপনয়ন ক্রমশঃ নারীদিগের পক্ষে নিষিদ্ধ হইয়াছিল। খৃষ্টপূর্ব পাঁচশতক হইতেই উহা কেবলমাত্র একটা অনুষ্ঠানমাত্রে পর্য-বসিত হইয়াছিল তাহার সহিত বেদাধ্যয়নের কোন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল না। মনু স্পষ্টতঃ বলিয়াছিলেন বালিকাদিগের উপনয়নে বেদমন্ত্র উচ্চারিত হইবে না এবং যাজ্ঞবল্ক্য বালিকা-দিগের উপনয়ন নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করিয়া-ছিলেন।

স্ত্রীলোকদিগের বেদাধ্যয়ন নিষিদ্ধ হওয়ার কতকগুলি কারণ ছিল। প্রথমতঃ বৈদিক সাহিত্য অত্যন্ত বৃহদাকার ধারণ করায় তাহা শেষ করিতে বহু বৎসর লাগিত। অতদিন বালিকা-গণ অবিবাহিত থাকিত না। প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করিতে ১৪।১৫ বৎসর বয়স হইয়া যাইত। তাহার পর আরও ৬, ৭ বা ১০ বৎসর পর্যন্ত ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করিয়া বেদাভ্যাস করা সম্ভব ছিল না, কারণ রাজদর্শনের পূর্বেই নারীদিগের বিবাহ হইত। উপনয়ন নিষিদ্ধ হওয়ায় যে ক্ষতি হইয়াছিল বিবাহের বয়স হ্রাস করিয়া দেওয়ায় তাহার মাত্রা আরও বাড়িয়া গেল।

বৈদিক বা দার্শনিক বিষয়ের শিক্ষা ব্যতীত প্রাচীন ভারতের রমণীগণ নারীজনোচিত বহু শিল্প ও কলা শিক্ষা করিতেন। বাৎস্যায়নের কামসূত্রে ৬৪টি কলার কথা লিখিত আছে তাহার মধ্যে গীত, বাদ্য, নৃত্য, আলেখ্য, বিশেষকচ্ছেদ্য অর্থাৎ তিলক বা টিপ কাটা, দশনবসনাঙ্গরাগ অর্থাৎ অধরের (দশনবসন) রঙ্গ দেওয়ায় ও অঙ্গরাগ বা প্রসাধন, মাল্য গ্রথন সূচীবান কর্ম অর্থাৎ সেলাই ও রিপুকর্ম, বিচিত্র শাকসূপ ভক্ষ্যবিকারক্রিয়া অর্থাৎ নিরামিষ ও আমিষ রন্ধন প্রভৃতি বহু আবশ্যকীয় কলার উল্লেখ আছে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে প্রাচীন স্বাধীন ভারতে শিক্ষার যথেষ্ট সমাদর ছিল এবং তাহা যথেষ্ট প্রচারিত হইয়াছিল। আজ যে ভারত-বর্ষে শিক্ষিত ব্যক্তির সংখ্যা এত অল্প তাহার কারণ অনুরাগের অভাব নহে পরাধীনতা, দারিদ্র্য, ও শাসকবর্গের অবহেলাই তাহার প্রধান কারণ। আশা করি, স্বাধীন ভারতের শাসকগণ ভারতের পুরাতন ঐতিহ্য পুনরায় ফিরাইয়া আনিতে চেষ্টা করিবেন।

পার্থ চট্টোপাধ্যায়

জুনিয়র উকিল। খাজনার চেয়ে বাজনা বেশি। বর্ষণের চেয়ে গর্জন প্রবল। প্রথম ক' বছর তো সিনিয়রের তামাক সেজেই কাটিয়ে দাও। গুরুসেবা কর তবেই তো মুক্তি। আগে সাধনা তারপরে তো সিদ্ধি।

কিন্তু রমাপদর ভাগ্যে বৃহস্পতি। শ্বশুরের জোর নেই, তবে গায়ে অসুরের মত শক্তি আছে। সত্যি খাটতে পারে রমাপদ। হাইকোর্টে বছর দুই বসতে না বসতেই মক্কেল আসছে তো আসছেই। তার সঙ্গে পাশ করেছে এমন অনেকে যেখানে ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছে রমাপদর তখন ফুরসৎ ফেলার সময় নেই।

সকালে ঘুম ভাঙে মক্কেলের মুখ দেখে। রাতে শুতে যাবার আগেও মক্কেলদের সঙ্গে পরামর্শ চলে। মক্কেলরাই রমাপদর এখন বিশ্বজগৎ---ধ্যান, জ্ঞান আর চিন্তা।

রমাপদর লাইনটাও একটু নতুন।

ল' পাশ করেই কি উকিল হয়? প্র্যাকটিশের আর্ট জানা চাই। অ্যাপ্রোচটা নতুন হওয়া চাই। হাজার হাজার উকিল আছে বাংলা দেশে। এই হাইকোর্টেই শ'য়ে শ'য়ে অ্যাডভোকেট আছে, ব্যারিষ্টার অ্যাটর্ণিও কি কম।

কিন্তু রমাপদ তাদের মধ্যে একক, স্বতন্ত্র। জুনিয়র হয়েও সিনিয়রের ঈর্ষার কারণ, জ্যেষ্ঠ হলেই যে শ্রেষ্ঠ হয় না রমাপদ তার প্রমাণ।

রমাপদ ঘোষ ডিভোর্সের উকিল।

সাতপাকের বাঁধন যত শক্ত হোক না কেন রমাপদ একটু চেষ্টা করলেই টান দিয়ে সরা সুতোর মত ছিঁড়ে ফেলতে পারে। হিন্দু কেন, যে-কোন জাতি, যে-কোন ধর্মের বিবাহের বজ্র আঁটুনি রমাপদর কাছে ফলকা গেরোর সামিল। কেস যত জটিল রমাপদর তত আনন্দ। শেষ পর্যন্ত এমন নাটকীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি করে তোলে রমাপদ যে পার্টি আর ডিফেণ্ড করার সাহস পায় না। এক্সপার্টি ডিক্রি হয়ে যায়।

রমাপদ বলে, বিয়েটা হল একটা কণ্ট্রাক্ট। যতক্ষণ ভাল লাগবে ততক্ষণই কণ্ট্রাক্টের দাম। ভাল লাগছে না অথচ চুক্তির বোঝা বয়ে বেড়াবেন কেন? ভাঙা মন, আর ছেঁড়া পাল এ দুটোই বয়ে বেড়ানো বিপদজ্জনক।

অতএব---।

অতএব সাহস করে আদালতে আসুন। ভুল কিংবা অবিশ্বাসের বোঝা হয়ে বেড়াবার চেয়ে যে সম্পর্কের ইতি টেনে দিল। নতুন করে জীবন আরম্ভ করুন আবার।

দর্শনশাস্ত্র থেকে কয়েকটা লাইন রমাপদ কোট করে। এতে এফেক্ট আসে। বলে: প্রতি মুহূর্তে আমাদের নতুন করে জন্ম হচ্ছে। পুরনো বিশ্বাস পাল্টে যাচ্ছে। চিন্তা, ধ্যান-ধারণা, ভাললাগা, ভালবাসা সবই আপেক্ষিক। আজ যা সত্যি, কাল মিথ্যে। কাল যা সত্যি হবে দুদিন পরে তা দেখবেন পুরনো হয়ে গেছে। তবে পুরনো বিশ্বাসের সঙ্গে, অতীতের ভালবাসার সঙ্গে আপোষ রফা কেন?

এ তো গেল বিশ্বাসের দিক। জীবনের প্র্যাকটিক্যাল দিকটাও দেখবেন না: অবিশ্বাসিনী স্ত্রী বা স্বামী, নিষ্ঠুর অথবা অসমর্থ সঙ্গী কিংবা সঙ্গিনী এদের হাত থেকে মুক্তি পাবার অধিকার আপনাকে দিয়েছে দেশের আইন। আইন মানেই তো আপনার অধিকার, যে অধিকার অনেক সংগ্রাম করে ছিনিয়ে এনেছেন

মক্কেলরা বোঝে। সমীহের দৃষ্টি নিয়ে চেয়ে থাকে। যত বেশি ওরা বোঝে তত বেশি ওর আসে।

: আপনার কি কেস?

: আমার স্ত্রী বুঝলেন কি না---

: অন্য পুরুষের সঙ্গে প্রেম করছেন---

: আজ্ঞে হ্যাঁ, ঠিক ধরেছেন স্যার। প্রথম প্রথম বিশ্বাস করি নি। আমাদের ভালবাসার বিয়ে---।

: ভালবাসার বিয়েতেই তো বেশি ভয়।

খুব আত্মপ্রত্যয় নিয়ে রমাপদ বলে। যেখানে বেশি পাওনা সেখানেই সব থেকে বেশি হারাবার ভয়। সংসারে অনন্ত বলে কিছু নেই। ভালবাসার যেমন আদি আছে অনন্তও আছে। আপনার স্ত্রী কি করেন?

: ইস্কুল মিসট্রেস।

: ইস্কুলের সেক্রেটারীর সঙ্গেই বুঝি?

: আপনি ঠিক ধরেছেন স্যার। প্রথম প্রথম লোকে বলত আমি বিশ্বাস করতাম না। তারপর দেখুন এই চিঠিগুলো আমার হাতে পড়াতে আমি আর---।

কেঁদে ফেলল লোকটা। কোঁচার খুঁটে চোখ মুছল। বছর পঁয়ত্রিশের নিরীহ চেহারার এক ভদ্রলোক।

রমাপদর এসব দেখে এখন আশ্চর্য লাগে না। কত দেখছে। কেস সব ছকে বাঁধা। দু' একটি জটিল যে থাকে না তাও নয়।

: আপনারও তো ডিভোর্স চাই?

: আজ্ঞে হ্যাঁ, ভদ্রমহিলা বলেন। মুখ নিচু করে কথা। বয়স হয়েছে। তবে খুব লাজুক।

হাসব্যাণ্ডের বিরুদ্ধে কোন স্পেসিফিক চার্জ?

ফ্যালফ্যাল করে তাকান ভদ্রমহিলা। যেন আনকোরা কোন সাক্ষী ডকে উঠে এজলাশ দেখে ঘাবড়ে গেছে।

রমাপদ আবার বলে: ছ' রকমের চার্জ আনতে পারেন স্বামীর বিরুদ্ধে। কোন চার্জ দেবেন ব্যভিচার? বিকৃত মস্তিষ্ক, ধর্মান্তর অথবা---

: না, না, এসব কোনটাই নয়। আমার স্বামী নেহাতই ভালমানুষ।

: তবে, তবে ডিভোর্স চাইছেন কেন? কোন ম্যানারিজম আছে? রাতে ঘুমোনোর সময় নাক ডাকান? আপনার প্রতিদৃষ্টি দেন না? নিজের জগতেই বাস করেন?

: না, তাও কেন? এই তো সেদিন আমাকে আর ছেলেমেয়েদের নিয়ে পুরী ঘুরে এলেন?

: ছেলেমেয়ে? ছেলেমেয়েও আছে নাকি আপনার?

: দুই মেয়ে। এক ছেলে। সবাই স্কুলে পড়ে।

: তাহলে ডিভোর্স চাইছেন কেন? আর কাউকে ভালবাসেন নাকি আপনি? আপনার কি কখন সময় মনে হয় এখানে আপনি অসুখী?

: ঠিক তাই। ঠিক ধরেছেন। দেখুন আমার স্বামীকে আমি ভালবাসি। কিন্তু তার চেয়েও বেশি ভালবাসি আর একজনকে। কিছু মনে করবেন না। ক্রাঙ্কলি কথাটা বলতে চাই। এ হল আমার স্বামীর একজন ছাত্র। বয়সে আমার চেয়েও হয়ত ছোট। কিন্তু বয়স দিয়ে ভালবাসা মাপা যায়?

রমাপদ বলে: তাই বলুন। ভালবাসা হল এ স্টেট অব মাইণ্ড। কেউ বলতে পারে না কার কখন কি ভাল লাগবে। আমি তো তাই বলি ভালবাসার রং বদলায়। আপনি খুব বোলড। ভালবাসা নেই এই কথাটা স্বীকার করতে সবাই লজ্জা পায়। আমরা অনেকেই হিপোক্র্যাট। আপনি শুধু তার ব্যতিক্রম। আমি আপনার কেস নিলাম।

: কিন্তু চার্জ? আমি তো কোন চার্জই খুঁজে পাচ্ছি না।

: আমাকে খুঁজতে দিন। এই যে ছোট্ট বইখানা দেখছেন---'দি হিন্দু ম্যারেজ অ্যাক্ট'। ১৯৫৫। ক্ষুদে অক্ষর, চটি বই। কিন্তু ক্ষমতা এর অসীম। একটা না একটা চার্জ লাগিয়েই দেব। আপনি ধরে নিন ডিভোর্স হয়েই গেছে। তার আগে জুডিসিয়াল সেপারেশনই নিয়ে নিন না। মহেশ্বরকে আগে না পান ব্রহ্মাকে নিন। হাইড্রোজেন না পান অ্যাটম নিন।

মন যখন ভেঙেছে তখন জোড়া দেবার চেষ্টা না করাই ভাল। আবার নতুন করে গড়ুন। নতুন সুরে গড়ুন।

এসব কথা রমাপদ একজনকে বোঝাতে পারে না, সে তার স্ত্রী তরলা। প্র্যাকটিশের আদি পর্বেই বিয়ে করেছে রমাপদ। সিনিয়র বলতেন: এ লাইনে আসবার সঙ্গে সঙ্গে বিয়েটা এসেনসিয়াল। বড় ইনভিভিজুয়ালিস্ট লাইন। একা একা বোর ফিল করবে। আর বউ না থাকলে কাজে উৎসাহ দেবে কে? লগি না থাকলে ভারি নৌকা ঠেলবে কি করে?

রমাপদর অবশ্য প্রেরণার চেয়ে তাগাদাটাই ছিল বেশি। ভালবাসার বিয়ে। কলেজে পড়তে পড়তেই প্রেমে হাবুডুবু। ল' পাশ করার তর সইছে না তরলার। ক্রমাগত তাগিদ দিচ্ছে। তাই বারে যেতে না যেতেই বর সাজতে হল রমাপদকে।

রমাপদর বন্ধুরা বলে রমাপদর অর্থ প্রতিপত্তি সবই স্ত্রী ভাগ্যে।

কিন্তু তরলার তো মুখে হাসি নেই। মুখ গোমড়া করে বলে: ঘর ভাঙাই তো তোমার কাজ? ক'টা ঘর ভাঙলে আজ?

রমাপদ হেসে বলে: ঘর যে ভাঙি সে তো নতুন করে ঘর গড়ার জন্যে।

: কিন্তু মানুষের মন কি তোমার এক তাল কাদা, যে ভাঙলেই যেমন খুশী গড়া যায়?

রমাপদ বলে: কাদা নয়ত কি তবে অচল অনড় পাথর? মনটা ডাইনামিক বলেই তো মানুষ বেঁচে আছে প্রমাণ হয়। যার প্রাণ আছে সেটাই তো নড়ে। স্রোত না থাকলেই তো শ্যাওলা।

: ভালবাসার তাই বিবর্তন হতে পারে।

: প্রেম কি তেলেভাজা খাবার যে বাসি হবে? সত্যিকারের ভালবাসার বিবর্তন নেই।

রমাপদ বলে: প্রতিপক্ষের চাঁদ কি পূর্ণিমাতে বাসি হয়?

: এসব তোমার মক্কেল তোলান কথা।

: কিন্তু খাঁটি কথা। মন যে ভাঙেই এমন বলি না। কিন্তু যদি ভাঙে তাহলে তাকে স্বাভাবিক-ভাবে নেব না কেন? পুরনো যন্ত্রের মত আমরা টোল খাওয়া পুরনো প্রেম বদলে ফেলতে পারি না পারাটাই হিপোক্র্যাসি। তুমি কি মান না?

: না, মানি না।

কলাবৃদ্ধির মত মক্কেল বৃদ্ধি হচ্ছে রমাপদর। সেই সঙ্গে মেদ বৃদ্ধি হচ্ছে। টাক বৃদ্ধি হচ্ছে। রমাপদ যত ফিস বাড়াচ্ছে, তত বেশি মক্কেল আসছে ওর কাছে।

আগে রবিবারটা বাদ ছিল। তরলাকে নিয়ে বেড়াতে বেরুত। সারা হপ্তায় একটি দিন সময়। আপাতত তাও বন্ধ। রবিবারেও মক্কেলরা আসে।

আর এত লোকেও ডিভোর্স চাইছে?

মাঝে মাঝে প্রাক্তন সিনিয়রের সঙ্গে দেখা হয় রমাপদর।

: খুব চুটিয়ে পশার দেখছি। বেশ। বউমার খবর কি? সি ইজ ভেরি ফরচুনেট।

রমাপদ একটু নির্ভরতা পেয়ে বলতে সুরু করে: কিন্তু স্যর, তরলা তো স্বীকারই করে না। ওর কাছে নাকি এটা ঘর ভাঙা। ডিভোর্সের মধ্যেও ফিলজফি থাকতে পারে, তরলা কিন্তু তা স্বীকার করে না।

সিনিয়র বলেন: ওকালতি হল কাক-বৃত্তি। কাক আছে তাই দুনিয়ার অনেক ময়লা নেই। কিন্তু কাকের প্রশংসা কখনও শুনেছ?

আবার আসেন সেই ভদ্রমহিলা।

রমাপদ বলে: আপনার কেস দেখে রেখেছি। টেন বি। ধারাটা পড়ি একবার শুনুন। 'এনি পারসন হু হ্যাজ ফিলটেড দি পিটিশনার উইথ সাচ ক্রুয়েলটি অ্যাজ টু কজ এ রিজনেবল্ এ্যাপ্রিহেনসন্ ইন দি মাইণ্ড----।

: আবার সেই ক্রুয়েলটি টানছেন কেন? ক্রুয়েলটি মানে তো হিংস্রতা।

রমাপদ বলে: কেন হিংস্রতা নয়? হিংস্রতা কি শুধু হিংসায়? আপনি বঙ্কিম-বাবুর চন্দ্রশেখর পড়েছেন? শৈবলিনীর ওপরে চন্দ্রশেখর ক্রুয়েল ছিল না?

আপনি তো বলেছেন স্বামী দিনরাত পড়াশুনা নিয়ে থাকেন। সংসারের কোন কাজে মন দেন না। এমন কি ছেলেমেয়েদের দিকেও নয়---। অ্যাপাথি মস্ত বড় ক্রুয়েলটি। শুধু বিচ্ছেদই নয় সেই সঙ্গে অ্যালিমনিও পাবেন।

ভদ্রমহিলা বললেন: অ্যালিমনি কি হবে? যার সঙ্গে ঘরই করলাম না, কি হবে তার টাকায়? প্রেমমূল্য যেখানে পাওয়া গেল না সেখানে হেমমূল্য নিয়ে কি হবে? কাঞ্চনের ওপর আমার লোভ নেই। পরিতোষের ভালবাসাই আমার লাখ টাকা। সরকারী কলেজে চাকরি পেয়েছে। কষ্টেসৃষ্টে চলে যাবে দুজনের। ছেলেমেয়েদের দায়িত্বটা ও নেবে। ও যখন বাপ ওরই তো দায়িত্ব।

রমাপদ বলল: কিন্তু অ্যালিমনি ছাড়বেন কেন? হকের টাকা আপনার। দানের পেছে দক্ষিণাটা ছাড়বেন কেন? ভদ্রমহিলার

স্বামী কনটেস্ট করেন নি, এবারও জয় হল রমাপদর।

আপাতত জুডিসিয়াল সেপারেশন। ছেলে-মেয়েদের দায়-দায়িত্ব মহিলার স্বামী রজতেশের। শুধু অ্যালিমনির দাবিটা তোলেন নি ভদ্রমহিলা।

এ-পর্যন্ত একটা কেসেও রমাপদ হারে নি। সব কেসেই ডিক্রি পেয়েছে। সবই এক্সপার্টি ডিক্রি। সব কেসেই জয়টিকা। আইন তো নয় এক একটি ধারালো তীর। শুধু লক্ষ্য ঠিক রাখতে হবে। তারপর ছুঁড়ে দিলেই হল।

অনেক টাকা ফিস পেয়েছে। ছোকরা প্রফেসর পরিতোষ আর ভদ্রমহিলা গাড়ি করে পৌঁছে দিয়ে গেছে। মনটা খুব হালকা রমাপদর।

আজ একটু রেস্ট নেবে। অনেকদিন রেস্ট নেওয়া হয় না, নথিপত্র বন্ধ করে ঘুমোতেই তো যায় রাত একটা নাগাদ।

তরলাকে কোথাও খুঁজে পেল না রমাপদ। ভারি আশ্চর্য তো। চাকর গুণধর এল তরলার বদলে। জলের বদলে বেল।

: তরলা কোথায়?

: আমায় ট্যাকসি ডেকে দিতে বললেন ডেকে দিলুম। একটা স্যুটকেশ নিয়ে কোথায় চলে গেলেন?

: কিছু বলে গেছেন? স্যুটকেশ নিয়ে কোথায় গেলেন?

: কই আমাকে তো কিছু----। তবে, গুণধরের মনে পড়ে গেল। চিঠি দিয়ে গেছেন একটা।

তা এমন মাঝে মাঝে যায় তরলা। একলা একলা সিনেমায় যায়, মার্কেটিং-এ যায়, বাপের বাড়ি টালিগঞ্জে যায়। রমাপদ আপত্তি করে না। আহা, প্রাণ যা চায় করুক না বেচারা। রমাপদ তো সঙ্গে করে কোথাও নিয়ে যেতে পারে না। মক্কেল ফেলে রমাপদ উঠবে কি করে? সাধনা করতে বসে তো বারবার আসন ছেড়ে ওঠা যায় না।

এ-দুনিয়ার সব কাজেরই তাল লয় ছন্দ আছে। অন্যমনস্ক মানেই তাল ভঙ্গ। অন্য চিন্তা মানেই সুর কেটে যাওয়া। অমন যে সুন্দরী উর্বশী, তার তাল ভঙ্গ হল অমনি দেবতারা শাপ দিলেন, স্বর্গ থেকে বিদায় নাও।

তরলা আগে সঙ্গে যাবার জন্য পীড়াপীড়ি করত। ইদানীং আর করে না। তবে মনঃক্ষুণ্ণ হয় কি না বুঝতে পারে না রমাপদ। তার অত সেন্টিমেন্ট নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় নেই।

— তবে রমাপদ মনে মনে জানে, আর যাই হোক না কেন, তরলা ভেতরে ভেতরে পতিপ্রাণা নারী। পারলে আগেকার হিন্দু নারীর মত স্বামীর পাদোদক খেত তরলা। এত লেখাপড়া শিখলে কি হবে, তরলা ডিভোর্সে বিশ্বাস করে না, ডিভোশনে বিশ্বাস করে। যারা ঘর ভাঙে তাদের প্রতি ওর শ্রদ্ধা নেই। রমাপদর দর্শন তরলা কোনদিন মানবে না।

কিন্তু আজ আবার চিঠি কেন? যদি কোথাও গিয়ে থাকে তরলা, তাতে চিঠি লেখার কি আছে? রমাপদ তো অবিশ্বাস করছে না তরলাকে।

কিন্তু চিঠি পড়ে চোখ কপালে উঠল রমাপদর। গুণ-ধরকে জিজ্ঞাসা করল।

: হ্যাঁরে সঙ্গে কেউ ছিল?

: এক ভদ্রলোক বসেছিলেন। আধা-বয়সী এক ভদ্রলোক।

দিদিমণি তাকে বললেন, রজতেশ তুমি এক মিনিট বস আমি আসছি।

রজতেশ? নাম বলল রজতেশ? কেমন দেখতে লোকটাকে?

: কালো। চোখে চশমা।

চিঠিখানার দিকে আর একবার চোখ বুলালো রমাপদ। ভেবে দেখলাম, একদিন যে ভুল আমি করেছি তার সংশোধনের সময় এখনও চলে যায় নি। রজতেশও আমার মত একজনকে ভালবেসেছিল। কিন্তু কি পেল? ভেবে দেখলাম আমরা দুজনে সমান দুঃখে দুঃখী। আর আমরা দুজনে দুজনকে এখনও ভালবাসি।

কিছু মনে কোর না। তুমিই তো বলেছিলে ভালবাসারও রং বদলায়। যেখানে ভালবাসা ফুরিয়েছে, সেখানে লোক দেখান সম্পর্কটা বয়ে বেড়ান হিপোক্র্যাসি। তোমার কথাই ঠিক আজ মানছি।

মৃত্যুদণ্ডের পরোয়ানা হাতে পেয়ে যেমন হয় তেমন হল রমাপদর। তরলা—তরলা তার দর্শনে অবশেষে বিশ্বাস করেছে। তরলাও আজ বিশ্বাস করে ভালবাসার রং পালটায়। কিন্তু এই পরিবর্তন যে এমন সর্বনাশের মধ্য দিয়ে আসবে রমাপদ তা ভাবে নি।

কোর্টে জুডিসিয়ল সেপারেশনের কেস আনল তরলা। অভিযোগ—ক্রুয়েলটি। সময় পেয়ে রমাপদ ভাবল: কনটেস্ট করবে কি না। নিজেই দাঁড়াবে কি না নিজের উকিল হয়ে।

কিন্তু রমাপদ কনটেস্ট করল না। কোন মুখে সে আদালতে গিয়ে দাঁড়াবে? আইনের বিরোধিতা করা যায় আইনে, কিন্তু ভালবাসা যখন ঘৃণা হয়ে ঝরে পড়ে সেই প্রচণ্ড ঘৃণাকে ঘৃণা দিয়েই প্রতিরোধ করতে হয়।

সেই মুহূর্তে এতদিন পরে রমাপদ উপলব্ধি করল, এতদিন তার সমস্ত কেসেই হার হয়েছে। বিশ্বাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ উপেক্ষা দিয়েই জয় করতে হয়। তার মক্কেলের প্রতিবাদীরা তাই করেছে। কেউ এসে দাঁড়ায় নি আদালতে।

এতদিন সব কেসেই তাই সে একতরফা ডিক্রি পেয়ে এসেছে। আসলে সারাজীবন ধরেই হেরে এসেছে রমাপদ।

॥ একটি গান ॥

"ওহে, দিন ত গেল, সন্ধ্যা হল, পার কর আমারে।
তুমি পারের কর্তা, শুনে বার্তা ডাকছি হে তোমারে॥
আমি আগে এসে, ঘাটে রইলাম বসে
(ওহে, আমায় কি পার করবে নাহে, আমায় অধম বলে)
যারা পাছে এল, আগে গেল, আমি রইলাম পড়ে॥
যাদের পথ-সম্বল, আছে সাধনার বল,
(তারা পারে গেল আপন আপন বলে হে)
(আমি সাধনহীন তাই রইলেম পড়ে হে)
তারা নিজ বলে গেল চলে, অকূল পারাবারে॥
শুনি, কড়ি নাই যার, তুমি কর তারেও পার,
(আমি সেই কথা শুনে ঘাটে এলাম হে)
(দয়াময়! নামে ভরসা বেঁধে হে)
আমি দীন ভিখারী, নাইক' কড়ি, দেখ ঝুলি ঝেড়ে॥
আমার পারের সম্বল, দয়াল নামটি কেবল,
(তাই দয়াময় বলে ডাকি তোমায় হে)
(তাই অধমতারণ বলে ডাকি হে)
ফিকির কেঁদে আকুল, পড়ে অকূল সাঁতার পাথারে॥"

—কাঙাল হরিনাথ

মোড়

এক পাট খোলা জানলার বাইরে নিঃসীম অন্ধকার। গাঢ় নিশ্ছিদ্র। একটা জোনাকির দীপ্তিও নেই। আশার স্ফুলিঙ্গ।

সেই অন্ধকারের দিকে চেয়ে চেয়ে তরলার ক্লান্তি আসে। চোখের দু'টি পাতায় ঘুম নামে। অন্তহীন প্রতীক্ষার অবসাদ শরীরের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে।

বাইরের অন্ধকার থেকে তরলা ঘরের দিকে চোখ ফেরাল। এদিকেও আলোর রোশনাই নেই। মিটমিটে একটা হ্যারিকেন আর কতটুকু দীপ্তি দিতে পারে!

তরলার সংসার। ছোট একটা প্যাঁটরা। আলনায় কয়েকটা কাপড় আর জামা। ও-কোণে ছোট বড় টিন। তরলার ভাঁড়ার। দরজা খুললে বাঁশের বেড়া আর খড়ের চাল দেওয়া ছোট এক রান্নাঘর।

এই তরলার সংসারের পরিধি। তার জীবনের পরিধিও এর বেশী নয়।

অথচ এমন যে হবে কেউ আশা করেনি। তরলা তো নয়ই, তরলার মা-বাপও নয়।

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

গাঁয়ের মেয়ে। স্বল্পবিত্ত বাপ। চোখ ধাঁধানো রূপও ছিল না। কাজেই সাধারণ পাত্রেরই তারা খোঁজ করেছিল।

সেদিক দিয়ে নরহরি মনের মতন পাত্র। শাশুড়ী, ননদের বালাই নেই। একলা ঘরে গিন্নী। নরহরির একটা দোকান আছে পথের ধারে। সারা গাঁয়ে ওই একটি দোকান।

তরলাও মনে মনে খুব খুশী হয়েছিল। বাসরঘরে মানুষটাকেএকটু গম্ভীর প্রকৃতি মনে হয়েছিল। কথা-বার্তা কম বলেছিল। রসিকতার ধার দিয়েও যায়নি। পথেও দু' একটা কথা। তাও খুব দরকারি।

তা হোক, এমন রাশভারি লোকই তরলার পছন্দ।

কিন্তু ক'মাস যেতে না যেতেই আবরণ খসে পড়ল। আবরণের অন্তরালে মানুষটার আসল চেহারা দেখে তরলা শিউরে উঠেছিল।

মাঝ রাতে তরলার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। হাতড়ে হাতড়ে দেখল মানুষটা পাশে নেই। তরলা বিছানা থেকে উঠে পড়েছিল।

দাওয়ায় ফিসফাস শব্দ। চাপা গলায় দুটো মানুষের কথাবার্তা। পায়ে পায়ে তরলা দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। বাইরে থেকে শিকল তোলা।

আবার পা টিপে টিপে তরলা জানলার এ পাশে এসে কপাটের ফাঁকে চোখ রেখেছিল।

দাওয়ায় দুজন। নরহরি আর একজন। প্রায় নরহরির বয়সী। ফিকে জ্যোৎস্না, নরহরির হাতে যে জিনিষটা সেই অস্পষ্ট চন্দ্রালোকেও ঝকঝক করে উঠল, সেটা দেখে তরলার সমস্ত শরীর হিম হয়ে গিয়েছিল।

কাঁপতে কাঁপতে তরলা বিছানায় ফিরে এসেছিল। শেষকালে এমন একটা মানুষের হাতে সঁপে দিল তাকে! চোর না ডাকাত, ভগবান জানেন।

তাহলে পথের ওপর দোকানটা শুধু একটা ভড়ং। পুলিশের চোখে ধুলো দেবার ফিকির। তলায় তলায় অন্য কারবারে মেতে আছে নরহরি। নিজে বেরোয় না। সাঙ্গ-পাঙ্গ আছে। তাদের দিয়ে কাজ হাঁসিল করে কিন্তু

লুটের মালের ভাগ-বাঁটোয়ারা নিশ্চয় হয়।

সেইজন্যই ওই দোকানঘরের পত্তন। মাল পাচার করার সুবিধার জন্য।

তরলা বুঝতে পেরেছিল অনেকক্ষণ পর মানুষটা নিঃশব্দ পায়ে এসে বিছানায় শুয়ে পড়েছিল।

সে রাতে তরলা কিছু বলেনি। বলেছে পরের দিন সকালে।

স্নান সেরে নরহরি দোকানের দিকে রওনা হচ্ছিল, তরলা পথ আটকাল।

কথা আছে তোমার সঙ্গে।

নরহরি যত না বিব্রত হল, আশ্চর্য হ'ল তার চেয়েও বেশী। মাস দুয়েকের ওপর যে শান্ত, স্বল্পভাষী মেয়েকে নিয়ে ঘর করছে, এ মেয়ের সঙ্গে যেন তার কোথাও মিল নেই।

নরহরি দাঁড়াল। আড়চোখে একবার তরলার আপাদমস্তক জরিপ করল,— তারপর বলল, কি কথা?

কথাটা তরলা বলল। আগের রাতের দেখা ঘটনা।

মাথা নীচু করে নরহরি কিছুক্ষণ কি ভাবল তারপর বলল, ভালই হয়েছে, তুমিই কথাটা তুলেছ। আমি কদিন ধরে তোমাকে বলব ভাবছিলাম।

এই তোমার ব্যবসা, কেন তুমি বিয়ের সময় জানাওনি? কেন তুমি এমন করে আমার জীবনটা নষ্ট করলে? ছি, ছি।

নরহরি ভ্রূ কোঁচকাল। দুটো চোখে আরক্তিম ছায়া। দাঁত দিয়ে ঠোঁটটা চেপে নিজেকে সংযত করার চেষ্টা করল।

খুব আস্তে, প্রায় অস্পষ্ট গলায় বলল, দাঁড়াও দাঁড়াও, কোথায় যেন একটা ভুল হয়ে গেছে। তুমি আমাকে কি ভাবছ বলতো?

আর কি ভাবতে পারি বল? বন্দুক পিস্তল নিয়ে কারা ঘোরাঘুরি করে? কারা?

কথা শেষ হবার আগেই তরলা চোখে আঁচল চাপা দিল। সারারাতের কষ্টে সংযতকরা অশ্রুর বেগ আর বাধা মানল না। দু' গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ল।

নরহরি তরলার কাছে এগিয়ে এল, তার পিঠে একটা হাত রাখতে গিয়েও কি ভেবে রাখল না। শুধু বলল, চল, ঘরের ভিতর। সব কথা তোমায় বলছি।

নরহরির পিছন পিছন তরলাও ঘরের মধ্যে এসে ঢুকল। কান্না থেমেছে কিন্তু যৌবনপুষ্ট দেহটা আবেগে ফুলে ফুলে উঠছে তখনও।

তরলা কিছু বুঝল। অনেকটাই বুঝল না। যেটুকু বুঝল, সেটুকুও যে খুব সহজ, স্পষ্ট, এমন নয়।

যে দেশে তারা বাস করে সে দেশ বুঝি স্বাধীন নয়। অনেক দূর থেকে এসে বিদেশী এক জাত সে দেশ শাসন করছে। আপাতদৃষ্টিতে যে দেশ শুধু গাছপালা মাটি জলের সমষ্টি বলে মনে হয়, তারও আত্মা আছে, প্রাণ আছে। আমাদের ধারণ করেন, পালন করেন, তাই তিনি আমাদের মা। এই মা শৃঙ্খলিতা, নির্যাতিতা। বন্ধনমুক্তির পণ নিয়ে যারা প্রাণোৎসর্গ করেছে, নরহরি তাদেরই একজন।

যে প্রশ্ন তরলার চোখের ছায়ায় ঘনীভূত হয়ে এসেছিল, সে প্রশ্নের উত্তরও নরহরিই দিয়েছিল।

বিয়ে করে সংসারী হওয়ারও কারণ ছিল। বাউণ্ডুলে, ছন্নছাড়া মানুষগুলোর ওপর পুলিশের নজর বেশী। বৌ নিয়ে সংসার করছে, গৃহীর এমন একটা মুখোশ সময়ে অসময়ে খুব কাজে লাগে। পুলিশের চোখ এড়াবার জন্য।

হাটুর ওপর মুখটা রেখে তরলা চুপ করে কথাগুলো শুনল। এক মুহূর্তের জন্যও দৃষ্টি সরাল না নরহরির দিক থেকে।

তরলার চোখের সামনে একটা দৃশ্য ভেসে উঠল। অনেক আগে দেখা একটা দৃশ্য।

বাপের সঙ্গে আত্মীয়ের বাড়ী থেকে ফিরছিল। হাটের মধ্য দিয়ে ফেরার পথ।

হঠাৎ হল্লা উঠল।

হাটের সব লোক ছুটল সওদা ফেলে। পশ্চিমের আকাশ লাল হয়ে উঠল।

আগুন লেগেছে, আগুন।

বাপের হাতটা শক্ত হাতে ধরে তরলা চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। তারপরই লাল পাগড়ী মাথায় পুলিশের দল ছুটে এল। হল্লা আরো জোর।

কী হয়েছে বাবা?

কাঁপা গলায় তরলা প্রশ্ন করেছিল।

কি হয়েছিল সে খবর তরলার বাপ পথচলতি আর একজনের মুখ থেকে সংগ্রহ করেছিল।

স্বদেশী বাবুরা বিলিতি কাপড়ের দোকানে জোর করে ঢুকে সমস্ত বিলিতি কাপড় টেনে রাস্তায় ফেলে দিয়েছে। তারপর তাতে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে। পুলিশ এসে বাবুদের সব গ্রেপ্তার করেছে। কিন্তু আগুন এখনও নেভেনি।

স্বদেশী কারা বাবা? সেদিন তরলা নিরীহ প্রশ্ন করেছিল বাপকে। এ ভাবে জিনিষের ক্ষতি করে তাদের কি লাভ।

সেদিন বাবা তার প্রশ্নের কি উত্তর দিয়েছিল, আজ আর তরলার মনে নেই। যেদিন তার চোখের সামনে দিয়েই

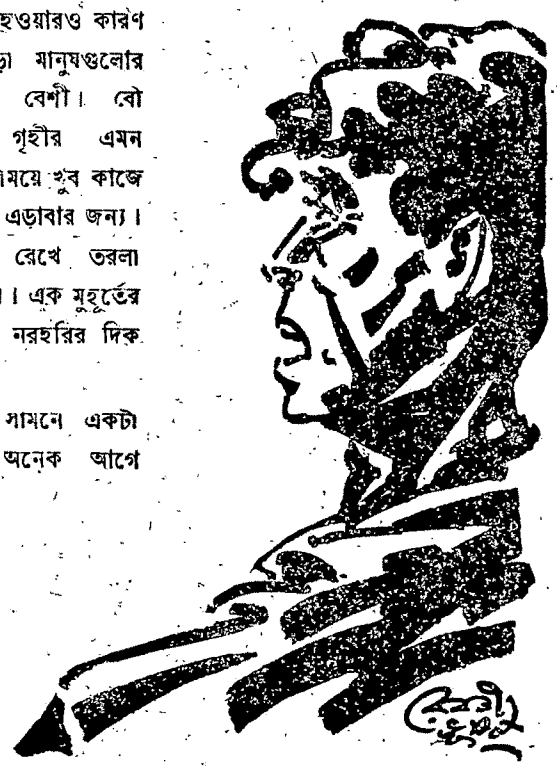

পুলিশ স্বদেশীবাবুদের টানতে টানতে নিয়ে গিয়েছিল, সে দৃশ্যও অস্পষ্ট হয়ে গেছে। শুধু রক্তাক্ত ধূমায়িত পশ্চিমের আকাশের ছবিটা চোখের সামনে জ্বল জ্বল করে উঠল।

তরলা ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পারে নি, আগুনের সে লেলিহান শিখা আকাশ থেকে নেমে এসে তরলার ললাট দগ্ধ করবে।

তারপর থেকে তরলা বেশ অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল। নিস্পৃহভাবে সংসারের কাজটুকু শুধু করে যেত। নির্লিপ্তভাবে কথা বলত নরহরির সঙ্গে। শুধু যেটুকু প্রয়োজন, সেইটুকুই।

তবু মানুষটা সঙ্গে থাকত। রাতের বেলায় একশয্যায় আশ্রয় নিত দুজনে। কিন্তু সব রাতটুকু নরহরি থাকত না। ঘুমের ঘোরের মধ্যেই তরলা শুনতে পেয়েছে বাইরের দরজার ঠুক-ঠুক শব্দ। পাশে শোয়া লোকটা চমকে উঠে দরজা খুলে বেরিয়ে চলে গেছে। সে রাতে আর ফেরেনি।

প্রথম প্রথম তরলা জিজ্ঞাসা করেছিল।

কোথায় যাচ্ছ এই মাঝরাতে?

এ প্রশ্ন নরহরি এড়িয়ে গেছে শুধু বলেছে, দরজাটা বন্ধ করে দাও।

দরজা তরলা বন্ধ করেনি। খোলা দরজার কপাটে পিঠ রেখে চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল। অনেকক্ষণ ধরে।

এরপর অবস্থা আরও খারাপ হ'ল।

পর পর দুদিন চারদিন মানুষটা ফিরল না। অবশ্য ফিরবে না যে সে খবর তরলা পেল গাঁয়ের ছুতোর মিস্ত্রি ভূধরের মারফৎ।

দাওয়ায় পা ঝুলিয়ে গালে হাত দিয়ে তরলা চুপচাপ বসেছিল।

রান্নাঘরের দিক মাড়ায় নি। সারাটা রাত বিছানায় ছটফট করেছে। ঘুম আসে নি। বাপের বাড়ী গিয়ে থাকবে কিছু দিন, সে পথও বন্ধ। মাও নেই, বাপও নয়। বিয়ের ক' মাসের মধ্যেই দু'জনে খতম হয়ে গিয়েছে।

অন্যবার সকাল ন-দশটার মধ্যেই মানুষটা ফিরে আসে। একেবারে নদী থেকে স্নান সেরে। বাতা এসে দোকানের চাবিটা নিয়ে যায়। সেদিন বারোটা বাজে, লোকটার দেখা নেই।

ভূধর মিস্ত্রি দরজার গোড়ায় এসে দাঁড়াল।

দাদাবাবুর আসতে ক'দিন দেরী হবে। ভিন গাঁয়ে গেছেন কাজে। হাট থেকে যদি কিছু আনবার থাকে, তো পয়সা দিন।

ভূধর মিস্ত্রিকে স্পষ্ট তরলা দেখতে পেল না। দুটো চোখই ঝাপ্সা ছন্ন। তার কথাগুলো শুধু কানে গেল।

আঁচলে চোখ মুছে তরলা উঠে দাঁড়াল। ভূধরের দাঁড়ানোর ভঙ্গী, সন্ত্রস্ত চাউনি, সব কিছু যেন স্বাভাবিক নয়। নরহরির ভিনগাঁয়ের কাজের ধরণটা যে ভূধরের অজানা নয়, সেটুকু বুঝতে তরলার একটুও অসুবিধা হল না।

তরলা ঘাড় নাড়ল। না, কিছু আনাবার নেই। একবার ভাবল ভূধরকে জিজ্ঞাসা করে হাটে সেঁকোবিষ পাওয়া যায় কি না, যে বিষ ওষ্ঠলগ্ন হলেই জীবনে পরম তৃপ্তি এনে দেবে। সব দুঃখ, সব যন্ত্রণার অবসান।

কিন্তু কি ভেবে তরলা কিছুই বলল না। আবার গিয়ে দাওয়ায় বসল।

একটু দাঁড়িয়ে থেকে ভূধর চলে গেল।

বিকেলের দিকে নরহরি এল না, এল পুলিশ।

তরলা বাড়ীর মধ্যে ছিল, দুপদাপ আওয়াজ হ'তে ছুটে বাইরে এসে দাঁড়াল।

জন দশেক পুলিশ উঠানের ওপর।

তরলাকে দেখে একজন এগিয়ে এল।

নরহরিবাবু কোথায়?

তরলা সত্যি কথাই বলল, জানি না।

হুঁ, মুখ বেঁকিয়ে পুলিশ বিশ্রীভাবে হাসল, তারপর পিছন দিকে ফিরে অন্য পুলিশদের আঙুল নেড়ে ইশারা করল।

তরলাকে ঠেলে দিয়ে সবাই ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। তারপর দক্ষযজ্ঞ কাণ্ড। সব জিনিষপত্র টেনে টেনে চারদিকে ছড়িয়ে ফেলল। এমন কি তরকারির ঝুড়িও উপুড় করে দেখল তাতেও নিস্তার নেই। সমস্ত বালিশ বিছানা ছিঁড়ে ছিঁড়ে একাকার।

পুলিশ এক ঘণ্টা পরে যখন চলে গেল, তখন সেই এলোমেলো অবস্থার মধ্যে তরলা পাষাণ মূর্তির মতন চুপচাপ বসে রইল।

এক সময় উঠে ইতস্তত ছড়ানো জিনিষগুলো আবার তরলা ঘরের মধ্যে রাখল; ছেঁড়া বালিশগুলোও আস্তে আস্তে রিপু করল। কিন্তু নিজের ছেঁড়া সংসারটা আর রিপু করতে পারল না। নিয়তির সঙ্গে দুর্বার সংগ্রামে বার বার পরাজিত হল।

মাঝ রাতে আবার দরজায় শিকলের শব্দ। বাইরে ঝড়ের মাতন। তরলা জেগে উঠে শব্দটা শুনেছিল, কিন্তু ভেবেছিল বুঝি ঝোড়ো বাতাসে শিকলটা দুলছে।

কিন্তু বাতাসকে ছাপিয়ে আরো একটা আওয়াজ কানে এল।

তরলা, তরলা।

চেনা মানুষের কণ্ঠস্বর। এমন একটা স্বর শোনার জন্যই বুঝি তরলা দিনরাত উৎকর্ণ হয়ে ছিল। ধড়মড় করে উঠে পড়ল।

হ্যারিকেন জ্বালাল, তারপর দরজার এ-পাশ থেকে মৃদু গলায় বলল, কে? কে?

আমি, আমি তরলা।

দরজার ও-পাশ থেকে ক্লান্ত, ব্যাকুলকণ্ঠে উত্তর এল।

নির্দ্বিধায় তরলা দরজা খুলল। হ্যারিকেনটা উঁচু করে ধরল এক হাতে। তারপর হ্যারিকেনের দীপ্তি চৌকাঠের ও-পারে লোকটার ওপর পড়তেই চমকে পিছিয়ে গেল।

এক মুখ গোঁফ আর দাড়ি। অবিন্যস্ত চুলের রাশ। অল্প আলোতেও দুটো চোখে হীরকের দ্যুতি।

বাড়ীতে কিছু আছে?

নরহরির কণ্ঠের কাকুতি তরলাকে বিচলিত করল।

কোথায় ছিলে এতদিন?

তরলার এ প্রশ্নের উত্তরে নরহরি একটা আঙুল নিজের ঠোঁটের ওপর

রাখল। তারপর আবার বলল, বাড়ীতে খাওয়ার মত কিছু আছে?

বাড়ীতে মুড়ি ছিল। তরলা বাগানে নেমে খুঁজে খুঁজে গোটা দুই শশা তুলে নিয়ে এল, তারপর বসে বসে দেখল একটা মানুষের আগ্রাসী ক্ষুধার নিবৃত্তি মনে হ'ল, দিন দুই তিন বোধ হয় পেটে একটা দানাও পড়েনি।

খাওয়া শেষ করে নরহরি তরলার দিকে চোখ তুলে শুধু বলল, একটু জল।

কোণের দিকে রাখা মাটির কলসী থেকে তরলা জল গড়িয়ে সামনে রাখল। এক চুমুকে জলটা শেষ করে নরহরি উঠে দাঁড়াল।

বাইরে ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে তুমুল বর্ষণ সুরু হয়েছে। একটু আগে তরলা যখন বাগানে নেমেছিল, তখনই বেশ কয়েক ফোঁটা তার গায়ে পড়েছিল।

চলি।

নরহরি একটু যেন হাসবার চেষ্টা করল, কিন্তু হাসি ফুটল না।

তরলা বলল, এই বৃষ্টিতে?

নরহরি আবার হাসল। এবারের হাসি আরো করুণ, আরো নিষ্প্রভ।

দরজা খোলাই ছিল। ধুতির কিছুটা খুলে মাথায় জড়িয়ে নিল, তারপর সেই প্রবল বর্ষণের মধ্যে লোকটা ঝাঁপিয়ে পড়ল।

যতক্ষণ দেখা গেল, কপাটে হেলান দিয়ে তরলা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল। অপস্রিয়মান অস্পষ্ট যে মূর্তিটা মেঠো পথ ধরে, ঝোপঝাড় পার হয়ে এগিয়ে চলেছে, তার সঙ্গে তরলার একটা নিবিড় সম্পর্ক আছে, আত্মার আত্মীয় এ—কথা মনেই হল না। বাইরের দুর্যোগের মতন, মানুষটাও তার জীবনে শুধু একটা দুর্যোগ। তার বেশী কিছু নয়। তরলার জীবনের সব কিছু তছ্‌নছ্‌ করে দিয়ে গেছে।

এবারেও খবর আনল ভূধর মিস্ত্রি।

মাঝরাতে দরজায় ঠক ঠক শব্দ শুনে তরলা ছুটে গিয়ে দরজা খুলে দিয়েছিল। আজ বাড়ীতে চাল বাড়ন্ত। অল্প কয়েক মুঠো মুড়ি পড়েছিল। খিদেয় পেটের মধ্যে নাড়ীগুলো বার বার মোচড় দিয়ে উঠেছে, তবু তরলা মুড়ি ছোঁয়নি। কি জানি, রাত্রির অন্ধকারে গা ঢেকে যদি একটা ক্ষুধার্ত মানুষ দরজায় এসে দাঁড়ায়। কি করে তাকে ফিরিয়ে দেবে তরলা। কি করে বলবে, বাড়ীতে কিছু নেই, তুমি ফিরে যাও।

দরজা খুলেই কিন্তু তরলা বিব্রত হ'ল।

সে মানুষটা নয়, হ্যারিকেন হাতে ভূধর মিস্ত্রি।

গায়ে মাথায় ভাল করে শাড়ীটা জড়াবার জন্য তরলা দরজার একপাশে সরে দাঁড়িয়েছিল সেই অন্তরাল থেকেই শুনল।

দাদাবাবু ধরা পড়েছেন। পড়তেন না ধরা, নিজের দলের একজন লোকই বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। আপনি একটু সাবধানে থাকবেন। আমি মাঝে মাঝে এসে আপনার খবর নিয়ে যাব। এই নিন।

ভূধরের প্রসারিত হাতে কয়েকটা নোট।

আশ্চর্য, তরলা ভেবেছিল এমন একটা সর্বনাশা খবরে সে বোধ হয় বিচলিত হয়ে পড়বে। বালিশে মুখ লুকিয়ে সারাটা রাত গুমরে গুমরে কাঁদবে। কিন্তু তেমন কিছুই হল না। ভূধরের হাত থেকে নোটগুলো নিয়ে তরলা শক্ত করে আঁচলে গিট দিল।

বিষাদের পরিবর্তে একটা মুক্তি, একটা নিষ্কৃতির ভাব তার সারা শরীর আচ্ছন্ন করে ফেলল।

আর পুলিশের অত্যাচার নয়। রাতের পর রাত জেগে একটা মানুষের জন্য অপেক্ষা করে করে নিজের শরীরপাত করার আবশ্যক হবে না।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই তরলা ভাবল। শুধু কতকগুলো নীরস সংস্কৃত মন্ত্র দুটো হৃদয়কে বাঁধতে পারে না। তাদের অবিচ্ছিন্নভাবে বাঁধার জন্য, কাছে আনার জন্য যে মন্ত্রের প্রয়োজন সে মন্ত্র কোন দিনই দুজনের জীবনে উচ্চারিত হয়নি।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে তরলা যখন মুখ তুলে চাইল, তখন ভূধর সরে গেছে। তার হ্যারিকেনের ম্লান দীপ্তি নেই। পরিবর্তে হাল্কা জ্যোৎস্নায় তরলার উঠান ভরে গেছে।

পরের দিন স্নান সারার পর তরলার যেন নিজেকে অন্য দিনের তুলনায় বেশ পরিচ্ছন্ন বেশ হালকা মনে হল।

দোকানের চাবিটা তাকের ওপর ছিল। সেটা হাতে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল।

দোকানের ঝাঁপ খুলে দাঁড়িপাল্লা হাতে নিয়ে তরলা যখন বসল, তখন পাড়ায় পথচলতি অনেকেই চেয়ে চেয়ে দেখল। হাটে বাজারে মেয়ে-ছেলেকে জিনিষ বিক্রি করতে তারা বহুবার দেখেছে, তেমন দৃশ্যে তারা অভ্যস্ত, কিন্তু ভদ্রলোকের বাড়ীর বৌ এভাবে সদর রাস্তার ওপর দোকানে এসে বসবে, এটা কল্পনাও করেনি।

কিন্তু তরলা ভ্রূক্ষেপও করল না।

দোকানে অনেক জিনিষই নেই। পরাণের মাকে দিয়ে স্টেশনের ধারের দোকান থেকে দরকারি জিনিষ কিনে আনাল। দোকানটা ঝাড়ামোছা করে তকতকে করে তুলল। এ তল্লাটে আর দোকান নেই। কাজেই কিছু কিছু খদ্দের এসে দাঁড়াল। তবে অনেকেই বাকিতে জিনিষ নেবার খদ্দের।

কিন্তু তরলা ঘাড় নাড়ল, না, বাকি চলবে না। নগদ ছাড়া কিছু বিক্রি হবে না। নিজের সারাটা জীবনই বাকিতে কারবার করেছে তরলা। সে বকেয়া উশুল হবার কোন সম্ভাবনাই নেই। হিসাবের খাতা ছিল না বলেই বুঝি হিসাব কোন দিনই মিলল না। আর নয়। তেমন ভুল তরলা আর করবে না।

দিনের পর দিন গেল। বছরের পর বছর। এর মধ্যে ভূধর মিস্ত্রি একদিন আবার তরলার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল।

সদরে দাদাবাবুর মামলা সুরু হয়েছে। দাদাবাবুর খুব ইচ্ছা তরলার সঙ্গে একবার দেখা করবে। এক বেলার পথ। রাজী থাকলে ভূধরই সঙ্গে করে নিয়ে যাবে।

দাঁড়িপাল্লায় তরলা হলুদ ওজন করছিল, ভূধরের দিকে না চেয়েই বলল, সময় হবে না।

এমন গম্ভীর কণ্ঠে কথাগুলো তরলা বলল যে, ভূধর আর দ্বিতীয়বার অনুরোধ করতে সাহস করল না।

তারপর গোটা যুদ্ধ দেশের ওপর দিয়ে গেল। ঝাঁকে ঝাঁকে প্লেন আকাশ ছেয়ে ফেলল। বনে-জঙ্গলে সৈন্যদের তাঁবু পড়ল। তরলার ভ্রূক্ষেপ নেই। শুধু পেট-কাপড়ের মধ্যে ডাবকাটা কাটারিটা নিয়ে দোকানে যাওয়া-আসা করতে লাগল।

একদিন যুদ্ধও শেষ হল। লরী বোঝাই সৈন্যরা ফিরে গেল। গাঁয়ের লোক যেন নিশ্বাস ছেড়ে বাঁচল।

তবুও নিশ্চিন্ত নিদ্রার ফাঁকে ফাঁকে তরলা চমকে বিছানার ওপর জেগে বসে। মনে হয় কে যেন সন্তর্পণে দরজার শিকল নেড়ে চলেছে, ঠুক, ঠুক, ঠক।

রান্না করার সময়ে একটা মানুষের ভাত বেশী তৈরী করে ফেলে। তারপর খেতে বসে খেয়াল হয়। চোখ মুছতে মুছতে বাড়তি ভাতগুলো সানকিতে করে ছাইগাদায় ফেলে দিয়ে আসে।

আয়নার সামনে বসে সিঁথিতে সিঁদুর দিতে দিতে নিজের পরিপূর্ণ যৌবনের দিকে চোখ পড়ে যায়। অনেক কষ্টে তরলা উদগত নিশ্বাস চাপে।

একেবারে আচমকা।

পুকুর থেকে স্নান সেরে ভিজে কাপড়ে তরলা উঠান পার হচ্ছিল, হঠাৎ মানুষটা এসে দাঁড়াল।

কে? তরলা দুটো হাত জড় করে বুকের ওপর রাখল।

আমি।

খুব ক্ষীণ কণ্ঠস্বর। অনেক কষ্টে যেন কথা বলছে।

তরলা ঘুরে দাঁড়াল।

দুর্বল, কৃশ একটা মানুষের কাঠামো। মাথার চুল বেশীর ভাগই পাকা। শরীরটা সামনের দিকে ঈষৎ নুয়ে পড়েছে। কোটরগত, নিষ্প্রভ দুটি চোখ। সারা মুখে শিরার জট।

সুস্থ সবল মানুষটা এভাবে ফিরে এসেছে।

দেশ স্বাধীন হয়েছে তরলা। আমরা জেল থেকে মুক্তি পেয়েছি।

তরলা কথাগুলো চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনল। একটি কথাও বলল না। বলার মতন কিছু খুঁজেও পেল না।

জানো এতদিনে আমরা মুক্ত। বিদেশীর অত্যাচার থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছি। এ মাটি, এ সব গাছপালা সত্যিই আমাদের।

এবার তরলা অবাক হল।

কিভাবে এতদিন কেটেছে তরলার সে খোঁজ নেওয়া দূরে থাক, সামান্য একটা কুশল প্রশ্নও নয়। এসেই বড় বড় কথা বলতে আরম্ভ করেছে। এক সময়ে স্বাস্থ্যবান মানুষটার মুখে যে কথাগুলো সাজতো আজ এই ক্ষীণ-কায়, পাঁজরাসম্বল লোকটার মুখে কথাগুলো একদম মানাচ্ছে না।

একটু এগিয়ে তরলা দাওয়ায় গিয়ে উঠল। বুঝতে পারল লোকটাও পিছন পিছন আসছে।

চৌকাঠ বরাবর এসে তরলা দাঁড়াল, ফিরে জিজ্ঞাসা করল, তোমার জন্য রান্না চড়াই?

না, না, লোকটা হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, আমি দোকান থেকে খেয়ে এসেছি।

নরহরি দাওয়ার ওপর বসে পড়ল। এইটুকু হেঁটেই যেন ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। তরলার মনে হল মানুষটাকে যন্ত্রে পিষে তার রক্ত, মাংস, মেদ, মজ্জা সব বুঝি বের করে নিয়েছে। শুধু ছিবড়েটুকু ফেরত পাঠিয়েছে তরলার সংসারে।

এইটুকু নিয়েই তরলাকে সংসার সংসার খেলা খেলতে হবে। তরলা ঘরের মধ্যে ঢুকে দরজা ভেজিয়ে দিল।

দোকানের চাবিটা হাতে নিয়ে তরলা পাশ কাটিয়ে যাবার সময় নরহরি কথা বলল, কোথায় যাচ্ছ?

দোকানে।

বিস্মিত নরহরিকে আর কিছু বলবার অবকাশ না দিয়েই তরলা হন্-হন্ করে এগিয়ে গেল।

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর মানুষটা যখন বিছানার এক প্রান্তে শুয়ে পড়ল, তখন হ্যারিকেনের ম্লান দীপ্তিতে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তরলা দেখল।

শোওয়া মাত্রই ঘুমিয়ে পড়েছে। সাড় নেই। ক্লান্ত, নিশ্চেতন নির্জীব এক সত্তা। নিশ্বাস ফেলে তরলা আঁচল পেতে মাটিতে শুয়ে পড়ল।

দিন দুয়েক পরেই নরহরি কথাটা বলল।

তরলা রান্নাঘরে ছিল, নরহরি দরজায় গোড়ায় গিয়ে দাঁড়াল।

আমার জামা-কাপড়গুলো একটু কেচে দিও তো বিকেলে একটা মিটিং আছে।

তরলা কোন কথা বলল না। শুধু ঘাড় নাড়ল।

এতদিন মানুষটা ছিল না, তবু একটা সান্ত্বনা যে একদিন মানুষটা ফিরে এসে তরলার সব ভার নেবে। বাইরের দুর্যোগ থেকে বলিষ্ঠ সবল দুটি বাহু দিয়ে বাঁচাবে।

কিন্তু এতো পুরুষ নয়, পুরুষের ছলনা। এ মানুষের হাতে কোন দিন আগ্নেয়াস্ত্র দেখেছিল এমন কথা তরলার অবিশ্বাস্য মনে হল।

দুপুর থেকেই নরহরি সাজগোছ সুরু করল।

অনেকটা পথ। শহর থেকে বড় বড় লোক আসবেন। যাঁরা তিল তিল করে দেহের রক্ত দিয়ে দেশ-জননীর অপমানের কলঙ্ক মুছেছেন, পরাধীনতার নিগড় ভেঙে চুরমার করেছেন তাঁদের সম্বর্দ্ধনা জানাবার জন্যই এই সভা।

দোকানে বসেই তরলা দেখল নরহরি তারই হাতে কাচা ধুতি-পাঞ্জাবি পরে পথ দিয়ে চলে গেল।

নরহরি যখন ফিরল তখন সন্ধ্যা উতরে গেছে।

গা ধুয়ে এসে তরলা কাপড় ছাড়ছিল, এমন সময় বাঁশের আগল খোলার শব্দ হল।

নরহরি উঠান পার হয়ে দাওয়ার ওপর এসে বসল।

কাপড় ছাড়তে ছাড়তেই তরলা দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিল। ভেবে-ছিল বোধ হয় লোকটার গলায় সম্বর্দ্ধনার

(১৬২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

দুরতিক্রমণীয়া

প্রণতি মুখোপাধ্যায়

অসীমবাবু ভাষণ রেগে চেয়ার থেকে উঠলেন যেই, কাপড়টা কেমন করে যেন হাতলে আটকে গেল। মুক্তকচ্ছ হবার আগেই ঘুরে হাতল থেকে কাপড় ছাড়িয়ে নিয়ে তাকিয়ে দেখলেন—

অথচ এসব কিছুই হবার কথা নয়। সন্ধ্যা-বেলাকার নির্জন অবকাশ রকের ওপর চেপে বসতে চাইছিল, মাসের দ্বিতীয় শনিবারও ছুটি গেছে, আজ রবিবার। বেড়াতে যাবার অভ্যাস নেই খুব, অসীমবাবু একটু ঘরকুনো। একটু-আধটু গল্প লেখার শখ আছে, আজও তাই মনে মনে একটা গল্প তৈরী করতে বসেছিলেন। কাগজ-কলম ধরার আগেই মনে মনে গল্পের অনেকখানি লিখে ফেলেন তিনি। সময় হয়তো বেশী লাগে, কিন্তু এটাই স্বভাব। সেই মনে মনে গল্প লেখার প্রথম পর্যায়েই রিভাট বাধল।

হঠাৎ দেখলেন—চর্চক্ষেই দেখলেন, শুধু একখানা টাকিস তোয়ালে গায়ে জড়িয়ে---

সন্ধ্যা তখন রাতের দিকে মোড় ফিরব-ফিরব করছে। অসীম বারান্দায় একখানি আরাম কেদারায় বসে সান্ধ্য হেরিওয়ালার কাছ থেকে কেনা কাগজে একখানি রিক্ত মুক্তীর মালা আয়োগ করতে করতে তাঁর সদ্যোরচ্য গল্পের নায়ক-নায়িকার কথা ভাবছিলেন। না, বিষয়বস্তুর কথা ভাবেন নি। ও এখন বেকেলে হয়ে গেছে ---ছোটগল্প ছেড়ে উপন্যাসেও। পুট গোণি এখন, মুখ্য হুল বাকি যা কিছু সব। তার কারণ আছে। সাময়িক পত্রের পাতায় অন্ততঃ পটের জন্য জায়গা কোথায় বলুন? নায়কের গায়ের কাবলী জুতোর কোন প্রাটিচার কোনখানটায় ছেঁড়া তার বর্ণনা দিতে হবে। ধর্তিলার ভীড়ে হাঁটতে হাঁটতে ঠিক কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে একটা সস্তা সিগারেট ধরালো সে, তারও। কোন মেয়ের কথা কেমন করে ভাবতে ভাবতে কখন কোন পথচারীর সঙ্গে ধাক্কা খেল, তারও। তারপর নায়িকা আছে। তার রূপোলের সুপক্ক বর্ণটি, রক্তে দোদল্যমান নকল পেনডেন্টটি, হাতের গোডাবর্ধক ব্যাগের কারুকার্যটি—সব বর্ণনাগুলিই অত্যাবশ্যক, বাদ কোনমতেই কোনটাকেই দেওয়া চলবে না। সেই নায়িকা অলস শয়ন ছেড়ে উঠতে বিছানায় কোঁচ পড়বে যখন, চাদরখানি আবার টান করে পেতে দিতে গিয়ে কি ভেবে সে থামবে যখন, স্খলিত বসনাঞ্চল সংবরণ করতে করতে মন্থরপায়ে জানালায় এসে দাঁড়াবে যখন, নীচের চলমান জীবনস্রোত কিংবা সামনের বোনা-ধরা দোতলা বাড়ীর কোণের ঘর থেকে উত্থিতবান সিগারেট ধূমকুণ্ডলী নিরীক্ষণ করবে যখন, দু' এক কথায় তো তার বর্ণনা সেরে ফেলা যাবে না। অথচ অন্যদিকে নিষ্ঠুর সম্পাদককুল অবিরাম স্থানাভাব ঘোষণা করছেন। ছোট লেখা চাই, ছোট লেখা। এমন পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে গল্পের পুট ঢুকবে কোন ছিদ্রপথে।

"হায়রে কবে কেটে গেছে কালিদাসের কাল।" সেদিন সাময়িক পত্র-পত্রিকায় লেখা প্রকাশের ফ্যাশান ছিল না, কবিরা তাই নিশ্চিন্ত মনে লিখতে পারতেন। "তন্বী শ্যামাশিখরীদশনাপক্ক-বিম্বোধরোষ্ঠী"র বর্ণনায় যত খুশী শ্লোক রচনা করতে পারতেন। আজকের দিনের কোন বিখ্যাত লেখককেও যদি দু' এক পাতার বেশী ঘামে ভেজা জামা অথবা শয্যা-চা পর্ব থেকে অফিসযাত্রার আনুপূর্বিক বর্ণনা দেন তাহলে বই ছুঁড়ে ফেলে দেন সুশীল পাঠকও! অসীমবাবু দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন, এ যুগে জন্মাবার শতেক যন্ত্রণা।

সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি আমার গল্পের নায়িকা?

স্বীকৃতি জানিয়ে মেয়েটি মুখ টিপে হাসল। চেহারাটা সুশ্রী বেশ।

হেসে বলল, গল্প বলে কিছু যদি আপনার থাকে অবশ্য।

মেয়েটি তাঁর গল্পের পুট নিয়ে তাঁকে উপহাস করতে চাইছে। অসীমবাবু দোষ নিলেন না, কথাটা এড়িয়ে গেলেন। আধুনিক সাহিত্যের খবর রাখে না বোঝা যাচ্ছে।

বললেন, তুমি এমন অশ্লীল বেশে এলে কেন?

—ব্যস্ত হয়ে স্নানের ঘর থেকেই সোজা চলে এসেছি, তাই। বলে মেয়েটি ঈষদানত হয়ে নিজের পরিচ্ছদের ওপর চোখ বুলিয়ে নিল একবার। তারপর প্রতিবাদ জানাল।

অশ্লীল বলছেন কেন? বুক থেকে জড়িয়েছি, উরু পর্যন্ত পৌঁছেছে, দু'হাত দিয়ে ধরেও আছি —তবে? আর যুগটা চলছে এদিকে টপলেসের।

মিথ্যা নয়। কাগজে টপলেসের খবরটা খবর দেখে না এমন মানুষ বিরল। অসীমবাবুও বহুবার দেখেছেন।

সুতরাং অশ্লীলতার প্রশ্ন ছেড়ে বললেন, তা' এত ব্যস্ত হয়ে এখানে আসার কারণ কি জানতে পারি?

আপনার কল্পনার দৌড় দেখে প্রাণের দায়ে দৌড়ে এসেছি। কোন বিবেচনায় একটু আগে আমাকে একখানা লাল রংয়ের ডুরে শাড়ী পরাচ্ছিলেন?

তা হবে। মনের অগোচরেই অসীমবাবু তাঁর গল্পের নায়িকার অঙ্গে লাল ডুরে শাড়ী কল্পনা করছিলেন। এখন অবশ্য মনে নেই সে কথা। তবে এটা ঠিক যে উঠতি বয়সের মেয়েরা লাল ডুরে শাড়ী পরলে তাঁর ভাল লাগে। আজকাল কেন যেন বিশেষ দেখতে পান না।

কাপড়খানা মেয়েটির অপছন্দ হবার কোন

মনটা বোধহয় নায়িকার দিকেই বেশী ঝুঁকেছিল, এমন সময় মৃদু-কড়া একটা রিনটিন শব্দ শুনে ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন—

দেখলেন বড় একখানি টাকিস তোয়ালে জড়ানো এক নারীমূর্তি দাঁড়িয়ে।

অসীমবাবু একটু চমকালেন, তাঁর এই নির্জন বারান্দায় একে! এক বিড়ম্বিতও বোধ করলেন, কে এই লজ্জাহীনা অপরিচিতা?

পুরো অপরিচিতা মনে হচ্ছে না কিন্তু। রাস্তার আলো আর বারান্দার অন্ধকার চোখে সয়ে আসছে মত, ততই চেনা লাগছে।

যেন এই মুখখানিই কল্পনা করছিলেন বসে—অবশ্য পোশাকটা এমন ছিল না তার, চুলটাও এমন মাথার সারখানে চিপির মত উঁচু হয়ে ওঠেনি—

অসীমবাবু দ্বন্দ্বের মধ্যে থাকতে ভালবাসেন না।

অংগত কারণ খুঁজে না পেয়ে বললেন, কেন? তোমার এই তন্বী তরুণী-দেহে টুকটুকে লাল একখানি ডুরে শাড়ী তোমার লাবণ্য হাজার গুণ বাড়িয়ে দেবে।

—বোগাস। লাবণ্য---শ্রী—যত সব সেকেলেপনা। আর তরুণী মানে আমাকে কি আপনি আঠারো বছরের খুকী পেয়েছেন নাকি?

—আঠারো না হোক, বাইশ—

—ওটা বত্রিশ করুন। পাঠকের রুচির সঙ্গে একাত্ম হোক আপনার লেখনী।

প্রতিপক্ষকে নির্বাক দেখে আবার বলল, বত্রিশ বছর বছরের তন্বী নায়িকাই হ'ল প্রকৃত আধুনিকতার প্রতীক। তন্বী কাকে বলে আপনি তা মোটেই জানেন না—একি করেছেন বলুন তো আমায়। দেখে শিউরে উঠছি আমি—কড়া ডায়াটিং দরকার। অন্ততঃ এক মাস পাঁচশ' ক্যালোরি ডায়াটে থাকতে হবে। তন্বী মানে যে মেয়েটি এক হাতে বিজড়িত তোয়ালে সামলে অন্য হাতে তার সুগঠিত কণ্ঠে হাত দিল, এই দু'দিকের কণ্ঠায় দুটো তিন-সাড়ে তিন ইঞ্চি মাপের গর্ত থাকা চাই। শরীর সেই অনুপাতে রোগা হবে—তাতে ম্যাচিং শাড়ী আর স্লিপলেস ব্লাউজ—তবে না বলি তন্বী।

অসীমবাবু আর সব ভুলে বিমূঢ় কণ্ঠে শুধু বললেন, প্রায় না খেয়ে এ ভাবে রোগা হতে গেলে স্বাস্থ্য ভেঙে পড়বে না?

—ড্যাম ইওর স্বাস্থ্য! স্বাস্থ্যের কথা ভেবে কি ফ্যাশান ভুলব নাকি?

তা অবশ্য ঠিক। অসীম কৈফিয়ৎ স্বরূপ বললেন, আমি সম্প্রতি কলকাতায় বদলি হয়েছি, আধুনিক ফ্যাশান-ট্যাশান ঠিক জানি না তাই। তা কাপড়ের কথা কি বলছিলে?

মেয়েটি সহানুভূতিতে কোমল হয়ে বলল, ইস্ বনে-জঙ্গলে ছিলেন বুঝি? তাহলেও লোকে মাঝে মাঝে এসে কলকাতা কিংবা দিল্লী-বম্বের হালচাল জেনে যায়। যাক, আমার গায়ের এই তোয়ালেখানার কি রং জানেন?

—হ্যাঁ, ভুঁতের মত নীল রং---না, তার চেয়ে বোধহয় ফিকে হবে---

—আধুনিক সমাজে আমরা একে বলি পিকক্-ব্লু। কেমন লাগে রংটা আপনার?

—বিচ্ছিরি।

মেয়েটির চোখে আবারও সমবেদনা প্রকাশ পেল।—ইস্ একেবারে জংলী হয়ে গেছেন বাইরে থেকে। আমার দিদিমার চেয়ে তো আর বড় হবেন না আপনি। দিদু তো আবার নতুন করে পিকক্-ব্লু রংয়ের জামা পরছেন। আহা বেচারি বিধবা মানুষ, কাপড়টা সাদাই পরতে হয়, আগে তো জামাও সাদা পরতেন, এখন এমন সব লোভনীয় রং চারদিকে—

—তোমাকেই তো আমি কল্পনা করলাম, তোমার আবার দিদিমা ঠাকুমা এল কোথা থেকে?

—হাউ সিলি। মেয়েটির বিস্মিত কণ্ঠস্বর তার বাঁ হাতের চুড়ির গোছার মত বেজে উঠল রিনটিন করে। আপনি ভাবছিলেন না আমি দিদিমার কাছেই থাকি।

সত্যই অসীম একবার যেন ভেবেছিলেন কথাটা। তারপর অবশ্য ভাবছিলেন গল্পের মধ্যে মা-পিসি-দিদিমা টেনে আনা উচিত হবে না। মেয়েটি কিন্তু মনে রেখেছে ঠিক, স্মরণশক্তি প্রশংসনীয় সন্দেহ নেই।

অপ্রস্তুত হয়ে প্রসঙ্গটা আবার রংয়ের দিকে ফেরাতে চাইলেন অসীম। তাহলে তুমি বলছ এই তুঁতে মানে পিকক-ব্লু রংয়ের কাপড় পরবে। বেশ ভাল কথা। কিন্তু রংয়ের নামটা দেওয়া ঠিক হয়নি—ময়ূরের রং তো এমন উগ্র নীল নয়।

—কি আশ্চর্য! ময়ূরের কথা এখানে টানছেন কেন? মেয়েটি অকৃত্রিম বিস্ময়ে চোখ বড় করল। শাড়ীর রংয়ের সঙ্গে ময়ূরের কি সম্পর্ক? সন্ধ্যায় ড্রয়িংরুমে বসে গরমকালে সরবৎ আর শীতকালে কফি খেতে খেতে ময়ূর-প্রসঙ্গ তুলতে হয়—জাতীয় পাখী হিসেবে ময়ূরের সার্থকতা কতখানি, ডিম ফোটানোর ব্যাপারে কি কি অসুবিধার কথা লিখেছে কাগজে—এমনি সব আলোচনা---গলাটা সুরেলা হবে বেশ, উদাহরণগুলো একটু আড়ষ্ট হবে, ব্যস!

কথাটা নেহাৎ বেফাঁস হয়ে গেছে তাহলে। অসীমবাবু আবার একবার সামলে নিয়ে আলোচনা ওর প্রিয় প্রসঙ্গে ফেরাতে চাইলেন।

—পিকক-ব্লু রংয়ের কাপড় পরতে চাও তাহলে তুমি, কেমন? তাহলে কালো রংয়ের জামা পর, বেশ কনট্রাস্ট ম্যাচ হবে।

মেয়েটি চমকে উঠল শুনে। —সর্বনাশ! কনট্রাস্ট একেবারে আউট অব ফ্যাশান এখন। পিকক-ব্লুই জামা হবে—তা সে খাটাউ হোক বা পিওর সিল্ক।

—বেশ, তাই হবে। আচ্ছা, তোমাদের আধুনিক যুগের ফ্যাশানে আর কোন রং নেই বুঝি?

—আছে বই কি। ধরুন গোলাপী—

—গোলাপী মানে পিংক—বাঃ সুন্দর। রংটা ভাবলেই একেবারে পরীর রাজ্যে গিয়ে পড়ি আমরা, তাই না? তবে কি জান, দুধ-আলতায় গোলা গায়ের রং না হলে---

—আরে, সে গোলাপী কেন? সে বিশ্রী, প্যানপ্যানে। আজকাল কেউ বাচ্ছার জামার পশমেও ও রং চায় না। এ অন্য গোলাপী—কি করে যে বোঝাই---আচ্ছা, ভাল কথা, রাস্তা-ঘাটে সাইনবোর্ড বা বিজ্ঞাপনে একটা গোলাপী রং ব্যবহার করে দেখেছেন?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, কেন দেখব না। বিটকেল একটা চোখ-ঝলসানো গোলাপী রং—

—ঠিক ধরেছেন। সেই হ'ল আধুনিক গোলাপী রং। সে রং না হলে আজকের যুগটাই বন্ধ হয়ে যাবে, তা জানেন?

জানতেন না স্বীকার করতে হ'ল।

তবুও ক্ষীণ কণ্ঠে অসীম বললেন, দেখ, আমি দেখেছি এ রং কিংবা তোমাদের ঐ পিকক্-ব্লু—এ সব রং পরলে ফর্সা মানুষকেও কালো দেখায়। তুমি তো ফর্সা নও---

মেয়েটি আবার এক হাতে তোয়ালে সামলে অন্য হাতখানি প্রসারিত করে দিল মূর্তিমান প্রতিবাদের মত। তার নিটোল হাতের লীলায়িত ভংগীটুকু ভাল লাগল অসীমের।

হাতের মালিকান কিন্তু নিজের হাতের দিকে তাকিয়ে প্রসংগ ভুলে কঁকিয়ে উঠল প্রায়। করেছেন কি বলুন তো। হাত নয় তো, যেন থাম। পাঁচশ' ক্যালারির ডায়াটেও উপবাস পাব কি না ভাবছি। যাক, যে কথা বলতে যাচ্ছিলাম, ফর্সা নই মানে—উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ তো বটে। আপনি তো মমতা করে আমাকে তেমন কালো করেননি। এক পলক থেমে মেয়েটি ঈষৎ গ্রীবাভংগে অসীমবাবুকে নিরীক্ষণ করে দেখল। হেসে উঠল তারপর। সে হাসিতে অসীমবাবু তার বাঁ হাতের নীল কাঁচের চুড়ির গোছার রিনটিন শব্দ শুনতে পেলেন।

পরক্ষণে সে গম্ভীর হয়ে বলল, আমার চেয়ে ঢের ঢের ঢের কালো মেয়েরাও আজকাল এই নীল আর গোলাপী রংয়ের ফ্রক কেনে, বিননিতে ম্যাচ করে রিবন বাঁধতে না পেলে কেঁদে-কেটে হাট বাধায়—আর শাড়ীর তো কথাই নেই। বস্তী থেকে প্রাসাদ পর্যন্ত সর্বত্র এই রংয়েরই জয়যাত্রা।

অসীমবাবু মেয়েটির রুচিতে যত না ক্ষুণ্ণ হচ্ছিলেন, তার চেয়ে বেশী ক্ষুণ্ণ হচ্ছিলেন তাঁর রুচির প্রতি ওর অনাস্থা দেখে। চিরকাল তাঁর সুরুচির জন্য স্বজনদের প্রশংসা পেয়ে এসেছেন, মনে মনে গর্বিত ছিলেন একটু। তথাপি আজ মেয়েটির কথাই মেনে নিলেন। ভাবলেন অপ্রিয় সত্য না বলাই শাস্ত্রের উপদেশ। আর সত্যই ওদের মা রক্ষাকালীর পার্শ্বচরীর মত দেখালেই বা তাঁর কি এল-গেল। বরং হাতে না মারতে পারেন, ভাতে মারবেন—নায়িকাকে কালো হরিণ চোখ নাই দিন, কৃষ্ণকলি করবেন নির্মম হস্তে।

অবশ্য এক পক্ষে এই রুচির নিয়মে কাউকে শাড়ী উপহার দিতে গেলে সুবিধা খুব—তার ব্যক্তিগত প্রিয়বর্ণের খোঁজ নিতে হবে না স্পষ্টতঃ বা কৌশলে। দোকানে গিয়ে শুধু মনে রাখা হবে কিনতে হবে হয় পিকক-ব্লু নয়তো চক্ষুপীড়ক গোলাপী।

ওঁকে নীরব দেখে মেয়েটি বলল, শুধু এই নয়, আরও সুন্দর সুন্দর রং আছে—কচি কলাপাতা, বাসন্তী, লেমন—

কৃষ্ণকলির বর্ণসুষমার কথা ভাবছিলেন বলে হয়তো, অসীমবাবু আঁতকে উঠে কান

হাতচাপা দিয়ে ফেললেন। যাক, যাক, আর নয়।

পরে প্রকৃতিস্থ হয়ে বললেন, আচ্ছা, হাড়গিলের মত রোগা হবে বলছ, হাত-কাটা জামা মানাবে তো?

—নিশ্চয়। হয় স্লিপলেস নয়তো থ্রি-কোয়ার্টার—মধ্যপন্থা চলবে না। থ্রি-কোয়ার্টার স্লিপের জন্যেও বেশী কাপড় চায় না আজকাল দর্জিরা—জামাটা শুধু আরও একটু পেটকাটা পিঠকাটা করে দিলেই চলে। যুগটা যে কি অপূর্ব ইকনোমাইজিং হয়েছে!

কথা খুঁজে পেতে দেরী হ'ল অসীমবাবুর।

মেয়েটি বলল, দেখবেন যেন সোনার থালা পরিয়ে দেবেন না। অনেক বাড়ীতেই আজকাল জোর করে, কিন্তু সাজসজ্জা তো যুগোচিত হওয়া চাই, আপনিই বলুন। এই যেমন দেখছেন, বাঁ হাত ভর্তি ম্যাচিং কাঁচের চুড়ি চাই, আর ডান হাত এই রকম খালি থাকবে—বেরোবার সময় একটা জেন্টস রিস্টওয়াচ শুধু।

—নিজের ঘড়ি নেই তোমার?

—না, ঘড়ি তো থাকতেই হবে। কাশ সেভেনে উঠলেই আজকাল ঘড়ি লাগে। তাই লেডিস ঘড়ি একঘেঁয়ে হয়ে গেছে, আধুনিকতম নিয়ম ডানহাতে পুরুষের ঘড়ি।

ব্যাখ্যাটুকু অসীমবাবু নীরবে পরিপাক করবার চেষ্টা করবেন।

মেয়েটি রূপসজ্জার অন্য প্রসংগে এল।

—চুল ঠিক এমনি করে বাঁধতে হবে। আপনি কিছু ভাববেন না—মাথার মাঝখানটা এ রকম উঁচু করে দেবার কায়দা আমার ভালই রপ্ত আছে। চার পাশের চুলগুলো এলোমেলো থাকবে এই রকম। যুগটা যে কি ইকনোমাইজিং হয়েছে—তেলের খরচ এত কমে গেছে কি বলব! যাক, আপনাকে কিচ্ছু ভাবতে হবে না, শুধু একটা অনবদ্য বর্ণনা দিয়ে দেবেন, এই অনুরোধ। আজ পর্যন্ত কোন লেখক এ দিকটায় তাকাননি—বেজায় সেকেলে সব—সেই চূর্ণ কুন্তল আর শিথিল কবরীর যুগেই আছেন।

অসীমবাবু প্রমাদ গুণলেন। এ কেশ-বিন্যাসের বর্ণনা দিতে পারেন এমন বলিষ্ঠ লেখনী তাঁর নয়। এক বলা চলে 'কাকের বাসা-জিনি কবরী', কিন্তু রুচিসম্মত হবে কি? তবুও উৎসাহিত বোধ করলেন। না হোক রুচিসম্মত, আধুনিক তো হবে।

ততক্ষণে আবার উপদেশ বর্ষণ সুরু হয়েছে—লিপস্টিক খুব ফেড হওয়া নিয়ম এখন, ঠোঁটটা যেন সাদাটে মতন দেখায়। মুখে তেল চকচকে হবে—সে এক রকম আলাদা মেক-আপ, কাজল বেশ পুরু হবে, ভ্রূ দুটো আই-ব্রাউ পেনসিল দিয়ে কি ভাবে আঁকতে হবে আমি দেখিয়ে দেব।

এতক্ষণে প্রথম ধৈর্যচ্যুতি ঘটল অসীমবাবুর।

রেগে বললেন, এতসব আমার দ্বারা হবে না। এই গরমে রুক্ষ চুল মাথায় ঐ রকম উঁচু হয়ে থাকবে, চারপাশের ঐ সব ঝাঁঝুল্যমান খচরো চুল যথেচ্ছাচারে উড়বে বাতাসে—বীভৎস দৃশ্য। তারপর দিন নেই, রাত নেই ঐ সব রংয়ের কাপড় পরে ঘুরতে হবে মুখে-হাতে আবার মেক-আপের তেল না কি মাখবে বলছ। তাহলে কি আমি গল্পের পরিণতিতে নায়িকাকে হাত-পা বেঁধে এ্যাসাইলামে পাঠাব বলতে চাও?

বলে খেয়াল হল মেয়েটি অহত বিস্ময়ে চেয়ে আছে। দেখে মায়া হল। আহা বেচারী ছেলে মানুষ, বত্রিশ বছরের হতে চলেছে বলে তো আর সত্যি তা নয়।

তবুও তাকে হিতোপদেশ দেবার প্রয়াস পেলেন অসীম। দেখ, তোমার বড় বিলাসিতার শখ, এটা ভাল নয়। তোমাকে যদি আমি মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে করি এত সব উপকরণ জুটবে কোথা থেকে?

এ কথায় দেখা গেল সম্মুখবর্তিনীর চোখে আহত বিস্ময় মুছে বরং স্পর্ধিত আগ্রহ ফুটেছে।

—করুন না, বয়েই গেল বড়। আপনি কি বলতে চান ফ্যাশান শুধু ধনীর জন্যে। ওসব গরীব-বড়লোক ভেদাভেদ আর নেই। যে কোন একটা বড়লোকের মেয়ের সংগে আমাকে কম্পিট করতে দিন আপনি! আরে এটা বোঝেন না—ফ্যাশান তো যুগোপযোগী হতেই হবে—সুতরাং তারাও এমনি করেই চুল বাঁধবে, হাঁটবে, হাসবে, হাই তুলবে। আর শাড়ী-জামা-গয়না? কলকাতায় তার অভাব কোনদিন হবে না। এমন কোন ফ্যাশানেবল জিনিস নেই যার সস্তা নকল না বেরিয়েছে। বড়লোকের মেয়েদের ভুয়ো বড়লোকমিকে মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েরা আজকাল থোড়াই কেয়ার করে।

—ভুয়ো কেন?

—নয় বলেন কি? মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েরা না হয় জানিয়ে নকল গয়না পরে—ওঁরা দেখে নাক সিঁটকোন, আর ওঁরা যখন ঝুটো গয়নার সেট পরে মোটর থেকে নামেন, অমনি ঝুটো পাথর সাচ্চা হয়ে ওঠে বুঝি?

অসীম-বাবু এবার একটু কৌতুক অনুভব করলেন।

গোঁফের ফাঁকে মৃদু একটু হাসি ফুটিয়ে বললেন, তুমি তো দেখছি রীতিমত ধনী-বিদ্বেষিণী, তাহলে তো তোমাকে বড়লোকের মেয়ে করে দিতে হচ্ছে।

—দেবেন? মেয়েটির কণ্ঠে আগ্রহ প্রকাশ পেল।—তাহলে দেখবেন আমিও চটপট মত পালটে ফেলেছি। এ্যাডজাস্টমেণ্ট তো আসল শিক্ষা—আধুনিক যুগ তাই শেখায়। কি অপূর্ব না? সে কথা যাক—আমার পরিণতি কি স্থির করেছেন?

—তোমার পরিণতি নিয়ে আমার মাথা-ব্যথা নেই, আমার গল্পটা নিয়েই আমার যেটুকু ভাবনা। তা ছোট গল্পের আবার পরিণতি! তোমাকে গোধূলি বেলায় কিংবা উত্তীর্ণ সন্ধ্যায় ইডেন উদ্যানের বেঞ্চে বসিয়ে রাখলেই হবে শুদ্ধ হয়ে।

ঈষৎ আনুনাসিক স্বরে মেয়েটি বলল, না তা হবে না। দিনকাল বড় খারাপ—আমার একটা ভাল বিয়ে দিতে হবে।

অসীম বাবু এত কিছু আধুনিক নন যে এহেন নির্লজ্জতা কানে লাগবে না। তবুও মাথায় রক্ত চড়ে উঠছে না দেখে নিজেই অবাক হলেন।

শুনলেন তিনি বেশ ঠাণ্ডা মাথায়, বলছেন, কেন বিয়ের জন্যে এত তাড়া কিসের? কি লাভ পরাধীন হয়ে? তার চেয়ে এম-এ পাশ কর লেকচারার হও। অর্থ আসবে, সম্মান পাবে তা ছাড়া—

—সে আপনি এম-এ কেন একেবারে থিসিস সাবমিট করিয়ে দিন না—টিউটোরিয়াল হোম বা ন্যাশনাল লাইব্রেরী কোথাও যেতে হবে না যখন আমাকে। কিন্তু বিয়ে হওয়াই চাই।

—প্রফেসর হবে না?

—প্রফেসর হতে পারি, সেলস্ গার্ল হতেও আপত্তি নেই দরকার হলে—কিন্তু সেজন্যে বিয়ে হবে না?

—এ: বিয়েটা বড় সেকেলে।

—একালে নয়। এটাই ফ্যাশান।

—সে কি! বিয়েতেও ফ্যাশান!

—কেন লক্ষ্য করেন নি আজকাল যারাই বিয়ে করে—যে বয়সেই হোক। এক সময় অবশ্য উচ্চ শিক্ষিত মেয়েদের মধ্যে বিয়ে না করার মনোবৃত্তি প্রাধান্য পেয়েছিল, সে যুগ পার হয়ে এসেছি আমরা। বিয়ে তো দিল্লীকা লাড্ডু, যো খায়া উ ভি পস্তায়া, যো নেহি খায়া উ ভি পস্তায়া। তাই আজকের যুগের জেহাদ হল না খেয়ে পস্তানো বোকামি, খেয়েই পস্তাব।

—তোমার তো দেখছি বিস্তর অভিজ্ঞতা।

অটল গাম্ভীর্যে মেয়েটি বলল, না হলে চলে না। আজকের যুগে বাঁচার মন্ত্রই এই: চোখ কান খোলা রাখ।

একটু থেমে অসীম বাবু যেন ওর বক্তব্যের গুরুত্বটাই যাচিয়ে দেখলেন। তারপর ইচ্ছে করেই বিয়ের বিরুদ্ধে যুক্তি দেখালেন কিছু। দায়-দায়িত্ব যতটা বাড়ে মনের খোরাক ততটা মেলে না সব ক্ষেত্রে। দাম্পত্য সম্পর্কটাও ক্রমবিবর্তনের ধারায় এখন কাঁচের গেলাস হয়ে দাঁড়িয়েছে—ভাঙলেই হল। ইত্যাদি।

দেখলেন মেয়েটি প্রতিবাদ করার বদলে বরং আরও কিছু নতুন যুক্তি দেখাচ্ছে। বিশেষতঃ চাকরিজীবী বিবাহিতাদের ক্ষেত্রে যা শতাংশে সত্য। মেয়েরা আজ জীবিকা-অর্জনের ক্ষেত্রেও পুরুষের জীবন-সংগিনী

বহু ক্ষেত্রেই স্বামী-স্ত্রী একই সংগে বাড়ী থেকে বেরোন কর্মক্ষেত্রের উদ্দেশ্যে। অথচ যা চিরদিনের মেয়েদের কাজ সেই সব ধরের কাজগুলোর দায়িত্ব থেকেও মুক্তি পায় নি তারা। বরং পাশ্চাত্য প্রভাবে মা-পিসি-ধুড়িকে ছেঁটে ফেলে সংসার ছোটখাট ছিমছাম হচ্ছে যত, ততই সংসারের দায় বাড়ছে। রান্না যদি বা কোন সৌভাগ্যবতীকে নাই করতে হয়, তবু তদারকি না করলে চলে না। কাজের জন্য লোক যদি বা জোগাড় হয় তাদের অসুখ-বিসুখ, ছুটি নেওয়া, বাড়ী যাওয়ার দিনগুলোর সাংসারিক স্বল্প প্রয়োজনই বর্জন করা চলে। তা ছাড়া ছেলেমেয়ে থেকে পরিবারের সব মানুষ কটির সব চাহিদা পূরণের দায়িত্বই অনেকাংশে গৃহকর্ত্রীর। বিশেষতঃ আধুনিক শিক্ষিত সমাজের জ্ঞানের ভার তাদের কোন-দিকটা থেকেই মুখ ফিরিয়ে নিতে দেয় না।

—সামাজিক নেমন্তন্নের উপহারও দেখবেন তারা কিনছে, ছেলের জন্মদিনে কর্মস্থল থেকে ফিরেই কোমরে আঁচল জড়িয়ে রান্নাঘরে ঢুকছে। নিমন্ত্রিতরা আসবার আগেই সব কাজ এবং প্রসাধন সেরে ফিটফাট হয়ে থাকা চাই। যে চাকরি করে না তার দায়িত্বও সামান্য নয়। স্বামীর অফিসের ভাত দিয়েই কাপড়খানা বদলে নিয়ে মেয়েকে স্কুলে পৌঁছাতে ছুটছে, ফেরার পথে রোগা ছেলের ওষুধ কিনে আনবে তারপর তাকে পথ্য খাইয়ে আবার যদি তাকে রেশন আনতে দৌড়তে হয় তাতেও আশ্চর্য নেই।

—যতই বল, বহু ক্ষেত্রেই কিন্তু মেয়েরা শখ করে এতখানি দায়িত্ব নিজের মাথায় তুলেছে—তারা পুরুষের সমান হয়ে উপার্জনও করবে, এমন না হবে সন্তানের মনে যেন তার ছাপ থাকে। স্বামীর কাছে সে প্রিয় সখী থেকে সচিব পর্যন্ত সব কটি পদে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করতে চায়, শ্বশুর বাড়ীর কাছে সুখ্যাতি পেতে চায়, সতর্ক থাকে বাপের বাড়ীর লোকেরা পর হয়ে যাবার অভিযোগ না করে। অল-রাউণ্ডার আসলে এদেরই বলা উচিত।

—মেয়েটি বোধহয় একটু ক্ষুণ্ণ হল, আপনি কি এ মনোভাবের নিন্দে করছেন?

—না, বরং বাহাদুরি দিচ্ছি। যুগধর্মের প্রতিক্রিয়ার এটা চূড়ান্ত রূপ বলতে পার। যে মেয়েরা একদিন সাজানো পুতুলের মত আলমারি-বন্ধ ছিল তারাই আজ সংসারের সব দায়-দায়িত্ব মাথায় তুলে নিতে চাইছে। সত্যিই ঘরে-বাইরে মেয়েরা যা কাজ করে, সকালবেলা কোনরকমে বাজারটা এনে ফেলে দিয়েই ভাতের জন্যে তাড়া দিয়ে পুরুষ কোনদিনও তার যোগ্য হতে পারবে না।

—আজকাল তো তাও মেয়েরা অনেকেই বিকেলে নিজেরা মার্কেটিং সেরে রাখে। মেয়েটি যুগিয়ে দিল।

অসীম বাবু প্রায় স্বগতোক্তির মত বললেন আশ্চর্য! তবু তো মেয়েরা ভয় পায় না সংসার করতে—বরং উৎসাহ বাড়ছে যেন দিন দিন। কোথা থেকে এই অফুরন্ত প্রাণশক্তি আসে?

মেয়েটি উচ্ছ্বাসভরে বলল, তবেই দেখুন।

শুনেই কেন যেন বিপরীত প্রতিক্রিয়া জাগল মনে।

অসীম বাবু বিরূপ হয়ে বললেন, আশ্চর্য তোমাদের মন, তবু এত দায় ঝামেলা ঘাড়ে নিতে চাও!

মেয়েটি একটু হাসল। লাজুক হাসি।

মৃদু স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলল, বাঃ, বিয়ে করা এখনকার ফ্যাশান যে!

কে জানে কৌতুক বোধেই কি না, অসীম বাবু উদার হয়ে উঠতে চাইলেন খুব।

বললেন বল তোমার কেমন বর চাই? না কি প্রেম চালাচ্ছ, তাহলে আমার আর গল্প লিখে কাজ নেই—তুমি ভেসে পড়।

একটু লজ্জার ভান করে যেন হাসি চাপতে না পেরেই হেসে উঠল মেয়েটি। পুরুষকে মুগ্ধ করার মন্ত্র তাতে। প্রসংগান্তরে এসে তার গাম্ভীর্য গেছে, উচ্ছলতার আভাস জেগেছে দেহহিল্লোলে।

কি আশ্চর্য সেকেলে আপনি। প্রেম আর বিয়েকে এক শিকলে বাঁধতে চান। অত সহজে কেউ আর প্রেমে পড়ে বিয়ে করে না। 'প্রেমের জোয়ারে ভাসাবে দোঁহারে'-র দিন গেছে। কো-এজ্যুকেশন তো ছেয়ে গেছে দেশ, কজোড়া স্বামী-স্ত্রী বেরোয় বলুন। অথচ আগে—

—একথা বলা তোমার উচিত নয়। প্রেম চিরজীবী, সে তেমনি অক্ষয় আছে। কিন্তু মানুষ অভিজ্ঞতার আগুনে পুড়ে হিসেবী হয়েছে এই পর্যন্ত। তা অবিমৃষ্যতা তো প্রশংশনীয় নয়। জীবনে প্রতিষ্ঠিত না হয়ে—

যা বলেছেন। প্রতিষ্ঠাই হল আধুনিক জগতে চরম সত্য। প্রেম করার আগে হিসেব করা চাই, অথবা প্রেম করতে করতে হিসেব করা চাই—হিসেব করে প্রতিষ্ঠার মান নির্ধারণ করা চাই।

—অর্থাৎ তুমি বলতে চাও প্রেম—বিবাহ আর নয়, প্রতিষ্ঠার হিসাব-নিকাশ—(তবেই খাঁটি ও দ্বিধাহীন) প্রেম—বিবাহ। তা এ আর খারাপ কি

—নিন্দুকেরা খারাপ বলে। বলে তাহলে আর মা-বাবার ঠিক করা বিয়েতে দোষ করলে কি? তাঁরাও পাঁচটা সম্বন্ধ দেখে যেটি সবচেয়ে বেশী প্রতিষ্ঠাবান তাকেই মনোনীত করেন—ব্যাংক ব্যালান্সও দেখেন, স্বভাব-চরিত্রেরও খোঁজ নেন। প্রেম করতে গিয়েও আজকাল আর অনুরাগে রঞ্জিত চোখে যক্ষ্মারোগীর ছেলেকে বিয়ে করে না কেউ সহজে। প্রেম করতে হলেও চোখ-কান খোলা রাখে। কিন্তু খোঁজ-খবর নেবার উপায়টা সহজ না হয়ে ঘোরালো হওয়ার জন্য তার মেহনৎ অনেক। তাই সবাধুনিক ফ্যাশান হল বাবা-মা ঠিক করবেন বিয়ে, কথাবার্তা পাকা হলে মেয়ের সংগে পাত্রের আলাপ করিয়ে দেবেন। সেও সেই প্রাক-বিবাহ প্রেমই হল অথচ অনেক বেশী নিরাপদ। পাত্রপক্ষও ঐ পদ্ধতি পছন্দ করেন, প্রেমের ছিদ্রপথে তাহলে আর পণের টাকার থলিটা গলে যায় না। কিন্তু এই নিরাপত্তার সুযোগ যারা পায় না, বড় কষ্ট তাদের। অনেকের সংগে একসংগে প্রেম চালিয়ে তাদের জেনে-বুঝে তবে শ্রেষ্ঠটিকে বরণ করে নিতে পারা যায়। সেই বিচার-বিবেচনায় মানসিক শক্তিক্ষয় হয় অনেকখানি। আজকের দিনে প্রেমের সংজ্ঞা হল: বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার ও বিচার-বিবেচনার পর একটি প্রতিষ্ঠিত জীবনে জীবন যোগ করা।

যে কৌতুক মিশ্রিত মনোযোগে প্রেমালোচনা শুনতে শুরু করেছিলেন অসীম, মেয়েটির সুদীর্ঘ আর সুগম্ভীর বক্তব্য শুনতে শুনতে ক্রমেই সেটা হারিয়ে যাচ্ছে কোথায়, মন বিরূপ হয়ে উঠছে।

মেয়েটা পাকা বড়, বড় বেশী জানে। এই উঠতি বয়স—জীবন কোথায় স্বপ্নময় হয়ে ধরা দেবে চোখে তা নয়, মাখাভরা তিনকালের অভিজ্ঞতা যেন।

বিচিত্র মানব-মন। এই কথাগুলো ওর মুখ থেকে না শুনে উনি নিজে যদি ওকে শোনাতেন তা হলে গর্বিতই বোধ করতেন অসীম। কিন্তু এই প্রগতির যুগে মানুষের মনোভাব দিনে দিনে স্বচ্ছ হচ্ছে। লজ্জার আবিলতা আজ আর কোন বয়সকেই পংকিল করে রাখে না। সুতরাং মেয়েটিকে দোষ দেওয়া চলে না।

আত্মসমালোচনার মুখে চিন্তার রাশ টানলেন অসীম। ও বস্তুটা এখন ঐতিহাসিক অতীতের পর্যায়ে পড়ে। আ পরকৃত সমালোচনায় সম্যক আলোচনার আভাস মাত্র শুনলেও এখন অগ্নিমূর্তি হয়ে ওঠাই নিয়ম।

—মেয়েটা মজা মন্দ পায় নি, বলে কি না বর জে দাও! আর কিছু নয়! কেন অসীম বাবু কি ঘটকালীর ব্যবসা করেন? তবু পাত্র যদি বা মেলে, এখনই যদি বায়না ধরে চাকরি করাও এখনকার ফ্যাশান চাকরি দাও, তাহলেই তো গেছেন তিনি।

—কোথায় ভেবেছিলেন একটা ট্র্যাজিক গল্প লিখবেন তার বদলে এই চালিয়াৎ ছেঁপো মেয়েটাকে প্রতিষ্ঠিত জীবনে যুক্ত করতে বসবেন! নিজের মেয়ের বর জোটাতে লোকের প্রাণান্ত হচ্ছে এদিকে। ক' বছর পরে তাঁরও হবে তাই। আর যদি উচ্চ শিক্ষিতা করে তোলেন তাহলেও চাকরির উমেদারিতে সেই অবস্থাই দাঁড়াবে—তবে?

বদরাগী বলে অসীমবাবুর দুর্নাম আছে

(১৬৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

এখানে ঘাট নেই শুধু ঢেউ-খেলান পাড়। ঘাট সেই দুটো বাঁক পেরিয়ে একটু উত্তরে। হাওয়ায় হাওয়ায় মানুষজনে ফিসফাস, গুঞ্জন, কলরব উচ্ছ্বসিত হয়ে ইদিকে ক্ষণে ক্ষণে ভেসে আসে, এখানকার খাড়া পাড় অভিমানিনী নববধূটির মত জলের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে অনেকটা দূরে সরে এসেছে। তার কিনারায় নরম ঘাসের ওপর টানা টানা উঁচু গাছের সারি—ঝাউ আর নারকেল, মাঝখানে ঝকঝকে টিপের মত শিরীষ আর কৃষ্ণচূড়া। শিরীষ গাছে থোকা থোকা দোল-প্রেলান হলদে ফুল আর তার গলাগলি কৃষ্ণচূড়ায় রক্তের ঢেউ।

কাজ করতে করতে কতবারই যে সুদেষ্ণাকে আনমনা হতে হয়, থেকে থেকে শোবার ঘরের জানালায় এসে সে দাঁড়াবে। বাস্, রইল পড়ে কাজকর্ম, ও দুটো বজরা খড় বোঝাই হয়ে কোথায় যাবে তা কেই বা জানে। তবে শুধু পাতার ঝালরের আড়াল থেকে জলের দিকে চেয়েই তার দুচোখ ভরে ওঠে না, তার চোখ জুড়ে থাকে কৃষ্ণচূড়ার রাঙা টোপর। সেই কোন এক সূত্রে গাছটি তার শাখা-প্রশাখা নিয়ে যেন সুদেষ্ণার সারা অঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে।

সবে বিয়ে হয়েছে সুদেষ্ণার। এখনও সিঁথে জুড়ে উপচে পড়ছে রাঙা সিঁদুর। সারা অঙ্গে তার রেশ এসে পৌঁছেচে। তবে মনের সঙ্গে রঙের সম্পর্কটা কতটা নিবিড় সে তা বুঝে উঠতে পারে না। জীবনধারার একটা হেরফের হয়েছে—অভ্যাসের, অভিজ্ঞতার পরিবর্তন তবে সেটা নিয়ে মাতামাতি করবার মত তাগিদ সে পায়নি। ভাব-প্রবণ চাপা প্রকৃতির মেয়ে সুদেষ্ণা। বিয়ে হয়েছে কন্ট্রাক্টর পরিতোষ মুখুজ্যের সঙ্গে। এ তল্লাটটা জুড়ে পরিতোষের কাজ। গঙ্গার ওপর পর পর তিনটি বাগানবাড়ি কিনে নিয়েছেন জনৈক মাড়োয়ারি দস্তান। তৈরি হবে মস্ত এক রবার ফ্যাক্টরী, আপাতত বিরাট এলাকাটার সমস্ত বড় বড় গাছ আর জঙ্গল কেটে সাফ করা হচ্ছে, পুবদিকটা ফাঁকা হয়ে গেছে এবার পশ্চিমের পালা, সারাটা দিন সাইকেল চেপে মজুরদের পেছনে লেগে থাকে পরি-তোষ, মাঝে মাঝে ঘণ্টি এসে বাজে সুদেষ্ণার জানালার সামনে।

—এক গেলাস জল খাব 'সু'।

সুদেষ্ণা তাড়াতাড়ি জল নিয়ে আসে।

ছবি বসু

—কি ভাবছ এত তন্ময় হয়ে।

জবাব না দিয়ে সুদেষ্ণা কেমন ইঙ্গিতময় হাসে।

—আমার কথা বুঝি?

এবার সুদেষ্ণা মুখ টিপে হাসে। হাসলে ওর চোখটা কুঁচকে যায়, বেজায় ছোট্ট ছেলেমানুষ তখন দেখায় ওকে। জল খেয়ে যাবার সময় পরিতোষ বলে—শোবার ঘরের জানালা বন্ধ করে দিলেও ত' পার। এই টা-টা রোদ্দুরে কি যে দেখ বাপু।

খামখেয়ালী বউটাকে নিয়ে হিমসিম খেয়ে যায় পরিতোষ।

শুধু একটা পাল্লা মেলা ছিল, পরিতোষ চলে যেতে দুটো পাল্লাই খুলে দেয় সুদেষ্ণা। বেচারী পরি-তোষ কি জানে সুদেষ্ণার নেশা কোথায়? ঐ কৃষ্ণচূড়ার রাঙা মায়া যে তার চোখে জড়ান। এই অখণ্ড অবসরে শুধু এদিকে চেয়ে বিভোর হয়ে থাকা নয়ত সুধাকে চিঠি লিখতে বসা এই দুই ছাড়া আর তার কাজ কোথায়?

সুধার সঙ্গে একই ক্লাসে, এক কলেজে সে পড়ত। বাপ-মা দুজনেরই বিয়ের চেষ্টা করতেন, এ নিয়ে কখনও রাগ, কখনও বিরাগ সব শেষে ভাবী বর নিয়ে জল্পনা-কল্পনাও দুজনে করত সুধার আগেই সুদেষ্ণার বিয়ে হয়ে গেল।

আসবার দিন সুধা বলে—না হয় পাড়াগাঁয়েই থাকে তবু তোর বর ভাল সুদেষ্ণা। এর ওপর নির্ভর করে স্বচ্ছন্দে গা ভাসিয়ে দেওয়া যায়—ঠকবার সম্ভাবনা কম।

সুধার মুখের দিকে চেয়ে কী যেন বলতে চেয়েছিল সুদেষ্ণা। বার

বার কেঁপে উঠল তার সোঁটি দুটো, গঙ্গার ওপর ভাসা গাধা বোটটার দিকে চেয়ে চোখে কৌতুক ফোটে সুদেষ্ণার। সুধাকে লেখে—তুই ঠিকই বলেছিস সুধা। আমাদের ধর্মই লতার মত জড়িয়ে যে কোন আশ্রয়ে মাথা গুঁজে থাকা। সেই আশ্রয় যত মজবুত হবে আমাদের বরাত তত খুলবে। দুঃসাহসিক নায়িকা হবার বাসনা যে একেবারে ছিল না তা নয় আসল কথা সাহসেই কুলোল না।

তুই জিজ্ঞেস করেছিস কেমন আছি? এই গাছপালা বন-জঙ্গলের দিকে চেয়ে তবু যা হোক করে হোক দিন কেটে যাচ্ছে, পূবদিকের জঙ্গল সাফ হয়ে গেল এবার পশ্চিমে ওরা এগোচ্ছে, কোনদিন মড়মড় করে কৃষ্ণচূড়া ভুঁয়ে লুটোবে, তারপর ওরা কেটে কেটে তক্তা বানাবে। ধোওয়া-পোঁছা ন্যাড়া জমিতে কংক্রিটের গাঁথুনি তোলা হবে। সেদিন কেমন থাকব একবার জানতে চাইবি না?

তোদের কনট্রাক্টার পরিতোষবাবু কাজটা যদি একটু ঢিমে দিয়ে করতেন তাহলে হয়ত একটু সান্ত্বনা পেতাম।

সুধা লেখে—সান্ত্বনা নিজেকেই খুঁজেপেতে নিতে হয়, এখন হয়ত টাট্‌কা টাট্‌কা মিলছে না—কিছুদিন বাদে দেখবি এসব মনোবিলাস হাস্যকর। তোর যা হোক তবু প্রতীক্ষার শেষ হয়েছে, আমার দেখ দেখি কী গেরো? রোজ যা হোক করে হোক সাজ-পোষাক ক'রে রাণী সাজছি পরক্ষণেই সাজ খুলে ফেলে আবার ঘুঁটে-কুড়ানি দাসী হয়ে যাই।

আমার একটা কিছু জুটলে না হয় তোর সঙ্গে বদলাবার চেষ্টা করব, যতদিন না হচ্ছে ততদিন যা পেয়েছিস তাতেই তুষ্ট থাক।

সুদেষ্ণা বোঝে তুষ্ট না হওয়ার কোন যুক্তি নেই। পরিতোষের তরফ থেকে কোন ত্রুটি কেউ খুঁজে পাবে না। এত যত্ন আর সহানুভূতি পাবে বলে সুদেষ্ণা সত্যিই কল্পনাই করে নি। বিধবা মা সাধ্যমত খরচপত্র করে বিয়ে দিয়েছেন। এমনি দুম করে ক' আর বিয়েটা ঘটে নি—এর আগে সাত আট জায়গায় সম্বন্ধ দেখাদেখি তারপরেই না এ বিয়েটা ঘটেছে।

সুধার আবার চিঠি এসেছে। সে লিখেছে—আমাকে আজ আর এক জায়গা থেকে দেখতে আসছে। হ্যাঁরে, আমার মত তোরও কী বুকটায় এমনি দমবন্ধ করা ভাব হত? এক একবার যখন দেখতে আসে, মনটা তখন এক একটা তারে বাঁধা হয়ে যায়। একটা বিশেষ আবহাওয়ার জন্য তৈরী—ভাবি এই বুঝি আমাকে বাঁধবে—হোক তা হালদার পাড়া লেন নয়ত চাঁপাতলা বাই লেন। কখনও সহরের ভিড়ে, কখনও সহরতলীর একান্তে কিংবা পাড়াগাঁয়ের স্বস্তিময় নীরবতায় এক একটি নীড় গড়ি আবার ভাঙি। একটির পর একটি স্বপ্ন ভেঙে যায়। তখন বড় মায়া লাগে, তাই না?

সুধার চিঠিটা কানের কাছে যেন গুঞ্জন তোলে, মেয়েটা সুদেষ্ণার মনের কথাটা অমন করে কালির আঁচড়ে কি করে তুলে ধরল? থেকে থেকেই সে আনমনা হয়ে পড়ে।

খেয়েদেয়ে সাইকেল চেপে পরিতোষ চলে গেছে। যাবার সময় নিত্যকার মত সুদেষ্ণাকে আদর করেছে, বলেছে—ভাল করে লক্ষ্মী হয়ে ঘুমিয়ে নিও। মাথা হেলিয়ে সে তখন একটি পান পরিতোষের মুখে গুঁজে দিয়েছে। পরিতোষ চলে যেতেই কিন্তু শোবার ঘরের জানালাটা সপাট খুলে দিয়েছে, তারপর আবার সেই পাতার ঝালরের মাঝে একজোড়া চোখ আশ্রয় খুঁজেছে।

সুদেষ্ণা ভাবে সুধাটা ঠিক তার মনের মত চিঠি লিখেছে। একটা নীড় ভাঙার পর আর একটা নীড় সৃষ্টি—কথাটা হয়ত কাব্য বলে মনে হবে কিন্তু ভাঙার জ্বালা কি টের পেয়েছে সুধা। জানলে বোধহয় আর লিখত না।

সুদেষ্ণাকেও বার করেক যে যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছে। কিন্তু সুধাও জানে না যে একবার এ যন্ত্রণা আর দুঃখদায়ক ছিল না। সেবার সত্যি যেন মুক্তির আশ্বাস পেয়েছিল। বাস্তবিক এখনও আকুল হয়ে ভাবা যায় সেই একটি মানুষের কথা।

সেবার ছেলেই দেখতে এসেছিল বন্ধুকে নিয়ে। মাসীমা বললেন অমন গোঁজ হয়ে বসে থেক না, কথাবার্তা বলবে। কলেজে পড়া মেয়ে, আমাদের মত ত' আর মুখ্যু নও।

সুদেষ্ণার কোন ভাবান্তর হয় নি। অনেকবার এমনি সেজে-গুজে যে ঘরে ঢোকা তার মুখস্ত হয়ে গিয়েছিল, সে বার সেই ঘরে ঢুকে সে চমকে গেল।

পাতলা গড়নের ফর্সাপানা ছেলেটি আশ্চর্য জ্বলজ্বলে চোখে তাকে চেয়ে দেখেছে। এই কী বিয়ের পাত্র। পাত্রটি আর তার বন্ধু। দুজনেই যেন কলেজের পড়ুয়া ছাত্র।

ইচ্ছে করেই বুঝি ছোটমামা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন, তখন সুদেষ্ণা যেন পড়ল অথৈ জলে, যে টান টান করা মাথা নিয়ে সে ঘরে ঢুকেছিল সেই মাথা নেমে এল বুকের ওপর। একটা চাপা লজ্জার আলোড়নে দু'চোখের পাতা বন্ধ হয়ে আসছে।

তখন বন্ধুটিই পরিষ্কার গলায় বলে—লজ্জা করলেও একটু কথা বলতে দোষ কী, অমিতাভর সঙ্গে দুটো কথা বলতেও আরাম। দেখবেন আপনার লাভ বই লোকসান হবে না।

অমিতাভ মানে সেই জ্বলজ্বলে দৃষ্টিভরা ফর্সা ছেলেটি চোখাচোখি হতে কেমন অর্থপূর্ণ হাসি হাসে। তারপর চটপট ভাব জমাবার কায়দায় বলে—ধরুন না ট্রামে নেহাতই আপনার পাশের সিটে বসে পড়েছি। লেডিজ সীট হওয়া সত্ত্বেও ভদ্রতা করে তুলে দেন নি। বাস এই পর্যন্ত, সহজ আলাপ ত এতে ক্ষুণ্ণ হবে না।

সুদেষ্ণা মাথা নাড়ে। তারপর নানা প্রসঙ্গ সুরু হয় অতি স্বাভাবিক ভাবে। অমিতাভ আর তার বন্ধু যেন রোজই আসে তাদের বাড়িতে গল্প করতে। দেখা গেল অমিতাভ তাদের কলেজেই পড়ত বছর কয়েক আগে। তখন এটা সেটা টুকরো টুকরো কথার আলাপ, কোন প্রফেসারের খিটখিটে

মেজাজ, কার কী মুদ্রাদোষ তাই নিয়ে হাসাহাসি; কথা কাটাকাটি হতে হতে লজ্জার অবগুণ্ঠন কোন ফাঁকে খসে গেল।

মনে আছে অমিতাভর কথাগুলি—আপনাদের নাকতলার এই অঞ্চলটিতে কত গাছপালা। ভাবতেও পারবেন না কি ঘিঞ্জি পাড়ায় আমরা থাকি। গাছপালার কথা ভাবাই বিলাস অথচ কৃষ্ণচূড়ার বাহার কি এদিকটায়? সকাল বিকেল তাদের দেখে আপনারা হয়ত দেখার আনন্দও অনুভব করতে পারেন না। তবে ওদের রূপের জৌলুষ আরও বাড়ে ঠিক খরা বেলায় যখন রাস্তার পিচ গলে আর প্রকৃতির গরম নিঃশ্বাসে প্রাণ ত্রাহি ত্রাহি করে। সে সময় কোনদিন রাস্তায় বেরিয়ে তাদের রূপ দেখেছেন কী? নিশ্চয়ই দেখেননি, মা বারণ করবেন, বাইরে বেরুলে রঙ জলে যাবে তাই নয়। লক্ষ্মী মেয়ে কী আর করবেন।

—মোটেই না। নিজের মনের কথা আমার ঘাড়ে কেন জোর করে চালাচ্ছেন?

বেশ জোরে প্রতিবাদ করতে যেয়ে সুদেষ্ণা অপ্রতিভ হয়ে দেখে ছোটমামা কেমন বিস্মিতভাবে এসে ঘরে ঢুকছেন।

এরপর বলাই বাহুল্য। অমিতাভ আর তার বন্ধু প্রায় কথাই দিয়ে গেল। মা এসে দেখে শুধু দিনক্ষন ঠিক করবেন।

সুধার চিঠিটা খামে ভরে রাখে সুদেষ্ণা। বেলা গড়িয়ে আসছে, গঙ্গার বুকে পশ্চিমের পড়ন্ত রোদ খর খর করছে। একটু বাদেই দোরের সামনে সাইকেলের ঘণ্টা বাজবে। শোবার ঘরের জানালাটা তাড়াতাড়ি বন্ধ করে দিতেই সারা ঘরটায় এক রাজ্যি অন্ধকার এসে ভিড় করে। সুধাকে পরে একটা জবাব দিয়ে দিলেই হবে। যা তা করে এখন না লিখলেও চলবে। কিন্তু কি লিখবে, আসার কথা বলবে নাকি? বাপ-মায়ের জোগাড় করা পাত্র দেখতে আসছে মনে করলেই ত' বিতৃষ্ণা জাগে, তবু ওরই মাঝে একজন মনটাকে কেমন যেন বেঁধে ফেলে। ফর্সা পানা উজ্জ্বল চোখের একটি ছেলে কেমন যেন চোখা চোখা কথা বলে তবু কথায় মনটানে। এমন ত সুধার ক্ষেত্রেও ঘটতে পারে।

সুধাকে অমিতাভর কথা কোনদিন বলতে পারেনি সুদেষ্ণা। কেন সে তা নিজেই জানে না। অমিতাভকে সুদেষ্ণার ভাল লেগেছিল। মনে হয়েছিল এরই জন্য বুঝি এতকাল অপেক্ষা করছিল, এইভাবে জীবন ধন্য হবে এক পরম প্রাপ্তির প্রত্যাশায়।

নিবিড় এক সুখ-স্বপ্নের আবেশে বোধহয় সুদেষ্ণার চোখ অভিভূত হয়ে গিয়েছিল—ঠিক সেই সময় অমিতাভর মা এলেন তাকে দেখতে।

কনে দেখে হাত পা টিপে টুপে ঠোঁট উল্টে বললেন তাঁর ছেলের পক্ষে মেয়ের বয়েসটা বেশ যেন বেশীই হবে।

সুদেষ্ণার মা যখন উঠিপড়ি করে তার বয়েসটা দু বছর কমিয়ে দিতে, উদ্‌গ্রীব হ'ন অমিতাভর মা তখন তাঁর মুখের ওপর অবলীলাক্রমে দু বছর বাড়িয়ে দিতে দ্বিধা করেন না।

একটা অসহ্য অপ্রীতিকর আলো-চনার মাঝে সম্বন্ধটা ভেঙে গেল।

মা, মাসি বলেন—ভালই হ'ল। চাল নেই, চুলো নেই শুধু ত' ছেলের চাকরিটুকুই ভরসা। তাতেই মায়ের এত গুমোর?

—তোর আমি অনেক ভালো বিয়ে দেব খুকী?

মা ঠিকই কথা রেখেছিলেন। দু মাসের মধ্যে সুদেষ্ণার বিয়ে হ'ল কন্‌ট্রাক্টর পরিতোষ মুখুজ্যের সঙ্গে।

এ ছেলের চালচুলো সবই রয়েছে শুধু মা-মাসী কেন বিয়ের পর সুদেষ্ণা কেমন খুশী খুশী মুখে স্বামীর ঘর করতে এল।

কিন্তু মনের কথা বুঝি সুধাকেও বলা যায় না, তবু তার চিঠি আজকাল ওর পেতে ভাল লাগে। মনে হয় সুদেষ্ণা যেন তার নিজের বিগত জীবনটাকে সুধার মাঝে দেখছে। ভালবেসে বিয়ে করা তাদের দু'জনের জীবনেই হ'ল না তবু সুধার ক্ষেত্রে সুযোগটা হয়ত একেবারে ফুরিয়ে না যেতেও পারে।

আবার সেই নীলরঙের খামে মোড়া চিঠি পরিতোষের বুক-পকেটে দেখে সুদেষ্ণা হেসে ফেলে।

পরিতোষ বলে—বিয়ের আগে থেকেই তোমাকে লিখে বন্ধুর হাতে খড়ি হচ্ছে বুঝি।

—কি জানি।

—কি পায় একটা মেয়ে আর একজন মেয়েকে ঘন ঘন লিখে।

—হিংসে হয় বুঝি?

কৌতুকে সুদেষ্ণার চোখের তারা উদ্ভাসিত হয়। তারপর চিঠিটা তুলে রাখে। অবসরমত পড়লেই হবে'খন। রাত্তিরে সব কাজ সেরে সুধার চিঠিটা খুলে বসল সুদেষ্ণা।

সুধা লিখেছে—ভাই সুদেষ্ণা, এবার আর ভাঙল না, নীড়টা সিলে গেল মনে হচ্ছে। পাত্র শুধু একা নয়, বন্ধু আর মাকে নিয়ে জোট করে এসেছিলেন, ফর্সা চেহারা, একহারা গড়ন, চোখ দুটো বাপু একটু বেশীই উজ্জ্বল। কেমন যেন চোখের ভাষা উথলে পড়ছিল মনে হচ্ছিল। নেহাৎ মা রয়েছেন বলে কিছুই আর বলেন না। মা পছন্দ করে কথা দিয়ে গেছেন। ছেলের পছন্দের কথাটা বাসরেই বাপু তুই জিজ্ঞেস করিস, আমার বাপু বড় ভয় করছে।

শুধু মানুষটি নয় নামটিও আমার পছন্দ হয়েছে। ওর নাম অমিতাভ মৈত্র।

—তোর কী মনে হয় রে?

ঘুমন্ত পরিতোষকে প্রায় ঠেলে মেরে তুলে দেয় সুদেষ্ণা। তারপর ওর বুকের কাছে পরম নির্ভরতায় এগিয়ে আসে। অন্ধকারে দেখা যায় না সুদেষ্ণার নাকের পাটা কাঁপছে থরথর করে। ভাঙা ভাঙা গলায় যেন মিনতি উপচে পড়ে।

সুদেষ্ণা বলে—একটা কথা রাখবে? পশ্চিমে গঙ্গা পাড়ে ঐ যে কৃষ্ণচূড়া গাছ, তোমাকে কতবার কাটতে বারণ করেছি। ওটা কিন্তু কালই কেটে ফেলতে হবে।

আধ-ঘুমন্ত পরিতোষের বিস্ময় উপেক্ষা করেই সুদেষ্ণা বলে চলে—আমার দিব্যি, কালই গাছটাকে কাটতে হবে কিন্তু। ভারী ভয় করে আমার ওদিকে চাইলে।

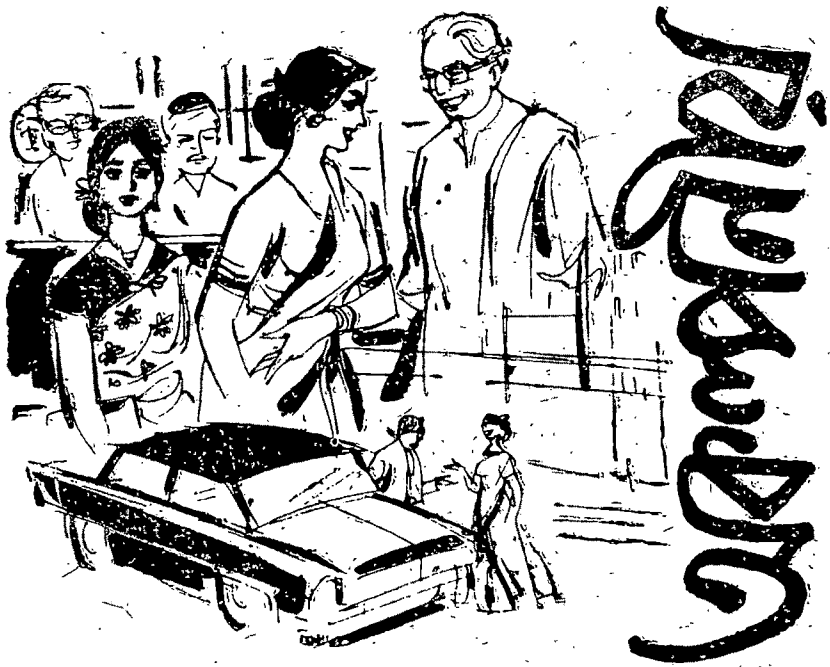

ওভারব্রিজ

প্রবল ভীড়ের চাপে, বাসের হাতলটা ধরে হাঁপাচ্ছিলেন প্রভুরাম। ক'দিন ধরে গাড়িটা বিগড়েছে, তাই ট্যাক্সি করেই যাতায়াত করছিলেন, কিন্তু আজ ট্যাক্সিটাও সময়মত মিলল না অথচ সাড়ে দশটায় তাঁকে ফ্যাক্টরীতে হাজির হতেই হবে, কারণ আজ বড়-দরের একজন লোকের কাছ থেকে, মোটা অঙ্কের কনট্রাক্ট পাওয়ার আশা আছে।

পাশের সিটে বসেছিলো দুটি মেয়ে। একজন উঠে দাঁড়িয়ে প্রভু-রামকে বললো, ওর সিটে বসতে।

—না, না, এই ভীড়ের চাপে, তোমার দাঁড়িয়ে যেতে অসুবিধে হবে মা। আপত্তি জানালেন প্রভুরাম।

—আমার অভ্যাস হয়ে গেছে, রোজ কলেজ যেতে-আসতে হয় তো। আপনি বসুন। সবিনয়ে বলল মেয়েটি।

কি আর করেন, বসলেন প্রভুরাম। স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন,—বুড়োদের নিজের সিট ছেড়ে দেওয়া, এ তো আজকাল দুর্লভ মা, কিন্তু আগে এসব ছিলো। তুমি বড় লক্ষ্মী মেয়ে।

ওঁর পাশের অন্য মেয়েটি খিল্‌খিল্ করে হেসে উঠে বলল——ওর নামটাও লক্ষ্মী কি-না।

—ও, তাই বুঝি! তা নামে আর স্বভাবে তো বেশ মিল দেখছি। হাসিমুখে বললেন প্রভুরাম।

লক্ষ্মী লজ্জা পেয়ে মুখ নত করে বলল—কি আর এমন করেছি, এটুকু করা তো আমাদের কর্তব্য।

সেই সময় সামনের সিটের একজন উঠে যাওয়াতে প্রভুরাম সেই সিটে উঠে গেলেন, লক্ষ্মী বসল নিজের জায়গায়।

বারি দেবী

পাশের মেয়েটি ওকে বলল—বুড়োটার ওপর যে তোর ভারি দরদ দেখছি, এদিকে যে আমার প্রাণটা যায়। উঃ, গায়ে কি গন্ধ। একটা সুন্দর ইয়ং ম্যানকে পাশে বসতে দেওয়া যায়, কিন্তু এই বুড়োগুলোকে আমি মোটেই সইতে পারি না,—ইঃ। গাটা আমার ঘিন্ ঘিন্ করছিলো।

—ছিঃ। মলি। বাপের বয়সী ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে থাকবেন, আর আমরা বসে থাকবো, এ মনোবৃত্তি ভালো নয়। নিজের বাবা হলে কি তাই পারতাম? তেমনি বয়সে-জ্যেষ্ঠদের সকলা ক্ষেত্রেই সম্মান করা উচিত। আমরা ফিলজফী পড়বো, অথচ বাস্তব ক্ষেত্রে সেই জ্ঞানকে অস্বীকার করবো, এটা তো উচিত নয়।

—তোর আবার সব তাতেই বাড়াবাড়ি, নিজের বাবার সঙ্গে আবার কার তুলনা? ফিলজফীতে বুড়ো নিয়ে মাতামাতি-করার কোনো নির্দেশ নেই তো। জবাব দিল মলি।

ওদের কথাবার্তা খুব নিম্নকণ্ঠে হলেও প্রভুরাম বেশ স্পষ্টই শুনতে পাচ্ছিলেন, তাই গন্তব্যস্থলে নেমে যাবার সময় ভালো করে দেখে গেলেন ঐ মেয়ে দু'টিকে।

প্রভুরাম চ্যাটার্জি লোহার কারবারী। দুঃস্থ অবস্থা থেকে আজকের প্রতিষ্ঠিত অবস্থায় আসার পথে যথেষ্ট সংগ্রাম করতে হয়েছে তাঁকে। শ্রমিক-জীবন থেকে আজ তিনি এসে পৌঁছেছেন মালিকের আসনে। একটি ফ্যাক্টরীর মালিক এখন তিনি।

বহু দুঃস্থ লোক এখন তাঁর ফ্যাক্টরীতে কাজ করে। দুঃস্থ বেকার কোনো মানুষ ওঁর সংস্পর্শে এলেই, তিনি তার উন্নতির জন্য আন্তরিক চেষ্টা করেন। নিজের ফ্যাক্টরীতে অথবা তাঁর পরিচিত অন্য কোনো জায়গায় তার কাজ ঠিক করে দেন। সেজন্য পরিচিত মহলে ওঁর যথেষ্ট সম্মান ও সমাদর আছে।

প্রভুরামের দুটি ছেলে। বড় ছেলে বিলেত থেকে ইঞ্জিনীয়ার হয়ে ফিরে এসে নিজেদের ব্যবসায়ে যোগ দিয়েছে। ছোট অজিত কলেজে পড়ে।

তাঁর স্ত্রী মনোরমা, অনেক অভাব-অভিযোগের পথ অটুট ধৈর্যের সঙ্গে পার হয়ে এখন সুখের ঘরে এসে পৌঁছেছেন।

ভাড়া বাড়ী ছেড়ে, এখন এসেছেন নিজের সুরম্য অট্টালিকাতে। সুজিতের এবারে বিয়ে দেবেন মনস্থ করেছেন। অনেক ঘটক-ঘটকী ছুটোছুটি করছে, কিন্তু মনোমত পাত্রী আজও পান নি ওঁরা।

সেদিন মনোরমা তাঁর বান্ধবীর বাড়ীতে বেড়াতে গিয়ে দেখতে পেলেন একটি সুন্দরী মেয়েকে। পরিচয় নিয়ে জানলেন—মেয়েটি বান্ধবীর সম্পর্কে ভাইঝি হয়। ওর বাবা বেশ ধনী লোক, মেয়ের বিয়ের জন্য উপযুক্ত ঘর-বরের সন্ধান করছেন। বান্ধবী বললেন,—মেয়েটিকে তো তোমার ভালো লেগেছে, যদি বলো তবে তোমার ছেলের সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব করতে পারি।

রাজি হলেন মনোরমা। কয়েকদিন পরেই বান্ধবী ওঁদের দুজনকে নিয়ে চললেন নিজের ভাইঝিকে দেখাবার জন্য। অবশ্য আগে ভাইকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন প্রভুরামের কাছে, বিয়ের প্রস্তাব করে, মেয়ে দেখার আমন্ত্রণ জানাবার জন্য।

মেয়ে দেখে ওঁদের খুব পছন্দ হল। তার ওপর প্রচুর আদর আপ্যায়নে ও কন্যাপক্ষের সৌজন্যে খুশি হলেন প্রভুরাম। প্রকাণ্ড হাল-ফ্যাসানের সুসজ্জিত বাড়ী, দামী গাড়ী, গেটে ভোজপুরী দারোয়ান, কন্যা-কর্তার সম্পদের পরিচয় বহন করছে। সবিনয়ে জানিয়েছেন কন্যাকর্তা,—মনোমত ঘর ও বরে কন্যাকে সম্প্রদান করতে চান তিনি, এবং তার জন্য যত টাকা লাগে, খরচে পিছপাও হবেন না। এতদিন পরে সত্যিই তাঁর পছন্দমত পাত্র যখন পেয়েছেন তিনি,—তখন ওদের সম্মতি পেলে, শুভ কাজটা যত শীঘ্র সম্ভব সুসম্পন্ন করে ফেলতে চাইলেন।

প্রভুরাম-দম্পতি জানালেন, কন্যা তাঁদের পছন্দ অতএব অন্য কথাবার্তা অগ্রসর হতে পারে।

প্রচুর জলযোগের পর, ওদের কাছ থেকে বিদায় নিলেন প্রভুরাম ও মনোরমা। বান্ধবী রইলেন ভাই-এর বাড়ী—বিয়ের অন্যান্য কথাবার্তা ও পরামর্শ ইত্যাদির জন্য।

গাড়ীটা দু-চার পা অগ্রসর হবার পরেই হঠাৎ গেল বিগড়ে। ড্রাইভার এক ধারে গাড়ী সরিয়ে রেখে নেমে গাড়ীর ইঞ্জিন পরীক্ষা করতে লাগলো। বিরক্ত চিত্তে রাস্তায় নেমে দাঁড়ালেন প্রভুরাম।

হঠাৎ তাঁর নজরে পড়লো—পাশের বাড়ীর একতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে সেই বাসে দেখা লক্ষ্মী মেয়েটি। ভারি খুশিমনে তিনি এগিয়ে গিয়ে বললেন—এই যে মা লক্ষ্মী, চিনতে পারছো আমায়! এইটি বুঝি তোমাদের বাড়ী?

মেয়েটি প্রথমে একটু অবাক চোখে চেয়ে রইলো ওর দিকে, তারপর ছুটে রাস্তায় নেমে এসে হাতজোড় করে প্রণাম জানিয়ে বিনীতভাবে বললো—হ্যাঁ, এই বাড়ীতে থাকি আমরা। আপনি আসুন না ভেতরে।

—যেতে বলছো? আচ্ছা যাচ্ছি। দাঁড়াও মা, গাড়ীতে গিন্নী আছেন, ওঁকেও ডেকে নিয়ে আসি।

মনোরমাকে সেদিন বাসের গল্পটা শুনিয়েছিলেন প্রভুরাম। তাই গাড়ীর কাছে গিয়ে যখন বললেন, সেই লক্ষ্মী মেয়েটি ডাকছে আমাকে, তুমিও চল না। গাড়ী ঠিক হতে তো একটু দেরী হবেই।

মনোরমা আপত্তি করলেন না, গাড়ীতে বসে তিনি বিরক্তি বোধ করছিলেন।

ওঁদের দুজনকে বাইরের ঘরে বসিয়ে বললো লক্ষ্মী—আপনারা বসুন, মাকে ডেকে আনি।

একটু পরেই লক্ষ্মীর সঙ্গে এলেন ওর মা।

উভয় পক্ষের পরিচয় বিনিময় হবার সময়, মনোরমা বারে বারে দেখছিলেন ওর মায়ের মুখখানা!

চেনাচেনা লাগছে যেন। সঙ্কোচ কাটিয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন—আচ্ছা! আপনার নাম কি সরলা? আর আপনার বাবার নাম কি ছিলো হরপ্রসাদ মুখার্জি? লাভপুরে বাড়ী ছিলো তাঁর?

লক্ষ্মীর মা মনোরমার কথায় একটু চমকে উঠলেন, তার পর কয়েক মুহূর্ত তাঁর মুখের পানে চেয়ে থাকবার পর বললেন—তুমি কি মনো?

—হ্যাঁরে সরো আমি। চিনতে পারলি তাহলে? বলতে বলতে ছুটে এসে সরলাকে জড়িয়ে ধরলেন মনোরমা।

প্রভুরাম অবাক চোখে দেখছিলেন ওদের কার্যকলাপ! লক্ষ্মী এসে প্রণাম করলো মনোরমাকে ও প্রভুরামকে।

লক্ষ্মীর চিবুক ধরে চুমো খেয়ে বললেন মনোরমা—এইটি বুঝি তোর সেই মেয়ে সরো? যার নাম আমার মা দিয়েছিলেন লক্ষ্মীরূপা?

—হ্যাঁ। কালো মেয়ের নাম যখন মাসীমা দিলেন লক্ষ্মীরূপা, তখন আর সকলে বলেছিল—নামটা মানায়নি ওকে। কিন্তু তোর ভগ্নিপতির বড্ড পছন্দ হয়েছিল নামটা, তাই ওর সেই নামই রয়ে গেছে।

প্রভুরাম বললেন,—সার্থক হয়েছে আপনার মেয়ের নাম,—নামে লক্ষ্মী, গুণে লক্ষ্মী, রূপেও লক্ষ্মী। শুধু সাদা রং হলেই কি সুন্দর হয়? শ্যামলা রংএও এমন লক্ষ্মীশ্রী, কজন মেয়ের আছে?

লক্ষ্মীকে জিজ্ঞেস করলেন প্রভুরাম তোমার বাবা কতদিন হল স্বর্গগত হয়েছেন মা?

—তা প্রায় বছর পাঁচেক হয়ে গেল। আঁচলে চোখ মুছে জবাব দিলেন সরলা। ছেলেটি বি-এ পাশ করেছিল, তাই কিছু রোজগার করছে, আর এই বাড়ীখানা ছিল, দোতলাটা ভাড়া দিয়ে কোনরকমে দিন চলছে। যখন তিনি চলে গেলেন তখন তো চারিদিকে অন্ধকার দেখেছিলাম, তারপর আস্তে আস্তে সব সয়ে গেলো।

বাল্যবন্ধুর দুঃখে মনোরমারও চোখে জল এলো।

লক্ষ্মী এই দুঃখময় প্রসঙ্গটি চাপা দেবার জন্য অন্য কথায় এলো।

মাসীমা! এদিকে এসেছিলেন কোথায়? আপনার কেউ থাকেন বুঝি এই দিকে।

—না, মা। আমার বড় ছেলের বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে, তাই মেয়ে দেখতে এসেছিলাম ঐ গেটওলা বাড়ীতে।

জানালা দিয়ে আঙুল বাড়িয়ে দেখালেন বাড়ীখানা মনোরমা।

—ও, ঐ বাড়ীতে? মল্লিকে দেখতে গিয়েছিলেন বুঝি মাসীমা? বেশ সুন্দর দেখতে, আমরা এক কলেজে পড়ি। বলল লক্ষ্মী।

—মলি? আপন মনে উচ্চারণ করলেন নামটা প্রভুরাম।

—হ্যাঁ গো! মলিই হবে, মেয়েটি তো নাম বললে মলয়া, তার থেকে বোধহয় ডাক নাম মলিই হয়েছে জবাব দিলেন মনোরমা।

—ও হো! দাঁড়াও! দাঁড়াও! মনে পড়েছে, মনে পড়েছে!

মলি!—আচ্ছা মা, ঐ মেয়েটিই কি সেদিন বাসে তোমার পাশে বসেছিল? উদ্বিগ্ন ভাবে প্রশ্ন করলেন প্রভুরাম।

—হ্যাঁ মেসোমশাই। ওকে বোধহয় চিনতে পারেননি আপনি। কিন্তু আমাকে তো ঠিক মনে রেখেছেন মেসোমশাই! মিষ্টি হাসির সঙ্গে বললো লক্ষ্মী।

—তোমার ভদ্র ব্যবহার সৎস্বভাবের জন্যেই যে তোমাকে আমি ভুলতে পারিনি মা! আর ঐ মলি মেয়েটি- - -।

মনোরমার দিকে ফিরে বললেন প্রভুরাম—জানলে গো, আমরা কোন মেয়েকে বৌ করবার স্থির করেছি? বাসের গল্প তো করেছি তোমায়, সেই দু' নম্বরের মেয়েকেই দেখে এলাম আমরা।

চমকে উঠলেন মনোরমা। যেন সাপের ঘাড়ে হঠাৎ পা পড়েছে তাঁর।

বিহ্বলভাবে বললেন—অ্যাঁ, বল কি? সেই সর্বনেশে বাচাল অসভ্য মেয়েটাকে ঘরে আনবো, ঘরে আগুন জ্বালাবার জন্যে? না, না, কিছুতেই না, কখনই না। উঃ! ভাগ্যিস্ গাড়ীটা খারাপ হয়েছিল, তাই তো! কি আশ্চর্য্য!—এ সবই ভগবানের লীলা, তা না হলে কি এদের বাড়ীর সামনেই গাড়ী খারাপ হয়? না তুমিই লক্ষ্মীকে দেখতে পাও,—আর সঙ্গে সঙ্গে প্রায় বারো বছর পরে আমিই পাই সরোকে দেখতে? হাত জোড় করে ভগবৎ চরণে প্রণাম নিবেদন করলেন মনোরমা।

আশ্চর্য হয়েছেন সরলা ওদের কথাবার্তা শুনে, তাই জিজ্ঞেস করলেন —ব্যাপার কি মনো? কিছু যে বুঝতে পারছি না।

সেদিনের বাসের ঘটনাটা বললেন প্রভুরাম। তারপর বললেন,—মেয়েটিকে প্রথমেই চেনা চেনা মনে হচ্ছিল, তবে, অনেক গয়না, দামী শাড়ী পরেছে, রং-টংও মাখা ছিলো মুখে, তাই ঠিক চিনতে পারিনি।

ভারি অপরাধী মনে করছে নিজেকে লক্ষ্মী! ব্যাপারটা যে এতদূর গড়াবে, তা বুঝতে পারেনি। বিবৃতভাবে সে বলল,—না, মেসোমশাই, মলি খুব খারাপ মেয়ে নয়, তবে সেদিন ঐসব কথা বলা ওর উচিৎ হয়নি। ও বোধহয় না বুঝে দোষ করে ফেলেছে মেসোমশাই, ক্ষমা করুন ওকে।

—আচ্ছা, আচ্ছা! ঠিক আছে মা-লক্ষ্মী! তোমার বন্ধু যখন, তখন ক্ষমাই করলাম ওকে। এবারে যাও তো মা, একটু চা করে নিয়ে এস, বড্ড গলাটা শুকিয়ে উঠছে! প্রসন্ন হাসির সঙ্গে বললেন প্রভুরাম।

এই দেখো! শুধু বক বক করেই মরছি! অনেককাল পরে দেখা কি-না। যা তো মা-লক্ষ্মী, চা নিয়ে আয়,—আর ঘরে যে খাবার তৈরী হয়েছে, নিয়ে আয়! বললেন সরলা।

—না, না—আর কিছু নয়, শুধু চা। ওদের বাড়ীতে এই মাত্র খেয়েছি, আরেকদিন এসে খাবো তোর কাছে! বললেন মনোরমা।

লক্ষ্মী চলে গেল চা-এর জন্য।

—বড্ড যেন জলটান হচ্ছে, ওখানে খাওয়ার চাপটা বেশী হয়ে গেছে! একটু জল খাওয়াবি সরো? মৃদু হাসির সঙ্গে বললেন মনোরমা।

এই যে ভাই এখুনি আনছি! ব্যস্তভাবে চলে গেলেন সরলা। মনোরমা প্রভুরামের পাশে বসলেন। তারপর মৃদুস্বরে ওঁদের কি কথাবার্তা চললো।

সরলা এলেন জলের গ্লাস নিয়ে। জলপান করে, মনোরমা উঠে গিয়ে সরলার হাতটা চেপে ধরে বললেন—একটা জিনিষ চাইবো, দিবি সরো?

অবাক চোখে ওর দিকে চেয়ে বললেন সরলা—কি এমন জিনিষ আমার আছে মনো? যা তোকে দেওয়া যায়? আমি যে বড় গরীব ভাই।

—আছে। আছে। হাসতে হাসতে জবাব দিলেন মনোরমা;—নিজের জিনিষের মূল্য কি নিজে বোঝা যায়? তার জন্যে দরকার হয় জহুরীর। আচ্ছা খুলেই বলি তাহলে। তোর লক্ষ্মীকে আমায় দে। ছেলে আমার পাত্তোর হিসেবে ভালোই, বিলেত থেকে ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করে এসেছে। চেহারা তো তুই আগেই দেখেছিস এখন আরো ভালো হয়েছে। তোর ভগ্নিপতিও লোহার কারবারে দুটো পয়সা করেছে, বাড়ী গাড়ী সব করেছে। মেয়ে তোর অসুখী হবে না।

কয়েক মুহূর্ত বিহ্বল চোখে, বাল্যসখীর দিকে চেয়ে থেকে, সজল কণ্ঠে জবাব দিলেন সরলা—এ কি সম্ভব মনো? অতবড় লোকের সুন্দরী মেয়ে, প্রচুর টাকা, সব বাতিল করে, গরীবের এই কালো মেয়েকে তুই বৌ করবি? এযে আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি না ভাই!

—তোকে অত স্বপ্নতত্ত্ব আওড়াতে হবে না সরো। এযে ভগবানের বিধান রে। তুই আমি কে? তা না হলে সেদিন বাসে তোর লক্ষ্মীকে দেখার পর থেকে তো উনি যে কতবার বলেছেন, —বৌ করতে হলে, ঐরকম মেয়েকেই করতে হয়,—আহা কাদের মেয়ে; যদি ঠিকানাটা জেনে নিতাম। দেখো,—ঠিকানা জানতেও হল না, ভগবানই যেন নিয়ে এলেন ঠিক জায়গায়।—

একটু হেসে আবার বললেন মনোরমা—মনে আছে, সেই ছোট বেলায় পুতুলের বিয়ে দিয়েছিলাম আমরা। বিয়ের পর আমার মেয়েকে যখন তুই বৌ করে নিয়ে যাচ্ছিস তখন আমি তো কিছুতেই দেব না, তখন তুই বলেছিলি,—আরেকবার আমরা পুতুলের বিয়ে দেব, তখন আমার হবে মেয়ে আর তোর ছেলে! তাহলেই তুই আমার মেয়েকে নিয়ে নিতে পারবি। এতদিনে তোর সেই কথাটা ফললো! এবারে তোর মেয়েকে নিয়ে যাবার পালা আমার।

প্রভুরাম হাসতে হাসতে বললেন—মা-লক্ষ্মী বোধহয় সত্যিই আমার আর জন্মে মা ছিলেন,—তাই বুড়ো ছেলেটাকে বাসে দাঁড়াতে দেখে অতো মায়া

(১৬৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

স্বপ্নসৌধ

ধর্মদাস মুখোপাধ্যায়

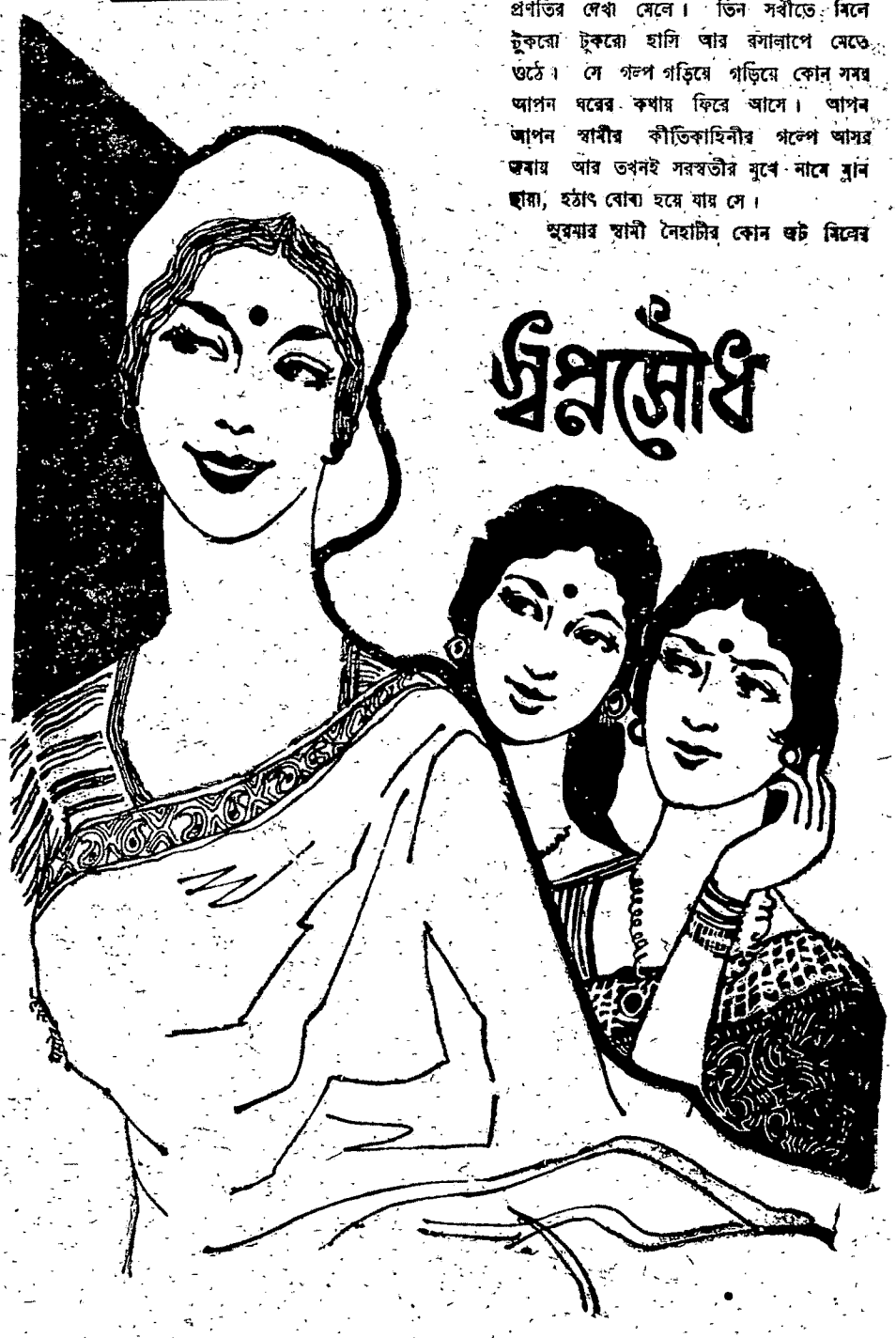

আর্ত কান্নায় ভেঙে পড়ে সরস্বতী সমরেশের পায়ের কাছে। বল বল, আর, কতদিন এভাবে থাকতে হবে। আর যে পারি না। চোরের মত পালিয়ে পালিয়ে থাকি। ওরা যখন গল্প করে ওদের সুখ-সম্পদের কথা আমি শুধু শুনে যাই মুখ বুঁজে। ওরা যখন স্বামীগর্বে হাসে আমার কান্না পায় নিজের ভাগ্যের কথা স্মরণ করে। বল, বল না, কতকাল আর চুপ করে থাকব, করে সেই সুদিন আসবে।

আসবে একদিন। নিশ্চয়ই আসবে : একটু অপেক্ষা কর লক্ষ্মীটি।

সমরেশের সব কাজ বন্ধ হয়ে যায়। মুখ তুলে চায় সরস্বতীর দিকে। আহা : এমন সুন্দর রং সরস্বতীর কোথায় গেল। কে যেন ওর সারা অঙ্গে কালি ঢেলে দিয়েছে। চোখের কোলে কালি। রুক্ষ্ম চুল। আর কি ব্যাকুল প্রতীক্ষা ওর চোখের পাতায়। দুঃখ পায় সমরেশ। মনে হয় এ সাধনা তার নয়। এ সব ছেড়ে দিয়ে সুরমা আর প্রণতির স্বামীদের মতই সেও চাকরি নিয়ে সাধারণ মানুষের মত সংসার সমুদ্রে ভেসে পড়ে।

কিন্তু পারে কই সমরেশ। যখন সে সরস্বতীর মুখের দিকে চায় তার সব প্রচেষ্টা সব সাধনা মনে হয় নিষ্ফল। এমন স্ত্রীর হাতে সংসারের দায়-দায়িত্ব তুলে দিয়ে কি সাধনা করছে সমরেশ। যেন সরস্বতীর মৃত্যুর বিনিময়েই তার এই তপস্যা। সে সরস্বতীর মৃতদেহের ওপর বসে তার শব-সাধনা করছে।

না, সে সব ছেড়ে সংসারকে আপাততঃ বাঁচাবে। সংসার তরণীর হাল নিজেই ধরবে। সরস্বতীকে অপমৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাবে।

—কি হোলো উঠে পড়লে যে : আর ভাল লাগছে না বুঝি। সমরেশকে উঠে পড়তে দেখে সরস্বতী উদ্বিগ্ন।

—না, তোমাকে মনে পড়ে গেল। মনে হল তোমার পাশে গিয়ে দাঁড়াই। সব দায়িত্ব আমি নিজে নিই।

ম্লান হাসল সরস্বতী।

চতুর্দশীর চাঁদের মতই ক্ষীণ। তুমিই তো নেবে তোমার সংসারের দায়িত্ব। কিন্তু আজ নয়। সেদিন তো আসবেই। শুধুই কি অর্থ চাই তোমার কাছে। তখন আসবে যশ অর্থ সম্মান কত কি? সেদিনের সেই অনেক পাওয়ার ক্ষণে আজকের এই না পাওয়ার দুঃখ ভুলতে পারব না?

আশ্বাস দেয় সমরেশ : আশা দেয়। দিন আসবে, আসছে। এখন শুধু অপেক্ষা করার পালা। আজকের মত সুখ-শান্তি সাধ-আহ্লাদ মুলতুবী রইলো।

অবসর ক্ষণে দুজনে মিলে স্বপ্ন দেখে। কল্পনায় রঙীন আশার জাল বোনে। সাময়িক দুঃখকে ভুলতে চায়। সংসারের কাজগুলো একে একে করে যায় খুশিমনে।

তারপর একসময় বেলা পড়ে আসে। পুকুরে যায় গা ধুতে। সেখানে সুরমা আর প্রণতির দেখা মেলে। তিন সখীতে মিলে টুকরো টুকরো হাসি আর রসালাপে মেতে ওঠে। সে গল্প গড়িয়ে গড়িয়ে কোন সময় আপন ঘরের কথায় ফিরে আসে। আপন আপন স্বামীর কীর্তিকাহিনীর গল্পে আসর জমায় আর তখনই সরস্বতীর মুখে নামে ম্লান ছায়া, হঠাৎ বোবা হয়ে যায় সে।

সুরমার স্বামী নৈহাটীর কোন জুট মিলের

হাজরে বাবু। ভাল মাইনে পান ভদ্রলোক। মাইনের চেয়ে উপরি পাওনা বেশি। বাড়ি আসার সময় সুরমার জন্য আনে ভাল ভাল রঙীন শাড়ি, গহনা এমন কত কি। অমন যে জাঁদরেল হাজরে বাবু তিনিও কেমন ভালমানুষটির মত সুরমার সামনে পা মেপে মেপে চলেন, সে কাহিনীও বাদ যায় না।

আর প্রণতির স্বামীর তো কথাই নেই। গ্রামের মাতব্বর, পঞ্চায়েতের সঞ্চল প্রধান। তাঁর কৃতিত্বের কাহিনী শুনে শুনে ওদের কাণ ঝালাপালা। স্বামীর ক্ষমতা আর ঐশ্বর্যের কাহিনী শুনিয়েই প্রণতি থেমে থাকে না। সরস্বতীর দুরবস্থার কথা টেনে আনে। তার দয়ার শরীর ভরে ওঠে গভীর সহানুভূতিতে। আহা! পাঠশালার মাষ্টারীতে কি চলে না কি আজকাল: কি কষ্টেই না থাকে সরস্বতী।

তাই তো প্রণতি সরস্বতীর দুঃখে ব্যথিত হয়ে বলে—তোমার কত্তাকে বললেই পার আমাদের ওঁকে বলতে। এত অভাব যখন তোমাদের একবার মুখ ফুটে বললেই উনি ধয়রাতি সাহায্য থেকে কিছু কিছু দিতে পারেন তোমাদের। সরকারের এখানকার সব দায়িত্বই তো ওঁর ওপরে কি না?

বেশ ছিল সরস্বতী এতক্ষণ। ওদের স্বচ্ছলতার কাহিনী প্রতিদিন শোনানোর মধ্যে আর সরস্বতীকে তাদের তুলনায় নিজের অবস্থা বোঝানোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। আজ প্রণতি ওখানেই থামেনি। সরস্বতীর দারিদ্র্য নিয়ে বিদ্রূপ করে আনন্দ পেতে চায়। ক্ষমতা আর ঐশ্বর্যের কাছে নতি স্বীকার করতে বলে—বলে, আত্মসমর্পণ কর।

নিমেষের মধ্যে সরস্বতীর দেহের রক্ত কণিকাগুলি দৌড়াদৌড়ি শুরু করে পা থেকে মাথা পর্যন্ত। কান মাথা গরম হয়ে ওঠে লজ্জা আর অপমানে। সাংঘাতিক কিছু একটা বলতে গিয়ে সংসারের কথা মনে আসে। আর তখনই চপসে যায়। রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে আসে। পাঠশালার—মাষ্টারের বৌএর ক্রোধ রূপান্তরিত হয় বিদ্রূপে।—বলবে বই কি ভাই? দরকার হলেই তোমার স্বামীর কাছে যাবে। তোমাদের নিয়েই তো আছি।

কথাটা আদৌ সত্য নয় ওরা জানে। সরস্বতীর পাল্টা আক্রমণে প্রণতির অপ্রতিভ মুখ-চোখে বিব্রত হওয়ার ভাব ফুটে ওঠে। প্রণতি এই ধাক্কাটা সামলে আবার কিছু বলে বসে তাই চতুর সুরমা গুমোট আবহাওয়াটাকে হালকা করার জন্য একেবারে প্রসঙ্গান্তরে যায়—ওসব কথা এখন থাক ভাই। বলব বলব মনে করে আসল কথাটাই বলা হয়নি তোমাদের। পুরুষগুলোর যত বয়স বাড়ে ছেলেমানুষিও তত পেয়ে বসে, আমাদের উনি আজ চিঠি দিয়েছেন—কি লিখেছে জান: আমার যদি পাখীদের মত ডানা থাকত উড়ে গিয়ে দেখে আসতাম আমার প্রিয় বিরহে আমারই মত কাতর হয়েছে—ছিঃ ছিঃ এত বয়স হয়েছে, এখনও এসব লিখতে লজ্জা করে না। আমি তো ভাই পড়তে পড়তে পড়া বন্ধ করে চলে এসেছি।

গোমড়া-মুখো প্রণতির ওষ্ঠেও হাসি দেখা দেয়। কিন্তু তার অত সময় কোথায় ঘাটের ধারে বসে থাকার। নিজের সংসারের চিন্তায়ই সে বিভোর। তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে তাকে। বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি, সরকারী অফিসারদের পায়ের ধুলো পড়ে তার আঙিনায়। তাদের চা পানে আপ্যায়িত করতে হয় অহরহ, কখনও জলযোগে। ছোট-বড় অফিসারদের কৃপায় তার ঘরে দুর্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য জিনিসের অভাব ঘটে না প্রায়ই। তাদের দেওয়া জিনিসে তাদেরই ভোগ দেয়। ঠাকুর যা খান তার দশগুণ হয়ে ফিরে আসে।

যাবার বেলায়ও এই কথাগুলো শুনিয়ে যায়। সরস্বতীরই মরণ। বাড়ি ফিরে আসে শূন্য মনে গভীর নৈরাশ্য নিয়ে। ওদের ঐশ্বর্যের পাশাপাশি দারিদ্র্যের কি বিকট রূপ। অভাব গ্রাস করেছে তার সমস্ত সত্তাকে। এ যে কি যন্ত্রণা সে কাকে বোঝাবে।

তাইতো সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ে সমরেশের ওপর। মানুষটা পড়ে রইল গ্রামে, সত্তর আশী টাকার মাষ্টারী নিয়ে। তবু যদি স্কুলের সময়টা ছাড়া বাকী সময় টিউশানি করতো, কি ছোটখাট ব্যবসা একটা করত।

ঘরে ঢুকে দেখে সমরেশ নিবিষ্ট মনে তার আরাধনায় রত। প্রণতিকে মুখের মত জবাব দিয়ে যে মনটা শান্ত হয়েছিল সে মনটাই যেন জ্বলে ওঠে আগুনের মত। সমস্ত দেহমন অদ্ভুত এক জ্বালায় রী রী করে।

—কি হবে বলতো ঘরের মধ্যে মুখ গুঁজে এই ছাইভস্ম নিয়ে পড়ে থেকে। কবে কি হবে তার জন্য এ কষ্ট যে আর সহ্য হয় না। যার যা খুশি সে বলে, কত আর যন্ত্রণা সয় একটা মন? সব কিছুর তো একটা সীমা আছে। বল, কতদিন আর মানুষের ঠাট্টা-বিদ্রূপ মুখ বুঁজে শুনে যাব। কথা বল, চুপ করে থেক না! তোমাকে তো শুনতে হয় না! কিন্তু আমার যে মাথা কাটা যায় লজ্জায়!

সমরেশ বোবার মত চেয়ে থাকে সরস্বতীর দিকে। তারপর এক সময় বুঝি জানলা দিয়ে আকাশ দেখে। সীমানাহীন ঐ নীল আকাশ ওর গায়ে কোন মালিন্য লাগে না। ও বিরাট বিশাল অনন্ত।

কাজ ছেড়ে উঠে আসে সমরেশ। ধীরে ধীরে সরস্বতীর কাছে গিয়ে হাত বুলিয়ে দেয় তার মাথায়। যে বিপুল ক্ষোভ আর দুঃখ তাকে ব্যথায় শেষ করে দিচ্ছিল তাই অশ্রু হয়ে নেমে এসে সমরেশের বুকটা ভিজিয়ে দিল।

সময় নেই বেশি। সময় নষ্ট করা চলবে না. যে সাধনাকে জীবনের ব্রত করেছে তাকে সফল করতেই হবে। এর ওপরেই নির্ভর করছে সরস্বতীর চোখের জল মোছানোর, তার বড় হওয়ার, দেশকে বড় করার।

—এই নাও তোমার চা। চোখের জল মুছে কাজে নেমেছে সরস্বতী।

তৃষিত চাতকের মত এর জন্যই অপেক্ষা করছিল সমরেশ। সরস্বতী ঠিক বোঝে কোন সময় কি চায় সে। মাস কাবার। সামান্য কটা টাকা কবেই শেষ। হাতে পয়সা নেই। তবু সরস্বতী কোথা থেকে সংগ্রহ করে আনে চা। কখনও কিনে আনে তিন পয়সা, তাই দিয়ে দুদিন চালায়। নিজেরও একটু খাবার সখ। খেতে পারে না। যেটুকু সে খাবে সেটুকু পরের দিন সমরেশকে দিতে পারবে। তারই তো দরকার। তাকে পুষ্ট করতে হবে। তার সকল কম সুখ-সুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। তার ওপরেই তো নির্ভর করছে ভবিষ্যৎ। তার সাধনায় ব্যাঘাত এলে চলবে না।

—চায়ে চুমুক দিয়েই গুড়ের তীব্র গন্ধে মুখটা বিকৃত হয়ে ওঠে সমরেশের। সরস্বতীর দৃষ্টি এড়ায় না। বলে—দুষ্ট সরস্বতী ভর করেছে তোমার মাথায়, তা কি হবে?

—আমার সরস্বতী দুষ্ট নয় মোটেই। মিছি-মিছি তার বদনাম দিচ্ছ।

—এ সরস্বতী নয় গো আর একজন, যার পায়ে মাথা খুঁড়ছ দিনরাত।

—এক সরস্বতীই আমার আরাধ্য। তাকে ঘিরেই আমার পরিক্রমা। আর সে শুধু সরস্বতী নয়, লক্ষ্মীও। সেই তো বাঁচিয়ে রেখেছে আমায়, আমার সব দায় থেকে মুক্ত করে।

—থাক, আর লেকচারে দরকার নেই। নিজের কাজ কর দেখি!

এ শান্তি ক্ষণেকের। এ আনন্দ তাদের সংসারে দুর্লভ। নিমেষের জন্য সরস্বতীর মুখে হাসি ফুটিয়ে আবার তাকে ঠেলে দেয় অসীম যন্ত্রণায়। সে যন্ত্রণা সে ভোগ করে একা। তার কোন অংশীদার নেই। এ দুঃখ তাকে বহন করতে হয় একা। এ সমস্ত মালিন্য থেকে সমরেশকে দূরে রাখে সরস্বতী। তার সাধনায় যেন বিন্দুমাত্র ব্যাঘাত না ঘটে। সংসার চালানোর যাবতীয় দায়িত্ব তার একার।

কিন্তু কোথায় যাবে তখন সরস্বতী। কার কাছে গিয়ে হাত পাতবে। কেউ যে দেবার নেই। সকলেই চায়। যার আছে তাদের কাছে যেতে যে মাথা কাটা যায়। এমনিতেই তাদের ঐশ্বর্যের জয়গানে সে পাগল। এর ওপর গিয়ে হাত পাতলে আর উপায় আছে নাকি।

না, প্রণতির ওখানে মরে গেলেও যাবে না সরস্বতী। তার বাইরের ঘরে সব সময় লোক গিজগিজ করে; সেখানে ঢুকতেই মাথা কাটা যায়। একদিন গিয়েছিল কি একটা প্রয়োজনে। দিয়েছিল প্রণতি। কিন্তু সে দানের প্রচার এমন সাড়ম্বর ও সরব যে বাইরের

লোকও বুঝেছিল এ বাড়ির গিন্নীর কাছে কেউ কিছু চাইতে এসেছে।

উঃ সে কি যন্ত্রণা! চারদিকে কেবল সাফল্য। ঐশ্বর্যের অহঙ্কার আর তার ভাগ্যে ব্যর্থতা, শুধুই ব্যর্থতা।

এর চেয়ে সুরমার কাছেই হাত পাতবে। সুরমা ভালবাসে সরস আলোচনা। সে হয়তো বলবে—কি ভাই সরস্বতী! বরের গল্প কিছু বলবে নাকি। তুমি ভাই ভীষণ চাপা। আজ পর্যন্ত তোমাদের ভালবাসার একটি কথাও শোনালে না।

হায় ভালবাসার গল্প। তারা যাকে ভালবাসে তার গল্প সুরমা শুনতে চাইবে কি? তারা ভালবাসে একমাত্র দারিদ্র্যকে। না খেয়ে থাকাকে। এ গল্প শুনবে নাকি সুরমা? স্বামীকে জোর করে তার আরাধনায় বসিয়ে স্ত্রী বেরিয়েছে লোকের দরজায় চাল ধার করতে। এ গল্প কি শোনবার নাকি!

তবু শোনাতেই হয়। সুরমার বাড়িতেই যায় সরস্বতী।

—কি খবর ভাই সরস্বতী! এসো এসো —অসময়ে যে—রান্না-বান্না সারা বুঝি!

কি বলবে সরস্বতী! বলবে নাকি স্বামী তার বড় হবার তপস্যায় রত। মাইনে পাওয়ার পর তিন চারটে দিন ছাড়া এমনি করেই কাটে তার মাস, তার জীবন, তার সংসার। বলবে নাকি এই জন্যই তো পুকুরের ঘাটের আসরে শুধু শুনে যায় বোবার মত। তার যে বলার কিছু নেই। স্বামী যে সাধনায় মগ্ন,—তার কথা বলার সময় তো আসেনি এখনও। তার সৌভাগ্যের দরজাটায় তালা লাগানো। তাকে খোলার চাবির সন্ধান আজও পায়নি সরস্বতী।

কিন্তু কল্পনা নিয়েই তো বাঁচবে না সরস্বতী। মুখ ফুটে বলতেই হবে তার কথা। লজ্জায় মরে গেলেও মুখ খুলতে হবে। ক্ষুধার আগুনে লাজ-লজ্জা সব পুড়বে। যে মুখে আজ ধার চাইবে, অনুগ্রহ ভিক্ষা করবে সেই মুখেই কাল বিকালে পুকুরঘাটে রসালাপ করতে হবে। আশ্চর্য বলতেই হবে।

লতে হয়—না ভাই, রান্না এখনও চাপেনি, আজ চাল বাড়ন্ত। এখন ভাত চাপাতে গিয়ে দেখি চাল নেই। আগে বলতে মনে ছিল না! এখন বলতে গেলে কুরুক্ষেত্র। তাই এসেছি তোমার কাছে! দুপালি চাল ধার দাও না ভাই! আবার ফেরৎ দিয়ে যাব আমাদের চাল এলে।

অমন হাসিখুশি সুরমা মুহূর্তেই গম্ভীর হয়ে গেল। মখর মানুষটা নীরবে চাল এনে দিল সরস্বতীকে। একটা কথাও শুধাল না, হাসল না, এই লজ্জাজনক আবহাওয়াকে হালকা করেও দিল না।

সরস্বতী মরমে মরে চাল নিয়ে এল। এই অপমানের কথা জানাবে কাকে। কে নেবে তার যন্ত্রণার অংশ। পাথরের মত স্থাণু হ'য়ে বসে ধ্যানে মগ্ন তার সুখ-দুঃখের সঙ্গী—তার জীবনমরণের সাথী। বুঝি তার অনুভূতি তার বোধশক্তি সব লোপ পেয়েছে। ভোঁতা হয়ে গিয়েছে তার বুদ্ধির দীপ্তি। ব্যথা-বেদনার কোমল সূক্ষ্ম তন্ত্রিগুলো অচল হয়ে আছে।

তাই থাক। তাকে এ সংসারের জ্বালা-যন্ত্রণা থেকে দূরেই রাখতে চায় সরস্বতী। সে বাস করুক চিন্তালোকে। মর্তলোকের এই কলহ কলঙ্ক-মাখা বিষবাষ্প যেন স্পর্শ না করে তাকে। তার সাধনা থেকে যেন না জাগায়। যত বিষ হলাহল উঠছে এ-সবই সরস্বতীর কণ্ঠে আশ্রয় করুক। সে নীলকণ্ঠের মতই সবটুকু বিষ ধারণ করবে কণ্ঠে, এ বিষের ছোঁয়া যেন স্বামীর সাধনার পথকে বিষাক্ত না করে তোলে।

ভাবতে ভাবতে বেলা পড়ে আসে এক সময়। ছায়া নামে সরস্বতীর ঘরের আঙিনায়, পুকুরের নিথর জল হাতছানি দিয়ে ডাকে তাকে। আবার এসে মেলে তিন সখীতে।

সুরমাই শুরু করে ওপাড়ায় আগুন লাগার খবর। প্রণতি মাঝপথে বাধা দেয় সুরমাকে। বলে আরও পড়ত যদি আমাদের উনি গিয়ে না পড়তেন।

সুরমার চেয়ে বেশী বয়স সরস্বতীর। একটা ঘটনাও শোনার উপায় নেই। সবখানে ওদের স্বামী-দেবতা হাজির। তাঁদের ছাড়া কোন ঘটনা ঘটতেই পারে না এই পৃথিবীতে।

সরস্বতী ক্রুদ্ধ কণ্ঠে প্রশ্ন করে প্রণতিকে —তারপর কি হল, কি করলেন আপনার উনি? ওঁকে দেখেই বুঝি আগুন নিভে গেল।

—ওরে সর্বনাশ! উনি না গিয়ে পড়লে গ্রামকে গ্রাম পড়ে ছাই হয়ে যেতো। উনিই তো ঘর থেকে কাঁথা বার করে জলে ভিজিয়ে খড়ের চালের ওপর চাপাতে বললেন। ওঁর বুদ্ধির জোরেই রক্ষা পেল শত শত মানুষের জীবন। বিপদে পড়লে ওঁর বুদ্ধি যেন খুলে যায়। এই আজই তো দাসপাড়ার একটি বৌ এসে কেঁদে পড়ল ওঁর পায়ে। স্বামী নাকি বেদম মারধোর করে তাড়িয়ে দিয়েছে বাড়ি থেকে। উনি চৌকিদার দিয়ে ডাকিয়ে বেটাকে এমন ধমক দিলেন যে সুড়্ সুড়্ করে বৌ-এর হাতে পায়ে ধরে মাপ চাইতে হোলো। তারপর বৌ-এর হাত ধরে চলে গেল ওরা হাসতে হাসতে

সুরমা এ গল্প শোনার পর চুপ করে থাকার পাত্রী নয়। সেও প্রণতির মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলে—বিপদে পড়লে আমাদের উনিও বক দিয়ে পড়েন। সেবারে ফ্যাক্টরীতে হল এ্যাকসিডেণ্ট। উনি জীবনের মায়া না করে ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং দুজন আহতকে বাঁচালেন নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে। তারপরেই তো হোলো প্রমোশন। উনি এখন অফিসের হাজরে বাবু।

ওদের কথা শেষ হলে ওরা বুঝি আশা করে সরস্বতীও কিছু বলবে। সরস্বতীর বলার কিছু নেই। তার জীবন শুধু শোনার। সে শুধু শুনে যাবে সকলের সাফল্যের কথা, গৌরবের কথা। বাড়ি ফিরে সেই অচঞ্চল পাষাণ মূর্তিটার কাছেই এগিয়ে যায় সরস্বতী। তার নিবিষ্ট মনে কাজ করা দেখে প্রণতির জ্বলে যায়। বলে—সত্যই কি কিছু নেই তোমার জীবনে মানুষের কাছে গল্প করার মতো! তুচ্ছ পাঠশালার মাষ্টারী ছাড়া কিছুই কি করনি। বল না, চুপ করে থাক কেন? চিরকাল কি শুনে যাব অপরের কথা বোবার মত। কোনদিন তোমার মুখে একটি কথাও বলতে পারব না?

ধ্যানমগ্ন মানুষটি যেন ধীরে ধীরে জেগে ওঠে আরাধনা শেষ করে। নিমীলিত আঁখি মেলে ধরল সরস্বতীর মুখের ওপর। মুখে প্রসন্ন হাসি বরাভয় মূর্তি।

—নিশ্চয়ই পারবে। তোমার দুঃখের দিন শেষ হয়ে এল সরস্বতী।

দৈববাণী শোনার মত চমকে উঠল সরস্বতী। শিথিল শিরা উপশিরায় হঠাৎ জোয়ারের জলের মত এল প্রাণতরঙ্গ সমস্ত অবসাদ কাটিয়ে নতুন উদ্দীপনায় জেগে উঠল যেন—সত্যি বলছ—সত্যি আমার গা ছুঁয়ে বল। আমরা কি মানুষের মত মাথা উঁচু করে বাঁচতে পারব আবার!

—সত্যি কথাই বলছি সরস্বতী। আমার এতদিনের তপস্যার ধন পাঠিয়েছি পরীক্ষার জন্য। কয়েক দিনের মধ্যেই জানা যাবে ফলাফল।

জড়িয়ে গেল সরস্বতীর দেহমন। দুঃখের দিন শেষ হবে কিনা সে জানে না। তবু যেন একটি আশাসে তার সব ব্যথা ফুল হ'য়ে ফুটে উঠল।

তাই ছায়া নামার আগেই সরস্বতী এসেছে পুকুরঘাটে। ভাবছে একমনে।

—কি ভাই! কি ভাবছ এমন করে? যার কথা ভাবছ তিনি তো ঘরের মধ্যে বসে বসে তোমার চাঁদমুখ দেখেই দিনরাত্রি কাটান! কি করেন বল তো তোমার কর্ত্তাটি। বলবে না আমাদের! একটি দিনও মুখ খুলবে না।

নিশ্চয়ই বলবে সরস্বতী। আজ সে সব বলবে। তার অজ্ঞাতবাসের দিন সমাপ্ত। বহুদিনের অবরুদ্ধ বোবা কান্নাকে আজ প্রাণের জোয়ারে ভাসিয়ে দেবে। সকলকে জানিয়ে দেবে তার বিপুল প্রাণ সম্পদের কথা। তার সাধনার কথা। বাঁচার জন্যই এতদিনের মরমে মরে থাকার কথা।

—উনি ঘরে বসে সাধনা করেন— সরস্বতী সাধনা।

(১৬৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

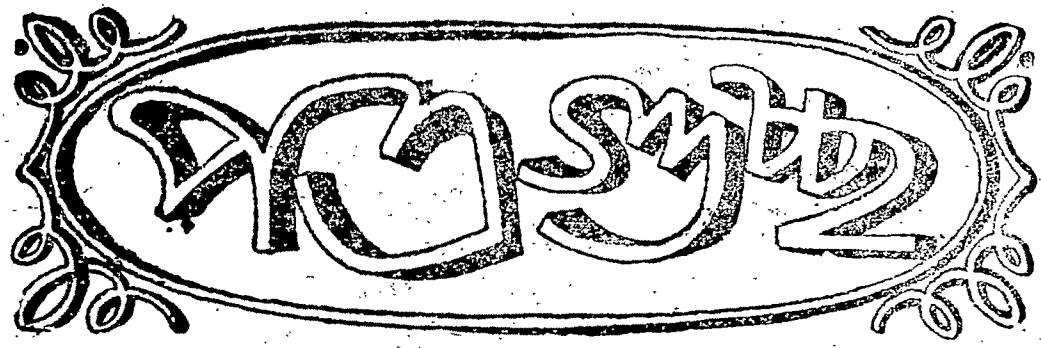

বিশিষ্ট সাহিত্যসেবীদের অপ্রকাশিত পত্রাবলী

[অত্র প্রকাশিত পত্রগুলি সাহিত্য ও সাহিত্যিক সম্পর্কে লিখিত। বাঙলার একাধিক সাহিত্যরথীর এই পত্রাবলীর মধ্যে তাঁদের চিন্তাধারা ও ধ্যানধারণার এক সম্যক প্রকাশ ঘটেছে। পত্রগুলি সংশ্লিষ্ট লেখকদের মনের এক-একটি উজ্জ্বল প্রতিচ্ছবি বহন করে। তাঁদের ভাবধারার বাহন এই পত্রগুলির মূল্য সেই বিচারে অপরিহার্য এবং চিরন্তন। পত্রগুলি শ্রীঅমিয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিত। —স]

মোরাবাদি
রাঁচী
২৬।১০।৩৭

কল্যাণীয়েষু,

তোমার চিঠি ঘুরে ফিরে অতঃপর আমার হাতে এসেছে। তুমি যদি কলকাতায় আমার সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে থাক ত' আমার সাক্ষাৎ পাওনি। কারণ আমি ইতিমধ্যে এখানে চলে এসেছি। আর ফিরব নভেম্বরের শেষে। সুতরাং তোমাদের সভায় উপস্থিত থাকতে পারব না। তুমি ঠিকই লিখেছ, আমি বক্তৃতা করতে ভালবাসিনে। আর সভাপতির কর্তব্য হচ্ছে বক্তৃতা করা। আমার দেহ মন দুইই বক্তৃতার বিরোধী। বক্তৃতা করা একরকম অভিনয় করা। এ অভিনয় করতে আমি অপারগ।

শ্রীরামপুর আমার সুপরিচিত। এবং আমার বহু বন্ধুবান্ধব শ্রীরামপুর-বাসী, যদিচ তাঁরা এখন শ্রীরামপুরে থাকেন না, থাকেন কলকাতায়। এর কারণ আমি বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ, আর বারেন্দ্রের সঙ্গে বারেন্দ্রের কুটুম্বিতা থাকেই, অন্ততঃ কুটুম্বিতার গন্ধ।

তুমি যে লিখেছ যে, আমার লেখা তোমাদের ভাবায়, এ কথা শুনে খুসি হলুম। আমার লেখা যে লোকপ্রিয় নয় তার কারণ বোধহয় তা লোককে ভাবায়। কোন বিষয়ে কিছু ভাবা আমাদের জাতির ধর্ম নয়। হাজার বৎসরের অধীনতার ফল নিজের চিন্তার উপর অবিশ্বাস। এবং সেই সঙ্গে পুরাকালের ও দূর দেশের চিন্তার উপর অগাধ ভক্তি। আমি এই মনের ঘুম ভাঙ্গাতে একটু-আধটু চেষ্টা করেছি।

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী

১, পাম প্লেস
বালীগঞ্জ
৭।৫।৪১

কল্যাণীয়েষু,

তোমার চিঠি পেয়েছি।

১৫ই জুন শ্রীরামপুরে উপস্থিত হবার কোনও আপত্তি নেই। তবে ইতিমধ্যে যদি কোনও বাধা ঘটে ত' পরে জানাবো।

তুমি যে আমার গল্পের জনৈক গুণগ্রাহী পাঠক তা জানতে পাই "বীনাবাই" সম্বন্ধে তোমার appreciation পড়ে।

"জুড়িদৃশ্য" সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথও খুব প্রশংসা করেছেন। "চাহার দরবেশ" পাঠক সমাজে যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করেছে।

আমার গল্প এখন জাতে উঠছে!

—ইতি
শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

১২০।২, আপার সার্কুলার রোড
৩রা আষাঢ়, ১৩৪২।

নমস্কার পূর্বক নিবেদন—

আপনার চিঠি ও "বাঙালীর কথা" পাইয়া বাধিত হইলাম।

ঐ কাগজটি আমি পূর্বে দেখি নাই। উহাতে আমার কোনও লেখা ছাপিবার অনুমতি আমি দিই নাই। অবশ্য "প্রবাসী" হইতে উদ্ধৃত লিখিলে অনুমতির কোন প্রয়োজন হয় না।

আপনাদের "বনফুল" কাগজটির শ্রীবৃদ্ধি হউক।

বিনীত নিবেদক
শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

ভদ্রকালী
শিমুলতলা লেন
২৮।৫।৫৩

পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু

সবিনয় নমস্কার নিবেদন,

আপনার পত্রখানিতে আপনি এখানে আসিবেন সংবাদে পরম আহ্লাদিত হইলাম। অবশ্যই আসিবেন, পথ চাহিয়া রহিলাম।

আপনার হাতে গীতারঞ্জন উপহার দিব, আপনার অভিমত কাগজে প্রকাশ করিলে বড়ই সুখী হইব। আশা করি সপরিবারে কুশলে আছেন। সেদিনকার সভায় আপনাদের সঙ্গলাভে ধন্য হইয়াছি।

ইতি
প্রীতিধন্য
শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

নিবেদন

বনফুল সাহিত্য সমিতির কর্মিবৃন্দ এবং সহৃদয় সাহিত্য রসিকগণ, সকলে আমার নমস্কার গ্রহণ করুন। আজ আপনাদের এই সুধী-সমাগমে উপস্থিত হইতে পারিয়া আমি নিজেকে পরম ভাগ্যবান বলিয়া মনে করিতেছি। জীবনের এই শেষ বেলায় আমার সতীর্থ শ্রীতারকচন্দ্র রায় এবং স্নেহ-ভাজন অনুজ শ্রীমান কুমুদরঞ্জন মল্লিকের সুমধুর সঙ্গলাভে আমি পরম আহ্লাদিত। কৈশোরকাল হইতেই আমি বাণীর সেবা করিয়া আসিতেছি এবং কবিতা-লেখার প্রচুর আনন্দ পাইয়াছি। আমার লেখা যখন আপনাদের মতন গুণীগণের হৃদয়গ্রাহিণী হইয়াছে, তখন আমার বাণী সেবা সার্থক হইয়াছে।

জীবনের এই অস্ত-সিন্ধু পারে
দাঁড়াইয়া এখন প্রতীক্ষা করিতেছি
উত্তরণ।

জীবন-মৃত্যু-সঙ্গমে একা
বাই তরণী;
বাগর হইয়া গিয়াছে সুমুখে
বৈতরণী।

কতটুকু তার চোখে পড়ে হায়,
ঢাকে, আসমানি নীল পর্দায়,
ওই কিনারায় শেষ হয়েছে কি
এই ধরণী?

ডুবু-ডুবু করে মুকুতা-স্বচ্ছ
তারার মণি,
একি ঝড় এল, শুনি বজ্রের
জয়ধ্বনি।

ঘনাইয়া আসে দরদিয়া রাতি,
নিবে জীবনের কর্পূর বাতি,
বাজে বাগেশ্রী রাগিণীর সুরে
বিসর্জনী।

মাথার উপরে ঝরে মেঘেদের
অশ্রুজল,
চোখ থেকে মোর কে করিল চুরি
মায়া কাজল।

যার ছলনায় লেগেছিল ভালো
এই মর্ত্যের সূর্যের আলো,
করে গো ইশারী ছেড়ে গেছে যারা
মাটির কোল।

হেরি পিছ টানে রাত্রি যেখানে
চন্দ্রবতী,
কোন্ যাদুকরী ভেঙে দিল মোর
ছন্দযতি।

আধ-মীন-নারী মঞ্জুমালায়
জড়ায়ে টানিছে বন্দীশালায়,
নেপথ্যে হেরি হানে কটাক্ষ
সে ভানুমতী

ঝুটা আনন্দ, সিন্ধুর মাথা
মুক্তাহার,
জয়-পরাজয় প্রীতি প্রহসন—
সব আঁধার।

কোন রসায়নে মাটি-জলে-গড়া
এই দেহ হেন রঙে রসে ভরা?
জাগে দূর স্মৃতি জনমান্তর
সংস্কার।

কত যৌবনে কত শী-রচনা,
পত্র-লেখা,
ছত্রগুলি সে কষ্টি পাথরে
স্বর্ণ-রেখা।

অভিসার-বাঁশী ডাকে বারে বার,
থামে যদি কভু ঝঙ্কার তার,
সঙ্কেত-সুরে কেহ কারে আর
দেবে না দেখা।

কত না অতীত চিতায় পড়িয়া
চিহ্নহারা,
পরপারে তারা মৌন ভাষায়
দেয় গো সাড়া;

রুদ্র ডঙ্কা বাজে দিক ভরি
বধির ছবিরা উঠিল মুখরি'—
'যেথা বন্ধন সেথা ক্রন্দন—
অন্ধ-কারা'

ছুটি দাও তবে হে বসুন্ধরা,
প্রণমে মন,
পিয়েছি তোমার বিদ্যুতে মধু-
নির্ঝরণ।

মৃত্যু হাসিয়া প্রসাদ বিতরে,
কাঁপে থর থর বুকের ভিতরে,
কই গো তরণী—কোন কূলে শেষ
উত্তরণ?

আপনাদের প্রীতিধন্য
শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়
৩০শে আগষ্ট, ১৯৫৩

পো: বড়িশা
কলিকাতা-৮
ইং ৬।৬।৫২

প্রীতিভাজনেষু,

আপনার পত্র পাইয়া আনন্দিত হইলাম। আপনাকে ভুলিয়া যাইব কেন? শ্রীরামপুরে আপনার গৃহে সেই আতিথ্য—গৃহিণীরও অতিথি সেবা, বড় ভাল লাগিয়াছিল। তাছাড়া সচ্চিদানন্দ প্রায় দেখা করিতে আসে। অতএব আপনারা আমার আত্মীয় বন্ধুর মত।

আপনি "বাংলা ও বাঙালী" পড়িয়া মুগ্ধ হইয়াছেন, তার একমাত্র কারণ আপনি বাঙালী। এবং আমি আপনাকে আপনার পিতৃকুল ও পিতৃ-ধর্মের কথা শুনাইয়াছি। কোন্ মানুষের তাহা শুনিতে ভালো না লাগে? আমিও ঐ বইখানিতে আমার পিতা, পিতৃভূমি ও পিতৃধর্মের জয়গান করিয়াছি এবং ধন্য হইয়াছি। আর দুইখানি গ্রন্থে আমি বাংলা ও বাঙালীর গৌরব কীর্তন করিয়াছি—"বাংলার নবযুগ" ও "জয়তু নেতাজী" এই তিনখানি বই আমি আমার স্বজাতির চৈতন্য সম্পাদনের জন্য লিখিয়াছি; কিন্তু এ জাতির নিদান-কাল উপস্থিত —বাঁচিবার বা বাঁচাইবার কোন আশা আর নাই। সব চেয়ে দুঃখ এই যে, আর কেহ তাহা দেখিল না। দেখিয়া এক ফোঁটা চোখের জলও ফেলিল না। শেষ কয়টা দিন আমি বড় দুঃখ পাইয়া গেলাম, কেন যে এতদিন বাঁচিয়া রহিলাম তাহা বুঝিতে পারি না।

কিন্তু এইবার আমার সময় হইয়াছে। আমি আর বেশিদিন বাঁচিব না। দেহ একেবারে ভাঙিয়াছে। বোধহয় খুব শীঘ্র হঠাৎ বিদায় লইব। আমি কি অবস্থায় যাত্রা শেষ করিতেছি তাহা কেহ জানে না। এ অবস্থাতেও

লেখনী ত্যাগ করিবার উপায় নাই। দেশের কাছে আমি কিছুই চাহি নাই। আমি শ্মশানে বসিয়া শিবের আরাধনা করিয়াছি, তাহাতে কোন কামনার কথা নাই, থাকিলে সত্যকে হারাইতাম। শ্মশানে শিয়াল কুকুর থাকে, তাহারা চিৎকার করে, করিবেই। আমি তাহাতে কিছুমাত্র বিচলিত হই না। কেবল যখন আমার গুরুকে, আমার সেই শিবকে, সত্যকে অপমান করে তখন মুখে অভিশাপ আসে, কিন্তু তাহাও ক্ষণিকের দুর্বলতা। জানি, আমার গুরুর তাহাতে কিছুই হয় না, কেবল উহাদের অকল্যাণ হয়। কিন্তু কাহারও নিকটে যেমন কিছুই চাহিবার পাইবার নাই, তেমনি অভিশাপ দিব কাহাকে? সকলেই তো মরা। দেশ বাঁচিয়া থাকিলে, আমি আরও কিছু দিন হয়তো বাঁচিতাম। দুই তিনটা কাজ বাকি ছিল—শেষ করিতে পারিতাম। কিন্তু তাহার বোধহয় আর প্রয়োজন নাই;—কাহার জন্য?

"বঙ্গভারতী"র কথা লিখিয়াছেন। উহার ভিতরকার কথা কৌতুককর। আমি উহার কিছুরই সংবাদ রাখি না, কেবল ভিতরকার লেখাগুলি ঠিক করিয়া দিই। আমার এই অবস্থায় কোন পত্রিকার ভার লওয়া অনুচিত এবং অসাধ্য। তবু পাঁচজন অতি নিকট ভক্ত ও শিষ্য আমাকে জোর করিয়া উহাতে সম্মত করিয়াছে, যে ব্যক্তি উহার প্রকাশক সে আপন বুদ্ধি ও ইচ্ছামত উহার আকৃতি এবং মূল্য প্রভৃতি স্থির করিয়াছে---লোকসান সেই দিকে, কাজেই আমার কোন কথা কহিবার যো নাই। আমার সঙ্গে কোন সম্পর্কই নাই। তবু কেন যে আমি আমার আত্মমর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করিয়া ঐটুকু দায়িত্ব লইয়াছি, তার কারণ—তবু দুইটা কথা মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিব। এ কয় বৎসর আমার মুখ একেবারে উহারা বন্ধ করিয়া দিয়াছে, তাহা বোধহয় আপনারা লক্ষ্য করিয়াছেন। দেশের কোন সুপ্রচারিত পত্রিকায় আমার একটি লেখাও প্রকাশিত হয় না, আমাকে উহারা বয়কট করিয়াছে। ইহার মূলে আছে সজনীকান্ত দাস। সেই কলিকাতার সমস্ত পত্রিকা ও প্রেসকে শাসন-দমন করিতেছে, এবং গভীর জলে ডুবিয়া থাকিয়া আমাকে সর্বপ্রকারে বিনাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছে ও করিতেছে। অথচ কেহই তাহা সন্দেহও করে না। এমনই কূটকৌশল তাহার। আমার মৃত্যু না হইলে সে স্বস্তি পাইবে না। 'বঙ্গভারতী' টিঁকিবে না। উহার বিজনেস পলিসী একদম আত্মঘাতী। কিন্তু আমার কথাও শুনিবে না। আমিও সম্ভবতঃ উহা শীঘ্র ত্যাগ করিব, তার প্রধান কারণ, আর আমি পারিতেছি না। একে আমার মৃত্যুকাল উপস্থিত, তার উপর এত প্রতিকূল অবস্থার সহিত লড়িতে হইলে আমি এক মুহূর্তও বাঁচিব না। এখনই 'বঙ্গভারতী'র বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ আসিতে সুরু হইয়াছে।

আশা করি আপনি সপরিবারে কুশলেই আছেন। আমার প্রীতি-সম্ভাষণ ও শুভ কামনা জানিবেন।

ইতি আপনাদের

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

বড়িশা পোঃ
কলিকাতা-৮
ইং ২০।৬।৫২

প্রীতিভাজনেষু,

আপনার পত্র পাইলাম। আমার প্রতি আপনার এই স্নেহ ও শ্রদ্ধা আপনারই অন্তরের শুচিতা ও আদর্শ-নিষ্ঠার পরিচায়ক, নইলে আমার ব্যক্তিগতভাবে প্রাপ্য কিছুই নাই। সাহিত্য-সেবা আমার অধ্যাত্ম-সাধনার সত্তায়, বিলাস নয়, খ্যাতি প্রতিপত্তি বা অর্থ লাভের উপায় উহা নহে। এইটুকু বিশ্বাস যদি রাখিতে পারেন, তাহা হইলেই ধন্য হইব। তারপর, আমি কি করিতে পারিলাম—শেষ পর্যন্ত এই সব গ্রন্থের কোন মূল্য থাকিবে কি না সে চিন্তা করি না, কারণ আমি দৃঢ় বিশ্বাস করি—উহা আমার গুরুনির্দিষ্ট কাজ—আমার কাজ নয়; অতএব, উহার জন্য তিনিই দায়ী। এবং ইহাই ভাবি, যাবজ্জীবন এই যে আমাকে তিনি ঐ যন্ত্রের যূপকাষ্ঠে বাঁধিয়া রাখিলেন, তাহাতে আমার কি লাভ হইল—আমার আত্মার কোন শান্তি, কোন্ সুস্থতা আমি লাভ করিলাম। আমার তিনি কি করিলেন।

'রবীন্দ্র-কাব্যে'র আপনি যে পরিচয় ঐ পত্রিকায় মুদ্রিত করাইয়াছেন—তাহাতে প্রকাশকের উপকার হইবে, কারণ বিজ্ঞপ্তিটি ভাল হইয়াছে। ঐ গ্রন্থ---একটা এমন বস্তু যে, উহার সমালোচনা খুবই দুরূহ। উহাতে রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভা ও তাঁহার কাব্য-দৃষ্টি দুইয়েরই সম্পূর্ণ নূতন ব্যাখ্যা ও পরিচয় করা হইতেছে---যাহা এ পর্যন্ত কেহ করে নাই---করিতে পারে না; বরং এমনই সংস্কার বিরুদ্ধ যে, কিছুতে উহা কেহ গ্রহণ করিবে না। আমি উহাতে যাহা করিয়া গেলাম তাহা সমগ্র বাংলা সাহিত্য-সমালোচনার যুগান্তর আনিবে; কিন্তু এখনই নয়, এই মোহের অবস্থা কাটিয়া গেলে। আপনাদের সহিত সাক্ষাৎ আলাপ-আলোচনায় আশা করি কথাটা একটু বুঝাইয়া বলিতে পারিব। আপনি আমার এখানে আসিবেন বলিয়াছেন—কলিকাতায় তো প্রায়ই আসেন, মাঝে মাঝে আর একটু কষ্ট করিয়া আমার এখানে আসিলে সুখী হইব। সোমবার ও শনিবার বাদ দিয়া, যে কোনদিন বেলা ৩টা হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত আমাকে পাইবেন।

ইতিমধ্যে 'বঙ্গভারতী' লইয়া এই শারীরিক ও মানসিক দারুণ পীড়িত অবস্থায়—কি যে বিপদে পড়িয়াছি এবং কি অনিশ্চয়তার মধ্যে আছি, তাহা আপনারা কল্পনা করিতেও পারিবেন না। আমার মনে হয় উহাই সাক্ষাৎ মৃত্যু শেল হইয়া উঠিবে। আমার Bloodpressure ভয়ানক বাড়িয়া গিয়াছে এখনও বুঝিতে পারিতেছি না—উহা গুরুর নির্দেশ, না শনির নিগ্রহ। ঐ পত্রিকা লইয়া ভিতরে তো দুর্গতির একশেষ, তার উপরে আমার পিছনে যে কুকুর ও শেয়াল দল বাঁধিয়াছে, তাহারা নাকি আবার তাহাদের সেই বিষ্ঠাভাণ্ড হইতে বিষ্ঠা ছড়াইতে থাকিবে। আমাকে এবার তাহারা চরম শাস্তি

দিবে। ব্যক্তিগতভাবে আমার তাহাতে কোনরূপ রাগ বা দুঃখ নাই তাহা আপনি জানেন। কিন্তু এতবড় একটা পাপ শহরের চৌমাথায় দাঁড়াইয়া এমন আস্ফালন করিতে পারে---দেশের যত সাহিত্যিক ও কবি তাহাদের পৃষ্ঠ-পোষক---এই কথা ভাবিয়া আমার Bloodpressure বাড়িয়া যায়। আমার অপরাধ---আমি 'বঙ্গভারতী'তে উহাদের শয়তানী ধরাইয়া দিয়াছি। বড় ওস্তাদ যিনি তিনি আড়ালে আছেন ---ছোটটি চারিদিকে হুঙ্কার করিতেছে। সে মনে করে, বাংলা সাহিত্যে তার চেয়ে বড় কেহ আর নাই। আমার শরীর বড় দুর্বল, যে রোগ-যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি, তাহাতে এই যাহা এখন করিতেছি, তাহাই আশ্চর্য্য। কিন্তু এই শরীরেও এতবড় পাপকে তো প্রশ্রয় দিতে পারিব না। তাই ভয় হয়, উহাতেই আমাকে শেষ করিবে।

আপনি আমার প্রীতি সম্ভাষণ ও শুভকামনা জানিবেন। ইতি—

আপনাদের
শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

১৮৩, ল্যান্সডাইন রোড
কলিকাতা-২৬
১৮।১১।৪৯

প্রীতিভাজনেষু,

আপনার দুখানা চিঠিই পেয়েছি। 'বনফুল সাহিত্য সমিতি'র পক্ষ থেকে আপনি যে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন সেজন্যে খুব গৌরব বোধ করছি, আপনাকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

কিন্তু আজকাল আমার শরীর অসুস্থ বড্ড; যেতে পারছি না---ক্ষমা করুন। এর পরে জানুয়ারী বা ফেব্রুয়ারী মাসে যেতে পারব আশা করছি। আপনাকে যথাসময়ে জানাব।

আপনাদের 'বনফুল' বইটি আমার খুব ভালো লেগেছে; এ সম্বন্ধে পরে বিশদভাবে আপনাকে জানাব। সম্প্রতি হাতে কোন কবিতা নেই; যদি লিখে উঠতে পারি---পাঠিয়ে দেব সম্ভব হ'লে আপনার অফিসে গিয়ে দেখা করব একদিন।

আপনার প্রথম চিঠি পেয়েই উত্তর দেব ভেবেছিলাম;—দেরী হয়ে গেল; কিছু মনে করবেন না। আশা করি ভালো আছেন। প্রীতি নমস্কার। ইতি

জীবনানন্দ দাশ

১৮৩, ল্যান্সডাইন রোড
কলিকাতা-২৬
১৭।১০।৫০

প্রিয়বরেষু,

শারদীয় 'বনফুল' ও 'নির্ণয়' পেয়ে খুব খুশী হয়েছি। অনেক ধন্যবাদ।

দুটো পত্রিকাই বেশ ভালো হয়েছে। 'বনফুলে'র সঙ্গে গত বছরই পরিচয় ছিল; কি রকম হবে আন্দাজ করেছিলাম কিন্তু 'নির্ণয়' পেয়ে বিস্মিত ও মুগ্ধ হলাম; আপনার সম্পাদনায় মাসে মাসে এ পত্রিকা বেরুবে জেনে খুব প্রীত বোধ করছি।

আপানাকে ইতিপূর্বে একটা চিঠি লিখেছিলাম এখনও উত্তর পাইনি। অধ্যাপক বিনোদবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পটা আগামী মাসের 'নির্ণয়ে' যাবে লিখেছিলেন;—আমিও ওঁকে সেই কথাই জানিয়ে দিয়েছি। শারদীয় 'দেশে'র জন্য লেখা কবিতাটির কি হল বুঝতে পারলাম না। আপনার চিঠি পেলে খুশী হব। কবে আসতে পারবেন। আশা করি ভালো আছেন? প্রীতি নমস্কার। ইতি—

জীবনানন্দ দাশ

রসা রোড সাউথ, কলিকাতা-৩২
২০শে সেপ্টেম্বর, '৫১

ভাই অমিয়,

আমার এখনই একটা কর্ম, ধর্ম ও জীবনেতে সঙ্কট কাল এসেছে, যাতে নিজের চেষ্টায় কোন দিকে কিছু করতে না পেরে দিবা রাত্র কেবল এই কথাই ভাবছি যে, আমার নির্ধারিত দিন ফুরিয়েই এসেছে হয়তো এটা তারই লক্ষণ, তাই আমার সৃষ্টা যেন আমার প্রতি বিমুখ হয়েছেন।

শরীর যেভাবের খারাপ, ঐভাবের খারাপ শরীর নিয়ে অনেক কাজই তো করেছি, আগেও যেমন এখনও তেমনি করছি। এখন কেবল কোথাও যাওয়া-আসাটা বন্ধ করেছি; কেউ আহ্বান করলে কখনও প্রত্যাখ্যান করি না, তাঁরই নির্দেশ বলে মেনে চলি। যখন গ্রহ-নক্ষত্র জীবনে আমার নিম্নগামী তখন (তোমার ভাষাতেই বলি) কোন কাজই তো সিদ্ধ হবার নয়; কাজেই বর্তমান কালে ঐ পুরোন ছবিগুলি বোসে বোসে ফিনিস্ করাই ভালো কাজ। তাই করি, আর কখনও কখনও একটু পড়াশুনা করি। ব্যস্ এই ভাবেই উৎসাহহীনতা উপভোগ করছি। একদিন যদি আসো তাহলে খুব ভালই হয়; কিন্তু কর্ম সমুদ্রে যে হাঁপাই ছেড়েচ তার সেই কর্ম ছাড়া আর সময় কোথা? কাজেই তোমার মনোমত কাজের সম্ভাবনা না থাকলে তুমি কোথাও বৃথা যাবে না এটাও হিসাব করে রেখেচি কিন্তু তবুও এমন কথা তোমায় দিতে পারচিনে যে এখানে এলে তোমার সময় নষ্ট হবে না। মাঝে মাঝে কথা কইতে ইচ্ছা হয়,—এই-টুকুই আমার কথা। অবশ্য, আমার রাজা কখন কিভাবে এসে কোন প্রেরণা দেবেন, কি করে ফেলবো তার তো ইতি নেই। অতএব হে বন্ধু! সময় থাকতে সুযোগের যথাশক্তি সদ্ব্যবহার করে নাও। আর বেশী কিছু বলবার নেই। ইতি—

প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়

পুঃ—দাদা, না হয় প্রমোদবাবু, এ ছাড়া আর কোন সম্ভাষণ চলবে না, আগেই সেকথা বলেচি। আমার মাথা খারাপের প্রমাণ এই যে পঞ্চাশটা পোষ্ট কার্ডে কাল তোমায় একখা ন পত্র দিয়েছি। আজ সেটা ফিরে এলো insufficient postage-এর জন্য, কাজেই আবার পর্য্যাপ্ত দণ্ড দিয়ে বাঁচি।

দি ইউনিভার্সিটি
লাক্ষ্ণৌ
১২।৮

প্রীতিভাজনেষু,

আপনার চিঠি পেলাম। পাঠকের প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া লেখকের পক্ষে স্বাভাবিক---তার ওপর যে পাঠকের

ভাল লেগেছে ও যে লেখকের রচনা দুর্বোধ্য বলে পরিত্যক্ত হয়।

এ দেশে পত্রিকা চালান খুবই কঠিন। দু একটি পত্রিকা ও একটি সমিতির ভার গ্রহণ করায় দুঃসাহসিকতা প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু এই প্রকার দুঃসাহস ভাল লাগে আমার। তার মধ্যে একটা ক্ষতিপূরণের মোহ আছে।

শিক্ষক সম্প্রদায়ের কর্মদক্ষতা নিতান্তই অপরিণত। অনেক মাসিক পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আছি; কিন্তু কোনটি কখনও চালাইনি। সমিতির বেলাতেও তাই। আপনার আত্ম-বিশ্বাস যেন আত্মপ্রসাদের নামান্তর না হয়।

নতুন কবিতা সম্বন্ধে কিছু লিখিনি তার কারণ ছিল অনেক। আবার পড়লাম। অবশ্য অন্য কবির ছায়া পড়েছে। তাতে আপত্তি করি না। অনুকরণটা সৃষ্টির অন্তরায় নয়। ভাল জিনিসের বিস্তার হবেই। বিস্তারের আকারকে যদি তরঙ্গ মনে করেন তবে একটি লহর অন্য একটি কেন্দ্র থেকে প্রসারিত লহরের সঙ্গে ধাক্কা খাবেই খাবে এই সুসম্বদ্ধ জগতে। দুই লহরের আঘাতে জল উঠবে ফুলে। তখন তার চূড়াই হবে নতুন সৃষ্টির কেন্দ্র।

আমার বক্তব্য তা নয়। বক্তব্য লিখলাম, আপত্তি লিখলাম না। গদ্য কবিতা উপভোগ করি. কিন্তু ভাল গদ্য কবিতার মধ্যে discriminate করবার কোনো critical principle খুঁজে পাইনি। রবীন্দ্রনাথের নতুন বই 'ছন্দ'তে একবার ঝোঁক দিয়েছেন content-এ আবার কোথাও form-এ। গদ্য কবিতার লক্ষ-লক্ষ রূপ যখন হতে পারে, এবং আমার মতে form অনেক সময়েই যখন পাঠকের আরোপ ও দান তখন form-এর মধ্যে কোন স্থায়ী principle পাই না, কেবল এইটুকু ছাড়া যে তার গড়ন হবে আঁট-সাঁট, পুরুষালী, tomboyish পর্য্যন্ত বলতে পারেন। অবশ্য পুরুষালী ম্যাকামী ছাড়া। আমার মনে হয় গদ্য কবিতার বিষয়ই প্রধানতঃ ভিন্ন। আরো প্রভেদ আছে নিশ্চয়।

আপনাদের কবিতাগুলি পড়ে মনে হোলো যে আপনারা এখনও poetically minded। এ অবস্থা লোভনীয় কি? এতে শেষে কবিতাও হবে না, গদ্যও হ'য়ে যাবে পানসে। এখন অবশ্য সুখপাঠ্য।

অত্যন্ত সঙ্কোচের সঙ্গে লিখলাম। আপনি রিপণের ছাত্র। আমিও ছিলাম। আমাদের সময় অন্য রকম ছিল। এখন কেমন জানি না। তবে বুদ্ধদেব, বিষ্ণু রয়েছেন—রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এখনও অধ্যক্ষ। তাঁদের মতামত গ্রহণ করুন না? অত্যন্ত মূল্যবান বলতে পারি।

লেখা? কি লিখব? কিছুই মাথায় আসছে না। এখানে বন্যা হয়েছে। সহরের বন্যা দেখে খুশী হলাম। এ-সহরের একমাত্র গোমতীতেই বহতা এল তাও ১৩ বৎসর পরে। গোমতীর ওপর কৃতজ্ঞতা আসছে।

ধূর্জ্জটিপ্রসাদ

ইউনিভার্সিটি কোয়ার্টার্স

লাক্ষ্ণৌ

সম্পাদক মহাশয়,

আপনাদের 'বনফুল সমিতির' কাছে একটি প্রস্তাব আছে। যে কালে আপনাদের সমিতির আমি সভ্য নই, তখন অবশ্য প্রস্তাব উপস্থিত করবার অধিকারী নই। কিন্তু আপনারা সাহিত্য-রসিক, অতএব সাহিত্য সংক্রান্ত কোন নির্দেশই আপনাদের কাছে ঐ সামান্য কারণে তুচ্ছ নয়। তাই নিবিঘ্নে নিবেদনটি জানাচ্ছি।

প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের বাংলা সাহিত্যে দান অনেক। তাঁর স্থান সম্বন্ধে মোটামুটি সকলেই একমত। ভাষার মোড় ফিরিয়েছেন, এবং তাকে একত্রে রসাল বলিষ্ঠ করেছেন। অথচ বাঙালী পাঠক-পাঠিকা তাঁকে যথার্থ সম্মান দেখায়নি। এতে তাঁর লাভ ক্ষতি না হোক আমাদের মূল্যজ্ঞান প্রমাণিত হয় না।

তাই আমার অনুরোধ যে আপনারা একটা সভা করে তাঁকে সম্মান দেখান। কোলকাতায় সমিতি বসেছে তাঁরা বিরাটভাবে আয়োজন করেন; কিন্তু অপেক্ষাকৃত ছোট সহরে কেন সভা ডাকা হবে না। আমার অভিজ্ঞতায় এই বলে যে ছোট সহরই, বিশেষতঃ শ্রীরামপুর, কৃষ্ণনগর, রঙ্গপুর, রাজশাহীর মতন স্থানেই সাহিত্য-রস ঘন হয়।

আপনাদের সমিতি যদি এই কাজটি গ্রহণ করে, তবে আমার বিশ্বাস যে সুচারুরূপেই তার সমাধান হবে। মে-মাসের ১।২ তারিখ পর্য্যন্ত আমি এখানে থাকব, তারপর কোলকাতায়, অতএব এইখানেই উত্তর দেবেন। আপনাদের সমিতির মঙ্গল কামনা করছি।

ইতি—

ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

শ্রীশ্রীদুর্গায় নমঃ

বহরমপুর (বাংলা)

১৩।২।৫১

সবিনয় নিবেদন,

কল্য আপনার পত্র পাইয়াছি। ভগ্নী নিরুপমার তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে লইয়া এই সব তর্ক-বিতর্কের মধ্যে জড়াইয়া পড়িতে আমি এখন অক্ষম, অতএব এ বিষয়ে বিশেষ কোন তথ্য আমি এখন দিতে পারিব কিনা বলিতে পারি না।

আপনার পত্রের প্রথম প্রশ্ন এই যে, শরৎচন্দ্র আমার ভগ্নীর কোন লেখা কখনো দেখিয়া গিয়াছেন কিনা? শরৎ দাদার সঙ্গে আমার ১৭।১৮ বছর বয়সের সময় প্রথম আলাপ, তখন আমরা ভাগলপুরে থাকিতাম এবং শরৎদাও এক পাড়াতে থাকিতেন। আমাদের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ আলাপ তখনই হয়। সেই সময় আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলিয়া একখানা হাতের লেখা কাগজ বাহির করি। শরৎ-দাদার মাতুল গাঙ্গুলী গোষ্ঠির সঙ্গে ঐ সময় আলাপ হয়। ঐ সময় শরৎদাদার হাতে লেখা অনেক গল্প আমরা পড়ি। আমরা যে কাগজ হাতে লিখিয়া নিজেদের মধ্যে প্রচার করি তাহাতে ভগ্নী নিরুপমাও লেখা দিতেন। শরৎচন্দ্র সেই সময় আমাদের এই সাহিত্য সাধনার প্রথম উষালোকের পথ প্রদর্শক ছিলেন। কিন্তু আমাদের কাহাকেও তিনি হাতে ধরিয়া লিখিতে

শেখান নাই। নিরুপমা আমাদের বহু পূর্বে অতি বাল্যকাল হইতেই কবিতা এবং গল্পাদি লিখিতেন। তবে আমাদের পত্রিকায় যখন যে লেখা বাহির হইত তাহা শরৎচন্দ্র দেখিতেন এবং আমাদের বন্ধু সভায় সমালোচনা করিতেন। তাই বলিয়া এ কথা কেহই বলিতে পারে না যে তিনি কাহাকেও নিজের ভঙ্গিমায় লিখিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। তারপর অনেক দিন পরে নিরুপমার লেখা যখন কাগজে বাহির হয় তখনো শরৎচন্দ্র সাহিত্যাকাশে অনুদিত। নিরুপমার যে পরিবারেজন্ম হইয়াছিল এবং লালিত-পালিত হইয়াছিলেন সে পরিবারে সে সময় অপর পুরুষের সঙ্গে অন্তঃপুরিকা-গণের আলাপ আলোচনা সম্ভব ছিল না—তবে নিরুপমার লেখা খাতা এবং কবিতা আমার এবং আমার দাদাদের বন্ধু মহলের সকলেই যেমন দেখিতে পাইতেন শরৎচন্দ্রও তেমনি দেখিতেন।

নিরুপমার কোনো লিখিত গল্প তিনি যে বিশেষভাবে দেখিয়া সংশোধন করিয়া দিয়াছিলেন তাহা আমার মনে হয় না। তবে আমার একখানা অপ্রকাশিত উপন্যাস তিনি কিছু দিন রেঙ্গুনে নিজের কাছে রাখিয়াছিলেন। কিন্তু কোনরূপ সংশোধন না করিয়াই আমায় ফিরত পাঠান।

শরৎচন্দ্রের লেখার সহিত নিরুপমার লেখার 'বিষয়' ও 'ভঙ্গী' উভয়ের পৃথক। অতএব শরৎবাবুর নিকট নিরুপমার সাহিত্যিক ঋণ খুবই কম। তবে তাঁহার সহিত আমাদের পরিচয় খুবই ঘনিষ্ঠই ছিল। শরৎদাও শেষের দিকে দু একবার আমার এই বহরমপুরের বাড়ীতে আসিয়াছিলেন এবং সেই সময় শরৎদার সহিত মুখোমুখি নিরুপমার কথাবার্তা হয়। তৎপূর্বে সাক্ষাৎভাবে কথাবার্তা হইয়াছিল কিনা সন্দেহ। নিরুপমা যখন সভা সমিতিতে যোগ দিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন তখন তাঁর বয়ক্রম প্রায় ৪০-এর কাছাকাছি হইয়া-ছিল। তবে শরৎবাবুর লেখার উপর আমাদের সকলেরই যেমন শ্রদ্ধা ও ভাল-বাসা ছিল নিরুপমার ততটা না হউক বেশ কিছুটা ছিল। কিন্তু তথাপি শরৎবাবুর চরিত্র সৃষ্টির বিষয়ে নিরুপমা সময় সময় অত্যন্ত বিরূপ মতও প্রকাশ করিতেন।

শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবীর সহিত আমাদের অতি বাল্যকাল হইতেই পরিচয়। তাঁহার পিতৃবংশের সহিতও আমাদের প্রায় আবাল্য পরিচয়। অনু-রূপার সহিত নিরুপমার 'গঙ্গাজল' পাতানো ছিল। কিন্তু তিনি বা তাঁহা দিদিই যে নিরুপমাকে উপন্যাসাদি লিখিতে প্রেরণা দিয়েছিলেন একথা ঠিক নয়। নিরুপমা ১৪ বৎসর বয়সে বিধবা হন। কিন্তু তৎপূর্বেই তিনি কবিতা লিখিতেন, অবশ্য সে সব শৈশব কবিতা যেমন হয় তেমনি হইত। তখনো আমাদের বাড়ীতে রবীন্দ্র-নাথের কবিতার তেমন আদর হয় নাই। এই বিষয়ে বলিতে পারি শরৎচন্দ্রই আমাদের রুচির পরিবর্তন করিয়াছিলেন তাঁহারই সাহচর্যে আমাদের সবকটী বন্ধুরই রবীন্দ্র সাহিত্যে প্রবেশ লাভ হইয়াছিল। রবী জ্যোতিতে যেমন সে সময়কার বাংলার সকল নবীন সাহিত্যিক জাগিয়া উঠিয়াছিলেন আমাদের তরুণ মনও তেমনি জাগিয়া-ছিল। যদি কেহ আমাদের এবং সেই সঙ্গে নিরুপমার মনকে জাগাইয়া থাকে এবং অনুপ্রেরণা দিয়া থাকে ত সেই কবি "জগৎ কবি সভায় মোরা" যাঁহাকে লইয়া গর্ব করি।

তবু একথা বলিব যে, শরৎচন্দ্রের চারিদিকে তাঁহার উপগ্রহরূপে যদি আমাদের নাম হয় তাহাতে আমরা গর্ব অনুভব না করিয়া পারি না। কিন্তু নিরুপমা নিজে জীবনের দ্বারা সাহিত্য সাধনার দ্বারা এবং বিশেষভাবে সনাতন হিন্দুধর্মানুরাগিনী নারীর ভক্তিধর্ম সাধনার দ্বারা প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন যে, তিনি ঠিক কোনো কলা-জ্যোতিষ্কের উপগ্রহ মাত্র নহেন। তাঁহার লিখিত পুস্তকাদি পড়িলেই শরৎচন্দ্রের সহিত সর্ব বিষয়ে পার্থক্য অনুভব করা যায়। এ বিষয়ে আর বেশী কি লিখিব?

আপনার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর এইবার সংক্ষেপে দিতেছি। নিরুপমা তাঁহার স্বর্গতা মাতার সেবার জন্য শেষ বয়সে বৃন্দাবনবাসিনী হইয়া ছিলেন। কিন্তু ১৯৪৭ সালের পরে একবার তিনি বৃন্দাবনে অত্যন্ত অসুস্থ হন। তখন তাঁহাকে এখানে আনিয়া চিকিৎসা করিয়া বাঁচান গিয়াছিল। তারপর ১৯৪৯ সালে আবার মাতৃসেবার জন্য বৃন্দাবন যান। তারপর আমার মাতৃদেবী গত চৈত্র মাসে ধামপ্রাপ্ত হন। ইহার পর নিরুপমা এখানে ফিরিব ফিরিব করিতেছিলেন। গত আশ্বিন মাস হইতে তিনি অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়েন। এমন কি চিঠিপত্রও দিতে পারেন নাই। আমরা আমাদের একজন আত্মীয়ার নিকট হইতে পত্র পাইয়া জানিতে পারি যে, তিনি অসুস্থা তখন এখান হইতে আমার বিধবা ভ্রাতৃবধূকে এবং লক্ষ্ণৌ হইতে আমার মধ্যম পুত্রকে পাঠাইয়া তাঁহার সেবার বন্দোবস্ত করি। কিন্তু তাঁহার হস্তাক্ষর ব্যতীত এখানকার পোষ্ট অফিস ও ব্যাঙ্ক হইতে টাকা তুলিতে না পারায় আমরা বড়ই অসুবিধায় পড়িয়াছিলাম। সেই সংবাদ কোনো অত্যুৎসাহী সাংবাদিক পাইয়া নিরুপমার মৃত্যুর পর ঐ বিকৃত সংবাদ কাগজে ছাপাইয়া-ছিলেন। কথাটা সম্পূর্ণ আজগুবি। আমি তাঁহার চিকিৎসাদির জন্য এবং মৃত্যুর পর ঊর্ধ্বদৈহিক কার্যের জন্য সমস্ত ব্যয় নির্বাহ করি। ঐ মিথ্যা সংবাদের প্রতিবাদও যথেষ্ট হইয়াছে।

যাক্, পত্রখানা বড়ই হইয়া গেল। মনের রেগে অনেক কথাই লিখিয়া ফেলিলাম। ক্ষমা করিবেন।

নিরুপমার বয়স সম্বন্ধেও ভুল সংবাদ বাহির হইয়াছে। মৃত্যুর তারিখও ভুল। কিন্তু এই বৃদ্ধ বয়সে সেই সমস্তর প্রতিবাদ করিয়া আর কি করিব বলিয়া চুপ করিয়া আছি।

ইতি—

শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্ট

উকিলপাড়া

পোঃ বহরমপুর (পঃ বাংলা)

পুঃ

নিরুপমার

মৃত্যু তারিখ ৭ই

জানুয়ারী, ১৯৫১।

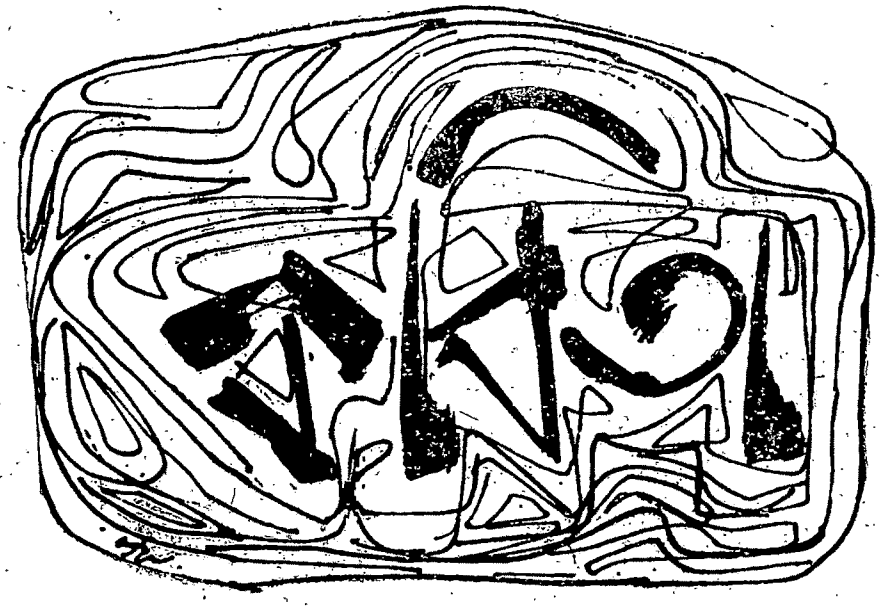

শ্রীশ্রীপূজা

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

অফুরন্ত এই যে পূজা হয় না সমাপন—
বিশুদ্ধ হয় দেহ এবং বিশুদ্ধ হয় মন।
আলপনা আর মুছে না যে
তোরণ চির-শ্যামল আছে,
কোথাও কালের কর্ স্পর্শ লাগে না নূতন
চিরন্তন।

আনন্দ এর মুক্তধারা অলকানন্দার,
পায় গড়িয়ে তীর্থ করে দুকূল দুটি পার্।
মহোৎসবের ও হিল্লোলে
জগৎ দোলায় হৃদয় দোলে,
পরিচিত ও কল্লোলই শুনি বারম্বার।

নরনারী দেবদেবী হয়, পূর্ণ সকল আশ।
অমর করে দেয় সকলে অমৃত উচ্ছ্বাস।
এই তো মণিকর্ণিকাতে
সিনান অর্ঘোদয়ের প্রাতে,
হয় সকল হিংসা ও দ্বেষ পাপের যে
বিনাশ।

পুণ্য শুচি জীবন দেবে বলারোগ্য সাথ,
জগন্মাতার মহামায়ার কৃপা নয়নপাত।
ঘুচে যাবে সব অরিষ্ট
সিদ্ধ হবে সব অভীষ্ট
পুনর্জন্ম লভি হবে মার্কণ্ডেয়-জাত।

তবে কেন

বিষ্ণু দে

দেখি সমতলে একাকার
তৃণাদপি সুনীচেন অভিন্নহৃদয়।
নিরাকারে সবই বুঝি বাস্তব আকার,
ভাবি হৃদ্যতায় হল সর্বজীবে
ত্রিকালবিজয়।

তবে কেন অভ্যাসের প্রত্যন্তপ্রান্তরে এই,
কার হাহাকার?

দীর্ঘ অনুষঙ্গে গড়া বিষঙ্গের ক্ষয়,
যে গঠনে লাভ আর ক্ষতি,
ওষ্ঠ ও অধর, কিংবা দু হাতের
অভিন্ন বলয়,
এক আর একে দুই এক আত্মরতি
মনে হয় সম্মিলিত দ্বিজের সংহতি।

কেন সমতলে মনে আচম্বিতে
রক্তমাখা বেঁধে কাঁটা-তার?

নিজের নিয়মে

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

তার কাছে একবার যেতেও পারি নি।
রত্নসিংহাসনে তার জীবন্ত বিগ্রহ
কেউ কেউ বলেছিল নয়নাভিরাম।
পাত্রমিত্র অমাত্যরা ছিল সন্নিধানে,
অন্তত সহজ ছিল নীরব কুর্ণিশ,
পদানত মন্ত্রমুগ্ধতায়।
আমি কিন্তু একবার কাছেও যাই নি।

ওরা প্রত্যাশায় ছিল। ওরা ভেবেছিল
অবশেষে কাছে যাব। অন্তত কুর্ণিশ
একবার করব তাদের। সৌখীন রাজার
পাত্রমিত্র বড়ো অল্প নয়। চারদিকে
নির্ধারিত করতালি অথবা ভীষণ
উচ্চকিত আরোপিত স্তুতি।
তবু একবার
আলোকিত সে সভায় যেতেও পারি নি।

নিজের নিয়মে আমি চলে যেতে চাই
ঋতুর উৎসবে, রুচিবোধে, আচরণে
নিজস্ব সত্তার ধ্বনি প্রতি উচ্চারণে।
নিয়ন্ত্রিত হতে এই
উদ্বেলিত শিল্পের সভায়
এখন আসি নি।
পরিশুদ্ধ, নির্বাচিত হয়ে
আমিও উৎসাহী শুধু
হৃদয়ের সংবেদনে
নিজের নিয়মে॥

আলোর মরাল

জগদীশ ভট্টাচার্য

দুর্যোগের মেঘঢাকা কৃষ্ণপক্ষ রাত ছিল কাল।
কালবোশেখীর ক্রোধ ক্ষিপ্ত ছিল পল্লী নিকেতনে
শেষবসন্তের কান্না ঝরেছিল নারিকেল বনে,
অশুভ কী আশংকায় বিশ্ব ছিল বীভৎস ভয়াল!
প্রসন্ন আকাশে আজ আনন্দিত এসেছে সকাল,—
সে যেন স্বর্গের শিশু, দুধে-দাঁতে হাসে ক্ষণে ক্ষণে
মর্ত্যবালিকার খুশি দোল খায় পুবালি পবনে;
দূরে শূন্যে উড়ে যায় শ্বেতশুভ্র আলোর মরাল।

'তুমি দূরে চলে গেলে জীবন আঁধার হয়ে আসে,'—
বলেছিলে কাল রাতে যন্ত্রণার বিষণ্ণ ভাষায়,
কপোলে মুক্তোর মালা ঝরেছিল বুকের আঁচলে।
আজ ভোরে ঘুম ভেঙে কণ্ঠ জাগে ললিতে বিভাসে,
অধর তৃষিত হয় কী নব-জীবন-পিপাসায়;—
প্রিয় দূরে চলে যায়, প্রেম তবু হাসে পূর্বাচলে॥

সনেট

সুধসত্ত্ব বসু

কালকে হঠাৎ দেখি কোথাকার আনাড়ী আরাম
আমার মেসের ঘরে জানালা ডিঙিয়ে রসিকতা
এঁকেছে বিচিত্র ঢঙে, হয়তো শিল্পীর কাছে দাম
তার আছে; শরতের রুপো রোদ কোন্ আকুলতা
বলয়িত আল্পনার মাধ্যমে সে এসেছে জানাতে?
প্রকৃতির আশীর্বাদ প্রসন্ন আমার প্রতি তাই
বর্ষার উদ্ধত জল ঝরে পড়ে খাটে বিছানাতে
গ্রীষ্মের উত্তপ্ত বায়ু জ্বালা আনে—প্রাণ আইঢাই।

এ ঘরে হঠাৎ কেন শারদীয় উল্লাসের ছোঁয়া,
উজ্জ্বল নরম রোদ বীড়াবতী বধূর মতনঃ
দেড়শ' টাকায় সেরে পুজোর বাজার যেতে হবে
বাড়ী ফিরে, বুড়ো মা-র বেড়েছে হাঁপানি, পুজো এল—
খোকাখুকু খুশির রেশমে মোড়া, আর প্রতীক্ষিত
গৃহিণীও—শ্রাবণের শেষে নব ফুটিয়ে কদম্ব!

ঝড় উঠলে

ধীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ঐ ঘরটায় ঝড় উঠলে
আকাশ মুখ কালো করে
সাত সমুদ্র তেরো নদী
কেমন যেন পাগল হয়ে যায়
নীল পাহাড়, আলো পাহাড়,
ঘুম পাহাড়
তিন পাহাড়ের চূড়া থরথরিয়ে কাঁপে।

ঐ ঘরটায় ঝড় উঠলে
দরজাগুলি জানলাগুলি
ভীষণ শব্দ ক'রে
কাঁদতে বসে,
চারদেয়াল কেবল মাথা খোঁড়ে
ঘরের মধ্যে টবের ফুল
বুকের বসন ছিঁড়ে ফেলে
তখন যেন আগুন গায়ে রক্তজবা।

ঐ ঘরটায় ঝড় উঠলে
এক সময় তিন ভুবন অন্ধকার,
এক সময় কান্নাগুলি
অবাক আলোয় হাসে॥

[২৪ আষাঢ়, ১৩৭২]

সন্ধ্যা

বাসব ঠাকুর

তোমাদের জনারণ্যে
নিধিরাম নায়কের দল
বীর সেজে ঘোরে
ময়দান বিদীর্ণ করে মাইকের জোরে।
কভু হাসে, কভু কাঁদে
কোটি কোটি বিভ্রান্ত মানব;
রবি আজ অস্তগত,
বিপ্লবের কবিও নীরব।

অন্নহীন, শিক্ষাহীন,
নির্দিষ্ট সীমানাহীন
হে আমার দেশ
তোমার নির্লজ্জ আঁধারে
সভ্যতার দৃপ্তশিখা
হবে কি নিঃশেষ!
বিদেশের প্রতিবিম্বে কৃষ্টির প্রদীপ এক
জ্বলে আজ তোমাদের ঘরে;
তারি মাঝে পতঙ্গেরা ছুটে এসে
পুড়ে পুড়ে মরে।

অন্ধকারে জমে ওঠে
শতাব্দীর ব্যর্থতার বাণী,
জীর্ণ দেবালয় হতে,
বিদায় নেবে কি বীণাপাণি?
রবি আজ অস্তগত,
বাকাহারা বিপ্লবের কবি।
সায়াহ্নের ম্লান আলো
ধূসর দিগন্তে আঁকে
কি করুণ হতাশার ছবি!

নিপুণ মৃগয়া

রামেন্দ্র দেশমুখ্য

খালরে বাঁশপাতা জ্যোৎস্না নিরুপম,
অভিসারে হরিণী আসে,
নূপুর নেই রাধা ঝামরে ঝমঝম্,
মনোহর কাজলে হাসে।

বনের নীলঘাসে পিপাসা নাচে নদী,
মদির জারুলের ফুল,
প্লাবিত জ্যোৎস্নায় যুবতী পায় যদি
হৃদয় শিকড়ের মূল।

রক্তকরবীর মায়াবী বুনো রাত
থাহাড়ী জ্যোৎস্নায় জ্বলে,
ব্যাকুল ব্যাধের শিশিরে ভেজা দাঁত
স্নিগ্ধ শিমুলের তলে।

আকাশে রোহিণীর জ্যোতির স্নেহময়
আলোর অস্ফুট তান,
পাতারা নির্জনে মেয়েলী কথা কয়
হাওয়াতে পরীদের গান।

হায়রে হরিণীর মরণ এল কাছে
বাঘের চোখে জ্বলে চাঁদ,
শ্যামলী প্রাণ তুমি জানো না কত আছে
নিপুণ মৃগয়ার ফাঁদ।

সন্ধ্যা দীপের শিখা

শ্রীমৃণালকান্তি দাশ

দুষ্টু বোন আজকে তুমি
কোথায় চলে গেলে,
আঁধার রাতের পাষাণ হৃদয়ে
কান্নার ডানা মেলে?

ভোরের আলোয় তাই তো আজ
হারিয়ে হাসি মুখ,
চাওয়া-পাওয়ার, হতাশ ব্যথায়
আজকে ভাঙ্গে বুক।

ওই ব্যথাতেই যুঝে যুঝে
হারান স্মৃতিগুলি,
সতেজ করে কান্নায় শুধু
ব্যথার টেনে তুলি।

জানি তোমার জীবনের যত
সাধ-আশার গান,
ফুটতে পেল না, যৌবনে শুধু
এনে আলোর বান॥

অমোঘ নিয়তির নির্দেশে শুধু
আগুন শপথ জেবলে,
ঊর্ধ্ব লোকেই হারিয়ে গেলে
নশ্বর দেহ ফেলে।

তবুও যেন স্মৃতির সাগরে
তোমার জীবন লিখা,
হৃদয় মাঝে জ্বালবে আমার
সন্ধ্যা দীপের শিখা।

স্মৃতির পাখীরা

বীরু চট্টোপাধ্যায়

স্মৃতির পাখীরা সব উড়ে উড়ে চলে।
কখনো দাঁড়েতে বসে
কখনো পুরণো কথা বলে।
সদা কাছে কাছে
হাসে গায় নাচে
আবার, কখনো সরে যায়—
দূর দিগন্ত নীলিমায়।

স্মৃতির পাখীরা সব কত কথা বলে।
কলকাকলীর রঙে
অবিরত বিলি কেটে চলে।
রঙিন কলাপে
দুরু দুরু কাঁপে
আবার কখনো তারা নামে
হৃদিপদ্ম ধামে
কুরে কুরে খায়
অন্তর বিষিয়ে ওঠে বিরণ ব্যথায়।

নিলিপ্ত

মাণিক মুখোপাধ্যায়

এলোমেলো চুল তার কপালে ছড়ানো
দীঘল দু'চোখ ভরা মমতার ঢেউ,
মুখখানি চেনা চেনা স্মৃতির কোঠায়
শতযুগ ধরে যেন আপনার কেউ।
কাছে ডাকি আসে না সে, নীরবে তাকায়
শূন্যপদে ফিরে যায় নির্জন নিলয়,
দিনে রাতে বিস্ময়ের কাজল মাখায়
ছুটে গেলে চকিতে সে মরীচিকা হয়।
তবু তাকে ভাল লাগে, ভালবাসি আরো,
হোক্ না সে সময়ের মরীচিকা ঢেউ,
বেদনার প্রতি পলে চেতনায় গাঢ়
আমি ছাড়া তাকে আর চিনিবে না কেউ।

সেই ভাল। তবু তাকে যত খুশি পারি
হৃদয়ের রঙে মেখে বলতে 'আমারই'॥

এখনো আমার প্রেমে

সুশীলকুমার গুপ্ত

এখনো আমার প্রেমে তোমার বিপন্ন উজ্জ্বলতা
হতে পারে দৃপ্ত নদী, পাহাড়ের নিরন্ত গুহায়
এখনো জাগাতে পারে পৌরাণিক প্রতিধ্বনি, কথা
ভেঙে ভেঙে যেতে পারে হৃদয়ের প্রসন্ন সীমায়।

শতাব্দীর অগ্রগতি তীক্ষ্ণধার ছুরিকার মতো
ক্রমশ গভীরভাবে ঢুকে যায় সত্তার পাঁজরে;
রক্তে রক্তে ভরে ওঠে স্মৃতিস্বপ্ন প্রার্থনা বিনত;
সেই সঙ্গে তোমাকেও দিনে দিনে কলঙ্কিত করে।

অভিশপ্ত নগ্ন নখে ছিঁড়ে যায় বুকের গোলাপ,
দৃষ্টির মানিকগুলি ছায়াচ্ছন্ন দীঘির গভীরে
কে নিয়ত ছুঁড়ে ফেলে, যৌবনের ঝাঁপি থেকে সাপ
দংশনে দংশনে বিষ ঢেলে দেয় উদাত্ত শরীরে।

এখনো আমার প্রেমে তোমার সার্থক উপস্থিতি
দিতে পারে বিশ্বাসের নির্ভুল ঠিকানা, খুঁজে খুঁজে
সৃষ্টির প্রতীকগুলি এনে সৎ ব্যঞ্জনার রীতি
নির্মাণে সক্ষম; ঢেউ দিতে পারে প্রাণের সবুজে।

সংক্ষিপ্ত আকাশবৃত্ত, মৃত্তিকার কণ্ঠে ফাঁস পড়ে;
এখনো আমার প্রেমে যেতে তুমি পার জন্মান্তরে।

দু'টি কবিতা

অমলকান্তি ঘোষ

নিজেকে লুকিয়ে

তোমার ঘরের পথে কটি ফুল কটি পাখী আছে।
তাদের বলেছ তুমি, "চুল, চুল, রূপ-স্বর নিয়ে
কখনো ডোকো না তাঁকে।"...বহুকাল গ্রামের বাহিরে
বাস করে নিজেকেই প্রায় তুমি ফেলেছ হারিয়ে।

যদি কেউ কোনদিন সারাপথ তোমাকেই খুঁজে,
অনেক তুণের শরে তোমার চলার রেণু দেখে
দুয়ারে দাঁড়ায় এসে, মনের নিভৃত সংশয়ে
তখন থেকো না ডুবে অভিমান-পীড়িত আবেগে।

আবিষ্কার

প্রথমে লেখেনি নাম, সেই ভেবে নেই অনুতাপ।...
প্রকৃত মানুষ হয়ে চপল-কোমল স্বরে কথা
বলে ছবিটির মুখে। অথচ কোণায় তার লেখা
নাম নেই, আঁকাবাঁকা আখরের নেই জটিলতা।
অপরূপ রেখাগুলি সেতারের সুরেলা আলাপ।
এবং হৃদয়ে তাঁর ভরা সুখ, নেই অনুতাপ।
"তোমার প্রাণের ছাপ এ ছবির প্রতিটি আঁচড়ে..."
—আবিষ্কারের খুসী অভিমানে হিম হয়ে আসে।
বিভোল মুখের বাণী, অথচ কিশোর-হাসি চোখে—
গিয়েছে অচেনা গ্রামে পথ চিনে আপন প্রয়াসে।

ফোনে—

মঞ্জুলিকা দাশ

গম্ভীর প্রত্যয়যুক্ত তোমার গলার স্বর আর্দ্র আন্তরিক
মনে হয় শুধু শব্দ সম্মুখীন বসে থেকে শুনি।
অন্ধকার দূর হয়ে মন হয় আলোকের মত
শ্রবণের প্রলেপনে স্নিগ্ধ হয় ক্ষত!

শান্তি এক পক্ষকাল পূর্ণিমার মত ঝরে অসুস্থ শরীরে
কণ্ঠস্বরে রোমাঞ্চিত তোমার হৃদয় নাকি, ইদানীং
আমার প্রণয়বোধ অত্যন্ত সজীব মনে হয়,
ভুলে যাই বিচ্ছেদের অনাগামী ভয়।
যন্ত্রণায় তীব্র কী সে জ্বালা বিষাণ-বিষাদ বাজে
সনির্বন্ধ প্রীতিময় সন্ধ্যাবেলা অন্তত অকাজে!

গম্ভীর প্রত্যয়যুক্ত তোমার গলার স্বর আর্দ্র আন্তরিক
সংশয়দ্বিধার হিম—অধিবাসী চিহ্নহীন করে।
অদ্ভুত প্রদেশ গড়ে এ জীবনে শান্তির প্রতীক।
অনির্বচনীয় সুধা অঙ্গে শিথিল মুঠিতে ভরে।

এক পক্ষকাল পরে অন্ধকারে দূরদর্শী আমি পরিণামী।
তোমার গলার স্বরে, অদর্শনে ফোনে অনুগামী
এমন আনন্দ হয় অসাক্ষাতে যেন নদীকে নিকটে টেনে
নিয়ে যাই জোয়ারের দিকে এ অবেলা
আমার জীবনে জাগে সমুদ্রের তরঙ্গের খেলা!
আশ্চর্য জিজ্ঞাসাযুক্ত তোমার গলার স্বর আমার রক্তের দুঃখ
—গেছে বুঝি জেনে!

সমর্পিতা

মায়া বসু

কাজলের অন্তরালে ঢেকে রেখে দু চোখের ভাষ
আমি শুধু চুপ করে থাকি।
প্রখর রৌদ্রের সব মুখরতা থেকে বহু দূরে
নির্জন ছায়ায় মুখ ঢাকি।

চৈত্রের প্রশান্তি দিয়ে মুছে নিতে চাই বার বার
বৈশাখের জ্বলন্ত গরিমা;
তোমারে ছাড়ায়ে যত যেতে চাই—পারি না—পারি না
অফুরাণ দু-বাহুর সীমা!

বিচ্ছুরিত দ্যুতি এক তোমার দৃষ্টিতে জেগে রয়।
চিরন্তন আলোর ইশারা
আমি এই অন্ধকারে হৃদয়কে প্রদীপ জ্বালিয়ে
জ্বলে জ্বলে পুড়ে পুড়ে সারা।

তোমারি দুহাতে আমি মুখ ঢাকি-নিজেকে লুকাই,
প্রসারিত দুই করতলে
অনুর্বর মৃত্তিকার বেদনার্ত বিসন্ন সংগীত
বেজে ওঠে সমুদ্র কল্লোলে।

একটি আশ্চর্য কণ্ঠস্বর

করুণাময় বসু

অনেক কাল আগে হারিয়ে যাওয়া একটি মুখের ছাঁচ
খুঁজে পেলাম এই কণ্ঠস্বরের ভিতর দিয়ে,
মনের ভাঙাচোরা কার্নিসে ভোরের আলোয়
এক ঝাঁক মনুয়া পাখি যেন ডানা ঝাড়া দিলো;
আশ্চর্য এই কণ্ঠস্বরের আমেজ!
কান পেতে শুনতে ইচ্ছে করে এই গাঢ় কণ্ঠস্বরের অনুরাগ,
নতুন কারা বুঝি এলো পাশের ফ্লাটে।
কে যেন হাসছে আর কথা বলছে,
সোনা গলান রৌদ্রে মুক্তার ঝিকিমিকি প্রাণ দিয়ে
খুসীর মালা গাঁথছে,
কার হৃদয়ে আলো হয়ে জ্বলবে, ছায়া হয়ে দুলবে
এই কথার পদ্মকলিঃ
হঠাৎ কানে এলো,
ঠিক পাঁচটায় ফিরবে কিন্তু, আমি জানলায় দাঁড়িয়ে থাকব।
একটা হাসিখুসী ভরা সুখী প্রাণ
মাতালের মতো জড়িয়ে জড়িয়ে নিচে নেমে যাচ্ছে,
শব্দের ঢেউ বাইরের রৌদ্রে দোল খেতে লাগলো,
ফুলফোটা হৃদয়ের প্রথম প্রহরে
বুকের রক্ত যেমন দোল খায় আশ্চর্য বিস্ময়ে।
সকালের সমস্ত আলো, বিকেলের সমস্ত ছায়া
এক হয়ে কাঁপতে লাগলো আমার হৃদয়ের
মোচড় দেওয়া ব্যথার কাছেঃ
একটা আশ্চর্য কণ্ঠস্বরে এতো মায়া!

বিষকন্যা

সুনন্দা দাশগুপ্ত

মদিরেক্ষণা রূপসী তোমার মনোমঞ্জীর হয়েছে কি চঞ্চল?
কমনীয় তব কপোতহস্তে ও পানপাত্র ভরা
দ্রাক্ষাদলিত বিকীর্ণদ্যুতি উচ্ছ্বলফেন সুরা।
বিহ্বল রাতে প্রতিটি প্রহর বাসনায় টলোমল।

দলিতাঞ্জন দীঘল দিঠিতে অরণ্যনীল ছায়া
ললাম ললাটে আধোবাঁকা ঐ চাঁদ,
ছলনামদির রঙীন হাসিতে কোন কুহকের মায়া—
রূপসি! তোমার নিবিড় চিকুরে রচেছ মোহের ফাঁদ।

তোমার রুচির তনুলাবণ্যে জোয়ারের মধুরিমা
নিটোল বাহুর প্রতি ইশারায় সর্বনাশের সাড়া।
অমোঘ অস্ত্রে পূর্ণ তূণীরে হয়েছ যে মনোহরা।
উত্তাল তব নৃত্যচপল চঞ্চল ভঙ্গিমা।

মোনালিসাহাসি ধমনিতে আনে ধ্বংসের গুঞ্জন,
সুচারু ও ছলে কৃষ্ণসারেরা হয়েছে যে উন্মন!

রবীন্দ্রসংগীতের তত্ত্বোপলব্ধি

শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস

রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রচার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অনুশীলনকারী ও অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিদের রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্বন্ধে জানবার স্পৃহাও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে। বিশেষতঃ রবীন্দ্রসঙ্গীত-শিক্ষার্থিগণ অগ্রসর পাঠক্রমে রবীন্দ্রসঙ্গীত-বিশেষজ্ঞের অধীনে বা বিশিষ্ট রবীন্দ্রসঙ্গীত-শিক্ষায়তনে শিক্ষাগ্রহণকালে রবীন্দ্রসঙ্গীতের তত্ত্ব সম্বন্ধে সম্যকরূপে অবগত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন। তত্ত্ব জানবার উৎসুক্য থাকলেও ক্ষেত্রবিশেষে বিধিবদ্ধ প্রণালীর অভাবে বিভ্রান্তির সম্ভাবনা দেখা দেয়। তার প্রতিকারের প্রচেষ্টায় সংক্ষেপে কিছু আলোকপাত করাই বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্যে। অবশ্য তত্ত্বের দিক থেকেই হোক আর ক্রিয়ার দিক থেকেই হোক রবীন্দ্রসঙ্গীতের যে উচ্চ স্তরে অনুসন্ধিৎসু শিক্ষার্থীর পক্ষে পৌঁছানো প্রয়োজন তা বিদ্যালয়গৃহের চতুঃসীমার মধ্যে স্বল্প কয়েক বৎসরে সম্ভবপর কি না তা স্বতন্ত্র আলোচনার বিষয়।

ভারতবর্ষের সঙ্গীতের ঐতিহ্য খুবই প্রাচীন। আমাদের সাহিত্য ও সঙ্গীতের উদ্দেশ্য মূলতঃ এক। সাহিত্যের মৌলিক বিভিন্ন ভাব প্রকাশ করা, সঙ্গীতেরও তাই, অবশ্য প্রণালী ভিন্ন। সঙ্গীত সাহিত্য সংশিষ্ট হলে অর্থাৎ সঙ্গীতে সুর ও বাণীর যোগাযোগ ঘটলে দুয়ে উভয়ে মিলিতভাবে ভাবপ্রকাশের দায়িত্ব বহন করবে এটাই আমাদের সঙ্গীতের মূল কথা। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ধারণা যে অত্যন্ত স্পষ্ট ছিল তাঁর উক্তিতেই তার প্রমাণ মেলে। তিনি বলেছেন:

"সুর অনির্বচনীয়ের প্রধান বাহন। কিন্তু মানুষ কেবল যে বাবহার্য সামগ্রীর সঙ্গেই অনির্বচনীয়কে প্রকাশ করতে চেয়েছে তা নয়, তার চেয়ে অনেক বেশি ব্যাকুল হয়ে চেয়েছে আপন সুখদুঃখ, ভালোবাসার সহযোগে। অর্থাৎ যে-সব শব্দ তার হৃদয়াবেগের সংবাদমাত্র দেয়, শিল্পকলার দ্বার তার মধ্যে সে অসীমের ব্যঞ্জনা আনতে চায়। আদিকাল থেকেই মানুষ তাই শব্দের সঙ্গে সুরকে মিলিয়ে গান গেয়েছে। এ কথা মানি, শব্দের নির্জেরই একটা শিল্প আছে, ছন্দ তার প্রধান অঙ্গ। কিন্তু ছন্দ তর্কলার নয়, গানেরও বটে। এ ছাড়া কাব্যের আছে বিশেষ তার শব্দ যোজনা ও শব্দ বাছাই। যা হোক, তবু দেখা গেছে মানুষ যেমন চেয়েছে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কাব্যকে তেমনি চেয়েছে গানকে। জানিনে ইতিহাসে কবে মানুষের ভাষা এমন অনাথা ছিল যখন সুর তাকে অবজ্ঞা করে তাকে পর বলে বর্জন করেছে।---চিরদিনই মানুষ কথার সঙ্গে সুর জড়িয়ে গান গেয়ে এসেছে—সুর বড়ো কি কথা বড়ো এ তর্ক ওঠেই নি। যদি নিতান্তই তর্ক তোলা হয় তাহলে আমি বলব এ ক্ষেত্রে সঙ্গীতই স্বামী, ভাষাকে সে আপন গোত্রে তুলে নিয়েছে। এই দাম্পত্যকে মানুষ চিরদিনই স্বীকার করে নিয়েছে আনন্দের সঙ্গে।"

রবীন্দ্রনাথ তাঁর দীর্ঘকালব্যাপী সঙ্গীত-রচনায় কথা ও সুরের মিলিত এই দাম্পত্য-সাধনাই করেছেন। তাঁর গানে কথা বড়ো কি সুর বড়ো এটা বিচার্য নয়, প্রধান লক্ষণীয় হল কথা ও সুর মিলিতভাবে কিরূপে ভাব প্রকাশ করছে। কথা ও সুরের অর্ধনারীশ্বর রূপই রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রধান তত্ত্ব, জানবার মৌলিক বিষয়। কথা ও সুরই হল রবীন্দ্রসঙ্গীত তত্ত্বের প্রধান কাণ্ড। তার কতকগুলি শাখা ও প্রশাখা আছে। সেই শাখা ও প্রশাখাগুলি অবলম্বন করে মূল কাণ্ডে আধিরোহণ করতে পারলে রবীন্দ্রসঙ্গীতের তত্ত্ব সম্বন্ধে ধারণা সহজে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অতঃপর প্রধান শাখা-প্রশাখা-গুলি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাক।

বিষয়বস্তু

রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানগুলিকে প্রধানতঃ ছয়টি পর্যায়ে ভাগ করেছেন—পূজা, স্বদেশ, প্রেম, প্রকৃতি, বিচিত্র ও আনুষ্ঠানিক। এই ছয়টি পর্যায়ের মধ্যে কয়েকটি বিষয়বস্তু অনুসারে পুনর্বিভক্ত হয়েছে, যাকে বলা যায় উপ-পর্যায়। তার মধ্যে পূজা ও প্রকৃতির উপপর্যায় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নিম্নের দৃষ্টান্ত তালিকায় এ প্রসঙ্গে বক্তব্য মোটামুটিভাবে উপস্থাপিত হল:

পূজা—

গান: গানের ভিতর দিয়ে যখন
বন্ধু: শুধু তোমার বাণী নয় গো
প্রার্থনা: অন্তর মম বিকশিত করো
বিরহ: বিশ্ব যখন নিদ্রামগন
সাধনা ও সঙ্কল্প: প্রতিদিন আমি হে জীবনস্বামী
দুঃখ: দুখের তিমিরে যদি জ্বলে
আশ্বাস: আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু
অন্তর্মুখ: এক মনে তোর একতারাতে
আত্মবোধন: দাঁড়াও মন, অনন্তরশ্মাগু মাঝে
জাগরণ: বিমল আনন্দে জাগো রে
নিঃসংশয়: জানি জানি কোন্ আদিকাল হতে
সাধক: নিভৃত প্রাণের দেবতা যেখানে
জাগেন একা
উৎসব: হৃদিমন্দিরদ্বারে বাজে সুমঙ্গল শঙ্খ
আনন্দ: তোমার আনন্দ ওই এল দ্বারে
বিশ্ব: আমার মুক্তি আলোয় আলোয়
বিবিধ: আরো চাই যে, আরো চাই গো
সুন্দর: ওহে সুন্দর, মরি মরি
বাউল: আমারে কে নিবি ভাই
পথ: এই আসা-যাওয়ার খেয়ার কূলে
শেষ: মধুর, তোমার শেষ যে না পাই

পরিণয়: দুইটি হৃদয়ে একটি আসন

স্বদেশ—

ও আমার দেশের মাটি

প্রেম:—

গান: চিত্ত পিপাসিত রে গীতসুধার তরে

প্রেমবৈচিত্র্য : একলা বসে হেরো তোমার ছবি
প্রকৃতি—
সাধারণ : একি আকুলতা ভুবনে
গ্রীষ্ম : দারুণ অগ্নিবাণে রে
বর্ষা : ওই আসে ওই অতি ভৈরব হরষে
শরৎ : মেঘের কোলে রোদ হেসেছে
হেমন্ত : হিমের রাতে ওই গগনের দীপগুলিরে
শীত : এল যে শীতের বেলা
বসন্ত : আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে
বিচিত্র—
এই তো ভালো লেগেছিল
আনুষ্ঠানিক :—
সবারে করি আহ্বান

গানের কাব্যাংশে ভাবের পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রসঙ্গীতের এরূপ পর্যায়-উপপর্যায়-বিভাগ বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ-সাপেক্ষ। উল্লেখযোগ্য যে, আনুষ্ঠানিক নামে যদিও স্বতন্ত্র পর্যায় আছে, কিন্তু বিভিন্ন অনুষ্ঠানের উপযোগী গান অন্যান্য পর্যায়েও ছড়িয়ে আছে।

উপরে যে ছয়টি পর্যায় সম্বন্ধে উল্লেখ করা হল, সমগ্র রবীন্দ্রসঙ্গীতসৃষ্টিকে তার আওতায় আনা চলে না। কেননা নাট্যবিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে বাল্মীকি প্রতিভা, কালমৃগয়া ও মায়ার খেলা গীতিনাট্য এবং চিত্রাঙ্গদা, চণ্ডালিকা ও শ্যামা নৃত্যনাট্য স্বতন্ত্রভাবে আলোচ্য। তা ছাড়া ভাষা ও তার স্টাইলের দিক থেকে ভানু সিংহের পদগুলিরও স্বাতন্ত্র্য আছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, ভানুসিংহের পদাবলী কতকগুলি খণ্ড খণ্ড পদ বা গানের সমষ্টি। তাতে নাট্যবিষয়বস্তুর কোনো ধারাবাহিকতা নেই, যেমন আছে গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্যগুলিতে। সেজন্য ভানুসিংহের পদাবলীতে নাট্যরূপ আরোপের প্রচেষ্টা নিরর্থক।

ভাববোধ

বিষয়বস্তুর সঙ্গে সঙ্গে ভাববোধ প্রসঙ্গটা এসে পড়ে। রবীন্দ্র-সাহিত্যে সম্যক জ্ঞানলাভ না করে রবীন্দ্রসঙ্গীতে যথার্থ অধিকার অর্জন দুরাশামাত্র। কারণ, রবীন্দ্রসঙ্গীত মূলতঃ সাহিত্যিক ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত। সেজন্য রবীন্দ্রসঙ্গীতের জন্য রবীন্দ্রসাহিত্যের চর্চা একান্তই আবশ্যক। কাব্যগত মূল্যায়ন সম্বন্ধে যিনি সচেতন নন তাঁর পক্ষে রবীন্দ্রসঙ্গীতের যথাযথ গীতিরূপ কণ্ঠে প্রকাশ করা সম্ভবপর নয়। গানের ভাবার্থ সম্বন্ধে যদি প্রতীতি না জন্মে তা হলে সুরের মাধ্যমে উচ্চারণ সহযোগে কী করে তার গীতিরূপ ও ভাবরূপ প্রকাশ করা সম্ভব? তদুপরি গানের কাব্যাংশের সঙ্গে যে দার্শনিক ভিত্তির সংশ্লিষ্টতা আছে তৎসম্বন্ধেও সচেতন থাকা প্রয়োজন।

সুর

রবীন্দ্রসঙ্গীতে সুরসম্পদের যে প্রাচুর্য ও বৈচিত্র্য আছে, অন্য কোনো একজন বিশিষ্ট সঙ্গীতস্রষ্টার গানে তা দুর্লভ। তাতে উত্তর ভারতীয় রাগসঙ্গীতের ও বাংলার লোকসঙ্গীতের প্রভাব অধিক দৃষ্ট হলেও কতকাংশে অন্য দেশের ও ভিন্ন প্রদেশের সুরও সাদরে গৃহীত হয়েছে। তা ছাড়াও রবীন্দ্রসৃষ্ট কোনো কিছু সুর বিশ্লেষণের অপেক্ষায় আছে। নিম্নের তালিকায় এ-সব সম্বন্ধে সংক্ষেপে দিকদর্শন করা হল :

রাগসঙ্গীত—
শুদ্ধরাগ : স্বগঠিত একক রাগ।
ছায়ালগ বা সালঙ্ক রাগ : দুই রাগের মিশ্রণে উদ্ভূত রাগ।
সঙ্কীর্ণ রাগ : দুইয়ের অধিক রাগের মিশ্রণে উদ্ভূত রাগ।
আগন্তুক স্বর। স্বরাবলী : যথাযথ ভাবপ্রকাশের জন্য রাগনিয়মের বহির্ভূত প্রযুক্ত স্বর। স্বরাবলী।
রবীন্দ্রসৃষ্ট সুর (রাগ)।?

লোকসঙ্গীত—
কীর্তনের সুর
বাউলের সুর
সারিগানের সুর, রামপ্রসাদী সুর ইত্যাদি।
ভিন্ন প্রদেশের সুর—
মাদ্রাজী সুর
মহিশূরী সুর
গুজরাটি সুর
কানাড়ী সুর
বিলাতী সুর—
অন্যের কথায় আরোপিত সুর—
সন্ত্রগান, অন্যান্য বাংলা গান ইত্যাদি।

তাল

রবীন্দ্রসঙ্গীতে তালবদ্ধ ও মুক্তছন্দ উভয়প্রকার গানই প্রচলিত। তালবদ্ধ গানের মধ্যে তেরো ও সতেরো মাত্রাসমষ্টির তাল ছাড়া, চার মাত্রা থেকে আরম্ভ করে আঠারো মাত্রা পর্যন্ত সব তাল রবীন্দ্রসঙ্গীতে ব্যবহৃত হয়েছে। তার মধ্যে কতকগুলি তাল ক্যাসিকাল রাগসঙ্গীতে প্রচলিত এবং অবশিষ্টগুলি রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক প্রবর্তিত। কবি-প্রতিষ্ঠিত ঝম্পক, রূপকড়া, নবতাল, একাদশী, নরপঞ্চতাল ইত্যাদি তালি নামাঙ্কিত হয়ে থাকলেও কতকগুলি তাল অ-নামাঙ্কিত আছে। বিভিন্ন গানে বিভিন্ন তাল যেমন ব্যবহৃত হয়েছে, গানের ভাব ও ছন্দ অনুযায়ী পাখোয়াজ, তবলা বা খোলের ঠেকা গঠন করে তার সঙ্গে সংযতভাবে সংগত করা আবশ্যক।

তালের সঙ্গে লয়ের প্রশ্নও অঙ্গাঙ্গীভাবে সংশ্লিষ্ট। যদিও আমাদের সঙ্গীতে বিলম্বিত মধ্য ও দ্রুত এই তিন প্রকার লয়ের ব্যবহার হয় এবং এইসব লয়ের মান অনমানের উপর নির্ভর করেই নির্ধারিত হয় তবু ও গানবিশেষে প্রত্যেক প্রকার লয়েরই তারতম্য ঘটে। প্রত্যেক গানের যথানির্দিষ্ট লয় রক্ষা করেই পরিবেশন করা উচিত। তা না হলে গীতিরূপের অবাঞ্ছিত পরিবর্তন ঘটবার সম্ভাবনা দেখা দেয়।

গানের শ্রেণী

বাংলা গানের গতি-প্রকৃতি যদি বিশেষভাবে পর্যালোচনা করা যায় তাহলে তাতে কাব্যসঙ্গীত রচনার প্রেরণাই অধিক লক্ষ্য করা যাবে। রবীন্দ্রসঙ্গীতও তার ব্যতিক্রম নয়। তৎসত্ত্বেও অনেক রবীন্দ্রসঙ্গীতে ক্যাসিকাল রাগসঙ্গীতের বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর গানের এবং বাংলার লোকসঙ্গীতের বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর গানের ব্যাপক প্রভাব বর্তেছে। তদনুযায়ী নিম্নলিখিত শ্রেণীর গানগুলি স্বতন্ত্রভাবে অনুশীলনযোগ্য :
রাগসঙ্গীত—
ধ্রুপদাঙ্গ রবীন্দ্রসঙ্গীত
খেয়ালাঙ্গ রবীন্দ্রসঙ্গীত
টপ্পা-অঙ্গের রবীন্দ্রসঙ্গীত
লোকসঙ্গীত—
কীর্তনাঙ্গ রবীন্দ্রসঙ্গীত
বাউলাঙ্গ রবীন্দ্রসঙ্গীত

উল্লেখযোগ্য যে, ক্যাসিকাল ধ্রুপদ, খেয়াল ও টপ্পার এবং ধ্রুপদাঙ্গ, খেয়ালাঙ্গ ও টপ্পা-অঙ্গের রবীন্দ্রসঙ্গীতের লক্ষণ ও পরিবেশন-রীতিতে পার্থক্য আছে। অন্য দিকে বাংলার প্রচলিত কীর্তন ও বাউল গানের এবং কীর্তনাঙ্গ ও বাউলাঙ্গ রবীন্দ্রসঙ্গীতের লক্ষণ ও পরিবেশন-রীতিতেও স্বাতন্ত্র্য আছে। এছাড়া আরো কোনো কোনো প্রাচীনতর গীত-শ্রেণীর প্রভাব রবীন্দ্রসঙ্গীতে আছে, তবে সে-প্রভাব ততটা ব্যাপক নয়।

কলিগঠন

ভারতবর্ষের সঙ্গীতের ইতিহাসে ধ্রুপদের যুগ এক বৈশিষ্ট্যময় যুগ। এই যুগের ধ্রুপদ সঙ্গীতে সুর, তাল ও বাণীর বিশেষ পরিমিতি লক্ষ্য করা যায়। প্রাচীনতর প্রবন্ধগানের দীর্ঘ কথার অংশের পরিবর্তে ধ্রুপদে স্থায়ী, অন্তরা ও সঞ্চারী ও আভোগ এই চারিটি কলির গঠনও গাঠনিক বৈশিষ্ট্য স্বীকৃত হয়েছিল। ধ্রুপদের কলিগঠনের এই বৈশিষ্ট্য রবীন্দ্রসঙ্গীতে খুব ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে। কেননা ধ্রুপদাঙ্গ রবীন্দ্রসঙ্গীতই হোক অথবা অন্য কোন শ্রেণীর রবীন্দ্রসঙ্গীতই হোক তার অধিকাংশই চার কলি-যুক্ত। অবশ্য এটি হল সাধারণ নিয়ম। তার অনেক ব্যতিক্রমও আছে। আবার কতকগুলি রবীন্দ্রসঙ্গীত আছে কলিগঠনের বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে যাকে বিশেষ করা যায় না।

গানরচনার ইতিবৃত্ত

রবীন্দ্রসঙ্গীতের ক্ষেত্রে গানরচনার ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে অবহিত হওয়াও কম প্রয়োজনীয় নয়, রবীন্দ্রনাথের গানরচনার মৌলিক উদ্দেশ্য সম্বন্ধে পূর্বে আলোচিত হয়েছে। কবি নিজেই তাঁর প্রথম ও শেষ বয়সের গানে স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করেছেন। তাঁর কথাতেই বলি :

(১৬২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

আলো আরো আলো

(সম্পূর্ণ উপন্যাস)

সুজাতা

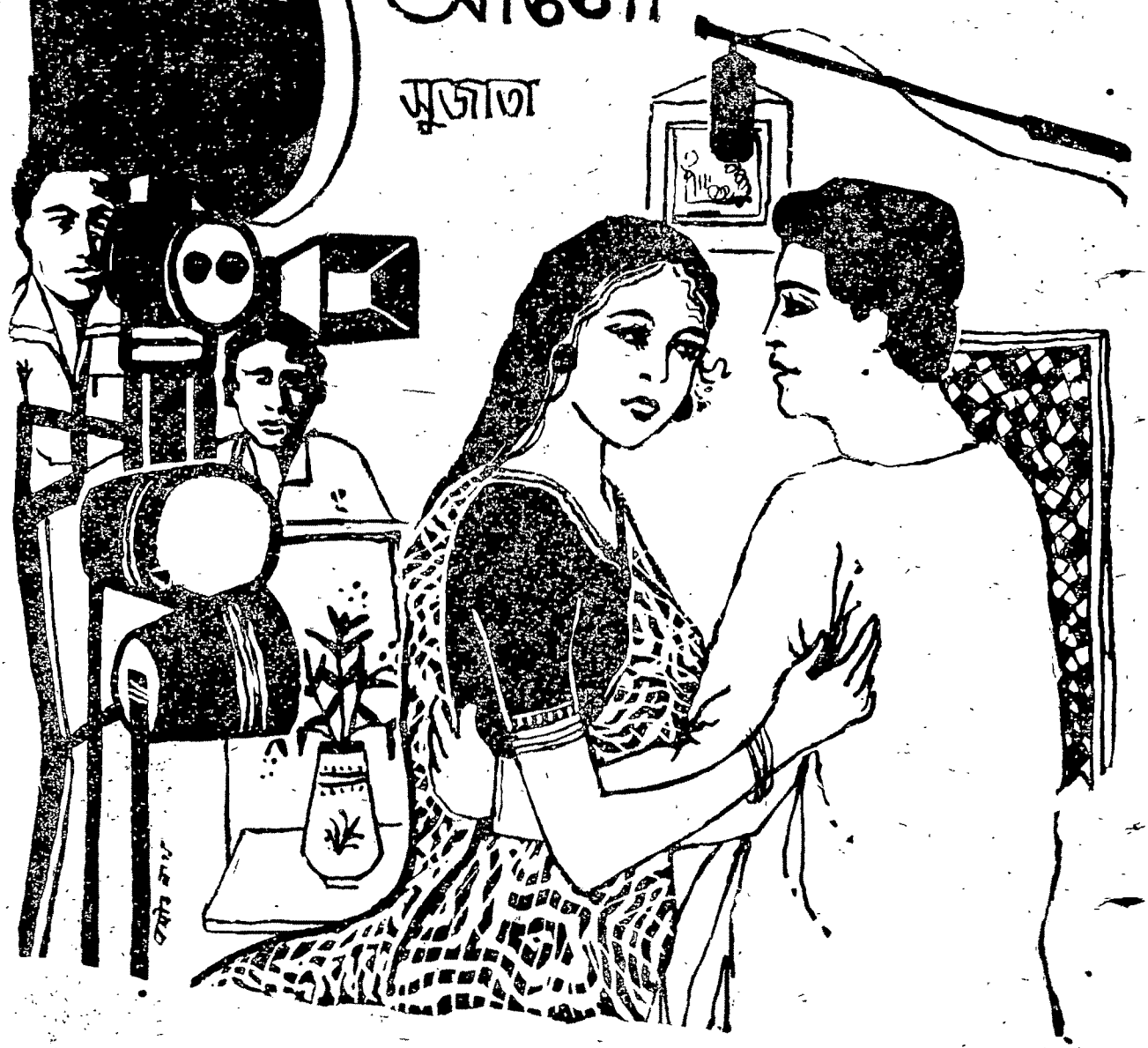

এক

"কোয়ায়েট অন দি সেট, অল লাইট—স্টার্ট ক্যামেরা, সাউণ্ড।"

দপ দপ ক'রে বড় বড় আলোগুলো জ্বলে উঠল, প্রায়ান্ধকার ঘরটা মুহূর্তের মধ্যে আলোর বন্যায় যেন ডুবে গেল, ক্যামেরা চলার মৃদু ধ্বনির মধ্যে ভেসে উঠল সহকারী পরিচালকের গম্ভীর আওয়াজ—

"নীল সমুদ্র; ব্যালকনি সট্। টেক টু—"

মেকআপ-ম্যানের হাতে ছোট আয়না আর পাউডার পাফটা ফিরিয়ে দিয়ে সোনালী লুটিয়ে পড়া আঁচল কাঁধের ওপর তুলে নিল, লীলায়িত ভঙ্গীতে এগিয়ে গেল মেপে মেপে চার পা, নায়ক অরূপকুমারের মুখোমুখি হোল, চোখে চোখ রেখে বলল, 'সত্যি! সত্যি বলছ তুমি আমায় ভালবাস?'

অরূপকুমার সোনালীর নরম হাতটা নিজের মুঠিতে তুলে নিল, একটু বুঝি বা চাপ দিল আবেগে, তারপর গাঢ় স্বরে বলল, 'হ্যাঁ, মঞ্জু! তুমি কি বোঝ না—'

কাট। পরিচালকের গম্ভীর নির্দেশে খট্ ক'রে ক্যামেরা থেমে, যাওয়ার আওয়াজ হোল দপ দপ ক'রে নিভে গেল সূর্যের মতো চোখ-ধাঁধানো আলোগুলো, ইলেকট্রিক ফ্যানগুলো চলতে সুরু করল আবার, মৃদু আলোয় সেটের ঘর, সিঁড়ি, বারান্দা নকল ফুলে-পাতায় মোড়া হয়ে ছায়াচ্ছন্ন রূপকথার দেশ ব'লে মনে হতে লাগল। রুমাল বের করে ঘাড়ের ঘাম মুছতে মুছতে অরূপকুমার সোনালীর কাছে এগিয়ে

বল, 'ঠিক হয়েছিল আমার বলা। উফ্! কি ভয় হচ্ছিল আমার। এখনও প্যালপিটেশন থামে নি।'

অরূপকুমার সোনালীর পায়ের কাছে রাখা মোড়াটায় বিনা আমন্ত্রণেই ব'সে পড়ল।

সোনালী বলল, 'প্রথম প্রথম ওরকম হয়; আমারও হোত।'

'আপনারও হে'ত!' কথাটা যেন বিশ্বাস হতে চায় না নতুন নট অরূপকুমারের।

সোনালী সেন—সারা দেশ জুড়ে যার খ্যাতি আর লক্ষ টাকা যার ন্যূনতম পারিশ্রমিক, রোমান্টিক রোলে যার জুড়ি নেই, সেই সোনালী সেনেরও প্রথম প্রথম ভয় করতো, গলা আটকে যেত আবেগ-মধুর দৃশ্যে?

'হোত বইকি।'

সোনালী ব্যাগ থেকে ছোট সুগন্ধির শিশি বার করে ঘাড়ে গলায় কনুই-এ মাখল ফরাসী-নির্যাস। দেহ সুরভিত হলো। আর অভিজ্ঞ চোখ দিয়ে সোনালী বুঝতে পারল সামনের মোড়ায় বসা এই তরুণ যুবকের হৃদয়ও জ্বলে উঠল সোনালীর ম্যাসকারা-মাখা কালো চোখের দিকে তাকিয়ে।

অরূপকুমার বললো, 'আপনার প্রথম ছবি-ই তো প্রচণ্ড সাকসেস্।'

'কিসের! কত ছোট ছোট রোল করেছি আগে, কত ডিরেকটার ফিরিয়ে দিয়েছেন আমায়—নাক কুঁচকেছেন। একে দিয়ে চলবে না—একথা যে কতবার শুনেছি!'

'আপনাকে বলেছে এইকথা! না না কি বলছেন? আপনার প্রথম বইত অনুপমা, আর তাই থেকেই তো আপনার নাম, প্রচণ্ড হিট তো সেটা। আপনার মতো—'

সোনালী মুগ্ধ যুবকের ব্যাকুল উচ্ছ্বাসে বাধা দিল না আর। তার ভ্রান্ত ধারণা নিরসন করার চেষ্টা করল না। লোকে তাই জানে বটে।

তাই জানুক! ভুলে যাক তারা সোনালীর অভিনেত্রী-জীবনের প্রথম পর্বটা। ভুলে যাক সেইসব নিন্দায় মুখর সমালোচনায় অকরুণ ব্যর্থ দিনগুলো। সোনালী নিজেই কী ভুলে যায় নি সেইসব হতাশায় মোড়া কালো কালো দিন? সেই যখন প্রযোজকের বাড়ি বাড়ি ঘুরেছে সোনালী—পরিচালকের দোরে দোরে। শ্যামবর্ণা ক্ষীণাঙ্গী মেয়েটির মুখে উজ্জ্বল সম্ভাবনার চিহ্নমাত্রও চোখে পড়ে নি অভিজাত পরিচালকদের। প্রতিভার কণামাত্র দেখতে পান নি তাঁরা এই দরিদ্র স্কুল-মাস্টারের স্ত্রীর মধ্যে।

আর সোনালী নিজে? সেও কি জানত এত বড় প্রতিভা, এমন আশ্চর্য অভিনয়-দক্ষতা লুকিয়ে আছে তার মধ্যে। স্বপ্নেও কি ভাবতে পেরেছিল এমন দেশ-জোড়া নাম হবে তার! এমন খ্যাতি, এমন প্রতিপত্তি আর এমন টাকা!

টাকা! হ্যাঁ ঐ টাকার মধ্যেই সব। টাকার জন্যেই এমন ক'রে পরিচালকের দোরে দোরে ঘোরা, রঙ মাখা আর অজানা-অচেনা পুরুষের কণ্ঠলগ্না হয়ে ভালবাসার অভিনয় করা। এত টাকা হবে, এমন লক্ষ লক্ষ টাকা, এমন অনায়াস-অবহেলায় সোনালী উপার্জন করতে পারবে, কয়েক বছর আগে নিজেই কি তা ভাবতে পেরেছিল?

লক্ষ টাকা!

হ্যাঁ, লক্ষ টাকার এক পয়সা কমে সে এখন ছবির কনট্রাক্ট করে না, অথচ লক্ষ টাকার উপার্জনের আশা নিয়ে তো সে ফিল্মে নামতে আসে নি।

কী চেয়েছিল সোনালী? কত টাকা? তিন শ', চার শ', পাঁচ-ছ' শ' টাকা মাসে রোজগার করতে পারলেই ঢের হবে সোনালী ভেবেছিল; বাড়ি-ভাড়া, খোকার দুধ আর সংসারের খরচ মিটিয়েও যাতে টি, বি, রুগী স্বামীর চিকিৎসাটা চালাতে পারে আর তাই জন্যেই তো সর।

নাহলে যখন ভালবেসে বাবা-মা আত্মীয়-স্বজন পরিজন সকলের সব নিষেধ, অনুরোধ অগ্রাহ্য ক'রে সোনালী (তখন অবশ্য তার নাম ছিল মীরা) বিয়ে করেছিল সমীর সেনকে তখন কি ও জানত স্কুল-মাস্টারের আয় কত সামান্য? কত পরিমিত জীবনের উপকরণ।

কিন্তু তবুও সুখী হয়েছিল মীরা নামে সেই দুষ্টু ছটফটে, চঞ্চল মেয়েটা। পিতৃ-গৃহের সচ্ছলতা ছিল না তার নতুন ঘরে, ছিল না মনোরঞ্জনের সহস্র উপকরণ—রেডিও, রেকর্ড, সিনেমা দেখা। বই কেনার যে অমন বাতিক ছিল সোনালীর তাও ছেড়ে দিতে হয়েছিল। তবুও কি আশ্চর্য সুখে, কি পরম পরিতৃপ্তিতে ভরে থাকত সারা হৃদয়-মন। ছেঁড়া কাপড় সেলাই করতে করতে শাক-চচ্চড়ি কড়ায় নাড়তে নাড়তে সর্বক্ষণই গুনগুনিয়ে উঠতো গান, শুনতে পেয়ে সমীর উঠে আসত শোবার-ঘরের তক্তপোষ ছেড়ে বারান্দায়, সেখানে তোলা উনুনে মীরা রাঁধত পিঁড়ি পেতে বসে।

'এ কি! উঠে এলে যে?' খুন্তী থামিয়ে অবাক হয়ে মীরা বলত? 'খাতা দেখা এরই মধ্যে শেষ হয়ে গেল?'

'কই আর তুমি হতে দিলে!' সমীর উবু হয়ে বসত মীরার পাশে 'তোমার গলা শুনলে কি আর স্থির থাকতে পারি?'

তারপর-ই সহসা হাত বাড়িয়ে কাছে টানতো স্ত্রীকে, আর উনুনের হাপে গরম হওয়া গালের ওপর চেপে ধরতো নিজের গাল।

'এই অসভ্য! ছাড় ছাড়! দেখতে পাবে যে লোকে!'

'দেখলে-ই বা। আমি তো আর পরস্ত্রীকে আদর করছি না। নিজের স্ত্রীকে-ই—'

'বারে! হলে-ই বা নিজের স্ত্রী। তাই বলে-ই নিজের লোক দেখিয়ে ভালবাসা যায় না-কি!'

সত্যিই যায় না। মীরার তাই মনে হতো। মনে হতো পিলিতি মানুষগুলো যেন কি। প্রকাশ্যে, দিনের আলোয় রাস্তা ভর্তি লোকজনের মধ্যেই আলিঙ্গন, চুম্বন করতে তাদের এতটুকু বাধে না। অবাক কাণ্ড। মীরা মরে গেলেও তা পারবে না।

কিন্তু সোনালী! দিনের পর দিন সেট-ভর্তি লোকের মধ্যে উজ্জ্বল আলোর তলায় নিখুঁত প্রেমের অভিনয় করতে তারও তো এতটুকু বাধে না। তবুও ভাগ্যিস ভারতীয় ছবিতে চুম্বন এখনও প্রবেশের অনুমতি পায় নি।

মা গো! ভাবতে-ই কেমন শরীর গুলিয়ে ওঠে সোনালীর। কে না কে, কে জানে কোন খারাপ অসুখই আছে কি-না, হয় তো দাঁত খারাপ, মুখে গন্ধ, হয় তো রসুনের গন্ধ বেরোয় মুখ দিয়ে—তার-ই মুখে মুখ দিয়ে সশব্দে চুম্বন! না ভাগ্যিস্ ভারতীয় সেন্সার বোর্ড রক্ষণশীল। নাহলে কি অবস্থা হতো সোনালী তথা মীরার।

আচ্ছা, রোমান্টিক রোল ছাড়া তো অন্য কিছু করেন না আপনি না?

অরূপকুমারের প্রশ্নে আবার সচকিত হলো সোনালী। মৃদু হেসে ঘাড় ফেরাতে-ই চোখ ফেরাতে-ই চোখে পড়ল ছেলেটির অপলক দৃষ্টি।

মনে-মনে-ই হাসলো সোনালী।

হোল—এই আবার আরম্ভ হলো।

এই অপলক দৃষ্টি, এই মুগ্ধ চোখে চেয়ে থাকা; এই বারেবারে ডেকে ডেকে কথা বলা—এসব-ই কিসের লক্ষণ সোনালী জানে। সে জানে এইখানে-ই থেমে থাকবে না এই ছেলেটি, আরো অনেক কথা বলবে সে, অনেক প্রশ্ন।

আজ সোনালীর সঙ্গে সামান্য প্রেমের অভিনয় করতে গলা বেধে যাচ্ছে ছেলেটির, বারে বারে রিহার্সাল দিয়ে নিয়েও মনে হচ্ছে হয়ত পারবে, হয়ত যথেষ্ট আবেগ থাকবে না গলায়, হয়ত পরিচালক অসন্তুষ্ট হবেন। কিন্তু একদিন এই ছেলেটি-ই দক্ষ অভিনেতা হবে। হয়ত সোনালীর সঙ্গে প্রতি ছবিতে-ই থাকবে বিপরীত ভূমিকায়, নাম করবে, অর্থ করবে আর----আর হয়ত প্রকাশ রায়ের মতো-ই তলিয়ে যাবে সোনালীর প্রেমে।

প্রেমের অভিনয় ছেড়ে সত্যিকারের ভালবাসা দাবী করবে সে তখন সোনালীর কাছে। সেটের মধ্যে-ই চঞ্চল হয়ে উঠবে। হয়ত ব' একটু অসংযত হবে, একটু বা অশোভন, আর তারপর-----?

হ্যাঁ। সোনালী জানে। অনেক দেখে দেখে সোনালী নিশ্চিত বুঝতে পারে—কে অভিনয়টাকে চিরদিন রেখে দেবে অভিনয় ব'লে—কাজ ব'লে জীবনের সদর অন্দরজায়, আর কে

জীর মধ্যে ডুবে যাবে, একেবারে একাত্ম হয়ে যাবে এই রঙ-মাখা এবং আলো-জ্বালা জীবনের সঙ্গে, আর সঙ্গে সঙ্গে এই জীবনের ক্ষণকালের সঙ্গিনীটিকে পেতে চাইবে চিরদিনের মতো, হাতে হাত রেখে শুধু ভালবাসার অভিনয়-ই করবে না, হাত পাতবে সোনালীর হৃদয়-দ্বারে, বসতে চাইবে সম্রাট হয়ে প্রেমের সিংহাসনে।

এই সব-ই আজকাল সোনালী বুঝতে পারে। এই ছেলেটির মধ্যে সেই লক্ষণটাই স্পষ্ট দেখতে পেল সোনালী। আরো একটা লক্ষণ অবশ্য এই ছেলেটির আছে, বড় অভিনেতা হাওয়ার।

হ্যাঁ—এই ছেলেটির মধ্যে অভিনয়-ক্ষমতা আছে, তাকে ফুটিয়ে তুলতে হবে। আর সোনালী ছাড়া কে পারবে সেই নিহিত শক্তিকে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত করতে।

সোনালী ছেলেটির ফিল্ম-টেষ্ট দেখে পরিচালক বিজয় ব্যানার্জীকে বলেছিল একে নিতে। কি যেন নাম ছেলেটির। মৃণাল। মৃণাল মিত্র।

'চলবে না!' সোনালী মাথা দুলিয়ে হেসে হেসে বলেছিল, 'ও নাম ফিল্মে কিছুতে-ই চলবে না, অন্য নাম নিতে হবে।

'অন্য নাম।'

হ্যাঁ ফিল্ম নেম!'

'কেন? ফিল্মে নামলেই একটা অন্য নাম নিতে হবে তার কি মানে আছে?'

পরিচালক বিজয় ব্যানার্জী এইবার মাথা নেড়েছিলেন 'না হে। মৃণাল নামটা সত্যি-ই চলবে না ছবিতে।'

'আর সাহিত্যিকরা যদি পেন-নেম নিতে পারেন,' সোনালী বলেছিল, 'তাহলে আপনারাই বা—

বিজয় ব্যানার্জী বললেন, 'আর সব দেশে-ই ত এই হয়।'

'এ-দেশেও তবে তাই হোক!' ছেলেটি বলল।

ছেলেটি রাজী হয়েছিল; আর বিজয়বাবুর ওপর ভার দিয়েছিল নাম বেছে দেবার। সাধারণত নবাগত তারকাদের নাম পরিচালকরা নির্বাচন করেন। সোনালী নামও তো দিয়েছিলেন এমন-ই এক পরিচালক।

এবার কিন্তু ব্যতিক্রম হলো। কি নাম দেওয়া যায় বিজয়বাবু ব'সে ব'সে ভাবছিলেন, পর পর কয়েকটা নাম ব'লে দেখছিলেন যথেষ্ট ধ্বনি-মাধুর্য পাওয়া যায় কী-না। প্রশান্ত কুমার দোলনকুমার আবীরকুমার।

'অরূপকুমার,' হঠাৎ ব'লে উঠেছিল সোনালী আর ব'লেই ওর সেই অপরূপ ভঙ্গীতে ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়েছিল মৃণাল মিত্রের দিকে। কি, পছন্দ হয়?

মৃণাল মিত্র এক মুহূর্তে চেয়ে থাকল সোনালীর হাসি হাসি মুখটার দিকে। তাকালে ওর উজ্জ্বল চোখের দিকে। তারপর চোখ নীচু ক'রে বলল, 'ঠিক আছে—ঐ নাম-ই থাক তাহলে।'

ঘাড় ঘুরিয়ে আবার সেই অপরূপ ভঙ্গীতে ব'লে উঠেছিল সোনালী, 'ধন্যবাদ।' আর স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিল ছেলেটির কানের ডগা লাল হয়ে উঠল, ফর্সা মুখে রঙের ছোপ লাগল।

আর হঠাৎ ভারি মায়া হয়েছিল সোনালীর —এই মধুর ছলনাটুকু না করলে-ই পারতো ছেলেটির সঙ্গে।

একেবারে কাঁচা তাজা ছেলেটি।

সোনালীর এই ঘাড় ঘুরিয়ে হাসি, বড় বড় চোখে চেয়ে থাকা, যেন বিশেষ ক'রে তার দিকে-ই তাকিয়ে আছে, তাকে ভাল লাগছে—এই বোধ পুরুষের মনে জাগিয়ে দেওয়া যে কি তা সোনালী ভাল ক'রেই জানে। এরপরই মুগ্ধ পুরুষ প্রলুব্ধ হয়, নানা ছুতোয় কাছে আসতে চায়, গুনগুন ক'রে শোনায় প্রণয়-প্রশস্তি।

সোনালী কিন্তু তারপর আর বেশী প্রশ্রয় দেয় না। এই একটু কথা একটু হাসি, কাজল-কালো চোখের দৃষ্টিপাত দু' একবার। ব্যাস্! কিন্তু তাতেই তো অন্যপক্ষের অস্তিম দশা। সোনালী যে একদিন তাকে চোখের ইশারায়, ঠোঁটের হাসিতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল সেকথা সে ভুলে যায়। বিমুখ নারী-চিত্ত জয় করার জন্যে তার সাধনার অন্ত থাকে না। একটু হাসি, একটু গানের জন্যে তখন সে সর্বস্ব দিতে প্রস্তুত।

অন্যায়। ঘোরতর অন্যায় এটা। পরিহাস-ছলে সমীর বলেছে, সোনালী কী আর জানে না? কিন্তু কী করবে? অভ্যাস হয়ে গেছে যে!

পরিচালক-প্রযোজকদের বিদ্ধ করতে, নিজের পাশে তাদের জড়িয়ে রাখতে, কনট্রাক্টের পর কনট্রাক্ট পেতে এই মধুর অভিনয়, এই ছলনার লীলা যে একান্তভাবে কাজে লেগেছে সোনালীর জীবনে।

তার অভিনয়-প্রতিভা, তার হরিণ-চোখের দুর্নিবার আকর্ষণ, তার একান্ত 'ফোটোজেনিক মুখ, কিছু-ই কি চোখে পড়েছিল পরিচালকদের যখন সে দু-তিন শ' টাকার জন্যে, সমীরের ওষুধ আর খোকনের দুধের বিল মেটাবার জন্যে, ঘুরত বাড়ী বাড়ী ষ্টুডিওর দোরে দোরে?

ওর রূপ ফরসা নয়, বড় অফিসার কী অভিজাত পরিবারের বধূ নয় ও, তাই কে তাকাবে ওর দিকে চোখ তুলে? কে বলবে ওকে সুন্দর—অপরূপ।

তারপর চাকা ঘুরল।

এখন শোনা যায় সোনালী সেনের মতো রূপসী বিরল, এমন মোহময় চোখ আর অপরূপ মুখের গঠন বুঝি শিল্পীর তুলিতে-ই সম্ভব।

সেই মুখ, সেই হাসির ক্ষমতা—তাই বারবার পরখ ক'রে দেখে সোনালী। আস্বাদন করে কালো মেয়ের রূপের প্রশস্তি।

অকাতরে তাই হাসি ছড়ায়, ঝকঝকে চোখে তাকায়, মুগ্ধ পুরুষকে বিহ্বল ক'রে তোলে। আর এইটা যেন অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। আজ কিন্তু একটু বিব্রত বোধ করল সোনালী।

সবে বিয়ে করেছে ছেলেটি। প্রেমের বিয়ে। দু'পক্ষের-ই আপত্তি ছিল। পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করেছে তারা। মৃণাল আর মাধুরী। মৃণালকে ছবিতে নামতে মাধুরী-ই উৎসাহিত করেছে সবচেয়ে বেশী। তার কলেজের অভিনয়ে মৃণালের চন্দ্রনাথ দেখে-ই তো প্রথম মুগ্ধ হয়েছিল মাধুরী।----ইত্যাদি ---ইত্যাদি----অনেক কথা-----গড়গড় ক'রে ব'লে গিয়েছিল মৃণাল দ্বিতীয় দিনের রিহার্সালের সময়-ই। সোনালী সেনের মতো একজন অভিনেত্রী যে রিহার্সাল দিতে আসবেন এতো অবিশ্বাস্য কথা, কিন্তু তবু সোনালী এসেছিল নাহলে নতুন-নামা মৃণাল মিত্রের ভয় ভাঙবে কেন? একদিন নয় দু'দিন। এই ছবিতে অভিনয় করতে না পারলে সমস্ত কেরিয়ার নষ্ট হয়ে যাবে মৃণালের, আর তার মানেই নষ্ট হয়ে যাবে তার জীবন। টাকা চাই মৃণালের, অনেক টাকা। মাধুরীকে চিকিৎসা করতে হবে। বিয়ের সর মাধুরীকে কাল-রোগে ধরেছে যে!

স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল সোনালী। চকিতে নিজের দশ বছর আগেকার জীবন ছবির মত ভেসে উঠেছিল চোখের সামনে। ব্যাগ খুলতেও গিয়েছিল সে, কিন্তু তারপর-ই মনে পড়েছিল তা হয় না। মৃণাল নেবে কেন? সোনালীও তো নিতে পারেনি। তবে সাহায্য মৃণালকে করতে পারে বই কী সোনালী। আর তাই সে করবে। তাই নিজের থেকে রিহার্সালে আসতে রাজী হয়েছিল। দু-একজন পরিচালককে ব'লে তার কাজ পাওয়ার ব্যবস্থা করেছিল।

কিন্তু মৃণাল মিত্র এ কি করছে? অজান্তে যে ফাঁদ পেতেছিল সোনালী, কেন সে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে তার মধ্যে পা ফেলতে চাইছে। না না, সোনালী তা হতে দেবে না, সে ফেরাবে তাকে।

'স্যাডাম,' সহকারী পরিচালক অনিল সোমের ডাকে চকিত হলো সোনালী।

'কি?'

'একটু উঠতে হবে যে।

'এর মধ্যে-ই পরের সটের লাইট রেডি! বা! কুইক হয়েছেন তো আজকাল মিঃ রয়।'

না না,' অনিল সোম যেন কুণ্ঠিত হলো, 'সট নয়, ষ্টিল নেব একটা।'

'ষ্টিল! এক্ষুণি!'

'আর একটা অরূপকুমারের সঙ্গে।'

না বলতে গিয়েও উঠে দাঁড়ালো সোনালী অরূপকুমারের সঙ্গে প্রয়োজনের অতিরিক্ত-ই দু-একটা তুলতে দিতে হবে। সোনালী সেনের সঙ্গে বিভিন্ন ভঙ্গীতে অনেক ছবি কাগজে, পত্রিকাতে এখন বেরুনো দরকার বইকি অরূপ-কুমারের। না হলে তার পাবলিসিটি হবে

কেন? লোকে জানবে কি ক'রে এই উদীয়মান তরুণ অভিনেতাকে?

উদীয়মান। হাসি পেল সোনালীর কথাটা মনে ক'রে। উদীয়মান—অর্থাৎ উঠছেন। ওঠা-ই যদি, ফিল্মে নামা বলে কেন লোকে? নামা আর ওঠা এক সঙ্গে হয় না কি?

কিন্তু তাই বোধ হয়। একদিকে ওঠে আর একদিকে নামে। ফিল্মে ওঠে আর সমাজ-জীবনে নামে। হ্যাঁ মনে আছে সোনালীর, প্রথম যখন সে ফিল্মে নামল সে কি অশান্তি। কি নিন্দার ঢেউ ফেনিয়ে ফেনিয়ে উঠতে লাগল ঘরে-বাইরে।

বিয়ের সময় বাবা-মা আপত্তি করেছিলেন, সম্বন্ধ ছিন্ন করবেন ব'লে ভয় দেখিয়েছিলেন, কিন্তু বিয়ের পর সব ঠিক হয়ে গিয়েছিল। বাবা-মা আসতেন খোঁজ করতেন, সমীর স্কুল মাষ্টারী ছেড়ে একটা ভাল চাকরির চেষ্টা করে না কেন, একথাও বারবার বলতেন, কিন্তু সম্বন্ধ ছিন্ন করে নি, আসা-যাওয়া, খোকার জন্যে সোনার বালা আর জামাই ষষ্ঠীতে তত্ত্ব সবই এসে পৌঁছত—কিন্তু আবার ঝড় উঠল মীরা যখন সোনালী হলো, ফিল্মে নামল। আবার সেই কান্নাকাটি বুক চাপড়ানো 'তুই আমাদের কুলে কালি দিলি—ইত্যাদি—ইত্যাদি—ইত্যাদি—। সেই পুরনো নাটকের ক্লান্তিকর অভিনয়। আর সেই নাটকেরও একদিন যবনিকা পাত হলো, আবার সহজ হলো সব, স্বাভাবিক হলো। কিন্তু এবার সময় লেগেছিল একটু বেশী।

প্রায় কয়েক বছর মা-দাদারা-বোনেরা কেউ খবর রাখতেন না সোনালীর।

কিন্তু আবার আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবের আগমনে বাড়ি ভরে যেতে লাগল, আদর-আপ্যায়ন, নিমন্ত্রণ, অভ্যর্থনার আর অন্ত রইল না, যখন থেকে সোনালীরা—সেই কসবার ছোট একতলা বাড়ি ছেড়ে উড ষ্ট্রীটের নতুন ফ্ল্যাটে ওঠে এল।

হ্যাঁ, তখন থেকে-ই সোনালী আবার ফিরে পেল সামাজিক পদ-মর্যাদা, একটু বোধহয় বেশী ক'রেই পেল। আজ কোন সাংস্কৃতিক সভা পূর্ণাঙ্গ হয় না সোনালীর অন্ততঃ দশ মিনিটের উপস্থিতি না পেলে, আত্মীয়-স্বজনের উৎসব প্রাণ পায় না যতক্ষণ না সোনালীর সোনার চেহারা সেখানে দেখা যায়।

সোনালী জানে কারণটা কি।

কে তাকে জাতে উঠিয়েছে।

টাকা। হ্যাঁ, যতদিন না সোনালী যথেষ্ট টাকা করতে পেরেছে, বড় গাড়ি আর সাজানো বাড়ি, ততদিন ফিল্মে নামার জন্যে অপাংক্তেয় ছিল সে। কিন্তু যে-ই টাকার অঙ্কটা স্ফীত হলো, অর্থের প্রাচুর্যে ঝলসিয়ে উঠলো চারদিক, ওমনি আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব সবাই ভুলে গেল যে, তাদের মতে জঘন্য অপরাধ করেছে সোনালী ফিল্মে নেমেছে।

এখন দাদারা তাদের মেয়েদের আর সোনালীর বাড়িতে পাঠাতে ভয় পায় না, দাদার ছেলেমেয়েরা এসে উইক এণ্ড কাটায় সোনালীর বাড়ি, আর মাসে একটা ক'রে সোনালী যে বিরাট পার্টি দেয়, সেখানে শহরের গণ্যমান্যরা কে বাকী থাকে আসতে?

কিন্তু যদি সোনালী এত টাকা না করতে পারতো, যদি এই শেভ্রলেট ইম্পালা ক'রে না ঘুরে বেড়াতো, উড ষ্ট্রীটের লনে দামী চেয়ার পেতে অথিতিকে নামী সুরা না পরিবেশন করতে পারতো—তবে? তাহলেও কি এরা এমনি করেই সোনালীর বাড়ি আসতো? থাকতো? খেত? আর সোনালীকে এতো সুখদা বরদা মনে করতো?

না, হোত না কিছুই, হতো না—তাহলে সোনালী যদি শ্রেষ্ঠ তারকা চিহ্নিত হয়ে এমন ক'রে রাতারাতি (তাই তো বলে লোকে) একেবারে সৌভাগ্যের, যশের, অর্থের ঊর্ধ্ব গগনে না উঠে যেতো তাহলে তার কসবার ভাঙ্গা বাড়িতে কে দিতো তাকে শিল্পীর সম্মান।

ম্যাডাম যেন আজ একটু অন্যমনস্ক, সহকারী পরিচালক অনিল সোম আবার সোনালীর কাছে এসে দাঁড়ালো, কি এতো ভাবছেন?

এই ছেলেটিকে কেন কে জানে সোনালী ভারী স্নেহ করে, আর সমস্ত ইউনিটের মধ্যে এই ছেলেটি সাহস ক'রে যখন তখন কথা বলতে পারে সোনালীর সঙ্গে—এমন কী তার দু'একটা অসঙ্গত আব্দারও রেখেছে সোনালী। পরিচালক বিজয়বাবু অনিলকেই পাঠান সোনালীর কাছে যদি কখনও দরকার হয়, পাঁচটার পরে আধ ঘণ্টা থাকবার কি লাঞ্চের সময় একটা সট নেবার।

কিছু ভাবিনী অনিল। একটু বাইরে যেতে পারি? নেক্সট সটের দেরী আছে তো?

অনিল একবার ওপর দিকে চেয়ে দেখল যেখানে সরু তক্তার ওপর বসে রবারের জুতো প'রে মানুষগুলো ক্যামেরাম্যানের নির্দেশে আলো জ্বালাচ্ছে আর নেবাচ্ছে, তারপর সোনালীর দিকে চেয়ে বললো, হ্যাঁ। অন্ততঃ পনেরো মিনিট দেরী আছে এখনও। আপনি কি নিজের ঘরে যেতে চান? আগেই যাননি কেন? আপনি কখনো এরকম ব'সে থাকেন না।

জবাব না দিয়ে হাসল সোনালী—সেই ওর আশ্চর্য অপরূপ হাসি; তারপর হাত বাড়িয়ে ফ্লোরের সামনে ঝোলা বড় কালো পর্দা ঠেলে বাইরে এসে দাঁড়ালো।

আঃ! সূর্যের আলোর মতো আলো কই? খোলা আকাশের নীচে দাঁড়াতে এত ভাল লাগে কেন? সোনালী হাল্কা পায়ে এগিয়ে গেল সামনের ছোট্ট সবুজ লনে। এই 'অপ্সরা' ষ্টুডিওটা এই জন্যেই সোনালীর এত ভাল লাগে। দুটি মোটে ফ্লোর কিন্তু চারিদিকে ছড়ানো সবুজ ঢেউ। বড় বড় আম গাছ,

চক্রবর্তী এণ্ড কোং

১২ নং শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

লিগূঢ়ানন্দ—(ঐতিহাসিক উপন্যাস)

শায়ের কণ্ঠি ৫·০০

রাজাবাদশার পথের ধারে ৮·০০

বেগম নয় বাঁদী নয় ৬·০০

নতুন মহলের বেগম ৪·০০

সরস্বতী বাঈ ২·০০

পঞ্চনদীর তীরে ১·৫০

সন্ধ্যা রায় (কবিতা) ২·০০

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

জলকন্যা ৩·০০

প্রেমেন্দ্রনাথ মিত্র

দিকভ্রান্ত ২·৫০

শ্রীবাসব

সুন্দর পাহাড়ী ঈষ্ট ৩·৫০

শৈলজানন্দের

মনোহারিকা ২·০০

বনফুলের মালা ২·০০

রমাপতি বসু

মায়াবনবিহারিণী ২·০০

ঐতিহাসিক উপন্যাস

মতিমঞ্জিলের আমিরজান ৫·০০

রাহুল সাংকৃত্যায়ন

সপ্তসিন্ধু ৪·৫০

বিশ্ববন্ধু সান্যাল

মালিকা বেগম ৪·০০

পরেশনাথ চক্রবর্তী

আগ্রার দুর্গ থেকে ১·৫০

রাজকন্যার নাম সুচিত্রা ৪·০০

প্রেমের চেয়ে বড় ৩·০০

মহাকবি গিরিশচন্দ্র ঘোষ

লীলা ১·৫০

প্রদ্যোত গুপ্তের

শ্রী রামকৃষ্ণ ২·০০

রাণী রাসমণি ২·০০

ভগিনী নিবেদিতা ২·০০

সাধক কমলাকান্ত ২·৫০

রূপ সনাতন ৩·০০

স্বামী বিবেকানন্দ ২·০০

শ্রীশ্রীসারদা মা ২·০০

বিষ্ণুপ্রিয়া ২·০০

গৌরপ্রিয়া লক্ষ্মীদেবী ২·০০

নাটক

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

নদী বয়ে যায় ২·৫০

বিমল রায়

ব্রীজ, গ্রহ সম্মিলন, অন্তরাল ২·০০ ২·০০

নারায়ণ দাসগুপ্ত

বিধান ২·০০

শঙ্কর গুপ্ত

ঢুলকি ফুলকি ১·৫০

ব্যাঙের তীর্থযাত্রা ১·৫০

কাঁঠাল গাছ আর অজস্র ফলে ভরা সমান ক'রে ছাঁটা নরম ঘাসের আস্তরণ। সোনালীর বেশীর ভাগ স্যুটিং এই স্টুডিওতে-ই হয়, আর যত কণ্ট্রাক্ট করে সোনালী, তাদের সঙ্গে প্রায়-ই একটা অলিখিত সর্ত থাকে যে অপ্সরা'-র স্যুটিং করতে হবে।

আম কাঁঠাল গাছগুলো পেরিয়ে গেলে ছোট্ট টলটলে একটা পুকুরী আছে এখানে, আর তার ধারে আছে বাঁধান বেদী। আর সেই বেদীতে বসে চা খেতে খেতে-ই তো কয়েক বছর আগে অমন কাণ্ডটা করেছিল প্রকাশ রায়। তখন এত নাম হয়নি সোনালীর, হয়নি এত টাকা। তবে উড ষ্ট্রীটের বাড়িতে উঠে এসেছে তখন সোনালীরা, ছোট একটা গাড়িও কিনেছে, আর এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান শিক্ষয়িত্রীর কাছে বলরুম নাচ আর নির্ভুল করে ইংরেজী কায়দার কথা বলতে শিখেছে।

ওটা জানা চাই।

কনকলতা বলেছিলেন সোনালীকে, তোমরা ভদ্রঘরের মেয়ে। লেখাপড়াও জান, কত সুবিধা। তুমি ত তাড়ি মেরে শিখে নেবে সব আদব-কায়দা, নাচ-গান। আমাকে তো জান-ই। কোথা থেকে উঠতে হয়েছে, কী অমানুষিক পরিশ্রম করতে হয়েছে তাতে ওঠার জন্য।

তা ঠিক! পাঁকে জন্ম কনকলতার, কিন্তু তবু পাক লাগতে দেননি তিনি গায়ে। মা-দিদিমা চেষ্টা করেছে জাত-ব্যবসায় নামাবার, কিন্তু কনকলতার মা-র সারেঙ্গীবাদক শোভনলালের সঙ্গে লুকিয়ে লুকিয়ে এসে দেখা করেছেন ফিল্ম কোম্পানীর কর্তাদের সঙ্গে।

তখন নতুন টকী হচ্ছে। ছায়াছবি তখন আর শুধু ছায়া নয়, বাণীময়ও। আর সেই বাণী যদি হয় সুরেলা, কণ্ঠ যদি হয় মধুর, তবে তার উর্ধ্বগতির পথ রোধে কে?

শোভনলাল মেয়ের মত ভালবাসতো কণককে, তাই মা-দিদিমার ভালবাসা কবল থেকে ছিনিয়ে এনে ভদ্রভাবে অর্থ উপার্জনের রাস্তাটা চিনিয়ে দিয়েছিল আর সেই রাস্তা চিনে চিনে ধাপে ধাপে উঠে উঠে কনকলতা একটি সত্যি-ই ভদ্রঘরের বধূ হলো, হলো মহিলা।

রূপ ছিল তার কণ্ঠ ছিল অপরূপ। তাই মুগ্ধ মানুষের ভিড় লেগে থাকতো তার চারি-পাশে, তার-ই মধ্যে যিনি এগিয়ে এসে হাত ধরলেন, তুলে আনলেন পরিচয়হীনতার লজ্জা থেকে মর্যাদার আসনে তিনি-ই ওর স্বামী ব্যারিষ্টার নিশীথ সেন। বিয়ের পরও ছবি করেন কনকলতা তবে এখন খুশীমতো বাছাই করা চরিত্রে। অর্থের জন্যেই আর রং মাখতে হয় না তো।

এ-ই কথা-ই কণকলতা বলেছেন সোনালীকে। সোনালীর ওপর তাঁর কে জানে কেন অসীম স্নেহ।

তিনি-ই বার বার বলেছেন, সোনা! শুধু বিদ্যা থাকলে-ই হবে না, বাইরের চাকচিক্যটা থাকা চাই, জগতে ওটা-ই কাটে, তুই বল-রুম নাচটা শিখে নে ভাল করে, আর টেবল ম্যানার্সগুলো দরকার এই লাইনে, নাহলে লোকে তোর দাম দেবে না।

তারপর কণকলতা-ই ঠিক ক'রে দিয়েছিলেন মিসেস প্যাটারসনকে।

সোনালী বি-এ অবধি পড়েছিল, ইংরাজী সাহিত্যে ওর অনুরাগই ছিল, একজন কলেজের ছাত্রীর পক্ষে যতদূর জানা সম্ভব, সোনালী ততটা-ই জানত এই বিদেশী ভাষাটা। কিন্তু শুধু জানাটা-ই সব নয়। সোনালী কি পারতো এমন মধুর করে ঘাড় ঘুরিয়ে বলতে, রি-য়্যা-লি? কি জানত লোন বিশেষ কাঁটা-ছুরি দিয়ে মাছ খেতে হয়, আর কোনটা দিয়ে স্যালাড! কি জানত সোনালী সঙ্গীর হাতে আলগা হয়ে আলতো ভাবে নিজেকে ছেড়ে দিয়ে পায়ে পায়ে মিলিয়ে নাচবার?

জানতো না, কিছু-ই জানতো না সোনালী। স্বচ্ছল মধ্যবিত্ত বাঙালী ঘরের মেয়ে সে। সোনা, মুক্তো পরেছে, বাড়ির গাড়িতে কলেজেও গেছে, কিন্তু বিলিতি সুর আর বিলিতি সুরা, বড় হোটেল আর প্লেনে ইউরোপ ভ্রমণ, সুইৎসারল্যাণ্ডে স্কী আর সুইমীং পুলে সাঁতার কাটা, এসব কি এমন অকুতোভয়ে করতে পারতো সোনালী, যদি না মিসেস প্যাটারসন দীর্ঘ দু'টি বছর ধ'রে তাকে শিক্ষা দিতেন?'

পুকুরের পাড় ধ'রে হাঁটতে হাঁটতে নীচু হয়ে লেবু গাছ থেকে একটা পাতা ছিঁড়ে নিল সোনালী। হাতে ঘষে নাকের কাছে তুলে ধরল। আঃ! গন্ধটা কী বুক-জুড়ান। মনে পড়ল ছোটবেলায় ঘোলের সরবতে মা লেবু পাতা ফেলে দিতেন একটি ক'রে, আর মায়ের হাতে সেই ঘোলের সরবতের মতো সুস্বাদু, এমন দেহ মন শীতল করা পানীয় আর কি কোথাও পেয়েছে সোনালী?

প্যারিসের সাঁজেলিশে বসে দবনে পান করেছে সোনালী, জেনিভায় শ্যাম্পান, রোমে, স্পেনে রৌদ্র-পক্ক আঙুরের রস, সব, সব। কিন্তু তবু তৃষ্ণা মিটল কই? মনে হয় মার হাতের সেই এক গ্লাস ঘোলের সরবৎ পেলে হয়তো এই আকণ্ঠ পিপাসা মিটত সোনালীর, বুক ঠাণ্ডা হতো।

কিন্তু কিসের এতো তৃষ্ণা সোনালীর? কিসের এতো জ্বালা? সব তো পেয়েছে সোনালী—অর্থ, যশ, সম্মান, প্রতিপত্তি সব-ই তো সোনালীর মুঠির মধ্যে,—সবই তো পেয়েছে ও। তবে কেন শান্তি পায় না মনে? কেন অনুক্ষণ জেগে থাকে এক অনির্দিষ্ট বেদনা, না পাওয়ার ক্ষোভ?

ম্যাডাম! আপনি এখানে? অনিল কখন এসে দাঁড়িয়েছে পেছনে, কী সর্বনাশ! এই লেবু গাছ কেয়াঝাড়ের মধ্যে এসে দাঁড়ায় কখন এই বিকেল বেলায়।

কেন কি হয়?

কেন জানেন না! এখানে সাপ আছে যে।

সাপ!

বেশী চমকালো সোনালী, বছর বারো আগে যখন প্রথম ষ্টুডিওয় এসেছিল কী ভয় পেয়েছিল তক্ষকের টকটক ডাক শুনে।

ও কিসের আওয়াজ!

তক্ষক। খুব নির্লিপ্ত ভাবে-ই পাশে দাঁড়ানো কার্তিক বেয়ারা মেক-আপের টেবিল গুছোতে গুছোতে বলেছিল।

তক্ষক! মানে সাপ তক্ষক?

হ্যাঁগো! এ যে রাজা পরীক্ষিতকে যিনি কামড়েছিলেন, কার্তিকের নিশ্চিত মুখের দিকে তাকিয়ে একটু ভয়-ই পেয়েছিল সোনালী দু পা পিছিয়ে এসেছিল।

সাপ আছে এখানে?

কত! হুঁ!

কার্তিক আপন মনে-ই টেবিল গুছিয়েছিল, সুন্দর ক'রে পাট ক'রে দিয়েছিল সোনালীর ছাড়া জামা-কাপড়। আর ঘর থেকে বাইরের লনটুকু আসতে আসতে গাড়িতে উঠে পর্যন্ত সোনালীর গা ছমছম করেছে, ভয়ে বুকের মধ্যে গুরুগুরু।

এখন মেক-আপ রুমে বসে মুখে যখন ঠাণ্ডা জলের ফোয়ারা ছিটিয়ে দেন তখন যদি ছাদের কোণে বাসা বাঁধা তক্ষকটা টকটক ক'রে ডেকে ওঠে তাহলে-ই বরং মন খারাপ হয়ে যায় সোনালীর। মনে হয় শুভ লক্ষণ দেখা গেল না আজ—স্যুটিং-এ অনেক গোলমাল হবে। অনেক এন. জি.। এন. জি.—কী অদ্ভুত সংক্ষিপ্তকরণ অর্থাৎ not good সেই সট আবার নিতে হবে আর ঠিক হলে O. K.

আর তক্ষকটা টকটক ক'রে ও. কে. ও. কে.-ই বলে—তাই জন্যে-ই ----

চলুন ম্যাডাম, পা চালিয়ে চলুন, সবাই ব'সে রয়েছে আপনার জন্যে----

সোনালী যেতে যেতে দাঁড়াল, ছুটতে হবে না-কি সেজন্যে?

অর্থাৎ অন্যান্য অভিনেতা অভিনেত্রী, পরিচালক, ক্যামেরাম্যান যদি অপেক্ষা ক'রে-ই থাকে সোনালীর জন্যে, তো থাক না। সোনালী সেনও কি যে কোন' উঠতি অভিনেত্রীর মতো পরিচালকের হুকুমমাত্র উঠে ছুটবে, সেটে হাজির হবে একেবারে ঘড়ি ধ'রে। আগে আগে তাই করতে হতো অবশ্য সোনালীকে। শুধু কি পরিচালকের হুকুম মেনে চলা? তখন ওকে চলতে হয়েছে পরিচালক প্রযোজকদের মর্জি মতো, দিতে হয়েছে অনেক কিছু।

কথা ঘোরাল অনিল, এর-ই মধ্যে কেমন ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব দেখেছেন? বিকেল হলো, সন্ধ্যে হলো আর সঙ্গে সঙ্গে হিম হিম আমেজ। অথচ এই তো সবে পূজো শেষ হলো।

হ্যাঁ। এবার শীত তাড়াতাড়ি-ই পড়বে মনে হয়।

ওরা এসে আবার পর্দা ঠেলে ঢুকলো সেটের আধ-আলো, আধ-ছায়ার মায়াপুরীতে।

মিসেস সেন, মৃদু অনুযোগ-ভরা গলায় প্রবীণ পরিচালক বিজয় ব্যানার্জী এগিয়ে এলেন, কোথায় ছিলেন বলুন তো! কতক্ষণ ধ'রে লাইট ক'রে ব'সে আছি। সবাই রেডী।

সোনালী বলল, ওদের রিহার্সাল দেয়ালেন না কেন বেশী ক'রে।

বিজয় ব্যানার্জী আর কোন কথা বলতে সাহস করলেন না। বুঝলেন ভাল নেই সোনালীর মেজাজ। আর বেশী কিছু বলতে গেলে হয়তো সেট ছেড়ে চলে-ই যাবে, স্যুটিং বন্ধ হয়ে যাবে, তখন আর এক কাণ্ড।

উঃ! দাঁতে দাঁত চিপে রাগ আটকান বিজয় ব্যানার্জী।

এই ষ্টারগুলো আজকাল যা হয়েছে, Industryর সর্বনাশ হচ্ছে এই ষ্টারডামের জন্যে। অথচ সে কথা কি কেউ বুঝবে। এদের মতন বড় star ছবিতে না থাকলে ডিষ্ট্রীবিউটার না দেখে ছবি নেবে, চোখ বুজে টাকা দেবে? রাগে, ক্ষোভে মাথার মধ্যে পর্যন্ত যেন জ্বালা ধরে যায় বিজয় ব্যানার্জীর। ছবি ফ্লপ করলে দোষ হবে ডিরেক্টারের, বাজারে তার দাম কমবে, নতুন কনট্রাক্ট হওয়া মুস্কিল হবে। অথচ এই সব স্টার? বই যত পড়বে তত নিজেদের দাম বাড়াবে এরা। আর মূর্খ ডিষ্ট্রীবিউটাররা ছবি করার আগেই কনট্রাক্টের সময় নিশ্চিত হতে চাইবে সোনালী সেন সেই ছবিতে আছে কী না। অথচ এই সোনালী সেনের নাম কে জানতো? যদি 'অনুপমা' বইটা ওরকম হিট না হোত! আর তার কৃতিত্ব কি সোনালী সেনের? সবটুকু প্রশংসাই পরিচালকের প্রাপ্য। প্রাণহীন পুতুল সোনালী সেনকে দিয়ে অমন জীবন্ত অভিনয় কে করিয়েছিল? পরিচালক ছাড়া আর কে? অবশ্য সে পরিচালক বিজয়বাবু নন। কে এক নতুন ছোকরা সোমেন না কি যেন নাম। এখনও তার অবস্থা খুব খারাপ। হাতে কাজ নেই। শরীরও ভাল নয়। জনশ্রুতি সোনালী সেনের নিয়মিত অর্থ সাহায্য তাকে বাঁচিয়ে রেখেছে? হ্যাঁ এদিকে অহঙ্কারী হলে কী হবে, মেয়েটার না-কী সে সব গুণ অনেক আছে, দয়ামায়া আছে।

পরিচালকদের-চোখের কোণ দিয়ে দেখেন, প্রযোজক-পরিবেশকদের সঙ্গে ডেকে কথা বলেন না, অথচ একটা সামান্য শিল্পী, এমন কী একষ্ট্রার সঙ্গেও কতো হাসি-গল্প, বেয়ারা, ইলেকট্রিসিয়ান, মেকআপ-ম্যান—তাদের সঙ্গে পর্যন্ত আলাপের শেষ নেই। কেমন যেন! —বিজয় ব্যানার্জী বোঝেন না এই অভিনেত্রী শ্রেষ্ঠ সোনালী সেনকে।

বিজয়বাবুকে নিজেই এসে বুঝিয়ে দিতে হলো, এই দৃশ্যটি কী ভাবে নিতে চান উনি।

সোনালী মন দিয়ে শুনলো, শুনতে শুনতে চোখ বুজে এল ওর, ঠোঁট দুটো ঈষৎ ফাঁক, অর্থাৎ নিবিষ্ট হয়েছে সোনালী, দৃশ্যের স্থান-কাল-পাত্র আর সংলাপ মনোমতো হয়েছে ওর আর তা না হলে যে সোনালী সেন তক্ষুণি চেঁচিয়ে ওঠে, সময় সময় প্রায় ধমকে ওঠে পরিচালকদের, এ সত্য তো সবাইয়ের জানা।

বড় ভয়ে ভয়ে আছে তাই প্রবীণ পরিচালক বিজয় ব্যানার্জী। সোনালীর মহারাণীর মতো মেজাজের জন্যে তাকে নিয়ে ছবি তোলার আদৌ ইচ্ছা ছিল না বিজয়বাবুর। কিন্তু উপায় কি?

শুধুমাত্র সোনালী সেন তাঁর ছবিতে আছেন ব'লেই আজ পাঁচ বছর পরে বিজয় ব্যানার্জী একটা চান্স পেয়েছেন। আর এই বইটা যদি একবার লাগাতে পারে তাহলেই ব্যাস। অন্ততঃ কয়েক বছরের জন্যে নিশ্চিন্ত, গোটা কয়েক কনট্রাক্ট নিশ্চয় হবে। আর সেই টাকা নিয়ে আর ছিনিমিনি খেলা নয়, আর নয় দু হাতে উড়িয়ে দেওয়া, ফূর্তির জোয়ারে গা ভাসানো।

এবার সব টাকাকে ইটে গেঁথে ফেলবেন তিনি, বাড়ি করবেন, দুখানা বাড়ি। একটায় থাকবেন। একটা ভাড়া দেবেন। তখন আর ভাবনা কিসের? নাই বা থাকল কনট্রাক্ট, মাসের শেষে বাড়ি ভাড়া আর বাজার খরচের চিন্তা করতে হবে না তো! তখন কি তিনি কেয়ার করবেন সোনালী সেন তাঁর ছবিতে নামতে রাজী হলো কী না হলো!

ঠিক আছে।

সোনালী চোখ মুছল। বিজয় ব্যানার্জীর মুখের দিকে হাসি-ভরা চোখে চাইল। আবার ঘাড় নেড়ে বলল ঠিক আছে।

অর্থাৎ সংলাপ মনে মনে বার কয়েক ব'লে নিয়েছে সোনালী, কোথায় কতখানি আবেগ থাকবে কোথায় কতটুকু, থেমে গলার সুর কেমন নামিয়ে কেটে কেটে বলতে হবে কথা—সে সব সোনালী মনে মনে ব'লে নিজে-ই ঠিক ক'রে নিয়েছে—এখন সট নেবার অপেক্ষা। অবশ্য-ই তার আগে মনিটার হবে, তারপরে তো আসল টেক।

মনিটার হলো—একবার নয়, বার বার তিন বার।

না মঞ্জু না, এই তিনটে মাত্র শব্দ, তারপরই সোনালীর হাত ধ'রে টানতে হবে অরূপ-কুমারকে, বুকের কাছে নিবিড় ক'রে ধরতে হবে, আরো গাঢ় গলায় বলতে হবে, তোমায় আমি ছেড়ে দেব না, দেব না, দেব না।

'না, মঞ্জু না' পর্যন্ত বলতে অরূপকুমারের আটকাচ্ছে না, কিন্তু সোনালীর হাত ধ'রে কাছে টানতে গিয়ে কেমন অসহজ হয়ে যাচ্ছে সে। সোনালীর চোখের দিকে চোখ তুলে তাকাতে গিয়ে-ই বারবার মুখ নামিয়ে নিচ্ছে, আর ছেড়ে না দেবার প্রতিশ্রুতি যথেষ্ট বিশ্বাস-যোগ্য মনে হচ্ছে না।

সোনালী দেখল, একবার, দুবার, তিনবার। ছেলেটার লজ্জা পাওয়া থমথমে মুখের দিকে একবার তাকাল, তারপর বিজয়বাবুর দিকে ফিরে

Puja Greetings :—

UNITED INDUSTRIAL COMPANY.

Govt. Contractors,
Exporters and Importers.

Dealers in :

Hardware, Pipes & Colliery Stores.
Mechanical, Structural & Electrical Engineers.

167, Old China Bazar Street, Calcutta-1

Phones : **22-8420 & 22-5436**

বললেন, মিষ্টার ব্যানার্জী আমার একটা সাজেসান ছিল।

বলুন বলুন মিসেস সেন, বিজয় ব্যানার্জী সোনালীর দিকে এগিয়ে এলেন।

আমি সমস্ত ধরণটা-ই বদলে দিতে চাই। কেন অতো চেঁচামেচি ক'রে প্রেম নিবেদন করবে ও, হাত ধ'রে টানাটানিরই বা দরকার কি? একটু কাছে সরে এসে খুব আস্তে একটু গাঢ় গলায় যদি বলে---

সোনালী অরূপকমারের সংলাপ ব'লে গেল আর শেষ হওয়ামাত্র অরূপকুমার এবং মনিল হাততালি দিয়ে উঠল, চমৎকার। অপূর্ব। আরো বেশী ন্যাচারেল।

বিজয় ব্যানার্জী গম্ভীর হয়ে গেলেন, এই ভাবে টেক হোক তাহলে, অরূপ। এসো ভাই, মনিটারটা আর একবার হয়ে যাক। সবাই বুঝল অভিনয়ের ধরণ এভাবে বদলে যাওয়াটা বিজয় বাবুর মনঃপূত হয়নি। অথচ প্রতিবাদ করার সাহসও নেই তার। বদলেছে যে স্বয়ং সোনালী সেন।

অতঃপর মনিটর হলোএবং দু'বার এন. জি'র পর ও. কে. সট হয়ে গেল, সোনালী হাই-তুলে ঘড়ি দেখল পাঁচটা।

এবার উঠতে হবে, পাঁচটার পর এক মুর্হুত সোনালী থাকতে চায় না। থাকেও না কোনও দিন।

পাঁচটাতে-ই প্যাক আপ, অর্থাৎ যবনিকা-পতন, কিন্তু দুটো খুচরো সট নেবার আছে বিজয়বাবুর, এক ঘণ্টা এক্সটেনশেন নিয়েছেন তাই।

সোনালী গলা তুলে মিহি সুরে ডাকলো, আয়া।

নেপালী সুশ্রী তরুণীটি মোড়া নিয়ে সেটের এক কোণে সুটিং দেখছিল এতক্ষণ, সোনালীর ডাকে ছুটে এল, হ্যাঁ মেমসাহেব।

এগিয়ে এসে সোনালীর ব্যাগ নিল, বিলিতি সচিত্র মাসিক পত্র-পত্রিকাগুলোও নিল।

সোনালী দুই হাত জোড় ক'রে একটু তুললো। ঝকঝকে দাঁতে সেই সোনালী হাসি হাসলো। অরূপকুমারের মুগ্ধ দৃষ্টির সামনে বোধ হয় একটু অপ্রস্তুত বোধ করলো, মাথা নামিয়ে তাড়াতাড়ি হেঁটে ফ্লোরের বাইরে দাঁড়াল।

এখনও সন্ধ্যে হয়নি, কিন্তু দিন শেষ হয়ে এসেছে, পশ্চিমের আকাশ লালে লাল।

সেই দিকে তাকিয়ে আনমনা হয়ে গেল সোনালী। কেমন যেন হঠাৎ, বিষণ্ণ, ক্লান্ত মনে হলো নিজেকে।

কতদিন যেন হলো?

যেতে যেতে থমকে দাঁড়িয়ে হিসেব কষল সোনালী, তেরো---। হ্যাঁ, পুরো তের বছর কেটে গেল ওর এই 'অল লাইট, আর কোয়েট প্লিজ' সেটের মধ্যে। বাইশ বছর বয়সে এসে ঢুকেছিল, আজ বেড়ে বেড়ে তেত্রিশ বছর এসে থেমেছে। এখন কি একেবারে থেমে যাবে? যৌবন তো ঐ পশ্চিম আকাশের সূর্যের মতো অস্তমুখ, আর কতদিন সাধারণের ভাল লাগবে তাকে। নতুন মুখ নতুন চেহারা দেখবার জন্য তাদের আগ্রহ জাগবে না কী?

সোনালী জানে, জাগবে, জাগছে।

আর পরিচালকরা যত-ই তার দরজায় এসে ভীড় জমান, নতুন একটি সুশ্রী মুখের সন্ধান পাওয়ামাত্রই আবার ছুটবেন সেখানে, আবার তাকে তুলে ধরবেন অসামান্য প্রতিভা ব'লে। তখন আবার সেই নতুন মুখের রাজত্ব। সে-ই মক্ষিরাণী। সোনালী জানে চিত্র-জগতে যারা অভিনয় করতে আসে তাদের পরমায়ু কতো স্বল্প, উল্কার মতো দ্রুত নিঃশেষ হয় তাদের জীবন, তাইত এতো হুড়োহুড়ি এত ছুটোছুটি। তাই এই ভোরের শিশিরের মতো ক্ষণস্থায়ী সময়টুকু বৃথাই যেতে দেয় না, দেবে না। কখন জনপ্রিয়তা চলে যাবে তার কে জানে? লক্ষ লক্ষ টাকা আসা বন্ধ হয়ে যাবে নিমেষে। তাই সোনালী এখন দু' হাতে টাকা কুড়ায়। লক্ষ টাকার এক কপর্দক কমে সই করে না। ভাল চরিত্র, দরিদ্র প্রযোজক কারো খাতিরে-ই না।

এমন কী যে কনকলতাকে ও এত ভালবাসে শ্রদ্ধা করে তাঁর কথাতেও তাঁর অনুরোধেও কম টাকায় কাজ করতে রাজী হয়নি সোনালী। কনকলতা বলেছিলেন, 'সোনা আমরা কয়েক জন শিল্পীরা মিলে করছি এই ছবিটা। সকলেরই শেয়ার থাকবে এতে, তাই গোড়াতে কেউ টাকা নিচ্ছে না, আর---

থামিয়ে দিয়েছিল সোনালী, না কনকদি, শেয়ার চাই না আমার, আমায় আপনারা নগদ টাকা-ই দেবেন।

কিন্তু সেওতো তোকে এখন কম নিতে হবে সোনা। আমার মুখ চেয়ে।

কনকদি! প্লীজ, ঐ কথাটি বলো না।

সোনালী হাত জোড় ক'রে বলেছিল, আমার যা রেট তার থেকে এক পয়সা কম নিতে পারব না আমি

সে কী সোনা? আমার খাতিরেও না?

না কনকদি। ভেবে দেখ, আজ বাজারে আমার চাহিদা আছে বলেই তোমরা আমায় চাইছ, কিন্তু কয়েক বছর বাদে যখন আমার চেহারা খারাপ হয়ে যাবে, আমার আর বক্স অফিস থাকবে না, তখন যদি আমি বলি---আমার অনুরোধ রাখতে তোমরা কি আমায় হিরোইন করবে?

এ কথার জবাব দিতে পারেননি কনকলতা, ক্ষুণ্ণ মনে ফিরে গিয়েছিলেন অন্য মুখের সন্ধানে।

আর শুধু কনকলতা কেন, অতো বড় যে ডিরেক্টার মোহন মুখোপাধ্যায়, যাঁর ছবিতে চান্স পাবার জন্যে অভিনেতা-অভিনেত্রীর আকুলতার সীমা নেই, ধন্য হয়ে যায় তাঁর ছবিতে কাজ করতে পেরে, সেই তাঁকেও ফিরিয়েছে সোনালী। এক লক্ষ টাকা দেওয়া সম্ভব নয় তাঁর পক্ষে, বলেছিলেন তিনি। বোধ হয় ভেবেছিলেন তিনি যে তাঁর ছবির জন্যে সোনালীকে ডাকছেন এই তো বড় দাম দেওয়া।

মিসেস সেন! আমি বলছি আপনাকে, 'আমি' শব্দটার ওপর জোর দিয়েই বলেছিলেন মোহন মুখার্জী, এই রোলটার জন্যে বিশেষ ক'রে বলছি মিসেস সেন, আপনি পড়ে দেখুন, স্ক্রিপ্ট দেখুন, কী স্কোপ, এই ছবি ক'রে যা নাম করবেন, জানি জানি।

জানি জানি, সেই মধুর হাসি হেসে সোনালী তাঁকে থামিয়ে দিয়েছিল, আপনার ছবিতে কাজ করতে পারা তো সৌভাগ্য মিষ্টার মুখার্জী কিন্তু---, একটু থেমে বেশ হাসি হাসি মুখে খুব সহজেই বলেছিল সোনালী, আমার রেট আমি কমাতে পারবো না মিঃ মুখার্জী।

মোহন মুখোপাধ্যায় বোধ হয় অবাক হয়ে গিয়েছিলেন বোকা মেয়েটার কথা শুনে। কিন্তু তবু তিনি এসেছিলেন আরো কয়েকবার। অনেক আলাপ-আলোচনা হয়েছিল। বড় বড় ক'রে ছবি ছাপা হয়েছিল সব কাগজ, পত্রিকায়।

যারা বাংলা দেশ উদগ্রীব হয়েছিল একটা খবর শোনার আশায়---সোনালী সেন আর মোহন মুখোপাধ্যায়ে যুক্ত নাম কিন্তু পূর্ণ হয়নি সে আশা তাদের। সোনালী মোহনবাবুর প্রস্তাবে রাজী হয়নি। পঞ্চাশ হাজার টাকা সে নিত পাঁচ বছর আগে। এখন তাকে নিতে হলে এক লক্ষ টাকার এক নয়া পয়সা কমে হবে না।

মেম সাহেব, সামনের সিট থেকে কাঞ্চীর ডাকে সোনালী চমকে উঠল। কী হয়েছে আজ সোনালীর? বারে বারে মন কেন ভেসে যাচ্ছে পুরণো দিনের পুরোন কথায়? মেমসাহেব, বাবাকা ঘর পাহেলে তো যানা হয় না?

হ্যাঁ কাঞ্চী। তাকে নির্দেশ দিয়ে সোনালী গাড়ির নরমে গা এলিয়ে দিল। হ্যাঁ, আজ বাবাকে দেখতে যেতে হবে। আজকাল প্রায় রোজ-ই ষ্টুডিও ফেরত বাবাকে দেখে যায় সোনালী কারণ পরে আর হয়ে ওঠে না।

মা মারা যাবার পর থেকে বাবার শরীর ভাল নেই। আর কে-ই বা দেখাশুনো করে। বৌদিরা নিজের নিজের ছেলেমেয়ে স্বামী নিয়েই ব্যস্ত, আর তেমন পয়সা-ই বা কোথায়? বাবার জন্যে একটা আলাদা লোক সোনালী-ই তো জোর ক'রে রেখে দিয়েছে। বাবার দুধ ছানা ফলের খরচ সানন্দে বহন করে সে। করতে পেরে ধন্য হয়ে যায়।

একমাত্র বাবাই সোনালীর ফিল্মে নামায় আপত্তি করেননি। একমাত্র তিনিই বুঝতে পেরেছিলেন সমীরকে বাঁচাতে যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন, তাতে এই পথ নেওয়া ছাড়া সোনালীর উপায় নেই।

মা, মাসী, কাকী, বৌদিরা কী চেঁচামেচি

করেছেন, বলেছেন তাঁরা ওর মুখ দর্শন করবেন না। শুধু বাবাই শান্তভাবে সাহস দিয়ে গেছেন সোনালীকে, প্রেরণা দিয়েছেন।

না হলে কি একা একা পারতো সোনালী সেই সব অন্ধকার দিন পেরিয়ে আসতে?

উঃ কী সব দিন। কাঁচরাপাড়া স্যানেটোরিয়ামে অসুস্থ সমীর, প্রতি মাসে তাঁর খরচ পাঠাতে হবে, ওষুধ ইঞ্জেকশানের দাম, অপারেশনের খরচ। এদিকে ঘরে খোকার দুধের জন্যে গয়লার নিত্য চেঁচামেচি, বাড়িয়ালার তর্জন গর্জন। শীতের রাত্রে গায়ে একটা গরম কাপড় নেই, গরমে নেই ইলেকট্রিক ফ্যান। খোকাকে সারারাত হাওয়া করতে করতে হাত ব্যথা হয়ে গেছে সোনালীর। ঘুম ভেঙ্গে অসহ্য ক্ষিধেয় মাথার মধ্যে পর্যন্ত জ্বালা ধরে গেছে।

টাকা চাই! টাকা!

সেদিন বারবার নিজেকে বলেছে সোনালী টাকা রোজগার করতেই হবে, যেমন ক'রেই হোক, যে ভাবেই হোক্।

কিন্তু সহজ হয়নি অর্থ উপার্জন করা। লক্ষ টাকার উচ্চ শিখরে উঠে আসতে অনেক বাঁকা-চোরা পথ পেরিয়ে আসতে হয়েছে সোনালীকে, দিতে হয়েছে অনেক দাম পরিচালকের বাড়ি হাঁটাহাটি করেছে। তার স্ত্রীর সঙ্গে ঘুরে ঘুরে তার সংসারের খুঁটিনাটি কাজ করেছে। রান্নাঘরে গিয়ে রুটি সেঁকেছে, কলতলায় গিয়ে কাপড় কেচেছে, তবু কিছু হয়নি।

কি জান! পরিচালক গণেশ চক্রবর্তী হাঁটুতে হাত বোলাতে বোলাতে বলেছেন, রিস্ক নিতে পারছিনে তো তোমায় নিয়ে। বক্স অফিস চাই তো।

ডিরেক্টর গোপাল ঘোষ মুখের ওপর স্পষ্ট বলেছেন, কেন আসতে চাইছেন এই লাইনে, আপনার বিশেষ সুবিধা হবে ব'লে মনে হয় না।

আর সেই 'মনের মায়া' ছবিটায়। সাত দিন স্যুটিং হবার পর, পরিচালক নতুন মুখ সোনালী সেনকে বাদ দিয়ে, নতুন ক'রে স্যুটিং আরম্ভ করলেন, তখনকার বিখ্যাত তারকা কমলকুমারীকে নিয়ে।

কিন্তু ফল কি হোল?

'মনের মায়া' চলেনি সাত দিন। আর তারপর 'অনুপমা' রিলিজ হলো। রজতজয়ন্তী, সুবর্ণ জয়ন্তী; হীরক জয়ন্তী হয়ে শেষ হলো অনুপমা। পুরো এক বছর ধরে তিনটে হাউসে কোলকাতা শহরে চলেছিল বইটা।

আর সে কি উত্তেজনা, কি আনন্দ। সব অপমানের প্রতিশোধ নেওয়া হলো, নিজের মনে বার বার বলেছিল সোনালী। আর তার চেয়ে আশ্বস্ত হয়েছিল এই ভেবে যে অতঃপর আর টাকার ভাবনা করতে হবে না, আর সেইটাই তো আসল।

মেমসাহেব, দরজা খুলে কাকী ডাকলো।

মাথায় কাপড় তুলে, ঘোমটায় প্রায় সম্পূর্ণ মুখ ঢেকে সোনালী নামল।

এই এক জ্বালা।

বিখ্যাত হওয়ার পর থেকে স্বচ্ছন্দ, স্বাধীন আর ঘোরাফেরা চলে না। যেখানেই যাও ভীড় জমে যাবে কৌতূহলী দর্শকের। শুধু কাছে এসেই সন্তুষ্ট নয় তারা, অশিষ্ট উক্তি করবে, চিমটি কেটে পালিয়ে যাবে।

অবাক হয়ে গেছে সোনালী। এই না-কী তাদের প্রিয় তারকার প্রতি ভালবাসার নিদর্শন।

দুই

বাবাকে দেখে বৌদির সঙ্গে গল্প ক'রে বাড়ি ফিরতে ফিরতে বেশ রাত হলো সোনালীর। অতো রাতে বাইরের ঘরে আলো জ্বলতে দেখে বিরক্ত হলো সে।

এত রাতে আবার জ্বালাতে এল কে?

বার বার ক'রে সকলকে ব'লে দিয়েছে, প্রাইভেট সেক্রেটারী প্রভাত রায়কে ব'লে দিয়েছে সোনালী, রাত্রে স্যুটিং-এর দিনে কোন বিজনেস টক নয়। কনট্রাক্ট করতে চাও, কথা বলতে চাও এস সকালে। আর প্রাথমিক কথা বলার জন্যে তো প্রভাত বাবু-ই আছেন।

কড়া কথা শোনাবে ব'লে ঘরে ঢুকল সোনালী, নমস্কার।

কিন্তু প্রতি নমস্কার ক'রে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল যে ব্যক্তিটি, তাকে দেখে অবাক হয়ে গেল সোনালী, আপনি।

অরূপকুমার। মৃণাল মিত্র!

হ্যাঁ! অনেকক্ষণ এসেছি। স্যুটিং-এর পর-ই আপনি চলে এলেন, দেখা হোল না, কিছু কথা ছিল আপনার সঙ্গে—, বলতে বলতে অপ্রতিভ হলো ছেলেটা। নিজের কাছেই বোধহয় অসঙ্গত ঠেকল এই অপেক্ষা করার ব্যাখ্যা।

এসেছেন, বেশ করেছেন কিন্তু আপনাকে এখানে বসিয়েছে কেন?

নীচের এই ঘরটা নিতান্ত একটা সাধারণ প্লাষ্টিকের ঢাকা দেওয়া সোফা সেট দিয়ে সাজানো। কোণে কাচের ফুলদানিতে প্লাষ্টিকের ফুল।

নিতান্ত বাইরের লোক, বন্ধু ব'লে পরিগণিত হবার উপযুক্ত নয় যারা, তারা-ই এসে বসে এই ঘরে, অপেক্ষা করে, তারপর দরকারী কথা বলে চলে যায়।

চলুন চলুন ওপরে চলুন, সোনালী হাত বাড়িয়ে দিল, এ ঘরে আমি 'বিজনেস টক' করি খালি। বেয়ারাটা আপনাকে এখানে বসাল কেন? বুঝতে পারেনি বোধহয়। কার্পেট মোড়া বড় কাঠের সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে নিজের মনে-ই হাসল সোনালী। না! এ ছেলেটি বড় তাড়াতাড়ি বড় বেশী এগিয়ে যেতে চায়! আড়চোখে অরূপকুমারের মুখের দিকে তাকিয়ে নিল সোনালী। শুধু অবাক নয়, অভিভূত হয়ে গেছে অরূপকুমার। অপলক চেয়ে-চেয়ে দেখেছে সিঁড়ির পাশে, পাশে যামিনী রায়ের আঁকা ছবি, দেখেছে সিঁড়ির মধ্যের জায়গায় সোনার মতো ক'রে মাজা পেতলের কলসি সুন্দর আলপনার ওপর বসান, তাতে রক্তগোলাপ গুচ্ছ।

সিঁড়ি দিয়ে উঠে বারান্দায় যেতে যেতে আরো অনেক কিছু-ই দেখবে অরূপকুমার। দেখবে শুধু অর্থ-ই নয়, সুরুচি, সহজ শিল্পবোধ কেমন ক'রে মিশে আছে সোনালীর উড ষ্ট্রীটের বাড়িতে যে আসে সে-ই মুগ্ধ হয়ে যায়, অবাক হয়ে শুধু দেখে।

এমন উন্নত শিল্পবোধ, এমন রুচিস্নান কোথা থেকে পেলে সোনালী। কি ক'রে শিখল এমনভাবে ঘর সাজাতে। অতি-আধুনিক বিলিতি আসবাব, তার-ই সঙ্গে শান্তিনিকেতনী বেতের নীচু মোড়া আর বাঁশের তৈরী আলোর ষ্ট্যাণ্ড, জাপানী কায়দায় সাজানো ফুলের তোড়া, আর ভারতীয় পদ্ধতির কলস, আর বারান্দায় ছড়ানো অপরূপ নকসার মাদুর, সাক্ষ্য দিচ্ছে সোনালীর উন্নত রুচির বিদগ্ধ মনের।

এই স্তুতি শুনে শুনে নিজের মনেই হাসে সোনালী।

ওরা কি জানে কত টাকা কি দিতে হয় সেই বিখ্যাত ইনটিরিয়ার ডেকরেটার মিঃ হিগিনসকে। লণ্ডন শহরেও তাঁর নাম কম নয়। তিনি শিল্পী, সাহিত্য-রসিক এবং অনেক কিছু। সোনালীর সঙ্গে লণ্ডনেই আলাপ। তাঁকে আসা-যাওয়ার খরচ দিয়ে সোনালী এনেছিল। তিনি নিজের হাতে সাজিয়ে দিয়েছেন সোনালীর এই উড ষ্ট্রীটের বাড়ি। হাসি পায় তাই সোনালীর মুগ্ধ গুঞ্জন শুনে। তারা কি জানে এ-সবই কিনেছে সোনালী। সব কেনা যায় পৃথিবীতে—যশ, সম্মান, রুচি—সব। সব। শুধু টাকা থাকা চাই, হ্যাঁ অনেক টাকা।

আপনার অসুবিধা করলাম তো? নীচু নরম আসনটার গভীরে ডুবে অরূপকুমার

বুকের দিকে মুখ তুলে তাকাল, রাত হয়ে গেছে তো।

না না না, এমন আর কি রাত। উনি ত এখনও ফেরেন নি। সোনালী বাঁ হাত তুলে হীরে বসান সুন্দর ঘড়িটায় সময় দেখল, দশটা বাজে, উনি এখনও ফিরলেন না কেন?

উনি কে? আপনার স্বামী।

সোনালী হেসে ফেলল অরূপকুমারের জিজ্ঞাসার ধরণ দেখে। কি ভেবেছিল ছেলেটি? ওর স্বামী নেই, কেউ নেই, একা এই বাড়িটায় থাকে? নির্বান্ধব, সঙ্গীহীনা অভিনেত্রী, তাই এসেছে এতো রাত্রে। কি চায় ও? কি ভেবেছে সোনালীকে?

কিন্তু না। ভুল ভাঙ্গল।

অরূপকুমার একটু লজ্জা লজ্জা গলায় বলল, একটা সুখবর আছে, তাই দিতে এলাম আপনাকে, ভেবেছিলাম রাত হয়েছে, চলে যাই। কিন্তু—

কি সুখবর, অনেক কনট্রাক্ট হয়েছে বুঝি?

না তা নয়, অবশ্য কনট্রাক্টের কথা হয়েছে।

কি তবে?

স্যানেটোরিয়াম থেকে খবর দিয়েছে মাধুরীর অপারেশন সাকসেসফুল। ও ভাল আছে, হয়ত, হয়ত আর ক'মাস পরে-ই ছাড়া পাবে।

সত্যি। খুব খুশী হলাম।

মুখে নয় শুধু, সত্যিই শুনে ভাল লাগল সোনালীর। একজন যক্ষ্মারোগী—যে কোন স্থানেই হোক না কেন—ভাল হচ্ছে, ভাল আছে, খুব শীঘ্র ফিরে আসবে স্যানেটোরিয়াম থেকে বাড়িতে এ-খবর শুনলে-ই ভাল লাগে। আর কেউ না জানুক, সোনালী জানে এ রোগের কতো জ্বালা, কী দুর্ভাগ্য এই দেশে এই অসুখ হলে। রোগী নিজে তো বটে-ই, সঙ্গে সঙ্গে রোগীর আত্মীয়-স্বজন, স্ত্রী-পুত্র পর্যন্ত অস্পৃশ্য হয়ে যায় সমাজের চোখে তাই কোথাও কারুর এই অসুখ হলে থাকতে পারে না সোনালী। মনে হয় সে তার সমস্ত শক্তি দিয়ে প্রাণপণে সাহায্য করবে সেই লোককে—যে পুরুষ বা নারীর ফুসফুসের ভেতর সেই নোংরা পোকা ঢুকে বসেছে, কুরে কুরে খাচ্ছে তার জীবন, সুখ, আশা, ভালবাসা—সব।

মৃণালের কথায় হঠাৎ অনেক সব পুরনো দিন আর পুরনো কথা মনে প'ড়ে গেল সোনালীর, আর হঠাৎ কেমন ভয় ভয় ক'রে উঠলো সোনালীর, সেই যেমন অনেক বছর আগে করতো, যখন সমীর ছিল কাঁচরাপাড়া হাসপাতালে, আর টাকা পাঠাবার দিন পেরিয়ে যেত, অথচ টাকা জোগাড় হতো না।

কি হয়েছে আপনার? কি হলো?

অরূপকুমার উঠে সোনালীর খুব-ই কাছে দাঁড়ায়, শরীর খারাপ করছে—না কী মিসেস সেন? জল দেব? মিসেস সেন—

না না কিছু হয় নি আমার হঠাৎ মাথাটা কেমন ঘুরে গেল।

বসুন বসুন, আপনি বসুন।

অরূপকুমার বোধ হয় হাত বাড়িয়ে সোনালীর হাত ধরতে যাচ্ছিল, বসায় সাহায্যের জন্য, কিন্তু সেই মুহূর্তে যিনি ঘরে ঢুকলেন তাঁকে ঘ'রে উজ্জ্বল প্রদীপ্ত হয়ে উঠল সোনালীর মুখ, এসেছ! তুমি এসেছ। ছুটে গিয়ে সে দুহাত দিয়ে স্বামীকে জড়িয়ে ধরল, এত দেরী করলে কেন! আমার এতো ভয় হয়েছিল।

সমীর স্ত্রীর মাথাটা বুকের কাছে চেপে ধরলেন একবার, তারপর-ই ছেড়ে দিয়ে বললেন, মীরা ইনি।

ওহো! আলাপ করান হয়নি। ইনি-ই আমার নতুন ছবির নায়ক অরূপকুমার।

সেই যাঁর নাম তুমি-ই দিয়ে দিয়েছ!

হ্যাঁ হ্যাঁ।

অরূপকুমার বেশ একটু অবাক হলো, এত ভাব ওঁর স্বামীর সঙ্গে। ষ্টুডিওর তুচ্ছতম খবরটাও স্বামীকে দিতে ভোলেন না। আবার স্বামীর ফিরতে দেরী হলে মূর্ছা যাবার অবস্থা আর লোকজনের সামনে এমন ক'রে স্বামীর কণ্ঠলগ্না হতে বাধে না।

অথচ বাইরে, ষ্টুডিওর লোকে কতো কী-ই না বলে এঁর সম্বন্ধে। সোনালী না-কি শীঘ্রি ডাইভোর্স করবেন স্বামীকে। ওদের না-কি মতে একদম মেলে না। মিসেস সেনকে সব সময়-ই দেখা যায় এর-তার গাড়িতে—টাকাওয়ালা ব্যবসায়ীর সঙ্গে এখানে-ওখানে আরো কত কি! এতো বাজে কথাও বলতে পারে লোকে!

বসুন! বসুন! দাঁড়ালেন কেন? সমীর সেন এগিয়ে এসে বসলেন অরূপকুমারের মুখোমুখী। গলার টাইটা একটু আলগা ক'রে দিতে দিতে বললেন, কি খাবেন বলুন? কি দেব আপনাকে? ব্র্যাণ্ডি না হুইস্কি?

ব্র্যাণ্ডি? হুইস্কি? কলের পুতুলের মতো যেন সমীর সেনের কথার পুনরাবৃত্তি করলো অরূপকুমার।

খিল খিল ক'রে হেসে উঠলো সোনালী, উনি এখন বাবালক আছেন। ওসব চোঁন না।

তাই না-কি? strange। সমীর সেন উঠে দাঁড়ালেন, কিন্তু আমার সাবালকত্ব বহুদিনের, তাই যদি কিছু মনে না করেন—

নিশ্চয় নিশ্চয়, অরূপকুমার এতক্ষণে যেন ভাষা খুঁজে পেল, আপনি যা খুশী খান না।

বেয়ারা ঝকঝকে ট্রে নিয়ে এল। লম্বা সুন্দর বোতলে ঈষৎ হরিদ্রাভ পানীয়, কাঁচের পাত্রে বরফ এবং সোডার বোতল।

সোনালী শিশি খুলে গ্লাসে ঢাললো হুইস্কি, সোডা মেশাল, বরফের টুকরো ভাসাল গ্লাসে। স্বামীর হাতে পানীয় তুলে দিয়ে সোনালী আবার অরূপকুমারের দিকে ফিরলো, আপনাকে তাহলে একটা অরেঞ্জ স্কোয়াশ-ই দিই, না-কি লেমন?

যা ইচ্ছে আপনার।

হুঁ এতো বিশ্বাস আমার ওপর।

হাল্কা পায়ে সোনালী নিজেই উঠে গেল অরেঞ্জ স্কোয়াশ আনতে, আর মনে মনে ও যেন কয়েক মাস পরের ছবিটা প্রত্যক্ষ করলো। কতদিন-ই বা অরেঞ্জ স্কোয়াশ খাবে অরূপকুমার—বড় জোর একটা-দুটো মাস, তারপর হুইস্কির পর হুইস্কি চালাবে গ্লাসে। হয়তো নির্জলা-ই। সেই ঈষৎ তেতো বিদেশী পানীয় চুমুক দিতে দিতে ধীরে ধীরে লজ্জা ভাঙ্গবে তার। সাহস বাড়বে। কে জানে সবাইয়ের সামনে-ই হয়তো অশোভন, অসম্ভব কাণ্ড সব ক'রে বসবে।

তারপর কাটলো বহুক্ষণ। গল্প, হাসি-ঠাট্টা।

একসময়ে অরূপকুমার বললো, আজ উঠি।

এক্ষুণি উঠবেন। মীরু, তুমি অরূপবাবুকে খেতে বল। বাঃ! না খাইয়ে ছেড়ে দিচ্ছ যে! প্রথম দিন এলেন!

হ্যাঁ সত্যি খেয়ে যান আমাদের সঙ্গে, সোনালীর গলায় আবদারের সুর।

না না, আজ থাক না। অন্যদিন না হয়—

না না, কোন কথা নয়। আজ আপনাকে খেতে-ই হবে এখানে।

সোনালী সেন যদি এমন মধুর সুরে অনুনয় করেন, গলায় এমন অন্তরঙ্গতার সুর এনে এমনভাবে কাছে এসে দাঁড়ান, অরূপকুমারের সাধ্য কী না বলার।

অগত্যা অরূপকুমারকে আরো দু' ঘণ্টা বসতে হলো। খেতে হলো। তারপর সোনালী সেনের মস্ত সাদা শেভলেট ইম্পালা তাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে এল।

খাওয়ার পর সোনালী রাত্রের পোশাক প'রে মুখে ক্রীম মাখছে। লম্বা আয়নায় সমীর সেনের ছায়া পড়লো, তোমার নতুন শিকারটি বড় বেশী কাঁচা।

কি যে বল।

না সত্যি। সিগারেট ঠুকতে ঠুকতে সমীর সেন আবার বললেন, একটু সাবধানে থেক। ফট ক'রে আবার না সেই প্রকাশ রায়ের কেস হয়ে যায়। এও যদি আবার আত্মহত্যা করে বসে।

আঃ! যত সব অলুক্ষণে কথা। এ অমন পাগলামীটা করতে যাবে কেন? বৌ আছে এর। ভালবেসে বিয়ে করেছে।

ভালবেসে বিয়ে করেছে। হুঁ, সমীর সেন ঘরের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে যেন আপনার মনে-ই বললেন কথাটা; ভালবাসার বিয়ে? সে তো আমাদেরও হয়েছিল।

তা হয়েছিল! সোনালী মনে মনে জানে সে তার স্বামীকে-ই ভালবাসে। চিরদিন ভালবাসবে।

মীরু। সমীর সেন ঘুরতে ঘুরতে সোনালীর কাছে এসে দাঁড়ালেন, এই টাকায় সই ক'রে দাওতো।

সোনালী ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলো। self লেখা চেকের পাতা, টাকার অঙ্কটা লেখা নেই। অর্থাৎ যেমন খুশী বসিয়ে দেবেন পরে সমীর সেন, কতো টাকা গো?

ইচ্ছে ক'রে-ই কণ্ঠে মধু ঢাললো সোনালী। এমনভাবে কথা বললো যেন নিতান্ত-ই কথার পিঠে কথা বলা। কত টাকা নেবে সমীর সেন—ওর স্বামী সে সম্বন্ধে সত্যি-ই ওর কোন কৌতূহল নেই। আর কিছু বলার তো থাকতেই পারে না। কারণ সোনালীর সব টাকা-ই তো ওঁর। আর তাঁর জন্যে-ই তো সোনালীর টাকার প্রয়োজন।

দেখি কতো লাগে। সমীর সেন সই করা চেকটা শূন্যে নেড়ে কালী শুকতে শুকতে জবাব দিলেন, বোধ হয় একটু বেশী-ই লাগবে।

সোনালীর ইচ্ছে হোল জিজ্ঞেস ক'রে জেনে নেয় কত বেশী? কত টাকা? এই পরশুই তো সমীর সেন টাকা তুলেছেন—এর-ই-মধ্যে ফুরিয়ে গেল সে টাকা? কি করলেন? কোথায় গেল টাকা? ষ্টুডিওয় সোনালী কাণাঘুষোয় শুনেছে কোন রেস্তোঁরায় ব'সে অত্যধিক মদ্যপান করার পর না-কি খেলাচ্ছলে ভেঙেছেন তাদের কাঁচের বাসনপত্র, সেই বারে উপস্থিত সকল লোকের পানাহারের দাম দিয়েছেন, এক দানে উঠেছে বার শ' টাকা। সুতরাং একদিন-ই যে এক হাজার টাকা উড়ে যাবে, এ আর এমন আশ্চর্য কী! কিন্তু এভাবে চললে তো সোনালীর উপার্জনেও সম্ভব হবে না কিছু সঞ্চয় করা, দুদিনের জন্যে, অনাগত ভবিষ্যতের জন্যে, বিগত যৌবনা উপার্জনে অক্ষমা সোনালীর জন্য এই বৈভবের কোন অবশেষ-ই তো থাকবে না, শুধু কি তাই।

খোকন! তার জন্যেও তো কিছু রাখতে হবে।

কিন্তু কি বলবে সোনালী। সমীর সেন কি কিছুতে-ই বুঝবেন না যে এভাবে টাকা নিয়ে ছিনিমিনি খেললে সে টাকা আর কতদিন? আর কত উপার্জন করবে সোনালী! আর তো ও পারে না।

বাংলা-দেশে একলাখের বেশী দাম পাওয়া দুষ্কর। বম্বেতে অবশ্য চার পাঁচ লাখও হেলায় পাওয়া যায়, কিন্তু হিন্দী ছবিতে সোনালী তেমন নাম করতে পারেনি। ওর হিন্দী উচ্চারণ কিছুতেই তেমন নির্ভুল হলো না, উর্দু উচ্চারণেও সেই উত্তপ্ত আবেগ ঢালতে পারল না ও অভিনয়ে। আর ও চেহারা, যে মুখের জন্যে বাংলা-দেশে লোক পাগল হয়ে গেল, সেই মুখ, সেই হাসি ব্যর্থ হলো হিন্দী ছবির দর্শকের কাছে। পর পর তিনখানা করছে সোনালী বম্বে যাতায়াত করে। কিন্তু পর পর তিনটে ছবি-ই ফ্লপ। প্রত্যেকটা ছবির পর সোনালী আরো প্রাণপণে খেটে হিন্দী শিখেছে, হিন্দী শিক্ষক পণ্ডিতজীর মাইনে দ্বিগুণ করে প্রত্যেক দিন সকালে তাঁর কাছে ব'সে পাঠ নিয়েছে। নির্ভুল উচ্চারণ শেখার প্রাণপণ চেষ্টা করেছে। কিন্তু ফল হয় নি।

পণ্ডিত সোনালীর হিন্দী শুনে, ওর মুখের হিন্দী বয়েৎ শুনে বাহবা বাহবা করেছেন। এখানকার সব লোক, ষ্টুডিওর শিল্পীরা সবাই একবাক্যে বলেছে এমন নিখুঁত উচ্চারণ, এমন হিন্দীসুলভ অঙ্গভঙ্গী যে কোন বাঙ্গালী মেয়ের পক্ষে রীতিমতো বিস্ময়কর, কিন্তু ফলং নাস্তি। সোনালীর করা হিন্দী ছবি সেই মে-তিমিরে সেই তিমিরে।

তোমার রেট এবার আর একটু বাড়াও।

সোনালী চমকে ফিরে তাকাল, কি বললে। রেট আরো বাড়াব?

হ্যাঁ। এক লাখে বড় বেশী দিন দাঁড়িয়ে আছ। পঁচিশ হাজার বাড়াও।

পাগল হয়েছ? এই এক লাখ-ই যথেষ্ট বেশী। এই পেতে-ই—

কোথায়? এক লাখও তো ভেট দিতে পারছো না। কত প্রোডিউসার ফিরে যাচ্ছে রোজ। আর যারা এক লাখ দিতে পারে তারা এক লাখ পঁচিশও দিতে পারবে স্বচ্ছন্দে।

না না না, সে হয় না, সোনালী বারবার মাথা নাড়ল, সে হয় না।

বাংলা-দেশের পক্ষে এক লাখ-ই খুব। আর মার্কেট কি ছোট হয়ে গেছে দেখতে পাও না। অর্ধেক তো পাকিস্তানে। তাছাড়া—

সোনালী চুলে ক্লিপ আটকানো শেষ ক'রে উঠল। স্বামীর একান্ত কাছে ঘেঁষে বসলো ইজিচেয়ারের হাতলের ওপর। তারপর হাত দিয়ে সমীরের মুখের ওপর উড়ে-আসা চুল সরাতে সরাতে বললো, তাছাড়া আর বেশী নিয়ে লাভ-ই বা কি বল? ব্ল্যাকে-ই তো নিতে হবে সব। সামলাবে কতো?

বাঃ! সইতো আর তুমি সব টাকাটায় করছ না। এখন যেমন দশ হাজারে সই ক'রে এক লাখ নিচ্ছ, তখন তেমনি পনেরো হাজারে সই ক'রে এক পঁচিশ নেবে। আর না হলে বম্বের ষ্টারেরা কি ক'রে নিচ্ছে দশ লাখ, পনেরো লাখ।

তা সত্যি ওদের বুকের পাটাও খুব। কিন্তু আবার কেউ কেউ ধরাও পড়েছে। তারপর কেস চলেছে গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে বছরের পর বছর।

কিন্তু কোন্ মানে, হয় গভর্ণমেণ্টের এই অদ্ভুত টাকা বসানোর? নিজের রক্ত জল ক'রে খেটে আনা টাকা, সেই টাকায় নিজের অধিকার নেই?

এই নিয়ম নীরু। জগতে কেউ খাটে আর কেউ ভোগ করে। তোমাদের কষ্ট ক'রে রোজগার করা টাকা গভর্ণমেণ্ট নিয়ে যাবে আর তোমাদের চুপ ক'রে ব'সে তাই দেখতে হবে।

সত্যি! নিশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়াল সোনালী, আর হঠাৎ যেন অজান্তে-ই ওর চোখ চলে গেল সমীর সেনের হাতে-ধরা একটু আগের সই করা চেকের পাতাটায়।

জগতের এই নিয়ম। কেউ খাটে আর কেউ ভোগ করে।

তাই বটে! তাই নয়?

বিছানায় শুয়ে শুয়ে বার বার সেই কথাটাই যেন ঘুরে ঘুরে আসতে লাগল সোনালীর কানে। পাক খেতে লাগল মাথার মধ্যে। কেউ খাটে, আর কেউ ভোগ করে।

কিন্তু কেন? কেন আজ একথা এমন ক'রে মনে হচ্ছে সোনালীর। সমীর সেন তার স্বামী, তাঁকে রোজ রোজ চেক সই ক'রে দিতে হচ্ছে ব'লে-ই এমন কথা ভাববে সোনালী? কিন্তু সত্যি তাঁর জন্যে-ই তো খাটে। তাঁর জন্যে-ই তো এই রঙ-মাখা, দিনের পর দিন উজ্জ্বল আলোর তলায় দাঁড়িয়ে নিখুঁত অভিনয় করার চেষ্টা—সব, এসব-ই তো তাঁর জন্য।

না শুধু তাঁর জন্যে-ই নয়। আরো আছে। আরো একজন। খোকন। সোনালীর ছেলে সৌমিত্র সেন। তাকে শুধু যে ভাল খাইয়ে ভাল ভাবে রেখে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ ক'রে যেতে হবে, তাই নয়—তার জন্যে রেখে যেতে হবে বৈভব, সম্পদ, সম্পত্তি, যেন কোনো দিন সৌমিত্রকে তার বাবা সমীর সেনের মতে অর্থাভাবে স্যানিটোরিয়ামে ব'সে দুর্ভাবন

পূজা অভিনন্দন—

পঞ্চানন সোম

প্রসিদ্ধ লোহ, হার্ডওয়ার এবং শীট ব্যবসায়ী

রেজিঃ টাটা, ষ্টক্কো এবং হিন্দুস্থান ষ্টীল ডিলার্স ★ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রেজিষ্টার্ড ষ্টকিষ্ট ★ গ্যালভানাইজড রিজিং, গাটারিং এবং ডাউন পাইপ প্রস্তুতকারক

৯, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা—(৭)

ফোন ঃ ৩৩৪০১৬

করতে না হয়, তার স্ত্রীকে না ঘুরতে হয় লোকের বাড়ি বাড়ি, দোরে দোরে।

সোনালী বিছানার পাশে টিপয়ে সৌমিত্রের ছবিটার দিকে তাকাল। ফ্রেমশুদ্ধ ছবিটা হাতে তুলে নিল, নির্নিমেষ তাকিয়ে থাকল ছবির দিকে কিছুক্ষণ। এই ছবিটা কিছুদিন আগে-ই দেরাদুন থেকে পাঠিয়েছে সৌমিত্র। কী সুন্দর দেখতে হয়েছে খোকনটা। সবাই বলে ওর না-কী সোনালীর মতো-ই মুখের গড়ন। সেই অপরূপ চোখ আর সেই আশ্চর্য হাসি।

যাই বল। একটু কিন্তু মেয়েলি তোমার ছেলের মুখ, সমীর ক্ষেপিয়েছে সোনালীকে।

কখখোনো না। খোকা যে লম্বায় তোমার চেয়েও বেশী, সেকথা ভুলছ কেন?

তাতে কি? মাথায় খানিকটা তালগাছের মত বেড়ে গেলে-ই ছোল না-কি?

আহা খোকন মোটে-ই তাল গাছ নয়। ও-না রীতিমতো ব্যায়াম করে। খোকনের মতো ফিগার একটা দেখাও দেখি—হ্যাঁ। খুশীভরা চোখে অনেকক্ষণ চেয়ে থাকল সোনালী ছেলের ছবির দিকে।

খোকন শুধু চেহারাতে-ই সুন্দর নয়, লেখাপড়াতেও ভাল। এই বছর সিনিয়র কেমব্রিজ দেবে। তারপর সোনালী ওকে পাঠিয়ে দেবে বিলেত। হ্যাঁ বিলেতে-ই পড়াশুনো করুক খোকন। দরকার নেই কোলকাতার কলেজে পড়ে। এখানে হলে অবশ্য সোনালী খোকনকে অনেক বেশী কাছে পেতো। দেখতে পেতো রোজ চোখ ভ'রে। কলেজে যাবার সময় খাবার স্যাজিয়ে দিত সামনে নিজের হাতে। ও'র এলোমেলো ক'রে ছড়ানো বই-খাতা গুছিয়ে

মা তুমি সিনেমায় নাম কেন?

রাখতো। 'আবার ছাড়া সাড়ে টা পরালি' ব'লে ধমকাতো। পরিষ্কার জামা-কাপড় তুলে দিত হাতে হাতে। ওর জন্যে ইলেকট্রিক উনুনে গরম গরম মাছের কচুরি ভাজতো ষ্টুডিও থেকে এসে। সন্ধ্যায় লনে চেয়ার পেতে ব'সে ছেলের সঙ্গে গল্প করতো। জীবন ভ'রে উঠতো সোনালীর।

কিন্তু তা হবার নয়। খোকন এখানকার স্কুলেই পড়তো আগে। একদিন স্কুল থেকে ফিরল গম্ভীর মুখ নিয়ে।

কি হয়েছে খোকন। উৎকণ্ঠিত সোনালী, শরীর খারাপ। মাথা ধরেছে?

সোনালীর হাত কপাল থেকে ছুঁড়ে ফেলেছিল সৌমিত্র, যাও। কিছু হয়নি আমার।

তারপর-ই ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো আট বছরের খোকন, কেন। কেন তুমি ছবিতে সব ঢং কর, ন্যাকামী কর, কেন তুমি তুমি---কথা শেষ করতে পারেনি খোকন, দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছিল খোকন।

আর দুধের গ্লাস হাতে আনত হয়ে বসেছিল সোনালী।

রাত্রে মার বুকের কাছে মুখ রেখে খোকন আস্তে আস্তে সব কথা-ই খুলে বলেছিল। ক্লাসের ছেলেরা অনেকদিন-ই ক্ষেপায় তাকে সোনালীর ছেলে 'রূপালী' বলে, অনেক মন্তব্য ক'রে চলে যায়, নীচু ক্লাসের ছেলেরা।

আজ দুজন বড় ছেলে এসে সৌমিত্রকে ধরেছে ওর মা-র সই করা ছবি এনে দিতে। তারপর ওকে শুনিয়ে শুনিয়ে আলোচনা করেছে কোন বইতে কতখানি ন্যাকামী করেছে সোনালী, কি ভাবে গায়ে প'ড়ে গলা জড়িয়ে ধরেছে নায়ক প্রকাশ রায়ের। আর তারপরই একজন পকেট থেকে খবরের কাগজে ছাপা সোনালীর ছবি বের ক'রে চকচক ক'রে চুমো খেয়েছে সেই ছবিতে। সৌমিত্র ঝাঁপিয়ে পড়েছে তার চেয়ে অনেক বড় লম্বা-চওড়া সেই ছেলেটার গায়ের ওপর, ছবি টেনে ছিঁড়ে দিয়েছে, কিল, চড়, লাথি, ঘুষি যা পারে মেরেছে পাগলের মতো। গোলমালে অনেক ছেলে জড় হয়েছে টিফিন রুমে। স্যারও এসেছেন এক-দু।

কি হয়েছে? কি ব্যাপার? স্যার জিজ্ঞেস করেছেন। ছেলেটা মিথ্যা ক'রে বলেছে সৌমিত্র অকারণে ওকে মেরেছে, চুল ছিঁড়ে দিয়েছে, হাত ধ'রে ঝুলে প'ড়ে কামড়ে দিয়েছে। আর সত্যি তখনও ছেলেটির ফর্সা হাতে সৌমিত্রর কচি দু পাটি দাঁতের দাগ।

কেন? কেন মেরেছ তুমি ওকে এরকম ক'রে?—কেন? কেন? বল। স্যারের বারবার জিজ্ঞাসা সত্ত্বেও একটা কথাও বলেনি সৌমিত্র চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে বেত খেয়েছে, ক্লাসের কোণে এক পায়ে দাঁড়িয়েছে। এক ফোঁটা জল পড়েনি ওর চোখ দিয়ে, মুখ দিয়ে একটি কথাও না।

এখন মা-র কাছে সব কথা বলতে বলতে কিন্তু কেঁদে ভাসালো সৌমিত্র। বারবার মা'র বুকে মুখ ঘষে ঘষে বললো আর আমি ঐ স্কুলে যাব না, ঐ ছেলে দুটো আছে সেখানে, ওরা তোমার ছবি নিয়ে-----

কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে আর বাকী কথা শেষ করতে পারেনি সৌমিত্র।

আর শুনতে শুনতে অবর্ণনীয় যন্ত্রণায় সোনালীর মাতৃহৃদয় যেন ফেটে গেছে, সমস্ত বুক নিংড়ে হাহাকার উঠেছে। সৌমিত্র, মীরার খোকন, তার নয়নের মণি, অন্তরের ধন—এমন ভাবে নিপীড়িত হয়েছে। অপমানিত হয়েছে সোনালীর জন্য। কি দরকার তবে আর অর্থ উপার্জনে, কি দরকার ঘর-সংসার ছেড়ে সারাদিন ষ্টুডিওর ফ্লোরে কাটাবার, ছেড়ে দেব কাজ। আর ফিল্ম করবে না বলেছিল সোনালী।

তার চেয়ে সহজ সমাধান আছে মীরু। কাজ ছেড়ে দেবে কেন? আর অভিনেত্রী নামটাও তো তাতে-ই থেকে যাবে।

তবে। তবে উপায় কি। আমার লোসে যা খুশী বলুক, অপমান করুক, কেয়ার করি না আমি। কিন্তু খোকনকে—

এইসব বাঙ্গালী স্কুলে কোলকাতার 'পেটি মিডল ক্লাস সোসাইটিতে এসব হবে-ই, সমীর সেন বলেছিলেন, তার চেয়ে খোকনকে বাইরের কোন রেসিডেনসিয়াল স্কুলে যদি পাঠিয়ে দেয়া হয়, ও যদি সেখানে পড়ে দেখবে কোন হাঙ্গামা-ই হবে না। কেউ জানবে না সেখানে সৌমিত্রের মা অভিনেত্রী সোনালী সেন।

অনেক ভেবে, অনেক রাত কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলিয়ে তবে মত দিয়েছিল সোনালী খোকনকে দুন স্কুলে পাঠানোর। খোকন তার কাছে থাকবে না, যখন তখন মা ব'লে এসে গায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে না, ষ্টুডিও থেকে বাড়ি ফিরে ফুটবল কি দম-দেওয়া এরোপ্লেন তুলে দিতে পারবে না খোকনের হাতে, রাত্রে ঘুমে ঢুলু ঢুলু চোখ খোকনকে গল্প ব'লে দুধ খেতে সাধাসাধি করবে না, আর শুতে যাবার আগে পাশের ঘরে ঢুকে খোকনের ঘুমন্ত কপালে চুমু খেয়ে ওর গায়ের ঢাকা ভাল ক'রে টেনে দিয়ে আসবে না—এ যে সোনালী ভাবতেও পারে না।

কি দরকার তবে এত খাটুনির, পাগলের মতো এই টাকার পেছনে ছোটার?

স্বামী নিয়ে সন্তান নিয়ে সুখে নির্ভাবনায় দিন কাটাবে বলে-ই তো মীরা নাম সেই মেয়ে নেমেছিল ফিল্মে, হয়েছিল সোনালী সেন।

কিন্তু এমন-ই বুঝি হয়।

কারণ জাঁকিয়ে উপার্জন-ই বড় হয়ে ওঠে একদিন, আর সেই উপায়টা-ই আস্তে আস্তে হয়ে ওঠে জীবন। নাহলে শুধু, কি খোকন-ই চলে গেছে সোনালীর কাছ থেকে দূরে? দুন স্কুলে।

সমীর যায়নি।

না, পাহাড় ডিঙিয়ে নদী পেরিয়ে ট্রেণে

চড়ে দূরে চলে যায়নি সমীর, পাশে পাশে-ই থেকেছে, এক ঘরে এক খাটে, তবু সোনালীর মনে হয়, কি দুস্তর দূরত্ব।

বদলে গেছে মানুষটা, একেবারে-ই বদলে গেছে।

সেই লাজুক, প্রণয়ী, কাব্য-পাগল, মানুষটাকে আজ আর খুঁজেই পাওয়া যায় না এই নিখুঁত সাহেবী পোষাক পরা স্থূল পানাসক্ত লোকটার মধ্যে।

যে সমীর সেন একদিন সোনালী তথা মীরাকে চক্ষে হারাত, অনুক্ষণ পাশে পাশে রেখেও মুহূর্তের স্বস্তি পেতো না। স্কুল থেকে ছুটি নিয়ে হঠাৎ বাড়ি চলে আসতো।

পারলাম না মীরু, কতক্ষণ তোমায় না দেখে থাকব বল? এই যার মুখ থেকে শোনা যেত প্রত্যহ-ই সেই প্রেমিক মানুষটা কোথায় হারিয়ে গেল?

আজও তার বাইরে যাবার প্রয়োজন নেই, ইচ্ছে করলে-ই যতক্ষণ খুশী সে ব'সে থাকতে পারে বাড়িতে। ইজি-চেয়ারে ব'সে থাকতে পারে খুশী মতো, কবিতা পড়তে পারে, বই কিনতে পারে, পারে সেতার বাজাতে।

কিন্তু সে সব কিছু-ই তো সে আর করে না। সারাদিন কাজের পর বাড়ি এসে সোনালী তার দেখা পর্যন্ত পায় না। কোথায় কোন বারে ব'সে পান করে, অর্ধেক দিন আহারও। ফিরতে এক এক দিন এতো রাত করে যে সোনালী ঘুমিয়ে না পড়ে পারে না।

বেড়াতে যেতে, ছবি দেখতে প্রায়-ই সোনালীকে খোঁজ করতে হয় অন্য সঙ্গীর, নতুন পাওয়া বান্ধবের।

আর তাদের সঙ্গে বেড়াতে বেড়াতে, ঘুরতে ঘুরতে, কখন অভ্যস্তে চোখের ভাষা অর্থময় হয়ে ওঠে, গলায় লাগে অন্তরঙ্গতার সুর, আর বুকও বুঝি দুলে ওঠে।

কিন্তু সে কিছু নয়। সোনালী জানে সে ক্ষণিক, সে মায়া। তাদের সোনালীর ভাল লাগতে পারে, দুদণ্ড পরম রমণীয় মুহূর্তও ঘুমিয়ে আসতে পারে তাদের মধ্যে, একটু হাত চেপে ধরা, একটু কাছে সরে বসা, গলার সুর আবেগ গাঢ় হওয়া এসব-ই হতে পারে, কিন্তু সোনালী জানে সে সব-ই অর্থহীন।

এই মধুর রঙ্গ, এই খেলা সোনালীর জীবনে অভিনয়ের ন মাত্তর।

ভাল সে একবার-ই বেসেছে, আর চিরদিন তাকে-ই বাসবে, সে তার স্বামী সমীর সেন।

সে বদলে যাক, মোটা হোক, সোনালীকে তেমন ক'রে ভালবাসা না জানাক, তবু সে তার প্রেমাস্পদ তার স্বামী। তাকে পায় না ব'লে-ই হয়তো সোনালী এমন জনে জনে মনের মানুষ খোঁজে। একটু ভালবাসার জন্যে ছটফটিয়ে বেড়ায়। ভারী আশ্চর্য মনে হয় সোনালীর এক এক সময়। সোনালী যে জীবনের জন্যে, যাদের জন্যে রঙ মাখলো, অপবাদ মাথা পেতে নিল, সেই জীবন-ই তাদের হলো না, সেই মানুষগুলো দূরে সরে গেল আস্তে আস্তে।

কিন্তু খুব কি কষ্ট পায় তার জন্য সোনালী? কোনও যন্ত্রণা?

না, তা ঠিক নয়। নিজের কাছে সোনালীকে স্বীকার করতে-ই হয়—একটা ভোঁতা অভাববোধ, একটা শূন্যতা মাঝে মাঝে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায় সোনালীকে। কিন্তু বেশীক্ষণ সেই নিয়ে বিলাপ করার অবকাশও নেই সোনালীর। হয়তো সেই মুহূর্তে-ই সেক্রেটারী প্রভাত রায় খাতা হাতে এসে দাঁড়িয়েছেন, আজ ষ্টুডিও থেকে সোজা যেতে হবে বীরনগরে সেই স্কুলের প্রাইজে। রাজ্যপাল স্বয়ং প্রেসিডেন্ট সেখানকার সোনালী প্রধান অতিথি, আর ঐ তো হাতে ক'রে তুলে দেবে পুরস্কার কচি কচি নরম হাতে।

এইসব দিনে বড় বেশী ক'রেই খোকনকে মনে পড়ে যায় সোনালীর, আর বুকের মধ্যেটা ফাঁকা, খালি খালি ঠেকে। আবার ভুলে যায় সব, চাপা পড়ে যায়, যখন ছবির নতুন কনট্রাক্ট হয়, টাকা নিয়ে দরাদরি করেন প্রভাতবাবু, আউটডোর সুটিং করতে হঠাৎ রাঁচি কী দার্জিলিং। একবার তো কাশ্মীরেও গিয়েছিল। সেবার অবশ্য সমীর সেনও সঙ্গে ছিলেন। আসবার সময় দেরাদুনে নেমে সাতদিন থেকে এসেছিল সোনালীরা। সাতটা দিনের জন্যে যেন দূরে গিয়েছিল এই 'আলোর জীবন'—এই অল লাইট স্টার্ট, ক্যামেরা সাউণ্ড-এ সেই সাতদিন স্বামী-সন্তান নিয়ে সোনালী সেন সেই স্ত্রী, সেই মা-ই হতে পেরেছিল, যা ও চিরদিন হতে চেয়েছে।

তখন সকাল থেকে দুপুর, আর দুপুর থেকে রাত একপাশে সমীর আর একপাশে খোকন। সোনালী নিজের হাতে ছেলের চুল আঁচড়েছে, স্বামীর টাই বেঁধেছে, হোটেলের ঘরেও নিজের সংসার পেতেছে, ঘর করণা করেছে। তারপর থেকে কতবার ভেবেছে সোনালী, এইভাবে বছরে অন্ততঃ একবার ছুটি কাটাবার কথা।

কেউ নয়, কেন লোকজন, সেক্রেটারী আয়া, কাউকে-ই দরকার নেই সোনালীর, শুধু সে, তার স্বামী আর তার ছেলে। চলে যাবে এমনি কোথাও। পাহাড়ের ওপর কি সমুদ্রের ধারে। সেখানে গিয়ে হয়তো সোনালী নিজেই রান্না করবে, সমীর খোকনকে নিয়ে বাজারে যাবে আর সন্ধ্যা বেলা তিনজন গোল হয়ে ব'সে গল্প করবে। তারপর নিজের হাতে গরম গরম রুটি সেঁকে সোনালী খাওয়াবে স্বামীকে ছেলেকে।

অনেক দিন, অনেক রাত এই সোনার স্বপ্ন দেখেছে সোনালী, ভেবে ভেবে পুলকিত হয়েছে। কিন্তু কিছুতে-ই—এমন কী একদিনের জন্যেও—সে পারেনি সেই স্বপ্ন রচনা করতে। খোকার ছুটি হয়েছে, সমীরেরও অবসর আছে, কিন্তু সোনালীর সময় কই? কোথায় অবসর?

কাজ আছে যে। সুটিং। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস। খালি রঙ মাখো, আলোর তলায় এসে দাঁড়াও, আর পরিচালকের নির্দেশ মতো পা ফেল, হাত নাড়, সত্যি কথা বলার মতো ক'রে কল বানানো 'ডায়লগ'।

আর এ না ক'রে উপায় নেই সোনালীর নিস্তার নেই। একদিন সুটিং কামাই করতে পারে না ও। একদিন চলে না-না গেলে। টাকা চাই যে, টাকা।

এমনি করেই তো বছরের পর বছর টাকা উপায় করে যাচ্ছে সোনালী। সে জানে আরো কয়েক বছর এমনি চালিয়ে যেতে হবে। আর এমনি ক'রে সেই টাকার অনেকখানি উড়িয়ে দেবে সমীর সেন। কিছু জিজ্ঞেস করতে পারবে না সোনালী, বলতে পারবে না, বাধা দিতে পারবে না।

খোকনের ছবির দিকে চেয়ে ঘুমে ভারী হয়ে এলো সোনালীর চোখ। পাশ ফিরে বালিশের ওপর হাত রেখে শুলো, আর সারা রাত ঘুমের মধ্যেও সেই অঙ্কহীন self লেখা চেকটা সোনালীর চোখের সামনে দুলতে লাগলো, ভাসতে লাগলো, বড় হয়ে যেন, ডেকে ফেললো সমীর সেনকে।

শুভ শারদীয়

আমাদের প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

সাহা এণ্ড কোং

প্রসিদ্ধ লৌহ ব্যবসায়ী

৮/১, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, বড়বাজার, কলিকাতা—৭

(অফিস) ৩৩৩৭৬১ —ঃ ফোন ঃ—৪৬৭৩৬১ (রেসিডেন্স)

তিন

ঠিক ভোর ছটার সময় আয়া নিয়ে এলো মাথার কাছে গরম জলে পাতিলেবুর রস। ঘুম চোখেই আয়ার হাত থেকে গ্লাসটা নিল সোনালী গরম জলের গ্লাস চোখ বুজে-ই ধীরে ধীরে চুমুক দিয়ে শেষ করলো। আয়ার হাতে গ্লাস ফিরিয়ে দিয়ে পাশ ফিরে শুলো। চোখ বুজলো আবার।

চোখ থেকে ঘুম যেন আর যেতে চায় না। তাছাড়া ভোরবেলা গরম চা না হলে কি ঘুম যায় চোখের পাতা থেকে।

অথচ এই গরম লেবু-জল খেতে-ই হবে ভোরবেলা। নাহলে মেদ জমতে পারে মুখে। চিবুকের তলায় দ্বিতীয় চিবুক দেখা দিতে আরম্ভ করবে। যৌবনকে ধরে রাখতে ছিপছিপে হালকা সুন্দর ফিগার রাখতে অনেক কিছুই করতে হয় সোনালী-কে। অনেক কৃচ্ছ্র সাধন। এইতো একুণি উঠে আবার ব্যায়াম করতে হবে। তারপরে---আড়মোড়া ভেঙ্গে উঠে পড়লো সোনালী। ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখল সাড়ে ছটা। আর নয়, এবার উঠতে-ই হবে। কেননা ঠিক সাতটায় আরম্ভ হবে শরীর মর্দন---ম্যাসেজ। তার আগে আধ ঘণ্টা যৌগিক ব্যায়াম।

তারপর আধ ঘণ্টা ধ'রে স্নান। স্নান সেরে হালকা হাউজ-কোট গায়ে সোনালী এল সাজানো খাবার ঘরে। কিন্তু খাবে কি? অর্ধেক জিনিস-ই তো সোনালীর খেতে নেই। মাখন খেতে নেই ফ্যাট হবে, ক্রীম খেতে নেই মোটা হবে। রুটি খেলেও মাংস লাগবে গায়ে।

ফল, শুধু ফল খেতে কোন বাধা নেই সোনালীর। তাও কলা বেশী খেতে পারবে না তাতেও না-কী মোটা হয়। পেয়ালায় কফি ঢালতে ঢালতে সোনালী স্বামীর দিকে ফিরল, বাবা করে যে প্রাণ ভরে যা খুশী তাই খেতে পারব। ভাত খাব আরাম ক'রে।

কি ক'রে পারবে?

বাঃ! কেন? আর কয়েক বছর পরে-ই যখন আর ছবি করব না, ফিগার স্লিম রাখবার দরকার হবে না।

হেসে ফেললেন সমীর, সেরকম হবে না কি কোন দিন।

বাঃ! হবে না! দেখ না তখন দুপুরে এক গাদা মাছের ঝোল-ভাত খেয়ে যা একখানি ঠাস্যা ঘুম দেব না।

সমীর সেন কথা না ব'লে এক টুকরো চীজ তুলে দিলেন সোনালীর হাতে। হ্যাঁ, চীজটা খায় সোনালী, আর দুধের বদলে হরলিকস। শুধু রোগা হলে-ই তো হবে না, লাবণ্য রাখা চাইতো। অবশ্য তার জন্যে ভিটামিন ট্যাবলেট আর প্রচুর ফল-মেওয়া তো সব সময়-ই খাচ্ছে। তাছাড়া তিন মাস অন্তর ডাক্তারকে দিয়ে চেক-আপ। এত সাবধানতা সত্ত্বেও কখনো-সখন দু' এক পাউণ্ড ওজন বেড়েও যায়, তখন আবার সেই ইলেকট্রিক ষ্টিমবাথ। অর্থাৎ গরম বাষ্পের তলায় নিরাবরণ দেহে শুয়ে থেকে থেকে ঘাম ঝরানো।

ভারী মজা লাগে ভাবতে।

একদিন যখন কোন' কিছু খাওয়াতেই বাধা ছিল না, সোনালী তখন সহজে-ই তন্বী, বরং, একটু ক্রীম দুধ একটু ভাল খাওয়া হলে স্বাস্থ্যের উন্নতি-ই হতো, যথেষ্ট পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে সোনালীর ঘন ঘন জ্বর হতো, আর ক্লান্তির ছায়া ভেসে উঠতো মুখে, তখন কোথায় ছিল এই ঝকঝকে সাদা রেফ্রিজারেটার ফল দুধ মাখন বুকে নিয়ে? কোথায় ছিল অজস্র পয়সা যখন তখন কোন বড় রেস্তোঁরা হোটেলে গিয়ে যা ইচ্ছে অর্ডার দেবার?

আর আজ!

খাবার অভাব নেই, পয়সার অভাব নেই, কিন্তু উপায় নেই খাবার ভোগ করবার।

মীরু তোমার আজ সুটিং কোথায়? রূপলেখা ষ্টুডিওয়?

না অপ্সরাতে-ই। বিজয়বাবুর বইটার সুটিং আছে তো।

তাই না-কি। পরপর চারদিন-ই বিজয়বাবুর বইটাতে-ই সুটিং করছো?

চারদিন কি বলছ? পুরো সপ্তাহটা-ই।

বল কি? টানা সাতদিন সুটিং করছেন উনি!

হ্যাঁ, আর এই মাসে-ই শেষ করবেন বলেছেন সুটিং, খাঁই মাসের আগে-ই রিলিজ দে।

ছবিটা ভালি-ই হবে, কে যেন বলছিল। এডিটিং রুমের রিপোর্ট তো তাই।

আর সাতদিন পরে-ই তো তোমার বিজয়কেতন রিলিজ।

হ্যাঁ, সামনের শুক্রবার।

ঐ ছবিটার রিলিজের পর-ই টাকা বাড়িয়ে দাও। ঐ যা বললাম এক পঁচিশ ক'রে দাও একেবারে, সমীর সেনের খাওয়া হয়ে গিয়েছিল, উঠে পড়লেন, আমি প্রভাতকে ব'লে দেব, এরপরে এক লাখ পঁচিশ হাজারের নীচে যেন কারো সঙ্গে কনট্রাক্ট না করে।

ওগো, সোনালী হঠাৎ হাত বাড়িয়ে স্বামীর জামার কোণ ধ'রে টানলো।

বিস্মিত হয়ে তিনি তাকালেন সোনালীর দিকে, কি ব্যাপার?

বসো না একটু।

কি ব্যাপার!

কেন?

কেন আবার! বসতে নেই! তোমার সঙ্গে বলতে গেলে দেখাই হয় না।

কি মুস্কিল! তুমি তো সারাদিন স্টুডিওতে-ই থাক! সময় কই তোমার? একটু পরে-ই তো তোমাকে যেতে হবে।

ততটুকু সময়-ই বা কেন থাক না, কেন থাক না তুমি আমার কাছে? সোনালীর গলায় বালিকার অভিমান, ভঙ্গীটাও ত্রিশোত্তীর্ণ যুবতীর নয়।

কিন্তু সোনালী তথা মীরুর এরকম হঠাৎ আয়া ভাবের বেগের সঙ্গে রিলক্ষণ পরিচয় আছে সমীর সেনের। এই খেয়ালী অভিমানিনী স্ত্রীটিকে চিনতে আর তার বাকী নেই। তাই তো সোনালী সম্বন্ধে কোন' দুর্নাম, অপবাদে কান দেন না তিনি। এমন কী সোনালী যখন তার ছবির নায়কদের সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করতে সত্যি-ই একটু যেন প্রেমে পড়ে, তাদের সঙ্গে বেড়ায় ঘোরে, ছবি দেখে, ডাইভে যায়, তখনও সমীর সেন কখনও চঞ্চল হন না, হিংসার আগুনে পুড়ে নষ্ট হতে দেন না মনের প্রশান্তি। তিনি জানেন সোনালী তাঁর---আর তাঁরই থাকবে। সোনালীর প্রেমকে চিরদিন বেঁধে রাখতে তার সযত্ন সতর্কতার প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন নেই সদাজাগ্রত ভালবাসারও।

সোনালী উঠে এসে স্বামীকে দুই হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলো, ওগো আজ আর বেরিয়ো না। কি রোজ রোজ ক্লাবে গিয়ে খালি খালি বিয়ার খাও।

বাঃ! বিয়ার খাই শুধু? খেলি না। সুকার। তাছাড়া একবার ব্যাঙ্কে যেতে হবে। খোকাকে টাকা পাঠাতে হবে। ট্যাক্সির পারমিটের জন্যে-ও যেতে হবে একবার। আরো কত কাজ। স্ত্রীর গালে আলতো ভাবে হাত ছোঁয়ালেন সমীর সেন। আজ বরং তুমি ষ্টুডিও থেকে সোজা বাড়ি এস, এক সঙ্গে যাওয়া যাবে কোথাও।

ও, হ্যাঁ তো---সোনালী লাফিয়ে উঠলো, ইনগ্রিড বার্গম্যানের নতুন ছবিটা দেখতে হবে তো। আজ-ই যাব। ঠিক ঠিক সোনালী মাথা নেড়ে নেড়ে বললো।

ভাল ছবি, বিখ্যাত অভিনেতা-অভিনেত্রীদের করা ছবি একটাও 'মিস' করে না সোনালী। ভাল অভিনয় দেখে-ই তো অভিনয় শিখতে হয়। তাছাড়া আর সুযোগ কোথায়? বিলেতের মতো এখানে অভিনয় শেখার স্কুল নেই তো। এখন অবশ্য গভর্ণমেণ্টের কী সব নাটক অভিনয় ইত্যাদি শেখার ক্লাস হয়েছে, কিন্তু সোনালী তো আর সেখানে যেতে পারে না। আর সোনালীকে শিক্ষা দেবার মতো কে-ই বা আছে ওখানে? মনে আছে বছর কয়েক আগে ফিল্ম ফেষ্টিভ্যালের সময় দুজন আমেরিকান চিত্র পরিচালক এসেছিলেন এ-দেশে। আলাপ করেছিলেন সোনালীর সঙ্গে, জানতে চেয়েছিলেন এত অপূর্ব অভিনয় করতে ও শিখেছে কোন স্কুল, কোন্ কলেজ থেকে? তাঁরা শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন যে কোন' শিক্ষা কোন' প্রস্তুতি বিনা-ই সোনালী অভিনয় জগতের এমন শীর্ষে চলে

গেছে। এত উৎকর্ষতা, এমন পারদর্শিতা লাভ করেছে।

মেমসাহেব, সুসজ্জিতা কাঞ্চীর ডাকে স্টেটস-ম্যান থেকে মুখ তুলে তাকাল সোনালী।

ভারী সুন্দর দেখতে কাঞ্চীটা। ওর গাল থেকে দার্জিলিংয়ের হিমেল হাওয়ার ছোপ এখনও যায়নি। দু'গালে যেন দুই গোলাপ ফুটে আছে। আর রঙ? আহা! সোনালী যদি কাঞ্চীর গায়ের রঙটা পেতো।

সবিনয়ে কাঞ্চী জানাল মেমসাহেবের পোষাক তৈরী। এইবার উঠে তৈরী হওয়া ভাল, নাহলে-----

যা যা, এক্ষুণি কি? সবে তো ন'টা।

কাঞ্চী আবার সবিনয়ে জানাল বিজয়বাবুর বিশেষ ক'রে বারবার ব'লে দিয়েছেন আজ প্রথম টেক-ই সোনালীর, ঠিক দশটায় ও যেন রেডি থাকে ফোরে।

তাই না-কি? ছোট আড়মোড়া ভেঙ্গে উঠে দাঁড়ালো সোনালী। জানলা দিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে দেখল। হাল্কা মেঘ ভেসে চলেছে, সোনালী-আলো জানলায়, ভারী লাল পর্দার গায়ে। হঠাৎ সোনালীর ইচ্ছে হলো ছুটে চলে যায় ঐ সামনের লনে, কি আরো বড় বিস্তীর্ণ কোন মাঠে---হ্যাঁ, হ্যা, ঘোড়ের মাঠে, না না, আরো বড়, আরো সবুজ কোন ঘাসের বনে। সেই যে বেড়াতে গিয়েছিল সমীর সেন আর মিঃ কাপুরের সঙ্গে লণ্ডনে হ্যামস্টেড হীথে। সেইখানে-ই এখন এই মুহূর্তে চলে যেতে ইচ্ছে করছে সোনালীর।

কাঞ্চী অবাক হয়ে গেল।

মেমসাহেব সকাল বেলা কাজের সময় জানলায় এসে দাঁড়ায় না তো কখনো। ষ্টুডিওয় গিয়ে যা ইচ্ছে করেন, ডিরেক্টারদের খেয়াল-খুশী মতো নাচান, কিন্তু ঠিক সময় ষ্টুডিওয় হাজিরা দেওয়া মেমসাহেবের বরাবরের অভ্যাস-কাঞ্চী আজ কবছর ধ'রে-ই দেখছে। চাপা ঠোঁটে হাসির ঝিলিক খেলে গেল। বুঝতে পেরেছে সে। মেমসাহেবকে সে তো আর কম দিন দেখছে না।

এই যে নওজোয়ান ছোকরা মেমসাহেবের সঙ্গে এই বইটাতে এসেছে, তার-ই কথা ভেবে আনমনা হয়ে যাচ্ছে কাঞ্চীর মেমসাহেব। কাঞ্চী কাল-ই বুঝতে পেরেছে মেমসাহেবের ভাল লেগেছে এই ছোকড়াকে। আর এখন কিছুদিন চলবে এই ভাল লাগার পালা। এই সময়টার মেমসাহেবের মন হয়ে থাকে যেন কল্পতরু। যা চাও টাকা পয়সা, ভাল শাড়ি, সেবার তো কান থেকে খুলে দুল জোড়া-ই দিয়ে দিলেন মেমসাহেব। ভাল-ই হয়েছে ঐ নতুন ছোকরা এসে। ইদানিং মেমসাহেব যেন বড় মনমরা হয়ে থাকতেন দিনরাত। মাঝে মাঝে মেমসাহেবকে শুয়ে শুয়ে ছেলের ছবি হাতে কাঞ্চী কাঁদতেও দেখেছে।

চল, দাঁড়ালি কেন? হাতের কাগজ দিয়ে কাঞ্চীর মাথায় আস্তে টোকা দিয়ে সোনালী খাবার ঘর ছেড়ে শোবার ঘরের দিকে পা বাড়াল।

চার

মা। সামনে-ই দাঁড়িয়ে সৌমিত্র।

খোকা। সোনালীর খোকা।

এক সেকেণ্ড, দু'সেকেণ্ড, অবাক হয়ে চেয়ে রইলো---সোনালী কি নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না।

খোকা তুই! এইবার সোনালী ছুটে এসে জড়িয়ে ধরলো ছেলেকে, কি করে এলি? কখন এলি? ভাল আছিস তো? কেন এলি হঠাৎ?

ওয়েট! ওয়েট! এত প্রশ্নের উত্তর এক সঙ্গে কি করে দিই।

সোনালীর বিশ্বাস যেন আর যেতে চায় না, খোকা তুই এসেছিস? সত্যি এসেছিস। সোনালী খোকার গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

তোমাকে এই সারপ্রাইজটা দেব ব'লে-ই তো চিঠি দিইনি আগে, টেলিফোন করিনি। খেলতে এসেছি আমর এখানে।

ও তুই তো আবার মস্ত ক্রিকেট খেলিয়ে, মনে-ই ছিল না আমার।

তিন দিন থাকব মা আমরা। তোমাকে কিন্তু রোজ আমার খেলা দেখতে যেতে হবে।

তুই বোস, কি খাবি বল?

বাপি কোথায় বাপি?

কাঞ্চী দেখত উনি কোথায় গেলেন। আয় বোস! সোনালী ছেলেকে বসিয়ে দিল খাবার টেবিলের সামনে। নিজের হাতে রুটিতে মাখন লাগাল। ইলেক ট্রক হিটারে ওমলেট ভেজে দিল টোমেটো কুচি দিয়ে, ঠিক যেমন খোকা চায়।

তোমার যে দেরী হয়ে যাচ্ছে, ঘড়ি দেখে সমীর সেন তাড়া দিলেন, আজ তোমার ষ্টুডিওতে যেতে।

থাক! যাব না আজ ষ্টুডিওয়। করবো না সুটিং। আজ খোকা এসেছে না।

না না, ওসব ছেলেমানুষী কর না, সমীর সেনের মুখ গম্ভীর হোল।

সুটিং ফাঁকি দেয়াটা ঠিক নয়। ওদের কতো ক্ষতি হয় তাতে ভেবে দেখেছে?

সোনালী সৌমিত্রের মাথার চুল আঙুল দিয়ে এলোমেলো করতে করতে বললো, আমি তো কখনও কামাই করি না। কতো লোক তো---সুছন্দা, সুপ্রীতি, নন্দা---কতদিন অসুখের দোহাই দিয়ে যায় না। আমি তো আজ পর্যন্ত কখনো---

সেইজন্যে-ই তোমার এই সুনামটুকু থাকার জন্যে-ই তোমাকে আরো চায়। প্রোডিউসার মহলে খবর নিয়ে দেখ, তোমার মতো ট্রাবল---ফ্রি আর্টিষ্ট---

আচ্ছা বাবা আচ্ছা! যাব। যাব। মনে মনে সোনালীও সুটিং কামাই করাটা প্রীতির চোখে দেখে না। আর্টিস্ট একদিন না আসলে প্রোডিউসারের কত টাকার লোকসান। আর কিছু না হোক, অকারণে এই অর্থ ক্ষতি কেন হবে সোনালীর জন্যে। এই নীতিবোধ সোনালীর মনে সমীর সেন-ই জাগিয়েছিল। হাজার হোক স্কুল টীচার তো। মাষ্টারী করা যাবে কোথায়? কতদিন এই কথা মনে ক'রে হেসেছে সোনালী, আজও হাসলো। তাহলে তুমি বাড়িতে থাকো আজ, খোকা একা একা থাকবে না কি সারাদিন?

বাঃ। আমিও তো তোমার সঙ্গে যেতে পারি মা, তোমার সুটিং দেখতে।

সোনালী অবাক চোখে ছেলের দিকে তাকালো। খোকা---সৌমিত্র সেন---যেতে চাইছে সুটিং দেখতে। তাও নিজের মা-র সুটিং। সোনালীর।

সেই খোকা! সোনালী সুটিং করে ব'লে মা চিত্রতারকা ব'লে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছিল। নিরুপায় ক্রোধে নিজের হাত মুচড়ে মুচড়ে শুধু ভারী কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছিল মা-র বুকে।

দু'বছর আগে যে সোনালীকে বলেছিল, ফিল্ম ছেড়ে দাও মা! তোমার ছবি পানের দোকানে ঝোলে, দেখে---

সোনালী ছেলেকে বোঝাতে পারেনি, বলতে পারেনি, পানের দোকানে ঝোলা পপুলারিটির লক্ষণ। সত্যিকারের পয়সা ঐ পানওয়ালা, বিড়িওয়ালারা-ই দেয়।

সে শুধু বলেছিল, ফিল্ম ছাড়লে খাব কি রে আমরা? পয়সা পাব কোথায়?

চোদ্দ বছরের খোকন উত্তেজিত হয়ে উঠে বসেছিল বিছানার ওপর, আমি চাকরি করব না, রোজগার করব।

সে তো করবি-ই তুই আরেকটু বড় হ', পাস-টাস কর তখন আমি কাজ ছাড়ব বই কী!

তারপর মা-ছেলেতে ব'সে ভবিষ্যতের অনেক সমধুর স্বপ্ন রচনা করেছিল তারা। কী ক'রে আয় বাড়াবে, বাড়ি ভাড়া থেকে ব'সে ব'সে-ই টাকা আসবে, এইসব।

শুধু একটা প্রসঙ্গ দু'জনে-ই সযত্নে সতর্কতায়

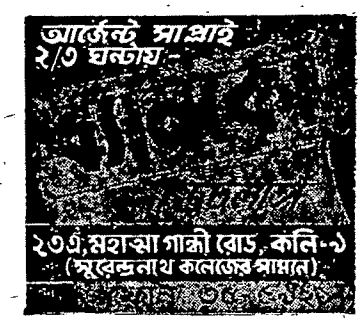

এড়িয়ে গিয়ে সমীর সেনের প্রসঙ্গ। সবাই উপার্জন করবে, কাজ করবে শুধু তিনি বাদে। শুধু তাঁর কোন দায়িত্ব নেই। দায় নেই উপার্জন করার। সংসার চালানোর।

সমীর সেন যে মৃত্যুর একেবারে গহ্বর থেকে ফিরে এসেছেন সে কথা কি সোনালী ভুলবে? খোকনের কচি বুকেও যে লেখা আছে সেইসব কালো কালো দিনের মলিন ইতিহাস।

সমীর সেনের কাজ করার উপার্জন করার দরকার নেই। তিনি বেঁচে থাকুন। ভাল থাকুন। তাহলে-ই সোনালী শুধু খুশী নয়, কৃতার্থ হয়ে যাবে। কৃতজ্ঞ থাকবে সমীর সেনের কাছে। শুধু মাঝে মাঝে মনে হয়, সমীর সেন বড় বেশী টাকা ওড়াচ্ছেন। বড় সহজে।

সোনালী স্বামীর দিকে তাকাল, হ্যাঁ গো, যাবে খোকন আমার সঙ্গে ষ্টুডিওয়?

সমীর সেন এক মুহূর্তে চুপ ক'রে কি যেন ভাবলেন। তারপর হেসে ফিরলেন সোনালীর দিকে, যাক। ক্ষতি কি। তোমার নাম এবং যশ এতই পাকা যে এত বড় ছেলে দেখে প্রডিউসার অবাক হলেও কনট্রাক্ট করতে দ্বিধা করবে না।

কী যে কথার শী! সোনালী ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো, আমার ষোল বছরের ছেলে আছে ব'লে ছবির বাজারে আমার দাম কমে তো চাই নে এমন ছবি করতে।

সমীর সেন আর সৌমিত্র দু'জন-ই হো হো ক'রে হেসে উঠলেন।

মা, আমার আরো দুজন বন্ধু যাবে কিন্তু। বুঝলে তো! তাদের আমি কবে থেকে ব'লে রেখেছি, স্যুটিং দেখাব। তোমার স্যুটিং। তারা কি বলে জান তো।

কি? সোনালীর হয়ে সমীর সেন-ই জিজ্ঞেস করলেন।

মা-র মতো এ্যাকট্রেস ভারতবর্ষে আগে কখনও হয়নি, আর কোনোদিন হবেও না। তারা বলে, ইনগ্রিড বার্গম্যান, গ্রেটা গার্বো—এঁদের মতো না-কি মা'র পজিশেন। শুনে যা অহঙ্কার হয় না-----

সোনালীর বুকটা সুখে যেন ভ'রে গেল। খোকা! সেই খোকা! একদিন যে মা অভিনেত্রী ব'লে কেঁদেছিল, সে-ই আজ গর্বিত মা'র অভিনয় করা নিয়ে। মা'র ফিল্ম কেরিয়ারের জন্য।

যাবে রে যাবে, সোনালী খোকনের মাথায় আস্তে টোকা মেরে বললো, তোর যত ইচ্ছে বন্ধু নিয়ে যাস। কিন্তু খুব ভাল পোষাক প'রে যাবি। তোর তো কাণ্ড! শেষে একটা ময়লা সার্ট, সুতো-বেরোনো টাই পরেই হয়তো চলে যাবি

দেখ না, এমন সাজ ক'রে যাব যে আমাকে-ই তোমার ডিরেক্টার হিরো বানিয়ে দেবে।

তা হিরোর মতো-ই তো চেহারা, সোনালী মুগ্ধ চোখে আবার ছেলের সুঠাম কান্তি যেন নতুন ক'রে-ই দেখে নিল।

দাও না মা আমাকেও একটা ছবিতে চান্স। হ্যাঁ মা সত্যি বলছি। আমারও ভীষণ ছবি করতে ইচ্ছে হচ্ছে। পরীক্ষা দিয়ে-ই আমি ছবিতে নামব।

খোকা! আর্ত চীৎকারে সৌমিত্র সমীর সেন অবাক হয়ে সোনালীর দিকে ফিরলেন। সোনালীর মুখ ফ্যাকাশে, ঠোঁট থরথর ক'রে কাঁপছে, এমন কথা ঠাট্টা করেও বলো না খোকা। কখনো নয়, কখনো নয়। ফিল্মে নামবে তুমি? কেন কেন? কিসের অভাব তোমার? কিসের দুঃখ? কতো টাকা চাই? কি চাই?

সোনালী হঠাৎ ঝরঝর ক'রে কেঁদে ফেলল।

মীরু, সমীর সেন কাছে এসে সোনালীর পিঠে হাত রাখলেন। মাথাটা বুকের কাছে টেনে এনে আস্তে আস্তে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন, ছিঃ! মীরু। শান্ত হও; শান্ত হও, খোকা এমনি ফাজলামী করেছে বই তো নয়।

সৌমিত্র শুধু অপ্রস্তুত নয়। অবাক হয়ে গেল। কথাটা যদিও নিতান্তই ও খেলাচ্ছলে বলেছিল, কিন্তু যদি সত্যি-ই হতো, তাতে-ই বা মা'র এতখানি উত্তেজিত হওয়ার, একেবারে কেঁদে ভাসিয়ে দেবার কী ছিল! ফিল্মে অভিনয় কেরিয়ার হিসাবে মন্দ তো নয়। আর এই ফিল্মে অভিনয় ক'রেই তো মা এত সব করেছেন। এই বাড়ি, গাড়ি, আরাম, বিলাস, বৈভব—সব-ই তো ফিল্মের-ই দৌলতে। যদিও নিতান্ত শিশু ছিল, তবু মন থেকে একেবারে মুছে যায়নি সেইসব দিনের স্মৃতি—যখন মা ফিল্মে নামেন নি, বাবা হাসপাতালে, আর তাদের সেই কসবার ছোট্ট বাড়িতে অভাব, পাওনার তাগাদা, বাড়িয়ালীর হুমকি—কি নয়?

খোকা! অস্বস্তিকর পরিবেশটা সমীর সেন-ই ভেঙ্গে দিলেন, তুই তাহলে স্নান-টান সেরে নে তাড়াতাড়ি। তারপর তোকে আর তোর বন্ধুদের গাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসবে। মীরু! তুমি না হয় আজ ছোট গাড়িটায় যাও।

চোখের জলের মধ্যে-ই সুন্দর ক'রে হাসল সোনালী। মা'র মুখের এই কিশোরীর মতো মিষ্টি হাসি দেখে যেন নতুন ক'রে ভাল লাগল সৌমিত্রের—মা'টা এতো ছেলেমানুষ! এত সুন্দর। সাধে কি আর সারা বাংলা দেশ সোনালী সেনের জন্য পাগল।

খোকা, তোরা তাহলে কখন পৌঁছবি?

বল কখন যাবে?

চোখের কাছে ঘড়ি-পরা হাত তুলে সময় দেখল সোনালী, আমার একটু দেরী হয়ে গেল। স্যুটিং আরম্ভ হতে দেরী হবে তাই। তা তোরা এগারোটা সাড়ে এগারোটার মধ্যে-ই চলে আয়।

তাই ভাল। আমি আমার বন্ধুদের ফোনে সেই কথা-ই ব'লে দিই।

একেবারে লাঞ্চের পর গেলে হতো না। সৌমিত্র বাবার দিকে ফিরল।

কেন? লাঞ্চের পর কেন? আমরা গোড়া থেকে-ই দেখতে চাই।

সমীর সেন হাসলেন, যা ভাবছিস্ তা নয়। ভীষণ বোরিং লাগবে দেখবি। কিন্তু সেজন্য না। আমি বলছিলাম সকাল থেকে গেলে তোরা খাবি কখন, কোথায়?

বাঃ! ষ্টুডিওয় আজকাল চমৎকার ক্যান্টিন হয়েছে, সে খবর রাখ না বুঝি!

সে খাবার তুমি তো আর খেয়ে দেখনি। তোমার খাবার তো যায় বাড়ি থেকে।

আহা! সবাই খায় তো। জান আমি দেখেছি। তাছাড়া খোকাদের খাবারও না হয় বাড়ি থেকে-ই যাবে, আমার-টার সঙ্গে।

সেটা ভাল দেখাবে কি? তার চেয়ে তোমরা সবাই বরং লাঞ্চে বাড়ি চলে এসো। সবাই মিলে একসঙ্গে খাওয়া যাবে। আমিও বাড়ি থাকব।

চমৎকার!! চমৎকার।

সৌমিত্র সোনালী দু'জনে-ই সায় দিল সমীর সেনের প্রস্তাবে।

পাঁচ

অনিল সোম সামনে-ই স্ক্রিপ্ট ধ'রে দাঁড়িয়েছিল আর সোনালী তার অভ্যস্ত ভঙ্গীতে মাথা কাত ক'রে চোখ বুজে মনে মনে 'ডায়লগ' ব'লে যাচ্ছিল।

একটু দূরে-ই চেয়ার পেতে বসেছিল সৌমিত্র, তার তিনি বন্ধু পুলক, কৌশিক আর পাঞ্জাবী ছেলে কিষণ সিং।

এখনও আলোগুলো সব জ্বলে ওঠেনি, তাই দূর থেকে সৌমিত্র মা'র মুখ ভাল ক'রে দেখতে পাচ্ছে না, কেমন যেন ছায়া ছায়া অবাস্তব মনে হচ্ছে সব কিছুকে। মাথার ওপর ইলেকট্রিসিয়ানরা কাঠের সরু পাটাতনের ওপর ব'সে দুর্বোধ্য ভাষায় কী সব বলছে।

পাঁচশ'টা মারো, ডিঙ্কি দাও, ইত্যাদি ইত্যাদি।

হঠাৎ কে যেন সাইলেন্স ব'লে উঠলো, অমনি খট্ ক'রে আওয়াজ হয়ে বড় বড় পাখাগুলো থেমে গেল আর সেই আধো-আলো আধো-অন্ধকারের মধ্যে-ই কার গম্ভীর গলা শোনা গেল 'কোয়ায়েট অন্ দি ফ্লোর, অল লাইট, ষ্টার্ট ক্যামেরা সাউণ্ড।'

সৌমিত্রর মাথার ঠিক ওপরে-ই যেন শত সূর্যের আলো জ্বলে উঠলো, চোখ ধাঁধিয়ে গেল মুহূর্তের জন্যে। আর তারপর-ই স্পষ্ট হয়ে উঠলো সামনের দৃশ্যটা চোখের সামনে।

বিরাট সাজানো হলঘর, সাদা শ্বেত-পাথরের সিঁড়ি উঠে গেছে ঘরের মধ্যে থেকে। দোতালার সমস্তটা জুড়ে সিঁড়ির মাথায় অপরূপ ঘেরা বারান্দা। আশ্চর্য সুন্দর ঘর-বাড়ি—বারান্দা সঙ্গে-ই কি? কিন্তু কার বাড়ি? কোথাকার প্রাসাদ।

হায়দ্রাবাদের নিজামও বোধ হয় এমন একখানি সিঁড়ি বা বারান্দা গড়তে পারেননি তাঁর ঐশ্বর্য সম্ভার দিয়ে। কিন্তু আশ্চর্য! কোন্ কলেজের প্রিন্সিপালের বাড়ি না-কী সেটা। প্রিন্সিপালের একমাত্র মেয়ে মঞ্জু, তার মা যে রোলটা করছেন।

তাকিয়ে তাকিয়ে সেটা-ই দেখছিল সৌমিত্র। হঠাৎ চোখে পড়লো তার বুকের কাছে বইয়ের গোছা চেপে দুপাশে লম্বা দুই বেণী ঝুলিয়ে সেই সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছেন মা।

সেটের একপাশ দিয়ে সন্তর্পণে চারদিক তাকাতে তাকাতে ঢুকলেন নায়ক অরূপকুমার। নায়কের দেখা পেয়ে-ই নায়িকার ছুটে যাবার কথা একেবারে দরজার কাছে, ঝাঁপিয়ে পড়ার কথা নায়কের বুকের ওপর, 'তুমি এসেছ, তুমি এসেছ ব'লে।

মাপাজোকা নির্ভুল পদক্ষেপ হওয়া চাই, খড়ি দিয়ে আগে-ই দাগ দিয়েছেন অনিল সোম। ঠিক কোনখানটায় কোন্ বৃত্তের মধ্যে দাঁড়াতে হবে অরূপকুমারকে।

সোনালীর পদক্ষেপ মাপা, গোণা। ঠিক ক'পা হাঁটলে সিঁড়ি থেকে নেমে অরূপকুমারের বুকের কাছে এসে দাঁড়ানো যায়, পরিপূর্ণ আলো এসে পড়ে তার মুখে মাথায় হাতে, সে সব আগে থেকে জানা, বুঝে নেওয়া। আর সোনালীর চলাচল কেমন হবে সেই বুঝে-ই তো লাইটের ব্যবস্থা। কতগুলো আলো সোনালীর মুখে থাকবে, বিশেষ বিশেষ আলোগুলো কেমন ক'রে তার মুখের চারিপাশে স্বপ্নের জাল রচনা করবে, লাবণ্য বাড়াবে, এসব-ই সোনালীর জানা। বলতে কী সোনালীর আলোর প্রয়োজন মিটিয়ে তবে-ই অন্য কারুর কিছুর জন্য আলোর ব্যবস্থা।

বড় সুন্দর, বড় উজ্জ্বল, দেখছে সোনালীকে এই আলোর ঢেউয়ে।

নিজের মা'কে আজ যেন আবার সৌমিত্র নতুন ক'রে দেখল। এত সুন্দরী, এত মনোহারিণী মা ওর। মা-কে যেন সৌমিত্র হঠাৎ আরো বেশী ক'রে ভালবাসলো, নতুন ক'রে জানলো।

আর আশ্চর্য! সোনালীও কি এই সময় ছেলের কথাই ভাবছিল? না হ'লে সামনে যেতে গিয়ে হঠাৎ ও পিছন ফিরে তাকাবে কেন? কেন দেখল ও পিছন ফিরে সৌমিত্ররা যে জায়গাটায় ব'সে ছিল সেই দিকে? উজ্জ্বল আলোয় দাঁড়িয়ে দূরের ছায়াময় কোণে কিছুই দেখতে পেল না সোনালী। আর হঠাৎ কেমন বিহ্বল হয়ে গেল।

কাট, কাট! বিজয় ব্যানার্জীর গুরুগম্ভীর গলা শোনা গেল। দপ ক'রে বড় বড় আলোগুলো নিভে গেল, ফ্যানগুলো চলতে আরম্ভ করলো, ঘর আবার মুহূর্তের মধ্যেই সেই আলো-ছায়ার রূপকথা।

বিজয় ব্যানার্জী অবাক হয়ে সোনালীর দিকে চাইলেন।

সোনালীও কম অপ্রস্তুত হলো না, এ রকম ঘটনা সোনালীর জীবনে গত সাত আট বছরের মধ্যে কখনো হয়নি।

সোনালীর ভুল হবে, 'ডায়লগ' বলতে গিয়ে আটকে যাবে, সামনে যেতে গিয়ে পেছনে ফিরে তাকাবে, এ রকম কখনো হয় না।

অনিল সোম কাছে এসে স্নিগ্ধ গলায় বললো, নিন, এই ঠাণ্ডা জলটা খেয়ে নিন তো দেখি। বসুন একটু ওখানে গিয়ে।

অনিল সোমের হাত থেকে বরফ দেওয়া জলের গ্লাসটা নিয়ে এক চুমুকে শেষ করলো সোনালী।

আঃ, তুমি কি ভগবান অনিল! কি ক'রে জানলে যে আমার এখন তেষ্টায় ছাতি ফাটছে।

বাঃ! টেকের আগে আজ যে আপনি জল খেয়ে নেননি। তাই তো আপনার ডায়লগ আটকে গেল। না হলে সোনালী সেনের জন্যে কাট বলতে হবে এমন ঘটনা কি আগে কখনো হয়েছে?

উত্তর না দিয়ে সোনালী শুধু হাসলো। সত্যি আজ কি হলো ওর? হঠাৎ কেন একটা কথা মনে হলো সোনালীর? কেন একটা, অজানা সঙ্কোচে ছেয়ে গেল সারা মন? মনে হলো খোকা কি ভাববে? কেন সৌমিত্রের মনোভাবটা, মুখ-ভাবটা দেখে নিতে চেষ্টা করল সোনালী? কেমন ক'রে তাকাবে খোকা মা'র দিকে যখন সোনালী অরূপকুমারের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়বে? এই সব বিদ্যুৎ চমকের মতো মাথায় এলো সোনালীর আর মুহূর্তে সব ভুল হয়ে গেল। সব গোলমাল।

ঘড়ির দিকে চোখ রেখে অনিল সোম আবার বললো, একটা বাজলো, এখন আর কিছু না, আবার লাঞ্চের পর।

না না, সেকি কথা, একটা ও কে টেক হলে না লাঞ্চের আগে, সোনালী ব্যাকুল হলো।

কি সব হচ্ছে আজ, একটাও ভাল লাগছে না ওর। খোকা হঠাৎ এসে পড়ায় সকাল থেকে যেমন মনে একটা আনন্দের সুর লেগেছিল, তেমনি হঠাৎ এই টেকিং না হওয়ার জন্যে, মধ্যপথে ছন্দপতনের জন্যে এক বিষাদে ভরে গেল মন।

নিজেকে বোঝাতে চেষ্টা করলো সোনালী, কি আর এমন হয়েছে? কত জনের জন্যেই তো কতদিনই কত রি-টেক হয়। কত এন. জি. সট হয় রোজ রোজ। কি এলো গেল এক সট যদি দু' ঘণ্টা পরেই নেওয়া হয়? টাকা তো আর কমিয়ে দেবে না তার জন্যে। নিজেকে নিজে বোঝালো সোনালী, কিন্তু তবু মন মানে না। কাঞ্চীর হাত থেকে ব্যাগ নিয়ে উঠে দাঁড়ালো সোনালী, ঠিক আছে অনিল। আয়্যাম সরি। লাঞ্চে বাড়ি যাচ্ছি। তোমাদের সব ঠিক হ'লে ফোন করো, চলে আসবো তখন। সোনালী গিয়ে সৌমিত্রের কাছে দাঁড়ালো, চল্ খোকা।

মা! কি সুন্দর লাগছিল তোমায় দেখতে, কি সুন্দর সুটিং।

অন্য দুটি ছেলেও মুগ্ধ চোখে সৌমিত্রর কথার পুনরাবৃত্তি করলো, Wonderful. So interesting.

সোনালী স্বস্তির নিশ্বাস ফেললো। যাক, ওরা তাহলে কিছু বুঝতে পারেনি। ওদের তাহলে ভাল-ই লেগেছে।

বাপি! বোরিং লাগবে বলেছিলে কেন বল তো? খেতে খেতে সৌমিত্র জিজ্ঞেস করলো, আমার তো খুব-ই ভাল লাগল।

তাই না-কী! সমীর সন পুডিংটা টেনে নিলেন।

কাল পরশু আমাদের খেলা, আজ আর সুটিং দেখা হবে না ব'লে মন-খারাপ হয়ে যাচ্ছে।

আজকে কি তোরা আবার যাবি না-কি?

নিশ্চয়! যাব না মানে? আজ আমরা শেষ অবধি দেখবো। যতক্ষণ হবে।

আয়া এসে বললো যে, ষ্টুডিও থেকে অনিল-বাবু ফোন করেছেন। মেমসাহেবকে যেতে বলছেন।

এত তাড়াতাড়ি! বিস্ময়ের সঙ্গে একটু যেন বিরক্তিও সমীর সেনের গলায়।

সোনালী কিন্তু খুশী হলো। অনিল সোম ডেকে পাঠিয়েছেন। সেটে সবাই প্রস্তুত। সোনালী সেনের জন্যে সবাই অপেক্ষা করছে ভেবে মনে মনে ভারি স্বস্তি পেল সোনালী। আশ্চ

With Best Compliments from :—

RAMRAKSHPAL CHOWDHURY

IRON AND STEEL MERCHANTS

Stephen House, Calcutta—1, Room No. 108

(Office) 238746 —: Phone :—336350 (Residence)

তো। খোকা রয়েছে এখানে, কতদিন বাদে সোনালীর স্বামীও উপস্থিত মধ্যাহ্ন ভোজনে—নিজের বাড়িতে নিজের ঘরে স্বামী-সন্তান পরিবৃতা হয়েও কেন ষ্টুডিওর ডাকের জন্যে উন্মুখ হয়ে উঠলো সোনালীর মন? সোনালী নিজেই একটু অবাক হলো। এন জি.সট কখনও হয় না তো আমার, নিজেকেই বোঝালো সোনালী। তাই সটটা না নেওয়া পর্যন্ত স্বস্তি পাচ্ছে না মনে।

উঠে দাঁড়িয়ে সোনালী বললো, খোকা। তোরা তাহলে আর একটু পরে, আমি চলে যাই---।

না মা, তোমার সঙ্গেই যাব।

স্যুটিং এখন সারাদিন, কত দেখবি দেখ না।

সোনালী ব্যাগ তুলে নিয়ে পা বাড়ালো, কাঞ্চী!

মেমসাহেব।

চল।

কাঞ্চীর সঙ্গে এসে গাড়িতে উঠলো আবার, মনে হলো যেন নিজের জগতে আপন ঘরে ফিরে যাচ্ছে সোনালী। কী আশ্চর্য।

ষ্টুডিও যেতে এত আগ্রহ, এমন নিশ্চিন্ত শান্তি বোধ আর কখনও করেছে কি? কি যেন।

গাড়ি ষ্টুডিওর গেটের ভেতর ঢুকলো।

ছয়

'বিজয়-কেতন' রিলিজের দিন যথারীতি হৈ হৈ, মারপিট, সিনেমা-হাউসের সামনে পুলিশ।

দুটো থেকেই টেলিফোনের সামনে ব'সে ছিল সোনালী। সেদিন দুপুরে বাড়ি চলে-এসেছে লাঞ্চের সময়। একটু দেরী ক'রে খবর নিয়ে তবে ষ্টুডিও যাবে। এমন-ই ক'রে থাকে তার অভিনীত প্রত্যেক ছবি রিলিজের সময়। বেজে ওঠে টেলিফোন ক্রিং ক্রিং ক'রে। 'হাউস ফুল' বোর্ড লাগানো হলো 'অনামিকা'র সামনে, 'রূপলেখা'র সামনে পুলিশ লাঠি চার্জ সুরু করেছে, ইত্যাদি ইত্যাদি সংবাদ ম্যাটিনী শো সুরু হবার আগেই সোনালী সংগ্রহ করলো। দুটোর পর থেকেই সুরু হয় অন্য ধরণের খবর আসা। কোথায় পাবলিক কি মন্তব্য করেছে, কোন্ বিশেষ জায়গায় সোনালীকে তাদের একটু বেশী ভাল লেগেছে, এই সব।

ছবির পরিচালক, সহ-পরিচালকরা, কলা-কুশলীরা সকলেই বারে বারে সোনালীকে জানায় এই সব খবর। আর তারপর ন'টার সময় সেজেগুজে প্রস্তুত হয় সোনালী। সমীর সেনও উপস্থিত থাকেন তখন; কোথাও যান না উনি সেদিন, একেবারে সোনালীর হাত ধরে সিনেমা হাউসে।

বড় শেভ্রলে ইম্পালা এসে ঢোকে সিনেমা হাউসের মধ্যে, শো তখন আরম্ভ হয়ে যায়, বাইরের লোকের ভীড় কমে যায় তখন সামনে, শুধু ছবির পরিচালক, প্রযোজক ইত্যাদি দুচার-জন দাঁড়িয়ে থাকে সোনালীর অভ্যর্থনার জন্যে।

মাথার লম্বা ঘোমটা টেনে সোনালী সমীর সেনের হাতে হাত দিয়ে ওপরে উঠে যায়। সামনের পর্দায় ছবি। চারিপাশে ঘর-ভরা মুগ্ধ দর্শকদের ভীড়। উচ্ছ্বসিত স্তুতি আর প্রশংসা তাদের। দেখতে দেখতে শুনতে শুনতে বুকের মধ্যে কেঁপে কেঁপে ফুলে ফুলে ওঠে সোনালীর। স্বামীর হাতটা সে আবার বেশী ক'রে চেপে ধরে। বিশেষ বিশেষ জায়গায় ফিরে ফিরে তাকায় সমীর সেনের দিকে। তিনি মাথা নামিয়ে স্মিত হাসি হাসলেন সোনালীর দিকে চেয়ে চেয়ে। আনন্দে ভরে যায় সোনালীর মন। এমন-ই হয় প্রত্যেকবার ছবি রিলিজের সময়।

কিন্তু এবার এ-কী হলো?

সাতটা, সাড়ে সাতটা বেজে গিয়ে আটটা বাজতে চললো। সমীর সেন এখনো বাড়ি ফিরলেন না কেন? অন্য দিন যা-ই করুন, যেখানেই যান, ছবি রিলিজের দিন উনি তো ঠিকই হাজির থাকেন দুপুর থেকেই বাড়িতে। অস্থির সোনালী বার বার দেখছে বারান্দায় বেরিয়ে স্বামীর গাড়ি এল কী-না। নানা জায়গায় টেলিফোন ক'রে খবর নিচ্ছে সোনালী সেন সেখানে আছেন কী-না।

কিন্তু না, কোথাও নেই সমীর সেন। অবশেষে ক্লাব থেকে খবর এল সন্ধ্যার একটু পরেই দু' তিনজন বন্ধু-বান্ধবীর সঙ্গে বেরিয়ে পড়েছেন তিনি, বাড়িতে খবর দিতে ব'লে দিয়েছেন। ফিরতে তাঁর রাত হতে পারে, সোনালী যেন দুর্ভাবনা না করে। খবরটা শুনে অবাক হয়ে গেল সোনালী। সমীর বাড়ি আসবেন না! তিনি কি ভুলে গেছেন আজ সোনালীর ছবির মুক্তি! টেলিফোন ছেড়ে স্তম্ভিত হয়ে বসে রইলো সে। এমন ভুল! এমন আশ্চর্য ভুল! বারো বছরে কখনো হয়নি। ভুল—না তা কেমন ক'রে হবে? সকালে তো সমীর সেন নিজে গিয়ে কালীঘাটে পুজো দিয়ে এসেছেন সোনালীর সঙ্গে, যেমন প্রতিবার দেন। ছবির সাফল্য কামনা ক'রেই তো দেবীমূর্তির পা ফুলে ফুলে ঢেকে দেওয়া। সমীর সেন কেন এমন করলেন? টেলিফোনের সামনে অনড় হয়ে বসে ছিল সোনালী। কাঞ্চী এসে খবর দিল বাথ-টাবে গরম জল প্রস্তুত। জিজ্ঞেস করলো, কোন্ পোষাক বের করবে আজ। কি জুতো।

যা তুই এখন থেকে, সোনালী গর্জন ক'রে উঠলো, বেরো আমার সামনে থেকে।

কাঞ্চী অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো সোনালীর মুখের দিকে। আর হঠাৎ দু-হাতে মুখ ঢেকে ফুলে ফুলে কাঁদতে সুরু করলো সোনালী।

কনগ্রেচুলেসন্স! চমকে মুখ তুলে চাইলো সোনালী। সামনে দাঁড়িয়ে আছে অরূপ-কুমার, ট্রিমেনডাস সাক্সেস্। সুপার হিট্ হয়েছে এই বই। জানেন, আপনার মুখটা দেখা-মাত্র পাবলিক হৈ হৈ ক'রে হাততালি দিয়ে উঠেছে। মনে হয়েছে আপনাকে দেখে লোক-গুলো বুঝি পাগল হয়ে যাবে। সত্যি কী সাঙ্ঘাতিক পপুলার আপনি! একদমে অনেক কথা ব'লে থামলো অরূপকুমার। মুগ্ধ চোখে চেয়ে রইল সোনালীর জল-ভেজা মুখের দিকে, কি করছেন ব'সে ব'সে এমন দিনে? হাউসে আসুন, স্বচক্ষে দেখুন পাব-লিকের পাগলামী।

পাবলিক তাহলে এ বইটাও অন্যান্য বইয়ের মতো সোনালীকে নিয়েছে। জানিয়েছে সাদর অভ্যর্থনা। সমীর সেনের মতো ভুলে যায়নি তারা আজকে সোনালীকে। অরূপ-কুমারও তো ভোলেনি, সেও তো ছুটে এসেছে সোনালীকে অভিনন্দন জানাতে, ডাকতে এসেছে হাউসে যাবার জন্যে।

চলুন।

সোনালী উঠে দাঁড়ালো। হাউসে যাব বৈ কী। আমি এক্ষুণি তৈরী হয়ে নিচ্ছি। এখনও অনেক সময় আছে। আপনি কিন্তু এখানে খাবেন। কাঞ্চী! কাঞ্চী!

সাত

'বিজয়-কেতনের' সাফল্যের পর দেড় লাখ টাকা কন্ট্রাক্ট সই করলো সোনালী।

শুধু সমীর সেন-ই নন, অরূপকুমারও বার বার বলতে লাগল, রেট বাড়ান, এরপর রেট বাড়ান আপনি।

প্রত্যেকটি দেড় লাখ ক'রে তিনটে ছবির কন্ট্রাক্ট হলো। বম্বে থেকেও ডাক এলো আবার। দু'লাখ টাকা দেবে তারা।

তা ছাড়া স্যুটিং-এর সময় বম্বের হোটেলে থাকার খরচ, আর ব্যবহারের জন্যে গাড়ি নিয়ে নাও মীরু, সমীর সেন উৎসাহিত করেছিলেন সোনালীকে, এদের টার্মস এণ্ড কন্ডিসন্স্ দেখছি খুব ভাল, তা ছাড়া এই নাগাররালা লোকটার খ্যাতি আছে বম্বের বাজারে।

সোনালী তবু প্রথমে রাজী হ'তে পারেনি।

আবদারের সুরে ঠোঁট ফুলিয়ে চোখ টান ক'রে বলেছিল সোনালী, বাংলা-ই আমার লক্ষ্মী। বাংলা দেশ-ই ভাল।

বাংলা থেকে দেড় লাখ টাকার বেশী কন্ট্রাক্ট আশা করো না। হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলো না।

কিন্তু বম্বে গিয়ে যদি দুনাম হয়?

দুর্নাম আর কি! হয়তো বইটা তেমন সফল না হ'তে পারে। তাই ব'লে টাকা তো আর ফেরৎ দিতে হবে না।

যাব। টাকা-ই যখন আসল কথা। তোমায় কিন্তু আমার সঙ্গে বম্বেতে গিয়ে থাকতে হবে ব'লে দিলাম। হ্যাঁ—য়া। সোনালী স্বামীর গলা জড়িয়ে, বুকে মাথা রেখে কণ্ঠে মধ ঢেলে দিল।

যাব বৈ-কি। প্রথমে তো যাব-ই, কিন্তু একটানা থাকতে পারব না।

কেন। থাকতে পারবে না কেন? স্বামীর

লোমশ বুক থেকে মাথা তুলে সোজা হয়ে সমীর সেনের চোখে চোখ রাখলো সোনালী, কেন? থাকা হবে না কেন শুনি?

বাঃ! এখানকার কাজ---সমীর সেন আমতা আমতা ক'রে থেমে গিয়েছিল।

এখানকার কাজ! এখানে তোমার কাজ? কি এ ন কাজ যে বাইরে থাকা চলে না?

আরে আছে আছে। আমার নানারকমের ব্যবসা আছে, ট্যাক্সি---আরো কত ব্যবসা। সমীর সেন পেছন ফিরে ঘর ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। সোনালী সেদিকে আগুন হয়ে চেয়ে রইল। বুকের মধ্যে যেন বিছে কামড়াচ্ছে।

কাজ! ব্যবসা! ট্যাক্সি। সোনালী যেন জানে না কিছু; বোঝে না যেন। লোক-মুখে নানা কথা শুনেছে সে, প্রমাণও ছোট ছোট পেয়েছে নানা, তবু যেন সম্পূর্ণ বিশ্বাস হয়নি। কিন্তু সেই 'বিজয়-কেতনের' রিলিজের দিন থেকে সোনালীর সব বিশ্বাস ভেঙ্গে গেছে।

প্রথমটা স্বামীর প্রতি দুরন্ত অভিমানে বুকের মধ্যে ফুলে ফুলে উঠেছে। অসহ দুঃখ! জীবন অর্থহীন মনে হয়েছিল সোনালীর। মিথ্যা! ব্যর্থ মনে হয়েছিল সব। ভেবেছিল আর কোন দিন ছবি করবে না। ছেড়ে দেবে সব। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করতে গিয়ে নিজেকে সে প্রশ্ন করলো, কি সব জন্যে, কার জন্যে? যাঁকে বাঁচাতে তার এই ছবিতে নামা, তিনিই যদি না রইলেন জীবনে, ভুলে গেলেন, অবহেলা করলেন তবে কেন?

মনের ভাব মুহূর্তে কিন্তু গেল বদলে। আশ্চর্য! সাজসজ্জা ক'রে সে অরূপকুমারের সঙ্গে ছবি দেখতে গিয়েছিল সেদিন।

স্বামীর ওপর অভিমান অবশ্য আজো যায়নি সোনালীর। সেদিন ছবি দেখে এসে সে বিছানায় শুয়ে ফুলে ফুলে কেঁদেছিল। তবু সে ছবি দেখেছিল, ছবি করাও ছাড়েনি। সেদিন পাশে ব'সে অরূপকুমার সোনালীর অপূর্ব অভিনয়ের প্রশংসা করেছিল মৃদু গুঞ্জনে। ভাল লেগেছিল সোনালীর, তবু যেন বুক ভরেনি। একটা শূন্যতাবোধ গিয়েও যেন যাচ্ছিল না।

ছবি দেখতে দেখতে বিশেষ বিশেষ জায়গায় কখন অজান্তে সোনালীর হাত এসে মিলছিল অরূপকুমারের হাতে। অরূপকুমার একটু বুঝি বিহ্বল হয়ে তাকাচ্ছিল সোনালীর দিকে। আর অন্য রকম একটা ভাল লাগা, একটা সুখের আবেশ ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছিল সোনালীর মনকে।

তবু মন ভরেনি। কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে ওঠেনি হৃদয়ের পাত্র, আর তারপর থেকে সেই ফাঁকটা যেন রয়ে গেছে। দিন দিন স্বামীর সঙ্গে সোনালীর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে, হৃদ্যত বেড়ে উঠছে অরূপকুমারের সঙ্গে। সে রাত্রে সমীর সেনকে না-কী বাধ্য হয়েই ব্যবসার খাতিরে বর্ধমান যেতে হয়েছিল। সোনালী পরে জেনেছে বন্ধু নয়, বান্ধবী—মিস এলিস লিরয়।

এই নিতান্ত সাধারণ চেহারার এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়েটির সঙ্গে সমীর সেনের পরিচয় আছে, এ-খবর জানা ছিল সোনালীর। কিন্তু এতো ঘনিষ্ঠতা, এতোটা অন্তরঙ্গতার খবর জানতো না সে।

যন্ত্রণায় ছটফট করেছে সোনালী। মনে হয়েছে সমীরকে গিয়ে সোজাসুজি জিজ্ঞেস করে এসবের অর্থ। কিন্তু তা আর হয়ে ওঠেনি।

সমীর সেন তেমনি চৈক সই করিয়ে নিয়ে সকালবেলা খাবার টেবিলে চীজের টুকরো এগিয়ে দিয়েছেন সোনালীর দিকে। কাজ ব'লে বেরিয়ে রাত বারোটার আগে ফেরেননি।

দুঃখে অভিমানে লুকিয়ে লুকিয়ে কেঁদেছে সোনালী, এখানে ওখানে, কাকে ফোন ক'রে খবর নিয়ে জানতে পেরেছে যে, সমীর সেন মিস এলিসের সঙ্গে ঘোরাঘুরি করছেন, সময় কাটাচ্ছেন তার ফ্রী স্কুল স্ট্রীটের ফ্লাটে।

আজকাল সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে প্রায়ই দেখে অন্য অনেক লোকের সঙ্গে অরূপকুমারও বসে আছে সোনালীর প্রতীক্ষায় নীচের ঘরে। ওপরে ডাকিয়ে এনে রোজই তাকে মৃদু তর্ৎসনা করে সোনালী।

তুমি কেন নীচে ব'সে থাক? ওপরে উঠে আসতে পার না?

মহারাণীর আদেশ ছাড়া কি পারি? অরূপকুমার এগিয়ে এসে সোনালীর একটি হাত নিজের হাতের মধ্যে তুলে নেয়, মৃদু চাপ দিয়ে বলে, বলো, আজ বান্দার কি কি কাজ?

চুপ ক'রে এইখানে ব'সে ব'সে মহারাণীর ধ্যান করো যতক্ষণ না আমি স্নান সেরে আসি। তারপর আমার সঙ্গে খেয়ে জোরে গাড়ি ছুটিয়ে দিয়ে একদম দমদম। সেখানে কফি খেয়ে—

আর কথা শেষ করতে পারে না সোনালী, ব্যাকুল-চুম্বনে ওর কথা বন্ধ ক'রে অরূপকুমার ততক্ষণ টেনে নিয়েছে নিবিড় বাহু-বন্ধনে।

প্রথম যেদিন অরূপকুমার শুভরাত্রি জানিয়ে চলে যেতে গিয়ে হঠাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে দুহাত বাড়িয়ে হঠাৎ সোনালীকে বুকে টেনে নিয়েছিল, চুম্বনে-চুম্বনে ওর নিশ্বাস বন্ধ ক'রে চলে গিয়েছিল, সে রাতে বিছানায় শুয়ে অনেকক্ষণ ঘুম আসেনি সোনালীর। বালিশে মুখ ঘষে বলেছে, এ আমি চাইনি, এ আমি চাইনি। মনে পড়েছে অরূপকুমারের সঙ্গে প্রথম দেখার কথা।

অরূপকুমারের মুগ্ধ দৃষ্টি সোনালীর সেদিনও ভাল লেগেছিল। আবার লজ্জাও পেয়েছিল। এই নিতান্ত তরুণ যুবক, সদ্য বিবাহিত, প্রেম ক'রে বিয়ে করেছে আবার, তার সঙ্গে যাই হোক, রোমান্সের স্বপ্ন দেখবে না সোনালী। তার উপকার ক'রে দেবে, কনট্রাক্ট ক'রে দেবে। কিন্তু প্রেম? ভালবাসা? রোমান্স?

নৈব নৈব চ।

কিন্তু কোথা থেকে কি হয়ে গেল।

'বিজয়-কেতন' রিলিজের দিন বাড়ি ফিরেও সোনালী স্বামীকে দেখতে পেল না। অনেক রাত অবধি বারান্দায় ব'সে ব'সে স্বামীর জন্যে অপেক্ষা করল সে। অরূপকুমারও থাকল সোনালীর সঙ্গে।

অরূপকুমার বারবার আশ্বাস দিল, ভয় কি? উনি তো ব'লে পাঠিয়েছেন ফিরতে রাত হবে।

সেদিন শুধু অরূপকুমারের আশ্বাসবাণী নয়, তার উপস্থিতিও সোনালীর মনে সাহস এনেছে, কিছুটা শান্তি দিয়েছে। যাই হোক, একজন লোক তো তবু আছে তার পাশে, যে তাকে ছেড়ে যায়নি এই দিনে। ব্যাকুল-চোখ তুলে সে বারবার তাকিয়েছে, সোনালীর হাতটা নিজের হাতের মধ্যে ধ'রে আর ছাড়তে চায়নি।

এমনি ক'রেই ধীরে ধীরে ঘনিষ্ঠতা বেড়ে উঠলো অরূপকুমারের সঙ্গে। তখন যেন ভুলে গেল সোনালী অরূপকুমারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করতে ও চায়নি, চায়নি তার প্রেমে পড়তে।

আট

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে-ই সমীর সেন চেক বইটা এগিয়ে দিলেন সোনালীর দিকে, কলমের মুখ খুলে হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন, সই করো।

ঘুম-জড়ানো চোখেই সই করলো সোনালী। পাতাটা ছিঁড়ে সমীর সেনের দিকে এগিয়ে দেবার আগে কি যেন ভেবে টেনে নিল সোনালী। সংখ্যাটা দেখল, এ-কী! দশ হাজার টাকা দিয়ে তুমি কি করবে?

সে কৈফিয়ৎ দিতে হবে না-কী তোমাকে? সমীর সেনের গলা শুধু গম্ভীর নয়, রুক্ষ, কঠিন।

আগুন জ্বললো সোনালীর চোখে, জল নয়। মুখে এসেছিল, আমার টাকা, সুতরাং কৈফিয়ৎ চাইবার অধিকার আমার আছে বই-কী! কিন্তু সেকথা বলা হলো না। দু'চোখে অসীম ঔদাসীন্য নিয়ে সোনালী শুধু চেকের পাতাটা হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়ে বললো, কৈফিয়ৎ আমি কবেই বা চাইলাম যে আজই চাইব?

সমীর সেন বোধহয় একটু অপ্রস্তুত হলেন তারপর কি ভেবে এগিয়ে এলেন সোনালীর দিকে, বললেন, তোমায় তো বলেছি, একটা নতুন বিজনেসে নামছি পার্টনারশিপে, তার জন্যে।

ও! সোনালী পাশ ফিরে বালিশ আঁকড়ে রইলো। সমীর সেন বোধহয় সোনালীর কাছ থেকে এত সংক্ষিপ্ত উত্তর আশা করেননি। আশঙ্কা করেছিলেন আরো প্রশ্নের, কৌতূহল, অনুসন্ধিৎসা। সমীর সেন নিজেই বললেন, স্টীল ফার্নিচারের ভীষণ মার্কেট এখন। তাই আমার এক বন্ধুর সঙ্গে, তার আবার ষ্টীল মার্কেটে খুব হোল্ড আছে কী-না।

সোনালীর মুখে আবার এল, বন্ধু, না বান্ধবী? কিন্তু সেকথা না ব'লে সোনালী বললো, তাই বুঝি?. ভাল!

এর পর বোধহয় সমীর সেন আর কথা খুঁজে পেলেন না। একবার কাশলেন। বার কয়েক পায়চারি করলেন সোনালীর সামনে, তারপর আস্তে আস্তে স্নানের ঘরের দিকে চলে গেলেন।

সোনালীও উঠে পড়ল।

আজ মঙ্গলবার। স্যুটিং নেই। এইদিনে সাধারণতঃ বন্ধ থাকে ষ্টুডিও। এই দিনটা ছুটি। বারবার এই দিনে বেলা ক'রে ওঠে সোনালী। বিছানায় শুয়ে শুয়ে উপভোগ করে আলস্য। জানালা দিয়ে দেখে গাছের পাতায় আলোর ঝিকিমিকি। আজ কিন্তু আর ভাল লাগল না শুয়ে থাকতে। সমীর সেনের চলে যাওয়ার পথটার দিকে তাকিয়ে থেকে দাঁত দিয়ে চেপে ধরল নীচের ঠোঁট। চোখ দিয়ে দু'ফোটা জল গড়িয়ে পড়ল।

কেন এমন হলো? কেন সোনালীর জীবন ভরে উঠল না সোনালী ফসলে? কার দোষ? কোন্ পাপে ব্যর্থ হয়ে গেল সব? ঝরঝর ক'রে তার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়লো।

মাগো! মা! সোনালী বালিশে মুখ চেপে ফুলে ফুলে কাঁদলো।

মীরু! মাথায় স্বামীর হাতের ছোঁয়া পেয়ে তীরের মতো উঠে বসলো সোনালী। দু'হাত বাড়িয়ে তাঁর গলা জড়িয়ে ধ'রে তাঁর বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে দিল সোনালী। জলে ভেজা মুখটা স্বামীর বুকে ঘষতে ঘষতে বললো, না না না।

পাগলী মেয়ে! কি হয়েছে! কি এতো কান্না! এই তো আমি রয়েছি, সমীর সেনের নিবিড় আলিঙ্গনের মধ্যে কেঁপে কেঁপে কেঁদে কেঁদে শান্ত হলো সোনালী।

আজ তুমি আমাকে ফেলে কোথাও যেতে পারবে না। আজ তুমি আমার কাছে থাকবে সারাক্ষণ।

থাকব গো থাকব, সমীর সেন সোনালীর মাথায় টোকা দিলেন, তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নাও। কাঞ্চীকে বল বেতের বাস্কেটে কিছু খাবার, জল, ফল গুছিয়ে দিতে। চল, আজ একটা লং ড্রাইভে বেরিয়ে পড়া যাক।

হ্যাঁ হ্যাঁ : তাই চল! তাই চল। সোনালী ছোট্ট মেয়ের মতো উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো, কাঞ্চী, কাঞ্চী!

জী মেমসাহেব। কাঞ্চী ছুটে এলো ড্রেসিং গাউন হাতে নিয়ে।

কাঞ্চী, আমরা বাইরে যাব। ফিরব না আজ। সারাদিন ফিরব না আজ। তুই সব গুছিয়ে নে তাড়াতাড়ি। বাবুচিকে বল—

মেমসাহেব! কুণ্ঠিত ভঙ্গীতে কাঞ্চী সোনালীর উচ্ছ্বাসে বাধা দিল।

কি রে?

ও সাহাব কবসে বেয়টা হ্যায়। আজ তো উন্কা সাথ আপকি যানেকি বাত থা না? কাঞ্চী মাথা চুলকে চুলকে তার বক্তব্য শেষ করলো।

সোনালীর মনে পড়ল। কাল সন্ধ্যায় অরূপকুমারের সঙ্গে গঙ্গার জেটিতে বসেছিল যখন হাতে হাত দিয়ে, তখনই ঠিক হয়েছিল ওরা দুজন সারাদিন বাইরে কাটাবে। চন্দননগরে গিয়ে গঙ্গায় নৌকা ভাসাবে। কি শহর ছাড়িয়ে মাঠের সবুজে গড়াগড়ি দেবে। একথা এক-দম মনে ছিল না। এখন কি করবে? কি বলবে? ফিরিয়ে দেবে অরূপকুমারকে। বলবে, আজ নয় মৃণাল, আজ নয়। এখন ফিরে যাও। আমার স্বামী আমার সঙ্গে বেড়াতে যাবেন বলেছেন। যখন তিনি যাবেন তাঁর বান্ধবী এলিসের সঙ্গে, আমি একা ঘরে বসে কাঁদব, তখন তোমাকে প্রয়োজন হবে আমার। তখন আবার তোমার ডাক পড়বে নিঃসঙ্গ জীবনে সঙ্গ দিতে, বিধুর সন্ধ্যা উজ্জ্বল ক'রে তুলতে।

সমস্যার সমাধান ক'রে দিলেন, ওঁকেও যেতে বল না আমাদের সঙ্গে। বেশ সারা-দিনের জন্যে একজন সঙ্গী পাওয়া যাবে। আর—একটু থেমে মিটমিট ক'রে হাসলেন সমীর সেন, তোমারও একটু বেশী ভাল লাগবে।

ভাগ! কৃত্রিম তর্জনে সোনালী স্বামীর গায়ের ওপর ড্রেসিং গাউনটা ছুঁড়ে দিল, কাঞ্চী; সাহেবকে বলো বসতে, আমি আসছি। গুনগুন ক'রে 'জীবন-পাত্র উছলিয়া' গাইতে গাইতে বাথরুমে ঢুকলো সোনালী।

বেশ হলো! এ বেশ ভাল ব্যবস্থাই হলো। সমীর সেনের সঙ্গে অরূপকুমার থাকলে বেশ একটি সুগোল পরিপূর্ণ জীবনের স্বাদ পাওয়া যাবে। আহা! খোকাটাও যদি থাকতো কাছে। সুগন্ধী বাথ-সল্টের ফেনার মধ্যে ভাসতে ভাসতে সোনালীর মন আবার খুশী হয়ে উঠলো। ভরে উঠলো।

আছে, আছে, সব আছে সোনালীর। স্বামী আছে, সন্তান আছে, মুগ্ধ প্রেমিকও পাশে পাশে আছে সর্বক্ষণ। কিন্তু আজ যদি মৃণাল না থাকতো তাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সারাদিন, তাহলে কি আরো ভাল লাগতো না সোনালীর? উপভোগ্য আরো বেশী হতো না স্বামী সান্নিধ্য! হ্যাঁ, ভাল লাগতো, খুব-ই ভাল লাগতো। তবু অস্বীকার করতে পারল না অরূপকুমার কাছে থাকার জন্যে একটু বেশী-ই ভাল লাগবে সোনালীর। রমণীয় হয়ে উঠবে প্রতিটি মুহূর্ত, কানায় কানায় ভরে উঠবে সুখের পাত্র!

নয়

মোহন মুখার্জীর কাছ থেকে আবার ডাক এলো সোনালীর। নতুন ধরণের গল্প। আর সে-চরিত্রে বিশেষভাবে পছন্দ করলেন সোনালীকে। সেরকম চরিত্রে আগে সে অভিনয় করেনি। স্ক্রিপ্ট্ শুনতে শুনতে মুগ্ধ হলো সোনালী—এতো ভাল লিখতে পারেন আপনি?

কিন্তু মিসেস সেন, এ-চরিত্র একমাত্র আপনিই পারেন ফোটাতে। বলুন, এবার না বলবেন না।

সমীর সেন পাশেই ছিলেন। সোনালীর হয়ে জবাবটা তিনিই দিলেন, না করবে কেন? ওর যা রেট তাই যদি আপনি দেন, না বলার ওর আছে কি? তবে ডেট দেখতে হবে। এ-বছর পুরোটাই বোধহয় বুকড্। ডেট্ দিতে পারবে কী-না সন্দেহ।

মোহন মুখার্জীর ফরসা মুখ লাল হয়ে উঠলো, ওর রেটটা তো এখন দেড় লাখ টাকা, তাই না?

হ্যাঁ।

● ম' খুব ভাল অভিনয় করেন

অতো দেওয়া সম্ভব নয় আমার পক্ষে। কারণ ছবিটা আমি নিজেই করছি এক রকম বলতে গেলে।

দেখুন, ছবির জন্যে যার-ই টাকা নেব, তার মর্জি বুঝে আমায় চলতে হবে।

কিন্তু আপনি তো চিরকাল নিজের খুশি-মতো ছবি করেন। কারুর বিধি-নির্দেশ মানেন না ব'লেই জানি।

ঠিক। আর সেইখানে এবার গণ্ডগোল। আবার শেষ দুটো ছবি কমার্শিয়াল সাকসেস্ হয়নি। তাই—

তাহলে এবার আপনার একটু ব্যবসার দিক দেখা উচিত। After all ছবি যদি সাধারণে না-ই নিল, তাহলে সে-ছবি করার সার্থকতা কোথায়?

সমীর সেনের প্রশ্নে বিশেষ বিচলিত হলেন না মোহন মুখার্জি, ধীরে ধীরে বললেন, আপনি বলেছেন ঠিকই যে, ছবি যদি লোকে না দেখে তাহলে ছবি করা সার্থক হয়ে ওঠে না। কিন্তু তাই ব'লে জনসাধারণের ভাল লাগার কথা মনে ক'রে এমন কিছুই আমি করতে পারবো না যার্তে আমার বিশ্বাস নেই, যা আমি বাজে মনে করি।

কিন্তু শুধু আপনার বিশ্বাস অনুসারে কাজ করলেও হবে না মিঃ মুখার্জি! বারবার যদি আপনার ছবি ফ্লপ—সমীর সেন কথা না শেষ ক'রে চোখ টিপে হাসতে লাগলেন। মোহন মুখার্জি আর সোনালীও সেই হাসিতে যোগ দিল।

আমি চেষ্টা করবো যাতে জনসাধারণের রুচি ফেরাতে পারি। তাদের রুচি তৈরী করার ভার তো আমাদেরই হাতে।

যদি সফল না হন?

বারবার চেষ্টা করবো, তবু হাল ছাড়বো না। তবু যাতে আমার বিশ্বাস নেই, যা আমি বাজে ব'লে জানি, তা কখনো-ই করব না, না কিছুতেই না। মোহন মুখার্জির গলা আরো দৃঢ় হলো। চোখ উজ্জ্বল হলো, আমার সমস্ত মন-প্রাণ যে-গল্পে যে-ছবিতে সায় না দেবে তেমন ছবি আমি কখনো-ই করবো না।

যদি অনেক টাকা পান?

তাহলেও না।

সত্যি বলছেন মিস্টার মুখার্জি? সোনালী কৌচে একটু সরে এলো মোহন মুখার্জির

দিকে, অনেক বেশী টাকা পেলেও আপনি ফরমাশ মতো ছবি করবেন না?

না মিসেস সেন। আপনি তো জানেন, বম্বে থেকে আমার অফার ছিল বেশ মোটা টাকারই আর সেসব টাকার অফার এখনো আছে। কিন্তু আমি রাজী হ'তে পারি না।

কেন মিস্টার মুখার্জি? ফিল্মে নামার উদ্দেশ্য তো টাকা করা।

দুঃখিত মিসেস সেন, আপনার সঙ্গে একেবারে একমত হ'তে পারলাম না। ফিল্মে কাজ নিশ্চয়ই অন্যান্য প্রফেসনের মতোই কিন্তু তার সঙ্গে অন্য আরো কিছু যুক্ত আছে। শুধু টাকা নয়, শিল্পবোধ, শিল্পসৃষ্টির আনন্দ। ভাল চরিত্র, শক্ত চরিত্র ফুটিয়ে তুলতে বেশী ভাল লাগে না আপনার? অভিনয় ক'রে খুশি হন না কখনও?

সোনালী নীরবে মাথা হেলালো—হয়। হয় বই কী! আর আজকাল যেন সেটা বেশী ক'রেই হচ্ছে।

মুখে মেক-আপ-এর লাল রং পড়ার সঙ্গে সঙ্গে কেমন একটা ক্ষীণ উত্তেজনা, আনন্দের ছোঁয়া লাগে বুকে। আর ফ্লোরে টোকার সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে সেটা। তখন সোনালী সব ভুলে যায়। মাথার কাছে সব কটা ঝলমলে আলো জ্বলে, মুখের ওপর মাইক দুলতে থাকে, চোখের সামনে দাঁড়িয়ে থাকেন পরিচালক আর সহ-পরিচালক। কেমন একটা যুদ্ধ জয়ের ভাব আসে সোনালীর মনে; দৃপ্ত ভঙ্গীতে এগিয়ে যায় ও। হ্যাঁ, এখন ও দেখাবে, অভিনয় করবে, মুগ্ধ ক'রে দেবে আপাতত ফ্লোরের এতোগুলো লোককে, আর তারপর ছবি রিলিজ হ'লে তো----এসব কথা আগে কিন্তু সোনালীর মনে হতো না। যখন সে প্রথম প্রথম ছবি করতো তখন সবচেয়ে বেশী যে-ভাব তার মনকে আচ্ছন্ন ক'রে রাখতো তার নাম ভয়।

হ্যাঁ, ভয়-ই। কি হবে? ভাল হবে কি-না অভিনয়? পরিচালক খুশি হবেন কি-না? চুক্তি মতো টাকা পাওয়া যাবে তো? এই সব চিন্তায় ভরে থাকতো সোনালীর মন। ঘড়ির কাঁটা যখন অপরাহ্নের দিকে হেলতো, চারটের ঘর ছাড়িয়ে পাঁচটার কাঁটা ছুঁই ছুঁই করতো তখন ব্যাকুল হয়ে উঠতো সোনালী। আর মুহূর্তও ভাল লাগত না, থাকতে চাইতো না স্টুডিওর পরিবেশে। মন তার উধাও হয়ে যেতো কসবার সেই ছোট্ট পুরনো বাড়ির স্যাঁতসেঁতে ঘরে, যেখানে অসুস্থ স্বামী বেতের চেয়ারে শুয়ে স্ত্রীর ফিরে আসার আশায় প্রহর গুণছেন, স্কুল থেকে ফিরে সোনালীর ছেলে হয়তো না খেয়েই শুকনো মুখে রুক্ষ চুলে একা একা ব'সে ঘরের মেঝেয় মার্বেল খেলছে।

কিন্তু আজ।

হয়তো অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে ব'লে আজ আর সোনালীর মন এমন ক'রে ঘরের দিকে ছুটে যায় না পাঁচটার সময়। সোনালী জানে—ঘরে স্বামী নেই প্রতীক্ষারত, খোকনকেও দেখতে পাবে না বাড়ি ফিরে।

সমীর সেন বললেন, কিন্তু আপনিও তো সোনালীকে চাইছেন ওর বক্স অফিসের জন্যেই।

চকিতে আবার মোহন মুখার্জির দিকে ফিরল সোনালী।

তাই তো! এতক্ষণ একটা প্রশ্ন করেছেন সমীর সেন, দেখা যাক মিস্টার মুখার্জি কি উত্তর দেন। পয়সার জন্যে কেয়ার করেন না, টাকা চান না উনি। ইস্! কত অহঙ্কার, কি বড় বড় কথা!

মোহন মুখার্জি একটা আশ্চর্য কথা বললেন, একটুও অপ্রতিভ হলেন না সমীর সেনের প্রশ্নে, না মিস্টার সেন। মিসেস সেনের ট্রিমেনডাস বক্স-অফিস আমি জানি, কিন্তু সেজন্যে আমি ওঁর কাছে আসিনি। আমি এসেছি, কারণ এই কাজলের চরিত্র মনে করতে গেলে যে চেহারা, যে কথা বলার ভঙ্গী আমার চোখের সামনে ফুটে ওঠে, সে সব মিসেস সেন ছাড়া আর কারুর মধ্যে পাই না। তা ছাড়া মিসেস সেনের অভিনয়-ক্ষমতার ওপর বিশেষ বিশ্বাস আছে। উনি এখন বাংলার শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী সন্দেহ নেই, তবু আমার মনে হয়, ওঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ অভিনয় এখনও করেননি উনি। সেটাই আমি একবার চেষ্টা ক'রে দেখতে চাই। তাই বারবার আসি। মিসেস সেনের বক্স-অফিসের জন্যে নয়, আসি ওঁর প্রতিভার জন্যে----

মোহন মুখার্জির কথা চুপ ক'রে শুনছিল সোনালী। আর এই সাধারণ প্রশংসা, মামুলি স্তুতিবাক্য, যা ও দুবেলা শুনছে রোজ, সেই পুরনো প্রশস্তি মোহন মুখার্জির গলায় নতুন ক'রে শুনতে শুনতে কেমন যেন নতুন-ই মনে হলো কথাটাকে সোনালীর।

মোহন মুখার্জি তখনও ব'লে চলেছেন, আপনার কাছ থেকে আরো অনেক আশা করি মিসেস সেন, অনেক বড়, অনেক কিছু, আপনি শুধু টাকার জন্যে এই লাইনে এসেছেন ভাবতে আমার খারাপ লাগে। টাকার দরকার আছে বই-কী, আপনি নিশ্চয় নেবেন। কিন্তু কনট্রাক্ট করার সময় শুধু টাকার অঙ্কই বিচার করবেন না। দেখে নেবেন কেমন চরিত্র, কেমন গল্প। সমীর সেনও কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন, টেলিফোন বেজে উঠলো এই সময়, তিনি উঠে গেলেন।

মোহন মুখার্জি পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন সোনালীর দিকে, বলুন মিসেস সেন, এ-রোল আপনি করবেন।

সোনালীর বলতে ইচ্ছা করল, করব। আপনার পরিচালনায় এমন একটা চরিত্র ফুটিয়ে তুলবো, এমন স্বাক্ষর রেখে যাব যে কোনদিন মুছবে না। কিন্তু সেকথা সে বলতে পারল না। সে কনট্রাক্ট নেওয়া না-নেওয়ার ব্যাপারে যা করবেন সব সমীর সেন। তিনি যদি রাজী হন, এক পয়সাও না নিয়ে সোনালীকে ছবিতে নামতে দেন, তবে তাই করবে সোনালী কিন্তু এমন অদ্ভুত আশা সোনালী করে না।

সে জানে, দেড় লাখ টাকার এক পয়সা কমে চুক্তিপত্রে তাকে সই করতে দেবেন না সমীর সেন।

জানেন মিসেস সেন, মোহন মুখার্জির গলা আবার শোনা গেল, এই ছবিটা আজ তিন বছর ধ'রে করবো ব'লে ঠিক ক'রে রেখেছি, কিন্তু উপযুক্ত নায়িকা পাই-নি ব'লে। তিন বছর ধ'রে ফেলে রেখেছেন, এত ভাল বই?

এই বই-এর জন্যেই তো আপনার কাছে বারবার আসছি মিসেস সেন। আপনি না করলে, আপনি রাজী না হ'লে এ ছবি আমার কোনদিন করা হবে না।

এই কাজল চরিত্রের জন্যেই আপনি বারবার এসেছেন আমার কাছে?

হ্যাঁ মিসেস সেন।

মুহূর্তের জন্য নির্বাক হয়ে গেল সোনালী। এমন কথা, এমন স্তুতি—শুধু তার-ই জন্যে নির্বাচিত চরিত্র—এমন মন-ভোলানো কথা আজ নতুন শুনছে সোনালী। কিন্তু কোনদিন এসব প্রশস্তি তাকে বিচলিত করেনি, কারণ ও জানতো, বুঝতো যে, তাকে ছবিতে পাওয়ার জন্যেই এই বাক্যের জাল পাতা।

আমায় একটু ভাবতে সময় দিন মিস্টার মুখার্জি।

বেশ! আমি কবে আসবো বলুন?

আপনাকে আসতে হবে না। আমি-ই ফোন করব কাল সকালে আপনাকে।

কাল সকালেই করবেন? অনেক ধন্যবাদ মিসেস সেন! সত্যি আপনার ডিসিশনটা আমার একটু তাড়াতাড়ি জানা দরকার, কারণ আপনি যদি না-ই নামেন ছবিতে—

তাহলে অন্য কারুর কাছে যেতে হবে, সোনালী-ই কথা শেষ ক'রে দিল মোহন মুখার্জির।

না, তা নয় মিসেস সেন! আমি তো আপনাকে ব'লেইছি যে আপনি যদি করেন তবেই ছবিটা হবে, নাহলে এ-ছবি আর করা হবে না, তবে সে-ক্ষেত্রে অন্য ছবির কথা ভাবতে হবে আর কি!

সোনালীর ইচ্ছা করলো এখনই কথা দিয়ে দেয় মোহন মুখার্জিকে, হ্যাঁ মিস্টার মুখার্জি আপনার ছবিতে কাজ করবো আমি। যা ইচ্ছে টাকা দেবেন আপনি, না পারলে না-ই দেবেন, তবু এমন চরিত্রে অভিনয় করার লোভ আমি সামলাতে পারছি না।

কিন্তু সেকথা বলা হলো না মুখ ফুটে। টেলিফোন ক'রে খবর দেবে এই কথা-ই বললো।

আজ সারারাত আমার ঘুম হবে না আর কী।

আর টেলিফোনের কাছে ব'সেই কাটাবো সারা সকাল।

কী যে বলেন।

সোনালী হাত জোড় করলো, অপরাধী করবেন না। সাড়ে দশটা থেকে এগারোটার মধ্যেই ফোন পাবেন আপনি।

অনেক ধন্যবাদ, নমস্কার জানিয়ে মোহন মুখার্জি চলে গেলেন।

নয়

সমীর সেন সোনালীর প্রস্তাবে সহজে রাজী হলেন না, করে করবে কি? একবার যদি রেট কমাতে আরম্ভ কর তাহলে, তাহলে কমাতে কমাতে কোথায় গিয়ে থামতে হবে কে জানে।

আহা! আমি তো সবাইয়ের জন্যে কম করব না রেট, শুধু মিস্টার মুখার্জির জন্যে।

লোকে যদি জানতে পারে তাহলে আর কখনো দেড় লাখ টাকা দেবে?

সোনালী সমীর সেনের কাছে সরে এলো, শুধু এই রোলটার জন্যে।

কি আছে রোলটায়? একটা গরীব কেরাণীর মেয়ে, অভাব-দুঃখের মধ্যে তানপুরা হাতে নিয়ে গান গাইছে। না একটা চান্স পাবে ভাল কাপড় পরার, না ঝকঝকে সেট।

সেটাই তো এই রোলটার চার্ম গো। নানান দামী পোষাক প'রে বড় লোকের মেয়ের রোল অনেক করেছি।

আর তাই তো তোমার নামও হয়েছে। টাকাও পাচ্ছ।

ঠিক। এ-সত্য অস্বীকার করতে পারলো না সোনালী। তবু কেন যেন মনে হচ্ছে এই রোলটার এই একান্ত গরীব দুঃখী মেয়েটার চরিত্রটা মনের মতো ক'রে ফুটিয়ে তুলে আনন্দই পাবে সোনালী। প্রশংসা পাবে।

তোমার যখন এতোই ইচ্ছা তখন এক কাজ কর।

কি?

পঞ্চাশ হাজার এখন নাও। আর বাকী এক লাখের জন্যে একটা শেয়ার রেখে দাও ছবিতে। ওঁর নিজের যখন ছবি।

মন্দ বলেন নি! সমীর সেন।

সোনালীর ভাল-ই লাগল। অন্তত সমীর সেন রাজী হলেন তাই, ব'লে দি। কারণ মোহনবাবু আর আমার নাম থাকলে ডিষ্ট্রীবিউটার্সদের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে যাবে।

টাকা উঠে আসবে দেখো।

মোহন মুখার্জি খুব সহজে রাজী হয়ে গেলেন।

সমীর সেন তারপর কিন্তু বললেন, কেন বললে না এক লাখের বেশী শেয়ার থাকবে।

বাঃ! তা কেন বলব? দেড় লাখ টাকা তো পুরো এসে-ই যাচ্ছে। পঞ্চাশ হাজার তো উনি দিয়ে-ই দিচ্ছেন।

তুমিও ওকে একটা ফেভার করছ সব টাকাটা এক সঙ্গে না নিয়ে।

কিসের ফেভার? তুমি-ই তো বললে টাকা উঠে আসবে।

আহা যদি বেশী আসে আসুক না।

বাঃ! আমার রেট্ তো দেড় লাখ। তুমিই তো বলেছে এর চেয়ে বেশী বাড়ানো চলে না বাংলা দেশে।

উঃ! সমীর সেন হতাশ ভঙ্গী করলেন। তুমি কিছু বোঝ না। আজ যে রেট্ থাকবে কালও তাই থাকবে না কী! বাজার বুঝে ব্যবস্থা।

বুঝি না ব'বা

তোমার বোঝার দরকার নেই। আমি-ই ব'লে দেবো মিস্টার মুখার্জিকে।

সোনালী ঝাঁপিয়ে এলো, আর কিছু বলতে যেও না ছিঃ! কি ভাববেন উনি।

সমীর সেন অবাক হয়ে তাকালেন সোনালীর দিকে। হলো কি এর! টাকা-পয়সা, কনট্রাক্ট এসব নিয়ে সোনালী আজ পর্যন্ত কোন কথা বলেনি। সমীর সেনের কথাই মেনে নিয়েছে খুশি মনে। সমীর সেন রাগ ক'রে উঠে দাঁড়ালেন যা খুশি করো, আমার কথা যখন মানবেই না।

শোন শোন, সোনালী স্বামীর জামা টেনে ধরলো, রাগ করছ কেন?

তুমি যখন সব দেখা-শুনো করবে ব'লে ঠিক করেছো তখন আমার দরকার কি তোমার কথায় থেকে?

একবার যখন কথা দিয়ে ফেলেছি---

আমার সঙ্গে আলোচনা না ক'রে পাকা কথা দিলে কেন?

বাঃ রে! তুমি-ই তো কথা দিতে বললে!

সমীর সেনের মনে প'ড়ে গেল, তিনি-ই সোনালীকে অনুমতি দিয়েছিলেন। সত্যি ওর কোন দোষ নেই। ওর ছলছল চোখ, কেঁপে কেঁপে ওঠা ঠোঁটের দিকে চেয়ে হঠাৎ যেন সমীর সেনের বুক মমতায় ভরে গেল। না, সোনালী ঠিক তেমনি-ই আছে।

সমীর সেনের সামান্য অসন্তোষ কল্পনা করলেও যার দু' চোখ জলে ভরে যায়।

আচ্ছা! আচ্ছা! কথা যখন দিয়ে-ই ফেলেছ, সোনালীর পিঠ চাপড়ে সমীর সেন একটু দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেলেন।

সোনালী হাতের রুমালে জল-ভরা চোখ মুছে খোলা জানলার সামনে দাঁড়াল। মন অশান্ত হলে-ই এই জানলাটার কাছে এসে দাঁড়ায় সে। এর মধ্যে দিয়ে সে যেন বুকের কাছে পায় অনেকখানি আকাশ। একটা আম গাছ চোখে পড়ে। আর মালীর বৌ ফুলঝরিয়ার ছোট সংসার।

ফুলঝরিয়া তার ছোট দু' বছরের মেয়েকে ঝিনুক দিয়ে দুধ খাওয়াচ্ছে। মুখ মোছাচ্ছে। স্বামীর দিকে গামছাটা ছুঁড়ে দিল। ছোট মেয়েটা খিল খিল করে হেসে উঠলো। সে স্বামী স্ত্রী-সন্তানের প্রেম-ভালবাসায় ভরা সুখের সংসারের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সোনালীর জল-ভরা চোখ আবার আনন্দে যেন ছেয়ে উঠলো।

আছে আছে। সংসারে সুখ আছে, আনন্দ আছে। আছে প্রেম-ভালবাসা। আজ শুধু কনট্রাক্ট সই আর টাকা উপার্জন করাটা-ই শেষ কথা নয় সোনালীর জীবনে।

সোনালীর স্বাস্থ্যবান ছেলে আছে, স্বামী আছে, আছে আরো একজন। হ্যাঁ অরূপকুমার আজ একান্ত সত্য হয়ে-ই আছে সোনালীর জীবনে।

প্রথম প্রথম অনেক দ্বিধা, অনেক দ্বন্দ্ব ছিল সোনালীর মনে। কেমন ক'রে যেন সেসব বিধি-নিষেধের শিকল ঝরে গেছে। কোন' সংশয়, কোন' অপরাধবোধ আজ আর পীড়িত করে না সোনালীর মনকে।

এখন চোখে যেন ঘোর লেগেছে, সারা পৃথিবী রঙে রঙীন। অরূপকুমারের ভালবাসা, তার প্রণয়-আলাপ সোনালীর মনে হয়, এমন অনুভূতি এর আগে তার জীবনে আর হয়নি তাই কি!

দাঁত দিয়ে ঠোঁট টিপে ফুলঝরিয়ার দিকে তাকিয়ে সোনালী আপন মনে-ই হাসল। প্রতি বারে-ই এমন মনে হয়। মনে হয় নতুন যে আসল, তার মতো এমন আর কাউকে দেখেনি সোনালী। এমনভাবে বুঝি আগে আর কেউ তাকে ভালবাসেনি।

অল্প পুঁজিতে
কাজ কারবার

অল্প টাকায় মেসিনের সাহায্যে নিম্ন-লিখিত নানা রকমের জিনিষের মধ্যে যেটা ইচ্ছে তৈরী ক'রে অর্থোপার্জন করুন

- বিস্কুট
- লজেঞ্জ
- কারি পাউডার
- আটা
- সাবান
- বোতাম
- চক-ষ্টিক
- কাঠের খেলনা
- কৌটা
- বালতী
- টালী
- রবার ষ্ট্যাম্প
- কার্ডবোর্ড বাক্স
- মলম
- ঔষধপত্র
- ন্যাপথলিন বল
- কর্পূর ট্যাবলেট
- চীনামাটির বাসন
- মোমবাতি
- কালির বড়ি

প্রিন্টিং ও বুক বাইণ্ডিং ইত্যাদি।

দু'খানি ব্যবসায়িক বই পড়ুন
লাভের ব্যবসা ২৲ সেলস্‌ম্যান্‌ ১৷৷৹

ওরিয়েণ্টাল মেসিনারী
(১৯১৯) প্রাঃ লিঃ
পি ১২, মিশন রো এক্সটেনসন, কলিকাতা।
(ফোন: ২৩-৪৮৪০)

কিন্তু বার বার ভুল ভেঙেছে সোনালীর। দুদিনের অতিথি দুদিন পরে-ই চলে গেছে। কেউ গেছে কাজের টানে, কেউ নবতর প্রণয় আহ্বানে। আর চরম বিদায় নিয়ে গেছে সেই একজন। সেই প্রথম। বিবাহিত জীবনে আবার প্রেমের আহ্বান তার কাছ থেকে-ই প্রথম পেয়েছিল সোনালী। চিরাচরিত প্রথা সংস্কার ভেঙে সেই প্রথম ডাক দিয়েছিল সোনালীকে। বন্ধনহীন প্রেমের জোয়ারে ভেসে যেতে, নিজেকে হারাতে পারেনি, সোনালী পারেনি।

তার সে আকুল ডাক সোনালীর মন ছুঁয়েছিল। প্রাণে উতর হাওয়ার স্পর্শ দিয়েছিল, একটা আশ্চর্য ভাললাগার সুখে ভ'রে গেছিল সারা মন। তবু সাড়া দিতে পারেনি সোনালী, সেদিন শুধু তার বুক-ভরা ভালবাসা-ই ফেরায়নি, ফিরিয়েছে জীবনের অনেক বড় পাওয়াকে।

আজ অন্তত তাই মনে হয়।

সেদিন সে ভয় পেয়েছিল। মীরা নামে সেই মেয়ের সংস্কারে লেগেছিল, তাই কঠিন হয়েছিল সোনালী। মনে মনে যখন আশ্চর্য সুখের শিহরণ মুখে তখন তাকে-ই কঁটার হুল বিঁধিয়েছে সোনালী। নিতান্ত সস্তা দরের নাটুকে ভাষায় অপমান করেছে।

তখন সোনালী একবারও বুঝতে পারেনি যে, একদিন সমস্ত বুক জুড়ে হাহাকার উঠবে এই জন্যে। এই প্রেম পাবার জন্যে-ই একদিন সোনালী তৃষিত আকুল হয়ে থাকবে। তারপর তো কতো জন এলো গেল। কই তেমন ক'রে তো কেউ সোনালীকে আর ভালবাসলো না। আহ্বান জানালো না। স্বামী আছেন বই-কী! কিন্তু তার সেই ভালবাসা তো নেই। তিনি যদি আগের মতো নিবিড়ভাবে ভালবাসতেন তাহলে সোনালীর কী-বা আর চাইবার থাকতো।

না যশ, না খ্যাতি, না অর্থ। অর্থ অবশ্য চাই। আজকের এই নিরাপত্তা নিশ্চিন্ততা আছে ব'লে-ই তো এসব ভাববার অবসর পাচ্ছে সোনালী, সেই বারো-তেরো বছর আগেকার জীবনের অভাব, অনটন, দুর্ভাবনা, দুশ্চিন্তা—পীড়িত করলে---

মেমসাহেব সান আয়া, কাঞ্চী খবর দিল।

সাব! কোন্ সাব?

মুহূর্তের মধ্যেই সোনালী বুঝতে পারল। কাঞ্চী মাথা নীচু ক'রে হাসি সামলালো। কর্ত্রীর এই ভাণটুকু দেখলে ওর হাসি পায়।

অরূপকুমার সাব।

ও তাই না-কী! সোনালী নিজের দিকে তাকাল। স্নান হয়নি এখন। এলোমেলো চুল। বিস্রস্ত বেশ। তাড়াতাড়ি ড্রেসিং গাউন গায়ের ওপর চাপালো। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দ্রুত চিরুণী চালালো চুলে। এখানে চা দিতে বলল সে।

একটু ভেবে সোনালী বললো, আমাদের সাহেব গেলেন কোথায়?

কাঞ্চী জানাল ছোট গাড়িটা নিয়ে বেরিয়ে গেছেন।

এত সকালে বেরিয়ে গেছেন সমীর সেন। ব্রেক-ফাস্ট খেয়ে যাবার অবসর হলো না পর্যন্ত। ভাল, থাকুন তিনি এলিসকে নিয়ে। সোনালীর আছে অরূপকুমার।

● হঠাৎ মাথাটা ধরে ছিল·····

দশ

সোনা! সোনা! সোনা! সোনালীর ঘাড়ের ওপর ঝুঁকে পড়ে তার নরম চুলের ওপর মুখ গুঁজে ক্ষুধিতস্বরে বারবার ডেকে যাচ্ছিল অরূপকুমার, সোনা, আমার সোনা।

ঘরে মৃদু নীল আলো জ্বলছে, পায়ের ওপর নরম কাশ্মিরী শাল। হাত বাড়িয়ে ওর মাথাটা নিজের আরো কাছে টেনে আনলো সোনালী, অরূপ?

বল?

তুমি এমনি ক'রে চিরদিন ভালবাসবে?

বাঃ! বাসব না?

কিন্তু তোমার তো স্ত্রী আছে?

তোমার তো স্বামী আছে?

তিনিই তো বড়-ই আছেন! কেয়ার-ই করেন না। খোঁজ-ই নেন না, বাঁচলুম না মরলুম। তাঁরও তো এলিস আছে।

কিন্তু সোনা! অরূপকুমার একটু থামলো। বোধহয় একটু ইতস্তত করলো তারপর পরিপূর্ণ দৃষ্টি ফেললো সোনালীর মুখে, যদি তিনি অবহেলা না করতেন তাহলে কি আমায়--- আবেগে গলা বন্ধ হয়ে গেল অরূপকুমারের। কথা শেষ হলো না।

মুহূর্তের জন্যে বিমনা হলো সোনালী। অরূপকুমার নিদারুণ প্রশ্ন করেছে। সত্যিই যদি সমীর সেন আগের মতো ভালবাসতেন সোনালীকে, আদরে-সোহাগে ডুবিয়ে রাখতেন বারো বছর আগেকার মতো। তবে? তখন কি সোনালী এমন ক'রে আকুল হয়ে অপেক্ষা করতো অরূপকুমারের জন্যে, না এমন রোমাঞ্চ এমন শিহরণ লাগতো তার সারা দেহে অরূপকুমারের ছোঁয়ায়?

না হতো না।

সোনালী খুব ভাল ভাবে-ই জানে হতো না। সমীর সেনের প্রেম যদি জাগ্রত হতো, তাহলে সোনালী পৃথিবীর কারুর দিকে-ই চোখ ফিরে থাকতো না, সে সত্য সোনালী জানে।

কিন্তু একথা কি মুখে বলা যায়? আর এখন সোনালী সত্যিই ভালবাসে অরূপকুমারকে, অনুক্ষণ তাকে দেখার জন্যে, তার হাতের একটু ছোঁয়ার জন্যে ছটফট করে। প্রতীক্ষা করে আকুল আগ্রহে।

বলো। বলো তুমি কি সত্যি-ই আমার ভালবাসতে যদি তোমার স্বামী---

সোনালী তার লম্বা সরু আঙুল দিয়ে মুখ চাপা দিল অরূপকুমারের, থাক, ওকথা থাক। কি হলে কি হতো না হতো, তা দিয়ে দরকার কি আমাদের? যা হয়েছে তাই কি যথেষ্ট নয়?

হুঁ। একটা লম্বা নিশ্বাস পড়লো অরূপকুমারের।

যথেষ্ট বেশী যা পেয়েছি, কিন্তু কেন জানি মনে হয় মাঝে মাঝে বুঝি হারের খেলা-ই খেলছি আমি।

পাগলা। সোনালী অরূপকুমারের চুলে আঙুল চালিয়ে এলোমেলো ক'রে দিল চুল, মাধুরীর খবর কি?

ওর তো আবার অপারেশন হবে। থরেকোপ্লাষ্টির সেকেণ্ড সিটিং। আবার তিনটে হাড় কেটে বাদ দেবে।

মন খারাপ হয়ে গেল সোনালীর। পৃথিবীতে অবিমিশ্র সুখ ব'লে কোন' কিছু নেই? অরূপকুমারের বাহুবন্ধনে সোনালী সব ভুলে একটা অপরূপ ভাল লাগার স্রোতে ভেসে যায়, তখন অরূপকুমার বিবাহিত একথাটা মনে প'ড়ে যায় কেন? কেন মনে হয় সে অন্যায় করছে? পাপ করছে? ছট্‌ফট্ ক'রে ওঠে ও।

এগারো

'নীল সমুদ্র' মুক্তি পেল পূজার ঠিক আগে।

প্রথম দিন মানুষে মানুষে ভরে গেল সব কটি হাউস। একটি আসনও কোথাও খালি নেই। চারটে হাউসেই দুলতে লাগলো 'হাউস ফুল' বোর্ড।

কিন্তু সোনালীর নাম কই দর্শকের মুখে মুখে?

হোল না। এই প্রথম সোনালীকে দর্শক তেমন ভাবে গ্রহণ করল না। অথচ সোনালীর মনে হয়েছিল এ-বইতে তার অভিনয় দেখে ধন্য ধন্য করবে সকলে। সোনালীর নাম হলো না, নাম হলো অরূপকুমারের। রিলিজের দিনে সোনালী, অরূপকুমার এবং সমীর সেন একসঙ্গে দেখতে গিয়েছিল।

সমীর সেন গম্ভীর। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে অরূপকুমারকে দর্শক নিয়েছে। সোনালীকে কিন্তু তারা তেমনভাবে অভিনন্দন জানাচ্ছে না। অরূপকুমার বারবার-ই সোনালীর পাশ থেকে উঠে উঠে যাচ্ছিল, যাচ্ছিল, নীচে হাউসের কোণে কোণে, সিড়িতে লবিতে।

এক একবার যায়, আর ফিরে ফিরে আসে সোনালীর কাছে, ফিস্‌ফিস্ ক'রে ব'লে কি শুনে এলো সে, মনে হয় আমাকে নিয়েছে লোকেরা।

তাই না-কি? সোনালী সত্যি-ই খুশি হলো, যাক একটা দর্ভাবনা গেল।

আমাকে তো বৌদিমণির মত দেখায়—

ফেরার সময় অরূপকুমার গাড়িতে না উঠতে-ই সমীর সেন জিজ্ঞেস্ করলেন, কি হলো?

লজ্জিত ভঙ্গীতে হেসে অরূপকুমার বললে আমি একটু থেকে যাই ----

এতো রাত্রে? এখন তো আর কোন' শো, সমীর সেনের মুখের কথা শেষ হতে পেল না। অরূপকুমার ততক্ষণ একদল লোকের পিছু নিয়েছে।

ছোকরার মাথা খারাপ হয়ে গেছে, ষ্টিয়ারিং ঘুরিয়ে সমীর সেন সোনালীর দিকে চাইলেন, চলন এখন ঐ লোকগুলোর পিছু---কি বলে-না-বলে শুনতে।

হবে-ই তো। এই তো ওর প্রথম ছবি, সোনালী সুগন্ধির শিশি বার ক'রে ঘাড়ে-গলায় মাখতে মাখতে বললো। মনে মনে কিন্তু একটা ক্ষোভ, দুরন্ত অভিমান ফেনিয়ে ফেনিয়ে উঠলো। কেন এমন ক'রে চলে গেল সে? সোনালীর চেয়ে বড় হলো লোকের মন্তব্য শোনা? সোনালী কোথায় ভাবছিল এখন বাড়ি গিয়ে বারান্দার ঢাকা আলোর নীচে বসবে ওরা তিনজন। ছোট ছোট গ্লাসগুলোয় টলটল করবে লাল সোনালী পানীয়, আর একটু পরে-ই সমীর সেন যখন উঠে যাবেন রাতের স্নান সারতে তখন সোনালী আর একটু ঘন হয়ে বসবে, ধীরে ধীরে ওর ডান হাতটি নিজের হাতে তুলে নিয়ে নতুন কেনা হীরের আংটিটা পরিয়ে দেবে।

অরূপকুমার নিশ্চয় অবাক হয়ে যাবে দেড় হাজার টাকা দামের হীরের দিকে একবার চাইবে, তারপর সোনালীকে টেনে নেবে বুকের কাছে। দক্ষিণের বারান্দায় অপরূপ কয়েকটি মুহূর্ত নেমে আসবে আবার ভরে উঠবে জীবন।

হোল না। সব পরিকল্পনা ব্যর্থ ক'রে দিয়ে অরূপকুমার চলে গেল। মূঢ় লোকটি ছুটলো সাধারণ দর্শকদের পিছু পিছু।

ছোকরার বাজার ভাল পড়ল মনে হয়।

তাই যেন হয়, সোনালী হাতের আড়াল হাই তুলে গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়াল। তারপর একটা কথাও নয়, নয় কোন আলোচনা। নিঃশব্দে সোনালী নেমে দাঁড়ালো গাড়ি থেকে। সমীর সেন গ্যারেজে গাড়ি রাখতে গেলেন।

আয়া জেগে ব'সে অপেক্ষা করছিল সোনালীর জন্যে। এক মুখ হাসি নিয়ে কাছে এসে দাঁড়াল। হাত থেকে ব্যাগ নিয়ে উৎসুক প্রশ্ন করলো মেমসাহেব আচ্ছা হায় তো রিপোর্ট।

হ্যাঁরে। যেন কোন দূর থেকে উত্তর দিল সোনালী।

কাফী বিস্মিত হলো। রিপোর্ট আচ্ছা তবে মেমসাহেবের মুখে এই বিষণ্ণতা কেন? কেন ব্যাগ দিয়ে দুটো টোকা মারলেন না কাফীর মাথায়? ব্যাগ খুলে তিনটে দশ টাকার নোট দিয়ে বললেন না, যা কাল তোর ছুটি? সিনেমা দেখিস তোর সেই খ্যাঁদা বন্ধুটার সঙ্গে।

প্রতিবার-ই তো তাই করেন মেমসাহেব। কি খুশি খুশি মুখ থাকে তার। গুনগুন ক'রে গান করেন। কখনো কখনো কাঞ্চীর ফোলা ফোলা গাল টিপে দেন।

সোনালী বললো, কাঞ্চী স্নানের ব্যবস্থা কর।

স্নান করবেন? বেরুবার ঠিক আগে এক ঘণ্টা ধ'রে স্নান ক'রে গেছেন। অবাক কাঞ্চী। যদি ঠাণ্ডা লাগে? যা শীত পড়েছে গত কয়েক দিন। কিন্তু সেকথা এখন বলে কে?

সুগন্ধি বাথ সল্টের ফেনায় ডুবে ডুবে অনেকক্ষণ ধ'রে স্নান করলো সোনালী। নরম তোয়ালে দিয়ে গা মুছতে মুছতে হঠাৎ দু ফোঁটা গরম চোখের জল গড়িয়ে এলো গালে।

সোনালীর নিজের-ই অবাক লাগলো। কেন? কিসের দুঃখ তার? এ-ছবিতে তেমন নিল না তাকে দর্শক? সোনালী জানে তাতেও বাজার দর কমবে না তার। এখনও তিন বছরের মতো কন্ট্রাক্ট আছে তার। সই করা হয়ে গেছে। তাছাড়া আছে বম্বের অফার, মোহন মুখার্জির বই।

আর ছবিটা হয়তো লেগেছে। আজকে-ই তো ঠিক বোঝা যায় না। দেখা যাক, কাগজে কি লেখে।

অরূপকুমারের প্রথম বই হিসাবে সাক্সেস্ বলা যায়। ওকে যে নিয়েছে এটা অন্তত ঠিক। কিন্তু এখনো এলো না কেন? নিজের সাফল্যের স্তুতি সোনালীর চেয়ে বড়? হয়তো ফোন করবে একটু পরে, কিংবা নিজে-ই এসে হাজির হবে রাত্তির দেড়টায়, যেমন এসেছিল একদিন প্রকাশ রায়।

ড্রেসিং গাউনটা হাতের কাছে-ই রাখল সোনালী। ক্রীম মাখা মুখের ওপর-ই ব্রাশটা আঁচড়ে নিল সোনালী, ঠোঁটে বুলালো লিপষ্টিক হাল্কা ক'রে।

সে-রাতে কিন্তু এলো না অরূপকুমার। এলো না পরের দিন সকালেও। এলো দুদিন পরে বিকেলে। সোনালী বাগান তদারক ক'রে বেড়াচ্ছিল। গাছে পোকা লেগেছে কী-না, মালী শুকনো পাতা ঠিকমতো পরিষ্কার করছে তো?

ছল ছল চোখে খানিকক্ষণ অরূপকুমারের দিকে চেয়ে থাকলো সোনালী, বেঁচে আছো তাহলে?

সত্যি সোনা। একটুও সময় পাইনি। দিনরাত খালি লোক আসছে বাড়িতে, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব, রিপোর্টার, ফোটোগ্রাফার। তুমি যদি দেখতে—মানে ইয়ে ঠিক যেমন তোমার কাছে আসে।

খট ক'রে কথাটা সোনালীর কানে লাগল অর্থাৎ সোনালীর মতো-ই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে অরূপকুমার। রাতারাতি। এক ছবিতে-ই।

খুব আনন্দের কথা, আশার কথা। সোনালী বললো।

কিন্তু অরূপকুমার কথাটার মধ্যে কোন' আনন্দ খুঁজে পেল না। কেমন যেন নিরুত্তাপ সোনালীর গলা। সোনালী সেটা নিজেও বুঝতে পারল।

চল, চা খাবে, অরূপকুমারকে সোনালী দক্ষিণের খোলা বারান্দায় নিয়ে এলো। কাঞ্চী সেখানেই চা নিয়ে এলো, আর নিয়ে এলো ঘরে তৈরী সন্দেশ, পিঠে, কুচো নিমকি। খেতে খেতে অরূপকুমার অনর্গল কথা ব'লে চললো, কে কি বলেছে, কোন্ কাগজের কি অভিমত, কোন জায়গাটায় ওর অভিনয় অনবদ্য হয়েছে। সোনালী এক মনে শুনছিল অরূপকুমারের কথা।

একটু চুপ ক'রে থেকে অরূপ বললো, ভাবছি, এইবার রেট্‌টা বাড়াব।

এখন-ই, সোনালী বিঘ্নিত হলো।

হ্যাঁ, বাজারে ডিমাণ্ড থাকতে থাকতে-ই টাকা ক'রে নেয়া যাক। আর ভাবছি বেহালার দিকে কাঠা চারেক জমিও কিনে রাখব সেই সঙ্গে।

বেশ তো। সোনালী আর এক পেয়ালা চা এগিয়ে দিল অরূপকুমারের দিকে।

অরূপকুমার উঠে দাঁড়িয়ে বললো, আজ উঠি বুঝলে। রাত ন'টার সময় আবার আসবেন ডিরেক্টার মাধব বোস। আর বলো কেন, বসবার সময় পর্যন্ত পাই না। সময় পেলে-ই আসব।

বারো

'নীল সমুদ্রের' পর 'অশান্ত হৃদয়' তেমন সমাদর পেল না বাংলা-দেশের দর্শকদের কাছে। সোনালী সেনের সে চার্ম নেই, সে জৌলুষ গেছে ইত্যাদি উক্তি শোনা যেতে লাগলো।

সোনালী স্বামীর জামার খুঁটটা চেপে ধরলো ব্যাকুলভাবে, দেখছো, তো, এ ছবিটাও হিট্ করলো না।

ফ্লপও করেনি।

সে-তো অরূপের জন্যে। এ-ছবিতে না-কী লোকে তাকে দেখতে-ই যাচ্ছে।

যাকে দেখতে-ই যাক, ছবি তো চলছে।

দেখো, সোনালী জামার খুঁট ছেড়ে স্বামীর হাত ধরলো, ভাবছি আর ছবি করবো না, কি হবে আর মিছিমিছি বদনাম কিনে? তার চেয়ে সময় থাকতে থাকতে, সুনাম থাকতে থাকতে রিটায়ার করা-ই ভাল, যেমনি কতকদি করেছে।

পাগল। কতকদির বয়স আর তোমার বয়স। তাছাড়া টাকার কি হবে?

কেন ব্যাঙ্কে তো আমাদের লাখ কয়েক জমেছে। তাছাড়া ভবানীপুরের সেই ফ্ল্যাট বাড়িটা আছে না? তার ভাড়া আছে। আর তাছাড়া তোমার বিজনেস থেকেও----

মাথা চুলকে কেমন যেন একটা অপরাধীর ভঙ্গী করলেন সমীর সেন, মীরু! বলা হয়নি তোমায়, ব্যাঙ্কে টাকা আর বিশেষ নেই।

সে কি। কি হলো সে টাকার?

টাকাটা----মানে---মেন্‌লি বিজনেসেই গেছে আর কি।

গেছে! আর্তনাদ ক'রে উঠলো সোনালী।

আহা! ভেব না। বিজনেস থেকে-ই টাকা আবার সব তুলে আনবো। দেখো না-----মানে----কত ব'লে চললেন তারপর সমীর সেন। কি তাঁর প্ল্যান, নতুন রেস্তোঁরা করবেন, তাতে কেমন নিশ্চিত লাভ ইত্যাদি।

কোন' কথা সোনালীর কানে গেল না—নির্নিমেষে স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলো শুধু। এতোগুলো টাকা, এত-দিনের এত পরিশ্রমের ফল সব গেল। মাথাটা কেমন ঝিমঝিম করতে থাকলো সোনালীর। ধীরে ধীরে চোখের সামনে যেন অন্ধকার হয়ে গেল সব। মনে হলো পড়ে যাচ্ছে, তলিয়ে যাচ্ছে কোন্ অতলে।

মেমসাহেব, মেমসাহেব! কাঞ্চীর ব্যাকুল ডাক যেন ভেসে এল সোনালীর কানে। মুখের ওপর আরো একবার এসে পড়লো জলের ঝাপ্টা। কাঞ্চীর ছোট ছোট বাঁকা চোখের কোণ থেকে জল গড়িয়ে পড়লো সোনালীর গালে। সোনালী উঠে বসলো।

দূর কাঁদছিস কেন? কি হয়েছে?

আপ বেহুঁস হো গায় থি মেমসাহেব---ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো কাঞ্চী।

চুপ কর! কাঁদিসনি। তোর সাহেব কোথায় গেলেন?

সাব তো বেহুঁস হনে কি পাহেলে-ই নিকাল গিয়া। দেখাই নেহি আপ গির পড়া কুরসীমে।

গির পড়া কুরসীমে!

তাই তো। এই তো মেঝের কার্পেটের ওপর শুয়ে রয়েছে সোনালী। মাথার তলায় কুশন গোঁজা, আর জলে ভিজে সোনালীর চুল, মুখ। কিন্তু সমীর সেন চলে গেলেন। কোথায়? কতক্ষণ আগে?

মেমসাহেব!

কি রে?

পি লিজিয়ে!

এক পেয়ালা ধূমায়িত হরলিকস্। সোনালীর চোখে জল এলো। না সব যায়নি। আছে এখনো কিছু আছে। খোকা আছে। কাঞ্চীর মতো একান্ত বিশ্বস্ত সেরিকাও আছে অনুক্ষণ পাশে পাশে। হরলিকস্ পান ক'রে সোনালী উঠলো। পাস-বই বার ক'রে একবার দেখতে হবে। সত্যি কতো টাকা উড়ে গেছে রেসের মাঠে আর এলিস লি রয়ের পেছনে। জানে সোনালী, বোঝে, বিজনেস করেন না সমীর সেন। রেস, মদ এবং মেয়েমানুষ এতে-ই সোনালীর সব টাকা উবে গেছে। ব্যবসার অসাফল্য নয়।

আলমারী খুলে সোনালী অবাক। পাশ-বুক নেই, চেক-বুক নেই, সোনালীর গয়না নেই। গেছে সব গেছে। সব। মাথাটা ঝিমঝিম ক'রে এলো সোনালীর। আস্তে পাশের চেয়ারটায় ব'সে পড়লো শুধু। ভাল ক'রে ক্ষতির পরিমাণটা তলিয়ে দেখবার চেষ্টা করলো একবার। টেলিফোন ক'রে জানলেন মাত্র সামান্য কয়েক হাজার টাকা প'ড়ে রয়েছে। ম্যানেজার স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে খবর দিলেন, ভবানীপুরের বাড়ি, যেটা সৌমিত্রের নামে ছিল, সে বাড়িটাও বাঁধা দিয়েছেন সমীর সেন। অত্যন্ত সামান্য টাকায়। ত্রিশ হাজারের জন্যে।

চোখের সামনে বারবার কেমন অন্ধকার হয়ে আসছে সব। বুকের মধ্যে কিসের যন্ত্রণা। শোক? টাকার জন্যে এমন শোকও হয় মানুষের মনে। এমন শূন্য মনে হয় সারা পৃথিবী।

সোনালী বিছানার ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে শুয়ে কাঁদতে লাগলো। এই মুহূর্তে আর কারো মুখ মনে এলো না। মনে হলো, গেল সব গেল, আর কি পারবে এই সম্পদ গ'ড়ে তুলতে? পারবে এই লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করতে? সোনালীর বাজার প'ড়ে এসেছে, আর কে ওকে এতো দাম দেবে। কি ক'রে সোনালী উপার্জন করবে লক্ষ লক্ষ টাকা। আর তাই যদি না পারে, তবে কি লাভ স্টুডিওতে গিয়ে, রঙ মেখে, অভিনয় ক'রে?

কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো সোনালী।

তেরো

অরূপকুমার এসেছিল বিদায় নিতে।

তিনটে ছবির কনট্রাক্ট নিয়ে বম্বে যাচ্ছে ও। ওখানে ওঁরা কাজ পাবে আশা রাখে। আপাতত বম্বে-কোলকাতা আসা-যাওয়া করবে।

দেড় মাস বাদে আসছি তখন দেখা হবে, হাত নেড়ে বিদায় জানিয়ে বলেছিল অরূপকুমার, গিয়ে চিঠি দেব।

সোনালী উত্তর না দিয়ে মাথা হেলিয়েছিল। বিদায়, বিদায় বন্ধু! মনে মনে বলেছিল সোনালী। জানি চিঠি দেবার অবসর হবে না তোমাদের, হবে না দেখা করবার ফুরসৎ। দেড় মাস বাদে দেড় দিনের জন্যে যখন তুমি ফিরবে, তখন দিনে রাত্রে স্যুটিং থাকবে তোমার। তার মধ্যে কোথায় সোনালীকে মনে করার অবসর।

আর বম্বে না গিয়েও সোনালীকে তুমি মনে ক'রে রাখোনি। সেই উত্তপ্ত আবেগ দিয়েও তাকে কাছে টানতে চাওনি। অনেক আগে সরে গেছ। সোনালীকে সরিয়ে দিয়েছ তোমার জীবন থেকে। প্রায় সরবেই-ই বললো সোনালী, তোমার হলো সুরু, আমার হলো সারা।

কি বলছো?

কিছু না।

সেই অত্যন্ত মধুর হাসি হাসলো সোনালী, সেই বাঁকা চোখে তাকালো। বিচলিত হলো অরূপকুমার। সেই বিশ্ব-বিমোহন হাসি সম্পূর্ণ উপেক্ষা ক'রেই উঠে দাঁড়ালো, চলি! আবার গোছগাছ আছে তো! বাই।

● পাশ বই নেই গহনা নেই

বাই!

নতুন কেনা লাল ঝকঝকে ষ্টেশ্বার্ড হেরল্ড চালিয়ে চ'লে গেল অরূপকুমার। দু'চোখে জল এলো সোনালীর। কি হলো? কেন হলো? শুধু অর্থ? শুধু খ্যাতি? অকৃতজ্ঞ লোকটা তার জন্যে-ই সোনালীর জীবনকে শূন্য ক'রে দিয়ে চলে যেতে পারলো!

সোনালীর মনে পড়লো, কপর্দকের মতো অর্থকে, খ্যাতিকে, সে নিজেও একদিকে জীবনের সব মনে ক'রে ছুটেছিল! আজ তার অর্থের ভাঁড়ার শূন্য। খ্যাতি অস্তোন্মুখ। তাই কি সোনালী এমন ক'রে আজ একান্তভাবে চাইছে প্রেম, ভালবাসা, প্রণয়।

লম্বা নিশ্বাস ফেলে সে উঠে দাঁড়ালো।

এই ক' মাসে কি হয়ে গেল জীবনটা। খোকা জার্মানীতে কোথায় কোন ফার্মে চাকরি জোগাড় ক'রে চলে গেল (সোনালীর টাকা কই তাকে বিদেশের পাঠাবার)। সঞ্চিত অর্থ সম্পত্তি সব নিঃশেষ হলো। যে মানুষটি দুঃখের দিনে একটু সমবেদনার কথা বলতো, সুখের হাসি ফোটাতো সোনালীর ঊষর জীবনে, প্রত্যাহের গ্লানিময় থেকে মুক্ত ক'রে ওকে আনতো প্রেমের অমরাবতী স্বর্গলোকে—সেই শেষ আশা, একমাত্র অবলম্বন সেও চলে গেল।

কি রইলো জীবনে আর! কিসের প্রত্যাশা! কোন্ সুখ? আঁচল দিয়ে চোখের জল মুছলো সোনালী। ঘর থেকে বারান্দায় বেরিয়ে এলো, পায়চারী করতে করতে বারবার মনে মনে বললো, ভুলে যাব আমি অরূপকুমারকে। সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে আবার আঁকড়ে ধরব আমার সন্তানকে, আমার স্বামীকে। আবার সংসার ঘিরে-ই দুলবে আমার আশা, আনন্দ, ভালবাসা।

এই ক'দিনে সমীর সেনেরও অনেক পরিবর্তন হয়েছে বলে মনে হয়। উনি আগের চেয়ে অনেক বেশী সময় বাড়ি থাকছেন। এমন কি সোনালীর যখন তিন দিন জ্বর হলো তখন এক মুহূর্ত বাড়ি ছেড়ে বেরোননি। সোনালীর বিছানার ধারে এসে বসেছেন। সোনালীর মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েছেন। সমীর সেনের সান্নিধ্য তখন তেমন ক'রে উপভোগ করতে পারে নি সে। মন ভরে ছিল অরূপকমারের স্মৃতিতে। টাকার শোকে।

যে-অর্থ নষ্ট করেছেন সমীর সেন, সে পরিমাণ অর্থ কোন দিন-ই উপার্জন করতে পারবে না সোনালী। অভ্যস্ত আরাম, বিলাসের অনেকখানি-ই খসে যাবে অন্তে আস্তে জীবন থেকে। আর কে জানে, সেই অল্পবিত্ত মধ্যবিত্ত ঘর-সংসারে-ই হয়তো সোনালী আবার ফিরে পাবে সেই প্রথম জীবনের ভাল লাগার স্বাদ।

বারান্দা থেকে আবার ঘরে ঢুকলো সোনালী। অনেক হয়েছে জীবনের অপব্যয়। স্বামী ঘিরে তাকে কেন্দ্র ক'রে সে সুখী হবে। আর তিনিও যখন এগিয়ে এসেছেন। সে আগমন হোক অনুশোচনায়, হোক লজ্জায়। এসেছেন—এইটা-ই বড় সত্য সোনালীর কাছে। স্বামীকে আর দূরে যেতে দেবে না সোনালী। সরে থাকতে দেবে না। ধ'রে রাখবে। টেনে আনবে নিজের কাছে। তাতে-ই অখণ্ড শান্তি পাবে সোনালী

ওগো! সোনালী প্রায় ছুটতে ছুটতে স্বামীর কাছে এলো।

কি গো—সমীর সেন আস্তে আস্তে সোনালীর গালে টোকা দিলেন।

আজ রাত্রে আমরা কিন্তু সিনেমা যাব, তারপর লং ড্রাইভ।

হ্যাঁ! ঐ ছোট গাড়িতে-ই। তোমার গাড়িতে। বড় গাড়িটা বেচবার জন্যে পাঠিয়েছি। আর শোন! আজ বিকেলে তুমি স্টুডিও থেকে নিতে যেও আমায়, যেমন আগে যেতে। তাড়াতাড়ি ফিরে এসে তৈরী হয়ে নেব। বুঝলে?

আচ্ছা গো আচ্ছা।

খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে স্বামীর গলা জড়িয়ে বুকে মাথা রাখল সোনালী। সার্টের ফাঁক দিয়ে লোমশ বুকের ওপর চুম্বন করলো। ছুটলো রান্নাঘরে।

বাবুর্চিকে বিদায় করেছে ক'দিন আগে। ড্রাইভারকেও। সুরেন-ই রান্না করছে আগের মতো, কাঞ্চীও প্রায়-ই ষ্টুডিও কামাই করে সাহায্য করে।

রান্নাঘরে সোনালীকে দেখে সুরেন অবাক হলো, আমায় ডাকলেন না কেন? কাঞ্চীকে দিয়ে ব'লে পাঠালেন না কেন? কি হয়ে

না না কিছু চাই না আমার। বাবুর জন্যে এবেলার কৈ-তেলটা আমি-ই রাঁধবো। আর শোন, এই টাকা নাও, ভাল দেখে মুরগী নিয়ে আসবে একটা। বিকেলে ফিরে আমি-ই রোষ্ট করবো। তুমি কিছু ক'রো না, শুধু জোগাড় রেখো। আর শোন। সেই কুকিং-এ্যাপেল এনে রেখো, আমি এসে চাটনি করবো, টনি বড় ভালবাসেন, এসব নির্দেশ দিয়ে খুশী মনে ষ্টুডিওয় গেল সোনালী।

ষ্টুডিওর অবসর সময়, কাজের ফাঁকে ফাঁকে বারবার সোনালীর চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগলো নিজের শোবার ঘর, রান্নাঘর এবং সমীর সেনের মুখ।

চৌদ্দ

রিসিভারটা হাতে ধরে স্তব্ধ হয়ে বসেছিল সোনালী।

লাঞ্চের পর সেটে যাবার পূর্ব মুহূর্তে অনিল সোম এসে ডেকেছিল সোনালীকে, ম্যাডাম, আপনার ফোন।

আমার ?

হাঁ।

কোথেকে।

তা জানি না।

চল যাচ্ছি, মুখে একটা লবঙ্গ ফেলে ধীর পায়ে অফিস-রুমে এসে ফোন ধরেছিল সোনালী।

হ্যালো ?

মীরু !

সোনালী চমকে উঠেছিল, তুমি কথা বলছো !

হাঁ শোন। সোনালীর উচ্ছ্বাস গায়ে না-মেখে ব্যস্ত গলায় সমীর সেন বললেন, তুমি বরং আজ ষ্টুডিওর গাড়িতেই ফিরে এসো আমি তোমায় তুলে নিতে যেতে পারছি না।

কেন ?

একটা জরুরী কাজে আমাকে এখন দুর্গাপুর যেতে হচ্ছে।

দুর্গাপুর !

হাঁ ! ফিরতে দিন চারেক লাগবে। মানে নতুন একটা বিজনেসের ব্যাপারে আর কী। রাখছি রাখলুম।

খটাস্ ক'রে টেলিফোন কেটে দেবার শব্দ হলো। কিন্তু তবু যেন বুঝতে পারলো না সোনালী যে রিসিভারটা নামিয়ে রাখতে হবে। সমীর সেন নেই তারের অন্য প্রান্তে। তিনি হয়তো উঠে বসেছেন এতক্ষণ তাঁর একান্ত নিজস্ব গাড়িটায়। পাশে আছে বান্ধবী এলিস লিরয়।

কতক্ষণ এমনভাবে বসেছিল, সোনালী জানে না। চমক ভাঙ্গলো অনিল সোমের ডাকে, ম্যাডাম ! আর কতক্ষণ টেলিফোন করবেন ? সট্ রেডী, সবাই অপেক্ষা করছে আপনাদের জন্যে।

অপেক্ষা করছে ! সোনালীর জন্যে অপেক্ষা করে তাহলে কেউ ! কিন্তু কই অরূপকুমার তো অপেক্ষা করেনি সোনালীর জন্যে। অপেক্ষা করেনি সমীর সেন।

বুকের মধ্যে নতুন ক'রে একটা জ্বালা সুরু হলো সোনালীর। হলো না কিছু-ই হলো না। সকালের আলোয় যে-স্বপ্ন দেখেছিল সোনালী, যে-আশার মালা গেঁথেছিল, দুপুরের এই খরতাপে তা শুকিয়ে গেল। মিলিয়ে গেল মরীচিকার মতো।

অরূপকুমার গেছে। সমীর সেনও কোনো-দিন ফিরে আসবে না সোনালীর কাছে। কি নিয়ে বাঁচবে তাহলে সোনালী, বড় যে-শূন্য, অর্থহীন হয়ে গেল সব।

কি হলো ম্যাডাম ! উঠুন।

হ্যাঁ চল যাই, যন্ত্রচালিতের মতো অনিল সোমের পিছু পিছু ফ্লোরে এসে ঢুকলো সোনালী।

ব্যস্ত পায়ে ছুটে এলেন ডিরেক্টর, মিসেস সেন, ঘুমিয়ে পড়েছিলেন বুঝি ? শীগগির তৈরি হয়ে নিন। আমাদের আলো-টালো সব রেডী। প্রশান্তও তৈরি। মেক-আপ কই। মেক-আপ। হাঁক দিয়ে আবার ক্যামেরার কাছে ফিরে গেলেন পরিচালক।

এ-ছবির নতুন নায়ক কুণ্ঠিত হাসি হেসে কাছে এসে দাঁড়ালো, আপনার সঙ্গে এই আমার প্রথম সীন। বড় ভয় করছে।

ভয় কি ! স্তিমিত ঠাণ্ডা গলায় সোনালী বলো।

সব ঠিক হয়ে যাবে। প্রথম প্রথম শু-রকম ভয় আমারো হোত।

আপনারও ! বিস্মিত গলা প্রশান্তর।

নিশ্চয় ! হতো বই-কী ! ঘাড় ঘুরিয়ে তার দিকে চেয়ে হাসলো সোনালী।

মুগ্ধ প্রশান্ত এক পা এগিয়ে এলে সোনালীর কাছে। মেক-আপম্যান কার্তিক ততক্ষণ টিনের বাক্স খুলে বার করেছে পাউডার পাফ আর লিপষ্টিক।

কার্তিকের হাতে নিজের মুখ সঁপে দিয়ে চারিদিকে একবার দেখলো সোনালী কিছু তো বদল হয়নি পরিচিত পৃথিবীর।

সেই সেটের ঘর-বাড়ি, সেই রঙ-করা মানুষের মুখ, আর মাথার ওপর পাটার্তনে ব'সে ইলেকট্রিসিয়ানের দল।

অল লাইট, গম্ভীর গলা পরিচালকের।

দপ্ দপ্ ক'রে সূর্যের মতো আলোগুলো জ্বলে উঠলো, যেন সহস্র ধারা ছড়িয়ে পড়লো সোনালীর মুখে, মাথায়, বুকে, হাতে। আলোর বন্যায় যেন ভেসে গেল সারা ঘর। আর মুহূর্তে-ই আলোকিত হয়ে উঠলো সোনালীর মন।

এতো আলো, এতো আনন্দ, এখনো আছে পৃথিবীতে সোনালীর জন্যে। এতো ভাল লাগা ! সোনালী চোখের কোণ দিয়ে একেবার দেখলো নিজের মুখ, একবার প্রশান্তকে। দৃঢ় পায়ে এগিয়ে গেল সেটের মধ্যে।

না, ফুরিয়ে যায়নি। ব্যর্থ হয়নি সোনালীর জীবন। আছে, এখনো অনেক ঐশ্বর্য আছে সোনালীর। দু-হাত দিয়ে ছড়িয়েও যা ফুরাবে না।

অর্থ নয়। খ্যাতি নয়। এই অভিনয়। এই রঙ মেখে আলোর সমুদ্রে দাঁড়িয়ে বানানো কথা প্রাণের সঙ্গে বলা, জীবন্ত ক'রে তোলা প্রতিটি চরিত্র।

কোথায় অন্ধকার। কোথায় শূন্যতা। এ যে আলোর সমুদ্র। আলোকিত সমনুয়। আলোর জীবন। দাও দাও, আরো দাও। আলোকের অর্ঘ্যধারায় ধুইয়ে দাও।

সোনালী সেটের বাড়ির দরজার ওপর পা রাখলো।

পরিচালক চেঁচিয়ে উঠলেন কোয়ায়েট অন্ দ্য সেট্। হাট ক্যামেরা সাউণ্ড----

সোনালী সেন। ভালবেসে বিয়ে করেছিল একজন স্কুলের শিক্ষককে। মানে নি কোন বাধা, কোন নিষেধ। দারিদ্র্যের মধ্যেও—সুখী হয়েছিল তার স্বামী এবং পুত্রকে নিয়ে। তারপর দুর্ভাগ্যের ঝড়ে দিগ্‌ভ্রান্ত নাবিকের মতো অকূল সমুদ্রে কতোদিন ভাসতে হলো তাকে। হাতের মুঠি অবশ হলেও হাল সে ছাড়েনি। তারপর সোনালীর নবজন্ম। বতিচেল্লির ভেনাস যেমন সমুদ্র থেকে উঠে এসেছিল তেমনি রূপালী-পর্দায় ফুটে উঠলো সোনালী। নাম এবং অর্থ কোনটার-ই অকুলান হলো না তার। আবার ঝড় উঠলো। এবার ঝড় বাইরে যতোটা নয় ভেতরে তার চেয়ে বেশি। ক্ষুব্ধ, ক্ষুণ্ণ, ক্ষত-বিক্ষত সোনালী। অর্থের প্রাচুর্য বিলাসিতার প্রাবল্যের মধ্যেও তার অক্লান্ত জীবন-জিজ্ঞাসা। অর্থ নয়, সম্মান নয়, প্রেমের ব্যর্থতাও সব নয় শিল্প-সাধনা-ই কি শিল্পীর জীবনে একমাত্র মুক্তি ?

॥ শেষ

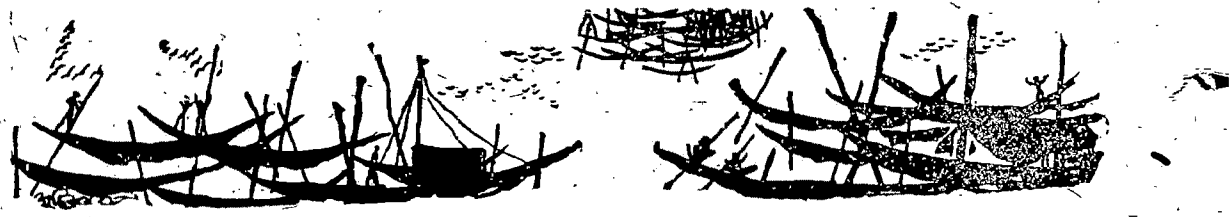

মুখোস

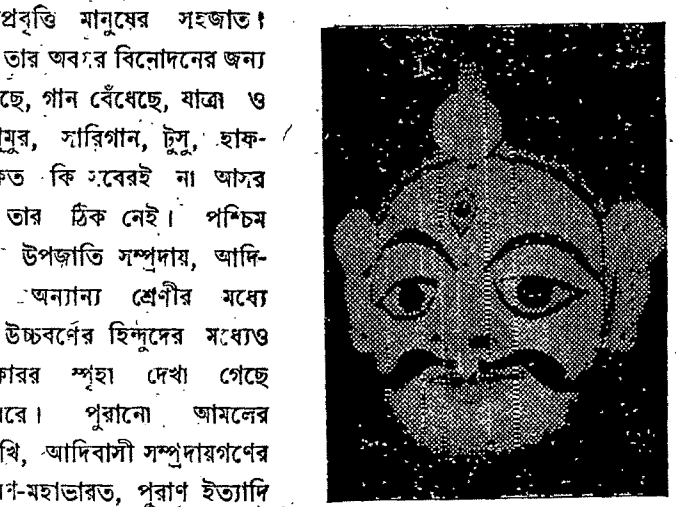

● শিবের গাজনের মুখোস

আশীষ বসু

অভিনয়প্রবৃত্তি মানুষের সহজাত। মানুষ তার অবসর বিনোদনের জন্য ছবি এঁকেছে, গান বেঁধেছে, যাত্রা ও কথকতা, ঝুমুর, সারিগান, টুসু, হাফ-আখড়াই কত কি যে বের করেছে, তার ঠিক নেই। পশ্চিম বাঙলাতেও উপজাতি সম্প্রদায়, আদিবাসী এবং অন্যান্য শ্রেণীর মধ্যে এমন কি উচ্চবর্ণের হিন্দুদের মধ্যেও অভিনয় করার স্পৃহা দেখা গেছে দীর্ঘদিন ধরে। পুরানো আমলের হিসাবে দেখি, আদিবাসী সম্প্রদায়গণের মধ্যে রামায়ণ-মহাভারত, পুরাণ ইত্যাদি নিয়ে নানা শ্রেণীর অভিনয় হচ্ছে। সেই অভিনয়ের জন্য পট আঁকা হয়েছে, পেছনে ঝোলানো হয়েছে পট, দৃশ্যাবলী আঁকা হয়েছে এই কাহিনীগুলিকে কেন্দ্র করে। সেই-গুলি গুটিয়ে ও পরে তা পেছনে বেঁধে অভিনয়ের আসর বসেছে। উপজাতি সম্প্রদায়ের নাচের জন্য নানা পোষাকের মধ্যে মুখোসের আধিপত্য দেখা গেছে অনেক আগে থেকেই।

পশ্চিম বাঙলার উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে রয়েছে কোল, সাঁওতাল, মেচ, লেপচা, ভুটিয়া ইত্যাদি সাতটি সম্প্রদায়। আদিবাসীদের মধ্যে আছে লোহার, কোরা, ডোম, খাসি খটিক, বেলদার, বেদিয়া বাউড়ী, প্রভৃতি সম্প্রদায়। এদের প্রায় প্রত্যেকেরই নিজস্ব বা সম্প্রদায়গত নাচ বা অনুরূপ অনুষ্ঠান আছে যার মধ্যে মুখোস ব্যবহারের প্রচলন রয়েছে। মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূম, পুরুলিয়া এবং দার্জিলিঙ জেলায় এবং উত্তরবঙ্গের আরও কয়েকটি স্থানে এই উপজাতি সম্প্রদায়ের বাস বেশী দেখা যায়।

উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে এই জাতীয় অনুষ্ঠানের সব চেয়ে বড় মরশুম ফাগুন-চৈত্র-বৈশাখ মাসে অর্থাৎ বসন্তকালে। বোঙ্গা বা সূর্য বা অন্যান্য দেবদেবীর পূজার সময়েও এ জাতীয় অনুষ্ঠান হয়। বিবাহাদি উৎসবেও এই প্রকার নাচ ও গান অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। উপজাতি ও আদিবাসীদের জীবন সহজ, সরল তাই এই সব অনুষ্ঠানগুলি তাদের মধ্যে আনন্দের শিহরণ জাগায়।

পশ্চিম বাঙলায় চিত্রকর শ্রেণীর মধ্যে মুখোস তৈরীর কাজ করতে দেখা যায়। পুরুলিয়া জেলার চোরদে-বাগমুণ্ডী অঞ্চলে ও মেদিনীপুরের নানা জায়গায় মুখোস তৈরীর প্রচুর কাজ এক সময় হতো। চোরদে-বাগমুণ্ডীতে এখনও অনেক মুখোস-শিল্পী আছেন সাঁদের হাতের কাজ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এঁদের মধ্যে কয়েক জনের নাম দিচ্ছি। সর্বশ্রী অনিল সূত্রধর, টুলুলাল সূত্রধর, চৈতন্যলাল সূত্রধর, দুর্গাচরণ দত্ত, ঘনশ্যাম পাত্র, কালীপদ, সুহৃদ, নকুল দত্ত, নেপাল শীল, রামচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি। এঁদের মধ্যে অনেকে ছড়িয়ে গেছেন বিহারে এবং উড়িষ্যায়। এঁদের একটি দলের সঙ্গে একবার আমার রাঁচীতে দেখা হয়েছিল; সেখানকার প্রতিমা তৈরীর কাজের অর্ডার নিয়ে তাঁরা কাজ করতে এসেছিলেন।

সূত্রধর বলতে আমরা সাধারণত কাঠের কারিগরই বুঝি, কিন্তু আসলে হাতীর দাঁতের কারিগর 'ভাস্কর' সম্প্রদায়, পটুয়া, চিত্রকর, শিঙের কাজের কারিগর, পাথরের কাজের কারিগর ইত্যাদি অনেকেই সূত্রধর সম্প্রদায়ভুক্ত। এমন কি বিষ্ণুপুরের নক্সীতাসের কারিগর 'ফৌজদার'রাও নাকি সূত্রধর।

বিহারের ছোটনাগপুর অঞ্চলেই মুখোস তৈরীর শিল্পটি সমধিক প্রসিদ্ধ। রাঁচীর কাছে বুন্দি, খুটিতে প্রচুর মুখোস তৈরী হয়। তবে সব সময়েই এ মুখোস পাওয়া যায় না। মুখোস তৈরী হয় বিশেষ বিশেষ উৎসব উপলক্ষ্যে। এবং একমাত্র তখনই তা পাওয়া যায়। কাজের তারতম্যে তার দাম আট-দশ আনা থেকে চার-পাঁচ টাকা অবধি হতে পারে। মানভূম, সিংভূম ও সাঁওতাল পরগণার দুমকা প্রভৃতি অঞ্চলে অনেক তৈরী হয়। সিংভূমের গামারিয়া

● ৺কালীর মুখোস

● পশ্চিম বাঙলার প্রাচীন মুখোস—পুরুলিয়া অঞ্চলের

● উপজাতি সম্প্রদায়ের কাঠের মুখ

মুখোস তৈরীর একটি বিশেষ শিল্প-কেন্দ্র। ছৌ-নাচ বিহারের একটি অতি বিখ্যাত নৃত্য। এতে রাম, রাবণ, দশরথ, সীতা, হনুমান ইত্যাদির অভিনয়ে বিশেষভাবে তৈরী মুখোস ব্যবহৃত হয়। যুদ্ধ, শিকারের দৃশ্যাবলী, বিবাহোৎসবের কাজেও মুখোসের ব্যবহার হয়ে থাকে।

নাগাভূমি, নেফা প্রভৃতি অঞ্চলের মুখোসের শিল্পকাজও অতি উল্লেখ-যোগ্য। শুনেছি নাগাদের তৈরী কাঠের মুখোস এক অতি বিস্ময়কর শিল্পকাজ। নাগাদের এই মুখোস তৈরীর ইতিহাস আছে। নাগাদের মধ্যে Head hunting বা মাথা কাটার প্রচলন একদা ছিল। এই মুণ্ডগুলিকে নাগাগ্রামের 'মোরাঙ' বা সাধারণের জন্য ঘরের মধ্যে সাজিয়ে রাখা হতো এবং এই কর্তিত মুণ্ডগুলির ছাঁচ তোলা হতো কাঠে। কাঠের মুণ্ডগুলি হতো অবিকল আসলগুলির মতো। পরে আসলগুলি সরিয়ে নকলগুলিকে জায়গা দেওয়া হত।

মুখোস সাধারণত কাগজের মণ্ড দিয়ে তৈরী হয়। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশেও মুখোস-শিল্প রয়েছে। কাশ্মীর, হিমাচল প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি জায়গার মুখোসও খুব উল্লেখযোগ্য।

ভগবানের বর

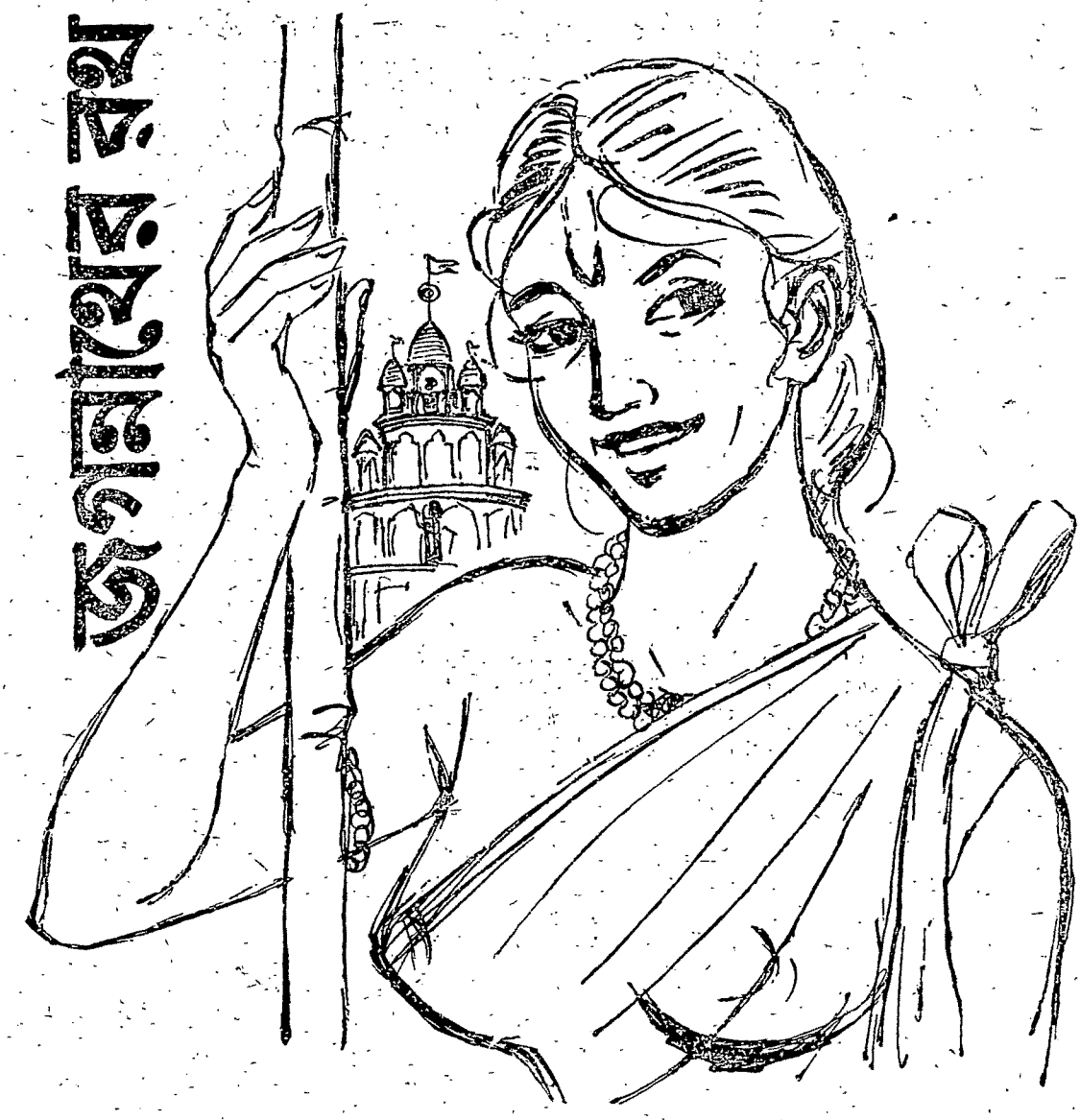

ভিক্ষের কাঁথাটি চিরদিন পুণ্যদাসী নিজেই সেলাই করে। নিজের কাঁথাটি, মাগনদাসের থলি। কিন্তু কয়েকদিন জ্বরের পর দেওয়ালে পিঠ দিয়ে সে সুঁচে সুতো পরাতে গিয়ে দেখল চোখের সামনে সুঁচের ছিদ্র, সুতো, কাঁথার মুড়ি সব লেপে পুঁছে একাকার। কিছুই দেখা যায় না। মনে পড়ল মাঝখানে মাগনদাস একবার তার ওপর রেগে বাউল হতে গিয়েছিল।

বলেছিল—'ও বেবসায় পয়সা আছে।'

পুণ্যদাসী, যেমন অবস্থায় পড়ুক না কেন, তাদের কামডহরির ভিটে আর হালতুর বাস্তুর কথা কখনো ভোলে না। ছেড়ে আসবার সময়ে গড় করে বলেছিল 'মা ঝেখানে যাই, তোমায় ভুলব না, মনে অইবে। আমার পিত্তি পুরুষেরে রন্ন দে'ছ, পতিপালন করেছ, সিটি ভোলবার লয় গো।'

—তাই, মাগনদাসের মুখে বাউল হওয়াকে 'বেবসা' বলায় সে চটে গিয়েছিল।

বলেছিল 'আমার ওপর যেন্না হয়েছে, তোমার যেখানে খুশী যাবে। তা ব'লে বাউল সন্নেসীর বেবসা করব উ কি কথা?'

'বেবসা ছাড়া কি? পয়সা ওজগার হলেই সেটি বেবসা হ'ল, লয়?'

মহাশ্বেতা দেবী

'আ রে মহাপাপী! আমরা বোষ্টমকে ভিক্ষে দিতাম তা সে-ও বেবসা করত বল?'

'সিটি আর ইটি এক লয়। তো' মাগীরা সব ঘুইলে-ফেলিস। এখন সব বেবসা রে। মাটে মাটে বাউলরা বাবুদের সামনে গান গায়, নেত্য করে, পয়সা নেয়, দেখিসনি?'

যা-হোক, কামডহরি ছাড়বার পনেরো ষোল বছরের মধ্যে অন্তত সাত-আটবার মা দাস এমন ঘর ছেড়ে গিয়েছে আর এসেছে।

সেবার বাউলের সঙ্গ ধরতে গিয়ে-ও থাকা হয়নি। তবে বেশ কয়েকটি কথা শিখে এসেছিল।

'ভগবানের অঙ্ নেই, জানলি বউ? গুরু ধত্তে ধত্তে ভগবান পাওয়া যায়। আর সব কিছুতে ভগবান অঙ্ দে'ছে কিনা? ফুলে, ফলে, সংসারের সর্বত্ত, তাই নিজের তরে উনি আর অঙ রাখেনি সব ফুইরে ফেলে নিজে উনি একাকার।'

কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই বউবাজারের সোনাপটিতে কয়লা বাছার কাজটি পেয়ে সে শেখা কথাটথা ভুলে গেল। তখন কিছুদিন সে নতুন ব্যবসার কথই বলত। কয়লা বাছতে বাছতে সোনার গুঁড়ো পাওয়া যায়। খানিকটা

পেয়ে গেলেই, 'বুঝলি বউ, হালতুর জমি আমি নিয়্যস, খালাস ক'রে আনব।'

বেশ জোরে জোরেই বলত।

তখনো ওদের বউ বউয়ের মতই থাকত। হাসপাতালের দাই হয়নি, থান পালটে-পেড়ে কাপড় ধরেনি। নাতনীও ছোট ছিল। তাই, মাগনদাসের কথাতে, বাড়ীর কর্তার যোগ্য জোর ছিল। তখনো ওরা সবাই বিশ্বাস করত হালতুর জমি থেকে মাগনদাসের জ্ঞাতি বোন-ভগ্নীপতিকে তোলা যাবে। একদিন তারা ফিরে যাবেই সেখানে। তাদের ছেলে মরে যাবার সময়ে দিব্যি দিয়ে গিয়েছিল।

তাই, মাগনদাস একটির পর একটি বৃত্তি ধরত, যখন যে কাজে থাকত, তারই কথা বলত। বাউল হতে গিয়ে ভগবানের কথা বলত। আবার কয়লা বাছার সময়ে সোনার গুঁড়োর কথা। সোনাপট্টির স্যাকরারা ঝাঁপ বন্ধ করবার আগেই অবশ্য মাগনদাস অবার ঘরামি কাজে লেগে যায়। তাই সে কথাটিও সে বেশীদিন বলেনি।

শুধু, পুণ্যদাসীর মাঝে মাঝে, দিনের এক এক সময়ে, কথাগুলো মনে পড়ে। যেমন মনে পড়ে আগেকার নানারকম শব্দ। কাঁসা-পেতলের বাসনের ঠুন ঠান, তার হাতের রুপোর চুড়ির কিনকিন্ শব্দ, ধান সেদ্ধ করে উঠোনে চালবার পর ধানের হাঁড়ি মাজবার-শব্দ। তেমনিই মনে পড়ে মাগনদাসের মুখের এক-একটা কথা।

'ভগবানের অঙ নেই জানলি, লেপে পুঁছে একাকার।'

এখন, জ্বর ছাড়বার পর, রথের ক'দিন থাকতে পুণ্যদাসী দেখল তার কাঁথাটি মাগন-দাসের ভিক্ষের ঝুলি, সেলাই করবে এমন অবস্থা আর নেই। সব লেপে-পুছে একাকার। 'চোখের জোরে ক'রে খেতাম, দিষ্টিটা কেড়ে নিলে ঠাকুর?'

বলতে গিয়েও পুণ্যদাসী সভয়ে মুখ সামলে নিল। নখে হাত চাপা দিল। রথে, উল্টো-রথে, বিপত্তারিণী ব্রতস্নানে, এখনো সে ভাল উপার্জন করে। করে বলেই বউ তাকে সহ্য করে। রথের সময় যত কাছে আসে, পুণ্যদাসীদের সংসারে বেশ একটা প্রত্যাশার জোয়ার আসে। জ্বর আসলে যেমন, উৎসাহেও তেমন, শরীর যেন তপ্ত হয়। এ সময়, দোকানীরা সবাই প্রত্যহ একটি করে ছোট পয়সা দেয়। এ রোজগারটি বাঁধা। তারওপর কপাল ভরসা।

'ঠাম্মা মুখ চাপা দিলি কেন?'

নাতনী তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল।

'এমনি।'

পুণ্যদাসী মনে মনে বলল 'চক্ষু অত্তুটি খোয়া গেছে জানলে তোমরা মা-মেয়েতে আমায় খোয়ার করবে। বলে কি মরব? দুটোর চোখ গেছে, তা তাকে আমি নে বইসে দিই, উইটে আমি। আমায় কে দেখবে?'

'কাঁথা সিঁয়োবি না?'

'এখন থাক।'

পুণ্যদাসীর গলা শুকলো। একসময়ে অঙ্গে অঙ্গে স্বাস্থ্য ছিল। কামডহরীর সবাই বলত 'উলোদের বউটা মৈষের মত খাটে গো!' গতরের জন্যেই সবাই আদর করত।

তারপর সেই অঙ্গে অঙ্গেই রোগ হল। নাতনী ছড়াকেটে বলত 'কি? গোবর ফুটিয়ে দেব? পায়ে লাগাবি? কেন, বাত হয়েছে বুঝি? মা গো এক অঙ্গে এত ওগ, তোরমত আর দেখিনি।'

'ওগটি লক্ষ্মী, পুণ্যদাসী গম্ভীর হয়ে বলত 'মানুষ কি বুক দেখে পয়সা দেয় বাছা? পায়ে বাত, হাতে ঘা, কোমরটি পড়ে গেছে, সব দেখে তবে পয়সা দেয়।

'অঙ্গে অঙ্গে ওগের বান ডেকেছে', নাতনী পিচ ফেলে বলত, হাত আশীতে দেখে দেখে খোঁপা থাবড়াত।

কিন্তু এখন চোখের সামনে সুঁচে, সুতোয়, কাঁথায়, ঝোলায় একাকার দেখে পুণ্যদাসীর বুকের নীচে ধপধপিয়ে ঢেঁকির পাড় পড়তে লাগল, বিশ্বভুবন অন্ধকার হল, কাঁপতে কাঁপতে সে ঘরের কোণে এসে বসল। 'তবে কি অথের চাকায় মরতে হবে?' ভাবতেই তার মনে চিত্র ভেসে ওঠে, এখনও উঠল। চোখে দেখেনি শুধু কানে শুনেছে, আকাশে মাথা ভূ-তলে চাকা, ভয়ঙ্কর একলক্ষ্যে ছুটে আসছে জগন্নাথের রথ, লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে 'জয় জগন্নাথ, জয় জগৎনাথো, জয় জগন্নাথ, জয় জগতোনাথো, জয় জগন্নাথ, জয় জগন্নাথো', ধ্বনি। মানুষের ঠেলাঠেলিতে নিশ্বাসের বাতাস বন্ধ, কিন্তু জগন্নাথের রথ তবু এগিয়ে আসে আর আসে সহসা, মানভূমে, বিহারে গোয়ালাদের 'কাউয়াডোর' পরবে ক্ষিপ্ত গাই-এর বাঁকা শিঙের সামনে চার পা বাঁধা শুয়োরকে যেমন তেমনি করেই কারা যেন অন্ধ, খঞ্জ, কুষ্ঠীকে রথের চাকার সামনে গড়িয়ে দিতে থাকল।

জগন্নাথের রথের সামনে কারো নিস্তার নেই, 'এভাবে মরলে মানুষ গতি পায় গো। রথযাত্রার পুণ্য পেয়ে দিব্যদেহে স্বর্গে যায়।' তাদের মনিববাড়ীর কুল-গুরুর গমগমে কণ্ঠ এখন পুণ্যদাসীর কানের কাছে যেন বেজে উঠল। ভোলে না সে, সে কথা মোটে ভোলে না। এখন পুণ্যদাসী মাথা এদিক থেকে ওদিকে দু-একবার নাড়ল। ভোলে না বলে সে বড় অসহায়, 'দো'ই ঠাকুর, দো'ই ঠাকুর।' সে অস্ফুটে বলল। তারপর মুখ তুলে আকাশ দেখতে চেষ্টা করল। জানলায় মুখ চেপে ধরে বাইরের দিকে তাকাতেই সে ভয়ে স্তম্ভিত হল, অস্ফুট আর্তনাদ করে ঘেমে উঠল।

তার চোখের সামনে মাত্র দু'গজ দূরে টিনের নিশান, বড় বড় ধ্বজার নীচে দশ-অবতার, সারি সারি দেব দেবী মুনিঋষির মূর্তি। তারই ফাঁকে দারুভূত জগন্নাথের ভয়ঙ্কর চেহারা, জগন্নাথের রথ।

প্রতি বছর তাদের বস্তির পেছনে, কাঠ-গোলার উঠানে পালচৌধুরীদের রথ সাজান হয়, রঙ পালিশ হয়, এ কথাটা কেন তার মনে ছিল না কে জানে। এখন মনে পড়ল, তবু বুকের ধুকধুকুনি থামতে চায় কি? 'এই সময়ে অথটি দেখলাম, এর মধ্যে নিশ্চয় দৈব আছে,' সে দু-একবার মনে মনে বলল। দৈব নেই, অলৌকিক নেই, একথা পুণ্যদাসীর মত আর কে জানে? অন্ধকেও চোখ পেতে দেখে না। মৃতকেও জীবন পেতে দেখে না। তবু, দৈবে, অলৌকিকে তার ভয়ানক প্রয়োজন। নইলে তার দেহ যেমন, মনও তেমনিই উদ্বাস্তু হয়ে থাকে। পিতৃপুরুষের ভিটে ছেড়ে এসে তবু দেহটা বেঁচেছে, কিন্তু দেব-দৈব অলৌকিক না থাকলে মনটা বাঁচত কি? এখন ছোট ছোট বিষয়ের মধ্যে পুণ্যদাসী অলৌকিকত্বের প্রকাশ দেখে। দেখে ভয় পায়। কিন্তু এ ভয়েও সুখ আছে। এখন, রথ যেখানে প্রতি বছর থাকে, সেখানেই রথটিকে দেখে, চোখ হারাবার ভয়ে জড়ভরত পুণ্যদাসীর মনে হল এ দৈব। দেবতাই তাকে জানাচ্ছে 'পুণ্য, তুই রথের নীচে মরবি।'

'বলি অথ কখনো দেখনি? আশ্চর্য মানুষ যা হ'ক। কখন থেকে চেঁচাচ্ছি দোর দিয়ে যাও। এই জন্য আমি কাজে লাগতে চাইনি। না, টাইমে যখন যেতে পারব না তখন যেয়ে লাভ নেই। তারা পয়সা দিয়ে লোক রেখেছে, বে-টাইমে গেলে শুনবে কেন?'

তাড়াতাড়ি এসে পুণ্যদাসী দোর ধ'রে দাঁড়াল। নরম গলায় বললে 'যা না বাবু। দোর দিচ্ছি! তুই যা।'

নাতনী খর খর ক'রে চলে গেল। হাস-পাতালে দাই-এর কাজ মানে রুগীর সেবা। পুণ্যদাসী ত তাই জানে। সেখানে যাবার জন্যে অত বড় খোঁপা, প্যাষ্টিকের ব্যাগ কেন কাজে লাগে কে বলবে। বউকে দু'একবার বলে দেখেছে 'বয়সের মেয়ে। নাতজামাই আজ না নেয়, কাজ হলেই নে' যাবে। কাজ কত্তে দিচ্ছ দাও, কিন্তু অমন ফেলান ভাল নয়।'

'তোমাদের দিনকাল আর নেই বাবু। একখানা কাপড় পরে অমনি ছুটলে। ভদ্দর-লোকদের কাজ, তা প'ক্কের হয়ে না গেলে তারা হাতের সেবা নেবে কেন?' বউ বিরস বদনে জবাব দিয়েছে, 'নইলে আমিই বা পেড়ে কাপড়-অঙীন ছাইমাটি পরে মরি কেন?'

পুণ্যদাসী আর কিছু বলেনি। বেশী কিছু বলে লাভ কি, কে শুনছে! অথচ, বউকে কাজটি সে-ই জোগাড় ক'রে দিয়েছিল। তার ওড়িয়া বাড়ীওয়ালী হাসপাতালে দাই-এর কাজ ক'রে ক'রে এই কোঠাগুলো তোলে। পুণ্যদাসীকে সে বড্ড ভালবেসে ফেলেছিল।

'তুই আমার বোন।' সে বার বার বলত।

ফেমিলা স্নো

সহজ সৌন্দর্য আর স্বাভাবিক
লাবণ্য ফুটিয়ে তোলার কাজে
তার জুড়ি নেই।

বোরোলীন হাউস, কলিকাতা-৩

তাকেই হাতে-পায়ে ধরে পুণ্যদাসী। 'মেয়েছেলে রুগীকে দেখবে, সেবা করবে, এ-কাজে কোন দোষ নেই মা, তুমি এ-কাজটি বউকে করে দাও।'

অবশ্য স্বেচ্ছায় বলেনি। বউটা তার মাথা খাচ্ছিল। দিন-রাত বলত, 'উনি আজ এ-বেবসা, কাল ও-বেবসা করবে, তুমি আমি ঝি খাটবো, এই করলেই আর রান্ন জুটেছে। তুমি আমায় দাই কাজটি করে দাও দিখিনি।'

'ওগীর সেবা। পুণ্য কাজ।' মাগনদাস ভারী গলায় বলেছিল। যদিও রোগীর সেবা করবার জন্যে বউ-এর তিলেক মাথাব্যথাও ছিল না। সে মজেছিল নানা রকম সঙ্গে। বাড়ীওয়ালীর ঘরে টেবিল-ঘড়ির টিকটিক শব্দ, স্টোভের গোঁ গোঁ ফোঁসফোঁসানি, লোকাল রেডিওর সময় জানাবার বাজনা। তার মনে হয়েছিল কাজটি পেলেই ক্রমশ্তরে তারও সব হবে।

'রোগী সন্তানের মত।' বাড়ীওয়ালী তাকে শিখিয়ে দেয়, 'রোগীর ময়লা ঘাঁটতে, বমি ঘাঁটতে ঘেন্না করবি না। ঘেন্না করেছিস জানতে পারলেই ওরা তোকে ছাড়িয়ে দেবে।' তারপর, এ কাজ থেকেই বউ মেয়েটাকে মানুষ করল, বিয়ে দিল, আবার জামাই কারখানার কাজ আর কোয়ার্টার পাবার সময়টুকুতে মেয়েকেও কাজে ঢুকিয়ে দিল। এখন ওদের ঘরেও ঘড়ি বাজে, স্টোভ জ্বলে। মা-মেয়ে যখন যার রাত-ডিউটি থাকে; রুটি তরকারী নিয়ে যায়। দিন-ডিউটি থাকলে ভাত নিয়ে যায়। রান্নার ছ্যাঁক ছোঁক, ঘড়ির টিক্‌টিক্, ওদের ঘরেও এখন নানা রকম শব্দের আমদানী হয়েছে।

পুণ্যদাসী নাতনীকে বিদায় দিয়ে, বউ-এর জন্যে অপেক্ষা করতে করতে ভাবল চোখটির কথা বললে বউ দয়া করে দেখিয়ে আসবে না কি হাঁসপাতাল থেকে। না খোয়ার করবে। যদি আশ্রয় ছাড়া করে? সেটি ভাবলেই তার ভয় হয়।

তবু ত বউ নাতনী তাদের ভাত দেয় না। 'এই ওজগারে চারজন খেতে গেলে আর অন্য কিছু হয় না।' পৃথক ক'রে দেবার গৌরচন্দ্রিকা গেয়েছিল বউ

'অন্য কিছু হয় না!'

কথাটা আরেকবার বলে পুণ্যদাসী হাঁ হয়ে গিয়েছিল।

'দুটো পয়সা না জমালে চাকুরে-জামাই আনব কি করে?

'চাকুরে-জামাই আনবি।'

পুণ্যদাসী আবার বোকার মত আউড়েছিল।

'নিশ্চয় আনব।' মুরগীর মত বুক ফুলিয়ে, আঁচল ঝাপটে, গলা তুলে বউ বলেছিল। সক্ষম রোজগেরে মানুষ যেমন নিজের জোর জানে ব'লে বর্বর ভাবে দর্বলকে আঘাত করে, তেমনি নিষ্ঠুরভাবেই সে আবার বলেছিল 'হ্যাঁ, চাকুরে-জামাই। হেলো চাষার হাতে পড়ে আমার যে হাল হয়েছে তা কি ওরও হক, তাই তুমি চাও?'

'বউ।' পুণ্যদাসী কাতর হয়ে বলেছিল 'যে-করে আমাদের জমি গেল, বাস্তু গেল, তা ত জানিস্। গরমেণ্ট নিলে, নালিশ খাটলে না। টাকা দিলে যৎসামান্য, কিছুই তোর অজানা নয়। সে-ভাগ্য ত আমাদের একার নয়, সকলেরই হয়েছিল।'

কিন্তু তখনই তার মনে পড়েছিল বউ এ-কথা শুনবে বলে কথাটা তোলেনি। হাঁড়ি আলাদা করে দেবার কথা থেকে এক কথা ওঠে।

'তা দেখ, সেইজন্যে বলি, আমার এখন টাকার দরকার। দু'জনের ওজগারে চারজন মনিষ্যি খেতে গেলে আর হাতে কিছু থাকে না। চালটা অন্তত যদি যার যার তার তার হ'ত---'

বউ হিসেব ক'রে দেখেছিল চক্ষুলের খরচটাই মোটা। বিশেষ করে তার শ্বশুর-শ্বাশুড়ীর।

কিন্তু, বলতে বলতে তার বোধ হয় সঙ্কোচও হচ্ছিল একটু একটু, আর সেই সঙ্কোচ ঢাকবার জন্যেই সে রুক্ষ গলায় বলেছিল 'জানি এটা আমার কর্তব্য, কিন্তু এখন আর পারা যায় না।' অন্যদিকে চেয়ে লণ্ঠনের চিমনী ঘষতে ঘষতে বলেছিল 'রাঁধাবাড়া একসঙ্গেই হবে, যেমন হতো।'

আসলে, কথাটা বলতে হল বলে তার নিজেকেই ছোট মনে হচ্ছিল। লজ্জা করে, কোথায় যেন বাধে। হাঁসপাতালের অন্য দাই মেয়েরা তাকে অবশ্য অনেকদিন থেকেই বুঝিয়ে আসছে স্বার্থপর না হ'তে পারলে তার ভবিষ্যৎ অন্ধকার। তবু ত বললেই কি আর বুড়ো শ্বশুর-শ্বাশুড়ীকে আলাদা ক'রে দেওয়া যায়?

পুণ্যদাসী তখন বউ-এর দিকে চেয়ে মনে মনে ভেবেছিল এখনকার শাস্ত্র আলাদা। রোজগারের অন্নে শ্বশুর-শ্বাশুড়ীকে প্রতিপালন ক'রে সে হয়ত খুব বড় কাজই করছে, এখনকার শাস্ত্র। কুড়ি বছর আগে হ'লে ধান ভেনে, গোবর-ঘুঁটে দিয়ে শ্বশুর-শ্বাশুড়ীকে অন্ন দেওয়াটা ঘরে ঘরেই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু, বউ-এর নামটি সেই আছে, স্বভাবটি খারাপ হয়নি। কিন্তু চালে, চলনে, সে কি আর সেই মানুষ আছে?

'শুনছ, আন্না একসঙ্গে হবে।' বউ তাকে চুপ করে থাকতে দেখে বলেছিল।

'চাল যার যার তার তার, হাঁড়ি একসঙ্গে।'

'শুধু চালে কি আন্না হয় বাবু! তেল, মশলা, আনাজপাতি, কয়লা, ঘুঁটে, সে ঝামেলিটি কম নয়। তাই, ঝা ভাল মনে হয়, তাই বললাম বাবু।'

বলতে বলতে হঠাৎ বউ-এর গলাটা ধরে এসেছিল। শ্বাশুড়ীর ফ্যালফ্যাল্ করে আহত দৃষ্টিতে চেয়ে থাকা দেখে শ্বাশুড়ীর ছেলের কথা মনে পড়েছিল। অনেক, অনেকদিন আগে, একদিন তাকে বলেছিল 'বউ, আমার মা, জানলি, আমায় অনেক কষ্টে বেঁচিয়েছে। টাইফাট্ জ্বরে পেরাণটা আমার গিয়েছিল আর কি।'

সেই শ্বাশুড়ীকে আজ সে আলাদা হয়ে যেতে বলল। না বলে উপায় কি। এখন তাকে দিন গোছাতে হবে। সময় থাকতে গুছিয়ে না নিলে পরে সে কোথায় দাঁড়াবে?

তারপর ক্রমে, বুড়োবুড়ীর সংসার বলতে গেলে আলাদাই হয়ে গিয়েছে। ওদের রাঁধা-বাড়ার শেষে পুণ্যদাসী ভাত চড়ায়। একবেলা তপ্ত খায়, একবেলা পান্ত। ঘর দু'খানার ভাড়া আজও বউই দেয়। তবে ঐ পর্যন্তই। একটু অসুখ-বিসুখের ভাব দেখলেই সে খনখন ঝন্‌ঝন্ ক'রে বলে 'সুস্ত থেকো বাবু, সুস্ত থেকো। পড়ে অইলে দেখব সে টাইম আমার মোটে হবে না। তা'লে আর চাকরী থাকবে না। দাই কি এখন একটা দুটো? ঝাঁকে ঝাঁকে আসতেছে আর ঘুরতেছে। ব'লে কত তা'বড় তা'বড় ঘরের ঝিউড়ী মেয়ে, বউ, সবাই আসতেছে। ওয়ার্ডেরও আর সে-দিন নেই গা। নিত্যি নতুন

মেট্রন, নিত্যি নতুন সিসটার, আমাদের ডিউটি দিতে আর চায় না।'

আজ রথযাত্রার ক'দিন আগে, চোখের দৃষ্টিটি হারাতে বসে, বউ-এর অপেক্ষা করতে করতে পুণ্যদাসী ভাবল এখন বউ কথায় কথায় বলে 'জামাই ঘর পেলে ত' আমিও যেতে পারি না। ঘরটি ছাড়তে চাই না উনাদের জন্যে।'

ভাত দিতে হয় না, তবু এত কথা শোনায়! চোখটি গেছে জানলে তখুনি কি বউ জামাই-এর সংসারে গিয়ে উঠবে না? পুণ্যদাসী এখনো ভিক্ষের পাট সেরে, হাত-পা ধুয়ে উনোন কাড়ে, বাসন মাজে, জল ধরে। বউ-এর শরীর খারাপ হ'লে কাপড় ছেড়ে রান্নাও করে। সে সাহায্যটুকু না পেলে কি বউ তাদের থাকতে দেবে?

'অথের নিচে যেতে হবে, জগন্নাথের অথ।' পুণ্যদাসী বিড়বিড় করে বলল, বউ আসতে দরজা খুলে দিল।

অন্য দিন, রাত-ডিউটি সেরে বউ বাজার ক'রে আনে। পুণ্যদাসী জিগ্যেস করে 'কি আনলি?' অথবা বউই বলে 'মাছ চিংড়ি ক-টা বেছে দাও ত।'

আজ বউ বড় চুপচাপ। নিজের ভাবনায় গম্ভীর। পুণ্যদাসীর দিকে সে ভাল করে তাকাল না, "লাবি গেচে?' জিগ্যেস করেই সে ঢুকে গেল।

এখন পুণ্যদাসী ধীরে ধীরে মাগনদাসের কাছে গেল। মাগনদাস যেমন উৎসাহে একটির পর একটি 'বেবসা' করতে যেত, এখন তেমনি উৎসাহেই ভিক্ষে করতে যায়। সে বলে 'কাজ লক্ষ্মী, কাজকে যে ভালবাসে না, তার জেবনে সুখ হয় না।' যেমন উৎসাহে সে একদিন চাল-বলদ নিয়ে বেরোত, তেমনি উৎসাহেই সে বাউল হতে গিয়েছিল, বেলেঘাটায় ঘরামির কাজ, বউবাজারে কয়লাবাছা, কোলের বাজারে মাছপটিতে বরফ ভাঙা, এমন কি দোকানের সামনের ফুপপাথ ঝাঁট দেওয়ার কাজ, সব কাজেই সে সমান আনন্দ পেয়েছে।

এখন ভিক্ষে করতে যাবার সময়েও তার চোখে-মুখে আনন্দ ফুটে ওঠে। খাট ধুতি, পায়ে কাপড়ের জুতো, হাতে কাঁথার ঝোলা, সে সূর্যের দিকে মুখ তুলে বসে বসে অধৈর্য হয়ে উঠেছিল। এখন পুণ্যদাসী আসতে বলে উঠলো, 'দেরী হয়ে গেল, আজ আর কেষ্টনগর লোকাল পাব না। সব লাইনেই বেস্তর ঠেলাঠেলি, আমার জায়গাটুকু কোন সুসন্দি না বাগিয়ে বসে থাকে। জগন্নাথ!'

এখন পুণ্যদাসী ভাল করে স্বামীর মুখখানা দেখল। হঠাৎ মনে পড়ল সাবিত্রীব্রতের কথায় শুনেছিল 'যে এয়োতি নিত্য স্বামীর মুখ দেখে, সে বড় পুণ্যবতী।' পুণ্যদাসী, সেই কবে থেকে মাগনদাসের মুখ দেখে আসছে, হয়ত পুণ্যও হয়েছে, এখন সে ভাগ্যটি থেকে ভগবান তাকে বঞ্চিত করতে বসলেন, সে নিঃশ্বাস ফেলল।

'তাড়াতাড়ি চ!' মাগনদাস একটু বিরক্ত হয়ে বলল। তার ভিক্ষে চাওয়ার মধ্যেও একটি গেরস্তের ভাব আছে। গেরস্ত মানুষ যেমন বাঁধা দোকানে জিনিস কেনে, চলায় ফেরায় কয়েকটি বাঁধা ধরণ-ধারণ অনুসরণ করে, মাগনদাসও তেমনি একটি জায়গায় বসে। লোকাল গাড়ীর কয়েকজন প্যাসেঞ্জার তার বাঁধা। সে হেলাঠেলি করে না, দুঃখকষ্টের ভয়ঙ্কর সব কথা বলে করুণা আকর্ষণ করে না, বেশ স্মিতমুখে বসে থাকে। তবু, এতদিনে অনেকেরই বিশ্বাস, এমন কি পুলিস কনষ্টেবলেরও, মাগনদাস লোকটা পয়মন্ত ওর মুখ দেখলে দিন ভালই যায়। শেয়ালদ ষ্টেশনের সামনে মাগনদাসকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে পুণ্যদাসী অভ্যেসমত বলল 'জল পড়লে ওপরে উঠো।'

তারপর হঠাৎ কি মনে পড়তে বলল 'ঝোলা ছিঁড়ে এন না ত। নিত্যি শিয়োতে পারি না।'

'ধপ ক'রে কে সেদিন এটা তাল দি'ছল ফেলে। তাতেই ছিঁড়েছে মনে হয়।'

'তাল দিয়েছিল। যারা তাল দেয়, তারা তেল দেয় না কেন? মিনি তেলে তালবড়া হয়?'

পুণ্য মন্থরগতিতে বাঁ দিকের ফুটপাথ ধরে চলতে লাগল। তার মুখের কথাটি সুন্দর, হ'তে পেতলের সাজি, তাতে চারটি ফুলবেলপাতা, এতটুকু ঘটিতে গঙ্গাজল। সে বলতে বলতে চলল 'যারা এত কষ্ট করে দোকান করে বসেছে তাদের ভাল হ'ক ঠাকুর। যে যে আশা করে আস্তায় বেরিয়েছে, তাদের আশাটি পূর্ণ কর। সংসারে সকলের ভাল কর ঠাকুর!'

এই কথা কয়টির জন্যে, দোকানীরা ওকে ভাল চোখে দেখে। প্রায় সকলেই একটি করে পয়সা দেয়। রথের সময়ে রোজগারটি আরো বাড়ে।

'এবার কি মনে করেছ ঠাকুর? তোমার অথ সবাই দেখবে, শুধু আমার চোখই তুমি কেড়ে নিলে?' পথ চলতে চলতে, পয়সা নিতে নিতে সে বলল।

আশ্চর্য, ভগবানের মনে কি আছে কে জানে, কেন না হঠাৎ আজ রাতে বিছানায় শুয়ে মাগনদাস সেই জগন্নাথের রথের কথাই তুলল।

'অনেকদিন বাদে হলধারী এসেছিল, জানলি বউ?'

'কে?'

'হলধারী ভুঁইমালী, মনে নেই, সেই যার বাপ মাহেশে রথের নিচে মরেছিল?'

'কেন মরেছিল যেন?'

'কেন আর, ওগের জ্বালায়। শূলের ব্যথায় পাগল পাগল হয়েছিল। তা ছাড়া তারকেশ্বরে হত্যে দিয়েও কিছু হল না। শেষ-মেশ দোকান করব বলে মাহেশে এসে রথের নিচে সঁপে দিলে।'

'মা গো! একটু ভয় হল না।'

'আর ভয়! অথের নিচে যে মরে সে অথের দিনের সবটুকু পুণ্য পায়।'

'তোমায় বলেছে!'

'তখন দেবতার মাহাত্ম্য ছিল যে।'

'হ্যাঁ গো, তবে যে সবাই বলে 'অথের নিচে ঝাঁপ দিলে পুলিসে ধরে নে যায়?'

'ধরে নিলে ত বয়েই গেল: অন্যাই ত কিছু করছে না?

'তবে ধরে কেন?'

সে-কথায় জবাব না দিয়ে মাগনদাস বলল 'এ পুণ্য থেকে বাবা, বঞ্চিত করবার জো-টি নেই। সেইজন্যেই ত' আগে আগে ফি-বছর জগন্নাথ-ধামে অথের নিচে মানুষ মরত।'

'মানুষ মরত!'

'কাতারে কাতারে।' বউ-এর কাছে সবজান্তা সেজে মিছে জাঁক জাহির করে বড় বড় কথা বলবার অভ্যাস মাগনদাসের আজও আছে। 'কানা-খোঁড়া, ওগী-ভোগী সবাই যেত।'

ভাবতেই পুণ্যদাসীর বুক চমকাল। রথের চাকার নিচে পড়লেও মরবে, না পড়লেও পথিকদের লক্ষ লক্ষ পায়ের চাপে পিষে যাবে।

কে জানে ভগবানের মনে এবার কি আছে! পুণ্যদাসী পাশ ফিরে শুয়ে আকাশের দিকে তাকাল। ঘুমের মধ্যে তাকে যেমন বোবায় ধরে, জেগে থাকলে তেমনিই বুকে চিন্তা চেপে বসে। অন্ন-চিন্তা বস্ত্র-চিন্তা, তার আবার চক্ষু-চিন্তা

মার্কি

রাজলক্ষ্মী ষ্টোর

৩৯৩, রবীন্দ্র সরণী (আপার চিৎপুর রোড) কলিকাতা-৭

দিলে ভগবান, সে মনে মনে বলল। তারপর, জানলা দিয়ে চেয়ে মনে হল আকাশটা যদি দেখতে পায়, তাহ'লে জানবে চোখটা তার নেহাৎ খারাপ হয়নি, ও তার মনের বিভ্রম।

তাকিয়ে আবার সে চমকে উঠল। তার চার কোণা ছোট আকাশখানা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে রথের চূড়ো, জগন্নাথের রথ।

মেলার জন্যে দোকানীরা যেমন ঘর তুলবে বলে আগেভাগে ভিড় করে, ভিখিরীরাও তেমনি। তারকেশ্বরের নুলোকে দেখে পুণ্যদাসী বললে, ই কি অকম ভক্ত গো। সারা বছর বাবার চরণে পড়ে থাকে, অথের সময়ে কলকেতায়?'

'না এলে মাসী তোমাদের সঙ্গে দেখা হয় কই?' নুলো হাসল। এরা সবাই জাত-ভিখিরী, গেরস্ত ছিল, ভিখিরী হয়েছে। নোংরা, কুঠে, মেয়েদের সঙ্গে, অথবা আনটপকা গজিয়ে ওঠা, 'মা মরেছে,' 'স্বামী ফেলে পালিয়েছে।' 'ছেলে যক্ষ্মায় ভুগছে, এদের সঙ্গে ওদের কথাবর্তা চলে না। গেরস্ত বউ-ঝি হিজড়েদের দেখলে যেমন, পুণ্যদাসীরাও ওদের নির্লজ্জতা দেখে তেমনই লজ্জা পায়। পুণ্যদাসীদের সংসার আলাদা, অনাথ আতুরের সংসার, কথাটি পুণ্যদাসী বড় স্নিগ্ধ ক'রে বলে, যেন তাদের এ-সংসারটিও কারও আশ্রয়ে আছে, ভগবানের আশ্রয়ে।

দক্ষিণেশ্বরের ভাগিনী, নৈহাটি ষ্টেশনের মোনাবুড়ো আর চেতলার ভব, সকলের সঙ্গেই দেখা হল। মোনাবুড়ো বললে 'দিদি যে আর চোখেই দেখ না, এখেনে বসে আছি।'

'এই ত' বাবা! কেমন আছ?'

'আর যেমন রেখেছে।' তারপর চারদিকে মুখ ঘুরিয়ে বাতাস শুঁকে মোনাবুড়ো বললে, এবার রথে জাঁক খুব।

'তোমার দেশের মতন কি আর, বাবা?

মোনাবুড়ো এক সময়ে জাতে ওড়িয়া ছিল। কথাটি এখন তারও মনে থাকে না। সে হেসে বলল, 'যখন যেখানে থাকি, সেখানেই দেশ গো। এখন শেয়ালদা।'

খেতে খেতে পুণ্যদাসী বললে 'চড়কডাঙার 'জয় হোক' ছেলে কোথায়? এবার গলা শুনতে পাই নি?'

ভব বললে সে আর নেই ক।

'দুগা শ্রীহরি।' অভ্যেসমত বলে পুণ্যদাসী নিগিয়ে গেল। তীর্থে যেমন সেথো, এখানেও তারা তেমনি সুখে-দুখে একসঙ্গে, কিন্তু তার'লে মরলে পরে দুঃখ নেই। পুণ্যদাসীরা জানে, যে গেল সে বেঁচে গেল।

এখন মনে মনে 'দুগা' বলতে বলতে সে নীরলরতন হাসপাতালে ঢুকল। এখানে তার বউ কাজ করলে আর সে সাহস করে আসতে পারত না। ভাগ্যে বউ ইডেনের দাই, 'হ্যাঁ গো, চোখের ডিপার্ট কোতা? পুণ্যদাসী একজনকে জিগ্যেস করল।

চোখ দেখাবার জায়গায় পেল্লায় ভিড়, ছোট-খাট রথের মেলা বললেই হয়। 'ও মা, এ যে সেই ভিখিরীটা গো! একজন ফর্সামত ঝি আরেকজনকে বলল। দ্বিতীয়জন জবাব দিল না। একজন বৃদ্ধ চোখে মোটা কাচ এঁটে বসে মাথা নাড়ছিলেন। তিনি বললেন, 'আহা, ভিখারী ত' আমরাও। তীর্থের কাকের মত বইয়া আছি দেখ না?'

হাঁসপাতালে সবাই সমান, পুণ্য সেটি জানে। টিকিট হাতে ক'রে বসল।

অনেক পরে, পেট-কাপড়ে টিকিট আর ঔষধের শিশি বেঁধে সে বাড়ী ফিরল। এখন তার মন প্রফুল্ল, শরীরে উৎসাহ। আশা আছে, ক্ষীণ হলেও আশা আছে। বাড়ী ফিরতে ফিরতে সে মনে মনে মানত করতে লাগল 'হে বাবা জগন্নাথ, তোমার দয়ায় আমার বছর বছর ওজগার, চক্ষুটি তুমি এখো গো।' এক টাকার চিনি-কলা দেব। চক্ষুটি তুমি এখো ঠাকুর, তোমায় নয়ন ভ'রে দেখব।'

বাড়ী ঢুকতেই রেডিওর গান তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। বউ ছুটে এসে বলল, 'তবে এলে? তোমার নাত-জামাই এসেছে। আমি ভাবছিলাম খেয়েদেয়ে তোমার ওপর ঘর ছেড়ে দে ছুটে হাঁসাতালে যাব। পেশেন্টকে বলব ডিউটিটুকু আমি সেরে দিই, লাবি আসুক।'

'অ!' পুণ্যদাসী থতমত খেল, 'আমি কি করব? এখুনো আন্না বাকি, তোর শ্বশুরকে আনতে আছে।'

'আন্না আমি করিছি তোমাদের।' বউ নীচু গলায় বলল। তার নিজের তাড়া না থাকলে এমন নিঃস্বার্থ ব্যবহার আজকাল সে কমই করে।

'আন্না করিছি। তোমাদেরটা তুলে দিইছি। শ্বশুরকে আনতে যাবে কি এখন, সে ত সন্দে-বেলা! তখন জামাই আর লাবি ঘরে অইবে এখন। ও কি কর?'

'উনোন দেখ ছি। আর চাটটি ভাত না বসালে আতের পান্তা, সকালের পান্তা?'

'সব ক'রে রেখিছি বাবু।' বউ গা-ঝাড়া দিল। তারপর বলল, 'জামায়ের সামনে যেতে হলে কাপড় ছেড়ে যেও বাবু। ও পক্ষের মানুষ!'

বউকে একটু বেশী অস্থির মনে হল, উৎসাহে চঞ্চল। পুণ্যদাসী নিজের আনন্দে ডুবে ছিল, তাই সেদিকে মন গেল না।

বলল 'হ্যাঁ হ্যাঁ চান করেই যাব। নাত-জামাই পাশ করেছে?

'করেছে।'

'কাজ পাকা হল?'

'হয়েছে।'

'তবে মিষ্টি খাওয়াতে হবে।' পুণ্যদাসী ফোকলা মুখে হাসল। তার মুখের কালো, ছোট হাঁ দেখেই বউ-এর পা থেকে মাথায় ঘেণ্না শিউরে গেল। ছেড়ে যেতে হবে, ফেলে যেতে হবে এই সব পিচুটান, কাঁথার ভ্যাপসা গন্ধ, ফোঁপরা বটগাছের আশ্রয়। কেন না ভুবন বড় শৌখীন ছেলে। নিজের বাপ-মা বাইকে ছেড়ে বউ আর শ্বাশুড়ীকে নিয়ে কোয়ার্টারে যাচ্ছে, কেন না তার বাপ মা বড় গরীব, ওদের ধরে থাকলে উন্নতি হয় না।

'আমার বাপ মা ত তবু পদে আছে, এরা সব জাত ভিখিরী, আরে ছ্যা ছ্যা, রাম কহ!'

মা-মেয়ের অন্তরঙ্গ কথা হাঁসপাতালেই হয়। একজনের ডিউটি শেষ হয়ে আর একজন ঢোকবার সময়ে।

লাবি তাই মা-কে বলল, 'কি করবে সেটি ভেবে দেখ।' মা'র ভেবে দেখতে একটুও সময় লাগল না।

'তবে, সে লাবিকে বলল 'যা করব তা অথের সময়ে। ওদের জানতে দেব না।

'জানতে দেবে না?'

'না। তিন মাসের ভাড়া বরং গিন্নীকে দিয়ে যাব। তিন মাসের মধ্যে কি আর ওনারা দেখে নিতে পারবে না কিছু?' ভগবান জানে এমন কাজ করতে আমার বুকের মধ্যে কি হচ্ছে। কিন্তু আমারই বা উপায় কি?

'অনেক করেছ বাবু।' লাবি মুখঝামটা দিয়ে পেশেণ্টের চুল বাঁধতে গেল।

রথযাত্রার দিন পুণ্যদাসী বড় আগ্রহ করে সকাল সকাল রওনা হল। মাগনদাসকে বলে গেল 'আমার এটা মানসিক আছে। তুমি বাবু দোকান থেকে যা হয় খেও। আমার আসতে সেই যাকে বলে সনঝে।'

প্রবল বর্ষণে পুণ্যদাসী চুপ করে ঘরের কোণে বসেছিল। নিশ্চুপে এসেছে সে কাউকেও জানতে দেয় নি। চোখের দৃষ্টি তার ফিরবে না, চোখের শিরা শুকিয়ে যাচ্ছে একথা জানবার পর কয়েক ঘণ্টা কেটে গিয়েছে।

বাড়ীতে এসেছিল ব'লে ওদের সব কথা ও জানতে পারল। জেনেও, বউ-এর নিষ্ঠুরতা তার মনকে নতুন করে আর স্পর্শ করল না। ভগবানের নিষ্ঠুরতায় তার চোখ দুটি যাচ্ছে। বউ-এর নিষ্ঠুরতায় তাদের আশ্রয়টুকু যাবে।

'এমন কত কাণা, খোঁড়া পথে পথে---' নাতজামাই-এর কথা কানে এল, 'তবু ত আপনি তিন মাসের ঘর ভাড়া ----'

'দিতে হবে না।' এ ঘর থেকে পুণ্যদাসী বলল।

'তুমি!' বউ এসে দরজা ধরে দাঁড়াল, তার মুখটা অপ্রতিভ, বিরক্ত।

'মা আর অন্যাইটা কি করছে বল।' লাবি খন খন করে বলল।

'এই যে তুমি আমাদের নুইকে হাঁসপাতালে যাচ্ছ আর আসছ, শেষে কি ওগমোগ নে সবাই মিলে মরতে হবে?'

'আমার ওগ হয়নি!'

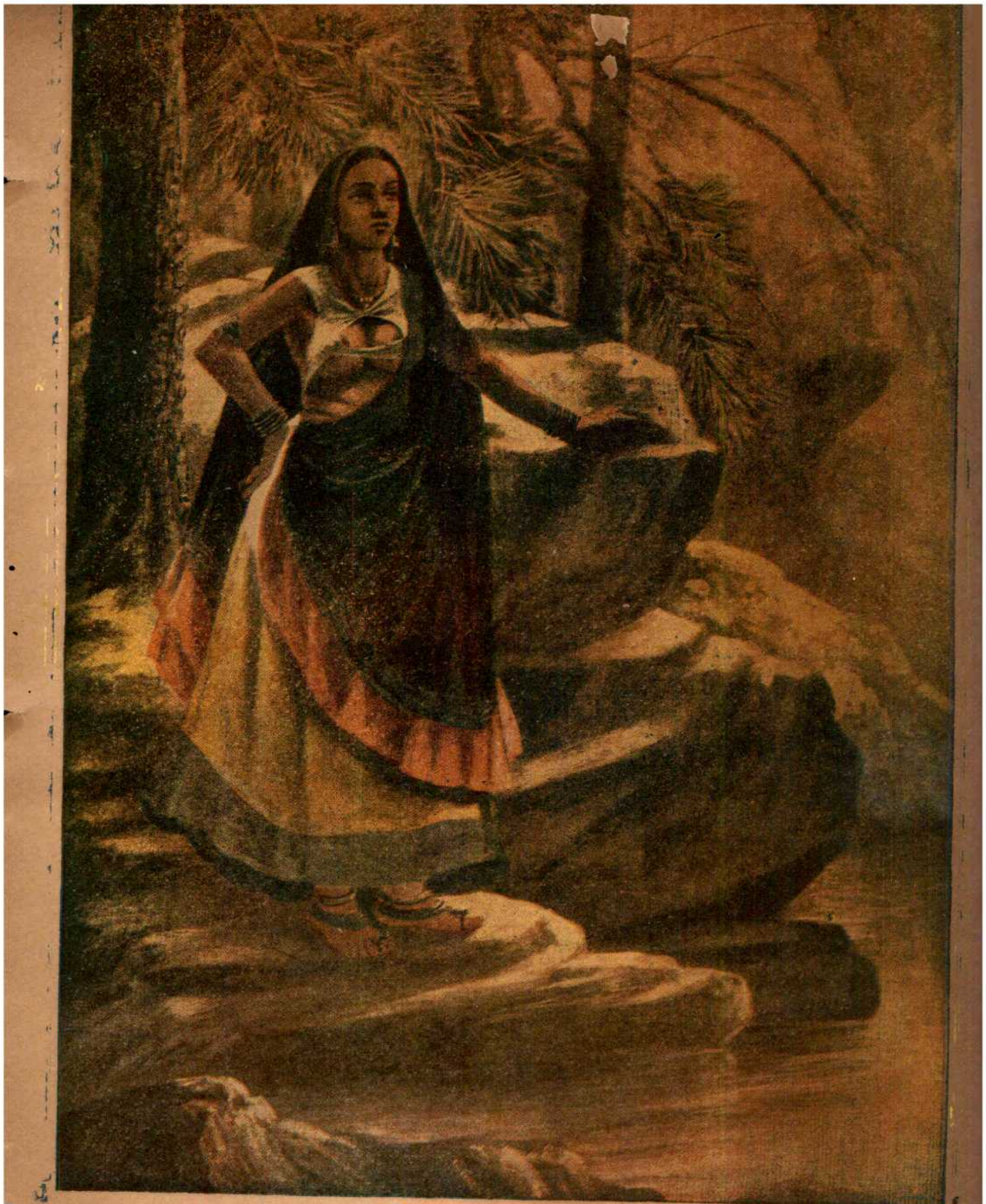

শারদীয়া
দৈনিক বসুমতী
॥ ১৩৭২ ॥

জংলী
—শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী অঙ্কিত

আরও সুন্দর আরও উজ্জ্বল ক'রে তুলুন আপনার চুল

একমাত্র লক্ষ্মীবিলাস নিয়মিত
ব্যবহারেই তা[illegible]।

সতর্কীকরণ

নকলের হাত থেকে বাঁচবার জন্য কিনিবার সময় ট্রেডমার্ক রামচন্দ্র মূর্ত্তি, পিলফার প্রুফ ক্যাপের উপর RCM মনোগ্রাম ও প্রস্তুতকারক এম.এল.বসু এণ্ড কোং দেখিয়া লইবেন।

লক্ষ্মীবিলাস
কেশ তৈল

এম.এল বসু এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ-লক্ষ্মীবিলাস হাউস, কলিকাতা-৯

'তবে কি হাঁসপাতালে বেড়াতে গিইছিলে?'

'চোক দেখাতে গিইছিলাম। চোখটি গারবার লয়, আজ শুনে এসতেছি। ব্বাপো রে!' পুণ্যদাসীর বুকে হাঁফ ধরছে, দম নিতে তার কষ্ট হল।

'তা'লে?'

'অন্ধ। হব তোর শ্বশুরের মত হব।' পুণ্যদাসী মাথা নেড়ে সে সম্ভাবনাকে একটু দূরে ঠেলল। তারপর উঠে দাঁড়াল।

'কোথা যাও?' বউ-এর গলা একটু ক্ষীণ, 'এই বিষ্টিতে পাগল না কি?'

পুণ্যদাসী জলে পা দিল। না, এখনো হাঁটু জল হয়নি।

'বলি, যাও কোথা?'

'অথের চাকার নিচে মরব। বিশু ভোবন খেয়ে থাক, অথ ত চলবে।'

'হা দেখ, অথ কোথা পেলে তুমি?'

কোন কথা শুনল না পুণ্যদাসী। আকাশ থেকে জল পড়ছে, সহর জলে থই থই। মানুষ-জন, গাড়ী-ঘোড়া কিছু নেই। জল ঠেলে গিয়ে সে কাঠগোলার উঠোনে ঢুকল। পালচৌধুরীদের কেউ কোথাও নেই, রথের চূড়ো তেরপলে ঢাকা। কাঠগোলায় মজুররা দরজা বন্ধ করে বসে আছে।

'দোর খোল, বাপা সকল, দোর খোল।' পুণ্যদাসী হাঁক দিতে লাগল।

'কৌন?' লোহার রাগী ঘণ্টার মত চং করে কে বললে ভেতর থেকে।

'আমি গো, পুণ্যদাসী, অথ চলবে না?'

'নেহী।'

'সি কি গো, অথ চলবে না?'

কোন জবাব নেই।

এখন পুণ্যদাসী ভীষণ ভয় পেল। নিদারুণ ভয়। সামনে তাকিয়ে দেখল থই থই জল, তার চোখের মত ঘোলা। এই ত' সামনেই তার ঘর, এতদিনের আশ্রয়। কিন্তু তার দৃষ্টি চলে যাচ্ছে, রাস্তা থেকে বিষ্টির জল শুকোবার মতই তাড়াতাড়ি চলে যাবে তার দৃষ্টি। বউ চলে যাবে, তার এতদিনের আশ্রয়ও চলে যাচ্ছে, তবে কি সে এখনি মাগনদাসের কাছে যাবে? বিষ্টির বহর দেখ, যেন 'প্রলয় পয়োধি জলের মত' বন্যে নামাবে। কিন্তু সামনে ঐ কি? তার একেবারে সামনে? পুণ্যদাসী হাত বাড়ালে। হোক এতটুকু ছেলেদের খেলাঘর থেকে ভেসে আসা। তবু রথ, জগন্নাথের রথ।

'হা দৈব!' পুণ্যদাসী এখন বুঝতে পারল জগন্নাথের রথ তাকে অনেক আগেই চাপা দিয়েছে। মাহেশে হলধারীর বাপ মরেছিল। তারও আগে জগন্নাথে না কি কাতরে কাতারে--- কিন্তু তাকেই প্রথম চাপা দিয়েছিল, রথের প্রথম বলি হবার অলৌকিকত্বে তার ঘোলা চোখ বিস্ফারিত হল।

সেই যখন সে হেলোচাষীর ঘরে যায়, সেই যখন মাগনদাসরা এক কথায় জমি, লাঙল, বাস্তু সব হারাল, তখন থেকেই সে রথের নিচে। তারপর এই এতদিনের জীবন, ছেলেটি মরল, বাড়ি বাড়ি কাজ, পথে পথে ভিক্ষে, মরতে মরতে ঘরের এক কোণায় এল, সেখানেও তাকে রথের চাকা তাড়া করে এল। এই যে দৃষ্টিটি গেল, এই যে বউ তাদের ফেলে চলে যাচ্ছে, এ আর কিছু নয়, জগন্নাথের রথ।

'ও মাসী উটে এস।'

কখন সে বড়রাস্তায় এসেছে, পথ দিয়ে চলেছে, পেছনে দক্ষিণেশ্বরের ভামিনীর গলা।

'মাসী অথ বেইরেছে। জলে হড়হড়িয়ে চলছে, দেখছ না? উটে এস।'

হ্যা, রথ তবে বেরিয়েছে। চাকার গড়গড়, গমগম শব্দ। পুণ্যদাসী, কোমর জলে দাঁড়ানো এত এত লোকের চীৎকার শুনতে পেল না, হাতে ছোট রথটা চেপে ধরে মাঝ-পথেই দাঁড়াল। উটে এস! ভামিনী কি জানবে জগন্নাথের রথের চাকায় পুণ্যদাসী কবে থেকে বাঁধা?

'উটে এস গো।'

'হা দেখ ভামিনী?' পুণ্যদাসী বলতে চেষ্টা করল 'একে আমি চেরদিন অথের চাকায় বাঁধা, তায় জগন্নাথের অথ চলে আকাশ-পাতাল জুড়ে, কোথায় উঠি বল?'

কিন্তু 'হা দেখ' কথাটি মুখে থাকতে থাকতেই জলের ধাক্কায় হাতে ছোট রথটি ধরে পুণ্যদাসী মুখ থুবড়ে পড়তে পড়তে দোকানের খুঁটি ধরে সামলাল।

'জয় জগন্নাথ' ধ্বনি, জলের ঢেউ, আর রথের চাকা সবই তার ওপরে উঠে আসতে চায়। সেই ধাক্কায় পুণ্যদাসী খুঁটিশুদ্ধ জলে মুখ থুবড়ে পড়ল।

'আমি ত অথের চাকায় আগে থেকেই বাঁধা গো!' তার কাতর মিনতি কারোর কাণে গেল না, শুধু রথের চাকা থর থর করে কেঁপে একটু থেমে আবার চলতে লাগল।

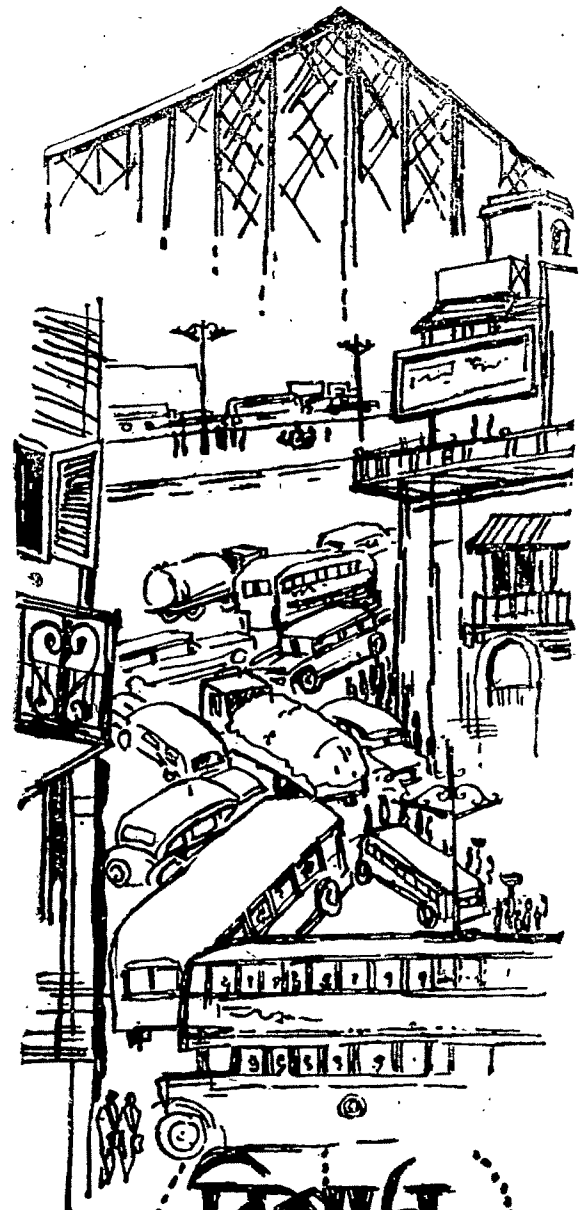

বিশ্বাস নাই করলেন

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

কাহিনীটি বিশ্বাস করা শক্ত হবে জেনেও লিপিবদ্ধ করে রাখছি।

তবে, বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কথা যদি উঠলই তো এই বা কে কবে বিশ্বাস করতে পেরেছিল যে, কলকাতার বুকের ওপর নিত্য সন্ধ্যায় এমন একটা কাণ্ড ঘটতে থাকবে—যার একটা উপায় বের করতে মন্ত্রিপরিষদ থেকে পৌরসভা, মায় ট্রাফিক-পুলিশ পর্যন্ত সবাই যাবে হিমসিম খেয়ে? ট্রাফিক জ্যাম, অর্থাৎ যানবাহনের অচলাবস্থার কথা বলছি। বিশেষ ক'রে বড়বাজারের প্রায় আধাআধি থেকে নিয়ে গঙ্গার পুল, পরে হাওড়ার বাস-স্ট্যাণ্ড পর্যন্ত। ট্রাম, বাস—একতলা, দোতলা—প্রাইভেট গাড়ি, ট্যাক্সি, টেম্পো, রিক্সা, মোটর গাড়ি, ঠেলাগাড়ি, অশ্বযান, খুটে,হকার,—যা কিছুর নমুনা আছে কলকাতায় সব এই মাইলখানেক ধরে একটা চাপ বেঁধে যায়। একবার যেটা একটু ঢুকে পড়ল তার আর পিছু হটে বেরুবার উপায় থাকে না; মিশ্র-পিণ্ডটা আস্তে আস্তে এগুতে থাকে। এটা ঘোড়ার গাড়ি, ঘণ্টায় পঁচিশ-ত্রিশ মাইল, ওটা ঠেলাগাড়ি, ঘণ্টায় দেড় মাইল, এ-ধরণের কোন তারতম্য নেই। সবকিছুই ঘণ্টায় মাত্র এত গজ। যানবাহনের জগতে এমন অপূর্ব সাম্যবাদ কুত্রাপি দেখা যায় না। হাজার হাজার বিচিত্র যানের অধৈর্য নিনাদে সমস্ত জায়গাটায় কান পাতা যায় না। তবু তারই মধ্যে আবার দেখেছি নিশ্চিন্ত নিষ্ক্রিয় ট্রামের ড্রাইভার পাশের ঠেলা গাড়িওয়ালার সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিল, তারপর উভয়েই বালিয়া জেলার অধিবাসী আবিষ্কার ক'রে খৈনি-চুনা সহযোগে পরিচয়টা অন্তরঙ্গতার স্তরে এনে ফেলায় প্রবৃত্ত হোল।

ক'রে কি লোকে? কাটিয়ে দিতে হবে তো কোনরকম ক'রে এরই মধ্যে।

রকমারি আছে। এ যা বললাম সেটা অবসর-বিনোদন; সে-অবসরটা অযাচিত এবং অনিবার্য-ভাবে ঘাড়ে এসে পড়েছে। কিন্তু বিনোদ শুধু ট্রাম-বাসের ড্রাইভার-কণ্ডাক্টারেরই হতে পারে, আর সবার কাছেই তো সমস্যা। এতবড় সহর কলকাতা, এত মানুষ, কত বিচিত্র রকমের প্রয়োজন তাদের, কত ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে, অথচ জাঁতিকলে প'ড়ে ছটফট করা ছাড়া যেন উপায় নেই।

এইরকম একটা ছটফটানি ধরেছে আমাদের মিত্তিরমশাইয়ের। এক ট্যাক্সিতেই চলেছি আমরা, যদিও পূর্বে কোন পরিচয় ছিল না।

এক ট্যাক্সিতে রয়েছি আমরা এমহার্স্ট ষ্ট্রীটের চৌমাথা থেকে। হাওড়া আসতে হবে, ট্রাম-বাস-ট্যাক্সি-রিক্সা একটা যা-হয় কিছুর জন্য অপেক্ষা করছিলাম। একটা ট্যাক্সিই গেলাম পেয়ে। রাস্তার ওদিক দিয়ে যাচ্ছিল, ফাঁক দিয়ে ঘরে এসে এদিকে দাঁড়িয়েছে,

● হ্যা ওলট ধরে বললেন—"হাওড়া যায়গা?"

পাশের একটা গলি থেকে মিত্তিরমশাই হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে এসে আমার আগেই দোরের হ্যাণ্ডেলটা ধরে বললেন—"হাওড়া যায়গা।" সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে হাঁক দিতে আরও তিনজন সরু গলির মুখ থেকে এক এক ক'রে বেরিয়ে এল। একজন যুবা, বেশ ফিটফাট হয়ে সজ্জিত, তার পেছনেরটি পরুত বলে মনে হোল এবং তার পেছনেরটি বেরিয়ে আসতেই বোঝা গেল বিবাহের ব্যাপার। লোকটার একহাতে একটা বড় পুঁটলি, একহাতে টোপর, সাজগোজে বোঝা যায় নাপিত।

বেশ একটু হতচকিত হয়ে গেছি। তারপর ব্যস্তভাবে—"ওঠ, উঠে পড়ো।"—বলে উনি দরজাটা খুলতেই বললাম—"কিন্তু আমি ধরেছি ট্যাক্সিটা।"

"বাঃ, তা কি ক'রে হবে।"—একটু গা-জুরি করেই হ্যাণ্ডেলটা চেপে ধরলেন ভদ্রলোক।

বললাম—"জিজ্ঞেস করুন ড্রাইভারকে।"

ড্রাইভার একজন পাঞ্জাবী। আমাকেই সমর্থন করতে হাতটা আলগা হয়ে গেল ভদ্রলোকের। আমার দিকেই চেয়ে একটু ব্যাকুলকণ্ঠেই বললেন—"আমার যে বড্ড দরকার, দেখতেই পাচ্ছেন।"

বললাম—"যাবেন কোথায়?"

"হাওড়া স্টেশন।---ক'টা বাজল বিট্‌ঠল? ঠিক ক'রে দেখে বলো।"

ছেলেটি হাতঘড়ি দেখে নিয়ে মৃদুকণ্ঠে জানাল—"সাতটা পাঁচ।"

"ঐ নিন, ট্রেন ধরতে হবে। আর সময় কোথায়?"

ড্রাইভারকে বললাম—"আমি হাওড়া হয়েই বেরিয়ে যাব, এঁদের নামিয়ে দিয়ে যেতে আপত্তি আছে?"

ওদের থাকে না আপত্তির কিছু। ডবল ভাড়াই পায়। সেই থেকে একসঙ্গে আসছি। ওদের জন্য পেছনকার সীট ছেড়ে দিয়ে ড্রাইভারের সঙ্গে বসেছি আমি।

মহা ব্যস্তবাগীশ মানুষ।

প্রত্যেকের হাতেই একটা ক'রে স্যুটকেস, নাপিতেরটা বেশ বড়ই, উঠে পর্যন্ত চমকে চমকে উঠে একবার এটা একবার ওটা খুলে লণ্ডভণ্ড করছেন—ওরে দ্যাখ ওটা ছাড়ে নি তো, আনতো দেখি, সেটা দিয়েছে কি না।

তারই ফাঁকে ফাঁকে ড্রাইভারকে তাগাদা—"চালাও ঠিক-ক'রে। সামনে ট্রাম তো পাশ কেটে বেরিয়ে যাও---এ কি কাণ্ড!"

"জরিমানা দিবে বাবু?"

"জরিমানাই বা দিতে হবে কেন? আর ড্রাইভার দেখি নি; না আর ট্যাক্সি চড়ি নি? ক'টা বাজল বিট্‌ঠল? ঠিক করে দেখে বলো।"

ছেলেটি হাত উল্টে গণনা করছে, হঠাৎ চমকে উঠলেন—"তোমার রূপোর জাঁতি। জাঁতিটা কোথায় ফেললে? ঐ নাও, একটা অনর্থ হবেই।"

"আপনি তো স্যুটকেসে রেখে দিতে বললেন, হারিয়ে যাবে বলে।"

"বলি নি আমি।"

"বললেন তো।" নরম হয়েই বলল ছেলেটি। বেশ সুবোধ সুশীল গোছের।

"বলি নি!"—চটেই উঠলেন মিত্তিরমশাই। বললেন—"দেখাও কোন স্যুটকেসে রাখতে বলেছি। আনো দেখি।"

একটা একটা করে তিনটে স্যুটকেস খুলে তন্ন তন্ন ক'রে খোঁজা হোল, জাঁতি নেই। মিত্তির-মশাই গা এলিয়ে দিলেন পিঠের গদিতে। হাল ছেড়ে দিয়ে বললেন—"জানি একটা কিছু হবে।"

আমি রাস্তার একঘেয়েমিটা ভাঙবার জন্যেই মাঝে মাঝে ঘুরে দেখছিলাম, বললাম—"তখন যেন মনে হোল আপনি একটা স্যুটকেস থেকে বের করে পকেটে কি রাখলেন।"

মিত্তিরমশাই ক্লান্তভাবে গদিতে এলিয়েই এমনভাবে আমার পানে চাইলেন যেন এর মধ্যে আমার প্রবেশ ক'রে জটিলতা বৃদ্ধি করা তাঁর মোটেই রুচিকর নয়। স্থূল শরীর, একটা---চিনে-কোট পরা। মিনিটখানেক সামনেই চেয়ে থেকে কি মনে হতে দুহাতে ওপর থেকে পকেট-গুলো চেপে চেপে ভেতরের পকেট থেকে জাঁতিটা বের করলেন। একবার দেখে নিয়েই ও সম্বন্ধে আর একটিও কথা না বলে ব্যস্তভাবে গলা বাড়িয়ে প্রশ্ন করলেন—কোথায় এল মোটর তোমার ড্রাইভার—? একি, এখনও যে চিৎপুর পেরোও নি মনে হচ্ছে। মজালে দেখছি তুমি আজ।"

"কলকাতার হ্যারিসেন রোড আছে বাবু, ইয়াদ রাখতে হোবে।"

মিত্তিরমশাই একেবারে ক্ষেপে উঠলেন—"আমার ছেলের বিয়ে, আটটা সাঁয়ত্রিশ থেকে লগ্ন, দশটা সাতান্নয় শেষ। ট্রেন ধরতে হবে—শ্রাবণ মাসে এই শেষ দিন—এরপরেই ভাদ্দোর, আশ্বিন, কার্তিক গিয়ে—একেবারে অঘাণের সেই সাতাশে—আর তুমি কি না আমায় হ্যারিসন রোড দেখাচ্ছ!---দেখছেন তো?—কাকে যেন বলছি।"

শেষের সাক্ষী মানাটুকু আমাকেই। এরকম বিরক্ত করলে যা অবশ্যম্ভাবী তার কথাটাই বলতে হোল—"এই ভিড়ে তাড়াহুড়ো ক'রে শেষে একটা এ্যাক্‌সিডেণ্ট করে বসবে?"

চটে উঠলেন আমার দিকে চেয়ে—

"আপনিও তো বেশ, বাঙালী হয়ে ওর সঙ্গে একজোট হয়ে গেলেন! আর এই যে বিয়েটাই পণ্ড হ'তে চলেছে—চার মাসের মধ্যে আর দিন নেই, এটা তাহলে আপনার মতে আর এক্‌সিডেণ্ট নয়? বাঃ, বেছে বেছে খুব লোককে সঙ্গী করেছি তো! কোথায় একটু বুঝিয়ে বলবেন—বসেও রয়েছেন সামনে, না, আরও ওরই সঙ্গে সুর মিলিয়ে যাচ্ছেন!---ওকি, একেবারে যে থেমে গেলে।"

"লাল সিগন্যাল নজর না আসছে?"—নির্বিকারভাবেই প্রশ্ন করল ড্রাইভার।

চিৎপুরের চৌমাথায় অটোমেটিক সিগন্যাল। মিত্তিরমশাই ওর প্রশ্নে একেবারে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন—

"না, পড়ছে না নজরে লাল সিগন্যাল—যে চোখে সর্ষেফুল দেখছে তার নজরে পারে না পড়তে। তুমি ব্যাক করো, ফিরে যাই, অন্য ব্যবস্থা দেখি। তোমায় আর ঘটা ক'রে লাল সিগন্যাল দেখাতে হবে না আমায়।"

বিরক্তিকর হয়ে উঠেছে। ড্রাইভার হলদে সিগন্যালের জন্যে নির্বিকারভাবে সামনে চেয়ে আছে, সঙ্গে সঙ্গেই ষ্টার্ট দিতে হবে তাকে, আমিই বললাম—"একবার দয়া ক'রে পেছন দিকটা দেখলেই বুঝতে পারবেন সেটা আর সম্ভব কিনা। শুধু বলে তো লাভ নেই।"

গলা বাড়িয়ে ঘুরে পেছন দিকে চেয়ে খানিকক্ষণ পর্যন্ত সেইভাবেই থেকে গেলেন মিত্তিরমশাই। আমরা ততক্ষণে পড়ে গেছি জাঁতিকলে—পেছনে গাদাখানেক ট্রাম, মোটর, বাস, রিক্সা, মোষের গাড়ি, ঠেলাগাড়ি আরও এসে পড়ে লাইনটা প্রতি সেকেণ্ডে লম্বা হয়ে যাচ্ছে। পাশে তো রয়েছেই। একইঞ্চি নড়বার জায়গা নেই।

একসময় মাথাটা টেনে নিয়ে আমার দিকেই চেয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন—"বেশ মশাই, খুব তামাশাটা করলেন যা হোক!"

"আমি কি তামাশা করতে গেলাম বলুন? বিমূঢ়ভাবে প্রশ্ন করলাম আমি। বললাম—"এতো নিত্যই হ'চ্ছে, রোজদিনকার ব্যাপার।"

"বাঃ। বাঃ! চমৎকার! রোজদিনকার ব্যাপার, অথচ দিব্যি তো খাতির ক'রে নিলেন ভুলে গাড়িতে। বলিহারি যাই মশাই---"

এরপর যে একেবারে চুপ করে গেলেন তার কারণ অবস্থাটা সম্পূর্ণ বাক্যাতীত হয়ে পড়ল। ক্লাইভ ষ্ট্রীট পর্যন্ত কোনরকমে হামাগুড়ি দিয়ে চলল গাড়িটা—সব গাড়িগুলোই—তারপর যে অবস্থাটা দাঁড়াল তাকে আর চলা বলা যায় না। দু'গজ চলে আবার দাঁড়িয়ে যায়; তারপর হয়তো গজখানেকের পর আবার পাঁচ মিনিট নট-নড়ন-চড়ন, আবার হয়তো গজ তিনেক। যান-বাহনের শব্দের সঙ্গে মানুষের কণ্ঠ মিলে একটা আরকীয় কলরোলে জায়গাটা ছেয়ে গেছে, তার মধ্যে মিত্তিরমশাই সামনের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে একেবারে নিশ্চুপ হয়ে বসে রইলেন। ক্লাইভ ষ্ট্রীট থেকে নিমে হাওড়ার পুল পর্যন্ত এই মিনিট পাঁচেকের পথে যে পুরো একটা ঘণ্টা লাগল আমাদের, তাতে মাত্র দুবার পুত্র বিট্‌ঠলকে ঠিক ক'রে ঘড়িটা দেখে সময়টা জানাতে বললেন। তাও কী সে বলল তাতে যেন কান নেই। তারপর গাড়ি পুলের ওপর উঠতে আবার গলা খুলল ঘর।

হয়তো ভেবেছিলেন বড়বাজার পেরিয়ে নানা পথে নানা দিকে ভিড়টা চারিয়ে গিয়ে একটা সুরাহা হবে, উল্টে ট্র্যাণ্ড রোডের ভিড়টা এসে পড়ে অবস্থা আরও বে-এক্তিয়ার হয়ে পড়তে একেবারে দিশেহারা হয়ে উঠলেন। আমায় উদ্দেশ করে বললেন—"মশাই শুনছেন?---আপনি তো দেখছি দিব্যি নিশ্চিন্দি হয়ে বসে আছেন।"

একটু ব্যঙ্গের টোনেই।

বললাম—"তাছাড়া উপায় কি? কিছু যখন করবার নেই। আস্ত আবার কানে যাচ্ছে---"

এবার পূজোর বাজারের লিষ্ট থেকে
আর,ই,সি'র ট্রানজিস্টার রেডিও
বাদ দিতে হ'লেও দেশের প্রতিরক্ষা
তহবিলে মুক্ত হস্তে দান করুন।

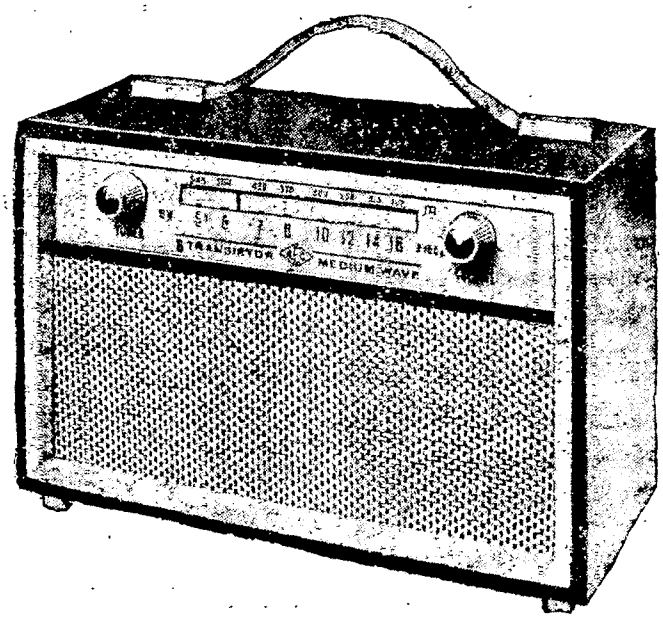

Model 6T5 Rs. 165/- (Local Tax extra)

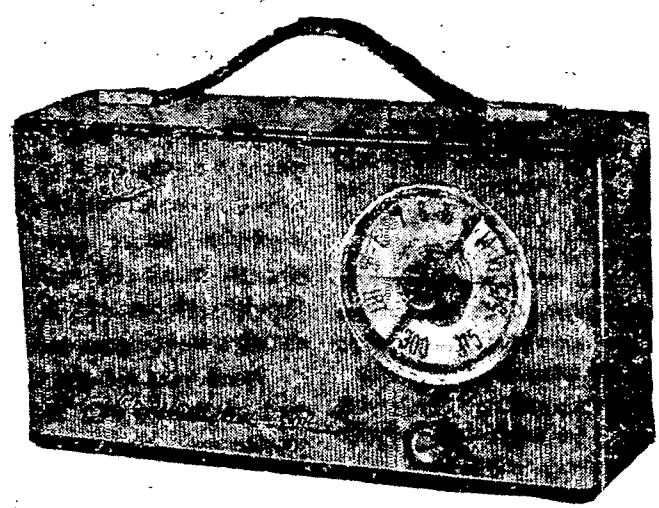

Model 6T4 Rs. 165/- (Local Tax extra)

রেডিও ইকুইপমেণ্ট কোং

কলিকাতা-১৩ ফোন: ২৩-১৭৮৮

"কা কানে যাচ্ছে আবার আপনার মশাই!!"—একেবারে সামনে ঝুঁকে পড়লেন।

বললাম—"শুনছি একটা বাস কি ক'রে একপেশে হয়ে গিয়ে ট্রাফিক একেবারে আটকে দিয়েছে।"

"তাহলে!! আমার উপায় কি হবে ভেবে দেখেছেন?---বিট্‌ঠল কটা বেজেছে, ঠিক করে দেখে বলো।"

"আটটা তিপ্পান্ন"—হাত উলটে নাকে চশমা ঠিক করে নিয়ে বলল বিট্‌ঠল।

"আ-টটা তিপ্পান্ন! ঐ নিন, লগ্ন আরম্ভ হয়ে গেছে ওদিকে, সে তো ট্র্যাফিক জ্যামের জন্যে আটকে থাকবে না।---ও মশাই!"

বাক্যালাপ বৃথা জেনে আমি আবার ঘুরে বসেছিলাম, ঘাড় ফিরিয়ে প্রশ্ন করলাম—"আমায় বলছেন?"

"আর কাকে বলব?---অন্য লগ্ন আর আছে পুরুত মশাই? খুঁজে পেতে দেখলে?—"

"চার মাস তেরো দিনের মধ্যে আর কিছু নেই, এক লহমাও নয়।"—গম্ভীরভাবে উত্তর করলেন পুরুতমশাই।

"ঐ শুনুন!"—আমার দিকে চেয়ে বললেন মিত্তিরমশাই।

—"তাহলে তো এ ব্যাটার বিয়ে শিকেয় তোলা রইল—জন্মের মতন। সব কথা বলিনি বোধহয় আপনাকে?"

বললাম—"ফুরসৎ কোথায় আপনার? ড্রাইভার আর স্যুটকেসগুলো নিয়েই তো পড়ে রইলেন।" এবার আমিই একটু ব্যঙ্গের সুর ধরলাম।

রাজ জ্যোতিষী

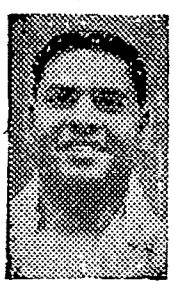

বিশ্ববিখ্যাত শ্রেষ্ঠ জ্যোতিবিদ, হস্তরেখা বিশারদ ও তান্ত্রিক, গভর্ণমেণ্টের বহু উপাধি প্রাপ্ত **রাজ-জ্যোতিষী মহোপধ্যায় পণ্ডিত ডঃ শ্রীহরিশচন্দ্র শাস্ত্রী** যোগবলে ও তান্ত্রিক ক্রিয়া এবং শান্তি-স্বস্ত্যয়নাদি দ্বারা কোপিত গ্রহের প্রতিকার এবং জটিল মামলা-মোকর্দ্দমায় নিশ্চিত জয়লাভ করাইতে অনন্যসাধারণ। তিনি প্রশ্ন গণনায় ও ফরকোষ্ঠি নির্মাণে এবং নষ্টকোষ্ঠি উদ্ধারে অদ্বিতীয়।

সত্য ফলপ্রদ কয়েকটি জাগ্রত কবচ

শান্তি কবচ ঃ—পরীক্ষায় পাশ, মানসিক ও শারীরিক ক্লেশ, অকাল-মৃত্যু প্রভৃতি সর্বদুর্গতি-নাশক, সাধারণ—৫৲, বিশেষ—২০৲।

বগলা কবচ ঃ—মামলায় জয়লাভ, ব্যবসায় শ্রীবৃদ্ধি ও সর্বকার্যে যশস্বী হয়। সাধারণ—১২৲। বিশেষ—৪৫৲।

পণ্ডিত মহাশয়ের লিখিত বই পড়ুন

জুয়েল অব পামিস্ট্রী (ইংরাজী) মূল্য ৭৲ **সামুদ্রিক রত্ন** (বাংলা) পরিবর্দ্ধিত ও পরিমার্জিত ২য় সংস্করণ ৬৲।

হাউস অব এষ্ট্রোলজি (ফোন: ৪৭-৪৬৯৩) ৪৫এ, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড, কলিকাতা—২৬

● ……এবং সত্যি তাতে যেন বিয়ের কনেই।

ভদ্রলোক আমার মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে একটু চেয়ে রইলেন। একবার দু'দিকে ঝুঁকে মোটরের দুটো পাশ দেখে নিলেন, বোধহয় নেমে হেঁটে বেরিয়ে যাওয়ার কথা ভেবে। কোন উপায়ই নেই দেখে ব্যাকুল মিনতির সুরে বললেন,—"তাহলে শুনুন দয়া ক'রে। বের করুন একটা উপায়—"

যা বলে গেলেন তার একটা সংক্ষিপ্তসারই দেওয়া চলে এখানে:

যাঁরা জীবন সামরিক বিভাগে কমিসেরিয়েটে কাজ করে বছরখানেক হোল বদলি হয়ে কলকাতায় এসে রয়েছেন। আর বছর তিনেক রয়েছে চাকরি। আশা করেছিলেন এখান থেকেই রিটায়ার করবেন, তাই মেছুয়াবাজারে একটা বাড়িও কিনে নিয়ে গোছগাছ করে নিচ্ছিলেন, হঠাৎ হুকুম বেরিয়েছে ইম্‌ফলে বদলি। তার মানে, চাকরির শেষ কটা বছর ঐখানেই।

এইটি বড় ছেলে। চব্বিশ বছর বয়স হোল। মাসি থেকে ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ ক'রে কলকাতাতে একটা ভালো ইঞ্জিনীয়ারিং ফার্মে কাজ পেয়েছে। জন্মায় দক্ষিণ ভারতের পুণায়। বছর বারো পর্যন্ত ওই অঞ্চলেই কাটে, বিট্‌ঠলের ডাক নাম যে পড়ে গেছে সেটা আর ঘোচে নি, বাংলার মুখ তো এই প্রথম দেখা। ভালো নাম পায়ালাল।

ইম্‌ফলে গেলে আর এখন রিটায়ার করবার আগে ফেরবার আশা নেই। বিট্‌ঠলের বিয়েটা দিয়ে দিতে চান। মেয়েটির বাপ ওঁর কমিসেরিয়েটের বন্ধু বাসুদেব ঘোষ। বাড়ি উত্তরপাড়ায়। সেখানেই চলেছেন। বাসুদেব দ'বছর হোল রিটায়ার করেছেন।

প্রথমেই যা চোখে ঠেকল তার কথাই বললাম আমি—"কিন্তু বরযাত্রী তো দেখছি না।"

"সে অনেক কথা মশাই, বলতে গেলে আর রাত ফুরুবে না। এখন ছেলেটাকে কি ক'রে ঝুলিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্দি হয়ে যেতে পারি তার একটা বুদ্ধি দিন না দয়া করে।"

যে-ধরণের মানুষ, অনেক কথা থাকা বিচিত্র নয়, আমি ওদিকটা বাদ দিয়েই বললাম—"কি বুদ্ধি দিই বলুন না। মেয়েকে হাতের কাছে না পেলে তো বিয়ে হবে না।"

"উঃ!" অধৈর্যভাবে শব্দ ক'রে উঠলেন মিত্তিরমশাই। হাত দুটো ঝেড়ে দিয়ে বললেন—"এত বড় কলকাতা সহর একটা বিয়ের কনে পাওয়ার উপায় নেই। কী দুর্দৈব!"

ক্ষেপে গেল নাকি মানুষটা! বাক্যব্যয় বৃথা জেনেও বললাম—"ধরুন যদি যেতই ইম্‌ফল। সেখানে সে কনেটির কি হবে তাহলে? তাঁরাও তো ঠিকঠাক হয়ে বসে আছেন।"

ভদ্রলোক আমার দিকে চোখ পাকিয়ে সোজা হয়ে বসলেন। বললেন—"তাহলে নেহাৎ না বলিয়ে ছাড়লেন না মশাই। তার উপায় হয়েই যাবে।"

বেশ উঁচু গলাতেই। আমিও তর্কের স্বরে বললাম—"উপায়টা কি বলুনই না, শুনি!"

"পূর্বরাগ বোঝেন, লভ—আজকালকার ছেলে-মেয়েদের মধ্যে?" —বেশ গলা ছেড়ে দিয়েছেন।—"তিরিশ বছর পরে দেশে ফিরে এসে দেখি, কি পূর্বরাগের ঘটারে বাবা! ইস্কুলে পূর্বরাগ, কলেজে পূর্বরাগ, অফিসে পূর্বরাগ, ট্রামে পূর্বরাগ, বাসে পূর্বরাগ, উঠতে পূর্বরাগ, বসতে পূর্বরাগ—পূর্বরাগে পূর্বরাগে সারা দেশটা মথুরা-বৃন্দাবন করে তুলেছে। যদুর মেয়ে, সে নিজেরই মেয়ে, বলতে জিভে আটকায়, সে বেটিকেও এই ব্যাধিতে ধরেছে। পাড়ার ছেলে, এখনো ডাক্তারি পড়ছেই, শেষ হয়নি, বাসু গোবেচারি মানুষ, আমি বললাম—খবরদার এ-ব্যাপারে আস্কারা দিও না। এদিকে এ-ব্যাটাই বা বছরখানেকে কি কাণ্ড ক'রে বসে আছে বা আমি মরলে কি করবে কে জানে মশাই? শেষে দুই বন্ধুতে পরামর্শ ক'রে এই একরকম চুপি চুপিই বর নিয়ে গিয়ে---"

ঠিক এই সময় সেই অদ্ভুত যোগাযোগটা

হয়ে গেল, গোড়াতেই 'অবিশ্যাস্য' বলে সেটার কথা উল্লেখ করেছি। মিত্তিরমশাই ডানদিকে চেয়ে একেবারে নির্বাক হ'য়ে গেলেন।

হাওড়াগামী যানবাহনগুলো আবদ্ধ হয়ে চারটি লাইনে রয়েছে দাঁড়িয়ে। আমাদের ডানদিকে একটি লাইন, বাঁদিকে দুটি। সবশেষে ফুটপাতে জনস্রোত। গাড়ি থেকে নেমে সেখানে কারুর পৌঁছবার উপায় তো নেই-ই, অধিকন্তু বাস, মোটর, অশ্ব, গো-যান, রিক্সার দুর্ভেদ্য প্রাচীরের ওদিকে ঠিকমতো নজরেও পড়ে না।

আমাদের গাড়িটার বাঁ দিকে একটি বাস, ডানদিকে একটি প্রাইভেট মোটরগাড়ি। মিত্তিরমশাইয়ের বক্তৃতা চলছে, এই সময় ডানদিকের এই গাড়িটি রাস্তা পেয়ে গজ দেড়েক এগিয়ে যেতে, আমাদেরই মতো একটি ট্যাক্সি পাশে এসে দাঁড়াল। এবং সত্যিই তাতে একটি যেন বিয়ের কনেই। আমারও দৃষ্টিটা গিয়ে একেবারে নিশ্চল হয়ে গেল। অল্প আলো যে গিয়ে পড়েছে তাতে, সমস্তটুকু ঠিক মতো দেখতে না পাওয়া গেলেও একটি গোলাপী রঙের ভলের (veil) নীচে সাদা জরি দিয়ে বাঁধা খোঁপাটুক বেশ স্পষ্ট এবং তা থেকে সমস্তটুকু আন্দাজ ক'রে নেওয়া যায়। বয়স আঠার-উনিশ হওয়া অসম্ভব নয়। পাশে এদিকের দরজার ধারে একটি ভদ্রলোক, প্রায় মিত্তির মশাইয়ের বয়সী এবং বসেও আছেন মিত্তিরমশাইয়ের মতো থমথমে মুখ ক'রে। ওদিকেও অপেক্ষাকৃত কম বয়সের একজন। মেয়েটি মাঝখানে ; সামনের দিকে চেয়ে চুপ করে ব'সে আছে। অবিশ্যাস্য যোগাযোগের আর একটি ব্যাপার, মেয়েটির কোলে একটি গোড়ের মালা মাঝে মাঝে সাদা রাংতার স্তবকগুলো চিকচিক করছে। পাশে রজনীগন্ধার একটা বড় গুচ্ছ।

মিত্তিরমশাই মুখটা আমার দিকে এগিয়ে নিয়ে আসতে আমিও একটু ঝুঁকে পড়লাম; চাপা গলায় বললেন—"মশাই, কী কাণ্ড বলুন তো!"

ভাবলাম অবশ্য, সত্যিই মানুষটা পাগল হয়ে গেল নাকি, কিন্তু অস্বীকার করব না যোগাযোগের আকস্মিকতায় আমার মাথাটাও যেন গুলিয়ে আসছে। একটা নিতান্তই সুদূর সম্ভাবনা—শত যোজনেরও ওদিকে—কিন্তু দোষ কি একটু ঠুকরে দেখতে?—অন্তত এই দুর্ভোগের মধ্যে একটু অবসর বিনোদনের জন্যও।

ওঁর কথায় একটু তাচ্ছিল্যভাবে হাসলাম আগে, তারপর হাতটা চেপে ধরতে বললাম—"দাঁড়ান তাহ'লে, তাড়াহুড়োর কাজ নয়।---অবশ্যই যা ভাবছেন তা নয় নিশ্চয়,---"

যা অটল গাম্ভীর্য, বার দুই কেশে নিয়ে একটু সাহস সঞ্চয় করে নিতে হোল, তারপর একটু ঘাড়টা এগিয়ে নিয়ে গিয়ে বললাম—"আপনাদেরও আমাদের মতন দুর্ভোগ দেখছি। মেয়েকে বোধ হয়----"

"একে দুর্ভোগ বলেন আপনি!"—ভদ্রলোক ফেটে পড়বার জন্য যেন একটা সুযোগই খুঁজছিলেন, গলা খুলে দিলেন একেবারে---"অভিধানে এর ভাষা নেই। তোরা পারবি না তো গদি ছেড়ে নেমে আয় না—অন্ন নেই, বস্ত্র নেই—কোন্ দিকটা দেখবেন?—দেখি নি কলকত্তা মশাই?—এই তার চেহারা? —একটু নড়েচড়ে বেড়াবে লোকে তারও উপায় নেই—কি নিগ্রহ বলুন দিকি? এই ঘণ্টার পর ঘণ্টা—আদ্ধেক কলকাতার লোক জমে গেছে—সেখানে তাদের কথা ভাবুন তো—হা-পিত্যেশ ক'রে ব'সে আছে—ফুল, সভাপতির মালা, সব আমাদের কাছে—নাচ, তার আসলটা—গিয়ে পড়ব তবে মান থাকবে তাদের---"

"সভার ব্যাপার?"—প্রশ্ন করলাম আমি। বললাম—"তার সময় নিশ্চয় উৎরে গিয়ে থাকবে। ক'টায় আরম্ভ ছিল?"

"উৎরে তো গেছেই, সময় তো আর ট্যাক্সি-বাসের মতন দাঁড়িয়ে থাকবে না। আরম্ভ তারা যাহোক তা'হোক করে করেই দিয়েছে। সাহিত্যসভা। প্রধান অতিথি, সভাপতি—এঁদের ভাষণগুলো আগেই প্রোগ্রামে ফেলে দিয়ে হাঙ্গাম মিটিয়ে রাখতে বলেছিলাম—পরে কে আর শোনবার জন্যে বসে থাকবে? শেষের দিকে নাচ-গান। রীণারও দু'টো তার মধ্যে, একটা বড় আবৃত্তি—'বলাকা'—দু'মাস ধরে রিহার্সেল দিচ্ছে---"

"আপনারই মেয়ে?"

"নৈলে এ-দুর্ভোগ মাথায় ক'রে বসে থাকি?"

আমি এদিকে মনে মনে একটা প্ল্যান কষে যাচ্ছিলাম শোনার সঙ্গে সঙ্গে, বললাম—"দুর্ভোগ বৈকি। আমাদেরই মতন অবস্থা দেখছি।"

"আপনাদেরও সভা?"

"তার চেয়েও গুরুতর। ছেলের বিয়ে দিতে যাচ্ছি।"----

"আচ্ছা, এক অবস্থার কথায় মনে পড়ে গেল—কোথায় যেন দেখেছি আপনাকে এর আগে। নামটা একবার বলতে পারেন দয়া করে?"

"বটকৃষ্ণ বসু।"

"পেড়ে ফেলুন আসল কথাটা মশাই!"—মিত্তিরমশাই হাতে একটা চিমটি কেটে অধৈর্যভাবে ফিস্‌ফিস্ ক'রে বললেন। মুখটা একেবারে আমার মুখের কাছে নিয়ে এসেছেন। চাপাগলাতেই বললাম—"উতলা হলে চলে? বসু-মিত্তির, গোত্রের মিলটা তো হোল।"

না—

উনি আমার হাতটা চেপে বসে রইলেন। একটু একটু কাঁপছেন উত্তেজনায়।

ওদিকে ঝুঁকেই আছি। মনে করার ভঙ্গিতে চোখদু'টো কপালে তুলে কতকটা স্বগতভাবেই—(যদিও সজোরেই) আওড়ালাম—"বটকৃষ্ণ বসু—বটকৃষ্ণ বসু----"

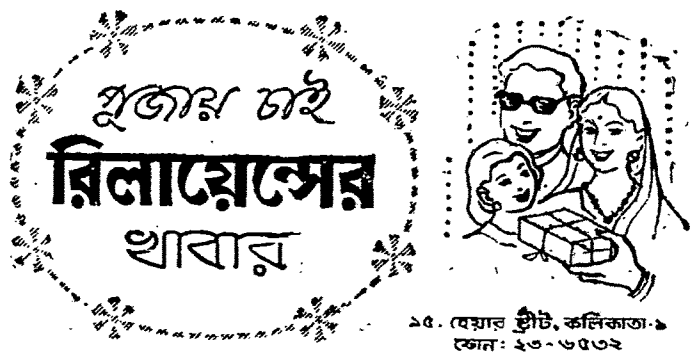

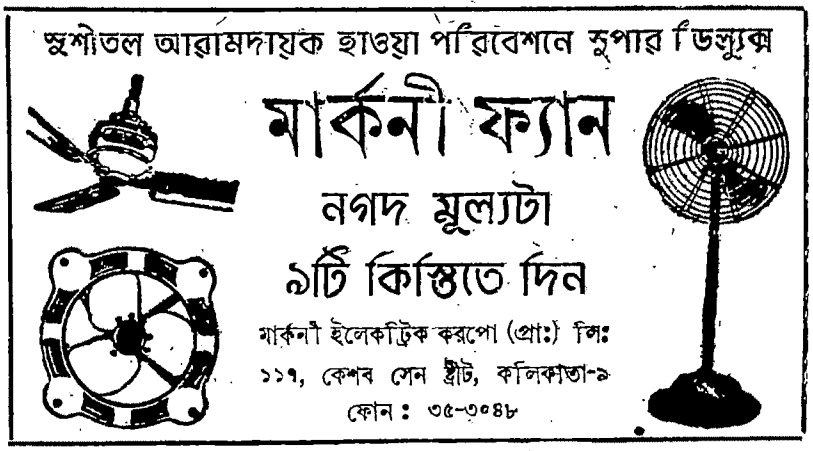

তারপর ওঁর দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলাম—"আচ্ছা, শিবপুরে আপনাকে কোথাও দেখেছি কি না বলুন তো—কোন সভা-সমিতিতে?"

কলকাতার লোক, কখনও না কখনও আসবেই এপারে।

"শিবপুরে নয়, বাজেশিবপুরে।" বললেন উনি।

নাপিতকে বললাম—"তুমি এখানটায় এসে ঘসো তো গুণধর, ; আলাপ করি একটু। ভেতরে ভেতরেই এসো, নামবার তো জো নেই।"

জায়গা বদল করতে করতেই ওঁকে উদ্দেশ করে বললাম—"শিবপুর বাজেশিবপুর তো আমরা আলাদা ধরি না।"

ধরুট-পঞ্চাননতলা থেকে নিয়ে গঙ্গার ওপারে যে-কোন জায়গা সম্বন্ধে ঐ কথাই বলতাম। প্রশ্ন করলাম—"কোনও সভা-সমিতিতে নিশ্চয়?"

"ছেলে দেখতে, রীণার জন্যেই। এই তো মাস দু'একও হয় নি।"

"বললাম না?"—মিত্তিরমশাইয়ের দিকে চেয়ে টীকা করলাম আমি। উনি ইতিমধ্যে পুরুতমশাইয়ের সঙ্গে জায়গা-বদল করে নিয়ে পাশে বসেছেন। বললাম—"সাজানো ঘর, একঘর মানুষ---"

"সভাই তো এক রকম।" সায় দিলেন মিত্তির মশাই। একেবারে কাছাকাছি; আর কথা কয়ে বলবার উপায় নেই, বুড়ো আঙুল দিয়ে পাঁজরটায় খোঁচা দিয়ে তাগাদা দিলেন।

"কার বাড়িতে বলুন তো"—বসুমশাইকেই প্রশ্ন করলাম। বললাম—"একটু যেন গোলমাল করে ফেলছি।"

"নবীন চৌধুরীর বাড়ি।"

"হুঁয়ে গেল ঠিক?"

"কোথায় মশাই? কেউ বলছে এত লেখাপড়া জানা আমাদের চলবে না, কেউ আবার এম-এ'র কমে রাজি নয়। কোথাও হয়তো খাঁই মেটাতে পারছি না—এমন ভাঙা রাশ মেয়েটার! এখানে আবার—যে দোষ কেউ ধরেনি আজ পর্যন্ত----"

"কী দোষটা ধরেছে?"—আমরা দু'জনেই ঝুঁকে পড়লাম। বললেন—"ছেলে নিজে দেখতে এল। গিয়ে বলেছে নাকি একটু খাঁদা।"

অল্প একটু চাপাই নাকটা। কিন্তু, যেমন হয়, তাতে ঘোরাল বেড়ের মুখটি যেন আরও মানানসই-ই করে দিয়েছে। আমি মিত্তিরমশাইকেই বললাম—"এই মেয়েকে খাঁদা বলে মিত্তিরমশাই! দেখুন তো। যদি আপনার বিটর সঙ্গেই কথা হোত (নামটা একটু মিষ্টি করেই বললাম) ছেড়ে দিতেন?" ওঁর তখন এমন অবস্থা মেয়ের নাক একেবারেই না থাকলেও নিয়ে নেন। অনুভব করছি উদ্বেগে সমস্ত শরীরটাই কাঁপছে। বললেন—"মা আমার তো পরী।"

"আছে নাকি ওঁর ছেলে?"—একটু অবহিত হয়েই প্রশ্ন করলেন বসুমশাই একরকম।

"ঐ তো পাশেই বসে। বর বেশেই।"

"বলছিলাম না?—আপনার চেয়ে আমাদের নিগ্রহ ঢের বেশি। বিয়ে করতে বেরিয়ে আটকে গেছে, যেতে হবে সেই উত্তরপাড়া। এদিকে লগ্ন শুরু হয় গেছে, শেষ দশটা সাতায়। তার মানে এ-বিয়ে হোল না আর কি।"

"কেন?"—বেশ আগ্রহের স্বরেই প্রশ্ন করলেন ভদ্রলোক, বিট্‌ঠলকে বর কয়েক দেখেও নিয়েছেন। বললাম—"সে অনেক কথা। এমন কিছু আছে যার জন্যে তাঁরাও পাড়াতেই দিয়ে দেবে বিয়ে। এদিকে ইনিও আর অপেক্ষা করতে পারছেন না।"

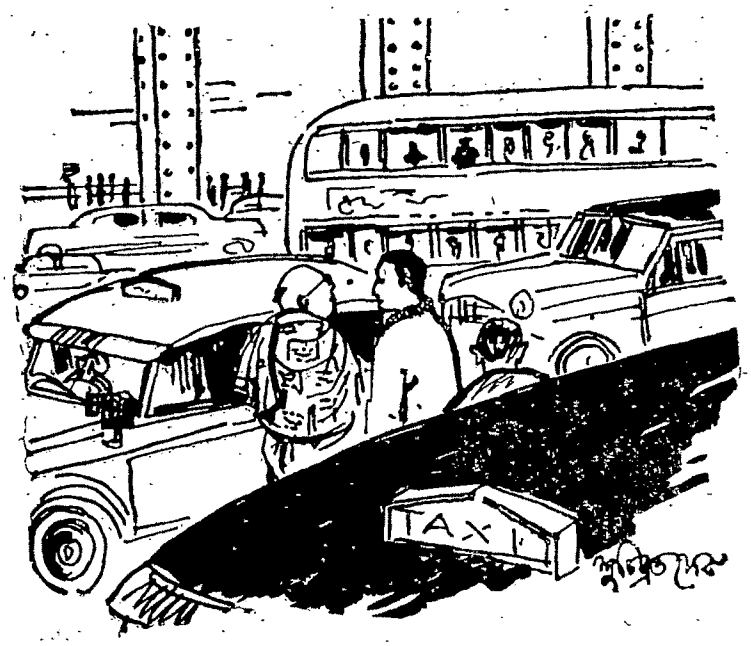

·····বর-পুরুত গিয়ে কনের গাড়ীতে উঠলো

"নিন না আমার মেয়েটিকে দয়া ক'রে।" ওঁরও গলা কেঁপে গেছে। প্রশ্ন করলেন—"কি ক'রে ওঁর ছেলে?"

বললাম—"সেদিক দিয়ে হীরের টুকরো। চেহারা দেখছেনই, এদিকে ইনজিনীয়ার, কলকাতাতেই একটা বড় ফার্মে কাজ করছে। মেছুয়াবাজারে মিত্তিরমশাইয়ের নিজের বাড়িও রয়েছে। চান মেয়ের বিয়ে দিতে আপনি?"

"আজ হয় তো কাল নয় মশাই। আসুন না একদিন আমার বাড়িতে—জোড়াসাঁকোয়----"

"ঐখানেই তো আটকাচ্ছে। তাই তো ভাবছি, এমন যোগাযোগ, অথচ যেন বিধাতার ইচ্ছে নয়। আপনি বলছেন—আজ হয় তো কাল নয়, ওঁর আবার এখুনি না হলে কোন উপায় নেই। নিজে মিলিটারিতে কাজ করেন, ছেলের বিয়ে দিয়ে পরশু চলে যাবেন সেই কোন্ ইমফল, না কালিমপঙে। আর তিন বছর এ-মুখো হতে পারবেন না, তাই---"

"কিন্তু এখুনি কি ক'রে হবে? এখানে এই পুলের ওপর, এই অবস্থায়।---"

---সম্ভব,-অসম্ভবের মাঝখানে প'ড়ে উদ্বেগ-আশা-নিরাশায় ভদ্রলোক যেন কি রকম হয়ে গেছেন, কী যে বলবেন, কী ভাবে বলবেন ঠাহর করে উঠতে পারছেন না। শেষে আমতা-আমতা ক'রে বললেন—"অন্তত দেনা-পাওনার কথা ঠিক করতে---"

অর্থাৎ আমাদেরই যা স্বার্থ, কতকটা তোষামোদেরই ভাব কন্যাকর্তার।

আমি হো-হো করে হেসে উঠে এক বিয়ের আসরই জমিয়ে তুললাম, বললাম—"দেনা-ছেলে, পাওনা-মেয়ে, এর অধিক কথা তো আমরা জানি না মশাই। —তারপর এখনই হওয়ার কথা—পাত্র-পাত্রী, পুরুত-নাপিত, টোপর-ফুল-মালা, সব মজুত। লগ্নও রয়েছে এখনও। এদিকে গঙ্গার পুল, মা নীচে দিয়ে বয়ে যাচ্ছেন—এরচেয়ে পবিত্র বিয়ের আসরও তো---"

হ্যাঁ, হয়ে যায়!! লাগিয়ে দিন !! উলু-উলু উল !!—শুভস্য শীঘ্রম !!---"

হ্যা, ওদিককার কথাটা বলাই হয় নি। নানা রকম শব্দের সে একটা মিশ্র কলরোল উঠছিল, কখনও বেশি, কখনও কম, সেটার সঙ্গে পাল্লা দিয়েই আমাদের কথাবার্তা চলছিল এবং তাতে পাশেই যে বাস দাঁড়িয়ে আছে তার এদিকের আরোহীরা আকৃষ্ট হয়ে পড়েছে। ব্যাপারটা যতই পেকে আসতে লাগল তাদের কৌতুক ততই জমে এসে নানারকম মন্তব্য ভেসে আসছিল মাঝে মাঝে, অবশ্য সবই উদ্দীপক আর উৎসাহজনক। আমার কথা শেষ হয়ে আসার সঙ্গে একেবারে বিবাহ-প্রাঙ্গণের কলরোলটা উঠে আর সব শব্দই দিল চেপে।

এবং তারই মধ্যে—বিশ্বাস করুন বা নাই করুন—দুটো গাড়ির দরজা একটু ক'রে ফাঁক হ'লে বর-পুরুত গিয়ে কনের গাড়িতে উঠল।

অনুবাদ করবেন না

এক

'I go up and we go down',—পণ্ডিতমশাই অনুবাদ করে দিচ্ছেন ক্লাসে। আই মানে চক্ষু, গো মানে গরু, অপ্ মানে জল, এণ্ড হচ্ছে অণ্ড অর্থাৎ ডিম, উই মানে উইপোকা, গো ডাউন মানে গুদাম। টানা মানে হলো,—গুদামের ডিমেতে উইপোকা লেগেছে দেখে গরুর চোখ দিয়ে জল ঝরছে। এ অনুবাদ যদি বানানো গপ্‌পো বলে মনে হয় তাহলে জনান্তিকে বলি, রবীন্দ্রনাথের অরূপ-রতন-এর অনুবাদ হয়েছিলো টমসনের হাতে Ugly Gem। আমি চিনি গো চিনি তোমারে ওগো হে বিদেশিনী,—ইংরিজি ভাষায় দাঁড়ালো : Sugar, you are foreigner; I know। রবীন্দ্রনাথ নিজেও, 'Horse is a noble animal'-এর বাংলা, 'অশ্ব অতি মহৎ জন্তু, নিয়ে ব্যংগ করেছেন কিন্তু বলে জাননি, ওর যথার্থ বাংলা কি হবে।

মূল রচনাকে ইংরিজিতে যদি ওরিজিন্যাল বলি, অনুবাদ তাহলে এবরিজিন্যাল ব্যাপার। মূলের সব কথার মানে অনুবাদে বজায় রেখেও, আসল লেখাকে সমূলে বাদ দেবার নামই অনুবাদ। ওই জন্যে বাঙালী লেখক বেশির ভাগই ইংরিজি থেকে না বলে নিয়েছে কিন্তু অনুবাদ বলে স্বীকার করেনি। বঙ্গ-সাহিত্য-সমুদ্রে তাতেই কল্লোল উঠেছে; কালি ও কলম হয়েছে ধন্য। ডিটেকটিভ গপ্‌পো বলুন আর ডিফেকটিভ গল্প, বৈজ্ঞানিক উপন্যাস থেকে হাংরি ডিজেনারেশান পর্যন্ত ইংরেজরা অন্য ভাষা থেকে অনুবাদ করেছে আর বাঙালীরা সে গুলিকে একের পর এক শিকার চরবার সময় নাম দিয়েছে: সনির্বাচিত রচনা।

ওকথা থাক। অনুবাদের কথায় আসা যাক। রবীন্দ্রনাথ অথবা সেক্সপীয়ার, কে বড়, এই হাস্যকর বাদানুবাদও চলবে, কিন্তু ওঁদের কারুর লেখারই অট্টহাস্যকর অনুবাদ চলবে না। জানি। জানি যে, রবীন্দ্রনাথের নিজের করা অনুবাদের কথা উঠবে, উঠবে নোবেল প্রাইজ পাবার কথা। সেকথা উঠবার আগেই বলব, নোবেল প্রাইজপ্রাপ্ত রবীন্দ্রনাথের In one Salutation to Thee, আর ব্যথার প্রলাপে মোর গোলাপে গোলাপে জাগে বাণী-র রবীন্দ্রনাথ কী এক? ওরা তো রবীন্দ্রনাথকে জানলো Religeon of Man-এর প্রবক্তা, মিষ্টিসিজমের আধুনিক প্রবর্তক বলে। রবীন্দ্রনাথ কি তাই?

মহৎ কাব্য কি, এ-সম্পর্কে নানা মুনির নানা মত। তা নিয়ে বিবাদ কোনও কালে শেষ হবার নয় জানি। আর তার সঙ্গেই এও জানি যে, তাই হচ্ছে সত্যিকারের মহৎ সাহিত্য যা অনুবাদের অনায়ত্ত।

মাইকেল দুঃখ করেছেন, হে বংগভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন, তা সবে অবোধ আমি অবহেলা করি—ইত্যাদি। আন্তরিক হলেও এ-দুঃখ অলীক। ক্যাপটিভ লেডির কবি মেঘনাদ-বধ লিখে বাংলা সাহিত্যের যত উপকার করেছেন, তার চেয়ে ক্ষতি করেছেন নিজের অনেক বেশী। মাইকেল ইংরিজিতে মেঘনাদ-বধ লিখলে জগতের শ্রেষ্ঠ ক্লাসিক কবিদের একজন হতেন। মাইকেল চিন্তা করেছেন ইংরিজিতে, এক্সপ্রেসও ইংরিজিতে যদি করতেন তাহলে সে এক্সপ্রেসানে এমন কিছু থাকতো যা বাংলায় বলা যায় না।

বাংলার দুই দত্ত-কবি, সর্বজ্যেষ্ঠ মাইকেল মধুসূদন দত্ত; সর্বকনিষ্ঠ সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। সুধীন্দ্রনাথের লেখা বাংলা পড়েও বাংলা বলে বোঝা শক্ত। অনুবাদ একান্ত করতে হলে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের বাংলা কবিতারই অনুবাদ করা উচিত,—আমি বলছি, বংগানুবাদ।

নীলকণ্ঠ

দুই

ওমর খয়ামের অনুবাদ করেছেন ফিট্‌জেরাল্ড; মহাভারতের,—কাশীরাম; রামায়ণের বাংলা করেছেন কৃত্তিবাস, হিন্দি করেছেন তুলসীদাস; বলা বাহুল্য ওর একটিও অনুবাদ-কর্ম নয়।

অনুবাদ করতে যানও নি কেউ। মূলকে আত্মসাৎ করে যার জন্ম দিয়েছেন ওই চার জন, তা মৌলিক রচনা। সাহিত্যে অপহরণ পাপ; আত্মসাৎ নয়। ওমর ফিটজেরাল্ডকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন, কাশীরাম এবং কৃত্তিবাসের মহাভারত এবং রামায়ণ বাঙালীর কলমে বাংলার কাব্য হয়ে উঠেছে। তুলসীদাস কেবল কবি নন, সাধক। রামায়ণ তাঁর কাছে কেবল কাব্য নয়; নিজের জীবন দিয়ে ও কাব্যের অনুবাদ করে তাকে জীবনকাব্য করে তুলেছেন তিনি।

আমরা মুখে বলি, ওমরের রুবাই পড়ছি, আসলে পড়ি ফিটজেরাল্ডের ভার্স। আমরা জানিই না যে, ওমরের মুখে ইংরেজিতে এমন অনেক বক্তব্যে মুখর হয়েছেন ফিটজেরাল্ড যা ওমরও বলেননি এবং বলতে পারেন না। মহাভারতে দুধের অভাবে অশ্বত্থামাকে পিটুলি-গোলা জল খাইয়েছিলেন দ্রোণ। পরাধীন এবং স্বাধীন ভারতে আজও ওমর খয়ামের ভাষা না জানার কারণে ফিটজেরাল্ডের তর্জমায় আমরা ওমরের রুবাই-এর বদলে যা পাচ্ছি তাকে বলে জবাই।

ইংরেজদের বলা হয়, 'a nation of shopkeepers'; কথাটা সাহিত্যের বেলাতেও সত্য। দোকানদারি মনোবৃত্তির ফলে জগতের যে কোনও স্বীকৃত ভাষায় বই বেরুনো মাত্র তাকে অনুবাদের হাতিয়ারে শিকার করেছে ইংরেজ। তাদের অনুবাদ-পটুতা অনস্বীকার্য। কিন্তু মূল ভাষা না জানার জন্যেই ইংরিজিতে বিশ্ব-সাহিত্য পর্যবসিত হয়েছে নিঃস্ব সাহিত্যে। ফুবেরের মাদাম বোভারি যে ইংরিজি অনুবাদে পড়েছে সে ও-বই পড়ে বুঝেছে কেবল এইটুকু যে, 'দেহতৃষ্ণা' মেটাবার পথে মরীচিকায় একজনের পথ হারাবার বর্ণনাই মাদাম বোভারি। ফরাসিতে যে ফুবেরের ওই গদ্যকাব্য পড়েছে সে জানে, ফুবেরই মাদাম বোভারি। ['C'estmoi']

আমরা যখন অন্য ভাষার কাব্য অনুবাদ করি বাংলায় তখন আমরা জানিই না যে সেই কাব্য যদি কথা বলতে পারতো তা'হলে সে আমাদের উদ্দেশে বলতো, হে বিদেশী Fool, তুমি জান না তুমি কী সর্বনাশ করেছ, বরঞ্চি তোমায় ক্ষমা করুন।

তিন

পটের অনুবাদ করা সম্ভব; রসের ভাষান্তর অসম্ভব।

সেক্সপীয়ারের নাটকের গল্প বাংলায় বলা যাবে। কিন্তু তাঁর নাটক কিংবা সনেট বাংলায় অনুবাদ করা যাবে না। বাংলায় ম্যাকবেথ একজন নাট্যকারই অনুবাদ করেছেন। সেক্সপীয়ারের ম্যাকবেথ যিনি পড়েছেন, তিনি জানেন বাংলায় ও-বস্তু কি দাঁড়িয়েছে। সেক্সপীয়ার ও কালিদাস অনুবাদ আয়ত্ত হলে রবীন্দ্রনাথ অনুবাদ করতেন। যে দু'চারটি অনুবাদ-কর্ম রবীন্দ্রনাথ করেছেন, তা দুটি কারণ-সম্ভূত। এক,—শিক্ষক রবীন্দ্রনাথ, কবি রবীন্দ্রনাথ যেন তার রচয়িতা। দ্বিতীয় অদ্বিতীয় কারণ সম্ভবত এই হবে যে রবীন্দ্রনাথ অনুবাদ করে দেখাতে চেয়েছেন যে, অনুবাদ করা যায় না কোনও মহৎ রচনার।

সেক্সপীয়ারের কোয়াটার সেন্টিনারি উপলক্ষে যে অনুবাদ বেরিয়েছে তাঁর সনেটের, তা সেক্সপীয়ার পড়লে নিজেকে কোট করা ছাড়া আর কী-ই বা তিনি করতে পারতেন; Its a tale told by an idiot, full of sound and fury signifying nothin'!

ক্ষুরস্য ধারা,—এই কথার মধ্যে যে আলো, Rezor's Edge,—এই কথার মধ্যে তার আভা কোথায়?

চার

দুটি ভাষায় সমান দখল এমন ব্যবসাচীর পক্ষেও সেক্সপীয়রকে বাঙালী এবং রবীন্দ্রনাথকে ইংরেজ করা অসম্ভব। একটি ভাষায় একটি কথায় যে দ্যুতি আরেকটি ভাষার সমার্থক একটি শব্দে দ্যোতনা কোথায়। শূণ্যস্ত বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রার যে ধ্বনি তার প্রতিধ্বনি অ-সংস্কৃত কোনও ভাষাতেই আশা করা শব্দের মহিমাকে তামাসা করা মাত্র। Twinkle Twinkle little star, how I wonder wha' you are. অথবা খোকা যাবে নায়, লাল জুতুয়া পায়,—এর অনুবাদ যিনি ভাবতে পারেন তিনি অভাবনীয়।

চিত্রের ভাষা সর্বজনীন; বিচিত্রের ভাষা বলার চেয়ে না-বলা অনেক বশি। কথাহীন সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা সব দেশ ও সব কালের উর্ধ্বে। কিন্তু কথা যে সৃষ্টির বাহন, তার এক ভাষার শব্দ আরেক ভাষায় নিঃশব্দ, বোবা!

শিবাজীকে কল্পনা করতে পারেন ঘোড়ার পিঠে তরবারি হাতে মাথায় পাগড়ির বদলে ড্রেনপাইপ প্যান্ট পরে হাতে রিভলভার খোলা গাড়ীতে মাথায় কাউবয় টুপি পাশে টপলেস মেয়ে চলেছেন ট্রেণ-ডাকাতি করতে? যদি পারেন তবেই পারবেন বিবাহের সংস্কৃত

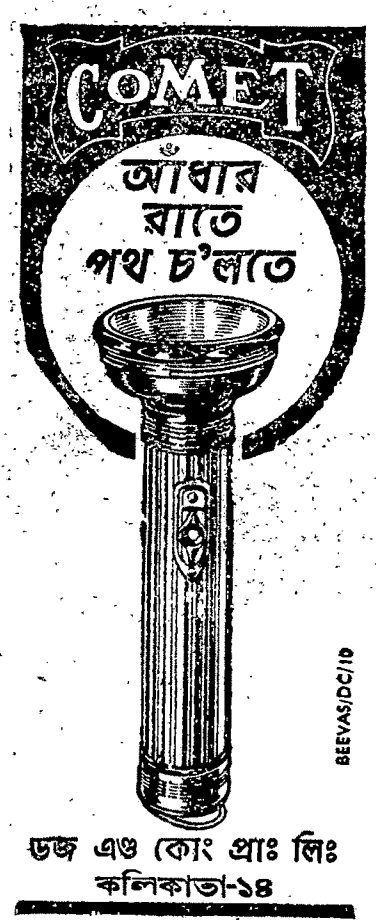

মন্ত্রের বাংলা অনুবাদ করতে। এই কল্পনাতীত কাণ্ডের যারা পাণ্ডা তাদের বক্তব্য হচ্ছে, সংস্কৃত মন্ত্র বর-কনে বোঝে না; অতএব বাংলায় বোঝাও। কী আশ্চর্য মীমাংসা? মন্ত্র যে বোঝবার নয়, বাজবার, এটুকুও যাদের বোধগম্য হলো না আজও, সেই অ-সংস্কৃত মন-ই কেবল এসব উদ্ভট পরিকল্পনা করতে পারে। মন্ত্রর অনুবাদ মন্ত্র না। আসলে সব কিছুকে গোলাবার মন্ত্রণা মাত্র।

বুকপোষ্ট, ইনস্যাণ্ড, বেয়ারিং, রেজেস্ট্রি বিবাহ, এমন কি 'বিবাহের চেয়ে বড়' ব্যাপারটা আমি বুঝি। যা বুঝি না, তা হচ্ছে রেজেস্ট্রি বিবাহ-ও করব, আবার বাড়িতে আচার্য ডেকে সংস্কৃত মন্ত্র-র বাংলা অনুবাদও শোনাব, এই ডুডু ও টামক দুই-ই খাবার। গাছের ও তলার দুই-ই কুড়োবার গজ-কচ্ছপি কারবার আমি বুঝি না।

'মা',—'সিনেমা' হয়েছেন এই পথেই: এবং এই পথেই এবার হতে চলেছেন, এক্‌জিমা'!

ডাক্তারি ওষুধ খাবার আগে ল্যাটিন নামের বংগানুবাদ, আইনের সাহায্য নেবার সময় ল্যাটিন ডিক্টাসের হেলপ-টু-দ্য ষ্টাডিস নাহলে চিকিৎসা এবং ওকালতি করতে দেব না, একে ডেমোক্রেসি বলে না; বলে—ডেমন এবং ক্রেজি। শ্রাদ্ধের মন্ত্রের বাংলা করতে গিয়ে মন্ত্রের আদ্যশ্রাদ্ধ করাটা ভোটের জোরে পাস হতে পারে কিন্তু তাতে শুদ্ধা প্রকাশ বেশি করা যায়, এ যাদের প্ল্যান তারাই দেশকে প্ল্যানটেন দেখাচ্ছে বারবার!

সংস্কৃত মন্ত্র বাংলা করে দিলে মন্ত্রর মানে বুঝলাম কিন্তু তাতে বিবাহ শুভ হলো কি তৎক্ষণাৎ! মন্ত্রর মানে তো শব্দগত নয় শুধু; সমস্ত জীবন দিয়ে তার মানে করতে হয়। বিবাহে বিশ্বাস করি না, করলেও রেজিস্ট্রি বিবাহে করি, কিন্তু লোকে এবং ঘরের স্ত্রীলোকে কি বলবে, ওই ভয়ে ওই সংগেই পুরুত ডেকে, আগুন জ্বেলে, হোম করে, কেবল বিয়ে নয়, বাড়ি বিয়ে পর্যন্ত করে তবে যাদের ভয়ে কাঁপি তারাই আমাদের দেশে সংস্কার-মুক্ত মন বলে বড়াই করি। কনভিকশানের অভাবে দুধের স্বাদ তারা ঘোলে মেটায়। সংস্কৃত মন্ত্রের বাংলা অনুবাদ করে তারা প্রমাণ করে যে তারা 'সং'।

শ্রাদ্ধে বিশ্বাস করি না, কিন্তু শ্রাদ্ধ করি সাকসেশান সার্টিফিকেটের ভয়ে। লোকে কি বলবে কেবল সেই আশংকায় মাথা নুড়োই, দাড়ি রাখি, পায় ক্যাম্বিশ মুড়ি, চেয়ারের ওপর কম্বলের লোম বিছিয়ে দিই। এ হলো সাধারণ কাণ্ড। অসাধারণ যারা তাদেরও মনোগত ভাব ওই, কিন্তু শ্রাদ্ধের সংস্কৃত মন্ত্রের বাংলা করে, তারা ভাবে, তারা দারুণ প্রগতিবাদী।

প্রগতির এত দুরগতি-ই, আমাদের সকল দুর্গতির মূলে।

পাঁচ

একজন জাতকের যেমন দু'জন জনক হওয়া বাস্তব-অসম্মত ব্যাপার, তেমনই একটি মন্ত্র দুটি ভাষায় উচ্চারণ সম্ভব নয়। বন্দে মাতরম বাংলায় চলে না: ধনধান্য-র সংস্কৃত অচল। এর কারণ মন্ত্র কেবল শব্দের সমষ্টি নয়, ধ্বনিও ওর ডাইমেনশান। উচ্চারণ অশুদ্ধ হলে মন্ত্র শুদ্ধ থাকে না। মন্ত্র-তন্ত্র যে মানে না তার কথার মানে বুঝি; কিন্তু মন্ত্রকে মান্য করে তার উচ্চারণকে যে অমান্য করে সে বীর-ও নয়, ভদ্রও নয়। মন্দিরের শুচিতার মতো মন্ত্রের বিশুদ্ধতাও অপরিহার্য। প্রাতঃকৃত্য করে সেই কাপড়েই স্নান না করে আমরা পূজোর ঘরে যাই না;—যদি কেউ বলে যে এতে কি দোষ হয়। তাহলে তাকে প্রশ্ন করব লাইব্রেরিতে পাঠরতদের কানের কাছে লং প্লেয়িং রেকর্ড বাজালে কী দোষ হয় না। দ্বিতীয় জিজ্ঞাসার উত্তরে যদি কেউ বলে তাতে মনঃসংযোগের অভাব হয়। তাহলে প্রথম প্রশ্নের অদ্বিতীয় উত্তরও ওই; পূজায় মন বসে যার দেহ অশুচি থাকলে, মনের শুচিতা সুদূর-পরাহত হয়। ও'পারেটিং থিয়েটারের নার্সকে যদি প্রয়োজনে চোখ বাদ দিয়ে মুখের সব ঢাকতে হয়, তাহলে পূজোর ঘরে ঢুকতে হলে পটবস্ত্র পরিধানে যার অপত্তি সে ব্যক্তি অসাধারণ বুদ্ধিমান হলেও বলতে হবে যে তার সাধারণ বুদ্ধির অসাধারণ অভাব।

ছয়

বাংলায় সংস্কৃত অথবা ইংরিজি থেকে অনুবাদের দিন গিয়ে এখন আসছে হিন্দিতে বলার দুদিন। নেকটাই ইতিমধ্যেই কণ্ঠলেংগোটি হয়েছে; স্যাণ্ডুইচ হয়েছে বালুকা মায়াবী: কলের জল: নলকা মুতনি। সাইকেলের হিন্দি যা হয়েছে তা মুখে বলা কিংবা কলমে লেখা শক্ত। ওল ইণ্ডিয়া লন টেনিস এসোসিয়েশান রাষ্ট্রভাষায় দাঁড়িয়েছে: অখিল ভারত গেণ্ডুয়া খেলনেকা ঘসিয়া সমিতি। হোক। রামায়ণের হিন্দিতে যখন দশরথের চার ছেলে হবে দশরথকা চৌবাচ্চা, তখনই, দফারফা হবে দেশের।

রবীন্দ্রনাথের: আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণধূলার তলে,—যখন হিন্দিতে হবে: মেরা শির লপট্ দে তেরা গোড়পর ঝপট্-লপট্,—তখন? তখন মনে পড়বে অবিস্মরণীয় রামমোহনের সেই স্মরণীয় সত্য ভাষণ:

মনে কর শেষের সেদিন কী ভয়ংকর?
সবাই বাক্য কবে তমি রইবে নিরুত্তর।

নাট্যাচার্য শিশিরকুমার

অশোক সেন

মস্কো, লণ্ডন, প্যারিস এবং জার্মাণীর যে সব অভিনেতার অভিনয় দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে, এঁদের কারোকেই নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের ধারে-পাশে স্থান পাবার মত বলে আমার মনে হয়নি, এমন কি গিলগুড্, র‍্যালফ রিচার্ডসন বা ব্রেখ্‌ট পার্টির অভিনেতাদেরও শিশিরকুমারের সমতুল্য অভিনেতা বলে স্বীকার করতে আমি রাজী নই।

আর শিশিরবাবুর অভিনয়-প্রতিভার পরিচয় তো নতুন করে দেবার কোন প্রয়োজন নেই। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ থেকে সুরু করে, শরৎচন্দ্র, দেশবন্ধু, অবনীন্দ্রনাথ, দিলীপকুমার, সুনীতিবাবু, শ্রীকুমারবাবু সবাই অকুণ্ঠিতভাবে শিশিরকুমারের অভিনয়ের উচ্চ প্রশংসা করে গেছেন। তাছাড়া দেশের আপামরসাধারণ তাঁর অভিনয়কে অন্তর থেকে গ্রহণ করেছিলেন---সীতা, আলমগীর, ষোড়শীর সংলাপ ঘরে ঘরে আবৃত্তি করতেন যুবকের দল যখন শিশিরকুমার এসব নাটক মঞ্চস্থ করেছিলেন তাঁর নাট্য মন্দিরে। এ থেকেই বোঝা যায়, জনগণ কিভাবে গ্রহণ করেছিলেন শিশিরকুমার এবং তাঁর সম্প্রদায়কে বাংলার রঙ্গমঞ্চে তাঁর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে। শুধু অভিনেতা হিসাবেই নয়, সে সময়ের একজন সেরা ইণ্টালেকচুয়াল হিসাবেও শিশিরকুমার আদৃত হয়েছিলেন বিদগ্ধসমাজে।

বুথ, গ্যারিক, কিন, ইরভিং, ট্রি, ব্যারিমোর প্রভৃতিকে যেমন দেশের সকল শ্রেণীর লোকেরাই গর্ব, অহঙ্কার, শ্রদ্ধা এবং অন্তরের ভালবাসার সঙ্গে রঙ্গমঞ্চের শ্রেষ্ঠ প্রতিভা হিসাবে বিভিন্ন সময়ে গ্রহণ করেছিলেন, শিশিরকুমারও ঠিক সমভাবেই গৃহীত হয়েছিলেন বাংলার ঘরে ঘরে।

কিছু লোক অবশ্য অযথা নিন্দা এবং কুৎসা প্রচার করবার চেষ্টা করেছেন শিশিকুমারের বিরুদ্ধে। কিন্তু এদের সংখ্যা এতই নগণ্য যে, এ সম্বন্ধে কোন আলোচনা না করাই যুক্তিযুক্ত। আর মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রও তো এই শ্রেণীর নিন্দাবাদের থেকে সম্পূর্ণভাবে রেহাই পাননি। সুতরাং শিশিরবাবুরও যে কিছু নিন্দুক থাকবে সেটাই তো স্বাভাবিক।

গিরিশচন্দ্র, অর্ধেন্দুশেখরের পর শিশিরকুমারের মত অভিনেতা আমাদের রঙ্গমঞ্চে আর আসেন নি। এক বিষয়ে অবশ্য গিরিশচন্দ্রকেও পেছনে রেখে গিয়েছিলেন শিশিরকুমার, সেটা হচ্ছে প্রডাকসনের ব্যাপারে। রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের সময় সমগ্র নাটকটিকে মনে রেখে কিভাবে নাটকের মঞ্চরূপায়ণ হওয়া উচিত, সে বিষয়ে গিরিশবাবুরা খুব দৃষ্টি দেননি। বাংলার রঙ্গাভিনয়ে এই প্রডাকসনের দিকটাই শিশিরবাবুর সব চেয়ে বড় দান।

তা ছাড়া নাট্যসম্রাজ্ঞী তারাসুন্দরী বলে গেছেন যে, অভিনয় শিক্ষাদানের ব্যাপারেও শিশিরকুমারই গিরিশচন্দ্র অপেক্ষা বেশী পারদর্শী ছিলেন---তারাসুন্দরী গিরিশচন্দ্র এবং শিশিরকুমার দু'জনেরই রিহার্সাল পরিচালনা দেখেছেন। সুতরাং তাঁর মতামতকে ঠিক হেসে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

শুধু অভিনয় এবং পরিচালনা বিষয়েই নয়, শিশিরকুমারের মত পাণ্ডিত্য এবং নানা ভাষা এবং নানা বিষয়ে জ্ঞান আমি খুব অল্প লোকের ভেতরেই দেখেছি। ১৯৫০ সালে আমার রবীন্দ্রনাথের সাঙ্কেতিক নাটক সম্বন্ধে সমালোচনা গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। সে সময়ে সাঙ্কেতিক নাটক বিষয়ে কোন বিশদভাবে আলোচিত সমালোচনার বই ছিল না। এই দুরূহ সাবজেক্টটি সম্বন্ধে জানবার জন্য অনেক বিদগ্ধ ব্যক্তিদের সঙ্গে দেখা করি---কিন্তু উপর উপর কথা বলা ছাড়া এঁদের

নাট্যাচার্য শিশিরকুমার

কেউই আমাকে কোন সাহায্য করতে পারেন নি। একদিন সন্ধ্যাবেলায় শিশিরবাবুর সঙ্গে এ নিয়ে কথা হোল। আরও দু' একজন লোক সেখানে উপস্থিত ছিলেন। শিশিরবাবু আমাকে প্রথমটায় বললেন—এ বয়সে আজকাল আর আমার কিছুই স্মরণে থাকে না। দশ-পনের বছর আগে এ নিয়ে আলোচনা করলে তোমাকে আমি নিশ্চয় সাহায্য করতে পারতাম। এর পর ঘরের অন্য লোকেদের সঙ্গে কথা চলতে লাগল হঠাৎ আমার দিকে ফিরে উত্তেজিতভাবে বললেন —অশোক, একটা বইয়ের কথা মনে হচ্ছে। ইয়েটস্-এর On the Idea of Good and Evil---এই বইটাতে সিম্বলিজম্ সম্বন্ধে অনেক মাল-মশলা পাবে।

সত্যিই এ বইটি থেকে আমি যথেষ্ট সাহায্য পেয়েছিলাম সাঙ্কেতিকতা সম্বন্ধে।

আর এক দিক দিয়ে তিনি আমার খুব উপকার করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের "রক্তকরবী" প্রভৃতি কয়েকটি নাটক আমার কাছে রিডিং দিয়েছিলেন। শিশিরকুমার বলতেন—দেখ ভালভাবে রিডিং পড়তে পারলে অনেক দুরূহ জায়গার অর্থ আপনা থেকেই স্পষ্ট হয়ে যায়। অবশ্য রিডিংটা ঠিকমত হওয়া চাই—শুদ্ধ উচ্চারণ, ঠিক জায়গায় বিরতি এবং প্রাণবন্ত ভাবাবেগের সঙ্গে পড়তে হবে। তাহলেই লেখকের রচনার ভেতর প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা হবে এবং তাঁর বক্তব্যের সঙ্গে শ্রোতা একাত্মতা অনুভব করবেন।

একদিন শিশিরকুমার রক্তকরবী থেকে পড়ে শোনাচ্ছিলেন :

"আমি প্রকাণ্ড মরুভূমি—তোমার মত একটি ছোট্ট ঘাসের দিকে হাত বাড়িয়ে বলছি, আমি তপ্ত, আমি রিক্ত, আমি ক্লান্ত। তৃষ্ণার বাহে এই মরুটা কত উর্বরা ভূমিকে লেহন করে নিয়েছে; তাতে মরুর পরিসরই বাড়ছে, ঐ একটুখানি দুর্বল ঘাসের মধ্যে যে প্রাণ আছে তাকে আপন করতে পারছে না। শোনামাত্র আমার কানে বেজে উঠল এলিয়টের 'দি ওয়েষ্ট ল্যাণ্ডের' এই লাইনগুলো—

'Here is no water but only rock
Rock and no water and the
sandy road
The road winding above among
the mountains
Which are mountains of rock
without water'

শিশিরকুমারকে বলাতে তিনি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে কি চিন্তা করলেন—তারপর বললেন এদিক দিয়ে নিশ্চয়ই খানিকটা আলোচনা করতে পার—সম্পূর্ণ একটা নতুন দিক খুলে দেওয়া হবে।

এই প্রসঙ্গে বিখ্যাত রবীন্দ্রসাহিত্যিক এবং বিদগ্ধ সমালোচক ডাঃ অমিয় চক্রবর্তীর একটি লেখাতে রয়েছে—

"Eliot's death haunted imagination saw human beings as bones, the contemporary scene as a waste-land, a rocky barrenness, and nothing but a miracle, a sudden shower from above could save humanity."

যক্ষপুরীতে নন্দিনীর আবির্ভাব এই মিরাক্যাল-এরই মত। ওখানকার মানুষদের পক্ষে সেইতো এই "a sudden shower from above."

যাই হোক, রক্তকরবীর ব্যাখ্যায় এই নতুন দিকে আলোচনাটা টেনে নিয়ে যাবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল নাট্যাচার্যের সেই অদ্ভুত গাম্ভীর্যপূর্ণ রিডিং-এর সাহায্যে।

অভিনেতা শিশিরকুমার ঃ শিশিরকুমার সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য করে নিজেদের জাহির করবার চেষ্টা করেছেন কোন কোন শিশিরোত্তর যুগের নট, নাট্যকার এবং নাট্য-সমালোচক। কিন্তু বড় কিছুর বিরূপ সমালোচনা করলেই তো বার্ণার্ড শ' হওয়া যায় না। তার জন্য শ'এর মত বিদ্যাবুদ্ধি থাকা দরকার। তাই ঐ সব সমালোচনা শিশিরকুমারের মহিমাকে কখনও এতটুকু ক্ষুণ্ণ করতে পারেনি।

শিশিরকুমার ছিলেন সত্যিকার মহৎ-শিল্পী। গ্রেট এ্যাকটিং বলতে যা বোঝায় তা শিশির-কুমারের অভিনয়েই দেখেছি। অভিনয়কে তিনি যে হাইটে তুলেছিলেন, তা যাঁরা সে অভিনয় দেখেননি, তাঁদের বর্ণনা করে বোঝানো প্রায় অসম্ভব।

কিন্তু যাঁরা নাট্যাচার্যের অভিনয় দেখেও জোর করে সে অভিনয়ের ত্রুটি দেখাতে গিয়ে আজে-বাজে কথা বলে থাকেন, তাঁদের আসল উদ্দেশ্য হোল নিজেদের খুব জাহির করে তোলা।

নটের যা প্রধান কর্তব্য, অর্থাৎ চরিত্রটিকে ঠিকভাবে রূপায়িত করা, বা নাটকের মূল

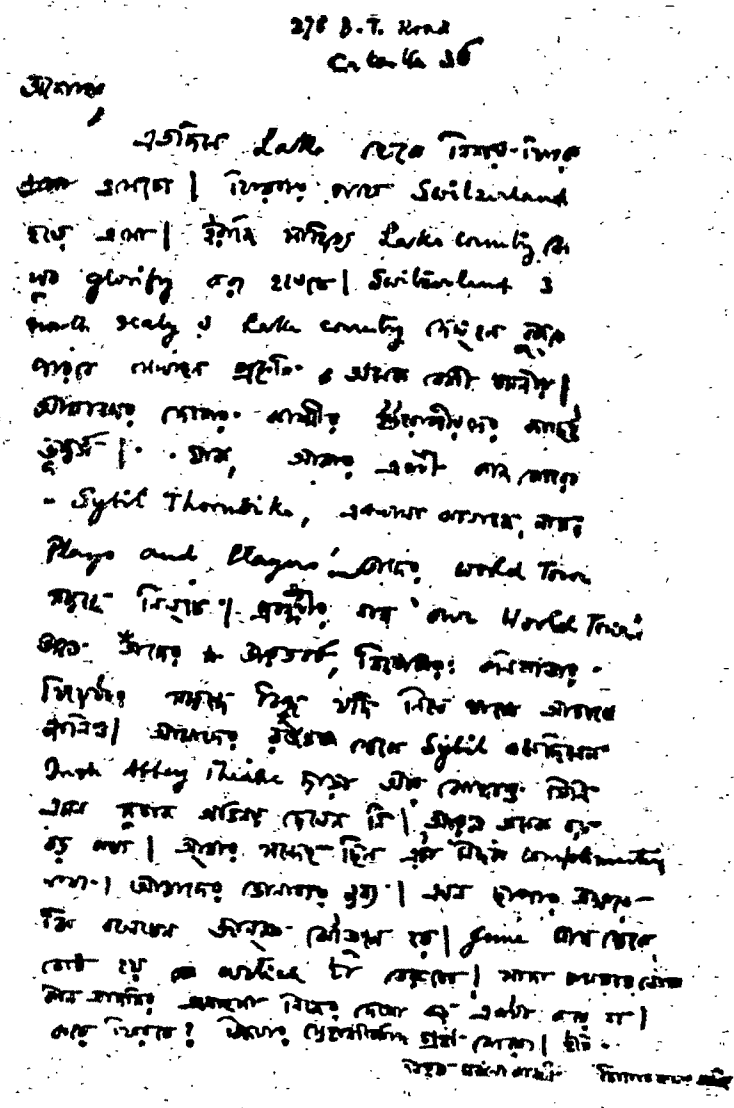

● নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের হস্তলিপি—লেখককে লিখিত পত্রের অংশবিশেষের প্রতিলিপি।

মাথাধরায়

নিশ্চিত আরামকে স্বাগত জানান

এনাসিন এতো কাজের, কারণ এ কয়েকটি ওষুধের এক সমন্বয়, ডাক্তারের বিধানের মতই এনাসিন দ্রুত সবরকমে আরাম দেবে।

- এনাসিনে রয়েছে দ্রুত ব্যথাবেদনা উপশমের জন্যে বিবিধ উপাদানের অতুলনীয় সংমিশ্রণ।
- এনাসিন স্নায়ুর উত্তেজনা শান্ত করে—যে উত্তেজনা সাধারণতঃ মাথা ধরার কারণ হয়।
- ইনফ্লুয়েঞ্জা বা সর্দ্দি জ্বর কমিয়ে আনতে এনাসিন কাজ দেয়।
- ব্যথা যন্ত্রনার সঙ্গে মাঝে মাঝে যে অবসাদ এসে পড়ে এনাসিন তা দূর করে।

BEN

এনাসিন

আরো ভালো কারণ এ কাজ করে ৪ ভাবে

Registered User:
GEOFFREY MANNERS & CO. LTD.

জ্বকে (ষ্টানিসলাভস্কি যাকে বলেছেন ক্রুলিং আইডিয়া অভ দি প্লে') দর্শকের সামনে স্পষ্টভাবে তুলে ধরা—তাই সব সময় করতেন শিশিরকুমার।

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায় কি কারণে তাঁর 'সাজাহান' নাটকে সাজাহানকে পক্ষাঘাতে পঙ্গু বলে বর্ণনা করেছেন জানি না, কিন্তু ইতিহাসে সাজাহানের পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হবার কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। বিখ্যাত ঐতিহাসিক স্যার যদুনাথ সরকার তাঁর 'আওরঙ্গজেব' হইতে এ বিষয়ে যা লিখেছেন তার থেকে খানিকটা তুলে দিচ্ছি—

'On 6th September (1657) Shahjahan suddenly fell ill of strangury and Constipation at Delhi...he decided to go to Agra and die there quietly in sight of the tomb of the wife he had loved so well. He entered Agra city on 26th October.

By the middle of November Shah Jahan had recovered sufficiently to be told of important matters which had hitherto been kept from him.'

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে ইতিহাসের সাজাহানের পক্ষাঘাত হয়নি এবং সেই জন্যই শিশিরকুমার সাজাহানকে প্যারালিটিক দেখাতেন না বা এ্যাক্রোবেটিকসের দ্বারা দর্শকের সস্তা হাততালি নেবার চেষ্টা করতেন না।

শিশিরকুমারের সাজাহান ছিল 'সম্রাট-কবি সাজাহান', 'বিরহী সাজাহান', 'পুত্রস্নেহান্ধ সাজাহান' অর্থাৎ আসল ইতিহাসের সাজাহান। রবীন্দ্রনাথ যাঁর বর্ণনায় লিখেছেন—

'জ্যোৎস্না রাতে নিভৃত মন্দিরে
প্রেয়সীরে,
যে নামে ডাকিতে ধীরে ধীরে
সেই কানে কানে ডাকা রেখে গেলে
এইখানে অনন্তের কানে।
প্রেমের করুণ কোমলতা,
ফুটিল তা
সৌন্দর্যের পুষ্পপুঞ্জে প্রশান্ত পাষাণে।
হে সম্রাট কবি,
এই তব হৃদয়ের ছবি,
এই তব নব মেঘদূত
অপূর্ব অদ্ভুত
ছন্দে গানে', ইত্যাদি।

এই কারণেই সাজাহানকে নিয়ে মঞ্চের উপর জিম্‌নাস্টিক করানো শিশিরকুমারের দ্বারা সম্ভব হয় নি।

মঞ্চ লোকশিক্ষা দেবার বেস্ট পুলপিট। সুতরাং মঞ্চ থেকে কোনো ঐতিহাসিক চরিত্র সম্বন্ধে ভুল শিক্ষা দেবেন, এ শিশিরকুমারের পক্ষে সম্ভব ছিল না।

'প্রতাপাদিত্য' নাটকের রঙা চরিত্রের রূপায়ণে শিশিরকুমার এক অভিনব পদ্ধতি গ্রহণ করেন। নাট্যকার রঙাকে দিয়ে ভাঙা ভাঙা হিন্দী বলিয়েছেন কিন্তু ভেবে দেখলেই বোঝা যায় রঙার পক্ষে ওভাবে হিন্দী বলার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। রঙা দেশ ছেড়ে ভারতে আসার পর কোন দিনই হিন্দী ভাষাভাষী জায়গায় বসবাস করেন নি। তাঁর পক্ষে যেটা স্বাভাবিক অর্থাৎ চাটগেঁয়ে কথা বলা, কারণ সে ওদিকটাতেই এসেছিল। তাই করেছিলেন শিশিরকুমার। তাঁকে দিয়ে চট্টগ্রামের ভাষা ও মাঝে মাঝে পর্তুগীজ ভাষা বলিয়েছিলেন নাট্যাচার্য, যাতে চরিত্রটি বাস্তবানুগ হয়ে ওঠে।

মিশরকুমারীর আবন চরিত্রের অভিনয়ে তিনি সুস্পষ্টভাবে একটা কথাই পরিস্ফুট করে তুলেছেন। সেটা হচ্ছে—'Suffrance is the badge of all our tribe.

গ্রেট এ্যাকটিং-এর জন্য যে সব গুণের দরকার তা যেন ছিল শিশিরকুমারের সহজাত। এর মধ্যে প্রধান ছিল তাঁর ভগবৎদত্ত সুকণ্ঠ। এত মেলডিয়াস ভয়েস এদেশে বা ইউরোপের মঞ্চে আমি কখনও শুনিনি। কণ্ঠস্বরকে তিনি অসংখ্য পর্দায় খেলাতে পারতেন—স্বরের আরোহণ এবং অবরোহণের কম্পনো তিনি যেন অভিনয়কে সঙ্গীতের উচ্চস্তরে তুলে ধরতেন।

ইংরাজীতে একটা কথা আছে—"Tragedy is cosmic, comedy is mundane",-এর ভাবার্থ বোধহয় এই যে কমেডি ব্যাপারটা স্থূল এবং পার্থিব। আর ট্র্যাজেডী থেকে একটা অপার্থিব এবং মহত্তর সত্যের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ট্র্যাজেডী এমন একটা বিরাটত্ব এবং ব্যাপকতার স্তরে আকর্ষণ করে যে সাধারণ জীবনের ক্ষুদ্রতা, নীচতা, সীমাবদ্ধতা পরিহর্জন করে মানব-মন এক অদ্ভুত অলোক আলোকতীর্থের সিংহ-দুয়ারের প্রবেশ-পথের সন্ধান খুঁজে পায়।

সীতার বিরহে রামের সেই বিলাপ—

"সহস্র বান্ধব মাঝে রহিব একাকী
আমার প্রাণের ব্যথা কেহ বুঝিবে না
সম্মুখে মিলাবে সুখ
মরুভূমে মরীচিকা সম
মৃত্যু হবে তীব্র নিরাশায়।"

অপহৃতা কন্যাকে ফিরে পাবার পর চাণক্যের বিরাট হাহাকার—

"কাত্যায়ন: নাড়ী দেখতে জান? বলতে পার আমি বেঁচে আছি কি মরে গেছি? এখন ইহকাল কি পরকাল?" ইত্যাদি।

আলমগীর নাটকের প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে, যেখানে দিলীর খাঁর কাছে যশোবন্তের বিশ্বাসঘাতকতার বর্ণনায় আলমগীর বলছেন—

"দুরাত্মা যদি সেদিন আমাকে বিন্দুমাত্র সাহায্য করতো, তাহলেও সুজাকে আমি ধরতে পারতুম। আমার সমস্ত ভাইদের মধ্যে সুজাই আমার একমাত্র প্রিয় ছিল। মূর্খ, দাম্ভিক, মাতাল, কিন্তু উদার সুজা। একবার তাকে ধরতে পারলে, মিষ্ট ব্যবহারে সহজেই তাকে আপনার করে নিতে পারতুম।"

"তার পত্নী পিয়ারিবানু—নারীরত্ন। মোগল হারেমে তার মত মহিমময়ী রমণী আমি দেখিনি। আজও পর্যন্ত তার স্মরণে আমার চিরনীরস চক্ষুও সজল হয়। মনে কর দিলীর খাঁ, দেহের পবিত্রতা রক্ষা করতে আরাকানে সেই বর্বর রাজার সম্মুখে তার ভীষণ আত্মহত্যা।

"রণক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে অনেক ভীষণ মৃত্যু দেখেছি। কিন্তু দেওয়ালে বারংবার মাথার আঘাতে নিজের অনুপম রূপরাশিকে ছারখার করে মরা—এরূপ মৃত্যুর কথা—উঃ—"

এবং পঞ্চম অঙ্কের অষ্টম দৃশ্যে যেখানে আলমগীর বলছেন—

"অপরিচিতের মত এসেছি, আবার অপরিচিতের মত দুনিয়া থেকে চলে যাচ্ছি। কে আমি, কোথা থেকে এসেছি, কোথায় চলেছি—ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়লুম। দিলীর! দেখি আত্মা আমার দেহ থেকে বেরিয়ে গেল। উঠতে লাগলো, উর্ধ্ব থেকে আরও উর্ধ্বে, আরও উর্ধ্বে। দুনিয়ার লোক তার পানে চেয়ে রইল, আমিও চেয়ে রইলুম। তারা ডাকলে 'সম্রাট!' উত্তর এলো না। 'আওরঙ্গজেব!' (মাথা নাড়িলেন)। 'আলমগীর!' (মাথা নাড়িলেন) উত্তর এলো না। 'মানব!' একবার যেন চেয়ে দেখলে। 'অতি মানব!' দিলীর! দেখতে দেখতে সেই মুখ প্রফুল্ল হল। তারপর কে যেন—কে যেন কোথা হতে ডাকলো 'মুসলমান!'—আত্মার মুখ হতে বাণী নির্গত হ'ল 'ওই আমি!' তারপর! কি এক পাহাড়ের বুকচেরা ঘর—বিশাল গুহা—তার ভিতরে পিপাসার্ত আলমগীর! জল জল—আত্মার পিপাসা—চাই জল। চারিদিক থেকে দুনিয়ার লোক পিয়ালা হাতে করে ছুটে এলো। হিন্দু, মুসলমান, ইহুদি, পার্শী, ক্রিশ্চান। কিন্তু দিলীর কারও জল আমি মুখে তুলতে পারলুম না! বুঝি আত্মা চেয়েছিল—সত্যের ঝরণা থেকে ঝরা জল! কেউ দিতে পারলে না—হিন্দু, মুসলমান, ইহুদি, পার্শী, ক্রিশ্চান! তুমি শেষে জল নিয়ে এলে, তোমারও জল পান করতে পারলুম না! কেন পারলুম না, দিলীর খাঁ?"

প্রসঙ্গত এখানে আওরঙ্গজেবের মৃত্যু-সজ্জায় ছেলেদের কাছে লেখা চিঠি থেকে একটা জায়গা তুলে দিচ্ছি: "I know not who I am, where I shall go, or what will happen to this sinner full of sins. Now I will say good-bye

to every one in this world and entrust every one to the care of God. - - - My years have gone by profitless. God has been in my heart, yet my darkened eyes have not recognized his light - - - There is no hope for me in the future.

[The Oxford History of India Vincent Smith Reprinted Second Edition 1941, p. 448]

উপরের আলমগীরের সংলাপের সঙ্গে এই চিঠির বক্তব্যের ভেতর বেশ মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

আর একটা ব্যাপারে এই প্রসঙ্গে পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। ক্ষীরোদপ্রসাদ তাঁর আলমগীরকে দিয়ে বলাচ্ছেন—"দেখি আত্মা আমার দেহ থেকে বেরিয়ে গেল", ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথও ঠিক এই ধরণেরই কথা বলেছেন প্রান্তিকের একটি কবিতায়—"দেখিলাম অবসন্ন চেতনার গোধূলিবেলায় দেহ মোর ভেসে যায় কাল-কালিন্দীর স্রোত বহি নিয়ে অনুভূতিপুঞ্জ, নিয়ে তার বাঁশিখানি, ইত্যাদি"।

নর-নারায়ণের তৃতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে, যেখানে জয়দ্রথবধের বর্ণনায় কর্ণ পদ্মাবতীকে বলছেন—

কর্ণ—

দেখিতে দেখিতে এলো সন্ধ্যা। সূর্য যেন
অস্ত গেল। আমি দেখিয়াছি,
দেখেছেন
দ্রোণাচার্য। কৃপাচার্য করেছে দর্শন।
তাই কেন, সমস্ত কৌরব দেখিয়াছে—
লোহিতবরণ দিনমণি ধীরে ধীরে
অস্তাচল-অন্তরালে ঢাকিল বদন।
কাঁদিয়া উঠিল দ্রোণ, কাঁদিয়া উঠিল
কৃপ! মনে হয়, আমারো আসিল
চোখে
জল। মনে হয়, পদ্মাবতী,
শোকে ক্ষোভে
আমিও হইন আত্মহারা। বন-মধ্যে
একাকিনী মহীয়সী পাণ্ডব-মহিষী
আতিথ্য লইতে গিয়ে সেই নরাধম
অসঙ্কোচে করেছিল তারে আক্রমণ,
সেই পশু—ইত্যাদি।

অথবা শেষ অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে বা মৃত্যু-দৃশ্যে যেখানে কর্ণ বলছেন—

'সারা বিশ্ব পশ্চাতে রাখিয়া একবার দাঁড়াও সম্মুখে ভীমসেন!'—ইত্যাদি।

রঘুবীর নাটকের পঞ্চম অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে যখন উদভ্রান্ত অনন্তরাওয়ের সামনে শান্ত, উদাস রঘুবীর নিজেকে ভয়াবহ ভীল সর্দারে পরিণত করলেন। অনন্তরাও অনুরোধ করছেন, 'স্থির হও—স্থির হও—' উত্তরে রঘুবীর বললেন—

ভীল নয় মায়ের সন্তান।
শিশু-ভীল সিংহ মেরে খায়।'—ইত্যাদি।

এ ছাড়াও মাইকেলের আত্মবিলাপের দৃশ্যগুলিতে, দিগ্বিজয়ীর দিল্লী পোড়ানোর দৃশ্যে। জীবানন্দ যখন ষোড়শীকে বলছেন—'আমি স্ত্রী চাই, পুত্র চাই ইত্যাদি, সধবার একাদশীর নিমচাঁদ যখন স্বগতোক্তির ভেতর দিয়ে নিজের জীবনের ব্যর্থতার কথা বলছেন—এই সমস্ত দৃশ্যাদির অভিনয়ে শিশিরকুমার বারবার Tragedy is Cosmic কথাটার সারমর্ম আমাদের কাছে পরিস্ফুট করে তুলতেন অভিনয়ের মাধ্যমে। কণ্ঠস্বরে থাকতো অপূর্ব ভাবব্যঞ্জনা। চোখের কাজে, মুখের ভাবে, জেস্‌চারের সাহায্যে ট্র্যাজেডীকে চরমভাবে রসঘন করে তুলতেন নাট্যাচার্য।

জগতের শ্রেষ্ঠ অভিনেতাদের বিরাট কল্পনা-শক্তির অধিকারী হওয়া দরকার। Ellen Terry বলেছেন—'Imagination: Imagination! I put it first years ago when I was asked what qualities were thought necessary for success on the stage.' Extensive study ছাড়া এই শক্তিকে অর্জন করা যায় না। ১৯৩৫।৩৬ সাল থেকে শিশিরকুমারকে খুব ঘনিষ্ঠভাবে জানবার আমার সুযোগ হয়েছে—দেখেছি। অবসরের বেশীর ভাগ সময়ই তিনি বই পড়ে কাটাতেন।

কারোর কারোর ধারণা যে, আধুনিক পাশ্চাত্য নাটক শিশিরকুমার পছন্দ করতেন না। এটা ভ্রান্ত ধারণা—টেনেসি উইলিয়ামসের নাটক যখন এদেশে প্রথম আমদানী হতে সুরু করে তখন শিশিরবাবুর কাছেই উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুনে আমি Street Car Named Desire, Cat on a Hot Tin Rool প্রভৃতি নাটক কিনে এনে পড়ি।

১৯৫৬ সালে আমি ছিলাম লণ্ডনে—সে সময় ব্রেখ্‌ট পার্টি প্যালেস থিয়েটারে অভিনয় করবে বলে কাগজে বিজ্ঞাপন পড়েছে এবং ব্রেখ্‌টকে ভালভাবে লণ্ডনের দর্শকদের কাছে পরিচিত করবার জন্য লেখালেখি হচ্ছে ওখানকার বিখ্যাত কাগজগুলিতে।

এই সময় শিশিরকুমার আমাকে লিখলেন ব্রেখ্‌টের কিছু নাটক পাঠিয়ে দিতে। অর্থাৎ দেশ-বিদেশের অতি আধুনিক নাট্যান্দোলনের সম্বন্ধেও তিনি সব সময় খোঁজখবর রাখতেন। দেশে ফিরে ব্রেখ্‌টের 'মাদার কারেজ' 'ককেশিয়ান চক সারকল্' প্রভৃতি নাটক সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে আমার বিস্তৃত আলোচনাও হয়েছে। 'চক সারকল্' সম্বন্ধে বলেছিলেন—'এটা যাত্রার ধরণে লেখা—সেইভাবেই প্রডাক্‌সনও হওয়া উচিত।' উত্তরে ওঁকে জানিয়েছিলাম উনি ঠিক কথাই বলেছেন এবং ওদেশে অনেকটা ঐভাবেই প্রডাক্‌সনটি দেখেছিলাম। সর্বদেশের ও সর্বকালের ভাল নাটকগুলি তিনি একাধিকবার পড়তেন, এত পড়াশুনা করতেন বলেই তাঁর কল্পনা-শক্তি ছিল এত বিরাট এবং বিস্তৃত।

শারদীয় অভিনন্দন—

কে, সি, ঘটক এণ্ড সন্স

(প্রাইভেট) লিঃ

৯৫ বৎসরের পরিচিত

বিশিষ্ট বাঙ্গালী লৌহ ব্যবসায়ী

জেজিয়ার্ড ভাটা-ইস্কো এবং

হিন্দুস্থান ষ্টীল ডিলার্স

৩ নং মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা—৭

ফোন ঃ—৩৩২৯৩৬ এবং ৩৩৪৫৪১

বিশুদ্ধ উচ্চারণ-ক্ষমতা না থাকলে মহান অভিনেতা হওয়া যায় না। তার জন্যও বিরাট পড়াশুনা এবং ভালভাবে ভাষাতত্ত্ব জানা দরকার। সংস্কৃত, বাংলা এবং ইংরাজী এই তিনটি ভাষাতেই শিশিরকুমার ছিলেন সুপণ্ডিত (তাছাড়া ফ্রেঞ্চ এবং ল্যাটিন সম্বন্ধেও তাঁর ভাল পড়াশুনা ছিল বলে শুনেছি)—তাই তাঁর অভিনয় ছিল perfect in articulation, pronunciation and delivery.

শিশিরকুমার ছিলেন আয়ত্তকণ্ঠ—অনায়াসে কণ্ঠস্বরকে শীর্ষবিন্দুতে তুলে আবার অতি সহজেই তাকে নামিয়ে আনতে পারতেন একেবারে নিম্নতম পর্দায়—His Voice was pleasing in its quality, sufficient in its quantity and capable of an infinite variety of mood and character.

সত্যিকার ভাল অভিনেতা কাকে বলা যায় এই নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে শিশিরকুমার যা বলতেন তার সারমর্ম অনেকটা এই ধরণের—বাণীশুদ্ধ অভিনেতার কথাগুলো যেন মুক্তোর দানার মত ঝকঝক করতে থাকে—কানের ভেতর দিয়ে একেবারে মর্মে প্রবেশ করে। অবশ্য তার মানে এ নয় যে, অভিনেতাকে তাঁর সংলাপের প্রতিটি শব্দকেই রং মাখিয়ে উচ্চারণ করতে হবে। প্রধান প্রধান শব্দকেই অর্থাৎ যে সব শব্দের দ্বারা চরিত্রের মনোভাবকে দর্শকের কানে পৌছিয়ে দেওয়া যায়—রঙে-রসে ভরপুর করে দিতে হবে। Effect Create করার জন্য শব্দোচ্চারণ নিয়ে বাড়াবাড়ি করলে কিন্তু বিপরীত ফল হয়—যা বলতে যাচ্ছি তাকে আরও অস্পষ্ট ও অর্থহীন করে তোলা হয়। শ্রুতিমধুর শব্দ পেলেই অনেক অভিনেতা প্রলোভন কাটিয়ে উঠতে পারেন না। প্রত্যেক অভিনেতারই একথা সব সময় মনে রাখা উচিৎ যে, শব্দে রং-এর আভাস দিতে গিয়ে যদি নাটকের ভাববারার গতি ব্যাহত করা হয়, সেটা একটা মস্ত বড় অপরাধ।

Blank-Verse এর অভিনয় সম্বন্ধে বলতেন—নাট্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দ থাকলে অভিনেতাকে বিশেষ সাবধানতার সঙ্গে অভিনয় করতে হয়। কারণ এর মধ্যে একটা বড় ধরণের রিপদের সম্ভাবনা আছে। কবিতা আবৃত্তির রীতিতে বা বক্তৃতার ঢং-এ নাটকের অমিত্রাক্ষর ছন্দ আবৃত্তি করলে সংলাপের অন্তর্নিহিত ভাবার্থ দর্শকদের কাছে অস্পষ্ট থেকে যাবে—খালি আবৃত্তির সুরটাই কানে বাজতে থাকবে। এই ধরণের ভুল যাতে না হয় সেজন্য এক সময় আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে অমিত্রাক্ষর ছন্দ কি ভাবে বলতে হবে অভ্যাস করেছি। এর জন্য আমি প্রধানত নজর দিতাম যাতে চরিত্রটির বক্তব্য স্পষ্টভাবে দর্শকের কাছে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে—সেজন্য যে শব্দের ওপর জোর দেওয়া উচিৎ—যে শব্দকে রঙিন করা দরকার বা যে শব্দের সুরটা জোরে বাজা উচিৎ সেগুলির প্রতি লক্ষ্য রেখে পাট তৈরী করতাম।

বিভিন্ন চরিত্র রূপায়ণে শিশিরকুমার নিজেকে কখনও repeat করতেন না। সাজাহান, আলমগীর, জাহাঙ্গীর শা, নাদির শা, বক্তিয়ার প্রত্যেকটি চরিত্রই বিভিন্ন সত্তায় ফুটে উঠতো তাঁর অভিনয়ে। এমন কি একই চরিত্রকে বিভিন্ন Interpretation-এ ফুটিয়ে তুলেছেন বিভিন্ন রাত্রির অভিনয়ে। যেমন চাণক্যকে কখনও করেছেন Cynic, কখনও Agressive, আবার সময়ে সময়ে অত্যন্ত প্রতিহিংসাপরায়ণ। এ জন্যই একই নাটকে তাঁর অভিনয় বারে বারে দেখেও ক্লান্তি আসতো না।

এ নিয়েও শিশিরকুমারের সঙ্গে আমার আলোচনা হয়েছে। বলতেন—'দেখ একই চরিত্রের নানা রকম interpretation হতে পারে। হ্যামলেট চরিত্র কত অভিনেতা কত ভাবে অভিনয় করেছেন। নাট্যকার অনেক সময়ে নিজেই জানেন না যে, সৃষ্ট চরিত্রটিকে নিয়ে তিনি ঠিক কি করতে চেয়েছেন। কারণ রচনার সময় তাঁর মনের তিনটে দিক—conscious, subconscious and supra-conscious, অর্থাৎ চেতন, অচেতন এবং অধিচেতন মানস কাজ করতে থাকে। তাছাড়া এদের মিশ্রণেও নানা আলো এসে পড়ে চরিত্রের উপর। অভিনেতা তাঁর পছন্দমত চরিত্রটির অন্তর্নিহিত সত্তাকে আবিষ্কার করবেন এবং মঞ্চে তাকে রূপায়িত করবেন—সব সময়ে যে একইভাবে তাঁকে চরিত্রটি সৃষ্টি করতে হবে, তারও কোন মানে নেই।

কস্তা ককেলাঁর মত শিশিরকুমারও অভিনেতার স্বৈতসত্তায় বিশ্বাস করতেন। আর আজকাল ইওরোপের রঙ্গমঞ্চে এটাই accepted theory.

তপতী এবং যোগাযোগ

রবীন্দ্রনাট্যে শিশিরকুমারের অভিনয় সম্বন্ধে এ-প্রবন্ধে আমি আলোচনা করলাম না, এই কারণে যে, এ বিষয়ে এত কথা বলবার আছে যে তার জন্য একটি আলাদা প্রবন্ধ লেখা দরকার। ভবিষ্যতে সুযোগ হলে সে চেষ্টা করবো। তবে 'তপতী' এবং 'যোগাযোগের' সম্বন্ধে দু' একটা কথা বলা প্রয়োজন।

নাটককে মঞ্চোপযোগী করতে হলে অনেক সময়েই edit করবার দরকার হয় পরিচালকের নির্দেশ অনুসারে। এ নিয়ে অনেক নামজাদা লেখক বিরক্ত হয়েছেন শিশিরকুমারের উপর। কেউ কেউ হয়তো এ কারণে এত রেগে গিয়েছেন যার ফলে তাঁদের নাটক শেষ পর্যন্ত শিশিরবাবুর থিয়েটারে মঞ্চস্থ করা সম্ভব হয়নি। শরৎচন্দ্রের সঙ্গেও সময়ে সময়ে এ নিয়ে মতদ্বৈধ হয়েছে শিশিরকুমারের এবং মতপার্থক্য হওয়াতেই শরৎচন্দ্র পল্লীসমাজের নাট্যরূপ শিশিরকুমারকে প্রথমটায় দিয়েও ফেরৎ নিয়ে গিয়ে অন্য মঞ্চে অভিনয় করতে দেন। শেষে সেখানে নাটকটি ফ্লপ করলে পরে নাটকটি এনে শিশিরকুমারের হাতে দিয়ে বলেন যে, শিশিরকুমার যা ভাল বোঝেন সেইভাবেই যেন নাটকটির অভিনয় করেন। সকলেই জানেন পল্লীসমাজের নাট্যরূপ 'রমা' শিশিরবাবুর নির্দেশে এবং পরিচালনায় বিরাট সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়েছিল। নাট্যাচার্যের পরামর্শেই 'দেনাপাওনা'র নাট্যরূপ ষোড়শীর শেষ দিকটা ট্র্যাজেডীতে পরিণত হয়। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু ছিলেন সম্পূর্ণ অন্য ধরণের —এ সব বিষয়ে তিনি ছিলেন অত্যন্ত উদার প্রকৃতির। শিশিরকুমারের নাট্য-পরিচালনার ক্ষমতা এবং অভিনয়-প্রতিভা সম্বন্ধে কবি অতি উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন। তপতী (১ম সংস্করণ) অভিনয়ের সময় কিছু কিছু জায়গায় রি-রাইট করে দেবার জন্য কবিকে অনুরোধ করেন নাট্যাচার্য এবং সেই অনুসারে কবিও সেই জায়গাগুলি আবার নতুন করে লিখে দেন। এই পরিমার্জিত তপতীই শিশির-বাবু মঞ্চস্থ করেন। পরে ঐ পরিমার্জিত তপতীই দ্বিতীয় সংস্করণ হিসাবে প্রকাশিত হয়েছিল। শিশিরবাবুর একমাত্র পুত্র শ্রীঅশোক-কুমার ভাদুড়ি আমাকে বলেছেন যে প্রথম সংস্করণের তপতী এবং তার সঙ্গে কবির সাদা কাগজে নিজের হাতে লেখা সংশোধিত অংশ-গুলি (ঐ বইয়ের সঙ্গে ষ্টিচ করা রয়েছে) তাঁর কাছে রয়েছে। আর একথাও অনেকেই জানেন না যে, শিশিরকুমার যখন যোগাযোগ মঞ্চস্থ করেন তখন ঐ উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়েছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। দুর্ভাগ্যবশত রবীন্দ্রনাথের স্বহস্তে লেখা নাট্যরূপটি অশোক-

শুভ শারদীয়া উৎসবে

আমরা আমাদের

শুভানুধ্যায়ী সকলকে

প্রীতি অভিনন্দন জানাই—

সাপ্লায়ার টী কোং

ফোন—২২-৬১৫০

সেল ডিপো :—

৮এ, লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১

৯১, নেতাজী সুভাষ রোড,

কলিকাতা-১

বিজয়ার সাদর সম্ভাষণ

সবার রঙে
রং
মেশান,

এবং আপনার
নিজস্ব অত্যাশ্চর্য্য
নূতন সৌন্দর্য্যজগত
সৃষ্টি করুন

আফগান স্নো

সৌন্দর্য্যবর্দ্ধক

ই, এস, পাটানওয়ালা, বম্বে-৭৭

বাবু খুঁজে পান নি নাট্যাচার্যের মৃত্যুর পর—তবে অন্যের হাতে লেখা সেই নাট্যরূপের এ্যাকটিং কপি তাঁর কাছে আছে। কিন্তু স্বহস্তে লেখা কপিটি হারিয়ে গেছে বলেই তো এত বড় একটা ব্যাপারকে ইগনোর করা যায় না। এলিজাবীথান টাইমসে রচিত কয়েকটি নাটক সেক্সপীয়ারের লেখা কিনা সে সম্বন্ধেও তো অনেক বাক্-বিতণ্ডা আছে এবং ভাষাবিদেরা বছরের পর বছর তাই নিয়ে গবেষণা চালিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগের নাট্যরূপটিও তো একই ভাবে আমাদের দেশের ভাষাবিদদের গবেষণার বিষয় হওয়া উচিৎ। এ সম্বন্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবার জন্য আমি বিশ্বভারতী এবং রবীন্দ্রভারতীর কর্তৃপক্ষীয়দের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তাঁরা যদি শ্রীযুক্ত অশোক ভাদুড়ির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন তাহলে আরও বিশদভাবে এ ব্যাপারের খুঁটিনাটি জানতে পারবেন। আমার নিজেরও একথা মনে আছে 'যোগাযোগ' মঞ্চস্থ হবার কিছু আগে কলেজ ষ্ট্রীটে একটি বইয়ের দোকানে শিশিরকুমারের সঙ্গে একদিন সকালে আমার দেখা হয়েছিল। তিনি আমাকে বললেন যে, কয়েক দিনের জন্য শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে—রবীন্দ্রনাথ তখন যোগাযোগের নাট্যরূপ দিচ্ছিলেন এবং শিশিরবাবুকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন দু'একটা জায়গা সম্বন্ধে আলোচনা করবার জন্য।

● শিশিরকুমারের কয়েকটি চিঠি

১৯৫৬ সালে আমি ছিলাম লণ্ডনে—ওখানকার নানা খবর দিয়ে মাঝে মাঝে শিশিরবাবুকে চিঠি দিতাম। শিশিরকুমারও নিয়মিতভাবেই উত্তর দিতেন। এপ্রিল মাসে লেখা একটি চিঠিতে ছিল—

278, Barrackpore Trunk Rd.
Calcutta—36
2. 4. 56.

স্নেহের অশোক,

আজ ৪।৫ দিন হোলো তোমার চিঠি পেয়েছি। নানা গোলমালে উত্তর দিবার সুবিধা হয়নি।—না, কোন থিয়েটার পাওয়া এখন সম্ভব নয়। বোধহয় ৮।১০ মাসের মধ্যে সম্ভব হবে না।

তুমি আনন্দ পাচ্চ শুনে খুসী হলাম। খুব দেখেশুনে বেড়াও। চোখ দটি খোলা রাখবে। যেখানে ভাল দেখবে সেটা মনে গেঁথে নেবে। একটা কথা, বিদেশে নিজের দেশের বা নিজের দেশের লোকের নিন্দা কোরতে নেই। এই কথাটি মনে রেখো।

আমাদের দেশের সরকার আমাকে সাহায্য কোরবে—এ-ধারণা মন থেকে দূর কর।

আমার শরীর খুব খারাপ নয়। অবশ্য একটু-আধটু গোলমাল এ বয়সে থাকা স্বাভাবিক।

আশা করি ভালই আছ। ইতি

চিরকল্যাণকামী
শিশিরকুমার ভাদুড়ি

এই সময় লণ্ডনের থিয়েটার সংক্রান্ত সাপ্তাহিক দি ষ্টেজ (7th June 1956) পত্রিকায় আমার ভারতীয় ষ্টেজ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ বের হয়। এ-পত্রিকাটি স্যার হেনরী আরভিং-এর সময় থেকে প্রকাশিত হচ্ছে—with the largest circulation in all branches of the Professional Stage. এই পত্রিকার একটি কপি শিশিরবাবুকে পাঠিয়েছিলাম। শিশিরবাবুর চিঠি পেলাম ১৮-৭-৫৬তে—

স্নেহের অশোক,

তোমার দু'খানি চিঠি ও Stage কাগজ পেয়েছি। তোমার লেখায় দু'টো কথা বাদ পড়েছে। (১) বাংলায় drama-র tradition বহুদূর বিস্তৃত। যাত্রা আজ ছশো বছরের চেয়েও পুরাতন। শ্রীচৈতন্যদেব নিজে যাত্রায় রাধিকা সেজেছিলেন। (২) গিরিশবাবু খুব বড় অভিনেতা ছিলেন কিন্তু এক জায়গায় তাঁর চেয়ে বাংলার থিয়েটারে আমার স্থান বড়। বাংলায় Production আমিই প্রথম প্রবর্তনা করি। ওঁদের সময় art of production সম্বন্ধে কোন ধারণা ছিল না।

এ-সম্বন্ধে অনেক কথা লিখবার আছে। কিন্তু আমার চোখ খারাপ, শরীর ও মন ভেঙ্গে পড়েছে, সুতরাং দীর্ঘ চিঠি লিখবার ধৈর্য নেই।

দুটি বিষয়ে তুমি আমাকে সাহায্য কোরতে পারলে ভাল হয়। (১) যদি RADA-র ঠিকানা সংগ্রহ করে তাদের একখানা Prospectus আমাকে পাঠাও বড় উপকার হয়। (২) Stage-এ আমি যদি বাংলা থিয়েটার সম্বন্ধে কিছু লিখি তারা কি রকম টাকা দিতে পারে? Statesman একটা article চাইচে। অতএব লিখতেই হবে। আশা করি ভাল আছ—

ইতি—মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী
শিশিরকুমার ভাদুড়ি

এর পরের চিঠির তারিখ ১-৯-৫৬—শিশিরবাবু লিখেছেন—

অশোক,

তোমার পাঠানো Prospectus ও চিঠি পেয়েছি প্রায় এক মাস হোল। শারীরিক ও সাংসারিক অসুবিধা থাকাতে উত্তর দিতে দেরী হোল। চোখের অসুখও একটা কারণ। লিখতে বড়ই কষ্ট পাই।

তুমি এক বছরের মধ্যে শিখে নেবার যে বিপুল আয়োজন করেচো তা যদি খানিক অংশেও সফল করে তুলতে পারো, তাহলে দেশে ফিরে এলে দেশের নাট্যশালার অনেক উপকার কোরতে পার। Formগুলির দিকে বেশী নজর দিও না। ওগুলো চিন্তা-বিলাসী রসিক জনের জন্য। নাটকগুলো শিক্ষকদের সাহায্য পোড়ো।

Bertolt Brecht সম্প্রতি অল্প বয়সে মারা গেছেন। তাঁর বই এখানে পাওয়া যায় না। যদি দু'একখানা আনতে পারো সঙ্গে এনো। Three Penny Opera-র খুব নাম। Clandel-এর ইংরাজী অনুবাদ আমি পাই নি। Tolstoi-এর চারিখানি বড় নাটক—তার মধ্যে একখানির শেষ অঙ্কের dialogue নেই, শুধু ynopsis আছে—অমূল্য।

আর একটা কথা :—Foyles-এর দোকানে (119—125 Charing Cross) একবার খোঁজ নিতে পার যদি, খোঁজ নিও Gordon Craig-এর 'The art of the Theatre' ও 'Books and Theatre' out of print হয়েছে কি? পুরাতন কপি ওদের দোকানে পাওয়া গেলে দাম কত পড়বে?

আশা করি ভাল আছ।

মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—শিশিরকুমার ভাদুড়ি

পুঃ একটু সুস্থ হলে খুব বিস্তৃত চিঠি দিতে পারবো।

ইতি—শিঃ

আমি দেশে ফেরবার সময় নাট্যাচার্যের জন্য ব্রেখ্‌টের 'মাদার কারেজ' এবং 'ককেশিয়ান চক্ সারকল্' নাটক দুটি নিয়ে এসেছিলাম। তখনও ব্রেখ্‌টের নাটক এদেশে পাওয়া যেত না। অবশ্য দু' এক বছর বাদে ব্রেখ্‌টের নাটক কলকাতায় আসতে সুরু করে এবং শিশিরকুমার খুব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ব্রেখ্‌টের নাটক পড়তে শুরু করেন। ব্রেখ্‌টের 'থ্রী পেনী ওপেরা' বৃটিশ কবি জন গে'র 'বেগার্স ওপেরা'র' নবরূপায়ণ—ইউরোপে 'থ্রী পেনী ওপেরা' অত্যন্ত জনপ্রিয়। তবে বই পড়ে এই ওপেরাটির ঠিক রস গ্রহণ করা যায় না—মঞ্চরূপায়ণ দেখতে হয়।

সর্ব্বভারতীয় তাঁতবস্ত্র ও ফ্যান্সী সাড়ীর বিপুল আয়োজন
ধনেখালী, টাঙ্গাইল, শান্তিপুর, ঢাকাই
ও মুর্শিদাবাদ সিল্ক ইত্যাদি।
স্বদেশী শিল্প ফ্যাক্টরী জুয়েলার্স
(বস্ত্র বিভাগ) ফোনঃ ৩৪-৩৫৫২
২১৩, বিধান সরণী (ঠনঠনিয়া) কলিকাতা-৬

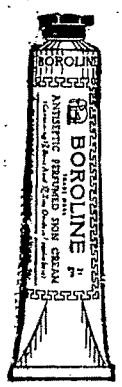

বোরোলীন

সার্বজনীন সর্বাঙ্গীন

ক্রীম

বোরোলীন হাউস, কলিকাতা-৩

কুডেলের ৯খানি নাটকের ইংরাজী অনুবাদ বৃটিশ ড্রামা লীগ লাইব্রেরীতে পড়ে আমার ভাল লেগেছিল—তাই শিশিরকুমারের মতামত জানতে চেয়েছিলাম। টলষ্টয়ের নাট্য গ্রন্থাবলীর একটি পুরানো কপি পেয়েছিলাম কয়েলসের দোকানে। সত্যিই এ-শ্রেণীর বাস্তববাদী নাটক সহসা চোখে পড়ে না—বিশেষভাবে আমাকে মুগ্ধ করেছিল টলষ্টয়ের 'পাওয়ার অভ ডার্কনেস' নাটকটি।

গর্ডন ক্রেগের বইগুলি তখন সত্যিই আউট অভ প্রিণ্ট ছিল—পুরাণো কপিরও খোঁজ পাইনি 'আর্ট অভ দি থিয়েটার' থেকে বিশদভাবে নোট নিয়ে এসেছিলাম। পরে অবশ্য বইটির নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল।

এর পরের চিঠিটির ডেট দেওয়া নেই—কিন্তু পোষ্টমার্ক রয়েছে ১৯-১০-৫৬'র। আমার চিঠিতে লেক ডিষ্ট্রীক্টে যাবার খবর পেয়ে, কিছু দিন কাদে শিশিরবাবু লিখেছিলেন:

অশোক,

এতদিনে Lake থেকে নিশ্চয় ফিরে এসেচো। ফিরবার পথে Suitzerland হয়ে এসো। ইংরাজী সাহিত্যে Lake countryকে খুব glorify করা হয়েছে। Suitzerland ও North Italy-র lake country দেখলে বুঝতে পারবে সেখানে প্রকৃতি অনেক বেশী রমণীয়। আমাদের দেশের কাশ্মীর ইউরোপীয়দের কাছেই ভূস্বর্গ। যাক, আমার একটি কাজ কোরো—Sybil Thorndike একখানা, কাগজে নাম, Plays and players তাদের World Tour সম্বন্ধে লিখচে। প্রবন্ধটির নাম 'Our World Tour—তাতে তাঁদের ভারতবর্ষ, বিশেষত কলিকাতার থিয়েটার সম্বন্ধে কিছু যদি লিখে থাকে আমাকে জানিও। আমাদের রঙ্গমঞ্চ থেকে Sybil বলেছিলেন Irish abbey theatre ছাড়া আর কোথাও তিনি এমন সুচারু অভিনয় দেখেননি। আরও অনেক বড় বড় কথা। আমার সন্দেহ ছিল এটা নিছক Complementary কথা আমাদের ভোলাবার জন্য। এখন ছাপার অক্ষরে কি বলেচেন জানতে কৌতূহল হয়। June মাস থেকে বোধ হয় articleটা বেরুচ্ছে। গাদা চামড়ার লোক কাল আদমির প্রশংসা নিজের দেশে বড় একটা করে না। কবে ফিরবে? বিজয়ার স্নেহাশীর্বাদ গ্রহণ কোরো। ইতি—

নিয়ত মঙ্গলাকাঙ্খী
শিশিরকুমার ভাদুড়ি

শিশিরবাবুকে জানিয়েছিলাম যে, তাঁর ধারণাই ঠিক—দেশে ফিরে সিবিল থর্ণডাইক স্মৃতি ধারণ করেছেন —কলকাতার থিয়েটার সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য তেমন কিছুই লেখেন নি। একথাও জানিয়েছিলাম যে, ইউরোপ এবং আমেরিকাতে নিজের দেশের থিয়েটার ছাড়া অন্য দেশের থিয়েটার সম্বন্ধে জানবার বোঝবার বিশেষ কৌতূহলও নেই। আইভর নোভালো যখন হলিউডে ছবিতে কাজ করতে যান তখন আমেরিকার থিয়েটারের লোকেদের কাছে ইংলণ্ডের তখনকার মঞ্চের যশস্বী অভিনেতা-অভিনেত্রীদের (যথা গ্ল্যাডিস কুপার) নামোল্লেখ করে দেখেন যে, আমেরিকানরা তাঁদের ভাল করে চেনেনই না। ১৯৫৬ সালে আমেরিকান ষ্টেজ এ্যাকট্রেস হেলেন হেজ ইংলণ্ডের মঞ্চাভিনয় সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য করে বলেন, এ ধরণের সিপসড এ্যাকটিং আমেরিকাতে দর্শকেরা বরদাস্ত করতো না। এ নিয়ে তুমুল ঝড় উঠেছিল লণ্ডনের থিয়েটার মহলে। ১৯৫৭ সালে আমেরিকান অভিনেতা টাইরণ পাওয়ার এলেন লণ্ডনে বার্ণার্ড শ'য়ের 'দি ডেভিলস ডিসাইপল' নাটকটির মঞ্চাভিনয় দেখাতে। দর্শকদের মন্তব্য শুনে বুঝলাম এ সব বই গিলগুড, অলিভিয়ার করলে একটা মানে হোত। আমেরিকান এ্যাক্টর এ সব নাটকে কি অভিনয় দেখাবে। নিজেদের ভেতরই যাদের এত গোলমাল তারা ভারতীয় অভিনেতাদের কিভাবে গ্রহণ করবে সহজেই অনুমান করা যায়। তবে রাজনীতিক কারণে ইংলণ্ড বা আমেরিকাতে রাম, শ্যাম, যদুর আগমনকেও বিরাটভাবে কাগজে ফ্যাস করতে এদের বাধে না। আমার নিজের ধারণা রাশিয়ানরা এ সব বিষয়ে অনেক অনেষ্ট।

যাক শিশিরকুমারের পরের চিঠির তারিখ ৬-১১-৫৬। লিখেছেন—

স্নেহের অশোক,

তোমার চিঠির উত্তর দিতে খুবই বিলম্ব হোলো। আজকাল অত্যন্ত দীর্ঘসূত্রী হয়ে পড়েছি। বিশেষ কাজ নেই, শরীরও ভাল নয়—মনের অবস্থ বড়ই apathetic তাইতে কলম ধরতে ইচ্ছা হয় না।

যাই হোক, তুমি London school of Journalism থেকে Diplema পেয়েচো শুনে খুশী হলাম। এখানে এসে Journalismই career কোরবে বলে মনে হয়। সকল রকমে নিজেকে fit কোরচো এও খুব সুখের বিষয়। এ দেশ drama ও থিয়েটারের critic নেই। উপযুক্ত লোকের future আছে সন্দেহ নেই। ভগবান তোমাকে জয়যুক্ত করুন।

ও দেশে রণ-দামামা বেজে উঠলো। ফিরবার সময় হয়তো তোমাকে অনেক কিছু না দেখেই চলে আসতে হবে। Egypt ও Hungary নিয়েই বোধহয় তৃতীয় world war সুরু হবে। ওখানে martial temparature কোন দিকে উঠচে না পড়চে। এখানকার কাগজ পড়ে কিছু বোঝা যায় না।

—আমার এখন অজ্ঞাতবাসের অবস্থা। সামনে করবার কিছু নেই। কিছু লিখবার চেষ্টা করচি। কতখানি সফল হব জানি না।

Craig এর বইখানি Heinemauna কোম্পানী Reissue করেচে। ২৫ শিলিং দাম করেচে। একখানা order দিয়েচি। কবে পাবো জানি না। Suez তো বন্ধ। তুমি একখানা সংগ্রহ কোরো। যদি এদিক দিয়ে না পাই তোমার বইখানাই উলটে দেখবো।—আজ ৬ই নভেম্বর, তুমি বোধ হয় জানুয়ারীর শেষে ফিরবে। হয়তো তত দিনে আমি একটা engagement পাবো।

এখানে---থিয়েটার বাড়ীটা Air condition কোরে modernise কোরচে। তবে এদের যেমন commercial outlook তাতে auditorium টাই শুধু উন্নত কোরবে। আসল জিনিষ অর্থাৎ stage এর উন্নতি কোরবার কোন প্রচেষ্টা নেই।

আশা করি, তুমি ভাল আছ।

তোমার ফিরে আসবার প্রতীক্ষায় রইলাম। আমার স্নেহাশীর্বাদ গ্রহণ করো।

সর্বদা মঙ্গলকামী
শিশিরকুমার ভাদুড়ি

উপরের চিঠিতে একটা জিনিষ লক্ষ্যণীয়—বই আর পড়াশুনাই ছিল নাট্যাচার্যের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য।

শিশিরকুমারের শেষ যে চিঠি পাই তার ডেট হচ্ছে ৭-১-৫৭, লিখেছেন:

অশোক,

তোমার শেষ চিঠিখানির উত্তর দেওয়া হয়নি। ৫ই তারিখে তোমার নভেম্বর মাসে ডাকে দেওয়া বড়দিনের শুভেচ্ছা পেলাম। ছবিখানি বড় ভাল লাগলো। নিশ্চয়ই ভাল আছ। দেশে ফিরচো কবে? আমার আন্তরিক শুভ ইচ্ছা গ্রহণ করো। আমার নতন কিছু খবর নেই।

আশা করি, February মাসেই দেশে ফিরবে। ইতি—

নিত্যকল্যাণকামী
শিশিরকুমার ভাদুড়ি।

শিশিরকুমারের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে বহু বছর কাটিয়েছি—তাঁর মত উদার, স্নেহশীল, বিরাট ব্যক্তিত্ব এবং পাণ্ডিত্যসম্পন্ন লোক আমি খুব কমই দেখেছি। তাঁর সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখতে বসে ভেবেছিলাম অনেক কথাই পাঠকদের কাছে বলতে পারব—কিন্তু ক্রমশই প্রবন্ধের আকৃতি স্ফীত হচ্ছে দেখে এইখানেই আমাকে শেষ করতে হচ্ছে। ভবিষ্যতে সুযোগ পেলে শিশিরকুমারের নানা দিক সম্বন্ধে আরও নানা কথা বসুমতীর পাঠকদের কাছে বলতে পারবো বলে আশা রাখি।

ডোমনের মুক্তি আসন্ন। কিন্তু ঠিক করে, অনেক হিসেব করেও স্থির করতে পারছে না। তার তিন বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছিল। তার ফলে কিছু দিন ছুটি বাদ যাবে। কতদিন সেইটেই ঠিক করতে পারছিল না।

পিছনের দিকে চায়।

উঃ! সে কত দিন! তিন বছর যে এতদিন, জেলের বাইরে থাকতে একদিনও মনে হয়নি। জেলের বাইরে রেল গাড়ির মতন হু হু করে দিন কেটে যায়। জেলের ভিতরে দিনগুলি গরুর গাড়ির চেয়েও মন্থর। যত না চলে, শব্দ করে এবং ধুলো উড়ায় তার চেয়ে অনেক বেশি।

যে দিনে সে ধরা পড়ল, সে যেন বহুকালের দুঃস্বপ্ন-ঢাকা একটি দিন। প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি ঘটনা মনে পড়ে। কিন্তু কেমন আবছা-আবছা।

কি করে কি যেন হয়ে গিয়েছিল।

খুন করার ইচ্ছে তার ছিল না। প্রয়োজনও ছিল না। চোরাই মাল বিক্রির টাকায় পকেট ভর্তি ছিল। কিছু তার সেই গরমে, কিছুটা মদের নেশার জন্য বটে, খুন করে ফেলেছিল। তাও হয়ত হতো না। লোকটার ভাগ্যদোষে ছোরাটা এমন বেকায়দায় পড়েছিল যে, হাসপাতালে নিয়ে গিয়েও তাকে আর বাঁচানো গেল না।

তবে, মামলা চালিয়েছিলেন বটে তার উকিল। সার্থক তাঁর লেখাপড়া শেখা। সমস্ত মামলাটা ভদ্রলোক তালগোল পাকিয়ে এমন জটিল করে তুলেছিল যে, কে খুন হলো আর কে খুন করলো সব গুলিয়ে গিয়েছিল। উকিলের অসাধ্য কাজ নেই। নইলে কবে ডোমনের ভবলীলা সাঙ্গ হতো।

শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী

আবার ছাড়া পাবে, আবার স্ত্রী-পুত্রের সঙ্গে দেখা হবে, একথা ভাববার সুযোগই আসত না।

● স্ত্রী কামিনী আর একটি তিন মাসের ছেলে

স্ত্রী কামিনী, আর একটি তিন মাসের ছেলে, তার তখনো নামকরণ হয়নি। এখন কি নামে ডাকে কে জানে।

ছেলেটার জন্যে ডোমনের মন তত উসখুস করে না, ক'দিনই বা দেখেছে তাকে? আর কতক্ষণের জন্যই বা? বাড়িতে সে কতটুকু সময়ই বা থাকত?

কিন্তু কামিনীর জন্য মাঝে মাঝে মনটা চঞ্চল হয়, বেচারা তার হাতে বহু দুঃখ পেয়েছে, বহু লাঞ্ছনা ভোগ করেছে। সব দিন ভাল করে খেতেও পায়নি। তার ক্ষুধা মিটিয়ে হাঁড়িতে কতটুকই বা পড়ে থাকত? মুখে কিছু না বললেও সে তো বুঝতে পারত সবই।

ধরা পড়ার দু'দিন আগে কি মারটাই না তাকে দিয়েছিল। অনাহার-ক্ষিণ্ণ বউটা মারের চোটে কি পরিমাণ কাৎরেছিল। বস্তির লোকেরা তার করুণ কাৎরানিতে জেগে উঠে তাদের মাঝখানে না পড়লে কামিনী মরেই যেত হয়ত।

এমন অনেক দিন ঘটেছে। কিন্তু এই শেষ দিনের কথাটাই তার বেশি করে মনে পড়ে। বোধ হয় সূতাটা সেইখানে ছিঁড়ে রেখে এসেছে বলে। ফিরে গিয়ে সেই সূতো আবার জোড়া লাগাবে।

অভাব, অনটন, দুঃখ এ তো তাদের জীবনের নিত্য-সঙ্গী। ফিরে গিয়েও

থাকবে। মনে মনে ডোমন প্রতিজ্ঞা করেছে, মারধোর আর সে করবে না। এর জন্যে নিজেকে সে তত দোষ দেয় না, যত দোষ দেয় মদ্য-পানের অভ্যাসকে। যা-কিছু দুর্ব্যবহার সে করে, মদের ঝোঁকেই করে। তিন বৎসর জেলে থাকার ফলে মদ্য-পানের অভ্যাসটা গেছে। স্থির করলে, ফিরে গিয়ে আর সে মদ ছোঁবে না। তার পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গেও মিশবে না। খাটবে—খুটবে, যা জোটে তাই খাবে, যাকে বলে দুঃখের অন্ন সুখ করে খাওয়া।

কিন্তু, ছাড়া সে পাবে কবে? তার মন মুক্তির জন্য ভয়ানক ব্যস্ত হয়ে উঠেছে।

তার কাজ ঘানি-ঘরে।

কিছুদিন থেকেই বুকের মধ্যে সে একটা কেমন যন্ত্রণা অনুভব করে। প্রথম প্রথম কর্তৃপক্ষ সেটাকে তেমন আমল দেননি। ভেবেছিলেন ওটা কয়েদি-সুলভ ছল-মাত্র। কাজে না যাবার ফন্দি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ডাক্তার ডাকতে হলো। তিনি তৎক্ষণাৎ তাকে জেলের হাসপাতালে পাঠিয়ে দিলেন।

শুয়ে-বসে, জেলের হাসপাতালের অপেক্ষাকৃত ভাল খাবার খেয়ে দিন তার মন্দ কাটছিল না।

ইতিমধ্যে হঠাৎ একদিন অপরাহ্নে আপিসে তার ডাক এলো।

ভয়ে ভয়ে আপিসে গেল।

মুক্তি।

তার ছুটি হয়ে গেল। এখনই, এই মুহূর্তে। জেলের বন্দীদের কাছ থেকে বিদায় নেবার সময়ও পেলে না। তিন বৎসর আগে যে পোশাকে সে জেলে এসেছিল,— একখানা ধুতি, একটা হাফসার্ট আর একজোড়া জুতো —সেগুলো তাকে দেওয়া হলো। জেলের পোশাক বদলে সেগুলো পরে সে নিজেই অবাক হয়ে গেল। অনেক দিন ধুতি-সার্ট পরেনি। নিজেকে কি রকম অস্বস্তিকর হাল্কা বোধ হচ্ছিল। সকৌতুকে নিজের দিকে চেয়ে হাসল।

সবচেয়ে অবাক হয়ে গেল, মনের আনন্দ উথ্‌লে উঠেছে বটে, কিন্তু গত কিছু কাল ধরে মুক্তির যে পিপাসা তাকে পীড়া দিচ্ছিল, সেটা আর নেই। যাবার যেন তাড়া নেই। হচ্ছে, হবে। ছুটি যখন হয়ে গেছে তখন ধীরে-সুস্থে গেলেই চলবে। শুধু, গালে হাত দিয়ে ভাবলে, রাস্তায় দাড়িটা কামিয়ে নিতে হবে। কতকাল গায়ে তেল পড়েনি। কোথাও একটু তেল মেখে স্নান করে নিতে পারলে ভালো হতো। এই রুক্ষ চেহারা নিয়ে কামিনীর সামনে দাঁড়াতে তার লজ্জা করছে।

কিন্তু তেল আর কে দেবে? স্নানই বা করবে কোথায়? জেল-গেটে যা তার জমা আছে, তা দিয়ে সেলুনে দাড়িটা কামানো চলতে পারে।

জেলের খাতায় সই দিয়ে সে বেরিয়ে পড়ল। জেলের প্রকাণ্ড বড় ফটকটার ছোট দরজাটা খুলে দিলো। ডোমন বাইরে এলো।

তিন বৎসর পরে রাজপথ এবং রাজপথের জনতার দিকে চেয়ে সে প্রথমটা ভড়কে গেল। সহরটা এই তিন বৎসরে কি ভয়ানক বদলে গেছে।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ তার ভিতকার দুর্ধর্ষ গুণ্ডাটা যেন জেগে উঠল। এই চলমান জনতার সঙ্গে নতুন করে পরিচয় করার দরকার। ট্রাম-বাস ছেড়ে দিয়ে সে লম্বা লম্বা পা ফেলে হাঁটতে আরম্ভ করল।

তাড়া কি? কামিনী তার জন্যে অপেক্ষা করে নেই। আজ সে ছাড়া পাবে, তা সে নিজেই জানত না। কামিনী তো দূরের কথা। এখনও একটু বেলা আছে। সন্ধ্যার মুখে হঠাৎ কামিনীর সামনে দাঁড়িয়ে তাকে সে তাক লাগিয়ে দেবে।

পাশেই একটা সেলুন।

অন্য কথা ভাবতে ভাবতে দাড়ি কামানোর কথা সে ভুলেই গিয়েছিল। সেলুনটা দেখে দাড়িগুলো উসখুস করে উঠল।

ঠিক হয়েছে। এইখানেই চুলও ছেঁটে নেওয়া যাবে। একটু স্যাম্পু করিয়ে নিলেই একেবারে রাজপুত্র। বস্তির লোকেরা ভাবতেই পারবে না সে জেল-ফেরত কয়েদী। ট্রামের ভাড়াটা বেঁচে গেছে। পয়সার অকুলান হবে না।

ডোমন গম্ভীরভাবে একটা চেয়ারে গিয়ে বসল: বেশ ভালো করে চুলটা ছেঁটে দাও তো দেখি।

ডোমন মোজসে পা দোলাতে লাগল। সামনেই আয়না। আয়নায় নিজের চেহারা দেখে নিজেই সে চমকে উঠল।

কি সর্বনাশ! নিজেকে সে নিজেই চিনতে পারছে না। ভাগ্যিস বুদ্ধি করে সেলুনে ঢুকেছিল। নইলে কামিনী তাকে দেখে ভয়ে আঁৎকেই উঠত হয়ত।

নিজের বুদ্ধির সে মনে মনে তারিফ করলে। লেখাপড়া শেখেনি বটে, বুদ্ধিটা তার শিশুকাল থেকেই তীক্ষ্ণ।

দেখলে, সেলুনের নাপিতটা অবাক হয়ে তার দিকে চেয়ে আছে। বোধহয়, এ রকম চেহারার কোন লোকের চুল এর আগে কখনও সে কাটেনি।

কিন্তু ডোমন তাকে অবাক হবার বেশি সময় দিল না। ধমক দিলে: হাঁ করে দেখছ কি? লাগাও।

লোকটি চুল ছাঁটে। কাঁচির একটানা এক ঘেয়ে শব্দ চলে। ডোমন আয়নায় নিজের মুখকান্তি দেখে আর ভাবে। এলোমেলো নানাকথা ভাবে: জেলের কথা, জেলের বন্ধুদের কথা, পূর্ব-জীবনের কথা, সে সময়কার বন্ধুদের কথা, এলোমেলো আরও নানা কথা। কিন্তু সমস্ত চিন্তা ঘুরে-ফিরে একবার কামিনীকে স্পর্শ করে যায়।

কামিনীর কথায় পুজি তার জীবনে বেশি হবার সুযোগ পায়নি। তার দিকে চাইবার সময়ই বা কতটুকু পেয়েছে? কিন্তু এই সেলুনে বসে সামনের বড় জায়গায় নিজের মুখের দিকে চেয়ে সেই স্বল্পপুঁজি যেন অনেক হয়ে গেছে। তার হৃদয়ের মধুচক্রে বিন্দু বিন্দু করে মধু জমতে লাগল।

চুল ছাঁটা, ক্ষৌরকর্ম এবং স্যাম্পু শেষ করে লোকটি যখন ডোমনের কেশচর্চা করলে, আয়নার দিকে চেয়ে ডোমন চমকে উঠল। একটু আগে

আয়নায় যে ডোমনের মুখ দেখা যাচ্ছিল এ যেন সে ডোমন নয়। সেই আগেকার ডোমন। কি হয়ত তারও চেয়ে সুন্দর এক ডোমন।

পয়সা মিটিয়ে দিয়ে ডোমন বাড়ীর দিকে চলল। হেঁটে নয়, বাসে।

বাড়ী ফেরবার তাড়া এসে গেছে।

বস্তি অন্ধকার। নিস্তব্ধ।

এই সময়টা এই রকমই থাকে। পুরুষেরা সকাল দশটাতেই যে যার কাজে বেরিয়ে যায়। তাদের এইবার ফেরার সময় হবে। মেয়েরা দ্বিতীয় দফা বেরিয়ে যায় বিকেল সাড়ে তিনটায়, কলের জল এলে। তাদেরও ফেরবার সময় হয়ে আসছে। তারা ফিরলেই উনুনে-উনুনে আগুন দেওয়া হয়। ধোঁয়ায় চারিদিক অন্ধকার হয়ে যায়। আর তারি মধ্যে আরম্ভ হবে কোলাহল।

মাঝের এই সময়টুকু বস্তি নিস্তব্ধ থাকে।

ডোমনের মনে হলো, নিরিবিলি সকলের অগোচরে প্রথম সে কামিনীর সামনে দাঁড়াতে পারবে। তাকে একেবারে চমকে দেবে।

পা টিপে-টিপে ডোমন নিজের ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালো। দেখে ঘর তালাবন্ধ। কামিনীকে চমকে দেবে কি, ডোমন নিজেই চমকে গেল।

ঘর তালাবন্ধ কেন? কামিনী কোথায় গেল? ভাবলে, অভাবে পড়ে আর পাঁচ জনের মতন কামিনীও হয়ত দাসীবৃত্তি করতে বেরিয়েছে।

ডোমনের বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠল। কামিনীর উপর সে নির্যাতন অনেক করেছে সত্যি, কিন্তু কখনও তাকে দাসীবৃত্তি করতে দেয়নি। ডোমনের অভাবে আজ কামিনীকে দাসীবৃত্তি করতে হয়েছে।

ডোমন স্তব্ধভাবে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল।

হঠাৎ তার মনে পড়ল ছেলেটার কথা। সে তো থাকবে। ভাবলে হয়ত অন্য ছেলেদের সঙ্গে খেলা করছে। কিন্তু ডাকবে যে, তার নাম তো জানা নেই।

বিমূঢ়ের মতন ডোমন দাঁড়িয়ে রইল।

—কে?

হরেরামের কণ্ঠস্বর।

—আমি ডোমন, হরেরাম। এরা সব গেল কোথায়? সে কথার জবাব না দিয়ে হরেরাম জিজ্ঞাসা করলে, সটান জেল থেকে ফিরছ?

—হ্যাঁ। তোমাদের খবর সব ভাল?

—চলে যাচ্ছে মোটামুটি। তুমি ভালো ছিলে তো?

—ছিলাম একরকম।

হরেরাম হঠাৎ খুব ব্যস্ত হয়ে উঠল। বললে, কলে গিয়ে হাত-মুখটা ধুয়ে এসে আমার ঘরেই বোসো। বরং আমি একটু চায়ের জোগাড় দেখি।

হাতমুখ ধুয়ে এসে ডোমন হরেরামের ঘরে তার তক্তপোষের উপর গিয়ে বসল। একটু পরেই দু-হাতে

দু-পেয়ালা চা নিয়ে হরেরাম ঘরে ঢুকল। ডোমন আবার জিজ্ঞাসা করলে, এরা কোথায় গেল? ছেলেটাকেও দেখছি না।

সংক্ষেপে হরেরাম বললে, বলছি। চা-টা খেয়ে নাও।

ডোমন মনে মনে কি রকম অস্থির হয়ে উঠছিল। চা-পানের পর প্রশ্নটা আবার করল।

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে হরেরাম বললে, তিন চার দিন আগে তারকেশ্বর যাবে বলে বেরিয়েছে। পরের দিন ফেরবার কথা ছিল। তা এখনো তো ফেরেনি দেখছি।

—একা গেছে?

নতমুখে গুন্ গুন্ করে হরেরাম বললে, না, একা নয়। ইদানীং একা তো সে থাকত না। আরেকটি লোক জুটে গেল।

বলেই অনেকটা কৈফিয়তের সুরে বললে, না-জুটিয়েই বা কি করবে বল? চেতো-নেটো মেয়ে, কোলকাতা সহরে একা থাকাও তো সোজা নয়। তাই আমরাও আপত্তি করিনি। আর দেখছি তো কিছু কাল ধরে, ছোকরা লোকও খারাপ নয়। বেশ ফুর্তিবাজও আছে। রোজগারপত্রও মন্দ করে না। দয়াধর্মও আছে। আর কি চাও বল?

যেন ছোকরাটির খবরের জন্যই ডোমন ব্যস্ত হয়ে উঠছিল।

ডোমনের গলা দিয়ে ঘর ঘর করে একটা আওয়াজ বেরুলো। তারপর কেনোমতে জিজ্ঞাসা করলে, তারি সঙ্গে তারকেশ্বর গেছে?

—কোথায় গেছে, তাকি জানি রে ভাই? সত্য কথা কি কেউ বলে? বলে গেছে তারকেশ্বর, ধরে রাখো তারকেশ্বর।

অনেকক্ষণ পরে ডোমন আবার জিজ্ঞাসা করলে, ছেলেটাকেও নিয়ে গেছে?

—না নিয়ে গিয়ে কি করে বল। কার কাছে রেখে যাবে? এ দুনিয়ায় কেউ কারো হ্যাপা পোহায় না হে।

এত বড় কথাটা বলে হরেরাম একটা উচ্চাঙ্গের হাসি হাসলে।

ঘরের এক কোণে একটা কেরোসিনের ডিবে জ্বলছিল। সেটি আলো যত না-দিচ্ছিল, ধোঁয়া উদগীরণ করছিল তার চেয়ে আরো বেশী। সেই প্রায়ান্ধকারে পাথরের মূর্তির মতন ডোমন বসে রইল।

হরেরামের সে দিকে খেয়াল নেই। বললে, তোমার খাওয়ার কথা ভাবছি না। আজ রাত্রের মতন এইখানেই দুটি খাবে। তারপর কাল থেকে যা-হয় ব্যবস্থা করে নিও। কিন্তু তোমার ঘরটা তো খুলতে হবে। শোবে কোথায়?

তালা ভেঙ্গে ঘর খুলে ডোমনকে বসানো হলো। সবই তৈরি। ঘরের কোণে কেরোসিনের ডিবেটা আলা হলো। ধবধবে বিছানা পাতাই রয়েছে, সেই বিছানায় ডোমন চোখ বন্ধ করে শুয়ে পড়ল।

ঘানিটানার ফলেই হোক, অথবা অন্য যে কারণেই হোক, বুকটা তার খুব দুর্বল। হাসপাতালে তারি একটা মন-বোঝানো চিকিৎসা চলছিল। মাঝে-মাঝে বুকের মধ্যে একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা বোধ করত। সেই ব্যথাটাই কি চাগিয়ে উঠল?

রান্না হতে রাত দশটা বাজল। ধুমধামের রান্না নয়, হরেরামের বউয়ের ফিরতে দেরী হয়েছিল।

দু'জনের ভাত বাড়া হতে হরেরাম ডোমনকে ডাকতে গেল।

—ডোমন, ও ডোমন! ঘুমুলে নাকি? সাড়া নেই।

হরেরাম ভাবলে, ক্ষুধায় এবং ক্লান্তিতে বেচারা ঘুমিয়ে পড়েছে। ডাকলে, ভাত দেওয়া হয়েছে তোমার, ওঠ।

তথাপি সাড়া নেই। ঘরে ডিবেটা কখন নিভে গেছে। ডোমন চলে গেল নাকি? না বলে কি যাবে?

বউকে ডাকলে, ডিবেটা একবার নিয়ে এসো তো। বউ তাড়াতাড়ি ডিবেটা নিয়ে এ ঘরে এলো।

সেই আলোতে দেখা গেল ডোমন মারা গেছে। কি আশ্চর্য! রোগ নেই, বালাই নেই---।

এমন সময় কলরব করতে করতে কামিনীরা সদলবলে এসে উপস্থিত।

ওদের সাড়া পেয়ে হরেরামের বউ চীৎকার করে উঠল, হতভাগী এতো দেরী করে ফিরলি। সব শেষ হয়ে গেছে।

কামিনীর বুকের ভেতরটা ঢিপ্ করে উঠল; কি শেষ হয়ে গেছে?

—ঘরে এসে দেখবি আয়।

কম্পিতপদে ঘরের মধ্যে এসে কামিনী দেখে তক্তপোষের উপর ডোমনের মৃতদেহ। ক্ষৌরীকৃত মুখ। পরিপাটি করে সিঁথি কাটা। বিবাহের দিন যেমনটি দেখেছিল, তেমনি।

……কলকাতা শহরে একা থাকাও তো সোজা নয়।

শিল্পী রবি বর্মা

শ্রীবিষ্ণু মুখোপাধ্যায়

ভারতীয় চিত্রশিল্পের ইতিহাসে রবি বর্মা একটি অবিস্মরণীয় নাম। আধুনিক ভাবাপন্ন শিল্প-রসিকরা এ-নামের যথোচিত মর্যাদাদানে আজ বীতস্পৃহ হলেও এবং অনেকের কাছে তাঁর অনন্যসাধারণ শিল্পকার্য ও সৌন্দর্যবুদ্ধির পরিচয় আজ বিস্মৃতপ্রায় হলেও প্রকৃত ভারতীয় শিল্পের প্রাচীন সারূপ্য অবধারণের পক্ষে তিনি যে নিদর্শনসমূহ রেখে গিয়েছেন, তার তুলনা হয় না। তাঁর যুগে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন 'একমেবাদ্বিতীয়ম্।'

রবি বর্মার প্রথম চিত্র-দর্শন সম্বন্ধে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা এস্থলে একটু উল্লেখ করলে অপ্রাসঙ্গিক করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। তখন বয়স অল্প, বাবার সঙ্গে বর্ধমানের মহারাজার প্রাসাদে গিয়ে তাঁদের সদর-মহলের একটি বিরাট সুসজ্জিত নাচঘরের দেয়াল-গাত্রে প্রলম্বিত বিচিত্র স্বজাতীয় ও বিজাতীয় রাজা-মহারাজা, দরবার, শিকার প্রভৃতি নানা চিত্রের শোভা নিরীক্ষণ করতে করতে একটি চিত্রের কাছে এসে থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলুম। সে ছবিটির আকারও যেমন ছিল বিরাট, তেমনি তার বিষয়-বস্তুও ছিল বিস্ময়কর। কিন্তু সে বিষয়বস্তু ছিল আমার কাছে পরিচিত। পিতামহীর মুখে শোনা, রামায়ণে লঙ্কাধিপতি রাবণের জটায়ু-বধের যে কাহিনী মনের মধ্যে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করেছিল, এ সেই ছবি। বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে অনেকক্ষণ ধরে দেখেছিলুম ছবিটিকে। পরিচিত বিষয়বস্তুর এমন জীবন্ত রূপ ইতঃপূর্বে আর কখনো দেখিনি বলেই সম্ভবত,—খণ্ডিত-পক্ষ জটায়ু ও পরাক্রমশালী রাজবেশধারী, কোষ-মুক্ত অসিহস্তে বলিষ্ঠবাহু রাবণের মুখ-ভঙ্গী দেখে মনে হয়েছিল, এ চিত্রের যিনি চিত্রকর, তিনি নিঃসন্দেহে শক্তিশালী। পিতৃদেবকে প্রশ্ন করে জেনেছিলুম, শিল্পীর নাম রবি বর্মা।

অতঃপর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে রবি বর্মার শিল্প-কীর্তির বহুবিধ নিদর্শনের সঙ্গে যতই পরিচিত হওয়ার সুযোগ ঘটেছে, ততই বিমুগ্ধ হয়েছি প্রধানত তাঁর সৃষ্টির মধ্যে দেশ-প্রীতি, সানুরাগ শিল্প-সৌকর্য ও সাত্ত্বিকতাবোধের পরিচয় পেয়ে। অবনীন্দ্রনাথ বা তাঁর নন্দলাল প্রমুখ শিষ্যগণ বা যামিনী রায় প্রভৃতি বিখ্যাত ভারতীয় শিল্পী-দের রূপকল্পনার মধ্যে যে ভারতীয় প্রাচীন ভাস্কর্য-শিল্প বা পট-চিত্রের প্রভাব নবৈশ্বর্যে ধরা দিয়েছে বিচিত্র আঙ্গিকে, রবি বর্মার মধ্যেও প্রধানত ভারতের পৌরাণিক যুগ যেন প্রকটিত হয়েছে চির-অনুসৃত অধ্যাত্ম-সুষমাকে চিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করার প্রবণতায়। অবয়ব-কল্পনায় তাঁর অভিনব শিল্প-কৌশল প্রায় সর্বত্রই শাস্ত্রসম্মত। দেহের গঠনভঙ্গী, লাবণ্য, স্বাস্থ্যসম্পদ আভরণ ও সাজ-পোষাক কোথাও অপ্রাকৃত নয়। অপ্রাকৃত বা অতীন্দ্রিয় রূপকল্পনা তাঁর মধ্যে স্থান পায় নি। তিনি ছিলেন একান্তই স্বাভাবিক আদর্শনিষ্ঠ শিল্পী এবং সে আদর্শ কখনও দেশজ মানুষিক বা দৈবীভাবের ব্যতিক্রম ঘটায় নি।

শিল্পী তাঁর একক চরিত্র-চিত্রণ বিষয়েও যেরূপ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন, তেমনি অধিক চরিত্র সংবলিত ঘটনাবহুল চিত্রেও তাঁর রেখাভঙ্গী কোথাও আড়ষ্ট, অবিন্যস্ত বা দোষদুষ্ট হয় নি। এই বলিষ্ঠ রেখাভঙ্গীর সঙ্গে রবি বর্মার প্রাসপেকটিভ-বোধ ছিল নির্ভুল।

● রবি বর্মার মাতুল রাজা রাজবর্মা

● শিল্পী রবি বর্মা

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যে পৌরাণিক কাহিনী-অধ্যুষিত চিত্রসমূহ তিনি অঙ্কন করেছেন, তার মধ্যে রাজা-রাণী মুনি-ঋষি, সভাসদ, দ্বারপাল, ও পরিচারক-পরিচারিকা প্রভৃতি চরিত্রগুলির দৈহিক অবিকলতার সঙ্গে সাজ-সজ্জা, ভাব-ভঙ্গী, সংযম-মাধুর্য এবং বিশেষভাবে এই প্রাসপেকটিভ বোধ বা চিত্রানুপাত জ্ঞান লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে। রূপের সঙ্গে ভাবের যে যোজনায় চিত্র পূর্ণতা লাভ করে, সে গুণপনা রবি বর্মার মধ্যে পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান। মূলত রবি বর্মা যেসকল পৌরাণিক বিষয়বস্তু নিয়ে এবং রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনীকে উপজীব্য করে চিত্র-রচনা করেছেন, তার মধ্যে অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গের অঙ্গাঙ্গি মিলনই সর্বাপেক্ষা উল্লেখ-যোগ্য বিষয় এবং শিল্পীর যথার্থ সার্থকতা ঘটেছে এইখানেই।

আলঙ্কারিকেরা সমস্ত শিল্পকার্যকেই 'বহু-চিত্র' বলে আখ্যাত করলেও, সাধারণত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিল্পীর স্বাধীনতা থাকে তার মনোমত রূপকল্পনাকে চিত্রপটে ধরে রাখার এবং সেখানে তার স্বেচ্ছাচারিতা বা স্বকপোলকল্পিত সৃষ্টির প্রকাশ ঘটে। সেই প্রকাশের মধ্যে শিল্পীর ভাব-রস কি পরিমাণ

সার্থক রূপগ্রহণ করেছে, শিল্প-রসিক সমালোচকের তা বিচার্য। যেমন রবীন্দ্রনাথের চিত্রসম্ভারের মধ্যে আমরা উপলব্ধি করে থাকি। কিন্তু যেক্ষেত্রে বিষয় নির্দিষ্ট করা থাকে, উল্লিখিত থাকে কাহিনীর মধ্যে, কোন প্রতিকৃতির হুবহু প্রতিফলনের প্রয়োজন হয়, বা কোন প্রাকৃতিক দৃশ্যকে রেখার মধ্যে ধরে রাখতে হয়, সেক্ষেত্রে শিল্পীর বৈশিষ্ট্য কিছুটা গণ্ডিবদ্ধ হলেও, তার নৈপুণ্যের পরিচয় নিরূপণ সেখানে যেমন দুঃসাধ্য হয় না, তেমনি তাঁর ব্যর্থতা ধরাও সহজসাধ্য হয়,---প্রকৃত বিষয়ের সঙ্গে শিল্পীর চিত্রিত বিষয়ের সাজাত্য, সাধর্ম্য বা সামঞ্জস্যের তারতম্য থেকে। পোট্রেট পেণ্টার, ল্যাণ্ডস্কেপ চিত্রকর বা কোন প্রাচীন গ্রন্থস্থ ঘটনাকে তুলির লিখনে নিত্যতা বা অভিনবতা প্রদানের মধ্যেও শিল্পীর থাকে প্রভূত গুণবত্তার পরিচয়।

শেষোক্ত বিষয়গুলিরই সার্থক কারিগর ছিলেন রবি বর্মা। এর দ্বারা তাঁর স্বকীয়তার অভাব ছিল একথা যেন কেউ মনে না করেন। কারণ সেকালের মহাকাব্যে বা শাস্ত্র-পুরাণে যে সকল কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে, তাকে রঙ ও তুলির সাহায্যে জীবন্ত করে তোলা প্রতিভাধর ও রূপদক্ষ শিল্পীর পক্ষেই সম্ভব। এই চিত্রবিদ্যায় রবি বর্মা যে কি পরিমাণ উৎকর্ষ লাভ করেছিলেন, তা তাঁর চিত্রগুলি যাঁরা যত্নপূর্বক অবলোকন করেন নি, তাঁদের পক্ষে অনুভব করা নিতান্তই দুরূহ।

তবে এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, দেশীয়তার সংস্কার থেকে সর্বক্ষেত্রে তিনি মুক্ত হতে পারেন নি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বীয় দেশজ রুচির কাঠামোর মধ্যেই চরিত্রগুলিকে তিনি গঠন করেছেন---দক্ষিণের বেশভূষার ছাপও পড়েছে ক্ষেত্র বিশেষে। কিন্তু তত্রাপি, পুষ্পের বাহ্যাবয়বের কথা বাদ দিয়ে সৌরভের মূল্যই যেমন আমরা বেশী করে দিয়ে থাকি, তেমনি শিল্পের রসের কথা ধরলে, তখন তাঁর দেশজ

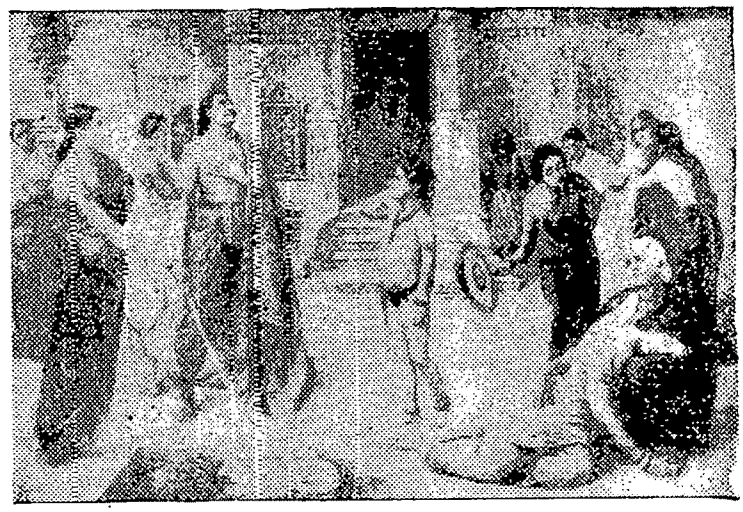

● রাজা ও মোহিনী

সাজ-পোষাক ও ভঙ্গিমার কথা বিস্মৃতই হতে হয় এবং অনাবৃতভাবেই বিদগ্ধ-মানসে সুন্দরের রূপটিই প্রতিভাত হয় সর্বাগ্রে।

আসলে আন্তর্ভারত-শিল্পের পরাতত্ত্বের দিকটিই রবি বর্মার শিল্পে চর্চিত হয়েছে অধিক পরিমাণে; হিন্দুর লোকমত, ধর্মমতকেই তিনি তাঁর কুশলী ভক্ত-শিল্পীর মন নিয়ে প্রতিফলিত করেছেন তাঁর ক্যানভাসের উপর---রঙের, রসের, ভাবের খেলা খেলেছেন শিল্পীর সৃষ্টির আনন্দে। শিল্পের নানা প্রকরণেও সিদ্ধহস্ত ছিলেন রবিবর্মা,---এ্যানোটমি, প্রাস্পেকটিভ সেড এণ্ড লাইট, ডেপথ্ স্পেস এবং মুভমেণ্ট-এর সব কটাই তাঁর বিশেষভাবে অধিগত ছিল।

ত্রিবাংকোরের একটি সম্ভ্রান্ত ক্ষত্রিয়-বংশে ১৮৪৮ খৃস্টাব্দের মে মাসে ত্রিবান্দ্রাম সহরের কাছাকাছি কিলিমানুর নামক গ্রামে রবিবর্মা জন্মগ্রহণ করেন। ত্রিবাংকোরের রাজ-পরিবারের সঙ্গে তাঁদের পরিবারের পুরুষানুক্রমে ঘনিষ্ঠতা ছিল এবং তাঁর পূর্বপুরুষরা আপদকালে মহারাজকে সাহায্য করার জন্য জায়গীর হিসাবে মহারাজের কাছ থেকে বিস্তৃত গ্রামের ভৌমাধিকার লাভ করেন। ত্রিবাংকোরের সামাজিক প্রথানুসারে পূর্বপুরুষ বা গোষ্ঠীয় পরিচয় হয় মা বা মাতুলের পরিচয়ে এবং ভাগিনেয় মাতুলের সম্পত্তির উত্তরাধিকারিত্ব লাভ করে---পুত্র পিতার সম্পত্তির অধিকারী হয় না। সে জন্য পূর্বপুরুষের পরিচয় এখানে মামার বংশানুক্রমিক পরিচয়ে---মাতৃকুলাবলম্বী।

মাতা ও মাতুলের গুণাবলীর অংশীদার হয়েছিলেন রবি বর্মা। তাঁর মাতা উমা অম্বাবাঈ ছিলেন অত্যন্ত বিদগ্ধা, ভক্তিমতী ও নির্মল চরিত্রের মহিলা। কাব্য-রচনায় বিশেষ পারঙ্গম ছিলেন অম্বাবাঈ এবং সেকালের ত্রিবাংকোরে কবি হিসাবে তাঁর প্রসিদ্ধি ছিল।

রবি বর্মারা ছিলেন তিন ভ্রাতা ও এক ভগ্নী। সেকালে ও-দেশে ইংরেজী-শিক্ষার বিশেষ প্রচলন না থাকায়, রবি বর্মা বাল্যকালে কেবলমাত্র সংস্কৃত শিক্ষালাভ করারই সুযোগ পান, বাড়িতে শিক্ষকের কাছে। কাব্য-ব্যাকরণ প্রভৃতি অধ্যয়নের সঙ্গে সঙ্গে রামায়ণ, মহাভারত ও অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থাদি পাঠেও তাঁর অনুরাগ জন্মায়। কিন্তু এবংবিধ অনুরাগের সঙ্গে চিত্রাঙ্কন সম্বন্ধে এই অল্পবয়স থেকেই তাঁর বিশেষ আকর্ষণ পরিলক্ষিত হয়। ব্যাকরণের বিভক্তি, কারক, অপাদান, সম্প্রদান প্রভৃতি কণ্ঠস্থ করা অপেক্ষা, বাড়ির দেয়াল-গাত্রে বা মেঝের উপর চক্‌খড়ি বা করলার সাহায্যে দেব-দেবীর মূর্তি অঙ্কন তাঁর কাছে অধিক আকর্ষণীয় ছিল। কিন্তু এই অল্পবয়স থেকেই চিত্রাঙ্কন সম্বন্ধে তাঁর অনুরাগ বাটীস্থ সকলেরই বিশেষ বিরক্তির কারণ হয়। কেবলমাত্র তাঁর মাতুল বাড়ির কর্তা রাজা রাজবর্মা, এই বিষয়টিকে অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে দেখেন। রাজা রাজবর্মা নিজেও ছিলেন বিশেষ প্রতিভাধর ব্যক্তি। অন্যান্য নানাবিধ

● শকুন্তলার পত্র লেখা

গুণের মধ্যে চিত্রাঙ্কনেও তার আকর্ষণ ছিল এবং অবসর সময়ে এই বিদ্যার অনুশীলন করতেন। কালক্রমে ভাগিনেয় রবি বর্মা যখন এই বিদ্যায় কিছুটা পারদর্শী হয়ে উঠলেন, তখন রাজবর্মা তাঁকে স্বহস্তে চিত্রে জল-রঙের ব্যবহার সম্বন্ধে শিক্ষা দেন।

সেকালের ভারতবর্ষে বিদেশীয় রঙ বা তুলির বিশেষ প্রচলন না থাকায়, রাজবর্মা নিজেই চিত্রাঙ্কনের সদয় প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি রবি বর্মাকে প্রস্তুত করে দিতে সাহায্য করতেন। রবি বর্মার এই সর্বগুণান্বিত মাতুল রাজা রাজবর্মা অন্যান্য বিবিধ বৈষয়িক কাজের মধ্যেও ছবির জন্য বিভিন্ন রঙ তৈরি ও চিত্র-বিদ্যার জন্য নানা উপকরণ প্রস্তুতের কার্যে বিশেষ পারদর্শিতা প্রদর্শন করেন। তাঁর মৃত্যুর পর এই বিষয় সম্পর্কে ওদেশে আর কোন উপযুক্ত প্রচেষ্টা না হওয়ায়, এই প্রণালী শিল্পাকারে প্রসারলাভ করতে পারে নি। তা ছাড়া এই সময় ক্রমশ ভারতবর্ষের বিভিন্ন শহরগুলিতে বিলাত থেকে চিত্রাঙ্কনের বিবিধ উপাদান-সামগ্রী আসাতেও এ বিষয়ে এদেশীয় লোকের আগ্রহের অভাব দেখা দেয়।

রবি বর্মার বয়ঃক্রম যখন মাত্র ত্রয়োদশ-বর্ষ তখন তাঁর মাতুল রাজবর্মা তাঁকে সঙ্গে করে ত্রিবাংকোরের রাজধানী ত্রিবান্দ্রামে গমন করেন এবং ভাগিনেয়র কয়েকখানি চিত্র তৎকালীন মহারাজাকে উপহার দেন। ইদানীন্তন কালের ন্যায়, সেকালে যদিও চিত্রবিদ্যায় পারদর্শিতা মর্যাদার বিষয় ছিল না, তবুও গুণগ্রাহী মহারাজা চিত্র-রচনায় বালকের অসাধারণ কৃতিত্ব দৃষ্টে অত্যন্ত প্রীত হন এবং ভূয়সী প্রশংসা করেন। অতঃপর উক্ত সময় থেকেই রবি বর্মা মহারাজের প্রভূত উৎসাহ ও সাহায্যলাভ করেন। এটা তাঁর প্রথম শিল্পী-জীবনে ঈশ্বরের পরম আশীর্বাদ বলেই তিনি চিরকাল স্মরণ করে এসেছেন।

১৮৬৬ সালে ত্রিবাংকোরের স্বর্গতা প্রধানা মহিষীর কনিষ্ঠা ভগ্নীকে বিবাহ করেন রবি বর্মা। উক্ত সময়ের বছর দুই পরে থিয়োডোর জনসেন নামক একজন ইংরেজ চিত্রকর ত্রিবাংকোরের রাজদরবারে উপস্থিত হন মহারাজা ও রাজপরিবারভুক্ত কয়েকজনের ছবি আঁকার জন্য। মহারাজা নিজেই তাঁকে বিলাত থেকে আনিয়েছিলেন এই কাজের জন্য। রাজদরবারে জনসেনের উপস্থিতি রবি বর্মাকে প্রভূত পরিমাণে উৎসাহিত করে। কিন্তু প্রথম দিকে এই বিদেশীয় শিল্পীর সাহায্যলাভে বিশেষ বেগ পেতে হয়ছিল। শিল্পী জনসেন ছিলেন অত্যন্ত স্বল্পভাষী ও রাসভারী লোক এবং চিত্রাঙ্কন-কালে কারুর উপস্থিতি তিনি মোটেই পছন্দ করতেন না। কিন্তু মহারাজের মধ্যস্থতায় শেষ পর্যন্ত রবি বর্মা জনসেনের ছবি আঁকার পদ্ধতি অবলোকন করার সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন। এই জনসেনের কাছেই রবি বর্মা প্রথম তেল-

● তদ্গত চিত্তে

রঙের কাজ দেখে অভিভূত হন এবং নিজে চিত্রবিদ্যার এই নূতন পদ্ধতিতে পারদর্শী হয়ে ওঠার জন্য বদ্ধপরিকর হন।

অতঃপর রবি বর্মার চিত্রানুশীলন এক নূতন পথের সন্ধান লাভ করে ক্রমানুয়ে উন্নতির পথে এগিয়ে চলতে থাকে। এই অনুশীলনের প্রথম পরিচয় মেলে মহারাজা ও মহারাণীর দু'খানি প্রতিকৃতির মধ্যে। ১৮৭৩ সালে মাদ্রাজে ললিতকলার যে প্রদর্শনী হয়, সেই প্রদর্শনীতে শিল্পী রবি বর্মার দু'খানি চিত্র প্রথম প্রদর্শিত হয়। এই চিত্র দু'খানির মধ্যে একটি তৎকালীন মাদ্রাজের গভর্নর লর্ড হোবার্ট-প্রদত্ত স্বর্ণপদক লাভ করে। উক্ত চিত্রটির বিষয়বস্তু ছিল একটি নেয়ার যুবতী পুষ্পদামের সাহায্যে নিজের কবরী বন্ধন করছে। এই চিত্রটি পরবর্তীকালে ভিয়েনার আন্তর্জাতিক চিত্র-প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হয় এবং শিল্পী ওখানকার-বিচারকমণ্ডলীর কাছ থেকেও প্রশংসাপত্র ও পদকলাভের গৌরব অর্জন করেন।

১৮৭৫ সালে সপ্তম এডওয়ার্ড যুবরাজরূপে ভারত-পরিভ্রমণ করতে এলে, ত্রিবাংকোরের মহারাজা তাঁকে রবিবর্মার আঁকা তিনখানি চিত্র উপহার দেন এবং উক্ত চিত্রগুলি যুবরাজের বিশেষ আনন্দের কারণ হয়। তিনি সপ্রশংস দৃষ্টিতে ছবিগুলি দেখতে দেখতে বলেন যে, 'ইউরোপে শিক্ষালাভ করেন নি, এমন একজন শিল্পীর পক্ষে এই ধরণের কৃতিত্ব প্রদর্শন অত্যন্ত প্রশংসার বিষয়।'

১৮৭৬ সালে 'শকুন্তলার পত্রলেখন' নামধেয় রবি বর্মার একটি চিত্র মাদ্রাজের একটি প্রদর্শনীতে প্রথমস্থান অধিকার করে এবং তদানীন্তন কালের স্থানীয় গভর্নর ডিউক অব বাকিংহাম সেটি ক্রয় করেন।

রবি বর্মা তাঁর সংস্কৃত শিক্ষা ও পুরাণ প্রভৃতি অধ্যয়নকে এরপর চিত্রে রূপায়িত করার জন্য আগ্রহান্বিত হন এবং নিজের রুচি অনুযায়ী বিষয় নির্বাচন করে ছবি আঁকতে থাকেন। অবশ্য এইসঙ্গে ব্যক্তিবিশেষের আলেখ্য ও অন্যান্য চিত্রও তিনি যে একেবারে আঁকেননি তা নয়। ডিউক অব বাকিংহামের একখানি

পোর্ট্রেটও এই সময় তিনি আঁকেন এবং এই ছবিখানি বিদেশীয় খ্যাতনামা চিত্রকরগণের ছবির সঙ্গে মাদ্রাজের গভর্নমেণ্ট হাউসে স্থান লাভ করে। এই চিত্রখানি রবি বর্মার লাইফ স্টাডি বা পোর্ট্রেট পেন্টিং সম্বন্ধীয় চিত্রসম্ভারের অন্তর্ভুক্ত একটি বহুজনপ্রশংসিত উল্লেখ-যোগ্য চিত্র। এই তেল-রঙ চিত্রের অঙ্কনকালে ডিউক অফ বাকিংহাম রবি বর্মার দ্রুত অঙ্কন-পদ্ধতির ভূয়সী প্রশংসা করেন। এইসঙ্গে তিনি একথাও বলেন যে, 'যদিও তিনি বহুবার ইউরোপীয় চিত্র-শিল্পীদের দ্বারা ছবি আঁকিয়েছেন, কিন্তু তাঁরা কেউই রবি বর্মার ছবির অর্ধেক পরিমাণ সার্থকতা দেখাতে সক্ষম হন নি।

ক্রমশ রবি বর্মার খ্যাতি ভারতের বিভিন্ন রাজন্যবর্গের মধ্যে যেমন প্রসারলাভ করতে থাকে, তেমনি বিদেশের বিভিন্ন প্রদর্শনীতেও তাঁর চিত্র সমাদৃত হয়। ত্রিবাংকোরের পুরাতন মহারাজার মৃত্যুর পর, তাঁর পরবর্তী অনুজ শিল্পানুরাগী মহারাজা রবি বর্মার সাহায্যে 'সীতার পরীক্ষা' নামক একটি বৃহদাকার চিত্র আঁকান। সীতার পাতাল-প্রবেশ নামেও এই চিত্রটি সাধারণ্যে পরিচিত। চিত্রের বিষয়বস্তু হচ্ছে: মাতা ধরিত্রী সীতাকে অঙ্কে নিয়ে ভূগর্ভে অন্তর্হিতা হচ্ছেন, রাজা রামচন্দ্র বিস্ময়াবিষ্ট এবং তাঁর দুই সন্তান লব-কুশ ক্রন্দনরত। কিন্তু সে সময় বরোদারাজ্যের প্রধানমন্ত্রী তাঞ্জোর মাধবরাও, যিনি ত্রিবাংকোরে বেড়াতে এসেছিলেন, তিনি এই চিত্রটি দেখে এতই মুগ্ধ হন যে, মহারাজা গায়কোয়ারের জন্যে সেটি কিনে নিয়ে যান। তা' ছাড়া নিজের জন্যেও শিল্পী রবি বর্মার অপর একটি চিত্র ক্রয় করেন। এই চিত্রটির বিষয়বস্তু: একটি নেয়ার বালিকা বেহালায় সুর বাঁধছে। পুণা শিল্প-প্রদর্শনীতে এই ছবিটিকে গায়কোয়ার স্বর্ণপদক দিয়ে পুরস্কৃত করেন। বাম্বাইয়ের তৎকালীন গভর্নর স্যার জেমস ফার্গুসনও এই চিত্রটি দেখে শিল্পীর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। রবি বর্মা মাধবরাওয়ের নিকট বিক্রিত এই চিত্রখানির একটি হুবহু নকল করে গভর্নরকে উপহার দেন এবং এর পরিবর্তে ফার্গুসনও রবি বর্মার শিল্প-প্রতিভার নিদর্শন হিসাবে তাঁকে ইংলণ্ডের রাজ-পরিবারের ফটো-সংবলিত একটি এ্যালবাম উপহার দেন।

এই সময় রবি বর্মা গায়কোয়ারের রাজ-পরিবারের বহু আলেখ্য, ভবনগরের মহারাজার আমন্ত্রণে গিয়ে তাঁর জন্য এবং মহীশূরের রাজার নিজের ও তাঁর ছেলেমেয়েদের ছবি আঁকেন। মহীশূরের রাজা রবি বর্মার শিল্প-কার্য দেখে এমনই প্রীত হয়েছিলেন যে, তাঁকে প্রভূত ধনরত্ন দেবার পরও উপহারস্বরূপ দুটি সুন্দর হাতী দিয়েছিলেন। কোন শিল্পীর ভাগ্যে এ ধরণের কোন উপহার আর কখনও কোথাও মিলেছে বলে মনে হয় না।

রবি বর্মা কলিকাতার আন্তর্জাতিক চিত্র-প্রদর্শনী ও লণ্ডনের ঔপনিবেশিক প্রদর্শনী থেকেও তাঁর প্রদর্শিত চিত্রের জন্য রৌপ্যপদক ও প্রথম শ্রেণীর মানপত্র পান। কলিকাতায় প্রদর্শনী উপলক্ষে থাকাকালীন তিনি বিজয়-নগরের মহারাজার অতিথি হিসাবে কয়েকদিন অতিবাহিত করেন।

ইতিমধ্যে তাঁর পরম ভক্তিভাজন ও চিত্র-বিদ্যার প্রাথমিক শিক্ষাদাতা মাতুল ও তার কিছুকাল পরে মাতার দেহান্তর ঘটে। এর ফলে অত্যন্ত মাতৃভক্ত ও ভাবপ্রবণ রবি বর্মা এমনই শোকাবিষ্ট হন যে, প্রায় এক বৎসরকাল তিনি মৌনব্রতাবলম্বী হয়ে তাঁর কিলিমানুরস্থ ভবনে ধর্মচর্চায় দিনাতিপাত করেন।

১৮৮৮ সালে এই ভক্ত ও নির্মলচরিত্র প্রখ্যাত শিল্পীর জীবনে আসে আর এক নূতন পরিচ্ছেদ ও কর্মপ্রেরণার যুগ। এই সময় গায়কোয়ারের মহারাজা রবি বর্মাকে তাঁর বরদার নূতন প্রাসাদে রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে চৌদ্দটি অনির্বাচিত শিক্ষাপ্রদ ঘটনার চিত্রাঙ্কনের ভার দেন। এই কার্যভার গ্রহণ ক'রে চিত্রাঙ্কনকার্যে হস্তক্ষেপ করার পূর্বে, তিনি উত্তর-ভারত ও মধ্য-ভারতের প্রাচীন ভাস্কর্য-শিল্প চিত্র-শিল্প ও প্রস্তর-গাত্রে অঙ্কিত চিত্রাদির মধ্যে, হিন্দু মহীপতি ও মহিষীদের সাজ-পোষাক ও অলঙ্করণাদির নিদর্শন সংগ্রহের উদ্দেশ্যে কিছুদিন বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করেন। এবং এই ভারত-পরিক্রমা সমাধা ক'রে গায়কোয়ারের কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। চৌদ্দখানি চিত্রের কার্য সমাপ্ত করতে তাঁর সময় লাগে প্রায় দু' বৎসর। ১৮৯০ সালে এই চিত্রগুলি গায়কোয়ারের হাতে তিনি তুলে দেন। চিত্রগুলি পুঙখানুপুঙখভাবে দেখে, মহারাজা বিস্ময়াবিভূত হয়ে রবি বর্মাকে সজোরে তাঁর বাহুবেষ্টনে আলিঙ্গন করেন। সাধারণের দর্শনের সুবিধার জন্য এই চিত্রগুলি প্রকাশ্য স্থানে কয়েক দিন রেখে দেওয়া হয়। এই উপলক্ষে সারা দেশে এক অপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি হয়। শক্তিধর শিল্পীর অপরূপ শিল্পকলার নিদর্শনভূয়িষ্ঠ চিত্রগুলি দেখবার জন্য সারা দেশের লোক ভেঙে পড়ে—দূর-দূরান্ত থেকে হাজার হাজার লোক সমবেত হতে থাকে।

ভারতের ভক্ত-জনসাধারণ মহাভারত ও রামায়ণের কাহিনীর প্রতি স্বভাবতই শ্রদ্ধাশীল; তার উপর সেই কাহিনীর জীবন্ত বর্ণাঢ্য চিত্রগুলি দর্শকদের একেবারে অভিভূত করে ফেলে। রবি বর্মার এই চিত্রগুলিই সম্ভবত ক্যানভাসের উপর তেল-রঙের সর্বপ্রথম অনির্বচনীয় আবির্ভাব।

প্রধানত এই চিত্রগুলিই সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে শিল্পীপ্রবর রবি বর্মার নৈপুণ্যের পরিচয় প্রচার করে এবং তাঁকে ভারতের শ্রেষ্ঠ শিল্পী হিসাবে প্রতিষ্ঠা দান করে। এই চিত্রগুলির আলোকচিত্র বহু সহস্র মুদ্রিত হয়ে, সারা ভারতের ঘরে ঘরে দেয়াল-গাত্রে শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রলম্বিত হয়। সেই যুগে চিত্রশিল্পের প্রতি এতাদৃশ অনুরাগ একমাত্র রবি বর্মাই ভারতীয়দের মন-মানসে উজ্জীবিত করেছিলেন বললেও অত্যুক্তি হয় না।

এই মূল্যবান রঙিন চিত্রগুলিকে সাধারণের সহজলভ্য করে তোলার জন্য শিল্পী নিজ-ব্যয়ে বোম্বাইয়ে একটি লিথোগ্রাফিক মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে, স্বল্পমূল্যে প্রচারের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু তা' হলেও রঙের বিচিত্র ব্যবহারের জন্য তাঁর বহু মূল্যবান চিত্রের প্রতিলিপি আজও আমাদের দৃষ্টির অগোচর অজ্ঞাতই থেকে গিয়েছে। সাধারণত বাজারে বা বিভিন্ন স্থানে কয়েক যুগ পূর্বেও রবি বর্মার যে সকল চিত্র আমাদের দৃষ্টিগোচর ছিল, সেগুলির অল্পাংশই তাঁর উৎকৃষ্ট চিত্র সম্ভারের মধ্যে গণ্য। এতদ্ব্যতীত তাঁর বহু উৎকৃষ্ট চিত্রের প্রতিলিপি আজও হয় নি এবং সেগুলি ভারতের বাইরে বিভিন্ন ব্যক্তির বাড়িতে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়েই হারিয়ে গেছে।

● সীতার পরীক্ষা

এখানে আমরা তাঁর কয়েকটি মাত্র চিত্রের প্রতিলিপি মুদ্রিত করতে সক্ষম হয়েছি। এগুলি সবই প্রাচীন প্রিণ্টের প্রিণ্ট। সুতরাং এ থেকে সামান্য আভাস ব্যতীত, মূল চিত্রের রূপ-রস-গন্ধের কোন আস্বাদই পাঠক লাভ করতে সক্ষম হবেন বলে মনে হয় না।

'রাজা রুক্মাঙ্গদ ও মোহিনী' নামক চিত্রখানির এখানে একটু সংক্ষেপে পরিচয় দেওয়া উচিত বলে মনে করি। পরিচয়টি হচ্ছে—রুক্মাঙ্গদের দুই রাণী; ছোট রাণী ও বড়রাণী। ছোট রাণী ভ্রষ্টা ও হিংসুটে স্বভাব। একদিন কোন এক দুর্বল মুহূর্তে রাজা এই ছোট রাণীর যে কোন প্রার্থনা পূরণ করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এই সুযোগে খলমতি ছোট রাণী একদিন রাজার কাছে তাঁর প্রতিশ্রুতিমত এই প্রার্থনা জানান যে, হয় তিনি বড় রাণীর গর্ভজাত পুত্রকে হত্যা করুন, না হয় তো তাঁর সম্মুখে রক্ষিত খাদ্যদ্রব্য আজ এই একাদশীর দিন আহার ক'রে উপবাস ভঙ্গ করুন। সত্যসংকল্প ভক্ত রাজা একাদশীর দিন আহার করা মহাপাপের মধ্যে গণ্য করতেন। অপর দিকে রাজপুত্র রাজাকে মহাপাপের ভাগী না হয়ে, বরং তাকে হত্যা করার জন্য অনুরোধ করছে; আর বড় রাণী এই দৃশ্যের সম্মুখীন হয়ে, বৃদ্ধা পরিচারিকার ক্রোড়ে মূর্ছা গিয়েছেন। রাজা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে নগ্ন অসি ঊর্ধ্বে ঊর্ধ্বনেত্রে ঈশ্বরকে স্মরণ করছেন, আর মোহিনী নিষ্ঠুরভাবে রাজাকে প্রতিজ্ঞাপালনের জন্য জিদ করছে। রাজপ্রাসাদে দেব-মন্দিরের মধ্যে এই মর্মন্তুদ দৃশ্যের চিত্রটি রবি বর্মা অত্যন্ত যত্নসহকারে অঙ্কিত করেন।

অপর একখানি চিত্রের মধ্যে শকুন্তলাকে আমরা পাই কণ্বমুনির আশ্রমে দুষ্মন্তকে পত্রলিখনরত অবস্থায়। শকুন্তলার দু' পাশে তাঁর দুই সখী প্রিয়ংবদা ও অনসূয়া এবং অনতিদূরে একটি চকিত-নয়না মৃগশিশু। অরণ্যের পরিবেশে ভাববিহ্বল অথচ উন্মনা শকুন্তলা ও তাঁর দুই সখীর আন্তরিকতা ও সহানুভূতিপূর্ণ মুখভঙ্গী অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী। প্রধানত রবি বর্মা যে মানসী-মূর্তি চিত্রণে সিদ্ধহস্ত ছিলেন, এই চিত্রটি এবং 'তদ্‌গতচিত্তা' নামক অপর আর একটি চিত্রের মধ্যে তার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। এই 'তদ্‌গতচিত্তা' বঙ্গদেশীয় মহিলারই যেন এক বিষণ্ণ প্রতিমূর্তি। তাঁর 'দময়ন্তী ও হংস', 'বিরাট রাজসভায় পাঞ্চালী', 'গঙ্গাবতরণ', 'অশোকবনে রাক্ষসী পরিবৃতা সীতা' প্রভৃতি চিত্রগুলি যাঁরাই অবলোকন করেছেন, তাঁরাই চিত্রস্থ চরিত্রগুলির মুখাবয়ব এবং মানবচরিত্র সম্বন্ধে শিল্পীর গভীর জ্ঞান, অলঙ্কার ও পরিচ্ছদ সম্বন্ধে বিজ্ঞতা ও ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয় সম্পর্কেও রবি বর্মার সূক্ষ্ম দৃষ্টি প্রভৃতি দৃষ্টে মুগ্ধ না হয়ে পারেন নি। আসলে শিল্পীর যে ধ্যান ও তন্ময়তা অনড় জড়ের মধ্যেও প্রাণসঞ্চার করে, সেই মন্ত্রগুপ্তিই যেন জানা ছিল রবি বর্মার।

রামায়ণ ও মহাভারত অবলম্বনে ইতঃপূর্বে উল্লিখিত চোদ্দখানি মূল্যবান চিত্র ব্যতীত আর একটি দশখানি চিত্রের বিশেষ সিরিজ রবি বর্মা অঙ্কিত করেন এবং এই সিরিজটির মধ্যে ভারতীয় সমাজ-চরিত্রের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কয়েকটি প্রকাশ বিধৃত হয়। এই দশখানি চিত্রই রবি বর্মা চিকাগো আন্তর্জাতিক-প্রদর্শনীতে প্রেরণ করেন এবং সেজন্য দুটি পদক ও প্রশংসাপত্র পান। আমেরিকার কয়েকখানি নামকরা কাগজে সে সময় তাঁর এই চিত্রগুলি প্রকাশিত হয় উচ্ছ্বসিত প্রশংসাসহ।

প্রকৃতপক্ষে ভারতে মহাকবি, দার্শনিক, স্থপতি, ভাস্কর, সঙ্গীতজ্ঞ, রাজনীতিবিদ প্রভৃতি অনেকেই এই পুণ্যভূমিকে রত্নপ্রসূ করেছেন সত্য, কিন্তু সেকালের সে সময় ভারতীয় চিত্রশিল্পীর স্থানটিতে যে শূন্যতা ছিল, একমাত্র রবি বর্মার আবির্ভাবেই তা পূরণ হয়েছে। এদিক থেকে তাঁকে নিঃসন্দেহে যুগপুরুষ এবং ভারতীয় শিল্প-অভ্যুত্থানের নব-প্রবর্তক বলা যায়। এই রেঁনাসাস-এর যুগে চিত্রশিল্পের প্রতি সাধারণের আগ্রহাতিশয্য যেমন দেখা দিয়েছিল, তেমনি চিত্রবিদ্যার অবনতি ও দুর্গতিও বহুল পরিমাণে বিদূরিত হয়েছিল।

রবি বর্মা সম্পর্কে 'প্রবাসী' পত্রিকার স্বর্গত সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের একবার লিখেছিলেন, 'ভারতীয় চিত্রবিদ্যার ইতিহাস যদি কখনও লিখিত হয়, তাহা হইলে, নিশ্চয়ই তিনি আধুনিক যুগে ইহার জন্মদাতা বলিয়া পূজিত হইবেন।'

রবি বর্মার চরিত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তাঁর চরিত্র ছিল সাধকের চরিত্রের মত এবং চিত্রশিল্পই ছিল তাঁর সাধনা। তাঁর সম্বন্ধে কথিত আছে যে, একবার তিনি নাকি রামায়ণের কি একটি চিত্র আঁকার পূর্বক্ষণে অত্যন্ত চিন্তাকিষ্ট হয়ে ভাবতে ভাবতে আবেশের মধ্যে সমগ্র ঘটনাটি জীবন্তভাবে দেখতে পান এবং সেই চিত্রটি আঁকা তাঁর পক্ষে সহজসাধ্য হয়ে ওঠে। আসলে তিনি ছিলেন অত্যন্ত নম্র, ভদ্র, কোমলস্বভাব, ভাবপ্রবণ, উদারপ্রকৃতির মানুষ। দয়ার ফল্গু বহমান ছিল তাঁর হৃদয়ের অভ্যন্তরে। দরিদ্র অভাবগ্রস্ত লোক তাঁর সান্নিধ্যে গেলে, কিছু যাচঞা করলে তিনি কখনও তাকে পরাঙ্মুখ করতে পারতেন না। শিল্পী ও সাহিত্যিকের যে মুক্ত মন ও উদারতা তার সার্থকতার পথে পরম সহায়ক, সে ঔদার্যে যেমন ভরা ছিল তাঁর মন, তেমনি তাঁর মধ্যে ছিল না আত্মশ্লাঘার লেশমাত্র। এই মহান ভারত-গৌরব শিল্পীর তিরোধান ঘটে ১৯০৭ সালে।

শুভ শারদীয়

আমাদের প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

মুখার্জী এণ্ড কাজিনস্ (প্রাইভেট) লিঃ

প্রসিদ্ধ লৌহ বিক্রেতা

রেজিস্টার্ড টাটা-ইস্কো এবং হিন্দুস্থান ষ্টীল ডিলার্স

৭ নং মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা—৭ ★ ফোন: ৩৩-১২০৩

শারদীয় অভিনন্দন—

কোয়ালিটি ইঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কস্

ম্যানুফ্যাকচারার্স এবং ইঞ্জিনীয়ারার্স

মাকড়দহ রোড, দাশনগর, হাওড়া

সিটি অফিস ফোন: ৩৩-৬৩৪৬

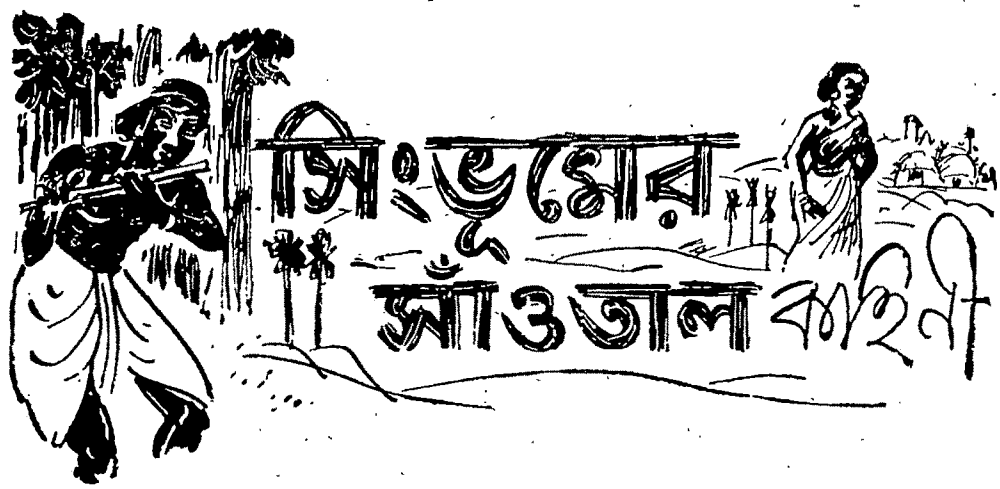

[ষাট-পঁয়ষট্টি বছর আগে রাজকর্মচারী সি এইচ বম্পাস্ সিংভূমে অবস্থানকালে সেখানকার কোহলান নামক জনপদের অধিবাসীদের জীবনযাত্রার সঙ্গে পরিচিত হন এবং সেই দেশে প্রচলিত কয়েকটি গ্রাম্য কাহিনী সংগ্রহ করে এসিয়াটিক সোসাইটির মুখপত্রে প্রকাশ করেন। লালবিহারী দে-র 'ফোক টেলস অব বেঙ্গল'-এর ধরণে লেখা এই কাহিনীগুলির মধ্যে যে সহজ ও সরল আবেদন আছে, তা আশা করি আজকের দিনের পাঠক-পাঠিকার কাছেও প্রতীয়মান হবে। বাংলায় যথাসম্ভব মূল ইংরেজি রচনার রীতিকে অনুসরণ করা হয়েছে।]

শৃগাল ও প্রতিবেশী

এক শেয়াল একটা ছাগলছানা মেরে গ্রাম থেকে একটু দূরে এক গাছতলায় বসে বেশ আরাম করে খাচ্ছিল।

কাকের স্বভাব, পরের জিনিষ দেখে চেঁচামেচি করে। একদল কাক গাছের উপর থেকে মহা গোলমাল আরম্ভ ক'রে দিলে।

অনেক কাকের ডাক শুনে গ্রামের লোকেরা ব্যাপার কি দেখবার জন্য গাছতলায় এল। ব্যাপার দেখে তারা শেয়ালটাকে রীতিমত ধনঞ্জয় দিয়ে তাড়িয়ে দিলে। তার সাধের মাংস সেইখানেই পড়ে রইল।

এই ঘটনায় কাকগুলোর উপর শেয়ালটা হাড়ে হাড়ে চটে গেল। এবং কেমন করে সে এর প্রতিশোধ নেবে, তার উপায়ও সুযোগ খুঁজে বেড়াতে লাগল।

কিছুদিন পরে সেই দেশে ভারি ঝড়-বৃষ্টি আরম্ভ হল। ভয়ানক দুর্যোগ, ঝড়ে গাছপালা ভেঙে পড়তে লাগল। পশুপক্ষী থাকবার জায়গার অভাবে মরবার উপক্রম হলো। শেয়ালটা সময় বুঝে কাকদের কষ্টে মহাদুঃখের ভাব দেখিয়ে তাদের নিজের গর্তে ডেকে নিয়ে গেল। সেখান থেকে পালাবার কোন পথ ছিল না। শেয়ালটা তখন এক এক ক'রে কাকগুলোকে মেরে ফেললো। কেবল নীলকণ্ঠ নামে একটা কাককে পরদিন খাবে বলে লেজে বেঁধে রেখে দিল। কাকটা পালাবার উপায় না-দেখে শেয়ালের লেজে ঠোকরাতে লাগল। ঠুক্‌রে ঠুক্‌রে লেজটা ফুলে ঢোল হল। বাঁধনটা খুলে গেল। কাকটাও উড়ে পালিয়ে গেল।

শেয়াল ফুলো লেজ নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে পথে এক কুমোরকে দেখতে পেলে। কুমোর হাঁড়িকুঁড়ি মাথায় ক'রে বাজারে বেচতে যাচ্ছিল। শেয়াল মহা গম্ভীরভাবে তাকে বললে যে, সে রাজার বাড়ীর সেপাই, তাকে একটা ভাঁড় দিতে হবে।

কুমোর প্রথমে রাজী হল না, শেষে শেয়ালের রকম সকম দেখে ভয় পেয়ে একটা ভাঁড় দিয়ে চলে গেল। শেয়াল সেই ভাঁড়ের মধ্যে ফুলো লেজ টিপে পুঁয-রক্ত বার করলে। তারপর ভাঁড়ের মুখে পাতচাপা দিয়ে রাখলে।

অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

পথে যেতে যেতে সে দেখলে, একটি রাখালের ছেলে কতকগুলি পাঁঠা নিয়ে যাচ্ছে। তাকে ডেকে শেয়াল বললে যে, তার বাপ এক ভাঁড় ঘি'র বদলে একটা পাঁঠা শেয়ালকে দেবে, এই রকম বন্দোবস্ত হয়েছে।

ছেলেটা ভাবলে, হবেও বা। সুতরাং তার কথায় বিশ্বাস করে একটা পাঁঠা দিয়ে পুঁয-রক্ত ভরা ভাঁড়টা নিয়ে চলে গেল। শেয়াল পাঁঠাটা নিয়ে মহানন্দে বাড়ি ফিরে গেল।

তার প্রতিবেশী শেয়ালদের এই পাঁঠা দেখে ভারি হিংসে আর লোভ হল। সে পাঁঠাটিকে বাসায় রেখে বাইরে গেছে, এই সুযোগে সকলে পাঁঠাটাকে মেরে সব মাংস খেয়ে ফেললে। তারপর চামড়ার মধ্যে ইট-পাটকেল পুরে পাঁঠার মতন সাজিয়ে রেখে দিলে। শেয়াল বাসায় এসে প্রতিবেশীদের কীর্তি দেখলে। কিন্তু কিছু না-বলে ছাগলের চামড়াখানা এক মুচির কাছে নিয়ে গেল। চামড়া দিয়ে একটা ঢাক তৈরি করে শেয়াল এক গভীর নদীর তীরে বসে দমাদম বাজাতে আরম্ভ করে দিলে। বাজনা শুনে প্রতিবেশী শেয়ালেরা এসে তার চারিদিকে ঘিরে দাঁড়াল। এমন মধুর স্বর তারা আর কখনো শোনে নি। আশ্চর্য হয়ে তারা জিজ্ঞাসা করলে, এমন সুন্দর ঢাক সে কোথায় পেলে।

শেয়াল বললে, নদীর তলায় এমন অনেক ঢাক আছে। গলায় এক-একখানা পাথর বেঁধে নদীতে ঝাঁপ দিলে সকলেই নদীর তলা থেকে সেইরকম ঢাক তুলে আনতে পারে।

অন্যান্য শেয়ালেরা ঢাকের লোভে তাড়াতাড়ি এক-একখানা পাথর গলায় বেঁধে জলে লাফিয়ে পড়ল আর সঙ্গে সঙ্গে ডুবে গেল। এই উপায়ে শেয়াল তার শত্রুদের শত্রুতার প্রতিশোধ নিলে।

নদীর সাপ

এক গেরস্তর বউ দূরগ্রামে বেড়াতে গিয়েছিল। বাড়ি ফেরার সময় পথে একটা নদী পড়ল। পার হতে গিয়ে সে দেখলে নদীতে জল অনেক, এবং স্রোতও বড় প্রবল। সে চারিদিকে চেয়ে দেখলে, কিন্তু নৌকা বা পার হবার অন্য কোন উপায় দেখতে পেলে না। তখন সন্ধ্যা হয়ে আসছে। কেমন করে বাড়ি পৌঁছবে, এই চিন্তায় সে ব্যাকুল হয়ে পড়ল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছে, এমন সময় নদীর মাঝখানে থেকে একটা বড় সাপ বেরিয়ে এল।

সাপ গেরস্তর বউকে ডেকে বললে, "আমি যদি তোমায় নদীর পার করে দিতে পারি, তাহলে তুমি আমায় কি দেবে?"

সে বললে, "সাপ, সঙ্গে ত' আমার কিছুই নেই, কি দেব বল?"

সাপ বললে, "আমায় কিছু না দিলে তোমায় পার করে দিতে পারি না।"

গেরস্তর বউ তখন গর্ভবতী ছিল। আর কোন উপায় না দেখে সে শপথ করে বললে যে, তার গর্ভে যে সন্তান আছে, যদি মেয়ে হয়, তবে সাপের সঙ্গে তার বিয়ে দেবে। আর যদি ছেলে হয়, তবে বড় হলে সে সাপের 'জুড়ি' বা নাম-পাতান বন্ধু হবে। গেরস্তর বউ দিব্যি ক'রে এই কথা স্বীকার করলে পর, সাপ তাকে পিঠে করে নদীর অপর পারে পৌঁছে দিলে।

গেরস্তর বউ বাড়ি ফিরে গেল। কিছু দিন পরে তার একটি মেয়ে হল।

বৎসরের পর বৎসর চলে যায়, কিন্তু গেরস্তর বউ সাপ ও নিজের প্রতিজ্ঞার কথা সব ভুলে গেল। একদিন সে নদীতে জল আনতে গেছে, এমন সময় সেই সাপটা নদী থেকে উঠে তাকে বললে, "কই তোমার মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে দেবে বলেছিলে, সে মেয়ে কই?"

এই কথা শুনে গেরস্তর বউয়ের সব মনে পড়ল। সে বাড়ি ফিরে এসেই তার মেয়েকে নদীর ধারে পাঠিয়ে দিলে। মেয়েটি যেই তীরের কাছে এসেছে, সাপটা তাকে ধরে নিয়ে অমনি জলের মধ্যে চলে গেল। মেয়েটি সেইখানে সাপের সঙ্গে থাকতে লাগল। কিছু দিনের মধ্যে তার চারটি সাপ-ছেলে জন্ম গ্রহণ করলে। অনেক দিন পরে মেয়েটির বাড়ির কথা, বাপ-মার কথা মনে পড়ল। সে তার মাকে দেখবার জন্য বাড়ি গেল। মেয়েটির ভাইরা বাড়ি এসে হারাণো বোনকে দেখে ভারি আশ্চর্য হয়ে গেল। তারা বললে, বোনটি, আমরা ভেবেছিলাম, তুমি জলে ডুবে গেছ।"

সে বললে, "না ভাই, আমি ডুবি নি। আমার বিয়ে হয়েছে, ছেলেপিলেও হয়েছে।"

ভাইরা জিজ্ঞাসা করলে, "আমাদের ভগ্নিপতি কোথায়?"

বোন বললে, "নদীর ধারে গিয়ে ডাকলে, তাকে দেখতে পাবে।"

এই কথা শুনে তারা সাপকে গিয়ে ডাকলে। সাপ নদী থেকে উঠে শালাদের সঙ্গে শ্বশুর-বাড়ি গেল। তারা খুব আদর-যত্ন করে সাপকে খাওয়ালে, সেইসঙ্গে এক পিপে ধেনো মদও পান করতে দিলে। মদ খেয়ে সাপটার ভারি ঘুম পেতে লাগল। সে কুণ্ডলী পাকিয়ে বেশ আরাম করে ঘুমতে লাগল। মেয়েটির ভাইগুলির ভগ্নিপতি সাপটাকে মোটেই পছন্দ হয় নি। তারা ঘুমন্ত অবস্থায় সাপটাকে কুড়ুল দিয়ে কেটে ফেললে। বোনটি সেই অবধি বাপের বাড়িতেই থাকল।

বাঘের বিয়ে

এক দেশে এক রাজা ছিলেন। তাঁর এক ছেলে আর অনেকগুলি মেয়ে ছিল। একদিন রাজা বনের মধ্যে ঘাস কাটতে গেছেন। কাটতে কাটতে এত ঘাস কেটে ফেলেছেন যে, বয়ে নিয়ে আসা তাঁর অসাধ্য। কি করবেন তিনি ভাবছেন, এমন সময় এক বাঘ সেখানে এসে উপস্থিত।

বাঘ বললে, "রাজা, আমি যদি তোমার ঘাসের বোঝা বাড়ি পৌঁছে দিতে পারি, তাহলে তুমি আমায় কি দেবে?"

রাজা বললেন, "তুমি কি চাও?"

বাঘ বললে, "তোমার এক মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে দিতে হবে।"

রাজা ভাবলেন, তাঁর অনেকগুলি মেয়ে, একজনের সঙ্গে বাঘের বিয়ে দেওয়ায় আপত্তি কি? রাজা সম্মত হলে বাঘ ঘাসের বোঝা পিঠে ক'রে নিয়ে রাজার বাড়ি পৌঁছে দিলে। রাজা দেখলেন, প্রকাশ্যে বাঘের সঙ্গে রাজকন্যার বিয়ে দেয়া বড় লজ্জার কথা। তিনি বাঘকে কূপের ধারে অপেক্ষা করতে বলে দিলেন। এদিকে এক মেয়েকে সেই কূয়া থেকে জল আনবার জন্য রাজা পাঠিয়ে দিলেন। রাজকন্যা যেমন কূয়ার ধারে এসেছেন, বাঘ অমনি তাঁকে নিয়ে পালিয়ে গেল। এদিকে রাজার ছেলে তার সেই বোনকে না-দেখতে পেয়ে খুঁজতে বেরিয়ে গেল। খুঁজতে খুঁজতে বনের মধ্যে এক গুহার ভেতর দেখতে যে, বাঘটা তার বোনকে মেরে মাংস খাচ্ছে। রাজপুত্র দৌড়ে গিয়ে রাজাকে জানালে। পরদিন বাঘটা সাহসে ভর ক'রে রাজবাড়িতে তাঁর সঙ্গে

শারদীয় অভিনন্দন—

নন্দী এণ্ড কোং রেজিঃ ষ্টকিষ্ট টাটা-ইস্কো এবং হিন্দুস্থান ষ্টীল

রাজকুমার এণ্ড ব্রাদার

বিশিষ্ট লোহ ব্যবসায়ী

রেজিঃ অফিস : ২০।২।বি, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা-(৭)

৩৩১৭৭৭—অফিস
৩৩৩৭০৮—গোডাউন
৬৭৪১০০—ষ্টীল ইয়ার্ড
} ফোন {
রেসিডেন্স
৪৬২৪৫১

সস্তায় ও সুন্দর

মশারি

পান্না মশারি ষ্টোর্স

৩৮-৬, রবীন্দ্র সরণী (আপার চিৎপুর রোড) কলিকাতা-৭

রকমারী শাড়ী ও পোষাকের জন্য

পদ্মা স্টোর্স

হাতীবাগান কলিঃ

৫৫-৮৩৫০

দুটি তারা

পারুল

ও

মাতোয়ারা

সুগন্ধ-জগতে তারকা সদৃশ

এন, ব্যানার্জী পারফিউমারী

কলিকাতা-২৯

দেখা করতে এল। রাজা আদর-যত্ন ক'রে তাকে কাছে বসালেন।

বাঘ বললে, "রাজা, বড় দুঃখের বিষয় আমার স্ত্রী মারা গেছে। এখন তোমার আর একটি মেয়ে আমায় দাও।"

রাজা বললেন যে, এ বিষয়ে তিনি খানিক ভেবে দেখবেন। রাজা বাঘকে রাজবাড়িতে থাকবার জন্য নিমন্ত্রণ করলেন। বাঘকে বেশ একটা নরম বিছানা দেওয়া হল। বাঘ নরম বিছানায় শুয়ে তখনই ঘুমিয়ে পড়ল। রাত্রিবেলা রাজপুত্র একটা বড় কড়ায় ক'রে খানিকটা জল গরম করলেন। বাঘ যখন বেশ ঘুমোচ্ছে, রাজার ছেলে সেই অবসরে বাঘের গায়ে সেই ফুটন্ত জল কড়াসুদ্ধ ঢেলে দিলে। বাঘ মহাশয় আর উঠলেন না, সেইখানেই পঞ্চত্ব পেলেন।

বাঘের পো

এক বনে এক বাঘিনী এবং এক গরু থাকত। তাদের উভয়ের বড় বন্ধুত্ব ছিল। তখনকার দিনে বাঘে মাংস খেত না। ঘাস-পাতা, শাক-সব্জী খেয়ে থাকত। বাঘিনীর দুটি ছেলে ছিল। তারা দিন দিন বড় হতে লাগল। একদিন বাঘিনী ও গরু জল পান করবার জন্য এক ঝরণার ধারে গেল। বাঘিনীটা একটু নেমে জল খেতে গেল, গরুটি ঝরণার মুখে দাঁড়িয়ে জল পান করতে লাগল।

জল পান করবার সময় গরুর পা লেগে জল ঘোলা হয়ে গেল। বাঘিনী সেই জল পান ক'রে মনে মনে ভাবলে, যার পা লেগে জল এত মিষ্টি, তার মাংস না জানি আরও কত মধুর। ঝরণা থেকে বাড়ি ফেরবার সময় বাঘিনী গরুর ঘাড় মটকে রক্ত-মাংস সব খেয়ে ফেললে। কেবল হাড়গুলো পড়ে রইল। বাঘিনীর ছেলেরা গরুর কথা তাদের মাকে জিজ্ঞাসা করলে

বাঘিনী বললে, আমি জানি না, গরু কোথায় গেছে। বোধ হয়, তাদের ফেলে রেখে সে আর কোনও জায়গায় চলে গেছে।

বাঘের পো-রা বেড়াতে বেড়াতে একদিন সেই হাড়গুলো দেখতে পেল। তখন তারা বুঝে নিলে, গরুর ভাগ্যে কি ঘটেছে। দুই ভায়ে পরামর্শ করলে, তাদের মা যখন বন্ধুর ঘাড় এমনি করে মটকাতে পারে, তখন একদিন তাদেরও ত মেরে ফেলতে পারে। এই ভেবে, বাঘিনী একদিন ঘুমচ্ছে, সেইসময় তারা কুড়ল-কোপা করে তাকে মেরে ফেলে অন্য দেশে চলে গেল।

ঘুরতে ঘুরতে এক গ্রামে পৌঁছে তারা শুনলে, একটা বাঘ এসে সেই দেশের বিস্তর গরু মানুষ মেরে ফেলছে। রাজা ঘোষণা ক'রে দিয়েছেন যে, যে সেই বাঘটাকে মারতে পারবে, তাকে অর্ধেক রাজত্ব ও তাঁর মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেবেন। বাঘের পো-রা বাঘ মারার কৌশল বেশ জানত। তারা সেই উপায়ে বাঘটাকে মেরে রাজার কাছে গিয়ে পুরস্কার চাইলে। রাজা অর্ধেক রাজত্ব ছেড়ে দিলেন, আর বড় ভায়ের সঙ্গে রাজকন্যার বিয়ে দিলেন। তারা বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করতে লাগল।

অকালে ভূমিষ্ঠ শিশু সমস্যা

(৪১ পৃষ্ঠার পর)

মায়ের জরায়ু থেকে বার করে নিয়ে কৃত্রিম ফুলের সাহায্যে ৬ ঘণ্টা পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হয়েছে। কাজের এই সবে শুরু। এ ৬দিন, ৬ মাস গর্ভের পর হাজার গ্র্যাম ওজনের শিশু অকালে ভূমিষ্ঠ হলে শতকরা ৯৫টি ক্ষেত্রে মৃত্যু অনিবার্য ছিল—৫ মাস হলে তো কথাই নাই। এখন ভ্রূণতত্ত্বের অগ্রগতি ও গবেষণায় সাফল্যের কল্যাণে হাজার গ্র্যাম ওজনের ভ্রূণের মৃত্যু আগের তুলনায় কিছু কমেছে। ৫০০ গ্র্যাম ওজনের ক্ষেত্রে এই সাফল্য লাভ করতে পারলে শিশু-মৃত্যুর হার অনেক-খানি কমিয়ে আনা যাবে সন্দেহ নেই।

ভ্রূণের গঠন ও ক্রমবিকাশের আদ্যোপান্ত জানা হয়ে গেলে স্নায়ু-তন্ত্রের কর্মপদ্ধতিও মানুষের আয়ত্তে আসবে। ভ্রূণের মধ্যে মানবিক আচরণের প্রথম লক্ষণগুলি যখন পরিস্ফুট হতে আরম্ভ করে সেই সময়-কার ক্রিয়া-প্রক্রিয়াগুলি আয়ত্ত করে ভাবী শিশুর অবয়বের গঠন এমন কি বংশগতি পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ করা যাবে বিভিন্ন পদার্থ ও রাসায়নিক বস্তুর সাহায্যে। উপ-করণ যখন কাঁচা ও কোমল থাকে তখনই ভাস্করের পক্ষে তাই দিয়ে নিজের ইচ্ছামত আকারের মূর্তি গড়ে তোলা সহজ।

ভুজগোপাখ্যানম্

(৫৪ পৃষ্ঠার পর)

নতুন একটা গিরগিটি হয়ে ওঠে। খসে-পড়া টুকরোগুলো কখনও জোড়া লাগে না।

এই হ'ল সাপের গল্প—ভুজ-গোপাখ্যানম্-এ সম্বন্ধে এত তথ্য চারিয়ে আছে দেশে দেশে যে এই সব আকাশকুসুম গল্প নিয়ে বেশী হৈ চৈ করা অপ্রয়োজনীয়। অবশ্য এদের বৈজ্ঞানিক রূপ জানলে উপকার বই অপকার হওয়ার সম্ভাবনা নেই বিন্দু-মাত্র।

সর্পদেবী এবং সর্প—কারোর গল্পই কম আকর্ষণীয় নয়। তবে দ্বিতীয়টির আকর্ষণ সম্ভবত অধিকতর কেন না, এখানে কল্পনার মূলে সত্যের ভিতটুকু স্পষ্ট অধিকাংশ ক্ষেত্রে, এবং তারই ফলে বিশ্বাসযোগ্যতা বহুগুণ বেশী। নিছক নাস্তিক মানুষও এ ধরণের গল্পে আনন্দ পেতে পারেন, প্রথম ক্ষেত্রে তা' অসম্ভব।

এডিসন

(৫২ পৃষ্ঠার পর)

সুইচ্‌গীয়ার, ভূগর্ভে কার্যকর তার, প্রথম বৈদ্যুতিক মিটার ইত্যাদি তাঁরই আবিষ্কার। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে লণ্ডন এবং ন্যু ইয়র্ক-এ কেন্দ্রীয় শক্তি কেন্দ্র এবং আলো জ্বালাবার পদ্ধতি বেশ চালু হয়ে গিয়েছিল।

এ নিয়ে কাজ করতে করতেই তিনি আবিষ্কার করলেন 'এডিসন এফেক্ট'—রেডিও নলের ভিত্তি।

ইতিমধ্যে তাঁর মনোযোগ আকৃষ্ট হয় ফোটোগ্রাফিতে। প্রাথমিক অসাফল্যর পর মাত্র পাঁচ বছরের মধ্যে তিনি এবং সহকারী মিঃ ডিক্সন সবিরাম-গতির নিয়ম নিখুঁত করেন; কার্যকরী চলচ্চিত্র ক্যামেরা এবং প্রথম ব্যব-হারিক দর্শন পদ্ধতি কিনেটোস্কোপও তাঁদেরই উদ্ভাবনা।

এডিসন-এর মত মানুষ যাঁরা মানুষের মঙ্গলকর্মে নিজেদের সঁপে দিয়েছিলেন, তাঁদের মূল্য কোন তাত্ত্বিকের তুলনায় কম এ কথা বলা সম্ভবত অনুচিত। যে সুবিধা তাঁরা মানব জাতিকে দিয়েছেন তা' ভোগ করে এঁদের ছোট করে দেখা আর যাই হোক কৃতজ্ঞতার পরিচয়বাহী নয়। যাঁরা এঁদের কৃতিত্ব, এঁদের উদ্ভাবনী মনীষা তেমন উঁচু দরের নয় মনে করে কিঞ্চিৎ তাচ্ছিল্য প্রকাশে অভ্যস্ত, তাদের এই কথাটুকু ভেবে দেখতে একান্ত অনুরোধ। তাতে ওদের লাভ কিছু না হ'লেও আমাদের মনের একটা বন্ধ জানালা অবশ্যই উন্মুক্ত হবে। লাভটা আমাদেরই।

বৈচিত্র্যের বদলে

(৫৬ পৃষ্ঠার পর)

দরজা বন্ধ করে দিয়ে উপানন্দ শুয়ে পড়ল। আজ আর হোটেল যাওয়া না। আজ একটু বৈচিত্র্য করা যাবে—আজ ঐ স্টোভে ফুটিয়ে নেওয়া যাবে একটু ডাল-চাল।

চিৎ হয়ে শুয়ে দেয়ালের উপর পা তুলে দিতে যাবে, এমন সময়ে দরজায় কে যেন কড়া নাড়ল।

দরজা খুলতেই—একি! সম্মুখে একজন মহিলা দাঁড়িয়ে।

উপানন্দ বুঝি হতভম্ব হয়ে গেল, জিজ্ঞাসা করল, "কাকে খুঁজছো?"

"কাউকে না। আমি রাস্তা হারিয়ে ফেলেছি। ভীষণ বিপদে পড়ে গিয়েছি। আজ রাত্রের মত যদি একটু আশ্রয় দেন।"

মহিলাটির আপাদমস্তক দেখে নিল উপানন্দ। দেখতে তো বেশ। বয়স কতই আর হবে।—কুড়ি হোক, বাইশ হোক, বড় জোর পঁচিশ হোক।

উপানন্দ বলল, "আমি যে একা থাকি, কি করে আপনাকে—"

"তাতে কোনো অসুবিধে হবে না আমার। আমি সকালে উঠে চলে যাব।"

কিছুই বলতে পারছে না উপানন্দ। কোথায় উনি যাবেন, কোথা থেকে উনি আসছেন, রাস্তা হারিয়ে গেল কী করে। কোনো কথাই জিজ্ঞাসা করতে পারছে না উপানন্দ। এমন কি মহিলাটিকে ঘরের মধ্যে বসতেও বলতে পারছে না দরজার সামনে সে দাঁড়িয়ে আছে।

মহিলাটি বললেন, "দেখুন কি রকম ভিজে গিয়েছি।"

কি রকম ভিজে গিয়েছেন উনি,

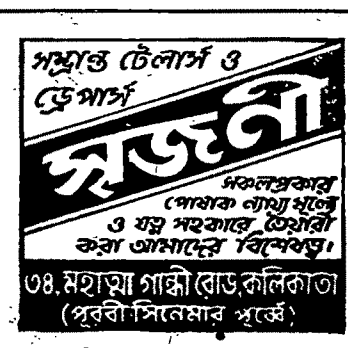

তাও ভালো করে দেখতে ভরসা পাচ্ছিল না উপানন্দ।

মহিলাটি বললেন, "আমি এভাবে আসায় আপনি খুব বিপদে পড়েছেন মনে হচ্ছে। কিন্তু বিপন্ন আপনাকে আমি করব না, সকাল হলেই চলে যাব। আমার শীত করছে। আপনার ঘরে একটু বসি।"

অগত্যা দরজা ছেড়ে দাঁড়াল উপানন্দ।

মিহিরের ছেড়ে যাওয়া চেয়ারটায় বসলেন মহিলাটি। বললেন, "দয়া করে দরজাটা বন্ধ করে দিন। হাওয়া আসছে, শীত করছে। তার উপর দুনিয়ার কত বাজে লোক আছে—এভাবে এখানে একজন মেয়েলোক দেখলে, কি আর বলব, বুঝতেই পারছেন।"

উপানন্দর চোখমুখের চেহারা বদলে গিয়েছে। কেমন ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে, দুই কান গরম হয়ে উঠেছে তার।

মহিলাটি বললেন, "একটা কাপড় দিন। ধুতি হলেও চলবে। দেখছেন না, কি রকম ভিজে গিয়েছি—এসব বদলাব।"

উপানন্দ ভাবছে—এ যে একটা নাটক। এমন ঘটনা ঘটা—এ যে অসম্ভব।

উপানন্দ বলল, "আপনি থাকুন। আমি একটু আসছি।"

"কোথায় চললেন আমাকে একা ফেলে?"

"কোথাও না। একটু ঘুরে আসছি। বেশি দেরি হবে না।"

কিন্তু মহিলাটি ওকে বাধা দিতে লাগলেন। একটু চাপা গলায় বললেন, "এমন একটা রোমাঞ্চকর অবস্থা থেকে আপনার এখন যেতে ইচ্ছে করছে? আপনি একটা কাপুরুষ নাকি?"

উপানন্দ বলল, "না না, সত্যি কাপুরুষ না। আমি আসছি। এক্ষুণি আসছি।"

উপানন্দ পালাবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। এই ভীষণ অবস্থা থেকে অব্যাহতি চায় সে। বলল, "একটু অপেক্ষা করুন, যাব আর আসব।"

"যাবেন না। বৃষ্টিতে ভিজলে সর্দি হবে যে।"

কিন্তু না, উপানন্দ বেপরোয়া। সে পালাবেই। পালাবার জন্যে সে উঠে পড়ল। দরজা খুলে ফেলল।

দরজা খুলতেই একি?—একপাল লোক দাঁড়িয়ে তার বারান্দায়। অপরেশ, মনোরঞ্জন, বিনয়, তপেশ আর মিহির এবং সঙ্গে কয়েকজন মহিলাও।

অপরেশ বলল, "আশ্চর্য। বিচিত্র মানুষ তুমি উপানন্দ। একজন মহিলার ভয়ে পালাচ্ছ?"

উপানন্দ একেবারে নিভে গিয়েছে, একেবারে নিষ্প্রভ হয়ে সে দাঁড়াল।

ঐ ভিড়ের মধ্য থেকে এগিয়ে একজন মহিলা ঘরের মধ্যে ঢুকে বললেন, "চমৎকার! শোনো তোমরা। সকলে চাঁদা তোলো। বন্দনাকে আমরা একটা মেডেল দেব।"

বেকুবের মত দাঁড়িয়ে ঐ কথাগুলো শুনল উপানন্দ।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের তত্ত্বোপলব্ধি

(৯১ পৃষ্ঠার পর)

"প্রথম বয়সে আমি হৃদয়ভাব প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছি গানে, আশা করি সেটা কাটিয়ে উঠেছি পরে। পরিণত বয়সের গান ভাব-বাৎলাবার জন্যে নয়, রূপ দেবার জন্য। তৎসংশ্লিষ্ট কাব্যগুলিও অধিকাংশই রূপের বাহন।"

এ হল প্রধান দুটি দিক। তা ছাড়া, কোন্ গান কোন্ সময়ে বা কী উপলক্ষে রচিত তা জানতে পারলে অনেক নূতন তথ্যের সন্ধান পাওয়া যাবে। কোনো গান বিশেষ উপলক্ষে রচিত, কোনো গান উপলক্ষবিশেষে রচিত হলেও তার ভাবসীমা দেশ-কালের গণ্ডি পেরিয়ে গেছে। কোনো গানে রচনার স্থান ও কালের প্রভাব আছে, কোনো গানে রচনার পূর্বের স্থান-কালের প্রভাব আছে, ইত্যাদি। রবীন্দ্রসঙ্গীতে যে মানব-মনের বহুবিচিত্র ভাব-অনুভাবের সন্ধান মেলে তার রহস্য এ-সব তথ্যে নিহিত আছে।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের তত্ত্ব ও তার উপলব্ধি সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করা হল। তত্ত্ব (Theory) সর্ববিষয়ে ক্রিয়া (Practice)-সংশ্লিষ্ট হবে এটাই নিয়ম। তা না হলে শাস্ত্র তথা তত্ত্ব ও পরিবেশন-রীতিতে সামঞ্জস্য থাকে না। অবশ্য কেবলমাত্র তত্ত্বজ্ঞানেই ক্রিয়ার পরিসমাপ্তি নয়। প্রধান হল যথাযথ সাধনার (ক্রিয়াত্মক) দিক। রবীন্দ্রসঙ্গীতে তাই গম্য।

ক্ষোভ

(৬৮ পৃষ্ঠার পর)

ফুলের মালা জড়ানো থাকবে, নিদেন-পক্ষে গলার মালাটা হাতে, কিন্তু সে সব কিছু নয়।

মুখে যেন অমাবস্যার অন্ধকার। মাঝখানে একপশলা বৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। নরহরির সারা গায়ে কাদার ছিটে।

নিতান্ত কৌতূহলবশেই তরলা জিজ্ঞাসা করল, কি, মিটিং হয়নি?

নরহরি ফেটে পড়ল, হবে না কেন, মিটিং ঠিকই হয়েছিল। কিন্তু আমাদের কেউ একবার মুখ তুলে দেখলেও না। বরং বক্তৃতা দিলে আমাদেরই আক্রমণ করে। হিংসার পথ, ভুল পথ। সেই পথে গিয়ে আমরা অন্যায় করেছি। দেশের স্বাধীনতা এসেছে চরকা কেটে আর অহিংসার বুলি আউড়ে। তাই তাদের স্থান মঞ্চের ওপর, যত ফুলের মালা দুলবে তাদের গলায়।

নির্জীব নির্বীর্য লোকটা জ্বলে উঠল।

এই অবিচারের প্রতিকার চাই। একটা জীবনকে নষ্ট করার কৈফিয়ৎ।

উত্তেজনায় নরহরি দাঁড়িয়ে উঠল।

শাড়ী পরা তরলার শেষ হয়নি, কিন্তু সব ভুলে সে দরজায় কপাট দুটো সম্পূর্ণ খুলে দিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল।

অবিচারের প্রতিকার তো আমিও চাইতে পারি। একটা জীবনকে নষ্ট করার কৈফিয়ৎ দাবী করার অধিকার তো আমারও আছে।

অবিকল নরহরির কণ্ঠ অনুকরণ করল তরলা। একই বিক্ষোভের সুর।

নরহরি চমকে মুখ ফেরাল। তুমি?

হ্যাঁ আমি। আমার জীবন নষ্ট করনি তুমি? তোমার উদ্দেশ্যের পিছনে আত্মহারা হয়ে ছুটেছ আমাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে। আমার যৌবনের দাবী জীবনের দাবী তুমি অগ্রাহ্য করেছ। তিল তিল করে উপবাসী রেখে আমার আত্মাকে অপমানিত করনি? আজ নিজের ওপর অবিচার হয়েছে, সেই বেদনাই তোমার বুকে বেশী বেজেছে!

অকল্পনীয়

(৭৮ পৃষ্ঠার পর)

হয়েছিল। এখন মা, ছেলের বাড়ীতে চলুন, বৌএর সেবাখান, আর বুড়ো ছেলেকে একটু আদরযত্ন করুন, এই প্রার্থনা।

সরলার দুচোখ দিয়ে ঝর ঝর করে জল ঝরতে লাগলো। লক্ষ্মী চা নিয়ে ঘরে এসেই, মার চোখে জল দেখে থমকে দাঁড়ালো। মনোরমা উঠে এসে,—নিজের আঁচল দিয়ে সরলার দুচোখ মুছিয়ে দিতে দিতে বললেন,—একি রে? কেঁদে যে একেবারে ভাসিয়ে দিলি। কচি মেয়েটা ভয় পাবে যে।

—আজ আমায় একটু কাঁদতে দে মনো। কান্নাভরা গলায় বললেন সরলা—দুটো ফুলের মত ছেলে মেয়ে একদিনে ঝরে গেল কলেরা হয়ে। ওঁর মুখের দিকে চেয়ে, প্রাণ ভরে যে কাঁদতেও পারিনি। তারপর এলো সেই সর্বনাশের দিন, এই বাচ্চা দুটোর জন্যে সেদিনও যে আমার কাঁদবার উপায় ছিল না। চোখের জলগুলো জমাট বেঁধে যে পাথর হয়ে গেছে ভাই। এই বুকের ভেতর সে পাথরটা চেপে বসে আছে। বড় দুঃখের দিনে তারা ঝরতে পারেনি, আজ বড় সুখের দিনে, পাথরটাকে গলে ঝরে যেতে দে ভাই।

আর শুধু নিজের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে মেয়েটাকে সঙ্গী করে দিনের পর দিন অবহেলা করেছ, তার ওপর বিচারের প্রশ্নটা বুঝি একবারও মনে হয়নি?

নরহরি চোখ তুলে দেখেই বিস্মিত হল।

চুলের রাশ খুলে পিঠের ওপর ছড়িয়ে পড়েছে। পরিপূর্ণ দুটি উরস সম্পূর্ণ উন্মুক্ত। ক্ষীণ কটি। যৌবন-পুষ্পিত দেহ। অগ্নিগর্ভা দুচোখের দৃষ্টি।

মূর্তিমতী যৌবনের ক্ষুধা।

প্রথম যৌবনে নরহরি বিপ্লবীদের কাছে দেশের এমনই এক মূর্তির রূপ কল্পনা করার শিক্ষা পেয়েছিল।

স্বপ্নসৌধ

(৮১ পৃষ্ঠার পর)

চমকে ওঠে দুই সখীই। যে সরস্বতী কোনদিন মুখ খোলেনি সে বলে কি? কোন সরস্বতীর সাধনা।

সাহিত্য সাধনা। উনি লেখেন গল্প উপন্যাস। মানুষের সুখ-দুঃখের কাহিনী। এই লেখাই তো ছাপা হয়ে কাগজে কাগজে বই হয়ে ছড়িয়ে পড়ে দেশ-বিদেশে। অসংখ্য মানুষ ঐ লেখা পড়ে মুগ্ধ হয়। কেউ কাঁদে কেউ হাসে। ঐ লেখা থেকেই ছড়িয়ে পড়ে নাম, আসে যশ অর্থ সম্মান, মানুষের মনের মাঝে বেঁচে থাকে সাহিত্যিক অমর হয়ে।

সরস্বতী গল্প করছে না, শোনাচ্ছে প্রাণের কথা, মনের কথা। সমরেশের কাছে যা শুনেছে সব সাজিয়ে রেখেছে থরে থরে মনের মণি-কোঠায়। জীবন দিয়ে যা উপলব্ধি করিয়েছে সমরেশ, সব ঢেলে দিচ্ছে সরস্বতী উজার করে।

প্রণতি আর সুরমা শুধু শুনছে না, গিলছে বোধ হয়ে। ওদের চোখ দুটো চক্‌চক্ করছে কৌতূহলে। দিনের পর দিন যে সরস্বতী অসীম ধৈর্যে ওদের গল্প শোনে এ সরস্বতী সে নয়। এ যেন দেবী সরস্বতী।

সরস্বতী নিজেও যেন কেমন হয়ে পড়েছে। তার আর কোন ক্ষোভ নেই। দুঃখ নেই। স্বামীর মহত্ত্ব আর গৌরব উপলব্ধি করেছে সে। সত্যিই আজ সে স্বামী-গর্বে গর্বিতা।

সরস্বতীর মুখের দিকে মুগ্ধ নেত্রে চেয়ে তখনও বসে দুই সখী। চেয়ে চেয়ে দেখছে স্বামীর সঙ্গে সরস্বতীও অনেক বড় হয়ে উঠেছে—তার মাথা ওদের ছাড়িয়ে অনেক—অনেক ওপরে উঠে গেছে।

দেশ জননীর কণ্ঠে আর্তস্বর ছিল, ম্যয় ভুখা হুঁ।

যে ক্ষুধা মেটাবার আপ্রাণ চেষ্টা নরহরিরা করেছিল, কিন্তু এতদিন পরে বুঝল তাদের সে চেষ্টা অপপ্রয়াস মাত্র।

কিন্তু আজ আর এক রমণীর কণ্ঠে সেই এক তৃষিত কণ্ঠস্বর। এর ক্ষুধা মেটাবার সম্বলও নরহরির জরাজীর্ণ দুর্বল দেহে নেই।

দাওয়ার খুঁটিটা সবলে আঁকড়ে ধরে নরহরি একটা অবলম্বন খোঁজার চেষ্টা করল। অন্তত তলিয়ে যাবার আগে সাময়িক একটা আশ্রয়।

দুরতিক্রমণীয়া

(৭২ পৃষ্ঠার পর)

মেয়েটার ওপর বীতস্পৃহ হয়ে উঠেছেন মনে-প্রাণে, রেগে দুত্তোর বলে হুঙ্কার দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠতেই কাপড়টা কি করে যেন চেয়ারের হাতলে আটকে গেল। হয়তো রক্তনেত্রে মেয়েটার দিকে ঘুরে দাঁড়াতে চেয়েছিলেন, তাতেই। মুক্তকচ্ছ হবার আগেই কাপড়টা ছাড়িয়ে নিয়ে তাকিয়ে দেখলেন—

দেখলেন সেই টাকিস তোয়ালে বিজড়িতা বাকপটিয়সী সর্বাধুনিকা মেয়েটি কোথাও নেই—সামনে তো নয়ই—তাঁর কল্পনাতেও না।

যাক্, তাই যাক। গল্প লিখে তাঁর আর কাজ নেই, শখ মিটেছে।

মন ভিন্নমুখী এখন—দ্বাদশ বর্ষিয়া কন্যাটির মুখ মনে পড়েছে। পাশাপাশি তার মায়ের মুখখানিও কম স্পষ্ট নয় মনের চোখের সামনে অসীম বাবু ব্যস্ত পায়ে ঘরের দিকে পা বাড়ালেন।

মাসখানেক হতে চলল গ্রামের বাড়ীতে নির্বাসন দিয়ে এসেছেন তাদের—চোখের জলে ভেজা মুখ দেখেও করুণা করেন নি।

কলকাতায় বদলী হয়ে এসেছেন তিনি মাস দুই। সস্তা শহরে চালের বীজাণু কিভাবে আক্রমণ করছে বহু মেয়েকে, এসে পর্যন্ত টুকটাক প্রমাণ পাচ্ছিলেন তার। অতটা গ্রাহ্য করেন নি। এমন সময় একদিন কুইম্যাক্স ঘটে গেল। ব্যাপারটা তুচ্ছই। একদিন দেখলেন বিস্তর দাম দিয়ে একজোড়া সৌখীন চটি কিনে এনেছেন-স্ত্রী, শুধু ফুল-লতা-পাতার বাহার তাতে, দুমাস টিকবে কি না সন্দেহ। বদরাগী বলে দুর্নাম আছে অসীম বাবুর, সেটা মিথ্যা নয়। ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির মত বলেছিলেন, এমন সময় মেয়ে কাছে ঘেঁসে এসে স্টেনলেস স্টিলের আংটি আর পুঁতির মালার দরবার করতেই একেবারে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলেন।

এই মুহূর্তে তাদের জন্য মন উতলা হয়েছে বড়।

ঘরে গিয়ে আলো জ্বালালেন অসীম বাবু। দেশে যাবার সব চেয়ে নিকটবর্তী ট্রেণের সময়টা দেখবেন টাইম টেবলে।

অনুশোচনার তীব্রতা অন্তর জুড়ে।

এত তুচ্ছ কারণে এত রাগ করা উচিত হয় নি তাঁর। লঘু পাপে গুরুদণ্ড দিয়ে বসে আছেন।

শাস্ত্রের উক্তি তো মিথ্যা হবার নয়; যস্মিন দেশে যদাচার।

চোখের সামনে অন্ধকার আর অন্ধকার। দেওয়ালের মত নিরেট, শক্ত দুর্ভেদ্য। এই অন্ধকারের সুতো দিয়ে এমন একটা জাল বুনে রাখা আছে, যার ফাঁদে পড়ে আজকাল ডাঙায় তোলা মাছের মত ছটফট করছে সুনন্দ। পালাবার মত ফাঁক রাখেনি কেউ, এমন কি ভোলবার মতনও।

'তোমার জন্ম অন্ধকার থেকে, তোমার মৃত্যু অন্ধকারের দিকে আর তোমার জীবনও অন্ধকার, ক'টি মুহূর্তের সমষ্টি—' নিঃশব্দ সময়ের বুক চিরে অমোঘ দৈববাণী বার বার ভেসে ওঠে।

সুনন্দ শোনে। শুনে শুনে প্রায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে।

নিজেকে আয়নায় প্রতিফলিত হ'তে দেখে বিস্মিত চোখে। সে একজন মানুষ। সমস্ত মানুষের প্রতীক। তারপর, দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে চোখ ফেরায় রোদে-জ্বলা কৃষ্ণচূড়ার ডালের দিকে।

ফুল ঝরছে, ঝরছে, ঝরছে।

জমাট রাত্রির ঘনীভূত কুয়াশার পর্দা সরিয়ে আবার একটি দিনের সূচনা দেখা দিলো। শুয়ে শুয়ে সুনন্দ ঘুমন্ত চোখে দেখলো প্রথমে জানলার ধূসর কাচে-রঙের ছিঁটে-ফোঁটা লেগেছে।

ঘরে কেউ নেই। ঘুম ভাঙার আগের মুহূর্তে বোধ হয় স্বপ্নের ঘোরেই হাত বাড়িয়ে নীলিমাকে ছুঁতে চেয়েছিল। হাতে যেন ওর নরম চুলের ছোঁয়া ঠেকেছে ভেবে আশ্বস্ত হয়ে চোখ খুলে সুনন্দ খালি, নিঃসঙ্গ, ফাঁকা ঘরটা দেখে আবার ঝিমিয়ে পড়ল। না, নীলিমা সত্যিই নেই। দেওয়ালে একটা চৌকো খালি সাদা দাগ, যেখানে ওর ছবিটা ঝুলত।

ঘুম ভেঙে সুনন্দ বিছানার উপর বসে তিনদিন দাড়ি না-কামানো মুখে হাত বুলিয়ে নিরুৎসাহী চোখ মেলল।

জানলার কার্নিশে একটা চড়ুই পাখি আজও এসে বসেছে। মুখে খড়ের কুটো অর্থাৎ ঘরের স্বপ্ন। পাখিটা জানে না একটুখানি ঝড় উঠলেই সেই

জয়ন্তী সেন

ঘর এক নিমেষে ভেঙে পড়বে। পরশু দিন বিকেলবেলা কালবৈশাখীর ঝড়ে অর্ধেক গড়া বাসাটা লণ্ডভণ্ড হয়ে মাটিতে পড়ে গিয়েছিল। কাল থেকে আবার শুরু হয়েছে খড়-কুটোর আমদানী।

জানলা দিয়ে চাকরটা মুখ বাড়িয়ে ওকে বসে থাকতে দেখে মাটির ভাঁড়ে করে কড়া তেতো চা আর ঠোঙায় মোটা দু'খানা বিস্কুট নিয়ে ঢুকল। নীলিমা চলে যাওয়ার পর থেকে প্রায় পনের দিন হয়ে গেল সব কিছুই ঐ শুকলালকেই করতে হচ্ছে। পরশু দিন মাস ফুরিয়ে গেলে মাইনে চুকিয়ে নিয়ে পাশের দোতলা বাড়ীর ছোকরা ডাক্তার-বাবুর বাড়ী কাজে লাগবে, এ কথা অনেকবারই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলছে। ডাক্তারবাবুর পশার ভালো, ওখানে মাসকাবারে টাকার জন্য হা-পিত্যেশ করতে হবে না তাকে।

'আমি বরং বাজারে যাই বাবু, দুটো টাকা দিন', শুকলাল গামছা দিয়ে ঘামে-ভেজা মুখ মুছে ইতস্তত করে বলে। কাল রাত্রিবেলা সুনন্দ রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে শুধু তিন-চার কাপ চা খেয়ে খিদে মিটিয়েছে, আর তারই ফলে আজ সকাল থেকেই পেটের মধ্যে কেমন একটা তীব্র শূন্যতা। ছেঁড়া পাঞ্জাবীর পকেটে হাত দিতে গিয়ে মনে পড়ে গেল কাল সন্ধ্যায় খালি মানিব্যাগটা অসহ্য ভারী মনে হয়েছিল বলে লেকের সোনালী জলে ওটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল।

ঘরে এখন নীলিমার ফেলে-যাওয়া ছোট হাত-বাক্সটা ঘেঁটে দেখা ছাড়া আর কোথাও কোনো উপায় নেই। ওটাকে কি তাহলে খুলতেই হবে?

'তোর কাছে খুচরো পয়সা থাকে ত' মুড়ি-টুড়ি নিয়ে আয় না—" সুনন্দ বিব্রত না-হওয়ার চেষ্টা করল। হাত নেড়ে আর মাথা নেড়ে আপত্তি জানালো শুকলাল। বাবুর নিশ্চয় সব কিছু গোলমাল হয়ে গেছে, তা না-হলে আজ নিয়ে বোধহয় তিনদিন ঐ একই কথার পুনরাবৃত্তি করছে।

'আচ্ছা, তবে ঘুরে আয় দশ মিনিট আমি দেখছি।'

অনিচ্ছুক চোখদুটো সুনন্দ দেওয়ালের তাকে ফেরালো। একটা ফাটল-ধরা কাচের ফুলদানিতে কতকগুলো শুকনো রজনীগন্ধার ডাঁটা। ফুলগুলো কবে ঝরে গেছে। ডাঁটার সবুজ রঙে ধাদামীর ছোপ। ছেঁড়া কাগজের স্তূপ, কলঙ্ক-ধরা পিতলের ছাইদানিটা। তার পাশেই নীলিমার ছোট হাত-বাক্সটা। ওটা নীলিমা নিয়ে যায় নি। তাছাড়া ঘরের আর কোথাও তার কোন চিহ্ন নেই। দড়িতে ময়লা গেঞ্জিটা যেখানে ঝুলছে সেখানে শাড়ী, ব্লাউজগুলো অগোছালো-ভাবে ছড়ানো থাকত। আয়নার সামনে ভাঙা চিরুণীটা পর্যন্ত নেই। তেলের গন্ধ মাখা কালো চুল বাঁধার ট্যাসেল যেখানে থাকতো, সেখানে তেলতেলে একটা ছাপমাত্র ফুটে উঠেছে।

ঐ ভাঙা হাত-বাক্সটা না থাকলে অনায়াসে সুনন্দ মনে করতে পারতো মাঝখানের দুটো বছর একটা স্বপ্ন। রাত্রির অন্ধকারে ছলনার মত কয়েক মুহূর্তের জন্য ওর চেতনার জগতে সাড়া তুলেছিল। তারপর আকাশে রোদ ফুটে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে স্বপ্নটা ঠিক কুয়াশার মত মিলিয়ে গেছে। যেমন প্রত্যেক স্বপ্নই হারিয়ে যায়।

হাত-বাক্সটা নামিয়ে তার ভেতর থেকে খালি সাবানের বাক্সটা তুলে নিলো। যখন তার চাকরী ছিলো, তখন নীলিমা সংসারের খরচ বাঁচিয়ে বাক্সে কিছু খুচরো পয়সা জমাতো। কে একজন ওকে বলেছিলো—এভাবে দিনে দু-চার আনা জমিয়ে কোনো সুগৃহিণী নাকি পাঁচশ টাকার একখানা সোনার হার গড়িয়েছিলেন। ন্যাকড়ায় গেরো বাঁধামাত্র দু-চার আনাই আছে, পাঁচশ টাকার ধারে-কাছেও পৌঁছতে পারে নি নীলিমা। শেষদিকে ওর সংসারে মন একেবারেই ছিল না। সুনন্দ বেশ বুঝত, এই ঘর ওর কাছে একটা খাঁচার মত দম-বন্ধ-করা আড়ষ্টতা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভুল বুঝতে পেরে নীলিমার ফ্যাকাশে সাদা মুখটা ক্রমশ যেন আরও প্রাণহীন হয়ে উঠেছিল একটু একটু করে।

জীবনটাই বোধহয় একটা মস্ত ভুল—সুনন্দ গুণে গুণে মাত্র দশ আনা পয়সা পেলো। এবারে একটা সাদা ভ্যানিটি ব্যাগ, যার চামড়ায় ঘষা-ঘষা দাগ লেগেছে। হ্যাণ্ডেলটা একসময়ে রূপোর মত ঝক ঝক করত, এখন কালো হয়ে গেছে। কুঙ্কুমের দাগ লাগা একটা আধ-ময়লা রুমাল, দু-তিনটে খুচরো চাবি, আর কয়েকটা পুরোন চিঠি। সুনন্দ খামগুলো উল্টে-পাল্টে দেখলো। না, এক-আধটা টাকাও জমিয়ে রাখে নি নীলিমা। ওর দোষ ছিল, যখন যা পেত, তাই শখের জিনিষ কিনে নষ্ট করত খামখেয়ালীর মত। শিষভাঙা ভুরু আঁকবার পেনসিলের পাশে ক্ষয়ে-যাওয়া লিপস্টিক, খালি সেণ্টের শিশি। ঝুটো পাথর বসানো দুলের একটি কোথায় পড়ে গিয়েছিলো, অন্যটি ফেলতে পারে নি প্রাণ ধরে। নকল হীরে তার পান্না এখনও ঝকমক করছে।

এ-ছাড়া কালো বাঁধানো গানের খাতার মধ্যে একটি ফুল-সাইজ ফটোগ্রাফ। সুব্রত তার স্টুডিওতে ওদের দু'জনকেই নিয়ে গিয়েছিল টানতে

টানতে। একসঙ্গে অনেকগুলো তোলবার পর হঠাৎ নীলিমার একলা একটি ছবি তোলার শখ হোল। জোর করে হাত ধরে নীলিমাকে জোরালো বাতির সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল সুব্রত কয়েক মুহূর্তের জন্যে। আশ্চর্য নিখুঁত হয়েছে ছবিটা। আসল মানুষের চাইতেও আরও সুন্দর।

ছবি দেখে নীলিমা খুশী হয়ে তখুনি সুব্রতকে রাত্রিবেলা খেয়ে যাওয়ার নিমন্ত্রণ করে বসেছিল সেদিন। হয়তো ওর খেয়াল ছিল না সুনন্দ দুটো টিউসনী করে রাত দশটার আগে ফিরতে পারবে না। আর সেই শুরু।

ভাঙা হাত-বাক্সটা উপুড় করে অনেক ঝাঁকুনি দিয়ে অবশেষে নিশ্চিন্ত হয়ে সুনন্দ খুচরো পয়সাগুলো নিয়ে জানলার ধারে এসে দাঁড়ালো। কয়েকটা টাকার সমূহ দরকার, ধার চাইলে ধার দিতে পারে এমন কোনো বন্ধুর নাম যদি হঠাৎ মনে পড়ে যায়, সেই আশায় প্রাণপণে মনের মধ্যে হাতড়ে দেখে নিলে একবার। নির্মলেন্দু আজকাল বাপের ব্যবসা দেখছে, কে বলছিলো একটা নতুন গাড়ী কিনেছে—সেদিন। তাছাড়া বিমল, উমানাথ, হরিপদ-দা মাসের প্রথম সপ্তাহে দু-একটাকা হয়তো দিতে পারবে এখন থেকে বলে রাখলে।

'বাবু—' শুকলাল পানের রঙে রাঙানো দাঁতগুলো মেলে হাসলো।

'বাজারে আর যেতে হবে না তোকে —আমি বাইরে কোথাও খেয়ে নেব—'

শুকলালের উপস্থিতি এড়িয়ে যাওয়ার জন্যে সংক্ষেপে সুনন্দ জবাব দিলো। আর একটা নামও মনের মধ্যে রঙিন তুলির আঁচড় কাটছিলো একটু আগে। মোহিত আর তার বোন মাধবী। বেশীদিনের আলাপ নয়, কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই ওরা অন্তরঙ্গ বাঁধনে বাঁধা পড়েছিল, আশ্চর্যভাবে। চায়ের আসরে মুচমুচে কাজু বাদাম খেতে খেতে নীলিমার গল্পটা একটা দুর্বল মুহূর্তে বলে সুনন্দ দেখেছিল মাধবীর নরম-কালো চোখের ভিজে ভিজে চাউনীতে প্রশ্রয় আর সহানুভূতির স্পষ্ট ছাপটুকু।

কলকাতায় নয়, অনেক দূরে মধুবনী বলে একটা জায়গা আছে। সেখানে শাল-মহুয়ার বনে আশ্চর্য-সুন্দর পাখি আসে, রাত্রি হলে দূরের পাহাড় থেকে ভালুক-ছানা নামে মধুর লোভে লোভে। মাধবী গান গাইতে পারে না, কিন্তু নরম মিষ্টি গলায় সুন্দর আবৃত্তি করে শোনায়।

সুনন্দকে দেখলে অবাক হয়ে যাবে ওরা। মোহিত দিশাহারা হয়ে বন্দুক-হাতে বনমুরগীর খোঁজে উধাও হবে, আর মাধবী তার ডুরেশাড়ীর আঁচল জড়িয়ে স্টোভে চায়ের জল চাপাবে গুনগুন গান গেয়ে।

হঠাৎ একটা সুখের ছবি দেখতে শুরু করল সুনন্দ—যে ছবি অন্ধকারের গায়ে মাঝে মাঝে আলোর মতো ফুটে উঠে আলেয়ার মত মিলিয়ে যায়।

'বাবু—' শুকলাল আবার ডাকল। ওর চমক ভেঙে দিয়ে—'একটা কথা বলি বাবু—শুনবেন? মা কবে ফিরে আসবে?'

'জানি না'—নির্লিপ্ত স্বর ফুটিয়ে তুলল সুনন্দ, যদিও মনে তুফান বইছে।

'না জানলে কি করে চলে বাবু।' আজ প্রায় পনর দিন হয়ে গেল একটা চিঠি পর্যন্ত এল না। আপনি কি ফের ঝগড়া করেছেন মার সঙ্গে?'

'তুই বেশী কথা বলিস না—' কড়া ধমকের সুর ফুটিয়ে তুলল সুনন্দ।

'আমি না-বললে কি হবে, পাড়ার সবাই আমাকে ডেকে কত কি বলে। এই তো ও বাড়ীর ডাক্তারবাবুর মাইজী. এদিকে হলদে বাড়ীর দিদিমণি, তারপর মুদী-দোকানে যে নতুন ছোকরা বাবুটা বসে।'—

সুনন্দ তার বুকের শব্দটা ক্রমশ জোরালো হয়ে উঠছে শুনতে পেল। এ-পাড়ায় তারা খুব বেশীদিন আসে নি, অথচ নীলিমার জন্যে সকলে এত কৌতূহলী হয়ে উঠল কেন?

কত কি খারাপ কথা বলেছে মাইজীর নামে—শুকলাল আবার একটানা বিলাপ শুরু করল, 'দোষ সবই আপনার বাবু।'

জিভের ডগা পর্যন্ত শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে, টের পেল সুনন্দ। তার দোষ? ঘর ছেড়ে যে কবারই বাইরে বেরিয়েছে, ওদের প্রত্যেকের দৃষ্টিতে কৌতূহল, বিস্ময় আর কৌতুকের আভাষ ছাড়া অভিযোগের কোন চিহ্ন ফুটে উঠতে দেখে-নি সুনন্দ। সবাই জানে নীলিমা তার স্বামীর ঘনিষ্ঠ বন্ধুর প্ররোচনায় ঘর ছেড়ে চলে গেছে। আজীবন বিলাসিতায় অভ্যস্ত বড়লোকের মেয়ে নীলিমা দারিদ্রাকে ঘৃণা করত। এ গল্প নতুন নয়। হাল্কা সুখ ছাড়া মেয়েরা অন্য কিছু জানে না, বোঝে না। দরজার কড়া নাড়ার শব্দে সুনন্দার ভাবনার একটানা গতি হঠাৎ হোঁচট খেল।

সকালের দিকে কে এল? মুদী, গোয়ালা, খবরের কাগজের হকার, যাদের প্রত্যেকের কাছে দু-তিন মাসের টাকা বাকি পড়েছে।

'বাড়ী আছ সুনন্দ—'মোড়ের একতলা বাড়ীর বাসিন্দা সত্যপ্রিয়বাবু অসহিষ্ণু কণ্ঠে হাঁক-ডাক লাগালেন; 'বৌমাকে এক পেয়ালা চা করতে বল। আর তোমার যদি হাত খালি থাকে, তা'হলে, দাবার ছকটা নিয়ে বসা যাক একহাত—।'

শুকলালের দিকে বিব্রত চোখে তাকালো সুনন্দ—। সাড়া না-দিলে ভদ্রলোক অনায়াসে ভাববেন ঘরে কেউ নেই। কিন্তু তাহলেই বা লাভ কি? সতেরো দিন পুরীতে কাটিয়ে এসেছেন বলে নীলিমার খবর এখনও শোনেন নি। কিন্তু বেশীক্ষণ নয়, এখান থেকে মহেশ

সরকরের বৈঠকখানায় গেলেই পাড়ার পাঁচজনের জানাতে দেরী করবে না সুনন্দ মিত্রের বউ ঝগড়া করে পালিয়ে গেছে। মুখে মুখে পল্লবিত হয়ে উঠেছে খবরটা—কেউ বলছে এক পাঞ্জাবী ভদ্রলোকের সঙ্গে সে বম্বে চলে গেছে, সিনেমার কনট্রাক্ট পেয়ে। শীঘ্রই নাকি তাকে রূপোলী-পর্দায় দেখতে পাওয়া যাবে।

'কি হোল সুনন্দ, শুনতে পাচ্ছ না নাকি?' সত্যপ্রিয়বাবু অসহিষ্ণু স্বরে ডাকাডাকি শুরু করলেন।

'আসুন, আসুন'—মুখে ভদ্রতার খোলস চাপিয়ে সুনন্দ এগিয়ে গেল। তাকে দেখে আঁৎকে উঠে সত্যপ্রিয় বললেন—

'এ কি চেহারা করেছ? অসুখ-বিসুখ করেছে নাকি হে—! আর ঘর-দোরের বা কি অবস্থা—!'

'নীলিমা নেই—' খুব নীচু গলায় সুনন্দ বলল।

'মানে?' ভদ্রলোকের দুই চোখে বিস্ময়ের আর বিভ্রান্তির স্পষ্ট ছাপ।

'আপনি তো জানেন ক'মাস আগে চাকরীটা গেছে। জমানো টাকাও কিছু ছিল না। বড়লোকের মেয়ে হয়ে এভাবে দিন কাটানো তার পক্ষে—'

'কি বলছ তুমি সুনন্দ—' কথার মাঝখানেই কথা বলে উঠলেন সত্যপ্রিয়বাবু—।

'নীলিমা চলে গেছে। কোথায় গেছে আমি জানি না। জানতেও চাই না। সে যদি অন্য কোথাও আর একরকম পরিবেশে সুখী হতে চায়, আমি বাধা দিতে চাই না।'

সত্যপ্রিয় আর কথা বলতে পারলেন না বিস্ময়ের আবেগে। সুনন্দ একি বলছে—বিবাহিত-স্ত্রী কেবলমাত্র স্বামীর দারিদ্র্যের অজুহাতে ঘর ছেড়ে যাবে, এও কি কখনও সম্ভব। নীলিমাকে তিনি যতটুকু চিনেছিলেন, তাকে তো লঘু প্রকৃতির মেয়ে বলে মনে হয়নি। হয়তো কোনো মন্দ লোকের পাল্লায় পড়ে বেচারী ভুল পথে পা বাড়িয়েছে।

'নীলিমাকে আপনি যতটা অসহায় মনে করছেন, সে মোটেই তা নয়—' সুনন্দ ক্লান্ত ঘোলাটে চোখে তাকালো—অনেক পুরুষ-বন্ধু ছিলো বলে কেরাণীর বউ হয়েও তার সাজসজ্জা কেমন চটকদার ছিলো, তাকি আপনার চোখে পড়ে নি?'

দুঃখ পেলেন সত্যপ্রিয়। বয়স হয়ে গেলে মানুষ নিয়মের ব্যতিক্রম ঠিক বরদাস্ত করতে পারে না। পঙ্গু, রুগ্ন, এমন কি দুশ্চরিত্র স্বামীকেও সতী-সাধ্বী স্ত্রীরা আজীবন সহ্য করে মেনে এসেছে যুগ-যুগান্ত ধরে। আজকে আধুনিক হাওয়া বইছে বলে সামান্য দারিদ্র্যের অজুহাতে ঘর ছেড়ে চলে গেল মেয়েটা—।

'পুলিশে খবর দিয়েছ নিশ্চয়—?'

মুখের রং অনেকখানি ফ্যাকাশে হয়ে উঠলেও নিজেকে সামলে নিয়ে সুনন্দ মাথা নাড়ল। যে চলে যেতে চায়, তাকে আইনের বাঁধনে জোর করে আটকে রেখে লাভ নেই। খাঁচার পাখির ডানা ঝটপট করা দেখতে হয়ত কেউ কেউ নিষ্ঠুর-আনন্দ বোধ করে, কিন্তু সুনন্দ ঠিক সে প্রকৃতির মানুষ নয়। চলে যাওয়ার দরজা যেমন খোলা তেমনি ফিরে আসবার দরজাও

বন্ধ হয় নি। যদি মন চায়, তাহলে নীলিমা যে কোনদিন ফিরে আসতে পারবে।

'কিন্তু এমনও তো হতে পারে, বিপদে পড়েছে মেয়েটা—'সত্যপ্রিয় চিন্তিত মুখে তাকালেন। খাঁজ-কাটা কপালে আরও কয়েকটা লাইন পড়ল। নীলিমার হাসি-খুশী মুখখানা বারবার মনে পড়ছিল। মেয়েটা সাজ-গোজ করতে ভালবাসত, সিনেমা দেখার আবদার ধরত যার তার কাছে। কিন্তু, তা বলে এমন একটা জঘন্য বিকৃত রুচি ওর কাছে ঠিক আশা করা যায় না।

'বিপদ আজকাল হামেশাই হচ্ছে। তুমি কাগজ দেখ নি আজকে?' আবার মাথা নাড়ল সুনন্দ। আজ কেন, গত দশদিন ধরে সে কাগজ দেখে নি। পৃথিবীর বিশাল পরিধির কোথায় কি হচ্ছে কিছুই সে জানে না।

'চটের থলিতে মোড়া একটা মানুষের শরীর পাওয়া গেছে। মানুষ নয়, মেয়েমানুষ। কিন্তু খণ্ড খণ্ড করে কাটা। কোনো কিছু বোঝার উপায় নেই—কেবল—'

সত্যপ্রিয় আচমকা থেমে গেলেন কথা বলতে বলতে। এই নৃশংস খবরটা সুনন্দকে বলা ঠিক হোল না। ও বেচারী মুখে যতই রাগ দেখাক না কেন, মনে মনে নিশ্চয় দুশ্চিন্তার খোঁচায় অস্থির হয়ে রয়েছে।

'কেবল কি সত্যপ্রিয়বাবু—' সুনন্দ থেমে প্রশ্ন করল।

'কিছু নয়। তুমি মিছি মিছি খারাপ কিছু ভাবতে বোস না, আমার মনে হয় নীলিমা হয়তো ঝগড়া করে তার বাপের বাড়ী গিয়ে বসে আছে। মেয়েদের তো ঐ একটাই জায়গা। তোমার সঙ্গে অবশ্য ও-পক্ষের তেমন সদ্ভাব নেই, তবু একবার না হয় চলে যাও শ্বশুরালয়ে—।'

কপালের উপর বিন্দু বিন্দু ঘাম, সুনন্দ ময়লা রুমাল দিয়ে মুছতে মুছতে ঘাড় নাড়ল।

'আমি চলি তাহলে—'সত্যপ্রিয় দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন—'খবর পেলে জানিয়ে দিও কিন্তু—।'

গলার কাছে কেমন শুকনো ঠেক-ছিলো অনেকক্ষণ ধরে। বেলা হয়ে গেছে। গলির নানা শব্দ ক্রমশ দুপুরের ঝিমন্ত প্রহরে আর শোনা যাচ্ছে না।

আর একটু চা পেলে হোত, পকেটে হাত দিয়ে খুচরো পয়সা নাড়তে নাড়তে সুনন্দ ভাবলো। অথচ মন্থর আলস্যের একটা স্রোত তার শিরায়-শিরায় বয়ে যাচ্ছিল সব কিছুর প্রতি বিমুখতার ভাব জাগিয়ে। কেবল আজ রাত্রিবেলা ন'টার ট্রেন ধরার একটা অদম্য বাসনা মধ্যে মধ্যে অস্থির উত্তেজনার ছোঁয়ায় তাকে উদ্‌ভ্রান্ত করে তুলছিল। ভোরবেলার দিকেই সে হয়তো মধুবনীতে পৌঁছে যেতে পারবে।

সেখানে শালবনের ভেতরে হাওয়ায় অদ্ভুত বাজনা বাজে, ছোট ঝর্ণার শব্দ পাথরের ফাঁকে ছলছল করে ওঠে।

'কে—কে ওখানে?' কড়া নাড়ার শব্দে চমকে উঠে বসল সুনন্দ। ঘড়িতে দম দেওয়া হয় নি। নীলিমা নিজের হাতে রোজ শুধু-যাওয়ার আগে দম দিয়ে যেত।

'আজ্ঞে বাবু—' শুকলাল মুখ বাড়াল—'আজ আর উঠবেন না?'

'না—' এই লোকটার সর্দারি সত্যি অসহ্য হয়ে উঠছে। নীলিমার কাছে প্রশ্রয় পেয়ে-পেয়ে বড় বেশী মাথায় চড়ে বসেছে।

'বাইরে ওঁরা সব এসেছেন। মাইজীর বাবা, ভাই, মাইজীর মা—।'

খবরটা শুনে ধড়মড় করে উঠে বসল সুনন্দ। ঘড়িটা সত্যিই থেমে গেছে। যদি কাঁটাগুলো আরও একটু দ্রুত চলত, যদি এখন রাত আটটা-নটা বেজে যেত। সময়কে তার শামুকের গতি থেকে একচুলও নড়াতে পারবে না জেনে সুনন্দ অনিচ্ছুক চোখ দুটো দরজার দিকে ফেরালো।

'নীলি কোথায়, ওকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছ—' নীলিমার মা হিস্টিরিয়া রুগীর মত ছটফট করতে লাগলেন—কান্নামেশা গলায় বিলাপ করতে করতে—'নীলি, লক্ষ্মী মা আমার, একবার দেখা দিয়ে যা—।'

কান্নার আতিশয্য সহ্য করতে পারছিল না বলে সুনন্দ স্পষ্ট নিষ্ঠুর গলায় বলল—'নীলিমা এখানে নেই।'

'কোথায় গেছে বাবা, ঠিকানাটা দাও আমাকে। তোমাদের দু'জনকে ফিরিয়ে নিয়ে যাব—আর অভিমান করে মুখ ঘুরিয়ে থাকব না।'

'আমি জানি না, সে কোথায় গেছে ঠিকানা রেখে যায় নি।'

'তুমি জানো না স্কাউণ্ড্রেল—' খালি পাইপের ডাঁটি দাঁতে ধরে কড়া গলায় গর্জন করে উঠলেন নীলিমার বাবা—।

'না, আমি সত্যিই জানি না। প্রজাপতি এক ফুল থেকে আরেক ফুলে ছোটে, হিসেব রাখে কার সাধ্য।'

'শাট আপ—ইউ সোয়াইন—' নীলিমার ভাই এগিয়ে এলো সামনে।

'আমার মেয়ে মরে গেছে ভাবতেও দুঃখ হয় না, কিন্তু তোমার মতো একজন লোফারের সঙ্গে তাকে থাকতে হয়েছে, সে কথা ভাবতে আমার বুক ফেটে যায়—'এক নিঃশ্বাসে কথা বলে নীলিমার বাবা হাঁপাতে সুরু করলেন।

'কাল সকালের মধ্যে যদি খবর না পাই তাহলে পুলিশে ডায়েরী করে আসব। বিজন বলছিল আজ দশ-বারো দিন হোল নীলি নিখোঁজ, অন্তত এ পাড়ার লোকেরা কেউ তাকে দেখে নি।'

'ঠিকই বলেছেন—' সুনন্দ অন্তরঙ্গ ভঙ্গীতে কথা বলতে শুরু করল—ঠিক তের দিন আগে ও চলে গেছে। সুব্রত

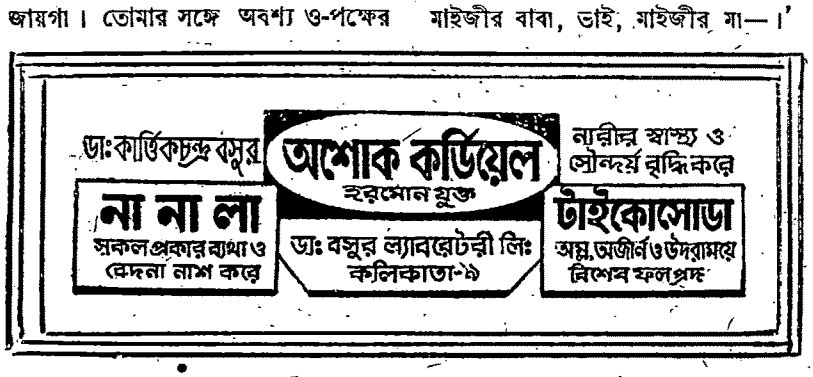

বনে আমার এক বন্ধু—মনে হয় তারই সঙ্গে। লজ্জায় আমি খোঁজ নিতে পারি নি।"

'শাট আপ—' জলন্ত দৃষ্টি ফেরালো নীলিমার ভাই। তারপর একটানা বিলাপে মগ্ন ভদ্রমহিলাকে টানতে টানতে ওরা বেরিয়ে গেল বাইরে।

ঘরটা নিস্তব্ধ হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। দেওয়াল থেকে ঝুরঝুর করে বালি খসে পড়ছে। বন্ধ ঘড়িটা নাড়াচাড়া খেয়ে হঠাৎ চলতে শুরু করায় তার টিক্-টিক্ শব্দ।

খসখসে গালের চামড়ায় হাত বুলিয়ে সুনন্দ আবার মেঘে-ঢাকা আকাশের এক কোণে চকচকে রোদ্দুরের মত একটা ভাবনার মধ্যে নিজেকে তলিয়ে দেবার চেষ্টা করল। এখানে সে যেন অনবরত একটা পর্দা-ফেলা গুমোট অন্ধকার রঙ্গমঞ্চের দিকে তাকিয়ে আছে, কিন্তু তারপরেই সেই পর্দাটা দুলে দুলে আস্তে আস্তে সরে যাবে, অন্য আর এক জীবনের আশ্বাস নিয়ে। যে জীবনের নাম সুখ, এ সেই জীবন।

সুখের স্বপ্ন বারবার তার চোখের সামনে উজ্জ্বল রঙের ছবি আঁকছিলো বলেই সুনন্দ আর শুয়ে থাকতে পারল না। রোদের রঙ এখন তামাটে, অনেকটা নীলিমার বাঁ হাতের মাদুলীটার মত। মাদুলীর কথা মনে পড়ে যেতে কেমন একটু অস্বস্তি বোধ হোল। ওটা শেষ মুহূর্তে ওর হাতে ছিল কি ছিল না কিছুতেই এখন মনে পড়ছে না। নীরেট সোনার চৌকো একটা মাদুলী, গায়ে খোদাই করা নীলিমার ডাকনাম। ঐ মাদুলীর নাকি সব বিপদ সব ভয়কে দূরে ঠেকিয়ে রাখার ক্ষমতা আছে—নীলিমা বলত।

মন হোল একটা শুকনো খড়ের গাদা, তাতে দুশ্চিন্তার ফুলকি একবার ছিটকে পড়লেই হোল। দাউদাউ করে জ্বলতে শুরু করবে এক নিমেষের মধ্যে। সুনন্দ সেই আগুনের তাপে একদিন অনেক জ্বলেছে, পুড়েছে, যন্ত্রণার ছোঁয়ায় ছটফট করেছে একলা ঘরের কোণে। রাস্তায় নেমে অন্য আর একদিকে যেতে চেষ্টা করল সে, সব কিছু ভুলে থাকার জন্য

একটা কৃষ্ণচূড়ার ডাল আগুনের মত জ্বলছে। সে আগুনে আলো আছে, কিন্তু জ্বালা নেই। ফুটপাতে একজন লোক খেলনার বেহালায় আশ্চর্য একটা সুর বাজাচ্ছে, সুরটা যেন চেনা-জানা। ওটা কি পাখি? বুকের কাছে দুধসাদা রঙ, ডানায় আকাশী নীলের আভা। ছোট ছেলেকে বেলুন, রঙিন খেলনা অথবা রঙচঙে ছবি দিয়ে যেমন ভোলায়, নিজের মনকেও ঠিক সেভাবেই ভোলাতে লাগল সুনন্দ।

তামাটে রঙের রোদ ক্রমশ ফিকে হলুদ হয়ে যাচ্ছে, রাস্তায় শেষ বিকেলের ভিড়ে পা ফেলার উপায় নেই। সুনন্দ অনেকক্ষণ ঘুরে সিনেমার পোস্টার দেখল, চায়ের দোকানে চা খেল, অপস্রিয়মাণ আকাশের আলোর দিকে তাকিয়ে ভাবনার কল্পনা-বিলাসে তলিয়ে গেল। জনারণ্যে মিশে নিশ্চিন্ত হওয়ার একটা সুযোগ খুঁজে বেড়াচ্ছিল সে। এখানে কেউ তার দিকে কৌতূহলী দৃষ্টি নিয়ে তাকাচ্ছে না, আড়ালে তার পারিবারিক জীবনের

(২৩১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

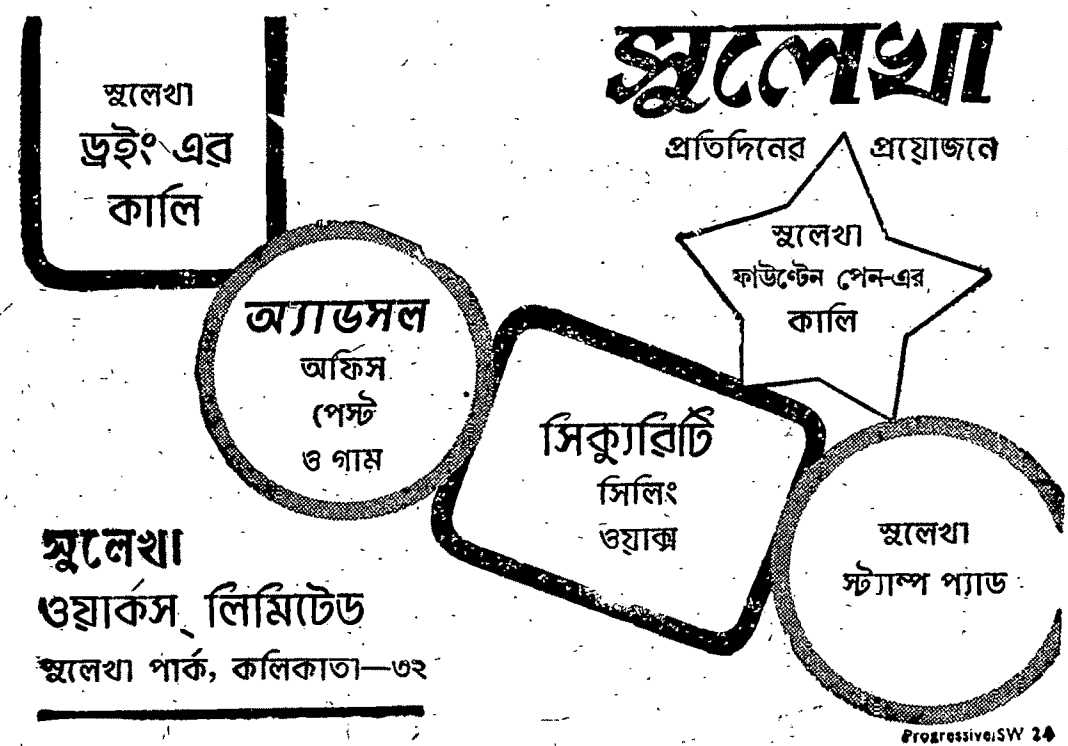

শাশ্বতী

(সম্পূর্ণ উপন্যাস)

॥ এক ॥

খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী তখন শেষ হয়ে আসছে। শাক্যসিংহ গৌতম বুদ্ধ তখনো জীবিত। * এ সময় তিনি বর্ষাবাস করেন শ্রাবস্তির জেতবন বিহারে। চম্পা, রাজগৃহ, শ্রাবস্তি, সাকেত, কৌশাম্বী, বারাণসী,—সর্বত্র নগরবাসীরা বুদ্ধ, ধর্ম এবং সংঘের শরণ গ্রহণ করেছে। আর্যাবর্ত ষোড়শ মহাজনপদে সুসং-

* গৌতম বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের সাল সম্বন্ধে দুটি মত প্রচলিত। প্রখ্যাত ঐতিহাসিকদের মধ্যে বেশির ভাগ এই মত গ্রহণ করেছেন যে-তাঁর মহাপরিনির্বাণ হয় খ্রীস্টপূর্ব চারশো ছিয়াশী অব্দে।

ধানীতে ছড়িয়ে পড়ছে। অবন্তীর রাজধানী উজ্জয়িনীতেও পৌরজনবর্গ উদয়নের কথা আলোচনা করে সমাজে, গোষ্ঠীতে, পানভূমিতে। অবন্তী ও বৎস প্রতিবেশী রাষ্ট্র। সুতরাং উদয়ন সম্বন্ধে উজ্জয়িনীর পৌরজনবর্গের কৌতূহল অপরিমিত। উভয় রাষ্ট্রই শক্তিশালী, কিন্তু প্রদ্যোৎ আর উদয়নের মধ্যে সদ্ভাব নেই। দুই রাজার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক শেষ পর্যন্ত কি রকম গিয়ে দাঁড়াবে, তাই নিয়ে নানারকম জল্পনা-কল্পনা চলে সবসময়।

বারীন্দ্রনাথ দাশ

তখন শিশিরকাল অপগতপ্রায়। শিপ্রা নদীর সন্নিকটস্থ রাজপ্রাসাদের পুরনারীরা অপরাহ্ণে প্রাসাদ-শিখরে অবসরবিনোদনকালে উর্ণা অঙ্গাবরণ ব্যবহার করার প্রয়োজন বোধ করে না। ঈষৎ হিম উত্তর সমীর আর প্রবল

ষষ্ঠ। রাজতান্ত্রিক এবং গণসংঘশাসিত বিভিন্ন রাষ্ট্রসমূহ পাশাপাশি সহাবস্থান করছে আর্যাবর্তের রাজনৈতিক ভারসাম্য বজায় রেখে।

ষোড়শ মহাজনপদের মধ্যে চারটি মহাজনপদ বা রাষ্ট্র—মগধ, কোশল, অবন্তী ও ও বৎস—ঐশ্বর্য ও সামরিক শক্তিতে শীর্ষস্থানীয় বলে পরিগণিত। মগধে রাজত্ব করছেন বিম্বিসার, কোশলে প্রসেনজিৎ। দুজনেই গৌতম বুদ্ধের পরম ভক্ত। অবন্তীর রাজা মহাসেন চণ্ড প্রদ্যোৎও বুদ্ধের অনুরাগী। বৎসরাজ উদয়ন কিছুকাল আগে পর্যন্ত বুদ্ধের প্রতি অনুকূল ছিলো না। কিন্তু সম্প্রতি বৌদ্ধ ভিক্ষু পিণ্ডোল ভরদ্বাজের প্রভাবে তার মনোভাবের কিছুটা পরিবর্তন হয়েছিলো। বিম্বিসার, প্রসেনজিৎ, প্রদ্যোৎ প্রত্যেকেই প্রৌঢ়ত্বে উপনীত। কিন্তু উদয়ন তরুণবয়স্ক। বছর পাঁচ-ছয় আগে মাত্র বিংশতি বর্ষ বয়েসেই সিংহাসনে অধিরূঢ় হয়েছেন।

উদয়ন তরুণবয়স্ক হলেও তার শক্তি ও শৌর্যের খ্যাতি তখন আর্যাবর্তের বিভিন্ন রাজ-

নয়, মাঝে মাঝে দক্ষিণাবহ মলয়ের মৃদুমন্দ আভাস জাগে অভ্যন্তর-উদ্যানের গাছের পাতায় পাতায়।

সেদিন অপরাহ্নে নানাবর্ণের বিচিত্র বসন ও আভরণ-সুসজ্জিতা পুরনারীরা যখন প্রাসাদ-শিখরে ইতস্তত সঞ্চরণ করছিলো, একপ্রান্তে প্রশস্ত অলিন্দে ধাত্রী বসুন্ধরার সঙ্গে একলা বসে বাক্যালাপ করছিলো অবন্তীরাজ-দুহিতা বাসবদত্তা।

বিস্তীর্ণ বিচরণভূমির অন্যপ্রান্ত থেকে তরুণী ও কিশোরীদের আনন্দমুখর প্রগলভ হাসি ও কোলাহল ভেসে এলো। বাসবদত্তা চোখ তুলে সেদিকে তাকালো। বাসবদত্তার ঘনপক্ষ্ম আয়ত নয়ন অতি সুন্দর দেখতে, কিন্তু পুরনারীরা সন্নিকটে কেউ উপস্থিত থাকলে অত্যন্ত বিস্মিত হোতো। কারণ বাসবদত্তার নয়ন তখন অশ্রুসজল হয়ে আছে। মহারাজা প্রদ্যোৎ ও মহারাণী অঙ্গারবতীর স্নেহলালিতা কন্যার মর্মবেদনার কোনো কারণ অনুমান করতে না পেরে তারা বিচলিত হোতো।

বাসবদত্তা চোখ ফিরিয়ে আবার দৃষ্টি আনমিত করলো। তারপর মৃদুকণ্ঠে বললো, "এ অত্যন্ত অন্যায়। যে ব্যক্তির প্রতি আমার কোনো শ্রদ্ধা নেই, তার কণ্ঠে বরমাল্য অর্পণ করতে আমায় কেউ বাধ্য করতে পারে না।"

"কেন শ্রদ্ধা নেই, ভর্তৃদারিকা?" জিজ্ঞেস করলো ধাত্রী বসুন্ধরা, "তিনি আমাদের প্রতি মিত্রভাবাপন্ন না হতে পারেন, কিন্তু তিনি বীর্যবান নরপতি। আমরা একথাও জানি যে, তিনি অতি রূপবান।"

"মহারাজা উদয়নকে আমি নির্দয় বলেই জানি," বাসবদত্তা উত্তর দিলো, "তিনি শ্রমণ পিণ্ডোল ভরদ্বাজের সঙ্গে চরম দুর্ব্যবহার করেছেন।

"সেসব পুরোনো কথা। এখন উনি পিণ্ডোল ভরদ্বাজের প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত।"

"এর অর্থ মহারাজা উদয়নের কোনো মতিস্থিরতা নেই। যখন তাঁর উপর প্রভাব ছিলো তাঁর পত্নী কুরু-ব্রাহ্মণকন্যা বুদ্ধ-বিদ্বেষী মাগন্দিয়ার, তখন তিনি বৌদ্ধ শ্রমণের উপর উৎপীড়ন করেছেন। পরে অন্য পত্নী সামাবতীর প্রভাবে তাঁর মনের গতি আবার অন্যরকম হয়েছে। এরকম ব্যক্তিকে আমি আদর্শ স্বামী বলে গণ্য করি না। হ্যাঁ, তাঁর প্রতি আমার প্রতিকূল মনোভাবের আরো একটি কারণ আছে।"

"কি কারণ, ভর্তৃদারিকা?"

"বসুন্ধরা, মহারাজা উদয়নের দুই পত্নী বর্তমান।"

"কিন্তু ভর্তৃদারিকা, ওঁরা কেউই তাঁর পট্টমহিষী নন। শুধু সমান কুলমর্যাদাসম্পন্ন রাজকন্যাই পট্টমহিষী হতে পারেন। দেবী মাগন্দিয়া কুরু-ব্রাহ্মণকন্যা। দেবী সামাবতী ক্ষত্রিয় সামন্তের কন্যা। বৎসরাজের মহামাত্য যৌগন্ধরায়ণ বহুদিন ধরে মহারাজা উদয়নের যোগ্য পট্টমহিষী হওয়ার উপযুক্ত রাজকন্যার অনুসন্ধান করছেন। একথাও আমাদের অবিদিত নয় যে, বৎস রাজ্যের অমাত্যবর্গ অবন্তীর রাজকন্যাকে তাঁদের পট্টমহিষীরূপে পেতে চান।"

"আমাদের মহারাজাও বৎসরাজকে তাঁর জামাতা করতে চান। তাহলে আর বাধা কোথায়? এজন্যেই কি আমার পিতা আমার অভিমত না নিয়েই কৌশাম্বীতে বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে অমাত্য পূর্ণভদ্র ও কাঞ্চুকীয় রৈভ্যকে দূতরূপে প্রেরণ করেছেন?"

ধাত্রী বসুন্ধরা কোনো উত্তর দেওয়ার আগেই শোনা গেল নারীকণ্ঠের অতুচ্চ ঘোষণা। প্রতিহারী ক্রোধনা উচ্চকণ্ঠে বলছে,—উৎসরণ করো, পুরবাসীগণ, উৎসরণ করো—।

বসুন্ধরা ফিরে তাকালো, তারপর বললো, "ভর্তৃদারিকা, মহারাজকুমার গোপালক ও মহারাজকুমার পালক দুজনে এদিকে এগিয়ে আসছেন।"

মহারাজা প্রদ্যোতের দুই পুত্র কাছে আসতেই বসুন্ধরা একপাশে সরে দাঁড়ালো। দুই রাজকুমার তাদের ভগ্নী বাসবদত্তার কাছে এসে দাঁড়ালো।

গোপালক জিজ্ঞেস করলো, "বাসবদত্তা, শুনলাম তুমি নাকি মহারাজা উদয়নকে বিবাহ করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছো।"

বাসবদত্তার মুখ পাণ্ডুর হয়ে গেল। বিরস কণ্ঠে বললো, "মা কি এবার তোমাদের পাঠিয়েছেন আমাকে বোঝানোর জন্যে? আমার যা বলবার আমি বসুন্ধরাকে বলেছি। আমার ধাত্রীই আমার মায়ের সঙ্গে কথা বলবে।"

গোপালক আর পালক দুজনেই হেসে উঠলো। পালক বললো, "না বাসবদত্তা, আমরা তোমাকে কিছু বোঝাতে আসি নি। বরং একথাই বলতে এসেছি যে, তোমার প্রতি আমাদের সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে। তোমার সঙ্গে আমরা একমত। অবন্তী রাজপরিবারের সঙ্গে বৎস রাজবংশের বৈবাহিক সম্বন্ধ হবে, এ আমাদের মনঃপূত নয়।"

"কেন রাজকুমার?" জিজ্ঞেস করলো বসুন্ধরা। সে তিন ভাই-বোনেরই লালনপালন করেছে, সুতরাং সে অসঙ্কোচে তাদের বাক্যালাপে অংশ গ্রহণ করতো।

"মহারাজা উদয়ন কি অবন্তী রাজবংশের জামাতা হওয়ার উপযুক্ত নন?" বসুন্ধরা আবার জিজ্ঞেস করলো।

রাজকুমার গোপালক তার দিকে ফিরলো। তারপর উত্তর দিলো, "না বসুন্ধরা, মহারাজ যাই মনে করুন, আমরা উদয়নকে আমাদের বংশের জামাতা হওয়ার উপযুক্ত মনে করি না।"

"কেন?"

গোপালক বললো, "বসুন্ধরা, তুমি কি একথা জানো যে, উদয়নের জননী মহারাণী মৃগাবতী দোহদস্নানের সময় অপহৃতা হয়েছিলেন?"

"হ্যাঁ, তিনি যখন অন্তর্সত্ত্বা হলেন তখন রুধির পরিপূর্ণ দীর্ঘিকায় স্নান করবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। মহারাজা উদয়নের পিতা মহারাজা শতানীকের* আদেশে একটি দীর্ঘিকার জল অলক্তকরঞ্জিত করা হয়। দেবী মৃগাবতী যখন সেখানে অবগাহন করে উঠলেন তখন এক বৃহৎ পক্ষী তাঁকে মাংসখণ্ড বলে ভুল করে তুলে নিয়ে যায় এবং পরে ভুল বুঝতে পেরে উদয়াচল পর্বতে তাঁকে পরিত্যাগ করে।"

দুই রাজকুমার উচ্চৈস্বরে হেসে উঠলো। পালক বলে উঠলো, "পাখি যতো বড়োই হোক, কোনো মানুষকে তুলে নিয়ে যেতে পারে?"

"আসল কথা কি জানো বসুন্ধরা," গোপালক বললো, "মৃগাবতীকে অপহরণ করেছিলো এক অনার্য আটবিক নৃপতি, তারপর তাঁকে উদয়াচলে পরিত্যাগ করে। সেখানে জামদগ্ন্য ঋষি তাঁকে আশ্রয় দেয়। এবং সেই উদয়াচলেই উদয়নের জন্ম হয়।"

"সে জন্যেই তাঁর নাম উদয়ন," বললো পালক।

"সে যাই হোক," বলে উঠলো বসুন্ধরা, "মহারাজা শতানীক পরে তাঁদের সন্ধান পেয়ে রাজ্যে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন এবং কুমার উদয়নের হাতেই রাজ্যভার সমর্পণ করেন। সুতরাং আমাদের কিছু বলার নেই।"

"আমরা তোমার সঙ্গে একমত নই বসুন্ধরা," পালক উত্তর দিলো, "যার জননী অনার্য কর্তৃক অপহৃত হয়, এমন ব্যক্তিকে আমি ভগ্নীপতিরূপে বাঞ্ছনীয় মনে করি না।"

"শুধু এই কি একমাত্র কারণ?" জিজ্ঞেস করলো বসুন্ধরা।

"না। অন্য কারণও আছে," জানালো গোপালক, "আমরা মনে করি বৎসরাজ্যের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। কোশলরাজ প্রসেনজিৎ এবং মগধরাজ বিম্বিসার উভয়েই রাজ্য বিস্তার করতে আগ্রহশীল এবং উভয়েরই লুব্ধ দৃষ্টি আছে বৎস রাজ্যের উপর; বিম্বিসার প্রসেনজিতের ভগ্নীপতি, সুতরাং হয়তো শেষ পর্যন্ত দুজনেই একসঙ্গে মিলে বৎসরাজ্য অধিকার করে নিজেদের মধ্যে বণ্টন করে নেবে। উদয়ন যুদ্ধবিদ্যায় সুপটু এবং অসমসাহসী

* পুরাণ অনুযায়ী উদয়নের পিতার নাম সহস্রানীক। শতানীক সহস্রানীকের পিতা এবং উদয়নের পিতামহ। কিন্তু ইতিহাস বলে উদয়নের পিতার নাম শতানীক।

হলেও প্রয়োজনে আর বিম্বিসারের সম্মিলিত আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারবে কি না তাতে আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ আছে।"

"কেন পারবে না?" জিজ্ঞেস করলো বাসবদত্তা।

পালক উত্তর দিলো, "উদয়নের কোন দায়িত্বজ্ঞান নেই। সিংহাসন লাভ করবার পর এক বৎসরকাল সে নিষ্ঠা ও যোগ্যতার সঙ্গে রাজ্য শাসন করেছে। কিন্তু এখন ওর আর রাজকার্যে মন নেই। এখন রাজ্য শাসন করেন মহামাত্য যৌগন্ধরায়ণ ও সেনানায়ক রুমণ্বান। মহারাজা উদয়ন এখন তার ঘোষবতী নামে বিখ্যাত বীণাটি বাজিয়ে বন্য হস্তী বশ করবার চেষ্টা করেন আর অবসর সময় বিরচিকা নামে কৌশাম্বির এক সুন্দরী গণিকার সঙ্গ উপভোগ করে কাটান। এরকম রাজা রাজ্য রক্ষা করতে পারে না।"

রাজকুমার গোপালক বললো, "এরকম পরিস্থিতিতে অবন্তীর রাজকন্যার সঙ্গে বৎসরাজের বিবাহ হলে কোশল এবং মগধ, উভয় রাজ্যের সঙ্গেই আমাদের শত্রুতার সূত্রপাত হবে। গান্ধাররাজ পুষ্করসারিন আমাদের বৈরী। কিন্তু আমাদের রাজ্যের সীমান্তে সৈন্যচালনা করেও কোন ক্ষতি করতে সক্ষম না হয়ে এখন মগধরাজ বিম্বিসারকে আমাদের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করবার জন্যে রাজগৃহে দূত প্রেরণ করেছেন বলে জানা গেছে। আমাদের এভাবে শত্রুবৃদ্ধি হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।"

"উদয়নের সঙ্গে আমাদের ভগ্নীর বিবাহ হতে না দেওয়ার চেষ্টায় আমরা যদি সফল হই, তাহলে হয়তো মহারাজকে বোঝাতে পারবো যে মগধের রাজপুত্র অজাতশত্রু কিংবা কোশলের যুবরাজ বিড়ূড়ভের সঙ্গেই বাসবদত্তার বিবাহ হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাহলে কোশল এবং মগধ উভয় রাজ্যের সঙ্গেই আমাদের মিত্রতা হবে। বৎসরাজ্যের কিছু অংশ আমরাও আমাদের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করতে পারবো। গান্ধাররাজ পুষ্করসারিনও আমাদের প্রতি শত্রুতাচরণে বিরত হবে," অভিমত প্রকাশ করলো রাজকুমার পালক।

রাজকুমারী বাসবদত্তা মণি-শিলাপীঠ থেকে উঠে দাঁড়ালো। এদের কথা শুনে তার মুখমণ্ডল ক্রোধে আরক্ত হয়ে গেছে। ঈষৎ কম্পিতকণ্ঠে সে জিজ্ঞেস করলো, "তোমরা কি আমাকে তোমাদের গূঢ়যুদ্ধের একটা বিশেষ অস্ত্ররূপে ব্যবহার করতে চাও?"

"রাজ্যের প্রতি রাজকন্যারও একটা কর্তব্য আছে বাসবদত্তা," গম্ভীরকণ্ঠে বললো রাজকুমার গোপালক।

"আমি তোমাদের উচ্চাভিলাষের বলি হতে চাই না।" উত্তর দিলো বাসবদত্তা, "আমি থাকে আমার শ্রদ্ধা ও প্রণয়ের যোগ্য পাত্র বিবেচনা করবো, শুধু তাঁরই কণ্ঠে মাল্যদান করবো, তিনি যেই হন। আমি কারো পট্টমহিষী হতে চাই না, আমি রাণী হতে চাই না, রাজ্যের প্রতি আমার কোনো লোভ নেই। আমি পট্টমহিষীর মর্যাদার চাইতে অধিকতর মূল্য দিই নারীত্বের মর্যাদাকে।"

দুই রাজকুমার স্তব্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ। তারপর গোপালক গম্ভীর কণ্ঠে বললো, "অমাত্য পূর্ণভদ্র ও কাঞ্চুকীয় কৈত্য আজ সন্ধ্যাবেলা ফিরে এসেছেন কৌশাম্বী থেকে সম্ভবত তাঁরা মহারাজা উদয়নের প্রত্যুত্তর নিয়ে এসেছেন। মহারাজ মন্ত্রণাগৃহে তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করছেন। মহামাত্র সোমেশ্বরও সেখানে উপস্থিত আছেন।"

"আমার অসম্মতিতে আমার পরিণয় হতে পারে না", সদর্পে বললো বাসবদত্তা।

পালক ধীরস্বরে বললো, "সম্ভবত আজই পরিণয়ের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করা হবে। আমরা সেজন্যেই তোমার কাছে এসেছি বাসবদত্তা। আমরা চাই যে তুমি দৃঢ়তার সঙ্গে অসম্মতি জানাও। আমরাও তোমার পক্ষ গ্রহণ করবো।"

"তোমরা আমার পক্ষ গ্রহণ করো বা নাই করো, আমি মহারাজকে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেবো যে, মহারাজ

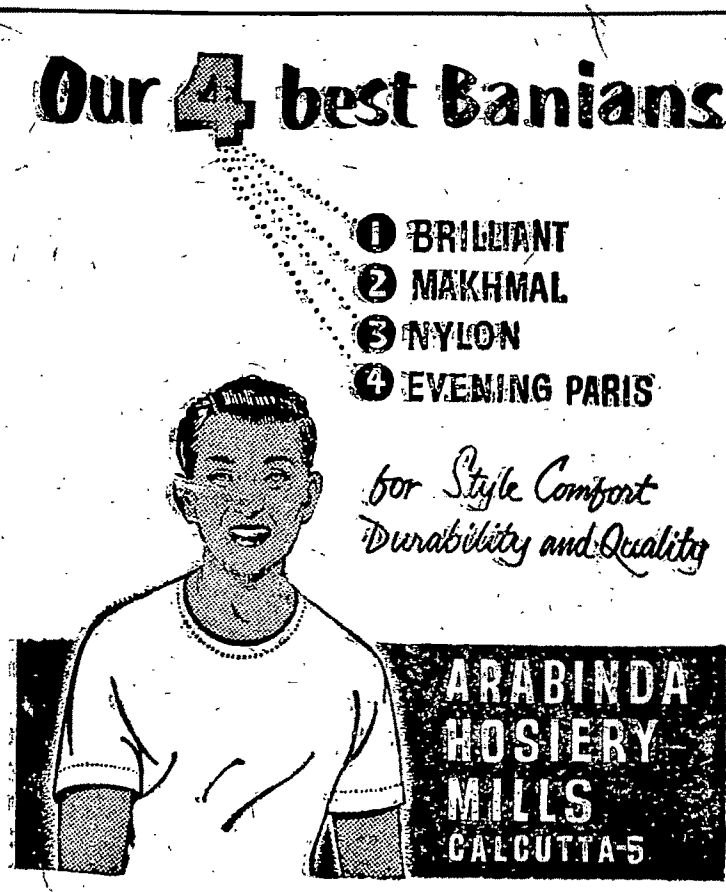

উদয়নকে আমি বিবাহ করতে অসম্মত।"— বললো বাসবদত্তা, "আর তোমাদেরও একথা জানিয়ে দিচ্ছি, তোমরা যে আমাকে তোমাদের গূঢ় উদ্দেশ্যসাধনের জন্যে ব্যবহার

করবে, তাও আমি হতে দেবো না। মহারাজ বা মহারাণী যদি আমার বিবাহ দিতে চান, তাহলে আমার জন্যে স্বয়ংবরসভার আয়োজন করতে হবে। ক্ষত্রিয় রাজকন্যা আমি, এ দাবি করবার অধিকার আমার আছে।"

গোপালক কিছু একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিলো, এমন সময় প্রতিহারী ক্রোধনা এসে জানালো, মহারাজাধিরাজ রাজকন্যাকে এবং রাজকুমারদের স্মরণ করেছেন। তিনি দর্শনগৃহে তাঁদের প্রতীক্ষা করছেন।

বাসবদত্তার সঙ্গে রাজকুমারেরা প্রাসাদশিখর থেকে নীচে নেমে এলো শীর্ণ পাষাণ অবতরণিকা অতিক্রম করে।

প্রাসাদের অভ্যন্তরমণ্ডলে রাজনিবেশের একপ্রান্তে অবন্তীরাজ প্রদ্যোৎ মহাসেনের দর্শন-গৃহ। সেখানে শুভ্র আস্তরণ আচ্ছাদিত পর্যঙ্কে উপবিষ্ট ছিলেন মহারাজা প্রদ্যোৎ ও পট্টমহিষী দেবী অঙ্গারবতী। গোপালক ও পালক প্রণাম করে এক পাশে দাঁড়ালো, বাসবদত্তা এগিয়ে মহারাজের পাদপীঠের কাছে প্রবালকুট্টিমে উপবিষ্ট হোলো।

প্রদ্যোতের আরক্ত মুখমণ্ডল ঈষৎ গম্ভীর। বাসবদত্তার দিকে তাকিয়ে ধীরকণ্ঠে বললো, "আমি জানতে পেরেছি যে, বৎসরাজ উদয়নের কণ্ঠে মাল্যদান করতে তোমার প্রবল অনিচ্ছা।"

বাসবদত্তা মৃদুস্বরে বললো, "ক্ষত্রিয়কন্যার অধিকারে আমি স্বয়ংবরা হবার অনুমতি প্রার্থনা করি।"

"সে আলোচনা করবার জন্যে আমি তোমাদের এখানে উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ পাঠাই নি," সগম্ভীর উত্তর দিলো মহারাজা প্রদ্যোৎ, "আমি তোমাদের স্মরণ করেছি একটা সংবাদ দেওয়ার জন্যে।"

বাসবদত্তা নীরবে অধোবদন হয়ে রইলো, মহারাজা প্রদ্যোৎ গম্ভীরভাবে কন্যা ও পুত্রদের মুখ অবলোকন করলো। তারপর বললো, "বাসবদত্তা বৎসরাজ্যের পট্টমহিষী হোক, এই ইচ্ছা আমার ছিলো। কিন্তু তোমরা একটা ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে উত্তেজিত হয়ে আছো। বৎসরাজ উদয়নের কাছে আমি বিবাহের কোনো প্রস্তাব প্রেরণ করি নি।"

একথা শুনে বিস্মিত হোলো পালক ও গোপালক। পালক জিজ্ঞেস করলো, "তাহলে অমাত্য পূর্ণভদ্রকে কৌশাম্বীতে পাঠিয়েছিলেন কেন?"

মহারাজা প্রদ্যোৎ একটু হাসলো। বললো, "তোমাদের কি ধারণা আমি বিবাহের প্রস্তাব পাঠিয়েছিলাম? উদয়নকে আমি আমার সমমর্যাদাসম্পন্ন বলে স্বীকার করি না। আমার পক্ষে উপযাচক হয়ে তার কাছে বিবাহের প্রস্তাব প্রেরণ করা সম্ভব নয়। আমি পূর্ণভদ্রকে কৌশাম্বীতে কেন পাঠিয়েছিলাম জানো?"

বাসবদত্তা চোখ তুলে প্রদ্যোতের দিকে তাকালো।

প্রদ্যোৎ বলে গেল, "বসুনেমি নামে এক ব্যক্তির কাছে উদয়ন ঘোষবতী নামে বীণা উপহার পেয়েছিলো। সে উদয়নকে সেই বীণা বাজানোর এমন একটা কৌশল শিখিয়েছিলো যা শুনলে বন্য হস্তীও এসে ধরা দেয়। আমি প্রস্তাব পাঠিয়েছিলাম, উদয়ন যেন উজ্জয়িনীতে এসে বাসবদত্তাকে বীণবাদনের সেই কৌশল শিখিয়ে দেয়।"

"মহারাজ উদয়ন কি উজ্জয়িনীতে আগমন করতে স্বীকৃত হয়েছেন?" জিজ্ঞেস করলো গোপালক।

প্রদ্যোৎ আবার গম্ভীর হয়ে গেল, উত্তর দিলো, "উদয়ন প্রত্যুত্তরে জানিয়েছে, সে উজ্জয়িনীতে আসতে অক্ষম, আমরা যেন বাসবদত্তাকে কৌশাম্বিতে উদয়নের প্রাসাদেই পাঠিয়ে দিই।"

"সে অসম্ভব," বলে উঠলো গোপালক।

"মহারাজা উদয়নের এই ধৃষ্টতা অমার্জনীয়" অধরদংশন করে বললো রাজকুমার পালক।

বাসবদত্তা দু-হাতে মুখ ঢাকলো। রুদ্ধ কণ্ঠে বললো, "আপনাদের গূঢ় যুদ্ধের প্রয়োজনে এভাবে আমার অসম্মান হতে দেওয়ার কী প্রয়োজন ছিলো?"

প্রদ্যোৎ বললো, "আমি বাসবদত্তার বীণবাদন শিক্ষার অন্য ব্যবস্থা করছি। উদয়নের এই ঔদ্ধত্যের সমুচিত প্রতিশোধ দিতে হবে। বাসবদত্তা একথা স্মরণ রেখে যেন যথোচিত অভিনিবেশের সঙ্গে যথাসময়ে আমার নির্দিষ্ট শিক্ষকের কাছে বীণবাদন শিক্ষা করে। বাসবদত্তাকে একথা জানানোর জন্যেই এখানে উপস্থিত হবার নির্দেশ দিয়েছিলাম।"

পালক বললো, "বাসবদত্তার পরিণয়ের চেষ্টাও আমাদের করতে হবে। আমি বলছিলাম, মহারাজা উদয়নের সঙ্গে যখন বাসবদত্তার বিবাহ সম্ভব নয়, এবার মগধের রাজপুত্র কিংবা কোশলের যুবরাজের সঙ্গে তার বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে রাজগৃহে কিংবা শ্রাবস্তিতে দূত প্রেরণ করা যেতে পারে। আমার মনে হয়, যদি মগধ কিংবা কোশলের সঙ্গে অবন্তী রাজ্যের মিত্রতা হয়, তাহলে অবন্তী রাজ্য লাভবান হবে।"

"তোমার সঙ্গে এসব আলোচনা আমি করতে চাই না। তুমি এখন আমার কাছে দর্শনগৃহ থেকে অপসরণ করার অনুমতি প্রার্থনা করতে পারো।" কঠিন কণ্ঠে বললো মহারাজ প্রদ্যোৎ।

"যদি তাই আপনার আদেশ হয়,—" ধীরে ধীরে বললো রাজকুমার পালক।

"বাসবদত্তাকেও সঙ্গে নিয়ে যাও," আদেশ জানালো অবন্তীরাজ; "এখন হয়তো তার দেবগৃহে সন্ধ্যারতির আয়োজন করার সময় হয়েছে।"

রাজকুমার গোপালকও ওদের অনুসরণ করতে যাচ্ছিলো, মহারাজ প্রদ্যোৎ হস্তসঞ্চালনে তাকে নিবৃত্ত করলো। রাজকুমারী বাসবদত্তা এবং রাজকুমার পালক দর্শন-গৃহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হবার পর মহারাজ প্রদ্যোৎ দেবী অঙ্গারবতীর দিকে ফিরে তাকালো। গোপালক বিস্মিত

হয়ে দেখলো প্রদ্যোতের মুখের উপর সেই কঠিন ভাব আর নেই।

"এভাবে কি আমাদের উদ্দেশ্যসাধন সম্ভব?" মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো দেবী অঙ্গারবতী।

"এভাবেই সম্ভব" প্রদ্যোত উত্তর দিলো, "আমি যে পরিকল্পনা করেছি, তাতে আমাদের উদ্দেশ্য সফল হবে বলে আমি নিশ্চিত। মহামাত্র সোমেশ্বরও আমার সঙ্গে একমত। উদয়নের সঙ্গে বাসবদত্তার বিবাহ দিতেই হবে। মগধরাজ বিম্বিসার অত্যন্ত শক্তিমান হয়ে উঠছে। মগধ আর অবন্তীর মাঝখানে বৎসরাজ্য। আমাদের প্রতিরক্ষার জন্যে বৎসরাজ্য আমার প্রয়োজন। বৎসরাজ্য আমাদের মিত্র হলে কোশল বা মগধ কেউই অবন্তীর সীমান্ত পর্যন্ত নিজেদের রাজ্য বিস্তার করতে সক্ষম হবে না।"

"বাসবদত্তা ক্ষুণ্ণ হতে পারে," বললো অঙ্গারবতী।

"সে যাতে ব্যথিত হবার কোনো অবকাশ না পায় সেজন্যই এই পরিকল্পনা করেছি," প্রদ্যোত উত্তর দিলো। তারপর রাজকুমার গোপালকের দিকে ফিরে বললো, "কালই তোমাকে বিন্ধ্যাচলের অরণ্য প্রদেশের উদ্দেশে যাত্রা করতে হবে। তোমার সঙ্গে যাবে ষষ্টি সংখ্যক সৈন্য। অন্যান্য নির্দেশ তুমি মহামাত্র সোমেশ্বর ও সেনানায়ক ইন্দ্রদত্তের কাছে পাবে। একটা কথা স্মরণ রেখো। উপরক্ষটা অত্যন্ত গোপনীয়। উজ্জয়িনীতে কেউ যেন জানতে না পারে।"

"বাসবদত্তা কিংবা পালক যদি জিজ্ঞেস করে?"

"সবাই জানবে তুমি বিদিশায় যাচ্ছ প্রয়োজনীয় রাজকার্য উপলক্ষে।"

॥ দুই ॥

যমুনার তীরে বৎসরাজ্যের রাজধানী কৌশাম্বী। মহারাজা উদয়নের সূর্যমুখ প্রাসাদ ছিলো নগরের কেন্দ্রস্থলে। প্রাসাদের অভ্যন্তর চতুঃশালের একপ্রান্তে উদয়নের গান্ধর্বশালা। নানাবিধ বিচিত্র বর্ণ পুষ্পের গুল্মলতাদিতে পরিশোভিত এই মনোরম গৃহ গান্ধর্ববিদ্যার অনুশীলনের জন্যে নির্দিষ্ট হলেও মহারাজা উদয়ন প্রণয়-গৃহরূপেও ব্যবহার করতো। দুই রাণী দেবী নাগদিন্না এবং দেবী সামাবতীর সঙ্গে বিশেষ কোনো সম্পর্ক ছিলো না বলে উদয়ন রাজঅন্তঃপরে বড়ো একটা যেতো না। অবসর সময়ে গান্ধর্বশালাতেই পড়ে থাকতো প্রিয়তমা গণিকা বিরচিকার সঙ্গে।

সেদিন সন্ধ্যাকালে উদয়ন যখন গান্ধর্বশালায় বসে তার ঘোষবতী বীণায় এক সন্ধ্যাকালীন রাগিণীর ঝঙ্কার তুলেছিলো, সে সময় স্বপ্নেও অনুমান করার সম্ভাবনা ছিলো না যে, কয়েকদিন পূর্বে সুদূর দক্ষিণে অবন্তীরাজ্যের রাজধানী উজ্জয়িনীতে তার বিরুদ্ধে এমন একটা ষড়যন্ত্রজাল রচিত হয়েছে, যার সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়বে তার ভাগ্যেরই উপর।

সম্মুখে মণিশিলকুট্টিমের উপর উপবিষ্ট ছিলো পরমাঙ্গপবতী বিরচিকা, নিবিষ্ট চিত্তে বীণা বাজাচ্ছিলো উদয়ন, আর বিরচিকা সামনে একটি মুরজ স্থাপিত করে সুপটু হস্তচালনায় তাল দিচ্ছিলো। চারদিকের ঘনায়মান অন্ধকারে ভরে উঠেছিলো নিশিপুষ্পের সৌরভ। বীণার প্রমত্ত ঝঙ্কার আর মুরজের স্নিগ্ধ-গম্ভীর নির্ঘোষ মিলে এক রমণীয় পরিবেশের সৃষ্টি করেছিলো।

বীণবাদন শেষ হোলো। উদয়ন ঘোষবতী-বীণা নামিয়ে রাখলো একপাশে। বিরচিকা স্ফটিক-ভৃঙ্গার থেকে মৈরেয় ভরে দিলো দুটি স্বর্ণচষকে। তারপর উদয়নের পাশে এসে দেহসংলগ্ন হয়ে বসলো। উদয়ন একহাতে বিরচিকার কটিবেষ্টন করে অন্য হাতে তুলে নিলো মৈরেয়পূর্ণ সুরাপাত্র। বিরচিকাও এক হাতে উদয়নের কণ্ঠবেষ্টন করে অন্য হাতে স্বর্ণচষক অধরসংলগ্ন করলো। ঈষৎ পান করবার পর বিরচিকা সুরাবিজড়িত কণ্ঠে বললো, "একটু একটু করে যেমন নিঃশেষ হয়ে যায় চষকের সুমধুর সুরা, তেমনি করে একদিন আমার এই যৌবনের রূপলাবণ্য কেটে যাবে। পানপরিতৃপ্ত হয়ে যেমন আপনি চষক সরিয়ে রাখেন, তেমনি একদিন আমাকেও সরিয়ে রাখবেন।"

উদয়ন হেসে উঠলো। তারপর বললো, "বিরচিকা, যতদিন আমার হাতে ঘোষবতী বাজবে, ততদিন তোমার রূপলাবণ্যও নিঃশেষ হবে না। আমি সুরের মায়াজাল সৃষ্টি করে তোমার যৌবন অনন্তকালের জন্যে এখানে ধরে রাখবো। তোমায় আমি কোনোদিন দূরে সরিয়ে রাখতে পারবো না। আমার বীণার সঙ্গে মুরজ সঙ্গত করবে কে?"

"শুনছি এক রূপবতী রাজকন্যা আসবেন আমাদের পট্টমহিষী হয়ে---"

"আপাতত তেমন কোনো সম্ভাবনা নেই," উত্তর দিলো উদয়ন।

"মহামাত্র যৌগন্ধরায়ণ আপনার পট্টমহিষী হবার যোগ্য পাত্রীর সন্ধান করে বেড়াচ্ছেন বলে শুনছি সবার মুখে।"

"তার জন্যে তোমার ভাবনার কি আছে? রাজসিংহাসনের জন্যে পট্টমহিষী, কিন্তু হৃদয়-মন্দিরে অধিষ্ঠানের জন্যে বিরচিকা।"

"চিরকাল?" জিজ্ঞেস করলো রাজার প্রণয়িনী সেই রূপবতী গণিকা।

"হ্যাঁ, চিরকাল," উত্তর দিলো উদয়ন। কিন্তু এই বিশ্রম্ভালাপ বেশিক্ষণ চললো না। প্রতিহারী বিজয়া গান্ধর্বশালায় প্রবেশ করে উদয়নকে অভিবাদন করে বললো, "ভর্তা, মহামাত্র যৌগন্ধরায়ণ আপনার দর্শনাকাঙ্ক্ষী হয়ে প্রতীক্ষা করছেন মন্ত্রণাগৃহে।"

"একাই এসেছেন?" জিজ্ঞেস করলো উদয়ন।

"না ভর্তা, সেনানায়ক রুমণ্বান এবং বয়স্য বসন্তকও আছেন তাঁর সঙ্গে।

উদয়ন কি যেন ভাবছিলো, বিরচিকা রাজার কণ্ঠসংলগ্ন হয়ে বললো, "আজ আপনি যাবেন না। একটু পরে চন্দ্রোদয় হবে, আমাদের অন্তঃমণ্ডলের অশোককুঞ্জ মুখর হয়ে উঠবে কোকিলের কূজনে। আমি অত্যন্ত নিঃসঙ্গ বোধ করবো।"

উদয়ন একটু হাসলো। তারপর প্রতিহারীকে বললো, "বিজয়া, তাঁদের সসম্ভ্রমে এখানে নিয়ে এসো।"

"এখানে?" বিরচিকা বিস্মিত হোলো।

"হ্যাঁ, যৌগন্ধরায়ণ, রুমণ্বান, বসন্তক প্রত্যেকেই আমার সখাস্থানীয়। আমার প্রণয়-গৃহে তাদের প্রবেশ করার অধিকার আছে।"

প্রতিহারী প্রণাম করে চলে গেল। একটু পরে আবার বাইরে পদশব্দ শোনা গেল।

উদয়ন চোখ তুলে তাকালো। বললো, "বসন্তক, তুমি একা? যৌগন্ধরায়ণ আর রুমণ্বান এলেন না?"

রাজসভার বিদূষক বসন্তক একটা হাস্যকর মুখভঙ্গি করে উত্তর দিলো, "মার্জার যতোই মৎস্যপ্রিয় হোক সে সরোবরের সান্নিধ্য পরিহার করে। হয়তো অনুরূপভাবেই আমাদের মহামাত্র রাজ-প্রণয়িনীদের রূপ-সরোবর থেকে দূরে থাকতে চান।"

উদয়ন সজোরে হেসে উঠলো, বিরচিকা কপট কোপে একমুঠো বকুলফুল ছুঁড়ে মারলো বসন্তকের দিকে, বললো, "ভর্তা আপনার এই বিদূষক অতি প্রগলভ।"

"মহামাত্র এখানে আসতে চান নি?" উদয়ন জিজ্ঞেস করলো।

বসন্তক উত্তর দিলো, "উনি মন্ত্রণা-গৃহেই আপনার দর্শন প্রার্থনা করছেন। আপনাকে একথা জানানোর জন্যেই তিনি আমাকে এখানে প্রেরণ করেছেন।"

"এখানে আসতে চান না কেন?" জিজ্ঞেস করলো বিরচিকা।

বসন্তক চক্ষু ঘূর্ণিত করে উত্তর দিলো, "মহামাত্রের ধারণা, রাজ্যের অমাত্যেরা যদি রাজার গান্ধর্বশালায় এসে মন্ত্রণা করে, তাহলে রাজার অনুরক্ত গুণীজনেরা মন্ত্রণাগৃহে সমাগত হয়ে গান্ধর্ববিদ্যার অনুশীলন করতে আরম্ভ করবে।"

উদয়ন আবার হেসে উঠলো। তারপর বললো, "বসন্তক, আজ এখানে নানাবিধ মিষ্ট খণ্ডখাদ্য এবং পানীয়ের ব্যবস্থা আছে। সেজন্যই তোমাদের সবাইকে এখানে আমন্ত্রণ করেছিলাম।"

"মিষ্ট খণ্ডখাদ্য?" বসন্তক তার সুডৌল উদরপ্রদেশে হাত বুলালো। "নানাবিধ পানীয়?" জিভ দিয়ে ওষ্ঠাধর সিক্ত করলো, বলে উঠলো, "তাহলে তো সবার এখানেই আসা উচিত। আমি সংবাদ দিচ্ছি যৌগন্ধরায়ণকে।" সে দ্রুত নির্গমন পথের দিকে অগ্রসর হোলো, তারপর আবার ফিরে এসে বললো, "মহারাজ, একটা কথা। আমরা যখন ফিরে যাবো, তখন এখানকার মধুর অবসরের একটা স্মৃতিচিহ্ন নিয়ে যেতে চাই। আমার সখি বিরচিকা কিছুক্ষণ নিভৃতে বসে আমাদের জন্যে একটি একটি করে বকুলমালিকা গ্রন্থন করবেন? এই আশ্বাস পেলে আমি হয়তো যৌগন্ধরায়ণ ও রুমণ্বানকে এখানে আসবার জন্যে প্রলুব্ধ করতে পারবো।"

উদয়ন গম্ভীর হয়ে গেল বসন্তকের কথা শুনে। তারপর বললো, "থাক, বিরচিকাকে আর বকুলমালিকা গ্রন্থন করতে হবে না। আমি তোমার সঙ্গে মন্ত্রণা-গৃহেই যাচ্ছি।"

"না ভর্তা," বলে উঠলো বিরচিকা, "আপনি এস্থান পরিত্যাগ করবেন না। আমি কিছুক্ষণ মাধবীমণ্ডপে বসে মাল্যগ্রন্থন করছি সবার জন্যে।"

"মাধবীমণ্ডপে যাওয়ার আগে মিষ্ট খণ্ড-খাদ্যে থালিকা সাজিয়ে রেখে যেও আমার জন্যে," জানালো বসন্তক।

বিরচিকা চলে যাওয়ার পর পরিহাসের লঘু ভাবখানি কেটে গেল বসন্তকের মুখের উপর থেকে। সবার সাক্ষাতে সে রাজার বিদূষক। সবার চোখের আড়ালে সে রাজার বয়স্য, সখা এবং উপদেষ্টা। গম্ভীর কণ্ঠে বললো, "মহারাজ, এ অত্যন্ত অনুচিত।"

"কি অনুচিত?" জিজ্ঞেস করলো উদয়ন।

"রাজ্যের মহামাত্র এবং সেনানায়ক রাজ-সন্দর্শনে এসেছেন গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণার জন্যে। তাঁদের গান্ধর্বশালায় আমন্ত্রণ করা উচিত হয় নি। বৎসরাজ্যের কি এতই দুরবস্থা হয়েছে যে, মহামাত্রকে রাজ্য সম্পর্কিত গূঢ় মন্ত্রণা করতে হবে একজন গণিকার সামনে বসে?"

উদয়ন চুপ করে রইলো। রাজাকে ঈষৎ ভর্ৎসনা করে বসন্তক চলে গেল, আবার যখন ফিরে এলো মহামাত্র যৌগন্ধরায়ণ ও সেনানায়ক রুমণ্বানকে সঙ্গে করে, তখন উদয়ন আবার তার ঘোষবতী বীণা তুলে নিয়ে নিজের মনে একটু একটু বাজাচ্ছে।

রাজাকে অভিবাদন করে যৌগন্ধরায়ণ আর রুমণ্বান আসন গ্রহণ করলো। উদয়ন কোনো কথা না বলে নিজের মনে বীণা বাজিয়ে চললো। যৌগন্ধরায়ণ নীরবে নিরীক্ষণ করলো রাজাকে তারপর বিনা সম্বোধনেই বাক্যালাপ আরম্ভ করলো।

"সংবাদ সুখকর নয়," বললো যৌগন্ধরায়ণ।

উদয়নের হাত তার সপ্তকের গান্ধারে গিয়ে একটু থামলো। "আমাদের গূঢ়পুরুষবর্গ সংবাদ এনেছে যে, কলিঙ্গ-নৃপতির প্ররোচনা ও পরোক্ষ সহায়তায় প্রত্যন্ত-নৃপতি আরুণি বৎসরাজের প্রতি আনুগত্য অস্বীকার করে সীমান্ত অঞ্চলে বিদ্রোহ সৃষ্টি করবার প্রয়াস করছে।"

উদয়ন বীণাবাদনে ক্ষান্ত না হয়েই বলে গেল, "একজন প্রত্যন্ত-নৃপতির বিদ্রোহে আমাদের বিচলিত হওয়ার কারণ কিছু নেই। সেনানায়ক রুমণ্বান তাঁর অধীনস্থ কোনো সেনাপতিকে সীমান্ত অঞ্চলে পাঠিয়ে দিন একদল সেনার সঙ্গে। তাহলেই যথেষ্ট।"

"না," বললো যৌগন্ধরায়ণ, "সৈন্য চালনা করলে একটা আপাতসমাধান হতে পারে বটে, কিন্তু কোনো স্থায়ী সমাধান হবে না। আরুণি সুযোগ পেলে আবার বিদ্রোহ করবে।"

"আরুণিকে বন্দী করে নিয়ে আসা হোক।"

"সে সীমান্ত অতিক্রম করে কলিঙ্গরাজের আশ্রয় গ্রহণ করবে। কলিঙ্গরাজ আমাদের বৈরী। মগধ ও কোশল আপাতত উদাসীন রাষ্ট্র, কিন্তু মগধের উচ্চাভিলাষ হয়তো একদিন বৎসরাজ্য গ্রাস করবার প্রলোভনের কারণ হতে পারে। অবন্তীরাজ্য আমাদের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন নয়। বিদেশপ্রবৃত্তিবিজ্ঞানের যে মূলনীতি, রাজ্যের চারদিকেই মিত্র, অতিমিত্র, আক্রন্দ এবং আক্রন্দাসার রাজ্য থাকা বাঞ্ছনীয় সে কথা আমরা ভুলতে বসেছি। আমাদের চারদিকে এখন শুধু অরি, পার্ষ্ণিগ্রাহ পার্ষ্ণিগ্রাহাসার আর উদাসীন রাজ্য। এই পরিস্থিতি বাঞ্ছনীয় নয়। সাম, দান, দণ্ড, ভেদ— কোনো নীতি আমরা সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগ করতে পারছি না এ অবস্থায়।"

"আপনাদের কি উপদেশ," জিজ্ঞেস করলো উদয়ন।

রুমণ্বান উত্তর দিলো, "এই পরিস্থিতিতে কিছুকাল বিগ্রহের নীতি ত্যাগ করে আসন-নীতি অবলম্বন করাই বাঞ্ছনীয়। ইতিমধ্যে সংশ্রয়-নীতির একটা পরিকল্পনা করতে হবে, যাতে এমন মিত্ররাষ্ট্রের সহায়তা পাওয়া যায় যে, কোনো অরি বা পার্ষ্ণিগ্রাহ রাজা আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করতে সাহস করবে না।"

"আপনাদের কি কোনো পরিকল্পনা আছে," উদয়ন জিজ্ঞেস করলো।

"অবন্তীরাজ্যের সঙ্গে একটা স্থায়ী মিত্রতার সুযোগ এসেছিল, কিন্তু আপনার যথোচিত বিচক্ষণতার অভাবে সেটা নষ্ট হোলো।"

উদয়ণ গম্ভীর কণ্ঠে বললো, "অবন্তী-রাজ প্রদ্যোত মহাসেনের প্রস্তাব অনুযায়ী আমি যদি উজ্জয়িনীতে গিয়ে অবন্তীরাজ-কন্যা বাসবদত্তাকে বীণাবাদন শিক্ষণ আরম্ভ করতাম, তাতে কি অবন্তীরাজ্যের মর্যাদাবৃদ্ধি হোতো?"

যৌগন্ধরায়ণ উত্তর দিলো, "আপনি যে প্রত্যুত্তরে দম্ভভরে অবন্তীরাজ-কন্যাকে কৌশাম্বিতে পাঠিয়ে দিতে প্রস্তাব পাঠালেন মহারাজা প্রদ্যোতের কাছে, এটাও খুব বিচক্ষণতার কাজ হয়েছে বলে আমি বলবো না। আপনি আমার সঙ্গে পরামর্শ করলেন না। ক্রোধান্ধ হয়ে উত্তর দিয়ে বসলেন।"

"আপনি হলে কি করতেন।"

"আমি হলে অবন্তীর রাজদূতকে এখানে দীর্ঘকাল আতিথেয়তায় আপ্যায়িত করে বসিয়ে রাখতাম। ইতিমধ্যে অতি দ্রুতগতিতে নিজে আপনার দূত হয়ে চলে যেতাম উজ্জয়িনীতে।

সেখানে এত দ্রুত উপস্থিত হতাম যে, অবন্তীরাজ মনে করতেন, তাঁর দূত কৌশাম্বিতে উপস্থিত হওয়ার আগেই আপনার দূত উজ্জয়িনীর উদ্দেশে যাত্রা করেছিলো। আমার মুখে তিনি বৎসরাজ উদয়নের সঙ্গে অবন্তীরাজকন্যা বাসবদত্তার বিবাহের প্রস্তাব শুনতেন। তখন মনে মনে লজ্জিত হতেন। এবং এই বিবাহের পরে অবন্তীরাজ হোতো বৎসরাজ্যের পরম মিত্র।"

"যাক, এখন আর অনশোচনা করে লাভ নেই।"

"মহারাজ, আমি এখানে অনশোচনা করতে আসি নি। আমি এসেছি আরেকটি প্রস্তাব নিয়ে।"

"বলুন।"

"এখন হয় মগধ, নয় কোশল, যে কোন একটা রাজ্যের সঙ্গে আমাদের মিত্রতা সম্বন্ধ স্থাপন করতে হবে। এবং এর প্রকৃষ্ট উপায় মগধরাজকন্যা পদ্মাবতীর কিংবা কোশলরাজকন্যা বজ্রাকে আমাদের পট্টমহিষী করা। যে কোনো এক রাজকন্যাকে এখানে আনলেই উভয় রাষ্ট্র আমাদের মিত্র হবে, কারণ কোশলের মহারাজা প্রসেনজিৎ হলেন মগধরাজকন্যা পদ্মাবতীর মাতুল এবং কোশলরাজকন্যা বজ্রার পিতৃস্বসা হলেন মগধের পট্টমহিষী। আমার মনে হয় মগধরাজকন্যা পদ্মাবতীর সঙ্গেই আপনার বিবাহ হওয়াই শ্রেয়, কারণ মহারাজা বিম্বিসার তাঁর দ্বিতীয়া মহিষী দেবী চেল্লনার পুত্র মহারাজকুমার অজাতশত্রুর বধূরূপে পেতে চান তাঁর শ্যালক মহারাজা প্রসেনজিতের কন্যা বজ্রাকে।"

কিছুক্ষণ নীরবে বীণা বাজালো মহারাজা উদয়ন। তারপর বললো, "আমাকে দুদিন ভাববার সময় দিন মহামাত্র। আমি পরশু অপরাহ্নে আমার সিদ্ধান্ত জানাবো।"

"কালকের মধ্যে জানতে পারলে ভালো হোতো," নিবেদন করলো মহামাত্র যৌগন্ধরায়ণ।

"কেন?"

"পরশু প্রত্যুষে মগধের রাজদূত সুমন্ত্র সেন রাজগৃহ যাত্রা করছেন। কাল সন্ধ্যায় তিনি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসবেন। আপনার সিদ্ধান্ত জানতে পারলে তাঁর সঙ্গে বিশদভাবে আলোচনা করে নিতাম।"

"বেশ, আগামীকাল অপরাহ্নের মধ্যেই জানাবো", উত্তর দিল উদয়ন।

যৌগন্ধরায়ণ, রুমণ্বান ও বসন্তক গাত্রোত্থান করলো। এমন সময় প্রতিহারী বিজয়া এসে জানালো বিন্ধ্য অঞ্চলের অন্তপালের কাছ থেকে একজন পত্রবাহক এসেছে বন্য হাতীর সংবাদ নিয়ে। সে মহারাজার দর্শনপ্রার্থী।

বন্য হাতীর সংবাদ যে আনে সে মহারাজা উদয়নের কাছে উপস্থিত হতে পারে যে কোনো সময়ে। উদয়নের আদেশ পেয়ে প্রতিহারী পত্রবাহককে মহারাজার কাছে নিয়ে এলো।

অন্তপালের পত্র পাঠ করতে করতে উদয়ণের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। বললো, "যৌগন্ধরায়ণ, কাল পূর্বাহ্নে আমি বিন্ধ্যাচলের অরণ্যের উদ্দেশে যাত্রা করছি।"

"কেন মহারাজ?" উৎকণ্ঠিত হয়ে জিজ্ঞেস করলো যৌগন্ধরায়ণ।

"অন্তপাল সংবাদ পাঠিয়েছে সেই অরণ্যে একটি অতি সুলক্ষণ বৃহদাকার হস্তীর সন্ধান পাওয়া গেছে। বিন্ধ্যাচলের নাগবনাধ্যক্ষ তাকে ধরবার অনেক চেষ্টা করেও পারে নি। এবার আমাকে চেষ্টা করতে হবে। ঘোষবতী বাজিয়ে হাতী ধরবার কৌশল যেটা শিখেছি, এবার হবে তার প্রয়োগ-নৈপুণ্যের চূড়ান্ত পরীক্ষা।"

"চার-পাঁচদিন পরে যাত্রা করলে হোতো না?" নিবেদন করলো মহামাত্র যৌগন্ধরায়ণ, "মহারাজের যাত্রার আয়োজন করতে সময় লাগবে।"

"ব্যাপক আয়োজন কিছু করবার দরকার নেই যৌগন্ধরায়ণ। আমরা যাত্রা করবো দ্রুত অশ্বারোহণে। লোকজনও বেশি প্রয়োজন নেই। আমার দেহরক্ষী দলের পঁচিশজন অশ্বারোহী এবং দু-তিনজন কিঙ্কর হলেই যথেষ্ট। হ্যাঁ, প্রাসাদের হস্তিশালার একজন

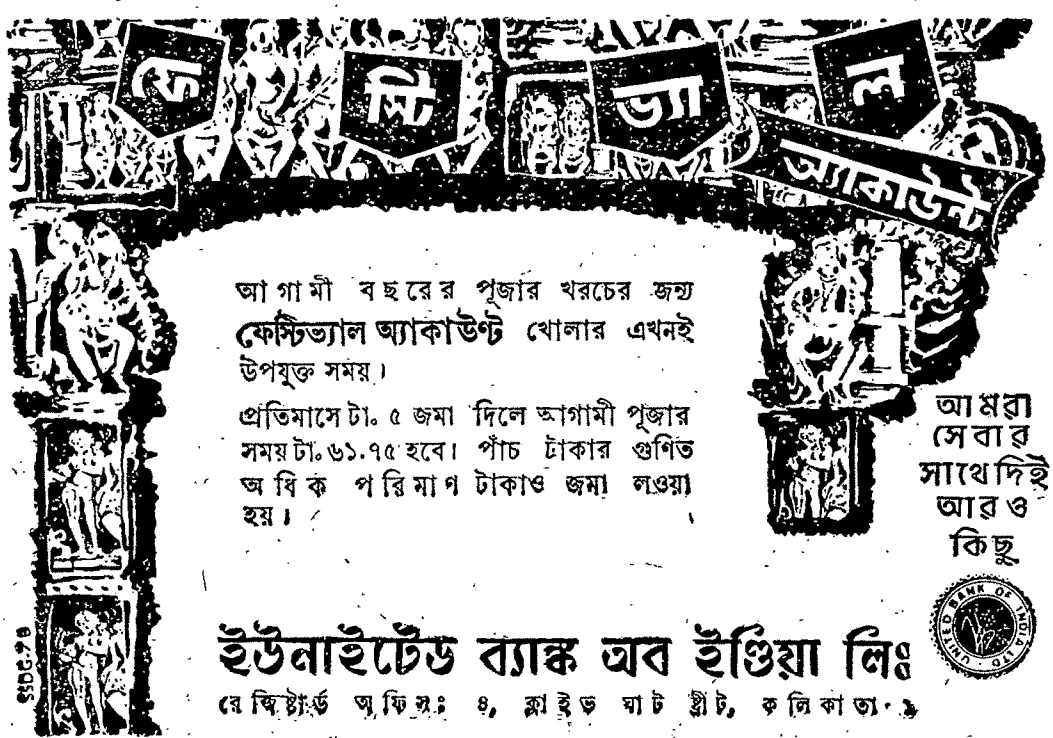

হস্তিপক সঙ্গে নেওয়া দরকার। বিজয়া," প্রতিহারীকে সম্বোধন করে উদয়ন বললো, "কাঞ্চুকীরকে জানাও অবিলম্বে আমার যাত্রার আয়োজন করতে।"

"মাত্র পঁচিশজন দেহরক্ষী নিয়ে যাবেন মহারাজ," বলে উঠলো সেনানায়ক রুমণ্বান, "এই সিদ্ধান্ত আমার মনঃপূত হচ্ছে না। আমি ভাবছি, একদল অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে আমিও আপনার অনুগমন করবো।"

"কোনো প্রয়োজন নেই রুমণ্বান। বৎস-রাজ্যের অভ্যন্তরে বৎসরাজা উদয়ন সম্পূর্ণ নিরাপদ। এবং রাজ্য-সীমান্তে অন্তপালের সেনাদল আমার নিরাপত্তার জন্যে যথেষ্ট।"

"কিন্তু মহারাজ," যৌগন্ধরায়ণ ইতস্তত করে বললো, "মগধের রাজদূতকে আমাদের সিদ্ধান্ত তো জানাতে হবে।"

অধৈর্য হয়ে উদয়ন হস্ত সঞ্চালন করে বললো, "আমি মহারাজা বিম্বিসারের সামন্ত নই। মগধের রাজদূতের স্বদেশ-যাত্রার সুবিধার কথা বিবেচনা করে এত দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে আমি বাধ্য নই। যা জানাবার আমি আমার সময় ও সুবিধামতো জানাবো।"

যৌগন্ধরায়ণ আর রুমণ্বান হতাশ দৃষ্টি বিনিময় করলো।

রূপচর্চায়
কে,হাড়ের
প্রসাধনী

বসন্তক বিদূষকসুলভ মুখভঙ্গি করে বললো, "মহামাত্র, এবার কোনো এক স্থূলকায়া মেদবহুলা বিপুলজঘনা রাজকন্যার সন্ধান করুন। তাহলে হয়তো আমাদের মহারাজা অরণ্যে অরণ্যে ঘোষবতী বাজিয়ে ফিরবেন না। রাজ-অন্তঃপুরে ঘোষবতী বাজিয়েই মত্ত মাতঙ্গীর চিত্তহরণ করবার বাসনা পরিতৃপ্ত করতে পারবেন।"

॥ তিন ॥

কিছুকাল পরের কথা। উজ্জয়িনী নগরে তখন পরিপূর্ণ বসন্ত। নগরের পৌরজনবর্গ আপানক, উদ্যানযাত্রা, জলবিহার, প্রবহণ প্রভৃতি নানাবিধ সামাজিক উৎসবে লিপ্ত হয়ে বসন্তশ্রী পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করবার প্রয়াস করছে। চূতকষায়কণ্ঠ কোকিলের অবিরাম কূজনমুখর প্রাসাদকাননে সময়ে অসময়ে শোনা যাচ্ছে যৌবনবতী পুরনারীদের কণ্ঠসঙ্গীত আর মুরজ মুরলি প্রভৃতি নানাবিধ বাদ্যযন্ত্রের সুমধুর ধ্বনি।

কিন্তু চারদিকে আনন্দ-উৎসবে যোগদান করার অবসর বাসবদত্তার নেই। মহারাজা প্রদ্যোত মহাসেন তার জন্যে এক শিক্ষক নিযুক্ত করেছেন। অল্পকালের মধ্যেই তার কাছ থেকে কয়েকটি দুর্লভ ও কঠিন বাদন-কৌশল আয়ত্ত করবার দায়িত্ব বাসবদত্তার উপর ন্যস্ত করেছেন মহারাজা প্রদ্যোত। প্রত্যেকদিন প্রভাতে প্রাতরাশের পর ধাত্রী বসুন্ধরার সঙ্গে শিক্ষকের কাছে আসে বাসবদত্তা। বসুন্ধরা কিছুক্ষণ-কাছে বসে। তারপর উঠে অন্যত্র চলে যায়। মধ্যাহ্ন-ভোজনের সময় ফিরে এসে ডেকে নিয়ে যায় বাসবদত্তাকে। ভোজনের পর বিশ্রাম নেওয়ার অবকাশও নেই। রাজকন্যাকে আবার ফিরে আসতে হয় শিক্ষকের কাছে। একলা বসে নতুন নতুন অপ্রচলিত অশ্রুতপূর্ব রাগিণীর সাধনা করে।

দৈনন্দিন রীতি অনুযায়ী সেদিনও এসেছিলো বাসবদত্তা। প্রাসাদের রাজ-অবরোধের অভ্যন্তরে সংগুপ্ত এক গূঢ়কক্ষের নাতিবৃহৎ দ্বারে প্রলম্বিত স্থূল প্রাবরণের ওপাশে থাকে বীণা-শিক্ষক; প্রাবরণের এধারে বসে বাসবদত্তা। কেউ কাউকে দেখতে পায় না। দেখবার চেষ্টাও করে না। বাসবদত্তা মহারাজা প্রদ্যোতের কাছে শুনেছে যে, এই শিক্ষক এক অতি কদাকার খর্বাকৃতি বিকলাঙ্গ বামন। সুতরাং তার মুখ দেখার প্রবৃত্তিও বাসবদত্তার নেই। এত সুন্দর তার বাদন-কৌশল, এত মনোহর তার সুমধুর সুর-বিন্যাস যে, তার মুখ অবলোকন করে সুরের মায়াজালের মদির আবেশ সে নষ্ট হতে দিতে চায় নি কোনোদিন। গুরু ও শিষ্যা কেউ কারো মুখাবলোকন করবে না, দুজনে কক্ষদ্বারের প্রাবরণের দুদিকে বসবে পরস্পরের দৃষ্টির আড়ালে, এ ব্যবস্থা বাসবদত্তার কোনোদিনই অস্বাভাবিক মনে হয় নি। মহারাজা প্রদ্যোত যে কারণ প্রদর্শন করেছিলেন, বাসবদত্তা নির্বিবাদে সেটা মেনে নিয়েছিলো।

বাসবদত্তা নিজেও বীণবাদনে সুদক্ষ, দীর্ঘকাল প্রাজ্ঞ গুরুর কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছিল। কিন্তু এক্ষেত্রে এক মাসের মধ্যেও বিশেষ কিছু আয়ত্ত করতে সক্ষম হোলো না, প্রথমত, তার নতুন শিক্ষকের কলাকৌশল তার কাছে মনে হোতো দুঃসাধ্য এবং অননুকরণীয়। তাছাড়া সে দৃষ্টির অন্তরালস্থিত বীণকারের সুর-বিস্তার শুনে এমন তন্ময় হয়ে যেতো যে, পরে তাকে যখন বাজাতে বলা হতো, তার আর কিছুতেই ফিরে মনে পড়ত না। অনেক সময় বীণার সুরে কণ্ঠে পুনরাবৃত্তি করতো তার গুরু। নেপথ্যে সুমধুর কণ্ঠস্বর শুনে বাসবদত্তা আরো মুগ্ধ হয়ে যেতো। ভাবতো, বিধাতা যাকে এত অসাধারণ কণ্ঠস্বর দিয়েছেন, তাকে এত কুরূপ করে সৃষ্টি করেছেন কেন। এক সময় শুনতে পেতো, তার গুরু তাকে বলছে কণ্ঠ-নিঃসৃত সুর বীণায় বাজিয়ে শোনাচ্ছে। বাসবদত্তা কিছুতেই সে সুর বীণায় তুলতে পারতো না।

সেদিনও একই অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি হোলো। তার গুরুর আজ প্রথম ধৈর্যচ্যুতি ঘটলো। বিরক্তিভরা কণ্ঠ শোনা গেল প্রাবরণের অন্তরালে, "তোমাকে কিছু শেখানো অসম্ভব। তোমার এখনো সুরজ্ঞানই নিখুঁত হয় নি। তুমিই যদি উজ্জয়িনীর সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভাশালিনী হও, তো আমার কিছু বলবার নেই। তবে তোমার অপেক্ষাও অধিক যোগ্যতা যদি কারো থাকে তাকেই আমার কাছে পাঠিয়ে দিতে বোলো তোমাদের মহারাজাকে।"

তোমাদের মহারাজাকে?—অত্যন্ত অশিষ্ট উক্তি। অবন্তীর মহারাজা উজ্জয়িনী নগরে সবারই মহারাজা। বাসবদত্তা কুপিত হয়ে বললো, "মহারাজা প্রদ্যোত মহাসেন সম্বন্ধে সসম্ভ্রমে উল্লেখ করবে। তুমি যেরকম কুদর্শন, তোমার বাচনরীতিও তেমনই অশিষ্ট।"

"কি?" ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর শোনা গেল প্রাবরণের অন্য ধার থেকে, "তুমি বলছো আমি কুদর্শন?" তোমার মতো এক কুব্জা বিকলাঙ্গীর এত স্পর্ধা?

"আমি কুব্জা বিকলাঙ্গী?" বিপুল ক্রোধে বাসবদত্তার মুখ রক্তিমাভ হোলো, "ওহে নির্বোধ, তাহলে এই দেখ আমাকে, বলে সে প্রাবরণ তুলে ধরলো। আর সবিস্ময়ে দেখলো, কক্ষের অভ্যন্তরে বীণা হাতে বসে আছে এক অতি রূপবান সুগঠন যুবাপুরুষ। বাসবদত্তা মুগ্ধদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ, তারপর সলাজ কুণ্ঠায় প্রাবরণ নামিয়ে দিলো।

কিন্তু সেই অপরিচিত যুবাপুরুষ আবার তুলে ধরলো কক্ষদ্বারের প্রাবরণ। বলে

উঠলো, "তুমি—তুমি এত সুন্দর? কে তুমি?"

বাসবদত্তা ব্রীড়াবনতা হলেও নিজের মর্যাদা ভুললো না। গম্ভীর কণ্ঠে বললো, "আমাকে তুমি বলে সম্বোধন করবে না। আমার জনক-জননী এবং ভ্রাতৃগণ ব্যতীত আমাকে তুমি বলে সম্বোধন করার স্পর্ধা এ রাজ্যে আর কারো নেই।"

সে লোকটা একটু হাসলো, বললো, "আমি ভিন্ন রাজ্যের লোক। সুতরাং সে স্পর্ধা আমার আছে। বরং তুমিই আমাকে তুমি বলে সম্বোধন করবে না। তোমাদের মহারাজাও আমাকে তুমি বলতে সাহস করেন না।"

ওর কথার ধরণ শুনে বাসবদত্তা বিস্মিত হোলো। জিজ্ঞেস করলো, "কে তুমি?"

"তুমি কে?" জিজ্ঞেস করলো বীণকার।

"আমি মহারাজা প্রদ্যোত মহাসেনের কন্যা। আমার নাম বাসবদত্তা।"

"তুমিই বাসবদত্তা?" মুগ্ধ-বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলো সে।

"তুমি কে?" বাসবদত্তা জিজ্ঞেস করল।

"আমি?" ম্লান হাসি হাসলো সে। ধীর কণ্ঠে বললে, "আমার নাম উদয়ন। আমি বৎসরাজ্যের নৃপতি, উপস্থিত এখানে বন্দী।"

স্তম্ভিত-বিস্ময়ে বাসবদত্তা তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ। তারপর জিজ্ঞেস করলো, "আপনাকে এখানে বন্দী করে আনলো কে? কি করে আপনার মতো একজন পরাক্রান্ত রাজাকে এভাবে নিঃশব্দে বন্দী করা সম্ভব হলো? আমরা তো কিছুই শুনিনি।

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস বেরিয়ে এলো উদয়নের বুক থেকে। গম্ভীর কণ্ঠে বললো, "বাসবদত্তা, সে এক দীর্ঘ কাহিনী। আমাদের মহামাত্র যৌগন্ধরায়নের সাবধানবাণীতে কর্ণপাত করি নি। রাজ্যশাসনে অবহেলা করে বনে বনে আমার ঘোষবতী বীণা বাজিয়ে বন্যহস্তী ধরবার চেষ্টায় কালক্ষেপ করেছি। এখন আমার কৃতকর্মের প্রতিফল ভোগ করছি।"

সেদিন হাতে অধিক সময় ছিলো না। পরদিন উদয়নের মুখে সমস্ত ঘটনা শুনলো বাসবদত্তা। উদয়ন এক স্বাধীন রাজ্যের রাজা বলে তাকে কারাগৃহে রাখা হয় নি, বিশেষ করে এই কারণে যাতে তাকে বন্দী করে নিয়ে আসার সংবাদ সর্বসাধারণের মধ্যে রটে না যায়। উদয়নকে এনে রাখা হয়েছিলো উজ্জয়িনীর রাজপ্রসাদের বাজ-নিবেশের অভ্যন্তরে এই গূঢ়কক্ষে। গূঢ়ভূমিতে তার অবাধ বিচরণের স্বাধীনতা ছিলে। কিন্তু সে জানতো এখান থেকে পলায়ন করবার কোনো উপায় নেই। প্রাসাদের বিভিন্ন কক্ষায়, প্রত্যেকটি গোপুরে আছে সতর্ক প্রহরী। গূঢ়ভূমির পরিবেষ্টন প্রাচীরের ওধারেও সশস্ত্র প্রহরীর সজাগ-দৃষ্টি থাকে দিবারাত্র।

কিন্তু গূঢ়কক্ষের সন্নিকটে কোনো প্রহরী রাখা হয় না। সুতরাং তাদের অন্তরঙ্গ বাক্যালাপ কারো কর্ণগোচর হওয়ার ভয় ছিলো না। উদয়ন তার বন্দী হওয়ার কাহিনী শোনালো বাসবদত্তাকে।

বিন্ধ্যাচলের অরণ্যে এক সুলক্ষণ হস্তীর সংবাদ পেয়ে তাকে ধরবার জন্যে সেখানে গিয়েছিলো রাজা উদয়ন। সঙ্গে ছিলো অল্প কয়েকজন দেহরক্ষী। অন্তপাল সঙ্গে যায় নি, সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার জন্যে কোনো সৈন্যদলও দেয় নি। সে বুঝিয়েছিলো, বহু লোক-সমাবেশ হলে হাতী পালিয়ে যেতে পারে। সে বলেছিলো, একদল সৈন্যকে দূরে দূরে রেখেছে বনাঞ্চলে সীমান্তরক্ষা এবং মহারাজের নিরাপত্তার জন্যে। উদয়নের কোনো সন্দেহ হয়নি। সে সরল মনে এই ব্যবস্থার অনুমোদন করেছিলো। পরে জানা গিয়েছে যে, বিপক্ষ থেকে প্রচুর সুবর্ণ উৎকোচ গ্রহণ করেছে বিন্ধ্য অঞ্চলের অন্তপাল।

সেদিন সকালে কিছুক্ষণ অনুসন্ধানের পর হাতীটিকে দেখতে পাওয়া গেল। গভীর অরণ্যের অভ্যন্তরে এক ছায়ানিবিড় স্থানে বৃক্ষলতা-গুল্মাদির অন্তরালে আত্মগোপন করে সে বিশ্রাম করছে। উদয়ন তার রীতি অনুযায়ী এক নিকটবর্তী স্থানে গিয়ে বসলো তার ঘোষবতী

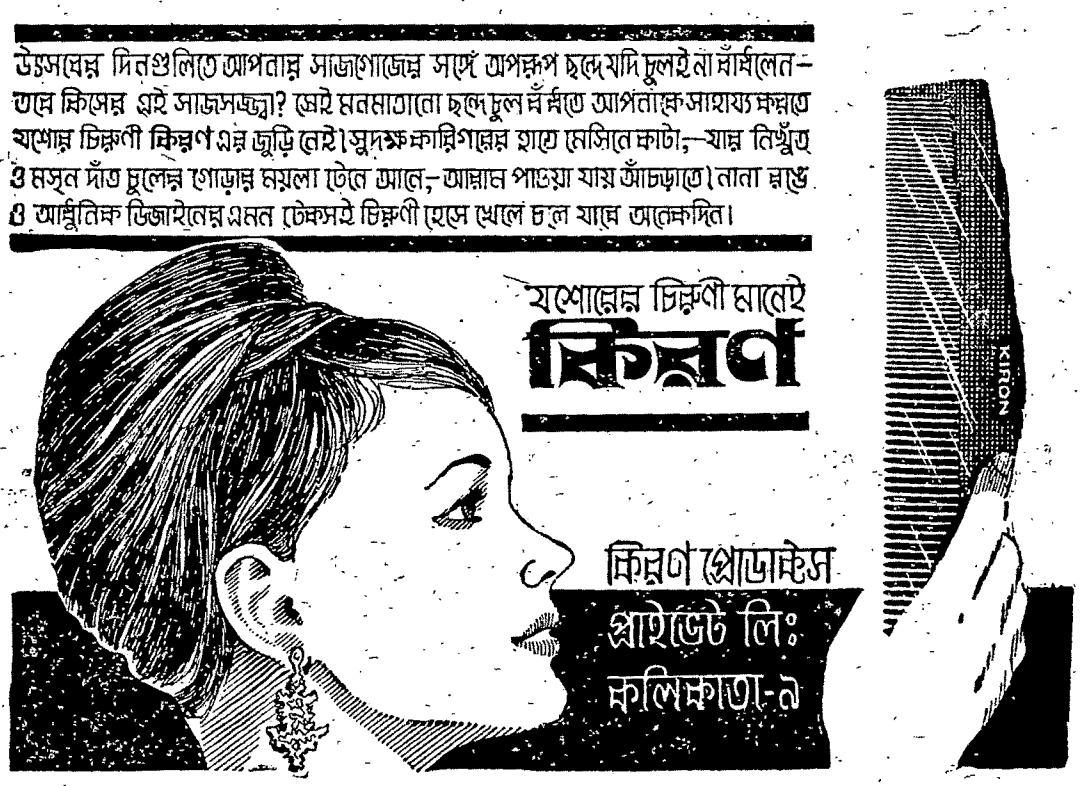

বীণা নিয়ে। সঙ্গে ছিলো শুধু পাঁচজন দেহরক্ষী এবং একজন সুদক্ষ হস্তিপক। অন্য দেহরক্ষীরা দূরে দূরেই রইল।

উদয়ন বাজাতে আরম্ভ করলো তার ঘোষবতী বীণা। চক্ষু মুদিত করে বাজাতে বাজাতে সে তন্ময় হয়ে গেল। হঠাৎ এক সময় চোখ খুলে দেখলো, তাকে ঘিরে আছে কয়েকজন সশস্ত্র বিদেশী যোদ্ধা। অদূরে ভূমিতলে পড়ে আছে ছ-জন সঙ্গীর প্রাণহীন দেহ। কখন যে এতসব ঘটে গেল উদয়ন বুঝতে পারে নি। উদয়ন বীণা ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে না দাঁড়াতে ওরা তাকে বন্দী করে টেনে নিয়ে গেল গভীর অরণ্যের ভিতর। সাহায্যের জন্যে কাউকে ডাকবার অবসরও উদয়ন পেলো না। তারপর দ্রুত অশ্বারোহণে দীর্ঘ দুর্গম পথ অতিক্রম করে ওরা উদয়নকে নিয়ে এলো অবন্তীরাজ্যে। তখনই উদয়ন জানতে পারলো সমস্ত রহস্য। লতাগুল্মাদির অন্তরালস্থিত হস্তী ছিলো দারুনির্মিত। দক্ষ শিল্পী এত নিখুঁতভাবে সেটি তৈরি করেছিলো যে, ছায়াসমাচ্ছন্ন অরণ্যে সেটিকে দেখলে আসল বলে ভ্রম হয়। আর সেই দারুনির্মিত হস্তীর অভ্যন্তরে ষষ্টি সংখ্যক নিপুণ যোদ্ধার সঙ্গে আত্মগোপন করেছিলো অবন্তী-রাজপুত্র গোপালক।

একথা শুনে বাসবদত্তা স্তম্ভিত হোলো। বলে উঠলো, "গোপালক গিয়েছিলো বিন্ধ্যাচলে? আমরা জানতাম সে বিদিশায় গিয়েছে রাজকর্ম উপলক্ষে।"

উদয়ন বলে গেল তার কাহিনী। তাকে অতি সংগোপনে নিয়ে আসা হোলো উজ্জয়িনীতে ---অতি সাবধানে, যাতে লোকে জানতে না পারে। প্রাসাদের অন্তরমণ্ডলে গৃহভূমির এই নিভৃতকক্ষে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন মহারাজা প্রদ্যোত, অতি সদয় এবং সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার করলেন তার সঙ্গে, বললেন---আপনাকে চিরকাল বন্দী করে রাখার বাসনা আমার নেই। আপনি বীণা বাজিয়ে বন্য হস্তী বশীভূত করার কৌশল জানেন বলে আপনার খ্যাতি আছে। সেই কৌশল আমায় শিখিয়ে দিন। আমি আপনাকে সসম্মানে মুক্তি দেবো।

উদয়ন বন্দী হলেও রাজোচিত মর্যাদার ভঙ্গিতে জানালো, সে প্রদ্যোতকে বীণবাদনের কৌশল শিখিয়ে দিতে প্রস্তুত, তবে তার আগে প্রদ্যোতকে গুরুপূজা করে তার শিষ্যত্ব অঙ্গীকার করতে হবে।

প্রদ্যোত একথায় স্বীকৃত হোলো না। বললো,---আপনার শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে দ্বিধাবোধ করবে না, এমন একজনকে আমি প্রেরণ করছি আপনার কাছে। তাকেই শিখিয়ে দিন।

বাসবদত্তা হেসে বললো, "তুমি আমাকে কুব্জা বিকলাঙ্গী মনে করতে?"

"হ্যাঁ, আমাকে সেকথাই বলা হয়েছিল"। উত্তর দিলো উদয়ন, "তোমার কণ্ঠস্বর শুনে আমি অনেক সময় ভাবতাম, এমন কোকিল-নিন্দিত কণ্ঠ বিধাতা যাকে দিয়েছেন, তাকে রূপ দেন নি কেন। যদি তুমি রূপসী হতে, তাহলে কণ্ঠস্বরের সঙ্গে মিলিয়ে রূপখানি কি রকম হোতো সেকথা মনে মনে কল্পনা করতাম। কে জানতো যে তুমি আমার কল্পনার চাইতেও অনেক বেশি সুন্দর।"

বাসবদত্তা একটু হেসে মুখ নিচু করলো।

উদয়ন ধীরে ধীরে বললো, "এখন আমি জানি যে, অনুরূপ কথা তুমিও ভাবতে।"

বাসবদত্তার বুকখানি কেঁপে উঠলো হঠাৎ। সেদিন বেশিক্ষণ সে বসলো না, উঠে পড়লো তাড়াতাড়ি। তারপর দিন সে এলো না। শীর্ষবেদনার ভাণ করে শয্যায় পড়ে রইলো সারাদিন। তারপর দিন যখন এলো, উদয়ন বললো,---"কাল আস নি কেন?" আমি সারাদিন তোমার কথা ভেবেছি। আমি যে একজন বন্দী সে কথা কালই যেন প্রথম অনুভব করতে পারলাম।"

বাসবদত্তার মুখে কোনো ভাবান্তর দেখা গেল না। চুপ করে শুনলো উদয়নের কথা। এ কথার কোনো উত্তরও দিলো না। অন্যান্য দিনের মতো বীণা তুলে নিয়ে তন্ত্রীতে আঘাত করলো। উদয়নও আর কিছু না-বলে শিক্ষাদানে মনোনিবেশ করলো।

এভাবে কেটে গেল কিছুদিন। একদিন বাসবদত্তা হেসে বললো, "আমাকে আপনার বিশেষ বাদন-কৌশলটি শিখিয়ে মুক্তির প্রত্যাশা করলে আপনাকে সারাজীবন এখানে বন্দী হয়ে কাটাতে হবে। আমি হার মানলাম। আপনার কৌশলটি আয়ত্ত করা আমার শক্তিতে সম্ভবপর হবে না।"

উদয়ন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললো, "তুমি যদি আমার কৌশল শিখে নাও, তাহলে তো তোমার সঙ্গে আমার আর দেখা হবে না।"

বাসবদত্তা একটা অদ্ভুত গভীর দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো উদয়নের দিকে। তারপর হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো, "তোমার নিজ রাজ্যে ফিরে যেতে ইচ্ছে করে না?"

"হ্যাঁ, খুব ইচ্ছে করে বসবদত্তা, কিন্তু সে কোনোদিন সম্ভবপর হবে ভাবতে গেলেও আবার মন বেদনায় ভরে ওঠে।"

বাসবদত্তা চুপ করে রইলো কিছুক্ষণ। তারপর বললো, "না, উদয়ন, তোমাকে মুক্তি পেতেই হবে।"

"তাহলে তুমি আমার বীণবাদন কৌশল আয়ত্ত করে নাও যতো সত্বর সম্ভব।"

"সে ভাবেও হবে না।"

"তাহলে?"

"এখান থেকে তোমার পালিয়ে যাওয়ার উপায় করতে হবে।"

"কিন্তু সে তো প্রায় অসম্ভব। এত প্রহরীর দৃষ্টি এড়িয়ে এই সুরক্ষিত রাজপ্রাসাদ থেকে পালিয়ে যাবো কি করে?"

"কোনো না কোনো একটা উপায় করতেই হবে," দৃঢ়কণ্ঠে বললো বাসবদত্তা।

দিনের পর দিন কেটে গেল। নানারকম জল্পনা-কল্পনা করলো বাসবদত্তা আর উদয়ন। কিন্তু কোনো ব্যবস্থাই সম্ভবপর বলে মনে হোলো না। কিন্তু তবু যে দিনের পর দিন দুজনের একই চিন্তা, রাতের পর রাত দুজনের মনে একই ভাবনা, আর সকাল থেকে সন্ধ্যে দুজনের বীণায় একই সুর, তাতে যেন দুজন-দুজনের পরম আপন হয়ে গেল।

কিন্তু বাইরে থেকে কারো কিছু বোঝার উপায় ছিলো না। দুজনের আঙিনায় প্রলম্বিত থাকতো সেই প্রাবরণ। প্রহরী মাঝে মাঝে দূর থেকে দেখতো, দেখতে না এলেও দূর থেকে মুগ্ধ হয়ে শুনতে পেতো দুজনের বীণা। মাঝে মাঝে ধাত্রী বসুন্ধরা এসে বসতো; কিছুক্ষণের জন্যে। মহারাজা প্রদ্যোত নিয়মিত সংবাদ পেতেন। গুরু-শিষ্যা দুজনে পরম অভিনিবেশের সঙ্গে বীণায় সুর-সাধনা করছে।

একদিন বাসবদত্তা এসে হাসতে হাসতে বললো, "কাল মহাকাল-মন্দিরে তোমার মুক্তি কামনা করে পুজো দিতে গিয়েছিলাম। সেখানে একটা কৌতুকজনক ব্যাপার দেখলাম।"

"কি ব্যাপার" জানতে চাইলো উদয়ন।

"মন্দির প্রাঙ্গণে একটি লোক ঘুরে বেড়াচ্ছে। তার মুখের ভাবভঙ্গি এমন যে, দেখলেই হাসি পায়। বোধহয় সে লোকটি কিঞ্চিৎ অপ্রকৃতিস্থ। তার হাতে একটি অতি ক্ষুদ্র বীণা। তাতে আছে মাত্র তিনটি তন্ত্রী। কিন্তু কোনো সুর নির্গত হয় না তার থেকে। একজন তাকে জিজ্ঞেস

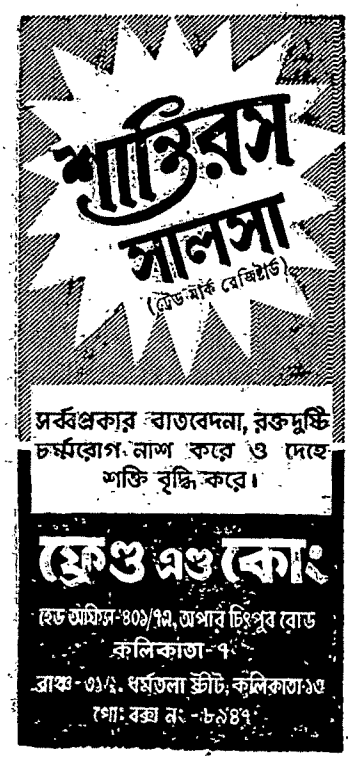

করলো, যে বীণায় কোনো সুর নেই সে বীণা বাজাও কেন? সে উত্তর দিলো, এ বীণা বাজিয়ে বশীকরণ করা যায়। কোন এক গন্ধর্ব নাকি তাকে এ বীণা দিয়েছে। আমার একজন পরিচারিকা সকৌতুকে বললো, —বশীকরণ করা যায় বীণা বাজিয়ে? বেশ তো, আমায় বশ করো। সে বললো,—সবাইকে বশ করা যায় না। এ বীণা বাজিয়ে বশ করা যায় শুধু স্থূলকায়া যুবতীকে।—লোকটি নানা ভাবভঙ্গি করে মেদ-বহুলা বিপুল-জঘনা এ রকম সব কথায় স্থূলাঙ্গী নারীর হাস্যোদ্দীপক বর্ণনা দিলো। সে একজন বিদেশী, সে নাকি স্থূলকায়া মানসীর সন্ধানে নানাদেশ ঘুরে বেড়াচ্ছে।"

উদয়ন হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে প্রাবরণ তুলে ধরে বাসবদত্তার মুখের দিকে তাকালো। জিজ্ঞেস করলো, "সে কি রকম দেখতে?"

বাসবদত্তার মুখে তার বর্ণনা শুনে উদয়ন ভ্রূকুঞ্চিত করলো।

"তোমার পরিচিত কেউ," বাসবদত্তা জিজ্ঞেস করলো উদ্বিগ্ন হয়ে।

"কাল অ। পরিচয় জেনে আসতে পারবে?" উদয়ন বললো।

বাসবদত্তা হেসে বললো, "বীণা বাজিয়ে স্থূলাঙ্গী যুবতীকে বশীকরণ করার কথা শুনে আমার হঠাৎ মনে পড়েছিলো ঘোষবতী বাজিয়ে তোমার হাতী বশ করার কথা। এই সাদৃশ্যে আমার একটু কৌতূহলও হয়েছিলো। আমি তাকে ডেকে পরিচয় জিজ্ঞেস করেছিলাম। সে বললো, তার নাম বসন্তক।"

উদয়ন উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠলো, 'বসন্তক?'

"তুমি চেনো তাকে?"

"হ্যাঁ, সে আমার বয়স্য ও অন্তরঙ্গ সহচর। সে কি এখানে একলা এসেছে?"

"না, সে বললো সে একজন যোগীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে সেই যোগীর সঙ্গে নানাদেশ পরিভ্রমণ করতে করতে উজ্জয়িনী এসে মহাকাল মন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করেছে।"

"যোগী? তুমি তাকে দেখেছো?"

"হ্যাঁ, আমি তাঁকে প্রণাম করতে গিয়েছিলাম। তাঁর নাম যোগী সুগন্ধগিরি।"

"যোগী সুগন্ধগিরি? যৌগন্ধরায়ণের সঙ্গে তো নামসাদৃশ্য আছে। তিনি কি রকম দেখতে?"

বাসবদত্তার মুখে বর্ণনা শুনে উদয়ন উৎফুল্ল হয়ে বলে উঠলো, "তিনি নিশ্চয়ই যৌগন্ধরায়ণ।"

এ নাম বাসবদত্তার অপরিচিত নয়। সবিস্ময়ে জিজ্ঞেস করলো, "তোমার মহামাত্র?"

উদয়ন সামনে ঝুঁকে পড়ে বাসবদত্তার হাত দুখানি চেপে ধরলো। ব্যাকুল কণ্ঠে বললো, "বাসবদত্তা, আমার জন্যে একটা কাজ তোমায় করতে হবে। যৌগন্ধরায়ণ ও বসন্তকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ওঁদের জানাতে হবে আমার সংবাদ। এই নাও অভিজ্ঞান।" বলে আঙুল থেকে মুদ্রাঙ্কিত অঙ্গুরীয় খুলে দিলো উদয়ন। তারপর বললো, "ওঁরা নিশ্চয়ই আমার সন্ধানে এত বিপদ স্বীকার করে ছদ্মবেশে অরি-রাজ্যের রাজধানীতে উপনীত হয়েছেন। ওঁরা আমার অকৃত্রিম সুহৃদ, আমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, অথচ আমি তাঁদের উপদেশ অবহেলা করে অপকর্মে সময় নষ্ট করেছি।"

"তুমি বিচলিত হয়ো না উদয়ন।" বাসবদত্তা সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করলো, "তোমার মহামাত্র ও বয়স্য যখন এখানে উপস্থিত হয়েছেন, তখন নিশ্চয়ই মুক্তির একটা উপায় হবে।"

পরদিন বাসবদত্তা আবার গেল মহাকাল মন্দিরে। সাক্ষাৎ হোলো যৌগন্ধরায়ণ ও বসন্তকের সঙ্গে। তাদের কাছ থেকে সংবাদ নিয়ে ফিরে এলো উদয়নের কাছে। কিন্তু রাজনন্দিনীর পক্ষে প্রত্যেক দিন এভাবে মন্দিরে গিয়ে কারো সঙ্গে সাক্ষাৎ করে গোপনে কথাবার্তা বলা সম্ভব নয়। সুতরাং তাকে ধাত্রী বসুন্ধরার সহায়তা গ্রহণ করতে হোলো। বসুন্ধরা বাসবদত্তার অত্যন্ত অনুগত। সুতরাং সব কথা শুনে সে তাদের সহায়তা করতে স্বীকৃত হোলো।

কয়েকদিন পরে বাসবদত্তা উদয়নকে বললো, "তোমার পালিয়ে যাওয়ার উপায় নির্ণীত হয়েছে। যৌগন্ধরায়ণই স্থির করেছেন এই পরিকল্পনা।"

বাসবদত্তার মুখে পলায়ন-পরিকল্পনার বিস্তারিত বিবরণ শুনলো উদয়ন। বসন্তকাল শেষ হয়ে আসছে। সামনে পূর্ণিমা। সেদিন নিশীথে উজ্জয়িনী নগরী যুবক-যুবতীদের বসন্ত উৎসবে উত্তাল উত্তরঙ্গ হয়ে উঠবে।

সন্ধ্যার পর বাসবদত্তার সঙ্গে তার ধাত্রী বসুন্ধরার ছদ্মবেশে গূঢ়ভূমি থেকে নিষ্ক্রান্ত হবে উদয়ন। বাসবদত্তার সঙ্গে দেখলে প্রহরীর মনে কোনো সন্দেহ হবে না, সে সন্ধ্যার আবছায়ায় ভালোভাবে পর্যবেক্ষণও করবে না। প্রাসাদের অন্তরমণ্ডল থেকে একবার নিষ্ক্রান্ত হতে পারলে তারপর আর বিশেষ কোনো অসুবিধে নেই। অন্তরমণ্ডল ভিন্ন প্রাসাদের অন্যান্য কক্ষায় বসন্ত-উৎসবের দিন প্রহরীদের বিশেষ কোনো সতর্কতা থাকে না। সেদিন রাজপ্রাসাদে উজ্জয়িনীর পৌরবর্গের অবারিত দ্বার। প্রাসাদের মধ্যমহার কক্ষায় কোনো নিভৃত স্থানে ধাত্রীর বেশ ত্যাগ করে উদয়ন উজ্জয়িনীর সাধারণ যুবকের বেশ পরিধান করবে। মহামর্যাদা কক্ষায় বসন্তক অপেক্ষা করবে তার জন্যে। সে উদয়নকে নিয়ে যাবে শিপ্রা নদীর তীরে কোনো এক নির্জন স্থানে, যেখানে অপেক্ষা করবে যৌগন্ধরায়ণ।

"তারপর?" উদয়ন জিজ্ঞেস করলো কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকবার পর।

"তারপর আর কি?" বাসবদত্তা বললো, "তুমি ফিরে যাবে তোমার রাজ্যে। মাঝে মাঝে," একটু যেন ভারী হয়ে এলো বাসবদত্তার কণ্ঠস্বর, —"মাঝে মাঝে মনে পড়বে তোমার অপটু শিষ্যার কথা।"

"আমি আমার কথা জিজ্ঞেস করছি না।" বলে উঠলো উদয়ন। "তোমার কথা জিজ্ঞেস করছি। তারপর তোমার কি হবে?"

"আমার জন্যে ভাবনা করার কিছু নেই।" মৃদুকণ্ঠে উত্তর দিলো বাসবদত্তা, "রাজকন্যার জীবনের একটা পূর্ব-নির্ধারিত প্রচলিত ধারা আছে। সেই ধারায় আমার জীবন কেটে যাবে।"

"বাসবদত্তা।"

সে চোখ তুলে তাকালো উদয়নের দিকে।

"তুমি যাবে আমার সঙ্গে?" জিজ্ঞেস করলো উদয়ন।

বাসবদত্তার সমস্ত শরীর হঠাৎ কেঁপে উঠলো।

॥ চার ॥

কয়েকদিন পরে একদিন সন্ধ্যাবেলা মহারাজা বীরপদক্ষেপে নিজের শয়নগৃহে প্রবেশ করলো। চারদিক নিস্তব্ধ, কারো সাড়া-শব্দ কানে আসে না। কয়েক দিন ধরে সমস্ত রাজপ্রাসাদ দুঃখে ও ক্ষোভে মিয়মাণ। কারো মুখে হাসি নেই, চারদিকে কোথাও আনন্দ উৎসবের সাড়া নেই, সবাই যাতায়াত করে নিঃশব্দে; কথা বলে খুব নিম্নকণ্ঠে।

পট্টমহিষী দেবী অঙ্গারবতী ম্লানমুখে বসেছিলো এক বৃহদায়তন পর্যঙ্কের উপর। কাছে দাঁড়িয়েছিলো একজন পরিচারিকা। রাজা শয়নগৃহে প্রবেশ করতেই সে প্রণাম করে পার্শ্ববর্তী দ্বারপথে সেখান থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে চলে গেল। প্রদ্যোত ধীরে ধীরে এসে উপবেশন করলো একটি আসন্দীতে।

অঙ্গারবতী পর্যঙ্ক থেকে উঠে এসে প্রদ্যোতের পায়ের কাছে প্রবালকুট্টিমের উপর জানু পেতে বসলো। জিজ্ঞেস করলো অবরুদ্ধ কণ্ঠে, "আর্যপুত্র মন্ত্রসভায় কি স্থির হোলো?"

প্রদ্যোত উত্তর দিলো, "মন্ত্রণাপরিষদকে বোঝাতে সক্ষম হলাম যে, বৎসরাজ্যের বিরুদ্ধে রণযাত্রা করা বর্তমান পরিস্থিতিতে ঠিক হবে না। বৎসরাজ্য সম্বন্ধে কোশল বা মগধের মনোভাব যাই হোক অবন্তী রাজ্যের সীমান্ত যমুনার তীর পর্যন্ত বিস্তৃত হওয়া তারা সহ্য করবে না।"

অঙ্গারবতী বললো, "উদয়ন যদি বাসবদত্তাকে বিবাহ করে নিজের পট্টমহিষী করে তাহলে তো তার সঙ্গে শত্রুতা করার কোনো প্রয়োজনই নেই। বৎসরাজ্যকে আমাদের মিত্র রাজ্য বলেই গণ্য করতে পারবো। জামাতার সঙ্গে কি কেউ যুদ্ধ করে?"

"দেবী, এ যুক্তি মন্ত্রণাপরিষদে উপস্থাপিত করা চলে না। মহামাত্র সোমেশ্বর ভিন্ন অন্য সবাই বৎসরাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবার পক্ষপাতী ছিলো। সেনানায়ক ইন্দ্র দত্ত, অমাত্য পূর্ণভদ্র আর তোমার দুই পুত্র তো ক্ষিপ্ত হয়ে আছে। তারা বলছে, অন্য সব বিবেচনা গৌণ। উদয়ন আমাদের রাজকন্যাকে হরণ করে আমাদের সম্মানহানি করেছে। তার এই ধৃষ্টতার সমুচিত প্রতিফল দিতে হবে। আমি আর মহামাত্র সোমেশ্বর অনেকক্ষণ ধরে তাদের সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক করে নিরস্ত করেছি। শেষ পর্যন্ত এই সাব্যস্ত হয়েছে যে, উদয়ন যদি বাসবদত্তাকে বিবাহ করে বৎস্যরাজ্যের পট্টমহিষী করে এবং আমাদের মহারাজা ও পট্টমহিষীর কাছে তার কৃতকর্মের জন্যে মার্জনাভিক্ষা করে, শুধুমাত্র তাহলেই অবন্তীর সেনাবাহিনী বৎসরাজ্যের বিরুদ্ধে রণযাত্রায় নিরস্ত হবে।"

"আর্যপুত্র, ক্ষত্রিয় রাজার পক্ষে কন্যা হরণ করে বিবাহ করা রীতিবিরুদ্ধ নয়," ধীরকণ্ঠে বললো অঙ্গারবতী, "উদয়নকে ছলন করে হরণ করে উজ্জয়িনীতে এনে আমরাই বা কি এমন প্রশংসনীয় কাজ করেছিলাম, এ সব আমাদের পারিবারিক ব্যাপার। এ নিয়ে দুই রাজ্যের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং লোকক্ষয় কি বাঞ্ছনীয়?"

"উজ্জয়িনীর রাজপুত্র ও অমাত্যদের আত্মসম্মানে আঘাত লেগেছে দেবী, ওরা তো এ সব যুক্তি শুনবে না। যাকে আমরা বন্দী করে নিয়ে এসেছি, সে যদি আমাদেরই রাজকন্যাকে সুরক্ষিত প্রাসাদের অভ্যন্তর থেকে হরণ করে পালিয়ে যায়, সে কি আনন্দ করবার মতো ঘটনা? অমাত্যবর্গকে আমি দোষ দিই না। আমি তাদের মনোভাব বুঝতে পারি। এটা শুধু পারিবারিক ব্যাপার নয়। এটা অবন্তী রাজ্যের সম্মানের প্রশ্ন। আর্যাবর্তে অন্যান্য সব মহাজনপদ ও গণরাজ্যসমূহে যখন এই সংবাদ ছড়িয়ে পড়বে তখন তারাই কিরকম হাসাহাসি করবে একবার ভেবে দেখ তো।"

"আর্যপুত্র, বাসবদত্তা স্বেচ্ছায় না গেলে কি উদয়নের সাধ্য ছিলো তাকে নিয়ে যাওয়ার বা এখান থেকে পালিয়ে যাওয়ার?" জিজ্ঞেস করলো অঙ্গারবতী, "তা ছাড়া তুমি উদয়নকে বন্দী করে প্রাসাদের অভ্যন্তরে এনে বাসবদত্তাকে তার কাছে বীণাবাদন শিক্ষা করতে পাঠিয়েছিলে। তাদের অন্তরঙ্গ হওয়ার সুযোগ করে দেওয়ার জন্যেই। তোমার মতো ব্রহ্মজন শক্তিমান সুবিবেচক নৃপতি যে শুধু হাতী ধরবার কৌশল শিখবার জন্যেই উদয়নকে বন্দী করে উজ্জয়িনী নিয়ে এসেছিলো, একথা কি কেউ বিশ্বাস করবে? তুমি তো চেয়েছিলে যে, উদয়নের সঙ্গে বাসবদত্তার বিবাহ হোক।"

"হ্যাঁ চেয়েছিলাম," উত্তর দিলো প্রদ্যোত, "এবং এত কৌশল অবলম্বন করেছিলাম এজন্য যে, আমাকে যেন উপযাচক হয়ে উদয়নের কাছে বিবাহের প্রস্তাব করতে না হয়। উদয়নও অত্যন্ত আত্মাভিমানী, সেও যে নিজের থেকে আমার কাছে বিবাহের প্রস্তাব পাঠাবে না, একথা আমি জানতাম। তাই আমি চেয়েছিলাম যে

কুটির শিল্প

বেকার সমস্যার সমাধান করতে হলে শুধু চাকুরীর সন্ধানে না ঘুরে ছোট ছোট কুটির শিল্পে নিজেদের নিয়োজিত করুন। কুটির শিল্পের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, যেমন—

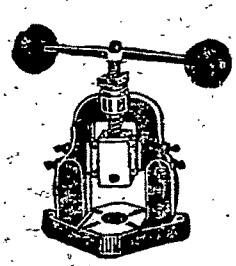

বল প্রেস

ফ্লাই প্রেস, এমবসিং ডাইপ্রিন্টিং প্রেস, টালি প্রেস, পাওয়ার প্রেস, ফ্রিকশন প্রেস ও চেন পুলী ব্লক ইত্যাদি আমরা তৈয়ারী করে থাকি।

নন্দী এণ্ড কোং

১২৫, বেলিলিয়াস রোড, হাওড়া
ফোন: ৬৬-২০৬১

তাদের মধ্যে প্রণয় গড়ে উঠুক, তাহলে শেষ পর্যন্ত আমার কাছে বাসবদত্তার পাণিপ্রার্থনা করতে উদয়নের বাধবে না। আমিও প্রথম দিকে কিঞ্চিৎ ক্রোধ প্রকাশ করে, তারপর বাসবদত্তার অনুনয়ে এবং তোমার মধ্যস্থতায় উদয়নের হাতে আমার কন্যাকে সমর্পণ করতে স্বীকৃত হতাম। তাহলে কোনো গোলযোগ হোতো না। বিবাহের পর বরবধূ নির্বিবাদে নিজের রাজ্যে ফিরে যেতে পারতো।"

"যাই হোক, এখন আর সেজন্য অনুশোচনা করে কোনো লাভ নেই," বললো অঙ্গারবতী, "যা হবার তাই হয়েছে। আমাদের অভীষ্ট যে সিদ্ধ হয়েছে, সেটুকুই আমার সান্ত্বনা।"

প্রদ্যোত আসন্দী থেকে উঠে দাঁড়ালো। প্রশস্ত শয়নগৃহের এদিক-ওদিক পদচারণা করতে করতে বললো, "কিন্তু ওদের এভাবে পালিয়ে যাওয়ার কী প্রয়োজন ছিলো? কতো রকম বিপদ হতে পারতো ওদের। জানাজানি হয়ে যাওয়ার পর পালক আর গোপালক সশস্ত্র অশ্বারোহী সেনা নিয়ে যখন ওদের পশ্চাদ্ধাবন করলো, তখন আমার যে কি উদ্বেগ হয়েছিলো তুমি কল্পনা করতে পারবে না। তাদের নিরস্ত করতে পারি না, অথচ তারা যদি উদয়নকে আক্রমণ করে নিহত করে, তাহলে তাকে আমার রক্ষা করার কোনো উপায় ছিলো? তুমি জানো না দেবী, দুর্ভাবনায় আমার ছয় সাত দিন ঘুম হয় নি। দশ দিন পরে পালক আর গোপালক এসে যখন জানালো যে, উদয়নকে ধরা যায় নি, সে নিরাপদে সীমান্ত অতিক্রম করে তার নিজের রাজ্যে উপনীত হয়েছে, তখন আমি মনে মনে নিশ্চিন্ত হলাম।"

"কবে বাসবদত্তার কাছ থেকে পত্র আসবে আর্যপুত্র", অঙ্গারবতী বলে উঠলো, "সে চলে যাওয়ার পর উজ্জয়িনীর রাজপ্রাসাদ যেন অন্ধকার হয়ে আছে।"

প্রদ্যোত উত্তর দিলো, "কেন এই বিষণ্ণতা দেবী? সুরাইকে সহজ হতে বলো, স্বচ্ছন্দ হতে বলো। আমাদের কন্যা এক পরাক্রান্ত রাজ্যের পট্টমহিষী হবে, আমাদের দুঃখ করার তো কোনো কারণ নেই।"

"আমার খুব আশা ছিলো খুব আনন্দ উৎসব করে বাসবদত্তার বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করবো।" অঙ্গারবতী বললো চোখের জল মুছে।

"সে আশা আমারও কি ছিলো না?" বলে উঠলো মহারাজ প্রদ্যোত।

অঙ্গারবতী কোনো উত্তর দিলো না। প্রদ্যোত নিজের মনে কিছুক্ষণ পদচারণা করলো তারপর হঠাৎ ফিরে দাঁড়ালো, বললো, "দেবী আমাদের আশা পূর্ণ করার একটা উপায় স্থির করেছি।"

"কি উপায়, আর্যপুত্র?"

"শোনো দেবী, বীণা শিক্ষা গ্রহণ করানোর ছলে আমরা বাসবদত্তাকে উদয়নের হাতে অনগ্নিসাক্ষিকভাবে দান করেছিলাম। যাই হোক, ওরা যখন চলে গেছে, তখন আমরা ওদের আলেখ্য-বিবাহ সম্পন্ন করবো।"

"আলেখ্য-বিবাহ? উদয়নের আদৌ কোথায় পাবো আর্যপুত্র?"

"উদয়নকে উজ্জয়িনীতে নিয়ে আসার পর চিত্রশালার প্রধান চিত্রকরকে বলেছিলাম উদয়নের চিত্র একটি চিত্রফলকে অঙ্কিত করে রাখতে। বাসবদত্তার চিত্র তো তোমার কাছে আছেই। দৈবজ্ঞকে ডাকিয়ে এনে বলে দাও একটি শুভলগ্ন স্থির করতে। সেদিন উজ্জয়িনীর রাজপ্রাসাদে আনন্দ-উৎসব করে বাসবদত্তা আর উদয়নের আলেখ্য-বিবাহ সুসম্পন্ন করবো।"

॥ পাঁচ ॥

কেটে গেল সাত-আট বছর সময়। খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী শেষ হয়ে পঞ্চম শতাব্দী আরম্ভ হয়ে গেছে। এই কয়েক বছরে আর্যাবর্তে রাজনৈতিক পট পরিবর্তন হয়েছে। খৃষ্টপূর্ব চারশো তিরানব্বই অব্দে বিম্বিসারকে কারারুদ্ধ করে অজাতশত্রু নিজে মগধের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হোলো। আর্যাবর্তের বিভিন্ন মহাজনপদের রাজধানীতে রটে গেল যে কোশল রাজ প্রসেনজিৎ মগধের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করবার জন্যে

কলিকাতার ষ্টকিষ্ট :—
পপুলার ড্রাগ হাউস (প্রাঃ) লিমিটেড
৪নং ভূপেন বসু এভিনিউ
রয়াল মেডিক্যাল ষ্টোর্স
৫৫।১৫ নং ক্যানিং ষ্ট্রীট
মেহেতা বিল্ডিং কলিঃ
রায় দাস এণ্ড কোং
বাগরী মার্কেট, ক্যানিং ষ্ট্রীট
দেজ মেডিক্যাল ষ্টোর্স
৬বি লিণ্ডসে ষ্ট্রীট
বসন এণ্ড কোং
এজরা ষ্ট্রীট, গান্ধী বিল্ডিং
কলিকাতা-১

অসহ্য পেটের বেদনা বন্ধ করে!
এম. এ. করিমের
অল্পজীন
রেজিষ্টার্ড
অম্লশূল, গ্যাষ্ট্রিক আলসার, লিভার ব্যথা ইত্যাদি যাবতীয় পেটের পীড়া দ্রুত নিরাময়ে আশ্চর্য্য শক্তিশালী
অল্পজীন কুটীর
হেড অফিস ও ল্যাবরেটরী—সাগোরাগনগর, ২৪ পরগণা, পঃ বঃ
স্থানীয় সম্ভ্রান্ত ডাক্তারখানায় বা ষ্টোরে খোঁজ নিন

ট্রপিকো
পি-৪-সি, আই, টি, রোড
কলিকাতা
রায় ব্রাদার্স
বাগরী মার্কেট
৭১, ক্যানিং ষ্ট্রীট
ইহা ছাড়া কলিকাতার সমস্ত সম্ভ্রান্ত দোকানে পাওয়া যায়।
বাংলা, বিহার, আসাম, উড়িষ্যা ও ভারতের প্রত্যেক প্রদেশে ও জেলায় উচ্চ কমিশনে, ষ্টকিষ্ট ও ডিষ্ট্রীবিউটর আবশ্যক স্থানীয় প্রতিপত্তিশালী ব্যবসায়িগণ সর্ত্তাদির জন্য লিখুন।

সাবধান! ভীষণ জাল হইতেছে। অল্পজীন ক্রয়কালে এম, এ, করিমের ফটো স্পষ্ট ছাপা দেখিয়া লইবেন।

প্রস্তুত হচ্ছেন। আবার একথাও শোনা গেল লিচ্ছবিদের উপর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যে অজাতশত্রু বজ্জিসঙ্ঘ নামক গণরাজ্যকে উচ্ছেদ করবার জন্যে সামরিক প্রস্তুতি করছে। মগধের যন্ত্রশিল্পীরা দুটি নতুন মারণাস্ত্র উদ্ভাবিত করেছে বলে সংবাদ পেলো প্রত্যেক রাজ্যের গূঢ় পুরুষ সংস্থা, মারণাস্ত্র দুটির নাম—মহাশিলাকণ্টক এবং রথমুষল। এ দুটি অস্ত্র সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ তখনো কিছু জানা গেল না। সবাই শুধু বলাবলি করতে লাগলো এটি দুটি মারণাস্ত্র যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহার করলে এক-একবারে বহু সংখ্যক সৈন্য নিহত হয়। কিছুকাল যাবৎ যে শান্তি বিরাজ করছিলো সমগ্র আর্যাবর্তে, সেই শান্তিময় যুগ শেষ হয়ে দেশব্যাপী যুদ্ধ-বিগ্রহ আরম্ভ হবে বলে আশঙ্কা করতে লাগলো সবাই।

গৌতম বুদ্ধ তখনো জীবিত। বর্ষাবাস শ্রাবস্তিতে করলেও নানাস্থান পর্যটন করছেন বার্ধক্যে উপনীত হওয়া সত্ত্বেও। কিন্তু শান্তি ও অহিংসার ললিত বাণীর কোনো প্রভাব পড়লো না শক্তি উন্মাদ সাম্রাজ্যবাদী বিজিগীষু নৃপতিদের উপর।

ইতিমধ্যে বৎসরাজ উদয়নেরও ভাগ্য বিপর্যয় হয়েছে। বাসবদত্তার সঙ্গে বিবাহের পর কিছুকাল দিগ্বিজয়ে মনোনিবেশ করেছিলো কিন্তু আবার রাজ্য সংরক্ষণ ও রাজ্যশাসনকর্ম অবহেলা করে মৃগয়া, হস্তী বশীকরণ ক্রীড়া ও গান্ধর্ববিদ্যা অনুশীলনে মন দিলো। ফলে অচিরেই রাজ্য হারাতে হলো উদয়নকে। তার সামরিক প্রস্তুতিবিহীনতার সুযোগ গ্রহণ করে বৈরীভাবাপন্ন প্রত্যন্ত নৃপতি আরুণি রাজধানী কৌশাম্বী শুদ্ধ অবন্তীরাজ্যের একটা বিরাট অংশ অধিকার করে নিলো। শুধু মগধের সীমান্ত-সংলগ্ন দু-তিনটি বিষয় রইলো উদয়নের অধিকারে। উদয়ন পট্টমহিষী বাসবদত্তা, রাজকুমার বোধি এবং অমাত্যবর্গকে নিয়ে সেদিকে পশ্চাদপসরণ করলো।

উদয়ন আশ্রয় গ্রহণ করেছিলো এক সুরক্ষিত বনদুর্গে। কিন্তু সেখানে এসেও রাজ্য পুনরুদ্ধারে তৎপর না হয়ে মৃগয়া এবং হস্তী বশীকরণেই প্রবৃত্ত হলো। মহামাত্র যৌগন্ধরায়ণ, সেনানায়ক রুমণ্বান এবং অন্যান্য অমাত্যবর্গ ক্ষুব্ধ হলো, মহারাজা উদয়নের নিষ্ক্রিয়তায়। কিন্তু উদয়ন ভ্রূক্ষেপ করলো না মোটেও। কর্ণপাত করলো না তাদের অনুযোগে।

একদিন সায়াহ্নকালে বনদুর্গের অভ্যন্তর প্রাঙ্গণপ্রান্তে এক শ্যামমনোহর লতামণ্ডপে বসে পট্টমহিষী বাসবদত্তা বিষণ্ণ মনে নানা কথা চিন্তা করছিলো। কাছে তৃণভূমিতে পাঁচ বছরের শিশু রাজকুমার বোধি ছুটোছুটি করে খেলা করছিলো একটি কন্দুক নিয়ে। এমন সময় একজন পরিচারিকা এসে জানালো মহামাত্র যৌগন্ধরায়ণ দেবী বাসবদত্তার সাক্ষাৎপ্রার্থী হয়ে অন্তরালে অপেক্ষা করছেন।

বাসবদত্তার অনুমতি পেয়ে যৌগন্ধরায়ণ লতামণ্ডপে উপস্থিত হোলো। বাসবদত্তা উঠে দাঁড়িয়ে অঞ্জলিবদ্ধ হাতে তাদের পরম সুহৃদ ও অনুগত সহচর এই প্রবীণ ব্রাহ্মণ মহামাত্রকে অভিবাদন করলো। যৌগন্ধরায়ণও প্রত্যভিবাদন করে বাসবদত্তার সন্নিকটে পাষাণস্থণ্ডিলে আসন গ্রহণ করলো। প্রারম্ভিক শিষ্টালাপের পর বললো, "দেবী, আজ বিশেষ কারণে আমরা আপনার শরণাগত।"

"আপনারা?"

"আমি, রুমণ্বান এবং অন্যান্য অমাত্যবর্গ।"

"মহামাত্র, রাজ্যহীন হবার পর মহারাজ এবং আমি অত্যন্ত দুঃস্থ অবস্থায় কালাতিপাত করছি। আপনাদের সহায়তা না পেলে হয়তো আমাদের পক্ষে জীবন ধারণ করাই দুষ্কর হোতো। আমি অমাত্যবর্গের কি উপকার করতে সক্ষম আমি জানি না। তবে আপনাদের বন্ধুত্বের সামান্যতম প্রতিদানও যদি দিতে পারি তাহলে নিজেকে ধন্য মনে করবো।"

"দেবী", বললো যৌগন্ধরায়ণ, "আপনি আমাদের রাণী। আমাদের জীবন আপনার ও মহারাজের সেবায় উৎসর্গীকৃত। প্রতিদানের কোনো প্রশ্নই ওঠে না। তবে রাজ্য পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টায় আপনার কিঞ্চিৎ সহায়তা আমাদের নিতান্ত প্রয়োজন বলে মনে হচ্ছে।

"অসঙ্কোচে খুলে বলুন মহামাত্র। আমার যথাসাধ্য আমি করবো।"

"দেবী, আমাদের সৈন্যবল অপ্রতুল। এই সেনাদল নিয়ে কোনোরকমে আত্মরক্ষা করা যায় মাত্র। কিন্তু রাজ্য পুনরুদ্ধার অসম্ভব। এ অবস্থায় আমাদের প্রয়োজন অন্য কোনো মিত্র রাজ্যের সহায়তা।"

"কে আমাদের সহায়তা করবে মহামাত্র? বাসবদত্তা কাতর কণ্ঠে বললো, 'আপনাদের মহারাজা আমার পিতা মহারাজা প্রদ্যোতের সাহায্য গ্রহণ করতে অত্যন্ত অনিচ্ছুক। আমি অনেক অনুরোধ করেছি, কিন্তু উনি কিছুতেই তাঁর কাছে সাহায্যভিক্ষা করে পত্র প্রেরণ করতে সম্মত হন নি।"

"তাতে কোনো লাভ হোতো না, দেবী। আমি নিজে সংবাদ প্রেরণ করেছিলাম মহারাজা প্রদ্যোতের কাছে। কিন্তু তিনি কোনোরকম সহায়তা করতে অক্ষম। তিনি বৃদ্ধ হয়েছেন এখন তাঁর প্রভাব কমে গেছে। রাজকুমার পালক তাঁর নামে রাজ্যশাসন করেন। তিনি, মহামাত্র সোমেশ্বর এবং সেনানায়ক ইন্দ্রদত্ত বৎসরাজকে কোনো রকম সৈন্য-সহায়তা করতে অনিচ্ছুক। গান্ধাররাজ পুষ্কর সারিণের সঙ্গে অবন্তীরাজ্যের আবার বিবাদ বাধবার সম্ভাবনার সৃষ্টি হয়েছে বলে ওঁরা ওঁদের সেনাবাহিনীর একাংশকে রাজ্যসীমান্তের বাইরে পাঠাতে চান না।"

"আপনাদের মহারাজ আমাকে উজ্জয়িনী থেকে হরণ করে নিয়ে এসেছিলেন বলে আমার দুই ভ্রাতা এবং অবন্তির অমাত্যবর্গ আজো তাঁর প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন।"

"হ্যাঁ, সেটিও একটা কারণ বটে," বললো যৌগন্ধরায়ণ, "যাই হোক, অবন্তীরাজ্যের কোনো সহায়তা আমরা আশা করতে পারি না। কোশলরাজ প্রসেনজিৎ মগধরাজ অজাতশত্রুর(১) সঙ্গে শক্তিপরীক্ষা করবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছেন। সুতরাং তাঁর পক্ষেও আমাদের কোনোরকম সাহায্য করা সম্ভব নয়। কাম্পিল্যরাজ ব্রহ্মদত্ত আমাদের প্রতি মিত্রভাবাপন্ন বটে, কিন্তু তাঁর সামরিকশক্তি আমাদের সহায়তা করবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। তিনি যে আমাদের দ্বিতীয়া মহিষী দেবী মাগন্দিয়াকে নিজের প্রাসাদে আশ্রয় দিয়েছেন, তাই অনেক। দেবী সোমাবতী শাক্যমুনির অত্যন্ত অনুগত। তিনি এখন শ্রাবস্তিতে ভিক্ষুণী সঙ্ঘে আছেন বলে আমরা আশা করেছিলাম যে, মহারাজা প্রসেনজিতের মহিষী দেবী মল্লিকা এবং তাঁর কন্যা রাজকুমারী বজ্রাকে বলে তিনি কোশল রাজ্য থেকে সৈন্য সাহায্যের ব্যবস্থা করতে পারবেন। কিন্তু আমাদের সে আশাও ফলবতী হয় নি।"

"সে কি করে হয় মহামাত্র? দেবী সোমাবতী প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছেন। এখন তিনি এসব ব্যাপারে একেবারে নিরাসক্ত। একথা ভুলে যাবেন না যে, তাঁকে পট্টমহিষী না করে আর্যপুত্র আমাকে বিবাহ করলেন বলে তাঁর মন একেবারে ভেঙে গিয়েছিলো।"

"যাই হোক দেবী, এখন এই হোলো পরিস্থিতি," বলে গেল যৌগন্ধরায়ণ, "এখন শুধু একটি রাজ্যের সহায়তা আমরা প্রার্থনা করতে পারি।"

"মগধ?"

"হ্যাঁ দেবী। মগধই একমাত্র শক্তিশালী রাজ্য যার পক্ষে আমাদের সাহায্য করা সম্ভব।"

"কিন্তু মহারাজা অজাতশত্রু কি আমাদের সৈন্য সাহায্য করবেন?" জিজ্ঞেস করলো বাসবদত্তা।

"কেনই বা করবেন?" প্রত্যুত্তরে প্রশ্ন করলো যৌগন্ধরায়ণ।

"তাহলে?"

"দেবী, আমি রুমণ্বান ও অন্যান্য অমাত্যবর্গের সঙ্গে এ বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছি। আমরা একটা উপায় স্থির করেছি। কিন্তু এতে আপনার সম্মতি এবং সহায়তা প্রয়োজন।"

"সব কথা খুলে বলুন, মহামাত্র।"

"দেবী, হয়তো আমাদের প্রস্তাব আপনার কাছে অত্যন্ত অপ্রীতিকর মনে হতে পারে—"

---

(১) বৎসরাজ উদয়নের সমসাময়িক মগধ নৃপতি ছিলেন, অজাতশত্রু। মহাকবি ভাস স্বপ্ন-বাসবদত্তা নাটকে মগধের রাজাকে দর্শক নামে অভিহিত করেছেন। কিন্তু মহারাজ দর্শক বা নাগদাসক মহাবংশ অনুযায়ী অজাতশত্রুর পুত্র উদয়ভদ্রের প্রপৌত্র। পরাণ অনুযায়ী দর্শক অজাতশত্রুর পুত্র।

শেখার কি কোন বয়স আছে ?

ছোট ছেলেমেয়েরা শিশুকালেই শেখে যে গাছপালা বেঁচে থাকার এবং বড় হয়ে ওঠার জন্য চাই জল। এই সত্যটি একবার জানলে আর কখনো তারা ভোলে না।

আর একটি কথা আপনি আপনার ছেলেমেয়েদের শেখাতে শুরু করুন। ছোট থাকতে থাকতেই নিয়মিত দাঁত আর মাড়ির যত্ন নিতে শিখিয়ে দিলে, দাঁতের ক্ষয় আর মাড়ির রোগ থেকে ওরা রক্ষা পাবে ও তার জন্য আপনার কাছে ওরা চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকবে। আপনার ছেলেমেয়েদের আজই ফরহান্স টুথপেষ্ট দিয়ে দাঁত আর মাড়ির পরিচর্যা করা শিখিয়ে দিন। বিখ্যাত দন্ত চিকিৎসকের তৈরী ফরহান্সই পৃথিবীতে একমাত্র টুথপেষ্ট যাতে মাড়ির জন্য ডক্টর ফরহান্সের বিশিষ্ট সঙ্কোচক উপাদান আছে। নিয়মিত ফরহান্স ব্যবহার করলে দাঁত ঝকঝকে সাদা আর মাড়ি সুস্থসবল থাকে।

বিনামূল্যে ! 'দাঁত ও মাড়ীর যত্ন'—রঙিন বই

ইংরাজী ও বাংলায় এই বই পাওয়া যায়; ডিপার্টমেণ্ট বি-৯ ম্যানাস ডেণ্টাল অ্যাডভাইসরি ব্যুরো, পোষ্ট ব্যাগ নং ১০০৩১, বোম্বাই-১: এই ঠিকানায় ১০ পয়সার ডাক টিকিট (ডাক মাশুল বাবদ) পাঠালেই আপনি এই বই পাবেন।

নাম _____

ঠিকানা _____

যে ভাষার চান তার নীচেদাগ দিয়ে দিন। _____

বাংলা/ইংরাজী। _____

"কোনো দ্বিধা করবেন না মহামাত্র। আপনাদের রাজ্য পুনরুদ্ধার সম্ভব করা যেতে পারে এমন কোনো প্রস্তাবই আমার কাছে অপ্রীতিকর হতে পারে না।"

যৌগন্ধরায়ণ একটু ইতস্তত করলো তারপর বললো, "মহারাজা অজাতশত্রু সাহায্যপ্রার্থী বৎসরাজকে সৈন্যসাহায্য নাও করতে পারেন, কিন্তু নিজের ভগ্নীপতি উদয়নকে নিশ্চয়ই সাহায্যদানে অনিচ্ছুক হবেন না।"

"অজাতশত্রুর ভগ্নীপতি?" বাসবদত্তা বিস্মিত হোলো।

যৌগন্ধরায়ণ ঈষৎ কুণ্ঠিতস্বরে বললো, "আমরা মহারাজা অজাতশত্রুর ভগ্নী রাজকুমারী শিলাবতীর (২) সঙ্গে মহারাজা উদয়নের পরিণয়ের কথা ভাবছিলাম।

বাসবদত্তার মুখমণ্ডল পাণ্ডুর হয়ে গেল, অশ্রু দেখা দিলো দুচোখে, তারপর রুদ্ধকণ্ঠে বললো, "মহামাত্র, আপনি তো সব কথাই জানেন। আর্যপুত্র বিবাহ হয় পর দু' বছর মাত্র আমার প্রতি অনুরক্ত ছিলেন, তারপর তো আবার তাঁর পূর্ব প্রণয়িনী বিরচিকার প্রতি তাঁর

আসক্তি ফিরে আসে। তার উপর আমার প্রভাব থাকলে আজ কি আপনাদের রাজার এই দুর্দশা হতে পারতো?" কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো বাসবদত্তা। তারপর বললো, "যাই হোক, বিরচিকার প্রতি আর্যপুত্রের আসক্তি আমি যখন গ্রাহ্য করতে পেরেছি, তখন মগধ রাজকন্যার সঙ্গে তাঁর পরিণয়ে আমার অসম্মতি হওয়ার তো কোনো কারণ নেই। এর ফল যদি বৎসরাজ্যের জন্যে শুভ হয়, তাহলে আমার মন অকুণ্ঠিতভাবে এতে সায় দেবে।"

বাসবদত্তার কথা শুনে, যৌগন্ধরায়ণও বিষণ্ণ মনে চুপ করে রইলো কিছুক্ষণ, একটু পরে বললো, "দেবী, আপনি মহীয়সী নারী, আপনার আপত্তি হবে না আমরা জানতাম। কিন্তু দুটি অসুবিধে আছে।"

"কি অসুবিধে?"

"আমরা মহারাজা উদয়নের কাছে প্রস্তাব উপস্থাপিত করেছিলাম। কিন্তু তিনি ঘোর আপত্তি জানিয়েছেন। তিনি বলছেন, দেবী বাসবদত্তার পাশে অন্য কোনো নারীকে তিনি পত্নীর মর্যাদা দিতে স্বীকৃত নন।"

বাসবদত্তা অধর দংশন করলো। বললো: "আর্যপুত্রের অসীম করুণা।—কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না, বাসবদত্তার চোখের আড়ালে বিরচিকা নামে এক গণিকাকে প্রণয়িনীর সম্মান দিতে তাঁর বিবেকে যদি না বাধে, বাসবদত্তার পাশে আরেকজন রাজকন্যাকে পত্নীর মর্যাদা দিতে তাঁর অসুবিধে কোথায়।"

যৌগন্ধরায়ণ একথার উত্তর দিলো না। মৃদুকণ্ঠে বললো, "দেবী, আরো একটা অসুবিধে আছে।"

"বলুন কি অসুবিধে।"

"মহারাজা উদয়নের পট্টমহিষী বর্তমান বলে মহারাজা অজাতশত্রু তাঁর সঙ্গে ভগ্নীর বিয়ে দেবেন না।"

ক্ষণিক নীরবতার পর বাসবদত্তা জিজ্ঞেস করলো, "আমি প্রাণবিসর্জন দিলে কি এই বিবাহ সহজসাধ্য হবে?"

"প্রাণ বিসর্জন দিতে হবে না দেবী, তবে আপনার সহায়তা পেলে অন্য একটা উপায় হতে পারে।"

যৌগন্ধরায়ণ ধীরে ধীরে তার পরিকল্পনা বললো বাসবদত্তাকে। বাসবদত্তা মাথায় হাত দিয়ে কিছুক্ষণ বসে ভাবলো। তারপর বললো, "বেশ, আমি আপনার প্রস্তাবে স্বীকৃত আছি। আমার মনে কোনো দ্বিধা নেই। আমাদের রাজ্যের মঙ্গল হলেই আমার সুখ। তবে একটা কথা।"

"আদেশ করুন, দেবী।"

"আমার পুত্র রাজকুমার বোধিকে তো কোনো একটা নিরাপদ আশ্রয়ে রাখতে হবে।"

"তাও আমি ভেবে রেখেছি দেবী। ভগ্নগণরাজ্য বৎসরাজ্যের অত্যন্ত অনুগত। রাজকুমার বোধিকে আমরা পাঠিয়ে দেবো ভগ্নগণরাজ্যের রাজধানী সুংসুমারগিরিতে। সে সেখানে নিরাপদেই থাকবে।"

॥ ছয় ॥

মাসাধিককাল পরের কথা।

মগধের রাজধানী রাজগৃহ হতে সন্নিকটে এক তপোবনে সেদিন মধ্যাহ্নকালে কিছু জনসমাগম দেখা গেল, বেশির ভাগই নিকটবর্তী গ্রামাঞ্চলের শ্রমণ, তপস্বী ও অধ্যয়নবত্তি প্রবৃত্ত ব্রাহ্মণবর্ণ।

মহারাজ বিম্বিসার কারারুদ্ধ হওয়ার পর তাঁর প্রিয়তমা পত্নী বিদেহকন্যা দেবী বাসবী কারাগৃহে তাঁর সেবাশুশ্রূষা করছেন। দ্বিতীয়া মহিষী লিচ্ছবিকন্যা দেবী চেল্লনা রাজগৃহের রাজপ্রাসাদেই থেকে গেলেন তাঁর পুত্র অজাতশত্রুর কাছে। সুতরাং বিম্বিসারের অগ্রমহিষী কোশল রাজকন্যা মহাদেবী সুমনা এসে বসবাস করছিলেন এই তপোবনে।

অজাতশত্রুর সহোদরা রাজকন্যা শীলাবতী মহাদেবী সুমনাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতো। সে অবসর পেলেই আশ্রমে এসে কাটিয়ে যেতো কিছুদিন। তারপর শ্রমণ, ব্রাহ্মণদের দানাদি করে ফিরে যেতো রাজধানী রাজগৃহে।

এবারও রাজকন্যা শীলাবতী এসে তপোবনে ছিলো কিছুদিন। কাল সে মহাদেবীর কাছে বিদায় গ্রহণ করে ফিরে যাবে রাজগৃহে। তাই আজ শ্রমণ, ব্রাহ্মণদের দান ও অভিলাষ পূরণ করা হবে এই সংবাদ পেয়ে তপোবনে এসে জড়ো হয়েছে নানা শ্রেণীর প্রার্থী।

শীলাবতীর দর্শন পাওয়ার সময় হয়েছে। রাজভৃত্যবর্গ সম্মিলিত ব্যক্তিবর্গকে রাজকন্যার নির্গমন পথ থেকে সমুৎসারিত করার প্রচেষ্টায় তৎপর। এমন সময় দেখা গেল এক প্রৌঢ় পরিব্রাজক এবং এক যৌবনবতী নারী পদব্রজে সেখানে এসে উপস্থিত হোল। ওরা দৃষ্টি আকর্ষণ করলো সবারই। কারণ কাষায়বস্ত্র পরিহিত পরিব্রাজকের চোখেমুখে ফুটে উঠছে একটা অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব। অন্যান্য ইতরজনের মতো তার ভাবভঙ্গি নয়। তার সঙ্গিনী ঈষৎ অবগুণ্ঠিতা হলেও সে যে পরমাসুন্দরী সেকথা বুঝতে পারছিলো সবাই। সবাই নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলো যে, এঁরা সম্ভ্রান্ত বংশীয় নিশ্চয়ই, সম্ভবত ভাগ্যবিপর্যয়ে কোনো দুরবস্থায় পড়ে এখানে উপনীত হয়ে এসেছে। তারা যে ভিন্ন দেশীয়, তাতে কারো সন্দেহ রইলো না, কারণ সেই নারীর বেশ অবন্তীদেশীয় নারীদের মতো।

অন্য সবাই তাদের লক্ষ্য করছে দেখে এরা দুজন সমাগত ব্যক্তিবর্গের কাছ থেকে কিছুটা দূরে গিয়ে দাঁড়ালো। তারপর অবন্তীর দেশ ভাষায় নিম্নস্বরে নিজেদের মধ্যে ঈষৎ কথোপকথন করলো। কেউ যদি তাদের বাক্যালাপ শুনতে পেতো, কিংবা তাদের ভাষা বুঝতে পারতো তাহলে বিস্মিত হোতো। কারণ সেই পরিব্রাজক তার সঙ্গিনীকে মৃদুস্বরে বলছিলো, "দেবী, আপনি এখানে আমাকে আর মহামাত্র বলে সম্বোধন করবেন না।"

"হ্যাঁ", উত্তর দিলো সেই নারী, "এখানে এই পরিচয়ই দেওয়া হবে যে আপনি আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আর আপনিও আমাকে দেবী বাসবদত্তা বলে সম্বোধন করবেন না। কিন্তু এখানে আমি কি নামে আমার পরিচয় দেবো?"

পরিব্রাজকবেশী যৌগন্ধরায়ণ উত্তর দিলো, "এখানে আপনার নাম হবে আবন্তিকা।"

কিছুক্ষণের মধ্যে সেষণের ঘোষণা শোনা গেল, তারপর দেখা গেল কাঞ্চুকীয় এক আশ্রমের প্রধান তাপসীর সঙ্গে আশ্রমপ্রাঙ্গণে আগমন করছে রাজকন্যা শীলাবতী। বাসবদত্তা এবং যৌগন্ধরায়ণ উভয়েই বিশেষ কৌতূহলে

(২) মহাকবি ভাসের নাটকে আছে মগধরাজের ভগ্নীর নাম পদ্মাবতী। কিন্তু ইতিহাস বলে পদ্মাবতী হোলো অজাতশত্রুর পত্নী, শ্রবন্তী রাজা উদয়ভদ্রের জননী।

সঙ্গে রাজকন্যাকে অবলোকন করতে লাগলো। রাজকন্যা অপরূপ রূপবতী। যৌগন্ধরায়ণ আর বাসবদত্তা মুখ ফিরিয়ে দুজন দুজনের দিকে তাকালো। দুজনের চোখেই অনুমোদনের দৃষ্টি। সমাগত ব্রাহ্মণবর্গ স্বস্তিবচন করলো। শীলাবতী প্রত্যুত্তরে দুটো-চারটি শিষ্টবাক্য উচ্চারণ করলো। তার মধুর কণ্ঠস্বর এবং সুমার্জিত বাচনভঙ্গি মুগ্ধ করলো বাসবদত্তাকে।

রাজকন্যার এক পরিচারিকা এসে দাঁড়িয়েছিলো বাসবদত্তার কাছে। বাসবদত্তা তাকে জিজ্ঞেস করলো, "রাজকন্যা বয়ঃপ্রাপ্তা হয়েছেন, এখনো ওঁর বিবাহ হয় নি কেন?"

পরিচারিকা উত্তর দিলো, "আমাদের রাজকন্যা মহারাজা অজাতশত্রুর অত্যন্ত প্রিয়পাত্রী। এজন্যে তিনি সমমর্যাদা সম্পন্ন রাজকুল ভিন্ন অন্য কোথাও বিবাহ দেবেন না। এতদিন উপযুক্ত পাত্র পাওয়া যায় নি বলেই দেবী শীলাবতীর বিবাহ হয় নি।"

"এঁকে কি এ পর্যন্ত কোনো রাজা বরণ করতে চান নি?" জিজ্ঞেস করলো বাসবদত্তা।

"উজ্জয়িনীস্থিত আমাদের রাজদূতের কাছ থেকে সংবাদ এসেছে যে, অবন্তীরাজ প্রদ্যোত তাঁর পুত্র রাজকুমার পালকের সঙ্গে দেবী শীলাবতীর বিবাহের প্রস্তাব করে দূত পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।"

একথা শুনে বাসবদত্তার মুখ উজ্জ্বল হোলো, কিন্তু ভ্রূকুঞ্চিত করলো যৌগন্ধরায়ণ। মৃদুকণ্ঠে অবন্তীর দেশভাষা বাসবদত্তাকে বললো, "আমাদের প্রভব বিলম্ব করা উচিত হবে না। অবন্তীর দূত আসার আগে তাঁর নিজেরই মগধে উপস্থিত হওয়া প্রয়োজন। তা নইলে আমাদের সমস্ত প্রয়াস নিষ্ফল হবে।"

রাজকন্যা শীলাবতী কাঞ্চুকীয়কে বললো, "এখানে সমাগত ব্রাহ্মণ ও তপস্বিবর্গের সবাই এই তপোবনের এবং নিকটবর্তী গ্রামাঞ্চলের অধিবাসী। এঁদের সকলেই আমার পূর্বপরিচিত। কিন্তু এখানে তিনজন নবাগতকে দেখছি। আপনি তাদের পরিচয় জিজ্ঞেস করুন।"

কাঞ্চুকীয়র প্রশ্নের উত্তরে যৌগন্ধরায়ণ বললো, "আমরা বিদেশী; অবন্তীরাজ্য থেকে আসছি। আমরা তীর্থপর্যটনে বেরিয়েছি। ইনি আমার ভগ্নী আবন্তীকা। ইনি প্রোষিতভর্তৃকা বলে আমার সঙ্গেই আছেন।"

অদূরে দণ্ডায়মান ছিলো কাষায় বেশ পরিহিত এক ব্রহ্মচারী। তার পরিচয় জিজ্ঞেস করলো কাঞ্চুকীয়। সে উত্তর দিলো, "আমি বৎসভূমিতে লাবাণক গ্রামে বেদ অধ্যয়ন করতাম। এখন যাচ্ছি রাজগৃহে। পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে বিশ্রামলাভ করবার জন্যে আজকের দিনের জন্যে এই আশ্রমে আতিথ্য গ্রহণ করেছি।"

বৎস্য দেশের লাবাণক গ্রামের নাম শুনে বাসবদত্তা আর যৌগন্ধরায়ণ পরস্পরের দিকে তাকালো। যৌগন্ধরায়ণ জিজ্ঞেস করলো, "আপনি রাজগৃহে কেন যাচ্ছেন?"

"বেদ অধ্যয়ন সমাপ্ত করতে। লাবাণক গ্রামে অধ্যয়ন করা আর সম্ভব হয় নি।"

"কেন?" জিজ্ঞেস করলো কাঞ্চুকীয়।

"লাবাণক ছিলো শান্তিময় গ্রাম। সেখানে জ্ঞানী অধ্যাপকবৃন্দ বাস করতেন। কিন্তু সাম্প্রতিককালে সেখানকার শান্তিময় পরিবেশ বিনষ্ট হয়েছে। অধ্যাপক এবং পণ্ডিতবর্গ বৎসরাজ্য ত্যাগ করে মগধে চলে আসছেন।"

"বৎসরাজ্যের অরাজকতাই কি এর কারণ?" জিজ্ঞেস করলো যৌগন্ধরায়ণ।

"খানিকটা তাও বটে, তবে একটা বিশেষ কারণ ঘটেছে সম্প্রতি।"

সবাই সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করবার জন্যে ঔৎসুক্য প্রকাশ করবার পর ব্রহ্মচারী বললো, "বৎসরাজ উদয়ন হৃতরাজ্য হয়ে তাঁর সেনাদলের অবশিষ্টদের নিয়ে লাবাণকে এসে স্কন্ধাবার স্থাপনা করেছিলেন। তাঁর সঙ্গে তাঁর পট্টমহিষী দেবী বাসবদত্তা এবং অমাত্যবর্গও ছিলো।"

"হ্যাঁ, বৎসরাজের দুরদৃষ্টের সংবাদ আমরা শুনেছি। বৎসের প্রত্যন্তবিষয় নিবাসী সামন্তরাজ আরুণি রাজধানী কৌশাম্বি সহ বৎসরাজ্যের অধিকাংশ জয় করে নিয়েছেন বলে জানা গেছে।"

"রাজস্কন্ধাবার লাবাণকে স্থাপিত হওয়ার পর গ্রামের শান্তিময় পরিবেশ আর নেই। চারদিকে এই রটনা যে, গামন্তরাজ আরুণি মহারাজা উদয়নের পশ্চাদ্ধাবন করে লাবাণকের দিকে এগিয়ে আসছেন। সেখানে একটা প্রবল যুদ্ধ হবে। এজন্যে গ্রামের অধিবাসিবৃন্দ গ্রাম ত্যাগ করে নিরাপদ অঞ্চলের দিকে সরে যাচ্ছে। আমিও সেজন্যেই চলে এলাম।"

রাজকুমারী শীলাবতী বললো, "অবন্তীরাজদুহিতা দেবী বাসবদত্তার কথা আমরা শুনেছি। তিনি নিরাপদে আছেন তো? যদি লাবাণকে থাকা তাঁর পক্ষে নিরাপদ না হয়, আমরা তাঁকে এবং তাঁর সন্তানকে মগধে আমন্ত্রণ করতে পারি।"

ব্রহ্মচারী বিষণ্ণমুখে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করলো। তারপর ভগ্নকণ্ঠে বললো, "দেবী, আপনি মহানুভব, দয়াময়ী। সেজন্যে আপনি দেবী বাসবদত্তার নিরাপত্তার কথা ভাবলেন। কিন্তু এখন তাঁর নিরাপত্তার কোনো ব্যবস্থা করা আর মানুষের সাধ্যের বাইরে।"

"কেন?" বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলো রাজকন্যা শীলাবতী।

"সে এক অতি মর্মান্তিক কাহিনী। রাজা উদয়ন অত্যন্ত মৃগয়াসক্ত। একদিন রাজা যখন মৃগয়ায় নিষ্ক্রান্ত হলেন, তখন হঠাৎ ব্যাপক গ্রামদাহ ঘটে গেল। দেবী বাসবদত্তা সেই গ্রামদাহে দগ্ধ হয়ে প্রাণ হারালেন। লোকে বলে, রাজার শত্রুপক্ষের কোনো চর এই অগ্নিকাণ্ড সঙ্ঘটন করে রাজাকে নিহত করার প্রচেষ্টা করেছিলো। মৃগয়ায় লিপ্ত থাকার কারণে রাজার প্রাণ রক্ষা পেলো।"

"কিন্তু রাজ্ঞীদেবী তো প্রাণ হারালেন," বললো দেবী শীলাবতী, "সুতরাং এভাবে প্রাণ রক্ষা পাওয়াতে রাজার মনে নিশ্চয়ই কোনো আনন্দ নেই। রাজার দুঃখের কথা চিন্তা করে আমারই হৃদয় সন্তাপিত হচ্ছে। দেবী বাসবদত্তার পুত্র রক্ষা পেয়েছে তো?"

ব্রহ্মচারী উত্তর দিলো, "মহামাত্র যৌগন্ধরায়ণ রাজপুত্র বোধিকে কয়েক দিন আগে বৎসরাজের অনুগত ভর্গগণরাজ্যের রাজধানী সুংসুমারগিরিতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। সুতরাং এ-রকম একটা মর্মান্তিক দুর্ঘটনা থেকে সে বেঁচে গেছে।"

"দুর্ভাগা রাজপুত্র এত অল্প বয়সেই মাতৃহীন হোলো," সখেদে বলে উঠলো শীলাবতী। "আমার মন সেই অবোধ শিশুর জন্যে হাহাকার করছে।"

"দেবী শীলাবতীর মন অত্যন্ত কোমল" ছদ্মবেশী বাসবদত্তা জনান্তিকে বললো যৌগন্ধরায়ণকে।

"হ্যাঁ, এরকম দয়াবতী আমাদের রাজমহিষী হওয়ার উপযুক্তই বটে," যৌগন্ধরায়ণ উত্তর দিলো।

বাসবদত্তা যৌগন্ধরায়ণের অলক্ষ্যে অধর দংশন করলো, আর কোনো মন্তব্য করলো না।

কাঞ্চুকীয় ব্রহ্মচারীকে জিজ্ঞেস করলো, "দেবী বাসবদত্তা যখন অগ্নিদ্বারা বিপন্ন হন, তখন তাঁকে উদ্ধার করার প্রচেষ্টা হয় নি?"

ব্রহ্মচারী উত্তর দিলো, "তাঁকে উদ্ধার করবার চেষ্টা করতে গিয়ে মহামাত্র যৌগন্ধরায়ণ নিজেই সেই অগ্নিদাহে প্রাণ হারালেন।"

একথা শুনে আক্ষেপ করতে লাগলো সবাই। প্রবীণ এবং অতি বিচক্ষণ মন্ত্রীরূপে আর্যাবর্তে যৌগন্ধরায়ণের খ্যাতি ছিলো।

ব্রহ্মচারীর মুখে সমস্ত বিবরণ শুনলো রাজকন্যা শীলাবতী এবং সমাগত অন্যান্য ব্যক্তিরা। রাজা মৃগয়া থেকে প্রত্যাবর্তন করে শোকাকুল হয়ে কিভাবে সেই অগ্নিতেই প্রাণ বিসর্জন করতে চেয়েছিলো, কিভাবে অন্যান্য অমাত্যবর্গ তাঁকে এই ভয়াবহ উদ্যম থেকে নিবৃত্ত করলো, এসব সংবাদ শুনে রোমাঞ্চিত

হয়ে উঠলো অন্যান্য শ্রোতারা। কিভাবে রাজা উদয়ন, বাসবদত্তার জন্যে দিবারাত্র বিলাপ করছে, কিভাব রাজা আহারনিদ্রায় নিরাসক্ত হয়ে শীর্ণকায় হয়ে গেছেন, এসব বর্ণনা শুনে বাসরদত্তা এবং শীলাদেবী উভয়েরই নয়ন অশ্রুসজল হয়ে উঠলো।

যৌগন্ধরায়ণ গদ্‌গদকণ্ঠে বাসবদত্তাকে বললো, "অতো অধীর হবেন না দেবী। কিছুকাল ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করুন। আমাদের আরব্ধ কার্য সুসম্পন্ন হলে এক আনন্দময় পরিবেশে আমরা সবাই পুনর্মিলিত হবো।"

ব্রহ্মচারীর কথা শেষ হোলো। বাসবদত্তার করুণ পরিণতি ও উদয়নের ভাগ্যের কাহিনী শুনে সবাই শোকসন্তাপিতচিত্তে ম্রিয়মাণ হয়ে রইলো কিছুক্ষণ। তারপর কাঞ্চুকীয় রাজকন্যাকে স্মরণ করিয়ে দিলো যে মধ্যাহ্ন কাল নিকটপ্রায়। শীলাবতী তখন বললো, "আর্য, আমি অভিপ্রেত প্রদান করার জন্যে শ্রমণ, ব্রাহ্মণ তপস্বিবর্গকে এখানে আমন্ত্রণ করেছি। আপনি ওঁদের জিজ্ঞেস করুন ওঁরা কে কি প্রার্থনা করে আমায় অনুগৃহীত করবেন।"

রাজকন্যার নির্দেশে কাঞ্চুকীয় উচ্চকণ্ঠে সবাইকে জানালো, রাজকন্যা সমবেত ব্যক্তিবর্গকে তাঁদের অভিপ্রেত দান করতে চান।

তখন কেউ চেয়ে নিলে কন্যা, কেউ বা চাইলো বস্ত্র। বিদ্যাভ্যাসের শেষে গুরুকে দান করবার জন্যে কেউ কেউ চেয়ে নিলো গোধন, ভূমি, সুবর্ণ। সবার শেষে এগিয়ে এলো পরিব্রাজকবেশী যৌগন্ধরায়ণ।

"আপনার কোন্ অভিপ্রায় পূর্ণ করতে পারি?" নিজেই জিজ্ঞেস করলো শীলাবতী।

যৌগন্ধরায়ণ বললো, "দেবী, আমি কাষায়-বস্ত্রধারী পূর্ণার্থী পরিব্রাজক। আমার ধনরত্ন বস্ত্র, কিছুরই প্রয়োজন নেই। আমি এখান থেকে দুর্গম অঞ্চলে তীর্থযাত্রা করছি। আমার এই প্রার্থনা যে, যতদিন আমি না ফিরি ততদিন আপনি আমার এই প্রোষিতভর্তৃকা ভগ্নীকে আপনার আশ্রয়ে রেখে পালন করুন এবং তাঁর চরিত্ররক্ষা করুন।"

এই প্রার্থনা শুনে কাঞ্চুকীয় দ্বিধাগ্রস্ত হোলো, কিন্তু দেবী শীলাবতী কোনো দ্বিধা না দেখিয়েই স্বীকৃত হোলো। বললো, "এঁকে দেখে মনে হচ্ছে, ইনি সম্ভ্রান্ত বংশজাতা। এঁর সঙ্গলাভে আমি পরিতুষ্ট হবো, আমি এঁর ভার গ্রহণ করলাম। এখন থেকে ইনি আমার সঙ্গে সঙ্গেই থাকবেন।"

যৌগন্ধরায়ণ সেখানে আর অপেক্ষা করলো না। রাজকন্যা শীলাবতীর অনুমতি নিয়ে সেদিনই আশ্রম ত্যাগ করে চলে গেল।

॥ সাত ॥

বৎসরাজ্যের মহামাত্র যৌগন্ধরায়ণ যা পরিকল্পনা করেছিলো, তাই হোলো। প্রত্যন্তনৃপতি আরুণি রাজা উদয়নের পশ্চাদ্ধাবন করে সীমান্ত সংলগ্ন বিষয়সমূহ অধিকার করবার পর উদয়ন কয়েকজন অনুচরের সঙ্গে সীমান্ত অতিক্রম করে মগধরাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করলো। সৈন্যসামন্ত অন্য রাজার রাজ্যে নিয়ে যাওয়া যায় না, সেজন্যে সেনানায়ক রুমণ্বান বৎসরাজের সেনাদলের অবশিষ্টাংশ নিয়ে চলে গেল দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে। সেসব অঞ্চলে বৎসরাজ উদয়নের অনুগত কয়েকজন আটবিক সামন্ত ছিলো। রুমণ্বান সেদিকে তাদের সহায়তায় সেনাবাহিনী পুনর্গঠিত করে আরুণির সেনাবাহিনীকে পশ্চাত দিক থেকে আক্রমণ করে বিপর্যস্ত করার প্রচেষ্টায় তৎপর হোলো।

মগধরাজ অজাতশত্রু উদয়নকে অতি সমাদরে নিজের রাজ্যে আশ্রয় দিলো। মগধ রাজ্যের অমাত্য বশ্যকারের নিয়োজিত অবন্তী ও কোশলরাজ্যস্থিত উদাস্থিত কাপটিক-ছাত্র, বৈদেহক, গৃহপতিক প্রভৃতি নানা শ্রেণীর গূঢ়পুরুষবর্গ ইতিমধ্যে রাজগৃহে সংবাদ প্রেরণ করেছিলো যে, কোশলরাজ প্রসেনজিৎ গোপনে অর্থসাহায্য করছে আরুণিকে। অজাতশত্রু গৌতমবুদ্ধের অনিষ্টপ্রয়াসী আত্মীয় দেবদত্তের পরামর্শনিয়ন্ত্রিত বলে বৌদ্ধসঙ্ঘ মহারাজ প্রসেনজিতের মগধবিরোধী গূঢ়নীতির অনুমোদন করে পরোক্ষভাবে এবং সেই কারণে অনাথপিণ্ডদ প্রমুখ কোশলরাজধানী শ্রাবস্তির ধনবান শ্রেষ্ঠিবৃন্দ অকাতরে প্রচুর স্বর্ণ ও অর্থ ঋণ দিচ্ছে উদয়নের শত্রু আরুণিকে যাতে প্রত্যন্তনৃপতি আরুণি মগধসীমান্তে উত্তেজনা ও সংকট সৃষ্টি করে অজাতশত্রুকে সেদিকে অভিনিবিষ্ট করে রাখতে পারে। বৃজিসংঘের নেতা লিচ্ছবি গণরাজ্যের রাষ্ট্রপ্রধান চেটকও আরুণির সঙ্গে মিত্রতা সম্পর্ক স্থাপন করবার বাসনায় গোপনে দূত প্রেরণ করেছে অবন্তীর রাজধানী কৌশাম্বি নগরে।

এসব কারণে অজাতশত্রুও উদয়নকে সাহায্য করা প্রয়োজন মনে করলো। রাজাকে তদনুরূপ পরামর্শ দিলো দেবদত্ত, বশ্যকার এবং অন্যান্য অমাত্যবর্গ। সুতরাং উদয়ন যখন দূত প্রেরণ করে অজাতশত্রুর কাছে সৈন্য সাহায্য প্রার্থনা করলো, অজাতশত্রুও অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে রাজধানী রাজগৃহে আমন্ত্রণ করলো উদয়নকে। সাম্প্রতিক নানা বিপর্যয়, বিশেষ করে উদয়নের পট্টমহিষী বাসবদত্তার গ্রামদাহে মৃত্যুর সংবাদ রাজগৃহে সবাই জানতো। সবারই সহানুভূতি উদয়নের জন্য। তার বিষণ্ণ অথচ সংযত ব্যক্তিত্ব হৃদয়স্পর্শ করলো সবারই, বিশেষ করে রাজা অজাতশত্রুর। রাজা প্রসেনজিৎ অজাতশত্রুর ভগ্নী শীলাবতীকে চেয়েছিলেন নিজের পুত্র রাজকুমার বিদূদভের জন্যে। কিন্তু শাক্যবংশীয় দেবদত্ত অজাতশত্রুকে জানিয়েছিলো বিদূদভের জননী শাক্যবংশী পিতার সন্তান হলেও তার মাতা ছিলো নিম্নজাতিয়া দাসী। সুতরাং অজাতশত্রু কোশলরাজপুত্রের সঙ্গে ভগ্নীর বিবাহ দিতে ইতস্তত করছিলো। দেবদত্ত এবং বশ্যকার এখন অজাতশত্রুকে বোঝালো যে, মহারাজ উদয়ন রূপবান এবং বিদ্বান। বৎসরাজবংশের মর্যাদা মগধরাজবংশ অপেক্ষা ন্যূন নয়। তার উপর বৎসরাজবংশ মগধ রাজবংশের তুলনায় অতি প্রাচীন। মহারাজ উদয়ন হলেন কুরুবংশজাত পাণ্ডববংশধর মহারাজ জনমেঞ্জয়ের চতুর্বিংশতি অধস্তন উত্তরপুরুষ। সুতরাং মগধরাজ অজাতশত্রু বৎসরাজ উদয়নের অভিজন-বিজ্ঞান-বয়ঃ পুরু-রূপ পর্যালোচনা করে তার সঙ্গে নিজের সহোদরা রাজকুমারী শীলাবতীর বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করলো। উদয়ন আপন অমাত্যদের সঙ্গে পরামর্শ করে এই প্রস্তাবে স্বীকৃত হোলো। কিছুদিনের মধ্যে সাড়ম্বরে আনন্দ উৎসব সমারোহের সঙ্গে বৎসরাজ উদয়নের সঙ্গে মগধ রাজকন্যা শীলাবতীর শুভপরিণয় সুসম্পন্ন হোলো। কেউ জানলো না যে, রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তর-চতুঃশালের বিবাহমণ্ডপের সন্নিকটস্থ কৌতুকগৃহের অন্তরাল থেকে নীরবে সাশ্রু নয়নে এই উৎসব পর্যবেক্ষণ করলো আবন্তী কাষেশধারিণী বাসবদত্তা। এমন কি, বিবাহ অনুষ্ঠানের কৌতুকমালাটিও গ্রন্থন করে দিয়েছিলো সে নিজেই।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে একদিন নব দম্পতির প্রণয়রজনী যাপনের আয়োজন করা হয়েছিলো রাজপ্রাসাদের সমুদ্রগৃহে। পদ্ম-কুমুদ প্রমুখ নানাবিধ জলজ পুষ্পসুশোভিত স্বচ্ছ সরোবরের মধ্যে নির্মিত এই প্রমোদভবন গন্ধসমন্বিত নানা বিচিত্র পুষ্পমালায় সুসজ্জিত করা হোলো উদয়ন ও শীলাবতীর তথ্যিবিধানের জন্যে।

সরোবরের ওপারে প্রমোদবন। সেখানে

মাধবীমণ্ডপে একলা বসেছিলো বাসবদত্তা। রাজকন্যা শীলাবতী বাসবদত্তাকে অত্যন্ত স্নেহ ও শ্রদ্ধা করতো, তাকে সে নিজের সখির স্থান দিয়েছিলো। সে কয়েকবার সখির সঙ্গে স্বামীর পরিচয় করিয়ে দিতে চেয়েছিলো। কিন্তু বাসবদত্তা বলেছিলো,—আমি প্রোষিতভর্তৃকা, সে জন্যে আমি পরপুরুষের সমক্ষে কখনো উপস্থিত থাকি না। বাসবদত্তা অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে অন্তরালে থাকতো যাতে উদয়নের সম্মুখে পতিত হওয়ার কোনো সম্ভাবনা না থাকে। সেদিন রাজকন্যা শীলাবতী ও উদয়ন সন্ধ্যাগৃহে আসবে রাত্রির প্রথম যামেনা এজন্যে বাসবদত্তা নিশ্চিন্ত মনে বসেছিলো প্রমোদবনের মাধবীমণ্ডপে। এই অজ্ঞাতবাস তার অসহনীয় মনে হচ্ছে। পতির বিরহেই এভাবে দিন কাটানো দুষ্কর, এর উপর যখন চোখের সামনে দেখতে হোলো অন্য নারীর সঙ্গে নবদাম্পত্য উপভোগ করছে তার প্রাণাধিক স্বামী, একেবারে দুঃসহ হয়ে উঠলো তার মনের কষ্ট। কিন্তু মনের কষ্ট মনে চেপে নির্জনে অশ্রুপাত করে দিন অতিবাহিত করতে হোলো বাসবদত্তাকে। ব্যক্তিগত সুখস্বার্থের উপরে পট্টমহিষীর দায়িত্ব। হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করতে হবে, সিংহাসনে পুনর্বাসিত করে সুখী করতে হবে স্বামীকে। রাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারী তার সন্তান রাজকুমার বোধি, তার ভবিষ্যতের কথা ভাবতে হবে। সুতরাং বাসবদত্তার মনের কোনো অভিযোগ নেই। সে তার কর্তব্য করে যাচ্ছে মহামাত্র যৌগন্ধরায়ণের নির্দেশে, সুদিন ফিরে এলে সব কষ্টের অবসান হবে,—মহামাত্রের এই আশ্বাসের উপর নির্ভর করে আছে বাসবদত্তা।

সেদিন সন্ধ্যায়ও মাধবীমণ্ডপে বসে বাসবদত্তা এসব নানাকথা চিন্তা করছিলো, এমন সময় পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনে সে সচকিত হোলো। ঈষৎ অন্ধকারে দেখতে পেলো দুজন পুরুষ এগিয়ে আসছে মাধবীমণ্ডপের দিকে। দুটি কণ্ঠস্বরই তার চেনা, একজন মহারাজ উদয়ন, অন্য জন তার বয়স্য বসন্তক। আর্যপুত্র এ সময় এখানে কেন,—একথা ভাবতে ভাবতে বাসবদত্তা সচকিত হয়ে দ্রুত আত্মগোপন করলো ঘনলতাবিতানের অন্তরালে।

উদয়ন আর বসন্তক কথা বলতে বলতে শিলাপট্টের উপর এসে উপবিষ্ট হোলো।

বসন্তক বলছিলো, "মহারাজ, আপনার কষ্ট আমি অনুভব করতে পারছি।"

"কি রকম?" জিজ্ঞেস করলো উদয়ন।

"মহারাজ, দীর্ঘকাল কষ্টভোগের পর এখন আবার সুখভোগ করছি। আর শত্রুতাড়িত হওয়ার দুশ্চিন্তা নেই, একস্থান থেকে অন্য স্থানে বিতাড়িত হওয়ার আশঙ্কা নেই। এখন আবার নগরজীবনের স্বাচ্ছন্দ্য উপভোগ করছি, রাজপ্রাসাদের ভোগবিলাসে অংশ গ্রহণ করছি, নানাবিধ অন্নব্যঞ্জন মোদক ও অন্যান্য সুমিষ্ট, খণ্ডখাদ্যে রসনা পরিতৃপ্ত করছি। অনর্থসলিলাবর্ত থেকে উদ্ধার পেয়ে আবার স্বর্গসুখ অনুভব করছি, কিন্তু আর্যপুত্র, সুখ কোনোদিন পরিপূর্ণ হয় না। এখানে আসবার পর থেকেই আমি উদরাময়ে রোগাক্রান্ত হয়ে আছি। আপনার অবস্থাও তথৈবচ।"

"না বসন্তক", প্রতিবাদ করলো উদয়ন। "আমার কোনো রোগ নেই। আমি সম্পূর্ণ সুস্থই আছি।"

"আর্যপুত্র, আপনি একেবারেই সুস্থ নন। ভোজনে আপনারও অরুচি আমি লক্ষ্য করেছি। আপনার আর আমার মধ্যে বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই। শুধু আমার রোগ উদরের আর আপনার রোগ হৃদয়ের।"

কিছুক্ষণ নীরব রইলো রাজা উদয়ন। তারপর বললো, "বসন্তক, তুমি ঠিকই বলেছো। আমি শত্রুভয় থেকে মুক্তি পেয়েছি। অজাতশত্রু আমাকে সৈন্য সাহায্য করবেন বলে স্বীকৃত হয়েছেন, বৎসরাজ্যের দক্ষিণাঞ্চল থেকে যা সংবাদ আসছে, তাতে মনে হচ্ছে আমাদের বন্ধু রুমণ্বানও খুব সাফল্যের সঙ্গে আরুণির সৈন্যবাহিনীর পশ্চাৎভাগের উপর পুনরাক্রমণ আরম্ভ করেছে। আমাদের রাজ্য পুনরুদ্ধার হওয়ার আশা ফলবতী হতে বেশি বিলম্ব নেই। এখানে আমি সম্মান, স্নেহ, মর্যাদা, স্বাচ্ছন্দ্য সবই পাচ্ছি। তার উপর পেয়েছি মনোরমা রূপবতী ভার্যা। কিন্তু বসন্তক, আমার মনেও সুখ নেই। নব পরিণয়ের পর আমি মদনাগ্নিদগ্ধ হয়ে আছি কিন্তু নব-প্রণয়ের মাধুর্য উপভোগ করতে পারছি না।"

"আর্যপুত্র," বললো বসন্তক। "আপনার অবস্থা যে আমারই মতো তাতে সন্দেহ নেই। আপনার হৃদয়ের উদরাময় হয়েছে।"

উদয়ন ম্লান হাসি হাসলো বসন্তকের পরিহাসবাক্য শুনে, তারপর আবার বিষণ্ণ কণ্ঠে বলে গেল, "দেবী শীলাবতী রূপে-গুণে চরিত্র-মাধুর্যে বাসবদত্তার প্রায় সমকক্ষ, তবু আমার হৃদয়হরণ করতে পারে নি। আমার মন বাসবদত্তার স্মৃতিতে আচ্ছন্ন হয়ে আছে।"

লতাবিতানের অন্তরালে একথা শুনতে পেলো বাসবদত্তা। তার চোখ দুটি সজল হয়ে উঠলো, হৃদয় ভরে গেল এক অনির্বচনীয় মাধুর্যে। এতদিনের এত কষ্ট যেন এক নিমেষে অপসারিত হোলো।

উদয়ন বলছিলো, "বাসবদত্তার কথা প্রায় বিস্মৃত হয়েছিলাম। কিন্তু সেদিন শীলাবতী হঠাৎ বললো, সে আমার কাছে বীণা শিখবে। আমার সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়লো বাসবদত্তাকে। তাকে খুব যত্ন করে বীণা শিখিয়েছিলাম। আরো মনে পড়লো, উদয়াচলে বসুনেমি আমাকে যে শিখিয়েছিলো অম্লানমালা গ্রন্থন করবার কৌশল, তাও শিখিয়েছিলাম বাসবদত্তাকে। আজকের মতো কতো পূর্ণিমার স্মৃতি আজ মনে ভেসে উঠছে। সে অম্লানমালা গ্রন্থন করে আর্যপুত্র কোথায়, আর্যপুত্র কোথায় বলে আমাকে খুঁজে বেড়াতো।"

গবেষণা-লব্ধ নব আবিষ্কৃত ঔষধ ব্যবহারে

ধবল বা শ্বেত, অসাড়, গলিত,

ব্যাতরক্ত প্রভৃতি রোগ দ্রুত নিরোধ ও স্থায়ী নিশ্চিহ্ন করুন

শরীরের যে কোন স্থানের শ্বেত দাগ, উচ্চবর্ণের অসাড়যুক্ত দাগ, ফুলা, আঙুলের বক্রতা, একজিমা, সোরাইসিস ও দূষিত ক্ষত নিরাময়ে আরোগ্যের জন্য বিস্ময়কর সেবনীয় ও বাহ্য ঔষধ ব্যবহার করুন। সাক্ষাতে অথবা পত্রে ব্যবস্থা লউন।

হাওড়া কুষ্ঠ কুটীর

প্রতিষ্ঠাতা—পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্মা, কবিরাজ।
৩নং মাধব ঘোষ লেন, খুরুট, হাওড়া। (ফোন ৬৭-২৩৫৯)
শাখা—৩৬নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৯ (পূরবী সিনেমার পাশে)।

বাসবদত্তা চোখের সামনের লতাজাল একটু-খানি সরিয়ে চোখ ভরে দেখতে লাগলো উদয়নকে।

বসন্তক বললো, "একই রকম কথা আমার মনে পড়ছে আর্যপুত্র দেবী বাসবদত্তাকে আমিও ভুলতে পারছি না। আজকের মতো তিথিদিবসে দেবী নানাবিধ সুসি খণ্ডখাদ্যে থালা সাজিয়ে আর্য বসন্তক কোথায়, আর্য বসন্তক কোথায় বলে আমাকে খুঁজে বেড়াতেন।"

কৌশাম্বির পুরোনো স্মৃতি মনে পড়তে বাসবদত্তার দুটি চোখ আবার জলে ভরে উঠলো। কিন্তু বসন্তকের কথার ভঙ্গি শুনে সে হাসি চাপতে পারলো না।

অন্ধকারের মধ্যে একটা মৃদু হাসি ভেসে এলো উদয়ন ও বসন্তকের কানে।

"কে ওখানে?" বলে উঠলো উদয়ন।

বসন্তক উঠে গিয়ে লতাপাতা সরিয়ে গাছের এ-পাশে ও-পাশে গুল্মের পেছনে লতামণ্ডপের অন্ধকারে উঁকি মেরে দেখলো। উদয়নও খুঁজলো এধার-ওধার। কাউকে দেখতে পেলো না।

"হয়তো প্রাসাদের কোনো পরিচারিকা," বললো বসন্তক।

উদয়ন উত্তর দিলো, "না, হতে পারে না, এরকম সময় মহাদেবী পদ্মাবতী কিংবা শীলাবতীকে ছেড়ে কোনো পরিচারিকা এখানে আসবে না। এলেও অন্তরাল থেকে আমাদের বাক্যালাপ শুনে হেসে ওঠার মতো প্রগলভতা প্রকাশ করবে না। আমি মগধরাজবংশের জামাতা হলেও নিজেও একজন চক্রবর্তী রাজা। মহারাজ অজাতশত্রু প্রাসাদের সবাইকে এই নির্দেশ দিয়েছে যে, মগধরাজের সমতুল্য সম্মান আমাকেও দেওয়া হবে সবসময়। প্রাসাদের কোনো পরিচারিকার এত স্পর্ধা নেই যে, আমাকে পরিহাস করবে।" কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলে উদয়ন, তারপর বললো, "বসন্তক—!"

"বলুন আর্যপুত্র—।"

"এরকমভাবে হেসে উঠতো শুধু একজন।"

"কে আর্যপুত্র?"

"দেবী বাসবদত্তা," ধীর কণ্ঠে বললো উদয়ন।

বসন্তক মুহূর্তের জন্যে চকিত হোলো, তারপর সেতার সামলে বিস্ময় প্রকাশ করে বললো, "সে কি আর্যপুত্র?"

"হ্যাঁ, আমি নিশ্চিতভাবে জানি, এ বাসবদত্তার হাসি, আর কারো নয়।"

"কিন্তু দেবী বাসবদত্তার হাসি এখানে শোনা যাবে কি করে? উনি তো স্বর্গারোহণ করেছেন অনেকদিন।"

"বাসবদত্তার হাসি আমি চিনি বসন্তক। এ নিশ্চয় তার হাসি।"

বসন্তক চঞ্চল হয়ে বলে উঠলো, "না আর্যপুত্র। কেউ হাসে নি। কারো হাসি আমরা শুনি নি। এ আমাদের মনের ভুল। আমরা সব সময় দেবী বাসবদত্তার কথা চিন্তা করছি। তাতেই এই ভ্রমের সৃষ্টি হয়েছে।"

"না বসন্তক, এ আমাদের কল্পনা নয়। আমরা সত্যিই একটা হাসি শুনেছি। সে হাসি ঠিক বাসবদত্তার হাসির মতো।"

"আমি কারো হাসি শুনি নি আর্যপুত্র," বসন্তক তাড়াতাড়ি নিজের উপবীত ধারণ করে বললো, "যদি শুনে থাকি, সেটা কোনো মানবীর হাসি নয়। আমি শুনেছি অবন্তীসুন্দরী নামে এক যক্ষিণী এই প্রাসাদ পরিবেষ্টনীতে বিরাজ করে। তাকে চাক্ষুষ দেখা না গেলেও তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কারো মনে কোনো দ্বিধা নেই। নিশ্চয়ই সে হেসেছে। নিশ্চয়ই আপনি তার হাসি শুনতে পেয়েছেন।" বলতে বলতে বসন্তকের কণ্ঠস্বর কাঁপতে সুরু করলো, "আর্যপুত্র, এই অবন্তীসুন্দরী কুহকিনী বলে সবার ধারণা। আপনি শীঘ্র চলুন এখান থেকে। নিশাকালে কেউ একাকী এই প্রমোদবনে আসে না। চলুন, আর্যপুত্র, আমরা অবিলম্বে, এই মুহূর্তে এ স্থান ত্যাগ করি।"

বসন্তক উদয়নের উত্তরের জন্যে আর অপেক্ষা করলো না। দ্রুত অপসরণ করলো সেখান থেকে। উদয়নও অনন্যোপায় হয়ে তার অনুসরণ করলো।

বাসবদত্তা হেসে উঠেই তাড়াতাড়ি নিজের মুখে হাত চাপা দিয়ে লতাবিতানের পেছন দিকে আরো গভীর অন্ধকারে সরে গিয়েছিলো। মহারাজ উদয়ন আর বসন্তক সেখানে থেকে চলে যাওয়ার পর সন্তর্পণে ধীরে ধীরে বেরিয়ে এলো। সেও ভাবছিলো প্রমোদবন থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে প্রাসাদের অভিমুখে যাবে কি না, এমন সময় শুনতে পেলো দুটি নারীকণ্ঠ। তাকিয়ে দেখলো অন্য দিক থেকে এগিয়ে আসছে প্রাসাদের দুজন পরিচারিকা। ওরা সন্নিকটে আসতে শুনতে পেলো একজন বলছে, "কোথায় গেলেন তিনি? কুররিকা বলছিলো, সে তাঁকে এখানে প্রমোদবনে একলা বিচরণ করতে দেখেছে কিছুক্ষণ আগে।"

অন্যজন উচ্চতর কণ্ঠে ডাকলো, "আর্যা আবন্তীকা,—আর্যা আবন্তীকা, কোথায় আপনি?"

বাসবদত্তা এগিয়ে গেল তাদের দিকে। উত্তর দিলো, "এই যে, আমি এখানে, আমার খোঁজ করছো কেন, পদ্মিনিকা?"

পদ্মিনিকা বললো, "আর্যা, আমাদের ভট্টিনী আপনাকে স্মরণ করেছেন।"

তাকে স্মরণ করেছে অজাতশত্রুর পট্টমহিষী মহাদেবী পদ্মাবতী? কেন?—বাসবদত্তা ভাবলো, রাজপরিবারের কেউ কোনো ব্যক্তিকে ডেকে পাঠালে কারণ জিজ্ঞেস করা শিষ্টাচারসম্মত নয়। বাসবদত্তা বললো, "চলো যাচ্ছি।"

পদ্মিনিকা তার সঙ্গিনীকে বললো, "মধুকরিকা, তুমি আর্যাকে নিয়ে ভট্টিনীর কাছে যাও। আমি ভর্তৃদারিকার জন্যে শীর্ষানুলেপন নিয়ে আসছি।"

শীর্ষানুলেপন? রাজপুত্রী শীলাবতীর জন্যে? বিস্মিত হোলো বাসবদত্তা। জিজ্ঞেস করলো, "দেবী শীলাবতীর কি হয়েছে? তিনি কি অসুস্থ?"

"হ্যাঁ", উত্তর দিলো মধুকরিকা, "তিনি শীর্ষবেদনায় কাতর হয়ে আছেন।"

মধুকরিকার সঙ্গে মহাদেবী পদ্মাবতীর কাছে উপস্থিত হোলো বাসবদত্তা। দেখলো পদ্মাবতী উদ্বিগ্ন হয়ে আছে। সে তার ননন্দা শীলাবতীকে অত্যন্ত স্নেহ করতো। আজ এমন এক মধুর পূর্ণিমানিশীথে সমুদ্রগৃহে প্রণয়রজনী অতিবাহিত করার প্রাক্কালে শীলাবতীর অসুস্থতায় বিমর্ষ হয়ে পড়েছে মহাদেবী পদ্মাবতী। বাসবদত্তা উপস্থিত হতেই বললো, "আর্যা আবন্তীকা, শীর্ষবেদনায় অবসন্ন হয়ে আছে দেবী শীলাবতী। শীর্ষাভিঘাতৌষধ প্রয়োগ করেও তার কষ্ট লাঘব করা গেল না। পদ্মিনিকাকে বলেছি যে, শীলাবতীর ললাটদেশে শীর্ষানুলেপন মর্দন করে দেবে। কিন্তু তাতেও বিশেষ কোনো ফল হবে বলে আমার মনে হচ্ছে না। সুতরাং আপনার সহায়তা ভিন্ন গত্যন্তর নেই।"

"আমি কি করতে পারি, মহাদেবী।" বাসবদত্তা সবিনয়ে বললো।

"আর্যা আবন্তীকা, আপনি বীণাবাদনে সুপটু। আপনি অনেকবার বীণা বাজিয়ে আমার

এবং শীলাবতীর অসুস্থতা দূর করেছেন। আমার অনুরোধ আজ আপনি কিছুক্ষণ বীণা বাজিয়ে শোনালে শীলাবতীর কষ্ট দূর হবে। আজ এই পূর্ণিমারাতে সমুদ্রগৃহে তাদের প্রথম প্রণয়রজনী যেন ব্যর্থ না হয়।"

বাসবদত্তা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস চাপলো। জিজ্ঞেস করলো, "দেবী শীলাবতী এখন কোথায়?"

"এখন সে আমার শয়নগৃহে আছে। আমি তাকে বসনভূষণে সুসজ্জিত করে সমুদ্রগৃহে পাঠিয়ে দিচ্ছি। আপনি আপনার বীণা নিয়ে সেখানে উপস্থিত হলে ভালো হয়।"

বাসবদত্তা একটু ইতস্তত করে বললো, "কিন্তু সেখানে বৎসরাজও থাকবেন। আমি তো পরপুরুষের সামনে উপস্থিত হতে পারি না।"

"আমি কাঞ্চুকীয়কে নির্দেশ দেবো।" মহাদেবী পদ্মাবতী বাসবদত্তাকে আশ্বাস দিয়ে বললো, "মহারাজ উদয়নকে যেন সমুদ্রগৃহে নিয়ে যাওয়া হয় দ্বিদণ্ডকাল পরে।"

প্রাসাদের অন্যপ্রান্তে বাসবদত্তার শয়নগৃহে সে সেখানে গেল নিজের বীণাটি আনতে। বীণা নিয়ে প্রাসাদ ত্যাগ করে প্রমোদবন অতিক্রম করে দীর্ঘিকার উপরিস্থিত সেতু অতিক্রম করে উপনীত হোলো সমুদ্রগৃহে।

সমুদ্রগৃহ একেবারে নিস্তব্ধ। চারিদিক অন্ধকার। শুধু দূরে এককোণে একটিমাত্র প্রদীপ জ্বলছে। গৃহের অভ্যন্তরে গাঢ় ছায়া। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না কিছুই। চারদিক গন্ধপুষ্পে সুসজ্জিত। প্রজ্বলিত অগুরু ধূপের সৌরভে চারদিক আমোদিত হয়ে আছে।

শীলাদেবী কি এরই মধ্যে এখানে এসে গেছেন?—বাসবদত্তা ভাবলো। চারদিক লক্ষ্য করলো ভালো করে। দেখতে পেলো কক্ষের অন্যপ্রান্তে একজন শুয়ে আছে শয্যার উপরে। আর কেউ নেই কক্ষের ভিতর। বাসবদত্তা ভাবলো, পরিচারিকারা নিশ্চয়ই শীলাদেবীকে এখানে শায়িত রেখে চলে গেছে।

ভারী নিঃশ্বাসের শব্দ কানে এলো। বাসবদত্তার মনে হোলো শীলাদেবী নিশ্চয়ই নিদ্রাভিভূত কিংবা তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। ভাবলো, ডেকে আর কথা বলবে না, কিছুক্ষণ বীণায় আলাপ করে কোনো সুললিত রাগিণী। সে পল্যঙ্কের কাছাকাছি উপবেশন করলো প্রবালকুট্টিমের উপর। তারপর বীণা কোলে তুলে নিয়ে পূর্ণিমারজনীর উপযোগী এক মধুর রাগিণীতে আলাপ ধরলো।

প্রায় দ্বিদণ্ডকাল বীণা বাজালো বাসবদত্তা তারপর একসময় যখন থামলো, মনে হোলো পল্যঙ্কের উপর রাজকন্যা যেন গভীর নিদ্রায় অচেতন হয়ে আছে।

বাসবদত্তা ভাবলো, মহারাজ উদয়নের আসবার সময় হয়ে আসছে, আমি এখন চলে যাই এখান থেকে। বীণা রেখে সে উঠে দাঁড়ালো। নিঃশব্দ পদক্ষেপে এগিয়ে গেল শয্যার দিকে।

বুকে পড়ে একটুখানি দেখলো সেই ছায়াবৃত শয্যার উপর। মন্থর নিঃশ্বাসের শব্দ কানে এলো।

বাসবদত্তা ভাবলো, রাজকন্যার মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দিই। তাতে হয়তো সে ঈষৎ তৃপ্তি লাভ করতে পারে।

শয্যার একপাশে উপবেশন করলো বাসবদত্তা। অতি ধীরে, অতি সাবধানে হাত বাড়িয়ে ললাট স্পর্শ করলো। আর সঙ্গে সঙ্গে একটি বলিষ্ঠ উষ্ণ হাত তার হাত চেপে ধরলো।

অতি পরিচিত হাত। চমকে উঠলো বাসবদত্তা।

"দেবী!—" সম্বোধন করলো উদয়নের তন্দ্রাবিজড়িত কণ্ঠ,—"বাসবদত্তা!"

হঠাৎ কেঁপে উঠলো বাসবদত্তার বুক। সে চকিতে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে উঠে পড়লো।"

"তুমি যেও না বাসবদত্তা।" স্বপ্নাবিষ্ট কণ্ঠে বলে উঠলো মহারাজ উদয়ন। "স্বপ্নে ছাড়া আর অন্য কোনো উপায়ে তোমার সঙ্গে আমার পুনর্মিলন সম্ভব নয়। জীবনে যতো দুঃখই পাই, স্বপ্নে যেন বিচ্ছেদের বেদনা আমাকে অনুভব করতে না হয়।"

কিন্তু বাসবদত্তা তার অপেক্ষা করলো না। দূরে পদশব্দ শোনা যাচ্ছে প্রমোদবনের ওদিকে। কেউ হয়তো আসছে সমুদ্রগৃহের উদ্দেশে, বাসবদত্তা দ্রুত বীণা তুলে নিয়ে সমুদ্রগৃহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে মিশে গেল বাইরের অন্ধকারে।

একটু পরে সেখানে এলো বসন্তক। শুনতে পেলো উদয়নের কণ্ঠস্বর। বারবার বাসবদত্তার নাম ধরে ডেকে উঠছে উদয়ন।

"মহারাজ, আপনি এখানে?" বসন্তক বলে উঠলো, "প্রাসাদে সবাই আপনাকে অন্বেষণ করছে। ভোজনগৃহে সমাগত হওয়ার সময় হয়েছে। মহাদেবী পদ্মাবতী পরিচারিকাদের নির্দেশ দিয়েছেন, আপনাকে যেন নানাবিধ আহার্যে পরিতৃপ্ত করে সুগন্ধ সুবাসিত বসনে ও গন্ধমাল্যে সজ্জিত করে দ্বিদণ্ডাধিককাল পরে এখানে নিয়ে আসা হয়। সেই অবধি সবাই আপনাকে অন্বেষণ করছে, কিন্তু আপনার সন্ধান পাচ্ছে না।"

"বসন্তক।" বললো উদয়ন, "একটা সুসংবাদ শোনো। বাসবদত্তার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে।"

"কোথায়?" সবিস্ময়ে জিজ্ঞেস করলো বসন্তক।

"এখানে। বাসবদত্তা এসে আমার বীণা বাজিয়ে শুনিয়েছে। আমার শয্যার পাশে এসে বসেছে। আমি তার হাত ধরেছি। কিন্তু সে রইলো না, সে চলে গেল।"

"আপনি স্বপ্ন দেখছিলেন আর্যপুত্র।" শঙ্কিতকণ্ঠে বলে উঠলো বসন্তক।

"না, না, স্বপ্ন নয়। আমি ঠিক জানি, সে বাসবদত্তা। যেই রাগিণীর আলাপ সে করছিলো, সে যে আমারই শেখানো।"

"কিন্তু আর্যপুত্র, আমি আসবার সময় তো কাউকে দেখতে পেলাম না। এখান থেকে কেউ চলে যাওয়ার সময় তো সত্বর উপর কিংবা প্রমোদবনে আমার সঙ্গে দেখা হোতোই।"

বসন্তকের কথা শুনে আবার সংশয়ান্বিত হোলো উদয়ন। ভগ্নকণ্ঠে বললো। "তবে কি আমি সত্যিই স্বপ্ন দেখছিলাম?"

যে সময় সমুদ্রগৃহে বসন্তক আর উদয়ন এরকম আলাপ করছিলো, ঠিক সেসময় প্রমোদবনে মাধবীমণ্ডপের অন্তরালে বসে অশ্রু বিসর্জন করছিলো বাসবদত্তা।

হঠাৎ কারো মৃদু পদশব্দ শুনে সে সচকিত

হয়ে মুখ ফিরিয়ে দেখলো পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে দেবী শীলাবতী। চাঁদের আলো এসে পড়েছে তার মুখের উপর। বাসবদত্তা সবিস্ময়ে দেখলো শীলাবতীর সুন্দর আননে ফটে উঠেছে একটা শীতল কাঠিন্য।

"আর্য আবন্তিকা," তীক্ষ্ণধার কণ্ঠে ধীরে ধীরে বললো শীলাবতী, "অন্তরাল থেকে সবই আমার চোখে পড়েছে। আর্যপুত্র স্বপ্নে বাসবদত্তার নাম স্মরণ করছেন। আর আপনি সেই মোহাচ্ছন্নতার সুযোগ নিয়ে অন্ধকারের মধ্যে—"

"না, না, আর বলবেন না, আর বলবেন না দেবী।" কাতর কণ্ঠে বলে উঠলো বাসবদত্তা।

শীলাবতী শুষ্ক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো বাসবদত্তার দিকে। কিছুক্ষণ পরে বললো, আর্য আবন্তিকা, আপনার চোখের এই অশ্রু, আপনার এই কাতর সন্তাপিত মনোভাব আমি অত্যন্ত নিন্দনীয় মনে করি। আপনাকে আমি সংযত চরিত্র বলেই জানতাম। যাই হোক, আমি যখন আপনার ভ্রাতা সেই তপস্বীকে কথা দিয়েছি যে, তিনি ফিরে না আসা পর্যন্ত আমি আপনাকে প্রতিপালন করবো এবং আপনার ধর্ম রক্ষা করবো, আপনার সঙ্গে কোনো নির্দয় ব্যবহার আমি করতে পারি না। কিন্তু আমি আশা করি যে, আপনি আর কখনো আমার স্বামীর সন্নিকটে আসবেন না। অনুরোধের ভাষায় বলছি, কিন্তু আপনি এটা আদেশ বলে গ্রহণ করবেন।"

॥ আট ॥

আবার উদয়নের ভাগ্য পরিবর্তন হলো। অবন্তীরাজ্যের দক্ষিণ অঞ্চলে সেনানায়ক রুমণ্বান সেনাবাহিনী আবার সংগঠন করে যে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলো সেটা সফল হোলো। রুমণ্বানের পুনরাক্রমণে পশ্চাদপসরণ করতে লাগলো বলাদগ্রাহী প্রত্যন্তনৃপতি আরুণির সেনাবাহিনী। পূর্বসীমান্ত থেকে মগধসেনা নিয়ে আক্রমণ করলো মহারাজ উদয়ন। দু' দিকের আক্রমণে সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত হোলো বিদ্রোহী আরুণিক সেনা। আরুণি নিজে যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হোলো। রাজ্য পুনরুদ্ধার করে মহারাজ উদয়ন সগৌরবে ফিরে এলো রাজধানী কৌশাম্বীতে সঙ্গে এলো মগধরাজকন্যা শীলাবতী। বাসবদত্তার অবর্তমানে শীলাবতীকে করা হোলো পট্টমহিষী।

শীলাবতীর সঙ্গে বাসবদত্তাও এলো কৌশাম্বীতে। রাজ্য পুনরুদ্ধার করা হয়েছে বলে তার মনেও খুব আনন্দ। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই সে আনন্দ বিষাদে পরিণত হোলো। মহামাত্র যৌগন্ধরায়ণের কোনো সন্ধান নেই। কিন্তু সে ফিরে না এলে বাসবদত্তার আত্মপরিচয় দেওয়ারও কোনো সুযোগ নেই। মহামাত্র যতদিন ফিরে না আসেন ততদিন আত্মপরিচয় সবার অজ্ঞাত রাখবে—সত্যে বাসবদত্তা আবদ্ধ। যৌগন্ধরায়ণের প্রত্যাশায় দিন গুণতে লাগলো বাসবদত্তা। কেটে গেলো দিনের পর দিন। অজ্ঞাতবাসের বেদনা এবার দুঃসহ হয়ে উঠলো।

শীলাবতী বাসবদত্তার সঙ্গে কোনোরকম রূঢ় ব্যবহার না করলেও আগের সেই সহজ বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার আর নেই। এখন সে বৎসরাজ্যের পট্টমহিষী। সে একটু অভিজনসুলভ দূরত্ব বজায় রাখে সবার সঙ্গে। প্রাসাদে পুরাতন পরিচারিকারা কেউ আর নেই। শীলাবতী তার নিজের পরিচারিকা ও অনুচরীদের নিয়ে এসেছে রাজগৃহ থেকে। কৌশাম্বীর সূর্যামুখ প্রাসাদের অন্তঃপুরের পশ্চাদভাগে এক নির্দিষ্ট অঞ্চলের বাইরে আসার অধিকার দেওয়া হয়নি বাসবদত্তাকে। সে জানে যে পট্টমহিষী শীলাবতী সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছে প্রতীহারীদের বাসবদত্তার উপর যেন সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়। সমুদ্রগৃহের সেই পূর্ণিমা রাত্রির ঘটনার পর থেকে শীলাবতী অত্যন্ত সতর্ক থাকে, যাতে তার প্রতিপালিতা এই আবন্তিকা উদয়নের কাছাকাছি কোথাও না থাকে।

সুতরাং কৌশাম্বী নগরে কি রাজপ্রাসাদের অন্যান্য কক্ষায় কেউ জানলো না যে, দেবী বাসবদত্তাও অবস্থান করছে সূর্যামুখ প্রাসাদে। সুংসুমারগিরি থেকে বাসবদত্তার পুত্র রাজকুমার বোধিকেও এখানে নিয়ে আসা হয়েছে বলে জানতে পেরেছিলো বাসবদত্তা। কিন্তু তার সঙ্গেও সাক্ষাৎ হওয়ার কোনো উপায় ছিলো না, কারণ দেবী শীলাবতী নিজের সপত্নীপুত্রকে একটুও স্নেহ করতো না বলে তাকে আনানো হোতো না অন্তঃপুরে। তাকে দেখবার জন্যে বাসবদত্তার মনে প্রবল ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সে নিজেকে সংযত রাখলো এই ভেবে যে, পুত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে তার আত্মপরিচয় গোপন রাখা সম্ভব হবে না।

এভাবেই দিন কাটছিলো। এমন সময় হঠাৎ একদিন অপরাহ্নে মধুকরিকা ছুটতে ছুটতে এলো বাসবদত্তার কাছে। হাসি মুখে উত্তেজিত কণ্ঠে বললো, "আর্য আবন্তিকা, আপনার জন্যে একটা সুসংবাদ এনেছি। আপনার ভ্রাতা সেই তপস্বী ফিরে এসেছেন। তিনি ভর্তা ও ভট্টিনীর সঙ্গে অপেক্ষা করছেন দর্শনগৃহে। ভট্টিনী আপনাকে সেখানে নিয়ে যাওয়ার আদেশ দিয়েছেন, তবে ভর্তাও সেখানে উপস্থিত আছেন বলে আপনাকে অবগুণ্ঠনে মুখ ঢেকে যেতে হবে বলে নির্দেশ দিয়েছেন ভট্টিনী।

মনের উত্তেজনা মনে চেপে বাসবদত্তা সত্বর প্রস্তুত হয়ে নিলো। তারপর প্রতিহারী ও মধুকরিকার সঙ্গে উপস্থিত হোলো উদয়নের দর্শনগৃহে।

সেখানে দুটি রত্ন-পীঠে পাশাপাশি উপবিষ্ট ছিলো মহারাজ উদয়ন এবং পট্টমহিষী শীলাবতী। একপাশে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়েছিলো তপস্বীবেশী জটাজুটধারী দীর্ঘ শ্মশ্রুবিমণ্ডিত এক ব্যক্তি। সূক্ষ্ম অবগুণ্ঠনের ভিতর থেকে দেখে বাসবদত্তা অনুমান করলো যে সে-ই মহামাত্র যৌগন্ধরায়ণ। সম্মুখে সসম্ভ্রমে দাঁড়িয়েছিলো একজন পুরুষ ও একজন নারী। তাদের দেখে উল্লসিত হোলো বাসবদত্তা। দুজনের সঙ্গেই তার পরিচয় বহুদিনের। একজন অবন্তীরাজ প্রদ্যোতের কাঞ্চুকীয় রৈভ্য। অন্যজন তার পুরাতন ধাত্রী বসুন্ধরা।

পট্টমহিষী শীলাবতীর হাতে দুটি আলেখ্য। সে দুটি নিরীক্ষণ করে বললো, "এটি তো আর্যপুত্র। প্রতিকৃতির সঙ্গে আর্যপুত্রের সাদৃশ্য অতি চমৎকার। কিন্তু এটিই দেবী বাসবদত্তার প্রতিকৃতি?"

কাঞ্চুকীয় রৈভ্য উত্তর দিলো, "দেবী, আর্যপুত্র যখন আমাদের ভর্তৃদারিকাকে হরণ করে উজ্জয়িনী ত্যাগ করেন, তখন আমাদের ভর্তা এবং ভট্টিনী এ দুটি আলেখ্য প্রস্তুত করিয়ে তাঁদের আলেখ্য-বিবাহ সম্পন্ন করেন। কন্যা বিয়োগ সন্তাপিত আমাদের ভট্টিনী এখনও এ দুটি আলেখ্য তাঁর জামাতার কাছে প্রেরণ করেছেন যদি ভর্তৃদারিকার প্রতিকৃতি আর্যপুত্রকে কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা দিতে পারে।"

শীলাবতী ভালো করে পর্যবেক্ষণ করছিলো বাসবদত্তার প্রতিকৃতির দিকে। ধীরে ধীরে বললো, "কিন্তু আমাদের আর্যা আবন্তিকার সঙ্গেও এই প্রতিকৃতির একটা আশ্চর্য সাদৃশ্য আছে।"

প্রথমটা উদয়ন গ্রাহ্য করলো না। বললো, "পরস্পরগত রূপতুল্যতা আমাদের অভিজ্ঞতায় নতুন নয়। কিন্তু যেহেতু আর্যা আবন্তিকা এই ব্রাহ্মণের ভগ্নী, সুতরাং এই প্রসঙ্গের আলোচনা নিরর্থক। তপস্বী, আপনি আপনার ভগ্নীকে গ্রহণ করুন। দেবী পট্টমহিষী তাঁর প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী আপনার ন্যস্ত দায়িত্ব সার্থকভাবে প্রতিপালন করেছেন এতদিন। এখন তিনি ভারমুক্ত হবেন।"

কোষবৃদ্ধি

হার্ণিয়া, টনসিল

যত বড়, যত পুরাতন হউক অপারেশনের দরকার নাই।

ডাঃ এস, কে, মুখার্জী, ডি, এম, এস

ঔষধেই সম্পূর্ণ আরোগ্য করেন।

দূরের ঔষধ ডাকে পাঠান হয়।

১১৯।২এ, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯ (প্রাতঃ ১০—১২টা ও বৈকাল ৫—৭॥টা)

৭।২বি, হাজরা রোড, কলিকাতা-২৬ (প্রাতঃ ৮—৯টা ও রাত্রি ৮—৯॥টা)

ফোন : ৩৪-১৫৪৩ ও ৪৭-৫০৪৫

"আপনার ও মহাদেবীর জয় হোক।" বলে উঠলো তপস্বীবেশী যৌগন্ধরায়ণ।

উদয়ন ভ্রূকুঞ্চিত করলো। বললো, "তখন একবার আমার মনে হয়েছিলো, এখনও মনে হচ্ছে, আপনার কণ্ঠস্বর আমার অপরিচিত নয়। হে ব্রাহ্মণ, আপনাকে কি আমি পূর্বে কোথাও দেখেছি?"

ব্রাহ্মণ উত্তর দেওয়ার আগেই কাঞ্চুকীয়ের সঙ্গে দর্শন-গৃহে প্রবেশ করলো শিশু রাজকুমার বোধি, অবগুণ্ঠনের অন্তরাল থেকে তাকে দেখে বাসবদত্তার হৃদয় উদ্বেল হয়ে উঠলো। অতি কষ্টে সে সংযত রাখলো নিজেকে।

উদয়ন বললো, "মাননীয় রৈভ্য, এই আপনাদের ভর্তৃদারিকা বাসবদত্তার পুত্র রাজকুমার বোধি।"

তাকে দেখে রৈভ্য এবং বসুন্ধরা দুজনের চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠলো বাসবদত্তাকে স্মরণ করে।

দেবী শীলাবতী তখনো অতি নিবিষ্ট মনে বাসবদত্তার প্রতিকৃতি নিরীক্ষণ করছিলো; হঠাৎ বলে উঠলো, "আর্যপুত্র, এটা দেবী বাসবদত্তার প্রতিকৃতি হতে পারে না। এটা আর্যা আবন্তিকার প্রতিকৃতি।"

তপস্বীবেশী যৌগন্ধরায়ণ আলেখ্য চেয়ে নিলো। তারপর বললো, "উজ্জয়িনীতে আমি কিছুকাল ছিলাম। দেবী বাসবদত্তাকে আমি দেখেছি। এই প্রতিকৃতি দেবী বাসবদত্তারই বটে। এবং আমার ভগ্নী আবন্তিকার সঙ্গে এই প্রতিকৃতির কোনো সাদৃশ্য আছে কি না সে বিষয়ে আমার ঘোর সন্দেহ আছে।"

যৌগন্ধরায়ণের কথা শুনে শীলাবতী ক্রুদ্ধ হয়ে বললো, "এতকাল আর্যা আবন্তিকা আমার সঙ্গে আছেন। আমার কেন ভুল হবে?"

যৌগন্ধরায়ণ উত্তর দিলো। "আবন্তিকা আমার ভগ্নী। আমারই বা কেন ভুল হবে?"

উদয়ন তখন বললো, "বেশ, অবগুণ্ঠন উন্মোচন করো। আমি স্বচক্ষে দেখে এই বিবাদের মীমাংসা করছি।"

ধাত্রী বসুন্ধরা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করছিলো বাসবদত্তাকে। সে তার কাছে সরে এলো, তারপর হঠাৎ বলে উঠলো, "আরে, ইনিই যে আমাদের ভর্তৃদারিকা বাসবদত্তা।"

"না, না", প্রতিবাদ করলো যৌগন্ধরায়ণ, "এ আমার ভগ্নী আবন্তিকা।"

উদয়ন ও শীলাবতী দুজনেই সবিস্ময়ে যৌগন্ধরায়ণ ও বসুন্ধরার দিকে তাকালো।

তারপর উদয়ন গম্ভীরকণ্ঠে বললো, "আর্যা আবন্তিকা, আপনি আপনার অবগুণ্ঠন উন্মোচন করুন।"

ধীরে ধীরে অবগুণ্ঠন অপসারিত করলো বাসবদত্তা। মৃদু কণ্ঠে বললো, "আর্যপুত্র জয়তু—।

"বাসবদত্তা!" উচ্চকণ্ঠে ডেকে উঠলো উদয়ন, উঠে দাঁড়ালো সিংহাসন থেকে। বাসবদত্তার পুত্র বোধি ছুটে এসে জড়িয়ে ধরলো তার জননীকে।

"মহারাজাধিরাজ জয়তু," গম্ভীর কণ্ঠে বললো যৌগন্ধরায়ণ।

"যৌগন্ধরায়ণ,—" দ্রুত ফিরে দাঁড়ালো উদয়ন, "এবার আমি চিনতে পেরেছি তোমার কণ্ঠস্বর।"

উদয়নের প্রশ্নের উত্তরে তখন যৌগন্ধরায়ণ খুলে বললো সব কথা।

উদয়ন অনেকক্ষণ স্তব্ধ থাকবার পর জিজ্ঞেস করলো, "রুমণ্বান জানতো?"

"হ্যাঁ প্রভু। শুধু রুমণ্বান কেন, অমাত্যবর্গের প্রত্যেকেই জানতো।"

"বসন্তক?"

"হ্যাঁ, সেও জানতো।"

রাজার মুখে একটু হাসি দেখা দিলো। বললো, "বসন্তক কী শঠ। রাজগৃহে আমাকে যক্ষিণী হুহুকিনী অবন্তিসুন্দরীর অলীক কাহিনী শুনিয়েছিলো।"

এমন সময় আরেকজন প্রতিহারী এসে প্রণাম করে দাঁড়ালো রাজা উদয়নের সম্মুখে। বললো, "মহারাজ, গান্ধর্বশালায় বিরচিকা অনেকক্ষণ ধরে আপনার অপেক্ষা করছেন, এত বিলম্ব দেখে তিনি অধৈর্য হয়ে পড়েছেন। উনি জানতে চান আর কতক্ষণ তাঁকে অপেক্ষা করতে হবে।"

বিরচিকার ধৃষ্টতা দেখে বাসবদত্তা স্তম্ভিত হোলো। যৌগন্ধরায়ণের মুখ রক্তবর্ণ হয়ে উঠলো। কিন্তু বিষণ্ণ হয়ে গেল শীলাবতীর মুখমণ্ডল।

বাসবদত্তার মনে আর কোনো সন্দেহ রইলো না। পরিষ্কার বুঝতে পারলো যে, আবার আগের অভ্যাসে ফিরে গেছে মহারাজ উদয়ন। শীলাবতীর মুখের দিকে তাকিয়ে বাসবদত্তা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস চাপলো।

কিন্তু উদয়নের মুখের উপর কোনো ভাবান্তর দেখা গেল না। প্রতিহারীকে বললো, "তুমি যাও, বিরচিকাকে গিয়ে বলো, আমি কিছুক্ষণের মধ্যেই আসছি।"

প্রতিহারী চলে গেলো। অবন্তীরাজের কাঞ্চুকীয় রৈভ্য এবং ধাত্রী বসুন্ধরাকেও বিশ্রাম করবার জন্যে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হোলো রাজার আদেশে।

আত্মরক্ষা ও শিকারের যাবতীয় সরঞ্জামাদির জন্য

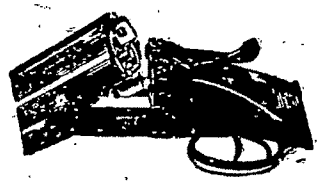

গ্রাম : তামাকা ফোন : ২২-১০৬৩

এন্, সি, দাঁ এণ্ড কোং, বন্দুক বিক্রেতা

৯, ডালহৌসি স্কোয়ার ইষ্ট, কলিকাতা - ১

ব্রাঞ্চ :—রাঁচী ও কোডার্মা (হাজারীবাগ)

দেবী শীলাবতী বাসবদত্তার কাছে এসে বললো, "আর্য আপনি আমার জ্যেষ্ঠা ভগ্নী। যদি আমি আপনার মনোকষ্টের কোনো কারণ হয়ে থাকি, আমায় মার্জনা করবেন।"

"তুমি আমাকে আশ্রয় দিয়েছিলে", উত্তর দিলো বাসবদত্তা, "আমি তোমার কাছে চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকবো।"

উদয়ন কি যেন ভাবছিলো। এবার বাসবদত্তার কাছে এসে বললো, "দেবী সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে।"

"কী আর্যপুত্র?"

"মগধরাজ অজাতশত্রুর সঙ্গে যখন শীলাবতীর সঙ্গে আমার পরিণয়ের আলোচনা চলছিলো, তখন অজাতশত্রু আমায় বলেছিলো, —গ্রামদাহে দেবী বাসবদত্তার দগ্ধ হয়ে মৃত্যু হয়, আমাদের এ সংবাদ অবিশ্বাস করার কোনো কারণ নেই। তবু, তাঁর দগ্ধ দেহ কেউ দেখে নি। দেখছিলো শুধু ভগ্নাবশেষ। এ প্রসঙ্গ অত্যন্ত বেদনাদায়ক। কিন্তু, যেহেতু দেবী বাসবদত্তার দগ্ধ দেহ কেউ দেখে নি, আমার ভগ্নীর সঙ্গে আপনার পরিণয়ের পূর্বে আপনাকে দিয়ে একটা কথা অঙ্গীকার করিয়ে নিতে চাই।

"—আমি তখন বললাম, বলুন কি অঙ্গীকার করতে হবে। আপনি সৈন্য সাহায্য করে আমার রাজ্য পুনরুদ্ধারে সহায়তা করবেন বলে প্রতিশ্রুত হয়েছেন। সুতরাং আপনার যা অভিলাষ আমি তাই করবো।

"—অজাতশত্রু তখন বললেন, দেবী বাসবদত্তার মৃত্যু হয়েছে। এতে সন্দেহ করবার কোনো কারণ আমাদের নেই। তবু মনে করুন, যদি তিনি কোনোদিন হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে আবার ফিরে আসেন, তাহলে কিন্তু আমার ভগ্নী শীলাবতীকে পট্টমহিষীর মর্যাদা থেকে অপসারিত করে দেবী বাসবদত্তাকে সেই স্থান দিতে পারবেন না।

"—একথা শুনে আমি দুঃখিতও হলাম, আবার কৌতুকবোধও করলাম। কিন্তু বাসবদত্তা যে মৃত এ সম্বন্ধে আমার কোনো সন্দেহ ছিলো বলে ভাবলাম, বাসবদত্তা যখন কোনোদিন আর ফিরে আসবে বলে মনে করার কোনো কারণ নেই, তখন রাজ্য পুনরুদ্ধার করার প্রয়োজনে এ রকম একটি অঙ্গীকার করলে কোনো ক্ষতি নেই। আমি অঙ্গীকার করলাম।

"—বাসবদত্তা, আজ আমি যদি এই অঙ্গীকার ভঙ্গ করি, তাহলে মগধরাজ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হবেন এবং নানা কারণে আমি তাঁর মিত্রতা হারাতে চাই না। কোশলরাজের সঙ্গে আমার বৈরিতা। এখন অজাতশত্রুও যদি আমার শত্রু হন তাহলে বৎসরাজ্য আবার বিপন্ন হয়ে পড়বে।

—তুমি এখন বলো, বাসবদত্তা, আমি কি করবো।"

উদয়ন থামলো। সবাই স্তব্ধ হয়ে রইলো। বাসবদত্তা স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকালো উদয়নের দিকে। মনে মনে ভাবলো,—এতদিন পর আবার দেখা হোলো আর্যপুত্রের সঙ্গে। এই তাঁর প্রথম সম্ভাষণ?

সে চোখ ফিরিয়ে নিলো। সামনে ঝুঁকে পড়ে আস্তে আস্তে বুকে টেনে নিলো রাজকুমার বোধিকে। তার মৃদুকণ্ঠে বললো, "মহামাত্র যৌগন্ধরায়ণ, আমার কর্তব্য শেষ হয়েছে। আমি এবার আমার পুত্র বোধির সঙ্গে সুংসুমারগিরিতে চলে যাবো। আপনি আমায় সেখানে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করুন।"

* * * *

তারপর আর বাসবদত্তার সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না। রাজকুমার বোধির সম্বন্ধেও ইতিহাস একেবারে নীরব। বৌদ্ধ জাতকের একটি কাহিনীতে শুধু উল্লেখ করা আছে যে, রাজকুমার বোধি ভর্গগণরাজ্যের রাজধানী সুংসুমার গিরিতেই বসবাস করতো।

উদয়নের পর কে বৎসরাজ্যের রাজা হয়েছিলো ইতিহাস নিশ্চিতভাবে কিছু বলতে পারে না। পুরাণ অনুযায়ী বৎসরাজ্যের সিংহাসনে সমাসীন হয়েছিলো উদয়নের আরেক পুত্র, অহিনর,—সম্ভবত দেবী শীলাবতীর পুত্র।

সমাপ্ত

"বেঙ্গল" ব্রাণ্ড লোহার সিন্দুক এবং কেবিনেট প্রস্তুতকারক

শচীন্দ্রনাথ দে এণ্ড ব্রাদার্স

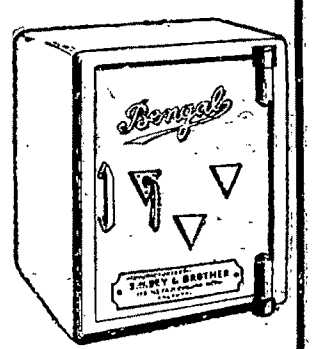

১১৭, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা—১

গভর্ণমেন্ট অনুমোদিত

আমাদের বণ্ডেড লেবরেটরীতে আমেরিকান ব্যাক পোটেন্সি ও ফুড ড্রাগস হইতে আভিজ্ঞ কেমিষ্টের তত্ত্বাবধানে তৈয়ারী হোমিও ডাইলুসান, টিংচার, বাইওকেমিক টেবলেট, ট্রাই-টুরেসন ও পেটেন্ট ঔষধাদি বিশুদ্ধ ও সুলভ। উপযুক্ত কমিশন দেওয়া হয়।

মূল্য তালিকার জন্য লিখুন

হোমিওপ্যাথিতে বিখ্যাত পুস্তক

বোরিকস মেটেরিয়া মেডিকা এণ্ড রেপার্টরী বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হইল। সুদৃশ্য বাঁধাই ডিমাই সাইজ, ১৪৯০ পৃষ্ঠায় মূল্য ১৫ টাকা। আমাদের গৃহ চিকিৎসা পুস্তক খানি প্রতিটি পরিবারের চিকিৎসার জন্য অপরিহার্য্য। মূল্য মাত্র ২ টাকা।

প্রস্তুতকারক ও প্রকাশক

ন্যাশনাল হোমিও ল্যাবরেটরী · কলিকাতা-১৪

সত্য স্বপনের ফল

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

ষোল টাকা চার আনা খরচ করে বিজ্ঞাপন দিয়েছিল পুলক—এক সর্বাধিক-প্রচারিত বাংলা দৈনিকে, মাত্র তিনখানি চিঠি এসেছে। সে ভেবেছিল বোধ হয় তিন চারশ' চিঠি আসবে এবং তার সঙ্গে অন্তত শ' দেড়েক ফোটো। কিন্তু পনেরো দিন অপেক্ষা করার পরও যখন আর কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না—তখন বুঝল যে এ-বিজ্ঞাপনের এই-ই মোট ফলশ্রুতি। চটে আগুন হয়ে উঠল সে—যদিচ এ উষ্মাটা কার ওপর—তা তার কাছেও ঠিক পরিষ্কার নয়। দোষটা তার ভাগ্যের না ঐ দৈনিকপত্রের না বাংলা দেশের—তা অত তলিয়ে ভাবার মতো মানসিক অবস্থা ছিল না তার, শুধু ব্যর্থ ক্ষোভে বারবার আপন মনেই বলতে লাগল, 'তবু বলে বাংলা দেশে মেয়ের অভাব নেই, তবু বলে মেয়ে দু'পায়ে জড়ো করা যায়। মেয়েদের বিয়ে হচ্ছে না বলে অনবরত নাকে কাঁদে সবাই। ছোঃ!'

বলা বাহুল্য বিজ্ঞাপনটা বিবাহের। দিয়েছিল পুলক—অর্থাৎ পাত্র স্বয়ং।

নিজের বিয়ের বিজ্ঞাপন নিজেই দেওয়া খুব রুচিকর নয়—কিন্তু পুলকেরও উপায় ছিল না। মা থাকেন সুদূর এলাহাবাদে। ছোট ভাই চুর্কের সিমেণ্ট ফ্যাক্টরীতে কাজ করে। সেইখানেই কোয়ার্টার পেয়েছে, বিয়ে-থাও করেছে, ঘোর সংসারী। কাছে থাকে বলেও বটে, তার দ্বারাই আগে নাতি নাতনী হয়েছে বলেও বটে, মা তাদের নিয়েই ব্যস্ত, তার যে নিজস্ব টাকা আছে এবং নিজস্ব আয় (বাড়িভাড়া পান একটা) সবই ছোট ছেলের সংসারে চলে যায়। ইদানীং বড়ছেলের বিশেষ খোঁজ-খবরও করেন না, কতকটা খরচের খাতায় নাম লিখে দিয়েছেন। কখনও-সখনও দৈবাৎ দু-একটা চিঠি লেখেন। তাও শুধু কুশলের জন্য লেখেন কদাচিৎ—পুলকের দেয় মাসিক খরচের টাকাটা পাঠাতে দেরি হলো জননীর প্রতি পুত্রের কর্তব্য স্মরণ করিয়ে উপদেশ দিয়েই বেশির ভাগ চিঠি দেন।

ইতিমধ্যে পুলকের বয়স হয়ে গেছে ঢের। বাইরে যা-ই বলুক, বিয়াল্লিশের কম নয়। দীর্ঘকাল কোথাও কোন স্থিতি হয় নি—সংসার না পাতাবার সেইটেই বড় কারণ। গ্র্যাজুয়েট নয়, কোন হাতের কাজও শেখে নি। লেখাপড়া ভাল লাগে নি তখন, তাই আই-এ পাস করে আর কলেজে যায় নি, রোজগারের ধান্ধায় বেরিয়ে পড়েছিল। অবশ্য বেরিয়ে পড়ে বুঝেছিল যে এ-কাজটা লেখাপড়া করার চেয়েও শক্ত, কিন্তু তখন আর ফেরবার উপায় ছিল না। তাই অনেক কিছু করে নানা ঘাটের জল খেয়ে কোন মতে শরীরটাকেই টিকিয়ে রেখে-ছিল, তার বেশি কিছু করে উঠতে পারে নি। না সঞ্চয়, না ভাল কোন কাজকর্ম বা চাকরি আর না বাসা বাঁধার কোন ব্যবস্থা। আর অহরহ এইভাবে জীবন-সংগ্রাম করতে হয়েছে বলে বয়স বা সময় সম্বন্ধেও অতটা সচেতন ছিল না, কোথা দিয়ে পরমায়ুর চল্লিশটা বছর কেটে গেছে টের পায় নি।

এর মধ্যে ঘুরেছে ঢের। দিল্লী, বোম্বাই, মাদ্রাজ, নাগপুর, পাটনা—কোথায় নয়! কাজও করেছে হরেক রকম; ছোট-খাটো চাকরি তো অজস্র, অর্ডার সাপ্লাইয়ের কাজ, দালালি এসব তো আছেই। ভাগ্যে এর মধ্যে ইনসিওরেন্সের এজেন্সীটা নেওয়া ছিল তাই এক-এক সময় সম্পূর্ণ বেকার হয়ে পড়লেও নিঃস্ব হতে হয় নি, ছোট ভাইয়ের কাছে বা মায়ের কাছে হাত পাততেও হয় নি। বরং যেমন করে হোক মাকে কিছু কিছু খরচের টাকা সে দিয়ে গেছে—প্রায় প্রতি মাসেই।

এইবার, এতদিন পরে একটু স্থিতি এসেছে। এখানকার একটা পাঞ্জাবী ফার্মে একটা চাকরি পেয়েছে, এদের ইঞ্জিনীয়ারিং ফার্ম, বেশ কিছুদিনের কারবার, হঠাৎ উঠে যাবার কোন সম্ভাবনা নেই। মাইনে খুব বেশি নয় অবশ্য, কারণ, চাকরিও নতুন ওর যোগ্যতাও খুব সীমিত। সে না জানে ইঞ্জিনীয়ারিং, না জানে হিসাব-নিকাশের জটিল তত্ত্ব। জীবনবীমা সম্পর্কে ম্যানেজারের সঙ্গে পরিচয়, সদালাপী ও সচ্চরিত্র দেখে তাঁর নজর পড়ে—তিনিই একরকম ডেকে কাজ দিয়েছেন। সেলস্ ডিপার্টমেণ্টে কাজ, কাজ যা তা না করলেও কোম্পানীর কোন ক্ষতি হবে না, এ পদটা ওর জন্যেই একরকম তৈরি করে নিয়েছেন তিনি। সুতরাং বেশি মাইনে আশা করাই অন্যায়, যা পাচ্ছে পুলকের কাছে তাই আশাতীত। মাইনে ভাতা ও বাড়ি ভাড়া নিয়ে

পৌনে তিনশ' টাকার মতো পাচ্ছে, ভরসা আছে যে বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে আরও কিছু করে বাড়বে।

জীবনে স্থিতি আসার সঙ্গে সঙ্গেই মানুষের একটু স্বাচ্ছন্দ্যের লোভ হয়। এতদিন কোনমতে মেসের খরচা দিয়ে থাকতে পারলেই যথেষ্ট মনে হত। এখন একটা মাঝারি হোটেলে থাকে, ছোট হলেও পৃথক ঘর, খাওয়া-দাওয়াও মোটামুটি ভাল, তবু মনে হচ্ছে যে, এই খাওয়ায় শরীর খারাপ হয়ে যাচ্ছে, এ-বয়সে বাড়ির খাওয়া না খেলে শরীর টিকবে না। আর তা খেতে গেলে একটা বাসা করা দরকার।

বর্তমানে কলকাতায় বাসা পাওয়া কঠিন—তবু চেষ্টা করলে হয়ত পাওয়া যায়। ভাল ঘর একখানা পাওয়া অন্তত অসম্ভব নয়—কিন্তু ঘর হলেই ঘরওয়ালীর প্রশ্ন ওঠে। যা দিনকাল, ঝি-চাকরের ওপর বরাত দিয়ে থাকা ঠিক নয়। সবসুদ্ধ ফাঁসিয়ে চলে যাবে কোনদিন।

ঘরওয়ালী—মানে স্ত্রী। অর্থাৎ বিয়ে করা।---

এখন এই বয়সেই? তাও কি সম্ভব! ছিঃ---

এই-ই হ'ল প্রথম প্রতিক্রিয়া, তবে নাকি কবি বলেছেন,—'ধন্য আশা কুহকিনী'—মনের মধ্যে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কে যেন বলে ওঠে, কেন, অসম্ভবই বা কিসে? কী এমন বয়স হয়েছে তার? যা বয়স তার থেকে ঢের ছোট দেখায় তাকে, চুলে পাক ধরে নি, মাংসপেশী কোথাও শিথিল হয় নি, একটা ছাড়া সব দাঁত এখনও অটুট। আর চিরকালই কি এমনি মেসে হোটেলে খেয়ে একা-একা দিন কাটাবে? সেও তো মানুষ, তার সাধ-আহ্লাদ নেই?

তা ছাড়া, এই চাকরির আয়ই একমাত্র নয়। জীবন-বীমার কাজটাও এখনো বজায় আছে, তা থেকেও শ' দুইয়ের মতো আয় হয় মাসে। সে নিজে একটা বীমা করিয়েছিল সম্প্রতি হাজার-পাঁচেক টাকা পেয়েছে, আরও একটা করেছে, চার বছর পরে সে টাকাটা পাকবে। একটু যদি চেপে ঘোরে তাহলে এ আয় আরও বাড়ানো যায়। অফিসেও কি আর কিছু উন্নতি হবে না? তবে, একটা ছোট-খাটো সংসার চালানো অসম্ভব কিসে? আর তেমন দেখলে, মা'র টাকাটা স্বচ্ছন্দে বাদ দিতে পারে, তাঁর বাড়িভাড়ার আয়েই তাঁর চলবার কথা, তিনি ছোট ভাইয়ের সংসারে ঘুষ দেবেন কি না, সেটা পুলকের দেখার কথা নয় তো।

অনেক ভেবেচিন্তে পুলক মাকে চিঠি লিখল। এবার তার বিয়ে করার ইচ্ছা এবং অবস্থা দুই-ই হয়েছে, মা যেন পাত্রীর খোঁজ করেন।

মা এর আগে বহুবারই অনুযোগ করেছেন বিয়ে না করার জন্য, দু-একটি পাত্রীর খোঁজ করে চিঠিও দিয়েছেন কথাবার্তা চালাবেন কি না জানতে চেয়ে—কিন্তু এবারের এই চিঠির উত্তরে ছেলের সুমতির জন্য কি? শুষ্ক আনন্দ প্রকাশ করে লিখলেন,—

'আমি একে বৃদ্ধা হইয়াছি, তাহাতে প্রায়ই অসুস্থ থাকি, এমতাবস্থায় আমি কোথায় পাত্রী খোঁজ করিব? তাহার চেয়ে বরং খোকাকে একটা চিঠি দাও, সে যদি তাহার শ্বশুরবাড়ি মারফৎ কিছু খোঁজ- খবর করতে পারে তো করুক।'

খোকা অর্থাৎ পুলকের ছোট ভাই পলাশ।

চিঠি পেয়ে পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত জ্বলে উঠল পুলকের। মা এখনও প্রতিমাসে তিনবার করে ছোট ছেলের কাছে যান, তা সে জানে। সারা এলাহাবাদ চষে ফেলেন প্রত্যহ ওখানে থাকলে। বাঁধা রিক্সাওলাই আছে এ জন্যে। যত অসুস্থতা তার বেলাতেই। অর্থাৎ সে এখন বিয়ে করলে পাছে খোকার বিষয়ে হাত পড়ে, এই তাঁর দুর্ভাবনা। তিনি চান পুলক আর বিয়ে-থা না করুক, বাবা ও মায়ের সব সম্পত্তি এবং পুলকেরও যা সারা জীবনের সঞ্চয়—সব তাঁর খোকার ছেলে-মেয়েরা পাক।----

হয়ত কথাটা সত্য নয়, পরে পুলকই হয়ত লজ্জিত হবে এমনটা অনুমান করার জন্য, কিন্তু তখনকার মতো এছাড়া কিছু মনে পড়ল না এবং মাকে ঘোর স্বার্থপর ও হিংসুটে বলে বোধ হতে লাগল।

এরপর নিজের বিয়ের ব্যবস্থা নিজে করা ছাড়া উপায় রইল না।

আছেন, দূর-সম্পর্কের মামা-টামা দু-একজন কলকাতা, পাটনা বা অন্যত্র আছেন, কিন্তু মা থাকতে এঁদের শরণাপন্ন হওয়া বড় লজ্জার কথা। তার চেয়ে সোজাসুজি বক্স নম্বর দিয়ে কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়াই ভাল। মেয়ে দেখে পছন্দ করে কথাবার্তা ঠিক হলে মাকে অভিভাবক দেখালেই হবে। তখন আর তাঁর সরে দাঁড়াবার কোন অজুহাত থাকবে না। তাও যদি না হয়, একটা মামা-কাকা কাউকে খুঁজে বার করলেই হবে।

অতঃপর অনেক ভেবেচিন্তে, বিস্তর বিজ্ঞাপন ঘেঁটে, কয়েকটি মুসাবিদা নষ্ট করে একটা বিজ্ঞাপন খাড়াও করল:

'জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত, শিক্ষিত সংস্কৃতিবান সুদর্শন ব্রাহ্মণ পাত্র সদ্বংশজাতা, শিক্ষিতা সুশ্রী পাত্রী চান। পাত্রী ব্রাহ্মণ না হইলেও ক্ষতি নাই। কলিকাতার বাহিরে কোন শহরে পাত্রের পৈতৃক বাড়ি আছে, নিজেও ভাল উপার্জন করেন। বয়স্কা পাত্রীতে আপত্তি নাই। ফটোসহ চিঠি দিন।' ইত্যাদি—

নিজে গিয়ে কোন এক বিখ্যাত বাংলা দৈনিকের অফিসে নগদ ষোল টাকা চার আনা খরচ করে বিজ্ঞাপন দিয়ে এল এবং বিপুল আশা বুকে নিয়ে কোন এক পরমাশ্চর্য নারীরত্ন, তার ভবিষ্যৎ জীবনসঙ্গিনীর অতর্কিত আবির্ভাবের প্রহর গুণতে লাগল।---

কিন্তু এল ঐ তিনখানি চিঠি মোটমাট। তাও পনেরো দিন ধরে। আশা যখন ছেড়েই দিয়েছে প্রায়—তখন এক-একখানা করে আসতে সুরু করল। তাও ছবি এল মাত্র একটি। সেইটেই যা একটু ভদ্র চিঠি, বাকী একখানা পোস্টকার্ডে এবং একখানা ইনল্যাণ্ডে।

সেসব পাত্রীও তেমন। মেয়ের বাবাই বলছেন শ্যামবর্ণ (একজন লিখছেন ময়লা), একজন ম্যাট্রিক ফেল আর একজন ম্যাট্রিক পাস (অর্থাৎ ক্লাস ফোর পর্যন্ত পড়া)।

উৎসবের দিনে

লিলি বিস্কুট

অফুরন্ত আনন্দ দান করে

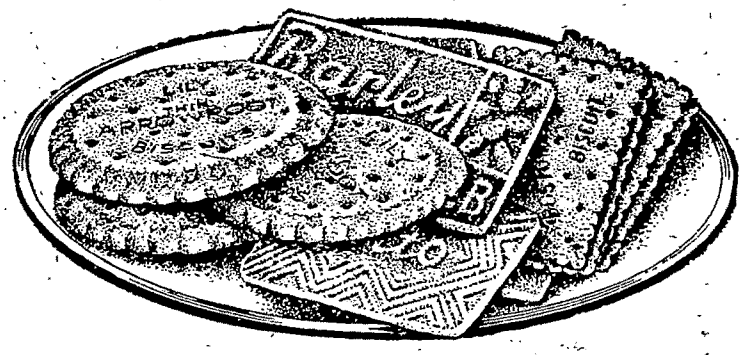

LB-13/68

IS-1115

লিলি বিস্কুট কোং প্রাইভেট লিঃ
কলিকাতা-৪

গৃহকর্মনিপুণা তো কথার মাত্রা, সব বিজ্ঞাপনে থাকে। দুজনেই নাকে কেঁদেছেন যে, তাঁরা খরচপত্র কিছুই করতে পারবেন না। ছবি পাঠান নি—একেবারে মেয়ে দেখাতে চেয়েছেন।

খামের চিঠিটি কিন্তু কিছু স্বতন্ত্র।

মেয়েটি বি-এ পাস, গৌরবর্ণা, ব্রাহ্মণ। বংশপরিচয়ও যা দিয়েছে—পুলকের জানা ঘর। বয়স লিখেছে চব্বিশ। গান-বাজনাও কিছু কিছু জানে। পাত্রীর কাকা চিঠি দিয়েছেন, তিনি নিজেই লিখেছেন, 'সম্ভবমতো খরচপত্র করিব।'

এ চিঠির সঙ্গে একটি ফটোও আছে। মন্দ নয়, বেশ কাটাকাটা মুখ-চোখ, একটু রোগা ধরণ হয়ত—তবে বাঙালীর মেয়ে বিয়ের আগে রোগা থাকাই ভাল, বিয়ের পরেই তো টিপসী মোটা হয়ে যাবে। সে বড় বিশ্রী।

অর্থাৎ সব দিক দিয়েই ঈপ্সিত পাত্রী। এর চেয়ে ভাল আর তার এ বয়সে জুটবে না। এ-ই ঢের। মনে হচ্ছে ভগবান তাকে এতকাল পরে অযথা নাকাল করবেন না বলেই কম চিঠির ব্যবস্থা করেছেন, একেবারে যেটি তার উপযুক্ত তাকেই এনে দিয়েছেন। পরমায়ু বেশির ভাগই তো বিগত—এখন প্রতিটি দিনেরই মূল্য যে অনেক। ভগবানের বিবেচনায় মনে মনে সে কৃতজ্ঞবোধ করল।

এবার তার উত্তর দেবার পালা।

পাত্রীর কাকা পত্রের শেষে পাত্রের সম্বন্ধে সমস্ত তথ্য জানতে চেয়েছেন। লিখেছেন উত্তর পেলে দেখা করবেন। কার সঙ্গে দেখা করতে হবে বিজ্ঞাপন-দাতা যদি দয়া করে তাও জানান।

খুবই ন্যায্য অনুরোধ। পুলক উত্তর দেবার জন্য তোড়জোড় করে লিখতে বসল। কে জানে কেন—এ বিবাহে যে কোন বাধার সৃষ্টি হতে পারে পুলকের তা একবারও মনে হল না। কেমন করে যেন তার স্থির বিশ্বাস হয়ে গেল যে, এ-ই তার বিধাতৃ-নির্দিষ্ট পাত্রী। সুতরাং যে দুদিন পরে তার চিরদিনের সঙ্গিনী হবে, তার 'গৃহিণী সচিব সখী'—তার কাছে কোন মিথ্যা সে বলবে না। জীবনের ভিত্তিকে মিথ্যার ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে দেবে না সে। তাই সে বহু মুসাবিদা ছিঁড়ে ফেললেও তথ্য একটাও ভুল লিখল না। বদল যা করল ভাষায়, প্রকাশের মুন্সিয়ানায়।

বয়সটা সম্বন্ধেই সবচেয়ে দ্বিধায় পড়েছিল। মেয়েটির বয়স লিখেছে ওরা চব্বিশ, মেয়েদের বয়স সাধারণত কমিয়েই বলে সকলে—সুতরাং ধরে নেওয়া যাক ছাব্বিশ-সাতাশ। তার বয়সটা সে-ক্ষেত্রে সাঁইত্রিশ হলেই ভাল শোনাত। তাই লিখবে নাকি? আয়নার দিকে তাকিয়ে দেখল পুলক, পঁয়ত্রিশ বললেও লোকে অবিশ্বাস করবে না—এমনই চমৎকার তার স্বাস্থ্য। না কি—আটত্রিশ-উনচল্লিশ লিখবে—? একটা মিথ্যা কথায় দোষ কি?

কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেটুকু দুর্বলতাও জয় করল।

মিথ্যা মিথ্যাই। যখন মিথ্যা লিখবে না স্থির করেছে তখন আর কেন।

সে লিখল, পাত্রের বয়স চল্লিশ পূর্ণ হইয়াছে, কিন্তু দেখায় তেত্রিশ-চৌত্রিশের মতো। যেমন-সুন্দর স্বাস্থ্য তেমনি স্থির যৌবন। মাসিক আয় বর্তমানে সাড়ে চারশ টাকার মতো—তবে ভবিষ্যতে আরও বাড়িবে। পাত্র দেশী পাস্তাবী ফার্মে কাজ করেন, আড়াই শো টাকার মতো মাহিনা। বাকীটা জীবন-বীমার দালালি করিয়া উপার্জন করেন। গৃহসুখ লাভ করিলে অধিকতর পরিশ্রম করিয়া অধিকতর উপার্জন করিতে পারিবেন। কলিকাতায় কোন বাসা নাই, পাত্র হোটেলে থাকেন, বিবাহ স্থির করিলে বাসা ভাড়া করিবেন। পাত্রের মা আছেন, বাবা নাই। পৈতৃকবাড়ি এলাহাবাদে। মা'রও কিছু সম্পত্তি আছে, তাহার অর্ধেক পাইবার কথা। ছোট ভাই বিবাহিত, তাহার সন্তানাদি আছে, তবে সেও ভাল কাজ করে। যদি মত হয় তো নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাত্রের সহিতই সাক্ষাৎ করিবেন।

চিঠি ডাকে দিয়ে যাকে বলে দুরু দুরু বক্ষে উত্তরের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল পুলক।

উত্তরও ঠিক নয়—মানুষটার আশাই বেশি। একদিন সে অফিসের ফেরৎ সোজা বাড়ি চলে আসে, যদিই সেই 'কাকা' এসে ফিরে যান এই ভয়ে। ইতিমধ্যে সে পাঁজি কিনেছে, মোটামুটি দু-তিনটে দিনও দেখে রেখেছে। এ মাসে আর হবে না,—মাত্র দশ দিন আছে, এ মাসের পরের মাসে বিয়ে নেই—তার পরের মাসের প্রথম দিকে হ'তে পারে। তা তারও কিছু সময় লাগবে, বাসা ঠিক করতে হবে একটা। ছোট্ট একটি ফ্ল্যাট, শ'খানেক টাকার মধ্যে পেলে ভাল হয়।

সে অফিসের দু-তিনটি বন্ধুকে বলে দালাল লাগিয়ে দিলে। এদিকে কসবা, বালিগঞ্জ, যাদবপুর, ওদিকে সিঁথি দমদম বরানগর—যেখানে হোক একটি ছোট্ট ফ্ল্যাট চাই। ভাড়াটা একশ থেকে একশ' কুড়ির মধ্যে হলেই ভাল হয়। একটা ঘর পেলেও আপত্তি নেই। যদি পৃথক কল-পাইখানা থাকে।

এইসব আয়োজনের সঙ্গে মনে মনে মেয়েটিকেও কল্পনা করার চেষ্টা করে—দুদিন পরে যে তার বধূ হবে। মনে তার নিত্য যাওয়া-আসা' রবীন্দ্রনাথের সেই পংক্তি সত্য হয়ে ওঠে। বারবার ফটোখানা বার করে দেখে। দেখতে দেখতে ইদানীং বেশ পছন্দ হয়ে গেছে তার, এখন তো রীতিমতো সুন্দরীই মনে হয়। কী-ধরণের শাড়ি তাকে মানাবে, সে কী রঙ ভালবাসে, আরও কি-কি তার পছন্দ, কেমন রুচি হবে তার—এ নিয়ে জল্পনা-কল্পনার অন্ত নেই। খরচ ওরা করবে বলেছে, তা সে যা হয় করুক, দরদস্তুর করে বিড়ম্বিত করবে না—পাত্রীপক্ষকে। পাত্রীর না মনে মনে তার সম্বন্ধে বিতৃষ্ণার ভাব দেখা দেয়, খরচ সে-ই করবে বরং। নগদ একটি পয়সাও চাইবে না। তার যা হাতে আছে তাতে না কুলোয় না হয় আপিস থেকে কিছু ধার করবে। কৃপণতাও করবে না, তাই বলে। এতকাল পরে যেমন বিয়ে করছে, বয়ের মতোই বিয়ে করবে।

সবই ঠিক, এখন শুধু ওদের চিঠি বা কারুর আসার অপেক্ষা।

কিছু সময় লাগবে তা পুলক জানে। আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে পরামর্শ করবে অবশ্যই। খরচ-পত্রের কথাটাও হিসাব করে দেখতে হবে। বিয়ে এক কথায় ঠিক করা যায় না। হয়ত তার সম্বন্ধে খোঁজ-খবরও করছে কিছু কিছু।

সুতরাং প্রথম সাত আট দিনে তত বিচলিত হয় নি পুলক। কতকটা নিজের চিন্তায় নিজে মশগুল ছিল। কিন্তু আটদিন কেটে যেতে বেশ একটু বিরক্ত হয়ে উঠল, সেইসঙ্গে কিছু বিস্মিতও। তার মতো পাত্র বিবাহে সম্মত হয়েছে জেনেও পাত্রীপক্ষ চুপ ক'রে ব'সে থাকে--- এ একটু বিস্ময়কর ঘটনা বৈকি! আবার এমনও মনে হ'তে লাগল---তার চিঠিটা পেয়েছে তো? যা আজকালকার ডাকের ব্যবস্থা, মারা যাওয়াও বিচিত্র নয়। আর চিঠি না পেলে তো সবই মাটি, তার ঠিকানাও তো পাবে না! হয়ত মনে করছে পাত্রেরই মত নেই এ পাত্রীতে।---

আরও তিনদিন দেখে পুলক আর একটি চিঠি দিল।

এবার উত্তরও পেল। তবে ডাকে নয়---দৈবাৎ।

এ চিঠি দেওয়ার পরের দিনই বোধ হয়, অফিসের ফেরৎ কী-একটা বীমার 'কেস'-এর তদ্বিরে শ্যামবাজারে যাচ্ছিল দোতলা বাসে চেপে। অন্য মনস্ক হয়েই বসে ছিল, ফ্ল্যাটের এখনও কোন কিনারা হ'ল না সে-ই ছিল দুর্ভাবনা---হঠাৎ বিয়ে শব্দটা কানে যেতে ঈষৎ সচেতন হয়ে উঠল। দেখল ঠিক তার সামনের সীটেই দুটি ভদ্রলোকে কথা হচ্ছে। তারই বয়সী দুটি ভদ্রলোক, যদিও দুজনেরই চুলে পাক ধরেছে বেশ---একজন আর একজনকে বলছে, 'হ্যাঁ—বিয়ের কথাই বলছি, তুই যে আকাশ থেকে পড়ছিস একেবারে। এবার লাগা যা হয় করে, আর—কবে করবি? এর পর যে আর কেউ বে দেবে না।'

'দাঁড়া—ভাইঝিটার একটা গতি না করে কিছুই করতে পারছি না যে। কী যে অভদ্রা লেগেছে, কোথাও একটা সম্বন্ধ দানা বাঁধছে না। অতবড় ছাব্বিশ-সাতাশ বছরের মেয়ে বাড়িতে বসে—নিজে তার সামনে কী আক্কেলে বিয়ে ক'রে বসি বল। দাদা যে এ কী বিপদে ফেলে গেল আমাকে। তাও যদি বাবা বেঁচে থাকতেন তো একটা কথা ছিল, এখন তো আমার ঘাড়েই সব।'

'সত্যি, গ্র্যাজুয়েট মেয়ে—কিছু খরচও করবি তোরা, মেয়েও কিছু কালো-কুচ্ছিত নয়—তবু কেন যে সম্বন্ধ লাগছে না একটাও! আশ্চর্য।---এই জন্যেই বোধহয় বলে ভবিতব্য।'

তারপরই বুঝি মনে পড়ে যায়। বলে, 'ভাল কথা, সেদিন যে সেই বিজ্ঞাপনটা দেখে চিঠি দিলি তার কী হ'ল? উত্তর এল কিছু?'

'ধ্যৎ! সে আর বলিস নি। একখানা ফটোই মাটি শুধু শুধু। ও কি আর ফেরৎ পাওয়া যাবে? সে নিহাৎই বাজে সহজ। বয়সের গাছ-পাথর নেই, নিজে লিখেছে এক চল্লিশ। কোন না তেতাল্লিশ-চুয়াল্লিশ হবে,

আপনার যদি থাকে
র‍্যালে সাইকেল—
গর্বে মাটিতে পা পড়বে না

হ্যাঁ, সাইকেল হ'ল র‍্যালে। যেমনি চলন, তেমনি গড়ন। চড়ে গেলে লোকে তাকিয়ে দেখে। হবে না? দুনিয়ার সবচেয়ে নামী সাইকেল। র‍্যালের কদরই আলাদা। যার র‍্যালে থাকে, তার খাতির বেশী হয়। র‍্যালে যদি আপনার বাহন হয়, গর্বে আপনারও মাটিতে পা পড়বে না।

র‍্যালে ভারতের সর্বাধুনিক সাইকেল কারখানায় সেন-র‍্যালের তৈরী

SRC.88 BEN

আবার লিখেছে—দেখায় ত্রেত্রিশ-চৌত্রিশের মতো, যেমন অটুট স্বাস্থ্য তেমনি স্থির যৌবন।---আওার গ্র্যাজুয়েট পাত্র। না চাল না চুলো—বিয়ে ঠিক হলে তিনি দয়া ক'রে বাসা ভাড়া করবেন। এতখানি বয়সে আড়াই শো টাকা মাইনের চাকরি করে তাও দিশী ফার্মে—তার আশা সে বাড়ি ভাড়া দিয়ে মাগছেলে নিয়ে সংসার চালাবে। বোঝ একবার আস্পর্দ্ধাটা।'

'তাই নাকি! সাহস তো কম নয়। রীতিমতো ধাষ্টামো।'

'তা নয়। পাগল। নইলে আর ঐ কথা লেখে—যেমন সুন্দর স্বাস্থ্য তেমনি অটুট যৌবন। আবার লিখেছে গৃহ সুখলাভ করিলে অধিকতর পরিশ্রম করিয়া আরও বেশি উপার্জন করিতে পারিব।'

'তাই নাকি। মরেছে। বদ্ধ পাগল বল্!----কত রকমের বিচিত্র জীব যে আছে পৃথিবীতে! পাগলা গারদের বাইরেই পাগল বেশি। তা আর কোথাও খোঁজখবর পাচ্ছিস না?'

আর শোনার দরকার ছিল না। শুনলও না পুলক। মধ্যপথেই নেমে পড়ল। নেমে পড়ে দেখল হেঁদোর সামনা-সামনি নেমেছে। ধীর মন্থর পায়ে গিয়ে একটা বেঞ্চে বসে পড়ল।

তখন কিছু ভাববার মতো অবস্থা ছিল না। কান মাথা ঝাঁ ঝাঁ করছিল অপমানে। শুধু ভগবানকে ডাকছিল একটা স্ট্রোক-টোক না হয়ে যায় এইখানে—এই অপরিচিতদের মধ্যে।---

ভারতে শুরু করল অনেক রাত্রে হোটেলে ফিরে। সে-রাত্রে খেল না কিছু, খাবার মতো অবস্থা ছিল না। পর পর কাপ দুই কফি আনিয়ে খেল শুধু। তারপর মাথায় জল দিয়ে সুস্থ হয়ে এসে বসল চেয়ারে।

প্রথমটা মনে হ'ল কড়া ক'রে চিঠি লেখে একখানা। খানিকটা মুসাবিদাও করে ফেলল বসে বসে। লিখল যে 'আপনারাই বাধ্য করেন মানুষকে মিথ্যা বলতে। সরলতাকে বলেন পাগলামি।' কিন্তু খানিকটা লেখার পর নিজেরই লজ্জা হ'ল। ছিঃ! আরও পাগল ভাববে হয়ত, নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করবে।

সে কাগজ ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে একটুকরো কাগজে শুধু লিখল, 'জবাব পেয়ে গেছি, ধন্যবাদ। আপনাদের মহামূল্যবান ফোটো ফেরৎ পাঠালাম।' তারপর সেই কাগজসুদ্ধ ছবিখানা খামে পুরে সেই রাত্রেই হোটেলের চাকরকে ডাকবাক্সে ফেলিয়ে কতকটা নিশ্চিন্ত হ'ল।

তারপরও দিন দুই-তিন শুধু ভেবেছে। আকাশ-পাতাল ভেবেছে। আদৌ বিয়ে করবে কি না। করলেও ঐ 'স্কুল ফাইন্যাল ফেল' ও 'ম্যাট্রিক মান' দুটি মেয়েকে দেখবে কি না তাও ভাবল ক'দিন। কিন্তু সেটাও ঠিক মনঃপূত হ'ল না।

এখনও কিছু ঠিক হয়ও নি। তবে মোটামুটি মন স্থির ক'রে ফেলেছে বাসা একটা পেলে ভাড়া ক'রে গৃহস্থালী সাজিয়ে ফেলবে, তারপর আর একটা বিজ্ঞাপন দিয়ে দেখবে। এবার একটাও সত্য কথা বলবে না, 'গ্র্যাজুয়েট পাত্র, বড় ইঞ্জিনীয়ারিং ফার্মে চাকুরি করেন, মাসিক ৭০০৲ উপার্জন। বয়স ৩৩।৩৪, প্রচুর পৈতৃক ভূসম্পত্তি আছে। নির্দায় নির্ঝঞ্ঝাট।' খুব ভাল শোনাবে। অনেক চিঠি আসবে এবার—সে বিষয়ে সে নিঃসন্দেহ। নিজে না করলেও অনেক বিয়ে দেখেছে সে, কেউ সার্টিফিকেট বা ডিগ্রি খুলে দেখতে চায় না। মাইনেও সঠিক গিয়ে অফিসে জানতে চায় না কেউ। ফার্ম তো নাম করা—তাতেই বিশ্বাস হবে যে অনেক টাকা মাইনে পায়।---ভাল কোন প্রস্তাব এলে মা'র জবানীতে চিঠি দেবে, মা'র সঙ্গেই দেখা করতে বলবে, তারপর যেদিন আসবে তারা সেদিন বলবে 'আমার ছোট ভাইয়ের অসুখের খবর পেয়ে মা কাল রাত্রেই মির্জাপুর চলে গেছেন, আমাকেই কথাবার্তা কইতে বলেছেন, তিনি এসে পাকা করবেন।'

না, সত্য কথা আর একটাও বলবে না সে। এবার চালাক হয়ে গিয়েছে।

জ্ঞাননেত্র খুলে গেছে তার।

এখনও ভাবছে অবশ্য। সময় আছে ঢের, ফ্ল্যাটটা না পাওয়া পর্যন্ত কিছু করা যাচ্ছে না। তাড়াতাড়ি কিছু করবেও না, আটঘাট বেঁধে কাজে নামবে, কোথাও কোন ফাঁকি না থাকে মিথ্যার মধ্যে।

এখন মনে পড়ছে তার, ছেলেবেলায় তার এক শিক্ষক কেষ্টবাবু মহাভারত থেকে একটি শ্লোক শুনিয়েছিলেন যে, কি কি পাঁচটা অবস্থায় মিথ্যা বলতে দোষ নেই—তার মধ্যে দুটো কথা মনে আছে, স্ত্রীর কাছে বা বিবাহকালে মিথ্যা বলতে দোষ নেই।

হাজার হোক ব্যাসদেব সত্যদ্রষ্টা, ঋষি। ঠিকই বলে গেছেন।

কিম্বা, তিনিও পুলকের মতো কোনদিন ঠেকে শিখেছেন কি না কে জানে।

মাছ ধরার ও খেলাধূলার সরঞ্জাম বিক্রেতা

সেন ব্রাদার্স— ১৫৫।২, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

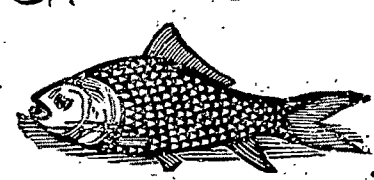

জীবনের নাম বেদনা

(১৬৯ পৃষ্ঠার পর)

মর্মান্তিক পরিণতির কথা নিয়ে কেউ গোপনে আলোচনা করছে না।

অন্যমনস্ক হয়ে পথ চলতে-চলতে সুনন্দ আবার তার গলির মোড়ে এসে দাঁড়ালো। ঘরের দরজা এখনও বন্ধ, অন্ধকার। নীলিমার বাবা কাল পর্যন্ত সময় দিয়েছেন, তার মধ্যে একটা খবর যা হোক কিছু দিতেই হবে। কি বলবে সে? জীবনের ব্যর্থ পরাজয়ের করুণ কাহিনী কিভাবে তুলে ধরবে প্রচণ্ড ঘৃণা ও অসম্মান-ভরা দৃষ্টির সামনে। চোখ বন্ধ করে সুনন্দ একবার নীলিমার মুখের রেখাগুলো স্পষ্ট করে ভাবতে চেষ্টা করল। কি ছিলো তার চোখে? অবিশ্বাস না মোহভঙ্গের কান্নাভরা অবসাদ। নীলিমা কি বুঝতে পেরেছিল সুনন্দ তার প্রতিটি হাসি, প্রতিটি উচ্ছলতার অন্য অর্থ করতে শুরু করেছে।

অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে তক্তপোষের ওপর শুয়ে পড়ল সুনন্দ। সারাদিন খাওয়া হয় নি, তাই বোধহয় পা দুটো অমন থর-থর করে কাঁপছে। মাথার মধ্যে একটা ফাঁকা শূন্য অনুভূতি। মধুবনীতে তাকে পৌঁছতেই হবে কালকের আগে, অনেকবার এই সংকল্প তার মনে আসা-যাওয়া করছে। সেখানে অন্ধকার এমন বিকৃত বীভৎস নয়, সেখানে সমস্ত রাত্রির আকাশে তারা ফুটে থাকে।

'যখন ছোট ছিলাম, মনে হোত কলকাতায় যাওয়ার আগে কয়েকটা তারা নিয়ে যাই সঙ্গে করে—' মাধবী হাসতে হাসতে বলেছিলো—'কলকাতায় তারা দেখাই যায় না এমন করে—।'

মাধবীর সরু কপালের পাশে নরম চুল দুলছে। হাসলে ওর গালে মিষ্টি টোল পড়ে, এমনি একটা ছবি যখন সুনন্দ মনের ফ্রেমে বসাতে ব্যস্ত, তখন হঠাৎ পাশাপাশি নীলিমার মুখ ভেসে উঠল। দরজায় একটা জোরে শব্দ পাওয়া গেল সঙ্গে সঙ্গে।

'বাবু—বাবু—উঠে পড়ুন। পুলিশ—।'

সুনন্দ উঠল না। মধুবনীর রাস্তাটা অনেকখানি কাছে সরে এসেছিল—এখন আবার অনেক দূরে হারিয়ে গেছে। ডাইনে বাঁয়ে সামনে, কোথাও আলো নেই। জীবনের নাম সুখ নয়, বেদনা। তাই আলো খুঁজে মানুষ কেবল ঘুরেই মরে।

একসঙ্গে অনেকগুলি লোক এসে দাঁড়ালো, সুনন্দ এটুকু মনে করতে পারল। দপ করে আলোটাও বোধহয় জ্বলে উঠেছিল। কেউ কোন কথা বলবার আগেই সে উঠে বসে সহজ ভঙ্গীতে বলতে শুরু করল—

'আমার স্ত্রী নীলিমাকে আমি খুন করেছি। চটের থলির মধ্যে যে খণ্ড খণ্ড শরীরটা পাওয়া গেছে, সেটা ওরই।

'কেন এ কাজ করেছি জানতে চান? 'আমি নীলিমাকে ভালোবাসতাম। সেই ভালোবাসাই আমার বিচার-বুদ্ধি-বিবেচনাকে ক্রমশ আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। আমার মনে হয়েছিল সুব্রতর সঙ্গে ওর সম্পর্ক ক্রমশ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠছে। শুধু সুব্রত একা নয়, যে কোন তৃতীয় ব্যক্তির সঙ্গে ওর কোনোরকম অন্তরঙ্গতা আমার পক্ষে অসহ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

'এ কাজ আমি হঠাৎ করি নি, অনেকদিন ধরে ভেবেচিন্তে গুছিয়ে করেছি। কেবল ঐ মাদুলীটা খোলা হয় নি। ঐ একটি মাত্র প্রমাণের জন্যেই আমাকে আত্মসমর্পণ করতে হোল।

'আমি অনুতপ্ত অথবা দুঃখিত নই। এ ছাড়া আর কিছু আমার করার ছিল না। হয়তো পাগল হয়ে যেতাম শেষ পর্যন্ত।'

যেন অনেকদিন ধরে মুখস্থ করে রাখা কথাগুলো এমনিভাবে একটানা বলে সুনন্দ নিশ্চিন্ত হয়ে চোখ বুজল। মধুবনীর স্বপ্নটা দেখার আর কোনো মানে হয় না, তবু তার চোখের সামনে যেন অনেকগুলো তারা দপ্‌দপ্‌ করে জ্বলছে।

FOR THREE-YEAR DEGREE COURSE

অধ্যাপক প্রমোদবন্ধু সেনগুপ্ত প্রণীত

1.	দর্শনের মূলতত্ত্ব —(ভারতীয় ও পাশ্চাত্ত্য দর্শন—৩য় সংস্করণ)	14·00
2.	ভারতীয় দর্শন— Indian Philosophy (৩য় সংস্করণ)	7·50
3.	পাশ্চাত্ত্য দর্শন— Western Philosophy (৩য় সংস্করণ)	7·50
4.	নীতিবিজ্ঞান ও সমাজদর্শন —(৫ম সংস্করণ)	14·00
5.	নীতিবিজ্ঞান— Ethics (৫ম সংস্করণ)	7·50
6.	সমাজদর্শন— Social Philosophy (৪র্থ সংস্করণ)	7·50
7.	মনোবিদ্যা— Psychology	12·00
8.	**Handbook of social Philosophy** (Pass & Hons.)	10·00

অধ্যাপক মহাদেব চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

1.	রাষ্ট্রবিজ্ঞান— Political Theory (১ম খণ্ড)	7·00
2.	ভারতের সংবিধান— Constitution of India (২য় খণ্ড)	4·00

অধ্যাপক ঋতেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত

1.	শিক্ষা-তত্ত্ব— (Principles and Practice of Education)	6·50
2.	ভারতের শিক্ষা সমস্যা— (Indian Ed. Problems)	10·00

অধ্যাপক সেনগুপ্ত ও রায় প্রণীত

1.	শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান —(Ed. Psychology with statistics)	13·00

অধ্যাপক চৌধুরী ও সেনগুপ্ত প্রণীত

1.	তর্কবিজ্ঞান প্রবেশ —(৩য় সং —Deductive & Inductive)	5·50
	[*Recommended by the C. U. and N. B. U. as a Text book*]	
2.	Logic Made Easy (in Bengali) —Banerjee	2.25

BP

BANERJEE PUBLISHERS

5/1A. College Row, Calcutta-9

Phone : 34-7234

সুখ নামে পাখি

বৃষ্টি-খচিত প্রাকৃতিক দৃশ্যের নিবিড় করা দিনে আমরা কনীনিকা-পিসীর বিশেষত্ব টের পেয়ে গেলাম।

হঠাৎ মনে হল আমাদের পিসীমা সকলের থেকে পৃথক, স্বতন্ত্র। সূত্র অন্বেষণে সন্ধানে পেলাম কনীপিসীর অনেক। আচরণ অনেক ব্যবহার, যা তখন তখন চোখে পড়ে নি।

চার ভাই-এর ছোট বোন কনীনিকা কনিষ্ঠা ভগিনী ঠিকই, মা-বাবার চোখের তারাও ছিলেন। তাঁরা গত হলে ভাই-দের সংসারে থাকতেন, আমরা ভাই-পোরা তাঁকে অপরিহার্য গৃহস্থালীর অঙ্গ বলেই দেখতে পেতাম।

কাজকর্ম করতে হত না ভরণ-পোষণ হেতু। ঠাকুরদার স্বল্প অর্থ কনীপিসীর নামে সুদে খাটত। অবশ্য তাতে উগ্র আধুনিকীদের মত বেশবিন্যাস চলত না। কিন্তু প্রয়োজন ছিল না কনীপিসীর, সে সাধারণ অন্য মেয়েদের মত প্রসাধন করত না।

হাল্কা শাড়ির আঁচলের সঙ্গে মানানসই একচিলতে জামাটি গায়ে দিয়ে চুলে চিরুণী কেমন করে জানি বোলাত। পাঁচ মিনিটে মুখে দু'হাতে সাধারণ ট্যালকম পাউডার ঘষে নিয়ে বার হত রাস্তায়, হঠাৎ মনে হত আলো জলে উঠত। আমাদের বোনেরা সারা মুখে মেকাপ ঘষে বয়সে বড় পিসীর পাশে দাঁড়াতে পারত না, আর হিংসায় জলে উঠত।

মায়েরা মুখ বেঁকিয়ে বলতেন, "এত বয়সে কনী যা ভাবুনে!"

শ্রীমতী বাণী রায়

কিন্তু আমরা দেখতাম কনীপিসী প্রয়োজনের অতিরিক্ত সময় কিছুতেই দিত না। একমিনিট আয়নার সম্মুখে দাঁড়ালেই তার সর্ব দেহে অগাধ পরিবর্তন সূচিত হয়। একটা ডাক্তার হাতে নিজের ঘরটায় দু-একবার ঘোরা মাত্র ঘরখানাও চক্‌মক্ করে উঠত। আর আমাদের ঘর যেন সর্বদা ম্যাট্-ম্যাট্ করত। চাকর সারাদিন ঝাড়ামোছা করেও নাগাল পেত না সেই ঘরের। দরজার পিতলের নকটি ঝিক্‌ঝিকে কষে রাখত পিসী, পাশাপাশি ঘরের দরজায় যেন পিতল পরানো, এখানে যেন সোনা। জানালার পর্দার ঝালর কেমন খাড়া খাড়া পিসীর, আমাদের মতো ন্যাতানো নয়। একই শাড়ি কনী-পিসী পরেছে, আমাদের মা-বোনেরাও পরেছে। মনে হয় পিসীর শাড়ির পাটে পাটে বুঝি যাদুকরীর বোনা যাদু।

চায়ের টেবিলে মিলতাম। যে মার্মালেড কনীপিসীর চামচেয় তুলে নীল-বর্ডারী প্লেটে রাখতেন, দু'হাতে আঙুলে টোস্টার থেকে যে রুটির টুকরোখানা তুলে নিতেন, সমস্ত কিছুর স্বাদ যেন পৃথক। আমরা কেমন বঞ্চিত বোধ করতাম, অথচ একই খাদ্য আমাদের সম্মুখে। কনীপিসী শাদা পেয়ালা হাতে ধরে মুখ ঠেকালে যেন শাদা উজ্জ্বল হয়ে উঠত, গোলাপী ফুল আরও গোলাপী লাগত। আবিষ্কার করতাম যে পেয়ালাটা চমৎকার। তখন সেই পেয়ালাটাই আমার চাই। হাসিমুখে কনীপিসী এগিয়ে দিত। কিন্তু আমার হাতে পড়ামাত্র আবার পেয়ালা নিম্নমাণ।

কারুর যদি এহেন ব্যক্তিত্ব বিকাশ থাকে, তবে তার জোটে বন্ধুও যেমন শত্রুও তেমন। জীবনটা সহজ হয় না।

কিন্তু কনীপিসী গ্রাহ্য করত না কিছুই। নিজের মনে থাকা অভ্যস্ত হয়ে যাওয়ায় অসুবিধাও দেখি নি কিছু

তার। একা-একা ঘরে বসে বই পড়ত। একা-একা বিকেলবেলায় বেড়াতে যেত।

ছেঁড়াখোঁড়া পুরনো বই অর্ধেক দামে কিনে পড়ে আবার অর্ধেক দামে বিক্রি করে দিত। আমাদের কাছে কখনও বা বই ধার করতে আসত। পাতলা ছিপছিপে ছোট চেহারা, ত্রিকোণাকার হাসিমুখ। দেখে আমাদের অত বড় পিসীমা বলে মনেও হত না। তার ভবিষ্যৎ নিয়ে বাড়ির কেউ মাথা ঘামায় নি। দেখে মনে হত কনীপিসীও ওদের মতই 'ক্যালাস্'।

যাই হোক, নিত্য যা দেখি তার বিস্ময়কোণ খুঁজে বার করা চলে না। কিন্তু ঘোর বর্ষার অপরাহ্নে ডালমুট ভোজের আসরে কনীপিসী কলাম্বাসের আমেরিকার মতই আমাদের দ্বারা আবিষ্কৃত হয়ে গেলেন।

মা বাইরের ঘনবর্ষণের দিকে চেয়ে সবাইকে বেগুনীর থালা এগিয়ে ধরলেন বললেন, "আজও রাস্তায় জল জমে গেল।"

কাকা সোৎসাহে কর্পোরেশনের নিন্দামুখর হলেন। তাঁর বহুদিন প্রোমোশন হচ্ছে না চাকুরীতে। তিনি নিজে কর্পোরেশনের চাকুরে। আবার চাহিদা মিটে গেলেই বিগলিত বিশ্বস্ত ভৃত্য হবেন।

মা এধার-ওধার চেয়ে চেয়ে বলে উঠলেন। "বলতে চাই না। বড় হয়ে গেছে, যে যার মত স্বাধীন। কিন্তু কনী বেরিয়ে গেছে। এই অঝোর বাদলায় কেউ বার হতে পারে নাকি?

বাবা বললেন, "কনী পারে।"

আকাশে তখন বিদ্যুৎ চমক ছিল না, কিন্তু আমাদের মন হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকে গেল। কনীপিসী যা পারে অন্য কেউ পারে না। কেন? না কনীপিসী অন্যের চেয়ে আলাদা।

কাকীমা চা-তৈরি করছিলেন। ভাসুরের সঙ্গে কথা বলেন, কিন্তু সম্ভ্রম বজায় রেখে ছোট সেজে গুরুজনের মর্যাদা দিতে আধো আধো হাস্যকর স্বরে কথা বলেন।

কাকীমা বলেন, "ফিরে এলে জিজ্ঞাসা যদি করি কোথায় এত বাদলায় গিয়েছিলে, উত্তর দেবে না। ওর পেটের কথা জানা শক্ত।"

বর্ষণ-ব্যাকুল দিন কি এতটাই আবিষ্কারে গুরু হয়ে উঠল; কনীপিসীর কোন কথা কই কখনও কেউ জানে না মধ্যে মধ্যে টেলিফোনে ডাক আসে, কে ডাকছে, কার সঙ্গে কথা বলছে কনী জানা যায় না। কার বাড়ি যায় বলা চলে না। কদাচিৎ কনীপিসীর কাছে অভ্যাগত আসে। পর্দাঘেরা ঘরের মধ্যে একটু বসে বিদায় নেয়। মা-বাবা বন্ধুদের মত চা-খাবার খায় না।

মনে হল তাইতো, কনীপিসী স্রোতেভাসা ফুলের মতই বাড়ির মধ্যে আলগা ভাসছে। কোথাও শিকড় নেই তার। কিন্তু লক্ষ্য করে দেখে না কেউ কনীপিসী ভাসছে। দেখলে ধরা যেত না কি?

নিজের মায়ের দিকে দেখলাম। স্থূল দেহে চওড়াপাড় শাড়ি, হাতে মোটা মোটা একগাদা চুড়ি বালা। সিঁদুর লেপে সিঁথিটা চওড়া। মুখে দম্ভে স্ফীত গৃহিণীপনা।

কাকীমার দিকে দেখলাম।

কেমন ভাঙা গাল ঢেকে চুলের বিন্যাস। হাতে পায়ে গায়ে তেল চিক্‌চিক্। দেখে মনে হয় নিম্ন-মধ্যবিত্ত ঘরের গাল ভাঙা-দ হঠাৎ একটা আধুনিক বালিগঞ্জী বাড়ির চার্জ পেয়ে গেছে।

এদের পাশে কনীপিসী অন্য জগতের লোক।

ভাবতে ভাবতে কনীপিসী এল। গায়ে পুরানো বর্ষাতি একখানা জড়ান। টপ্‌টপ্ করে ঝাঁকড়া চুল থেকে জল ঝরছে।

বাবা ভ্রূকুঞ্চন করলেন, কাকা মুখ বিকৃতি। কনীপিসীর ব্যবহার তাঁদের মনোপূত নয়। তাই তাঁরা নীরব বিরক্তি জানান। তাকে সংশোধনের দায়িত্ব তাঁদের নয়। যা খুশি হোক। নেহাৎ অন্যটা বোনকে বাড়ি থেকে বার করা যায় না, আইনগত ক্ষমতাও নেই।

মা বলেন, "তোমার কথাই হচ্ছিল কনী। এত বাদলায় কেউ বাইরে যায়? এখন অসুখে পড়লেই চিত্তির।"

কাকীমা আধোগলায় বললেন, "তোমার চা করব, কনী?"

"না। চা খেয়ে এসেছি।" দুই ভ্রাতার দিকে সভয় দৃষ্টিক্ষেপ করে কনীপিসী নিজের ঘরের দিকে চলে

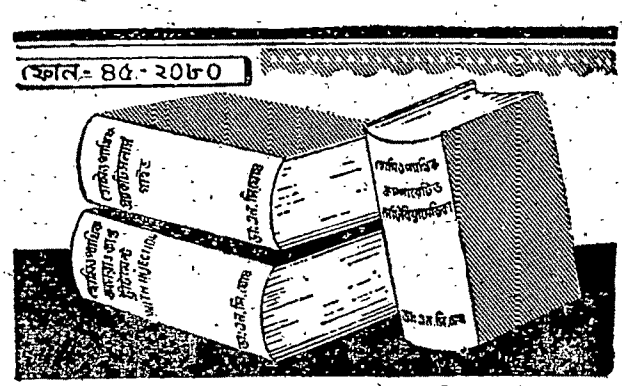

ঘোষ হোমিও ফার্মেসী
প্রতিষ্ঠাতা - ডাঃ এন, সি, ঘোষ এম,ডি (ইউ,এস,এ)
ঔষধ ও পুস্তক বিক্রেতা
৪৪বি, মনসাতলা লেন (খিদিরপুর) কলি:২৩

গেল। দেখেছি সে পারতপক্ষে দাদা-দের কাছে যেষত না।

কনীপিসীর চরিত্র আবিষ্কারের ফলে তখন আমি কৌতূহলী। পায়ে পায়ে তার ঘরের দিকে গেলাম।

"এসো প্রকাশ।"

কনীপিসী জামা কাপড় ছেড়ে মাথা মুছছে তোয়ালে দিয়ে।

বললাম, "ভিজেছে চুল বুঝি, কনীপিসী?"

"উঁহুঁ না, না।"

"যেমন বেণী তেমনি রবে
চুল ভেজাব না।"

কনীপিসীর গলায় আনন্দ ঝরে পড়ছে।

"কোথায় গিয়েছিলে? বন্ধুর বাড়ি?"

মুখ টিপে কনীপিসী "না, না। বলা হবে না, হবে না।

আমার ছোট বোন রেণু ঘরে ঢুকলো, "কনীপিসী, আজ কিন্তু জয়াদের বাড়ি নেমন্তন্ন; মা জিজ্ঞেস করলেন যে তুমি যাবে তো?"

কনীপিসী সর্বদা নিমন্ত্রণবাড়ি যেতে চাইত না। কিন্তু প্রতিবেশী-কন্যা জয়া রাস্তার উল্টো দিকে থাকে, তার বিয়েতে নিশ্চয় যাবে। কনীপিসী নিমন্ত্রণবাড়ি না গেলে অনুরোধ করে নিয়ে যাবার কেউ ছিল না।

'না' বলতে মুখ খুলল কনীপিসী, দেখলাম। আবার কি ভেবে বলল, "আচ্ছা, যাব। আজ যাব।"

যেন তার জীবনের একটা পরমোৎসব দিন উপস্থিত। উৎসবের ভাগ সে সবাইকে দিতে চায়।

গুন্‌গুন্ গান গাইতে গাইতে কনীপিসী পরিচ্ছদ পরিবর্তনে মন দিল:

"আমি রবো না সতী হবো না অসতী
পতি ছাড়িব না।
যেমন বেণী তেমনি রবে
চুল ভেজাব না।"

"পূর্ণদাস বাউলের গানখানা বারবার গাইছ যে আজ, কনীপিসী।"

আমার গালে লঘু ঠোকনা দিয়ে কনীপিসী বলল, "অনেক বয়স হয়েছে তোর, প্রকাশ। বুঝিস না আনন্দে লোকে অনেক কিছুই করে। গান আসে আনন্দে।"

নীলাভ একটা শাড়ি পরল কনী-পিসী, জরির পাড় বোনা। সূক্ষ্ম খোলে ছোট ছোট জরির ফুল। কোন নাম যেন শাড়িটার মেয়েরা বলে, চান্দেরি না কি? হাতকাটা গোলাপী একটা জামা গায়ে। কানে লম্বা গোলাপী প্রবালের গয়না ঝুলিয়ে দাঁড়াল আয়নার কাছে।

ইতিমধ্যে রেণুর হয়ে গেছে। কৌতূহলাক্রান্ত হয়ে সে এসেছে আগেই কনীপিসীর দরজায়।

পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকে থমকে গেল। দামী বারাণসী ধূপছায়া শাড়ি পরে এসেছে রেণু। সুতোর শাড়ি পরা কনীপিসীর কাছে নিভে গেল সে। যেন রং-চংমাখা একটি বাঁদর। অথচ রেণু সুন্দরী—খ্যাতি আছে।

কালো মুখ করে রেণু বলল, "বাবা, কী-ই সুন্দর শাড়িখানা পরেছো কনীপিসী! একেবারে লেটেস্ট। ভাল আর দেখাবে না কেন!"

উজ্জ্বল মুখে কনীপিসী বলল, "তোরখানাও তো লেটেস্ট।" চওড়া স্কার্ট পাড়ের দিকে আঙুল তুলল কনী-পিসী।

"বেণারসীই সেকালে হয়ে গেছে, তার আবার লেটেস্ট।" কনীপিসীর শাড়ির খোল ধরে বলল রেণু, "যেন হাওয়ায় উড়ছে।" নিজের শাড়ির দিকে চেয়ে মুখ কালো হল আরও। একটা নিঃশ্বাস পড়ল।

একটুক্ষণ রেণুর মুখের দিকে চেয়ে কনীপিসী বলল, "তুই এই শাড়িখানা পর আজ।"

"না, থাক।"

"না, না। থাকবে কেন? পর না, আমার সখ হয়েছে।"

শাড়িখানা অবশেষে পরে রেণু বলল "আমার শাড়িখানা তুমি পরো তাহলে?"

"দূর! অত জমকালো শাড়ি আমাকে মানায় না। আমি অন্য একটা পরে নিচ্ছি।"

শাড়ি বদল করার পরে দেখা গেল রেণুর জামা মানাচ্ছে না। জামা অন্যের চলবে না। কনীপিসীর জামার দিকে কটাক্ষ চেয়ে রেণু নিজেদের এলাকা থেকে গোলাপী জামা পরে এল।

কিন্তু আয়নার ছায়া বলে দিল—এই শাড়ি পরিহিতা আগের মূর্তি কত পৃথক ছিল।

সতৃষ্ণ চক্ষে কনীপিসীর কানের দোদুল্যমান গয়নাটার দিকে চেয়ে রেণু বলল, "অ্যাকসেসারি না থাকলে শাড়ি মানায় না?"

"মানে? ও,"—কানে থেকে অবহেলায় ঝোলানো দুল খুলে ধরল কনীপিসী, "এই নে।"

বিনা বাক্যব্যয়ে রেণু সে দুটি কানে ঝুলিয়ে অতি আগ্রহে এগিয়ে গেল আবার আয়নায়।

নিরাশ স্বরে বলল, "আর একটু মেকাপ লাগাবে বোধহয়। কনীপিসী তুমি অয়েলি মেকাপ লাগিয়েছ, না?"

"আমি কোন মেকাপই দিই নি।"

রেণু আবার গেল মুখ-চর্চায়।

একসঙ্গে বিয়েবাড়ি যাবার ব্যাচে বার হল সকলে। কনীপিসীর পোষাকে রেণু। কনীপিসী একখানা পাতলা বাসন্তী সুতী শাড়ি পরেছে কানে সোনা এবার।

কিন্তু মনে হল কনীপিসী অনন্যা, অন্যরকম। সে যা করে তৎক্ষণাৎ অন্যরূপ নেয়। এই যে বাসন্তী শাড়ি কনীপিসীর গায়ের ছোঁয়ায় পরীরাণীর শাড়ি হয়ে গেল। অথচ যে নীল শাড়ি কনীপিসীর অঙ্গে স্বপ্ন বুনেছিল সেই শাড়িখানা রেণুর গায়ে ভার হয়ে ঝুলছে। বর্ণ ও তার সাগর স্বপ্ন হারিয়েছে।

সিণ্ডেরেলার কাহিনী মনে পড়ে গেল। পরীরাণীর ছোঁয়ায় ইঁদুর হয় শাদা ঘোড়া, কুমড়ো হয় গাড়ি। কনীপিসীর ছোঁয়া লেগে জীবনই অন্যরূপ ধরে।

আবিষ্কারের গুরুত্বভরা বাদল সন্ধ্যার পরে বহুদিন কেটে গেল। দু-এক বছর। আমি পাশ করে চাকুরী খুঁজতে সুরু করে দিলাম।

While purchasing your cloth please insist on quality production.

We are always ready to meet the exact type of your requirement.

NEW GUJRAT COTTON MILLS LIMITED

9, Brabourne Road,
CALCUTTA-1

Phone : 22-9121 (6 lines)

MILLS :

Naroda Road, Ahmedabad.

প্রায়ই নিজের যন্ত্রণায় ব্যস্ত থাকতাম। কিন্তু বাড়ির মধ্যে একটা কিছু ঘটছে বুঝতে পারি। চুপচাপ ঝিমোনো আবহাওয়া মধ্যে মধ্যে কেটে দেয় ফিস্‌ফাস্, বাবা-কাকা-মা-কাকীমার জটলা। কনীপিসী কেন্দ্রবিন্দু।

কনীপিসীর মুখের হাসিও যেন থমকালো। কেমন শুকিয়ে ওঠে দিন দিন। চোয়াল জেগে উঠেছে ওর, চোখের নীচে কালি। উন্মনা হয়ে বসে থাকে, কিন্তু ছট্‌ফট্ করে।

আমার মনে পড়ে ছেলেবেলায় যে জাঁতিকল পেতে ইঁদুর ধরতাম, সেই ইঁদুরের কথা। একখানা পা ধরা পড়েছে কলে, ছট্‌ফট্ করে মরছে ইঁদুর। কোনমতে ছাড়া না পেলে চলে না তার। একবার পা'খানা ছাড়াতে পারলেই সে মুক্তি পায়। তেমনি কোথাও আবদ্ধ থেকে ছট্‌ফট্ করছে কনীপিসী। সমস্ত দেহমন তার বাইরের দিকে উন্মুখ। একবার মুক্তি পেলেই মুক্ত হতে পারে সে।

কিছু বুঝতে পারতাম না। বুঝবার মত সময়-শক্তিও ছিল না। কারণ বেকারত্বের গ্লানি নিয়ে আমি তখন উদ্‌ব্যস্ত। সর্বদা ছুটোছুটি করছি অফিসের চৌকাঠে-চৌকাঠে।

হঠাৎ একদিন সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে দেখি তুমুলকাণ্ড। মা সংবাদ দিলেন, "তোমার কনীপিসী চলে গেছে।"

"চলে গেছে কোথায়?"

"যেখানে এতদিন যাবে বলে ঠিক ছিল।"

আমি ব্যাপারটা জানি না বলে অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম। মা যা বললেন শুনে আমি স্তম্ভিত।

কনীপিসীর দীর্ঘদিন ধরে দুরন্তপ্রেম ছিল একজনের সঙ্গে, আমাদের বাড়ির মতে, অতি অযোগ্য অভাজনের সঙ্গে। কনীপিসীর ভালো বিয়ে হতে পারত। কিন্তু সে বিবাহ করে নি। ওই হাঘরে একটু দাঁড়াতে পারবে যখন, তখন তাকেই করবে বলে প্রতীক্ষায় ছিল। মধ্যে মধ্যে বার হয়ে যেত, দেখা করতে। এইভাবে চলছিল। ভদ্রলোক অর্থাভাবে পুরোপুরি এঞ্জিনীয়ার হতে পারে নি। ডিপ্লোমা নিয়ে একটা কারখানায় যোগ দিয়েছিলেন। কারখানার মিস্ত্রীকে বিবাহ করে পরিবারের সকলকে নামানো চলবে না, বাবা-কাকা সেকথা স্পষ্টই কনীপিসীকে বলে দিয়েছিলেন। ভদ্রলোক চাকুরী করতে করতে বিজনেস-স্কুলে পড়ে এম-আই-ই পরীক্ষা দিয়েছিলেন। সম্প্রতি ফল বেরিয়েছে। পাশ করেছেন উনি। এবার অ্যাসিস্ট্যাণ্ট এঞ্জিনীয়ার হয়ে ভালো কাজে যাবেন।

কিন্তু কোনটাই কাজে লাগল না। 'বাড়ি বন্ধ' ছিল কনীপিসীর ভাবী স্বামীর। তিনি মিস্ত্রী, অতএব আমাদের মত সম্মানী পরিবারের প্রবেশের ছাড়পত্র পান নি। এখানে স্টেনোগ্রাফারের আদর আছে, কারিগরের নেই। অবশ্য ব্যক্তিগত আক্রোশটাই বড় কথা হয়ে উঠেছিল।

কনীপিসীই দেখা করত। একথা এরা বে অবগত ছিলেন, কিন্তু না-দেখার ভাণটা ঝুলিয়ে রাখতেন সম্মুখে। দায়িত্ব বহন থেকে আদ্যোপান্ত অব্যাহতি।

অকস্মাৎ একদিন। সংবাদ পেয়েছেন ভদ্রলোক যে, তিনি এবার এঞ্জিনীয়ার হয়ে গেছেন, অর্থাৎ পাংক্তেয়। এখন ভাল কাজ পাওয়া মাত্র কনীপিসীর সংসার হবে। ভাই-এরা আর আপত্তির ক্ষেত্র পাবে না।

কিন্তু আশায় তন্ময় মনে ভবিষ্যতের স্বপ্ন বুঝি অন্যমনস্কতা এনে দিয়েছিল নিত্য সে যন্ত্রকে তিনি প্রতিপালিত পঙ্গুর—বশ্যতায় চালান, সেই যন্ত্র বিদ্রোহ করল। গ্রাসে পতিত হয়ে বাঁ-হাতখানি গেল। লেখাপড়ার কাজ চলতে পারবে এক হাতে বিকলাঙ্গের, কিন্তু যন্ত্র নিয়ে কর্ম এখানেই শেষ। সমস্ত জীবন পঙ্গু হয়ে গেল। তখন বিদ্রোহ করল কনীপিসী।

এতদিন অপেক্ষায় থেকে সুসময়কে অসময় করেছে সে। এবার শক্ত না হলে অসময়ও হবে শূন্য সমাপ্তি।

যথারীতি প্রতিবাদ হল বাড়ি থেকে।

কনীপিসী শক্ত হয়ে বলল, সুমন্তকে দেখাশোনার লোক নেই। ঝি-চাকরের ভরসায় রাখতে পারব না। তাছাড়া লোকজন রাখাও চলবে না। সুমন্ত আপাতত বেকার। এখন আমাকে দিয়ে ওর দরকার আছে।

বাবা বিদ্রূপে ফেটে পড়লেন, "তুমি করবেটা কি শুনি? মাত্র বি-এ পাশ করেছ। বি-টিও নয় যে ইস্কুলের একটা চাকুরি পাবে।"

"যেমন করে হোক চলবেই।" মাথায় ঝাঁকুনি দিয়ে শেষ কথা জানাল কনীপিসী।

তারপরে সামান্য কয়েকদিন মাত্র কথা কাটাকাটি চলল, হিংস্র আক্রমণ। কিন্তু স্থিরভাবে কনীপিসী জানাল যে, এতদিন এদের কথা শুনে সে সুমন্তের দাবী অস্বীকার করেছে, আর অপেক্ষার সাহস নেই।

"যদি সুমন্তের কিছু হয়? সারা জীবন দিয়ে আর ফেরাতে পারব না। এখন তবু কয়েকটা দিন পাবো।"

কাকা দাঁতে দাঁত চেপে বলেছিলেন, "হলে তো ভালো। গোল চুকে যায়।"

আর একটি কথাও বলে নি কনীপিসী। একদিন অপরাহ্ণে নিজের সামান্য ব্যক্তিগত জিনিষপত্র কিছু নিয়ে সুমন্তের ফ্ল্যাটে যেয়ে উঠল। সেখানেই বিয়ের ব্যবস্থা ছিল।

মায়ের কাছে সমস্ত শুনলাম।

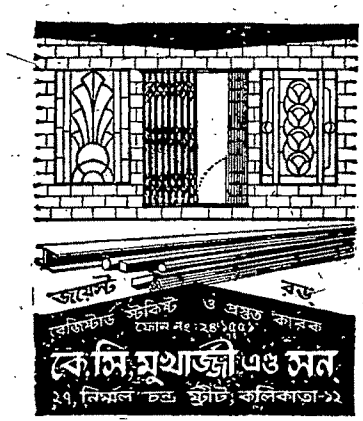

Radical and guarranted cure for fistula with minimum cost and without paim.
ডাঃ শচীন্দ্রনাথ বিশ্বাস
এম, বি-এইচ
পোঃ রাজপুর, ২৪ পরগণা

একটা চাকুরির সম্ভাবনা আজ পেয়েছি, কিন্তু সেই আনন্দ নিভে গেল।

কনীপিসীর ঘরে গেলাম।

খালি ঘর। কেমন মনে হল বড় সাধারণ। খাটটা রংজ্বলা কাঠ মাত্র, আয়না দাগ ধরা। আগে লক্ষ্য করি নি। আরে রাম, পর্দাগুলো পুরনো ন্যাকড়া মাত্র। কনীপিসী ছিল বলেই ঘরের বিশেষত্ব ছিল।

কেমন করে চলত কনীপিসীর কেউ জানে না। দাদুর দেওয়া সামান্য টাকায় সমস্ত প্রয়োজন মিটত কি না কেউ খবর নেয় নি। স্বাধীনতা দেওয়ার অজুহাতে দায়িত্বশূন্য অবহেলা দিয়েছে সকলে।

ঘর শূন্য করে, বাড়ি শূন্য করে আজ কনীপিসী চলে গেল।

তিন-চার বছর পরে দেখা পেলাম।

আমি বাইরে একটি চাকুরি কনীপিসীর চলে যাওয়ার পরেই পেয়েছিলাম। চাকুরিতে যোগ দেবার পর্বেই ধরে-বেঁধে এঁরা আমার বিয়ে দিয়ে বউকে সঙ্গে দিয়ে দিলেন। বছরখানেক পরে ছেলের বাবা হলাম। চার বছরে দুটি সন্তান।

কনীপিসী পরিবার থেকে মুছে গেছে। ইতিপূর্বে কলিকাতায় আসা-যাওয়া হলেও দু-একদিনের মধ্যে সময় পেতাম না। এবারে কয়েকটি দিন হাতে নিয়ে এসেছি।

কনীপিসীর খবর চাইলে শুনলাম প্রকট দারিদ্র্যে অতি কষ্টে কনীপিসীর দিন কাটছে। সুমন্ত একটা ফার্মে লেখাপড়ার কাজে কিছু পায়। কনীপিসী পাড়ার স্কুলে পড়ায়। "যেমন কর্ম তেমনি ফল।" মা টিপ্পনী দিলেন "বারবার নিষেধ করা হল লোকারটাকে বিয়ে কোর না।"

ঠিকানা নিয়ে নিলাম।

মা যেটুকু বলেন নি, বলতে পারেন নি, তার সন্ধান পেলাম দেখা করে।

খুঁজে বার করলাম ছোট রাস্তাটি। সেখান থেকে বার হয়েছে কানাগলি, শেষপ্রান্তে দোতলা পুরনো বাড়ির দোতলার ভাড়াটিয়া কনীপিসী।

নোংরা গলি, আশেপাশে ডাস্টবিন। মশা মাছি, তরকারীর খোসা জমা। গা ঘিনঘিন্ করে ওঠে; তবু এতদিনের অদর্শনের পরে কনীপিসীকে না দেখে তো ফেরা যায় না।

দোতালার সিঁড়িতে পা বাড়ানো মাত্র যেন অন্য জগৎ পেলাম। সিঁড়ির ধারে ধারে ফুল বসানো। দামী ফুল দামী টাবে নয়। খালি টিন, ভাঁড় ভর্তি দেশী গাছের মেলা। কয়েকটি চারা ফুলের পেখম মেলেছে।

দোতালার বড় ঘরটি থেকে পায়ের শব্দে আমার বার হয়ে এল কনীপিসী।

দেখলাম বিস্মিত হয়ে এতটুকু পরিবর্তন হয় নি। তেমনি হাল্কা রংয়ের পাতলা শাড়ি, মুখ তেমনি উজ্জ্বল।

"আয়, প্রকাশ।—এত যুগ পরে পিসীর খোঁজ নিতে এলি? আয় ঘরে, আজ উনিও বাড়ি আছেন।"

সুমন্ত-পিসেকে দেখলাম। পূর্বে এক-আধবার দেখলেও পরিচয় ছিল না। শ্যামবর্ণের সুদর্শন তরুণ, ইজিচেয়ারে বিশ্রামরত। একখানা হাত কৃত্রিম প্যাস্টরের, বোঝা যায়।

অনেকদিন পরের দেখায় অনিবার্য আবেগ কেটে গেলে কনীপিসী গেল পাশের ঘরে চা বানাতে। ছোট ঘরটায় গৃহস্থালী, বড় ঘরখানায় বাস্য।

ঝলমলে পরিষ্কার ঘরটির কোথাও দারিদ্র্যের ছায়া পড়ে নি। টাকা নেই এখানে, দেখলেই বোঝা যায়, কিন্তু গরিবানীর কাঁদুনীও বাজে না। এ-ঘর গরীব বড়লোকের ঘর নয়, কনীপিসীর ঘর। কনীপিসীর পিতৃ-গৃহের ঘরও ছিল বিশিষ্ট, কেবলমাত্র কনীপিসী সে ঘরে থাকে বলে।

পাশের ঘর থেকে স্টোভের শব্দ ঢেকে কনীপিসীর গান ভেসে এল:

'জাগো এবার, জাগো এবার,
অনেক রাত তো ঘুমিয়ে এলে,
ঘুমের দেশের পাখী এখন
জাগার দেশে ডানা মেলে।'

এই গান একদা আমাদের বাড়ির অলিন্দে ভেসে বেড়াত অনাহত আনন্দে, সূর্যের আলোর মত স্বাভাবিক মাধুর্যে। কে আদর করছে, কে না করছে, হিসাব-নিকাশ রাখে নি গান।

সুমন্তপিসে বললেন, "প্রকাশ, কি ভাবছো?"

"না। গান শুনছি।"

"কনীর গান? সর্বদাই গান গায় ও।"

পাখীর কাকলির মত গানের স্বর ভেসে এল এ ঘরে। দুঃখ-ব্যথা অভাব কিছুই নেই এখানে। কনীপিসী পঙ্গুকে বিবাহ করেছে, অভাবে ভয় পায় নি। কেন না, তার সাহস আছে। চিরসুখের দুর্লভ বর আছে। তার সুখ নামে শুকপাখীর বাসা তারি ডালে বাঁধা।

নিজের তরুণী পত্নীকে মনে পড়ে গেল। কুঞ্চনরেখা ললাটে এখনি পড়েছে। জীর্ণ শরীর থেকে বহুদিনই বসন্ত বিদায় নিয়েছে। অথচ প্রকাণ্ড অফিসারের স্ত্রী সে, ভোগের ত্রুটি নেই।

মধ্যবয়সী কনীপিসীর মধ্যবয়সী পঙ্গু স্বামী, কানাগলির ভাড়া ঘর—কনীপিসীর ছোঁয়ায় অন্য জগতে উন্নীত হয়ে গেছে। সেই সম্পদ কার আছে? রমা কনীপিসীর পোষাক বার করেও রমাই থেকে গিয়েছিল তাই।

এখনি চা-হাতে কনীপিসী এসে দাঁড়াবে। শৈশবস্মৃতি স্মরণ করে বুঝলাম সেই চা হবে গলানো অমৃত। পেয়ালা হবে ইন্দ্ররাজার প্রাসাদের স্ফটিক। ছেলেবেলার ভোলা দিনের সমস্ত স্বপ্ন এখনই ফিরে আসবে।

ছোটদের পাতা

পরিচালক ● বিষ্ণু শর্মা

শারদীয়া

শরতের সোনা-মেঘে রোদ চিকচিক।
বাতাসেতে হেলেদুলে হাসে কাশফুল।
ঝিকঝিক রেলে চড়ে হেথা-হোথা যায়
পূজায় সবার মুখে হাসি ফিকফিক॥

বছরের ক'টি দিন কি মধুমাখা;
উড়তে চায় যে মন খুলিয়া পাখা।
ঝলমল সব দিক শিউলি ঝরে;
সবারে জড়াতে মন আকুল করে॥

তোমাদের প্রীতি-মাখা পাতা ছোটদের,
হাতেতে দিলাম তুলে যত্নে রচি'।
এর সাথে ভালবাসা রইল অঢের;
সবার তরেতে—বড়, মিষ্টি কচি।

—বিষ্ণুশর্মা

ভিত

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

গৌহাটিতে দাঙ্গা-হাঙ্গামা সুরু হয়ে গেল। আসামী যুবকেরা সহসা বাঙালী পল্লী আক্রমণ করে লুঠ, অগ্নিকাণ্ড ও হত্যা সুরু করে দিল। ভারতের এক অঞ্চলের মানুষ যে এমনভাবে প্রতিবেশী ভারতীয়দের সর্বনাশ করতে পারে, তা চিন্তাশীল বুদ্ধিমান মানুষ কোনদিন ভাবতে পারে নি। আসামীদের এই বীভৎস বর্বরতা দেখে সারা ভারত চমকে উঠলো। ছাপ্পান্ন হাজার বাঙালী প্রাণের ভয়ে নিঃস্ব অবস্থায় আসাম ত্যাগ করলো।

কলিকাতার খবরের কাগজ থেকে রিপোর্টার ছুটলো আসামে, সমস্ত অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে বিবরণ পাঠাবার জন্য। সুধীনও একদিন ক্যামেরা কাঁধে ঝুলিয়ে বেরিয়ে পড়লো, বললো—ঘুরে আসি।

সুধীন যেদিন গৌহাটিতে পৌঁছলো তার আগে সান্ধ্য আইন জারী করে শহরের অবস্থাকে শান্ত করার চেষ্টা হয়েছে। সুধীন এসে উঠলো তার দাদার সহপাঠী ধনপতি বড়ুয়ার বাড়িতে। এ-অঞ্চলে এলে সুধীন এখানে এসেই ওঠে। ধনপতি এখানকার নেতৃস্থানীয় লোক। কিছুদিন জেলে ছিলেন, তারপর স্বাধীনতার আমলে নানাভাবে পয়সা করে এখন গণমান্য হয়ে উঠেছেন। সুধীনকে দেখেই তিনি খুশি হয়ে উঠলেন, বললেন—তোমার কথাই ভাবছিলাম। ঠিক সময় এসে পড়েছ। কলিকাতার কাগজে বড় বাড়িয়ে লিখেছে। তেমন গুরুতর কিছু হয় নি। তোমাকে সব ঘুরিয়ে দেখাবো।

সুধীন বললো—সারা ভারতে কংগ্রেসী শাসন চলছে, তাহলে এক রাজ্যের লোক প্রতিবেশীদের উপর এমন বর্বর হয়ে ওঠে কেমন করে। সবাই তো ভারতবাসী।

—এসব রাজনীতির খেলা, আমাদের বিরোধী দলের চক্রান্ত।

—বিরোধী দল যদি এতো বড় চক্রান্ত করতে পারে তাহলে আপনাদের পুলিস ও গোয়েন্দা কি ঘুমুচ্ছিল?

—আমরা সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা করেছি।

—ক'জনকে ধরে শাস্তি দিয়েছেন?

—ধরা হয়েছে অনেককে, এবার বিচার হবে।

—বিচারে কিছুই প্রমাণ করা যাবে না, কারণ আপনারা সাক্ষী পাবেন কোথায়? যারা সাক্ষী দেবে—হয় তারা মারা গেছে, না হয় দেশ ছেড়ে পালিয়েছে।

—তুমি সবেরই খারাপ দিকটা ধরো কেন? দেখ না কি হয়। ভাল করার আশা নিয়েই তো আমরা কাজ করছি।

—তা জানি, কয়েক বছর ধরে একটানা 'বাঙাল খেদা' আন্দোলন চলেছে, আপনারা তা মুখ বুজে দেখেছেন। তখনই ব্যাপারটা কঠোরভাবে দমন করলে আজ এতগুলি মানুষ সর্বহারা হতো না।

ধনপতিবাবু চালাক মানুষ, তিনি জানেন অন্যায়কে ঢাকা দেবার সেরা উপায় হলো বিতর্কের জবাব না দেওয়া, একটু মিষ্টি হেসে জলযোগের বিধান দেওয়া। সুধীনের ক্ষেত্রেও তিনি সেই ব্যবস্থা করলেন, বললেন—চা খাও, স্নানাহার করে বিশ্রাম কর, বিকাল বেলা তোমাকে নিয়ে বেরুবো, সব দেখাবো।

সে বাড়িতে সুধীন পরিচিত। সুধীন এসেছে খবর পেয়েই ছেলে-মেয়েরা তার চারিপাশে এসে ভিড় জমালো। সুধীনকে ধরে নিয়ে গেল পাশের ঘরে। সেটাই ধনপতিবাবুর অতিথিশালা।

চা খেয়েই একপাক ঘুরে আসবে বলে সুধীন মনে করেছিল, ধনপতির ছেলে রমাপতি বললো—ক্যামেরা ঝুলিয়ে পথে বেরুবেন না, পড়বেন। অবস্থা এখনও শান্ত হয় নি।

—পুলিস নেই?

—ছাদ থেকে মাথায় ইট পড়লে পুলিস কাকে ধরবে? যখনই বেরুবেন বাবার সঙ্গে বেরুবেন।

সুধীন পুরনো অভিজ্ঞ রিপোর্টার, দাঙ্গা-হাঙ্গামার ব্যাপার সে জানে। কোথা থেকে কখন কে ছুরি মেরে পালায়, কে কোথায় মরে পড়ে থাকে, কেউ তার খোঁজ রাখে না, আত্মীয়েরা তার খবরটুকুও পায় না। হত্যাকারীরা দলে ভিড়ে যায়, নেতারা আড়ালে দলের লোককে বাহবা দেন। আর বাইরে খবরের কাগজে বড় বড় ভাল ভাল বিবৃতি ছাপান। এদেশে রাজনীতিকদের মধ্যে এই ধরণের ভাবের জুয়াচোরই প্রধান হয়ে উঠেছে। এখানে নিজের খুশিমত চলতে গেলে, প্রাণটা হারাতেও পারে। দরকার নেই সে ঝুঁকি নেবার। সুধীন বিকাল অবধি অপেক্ষা করাই মনস্থ করলো।

পাশের ঘরে ধনপতিবাবুর এতটুকু অবকাশ নেই, সারাক্ষণই লোক আসছে, টেলিফোন আসছে, একটা গোলযোগের সময় নেতার কাছে জনসমাগম হ'বেই, ধনপতিবাবু এই পল্লীর একজন নেতা তো বটেই,—জেলখাটার ঐতিহ্য আছে, তার উপর পয়সাও করেছেন

বেলা তিনটে নাগাদ ধনপতিবাবু বললেন—চলো।

সুধীন তৈরি হয়েই ছিল, গাড়িতে গিয়ে ঠললো।

প্রথমেই এক ইস্কুলবাড়ির এক হল ঘরে এক সভায় তারা উপস্থিত হলো। শ'দুয়েক লোক সেখানে জমায়েৎ হয়েছে, একখানি ছবি ফুলের মালা দিয়ে সাজানো হয়েছে। ফটো-খানির পানে তাকিয়েই ধনপতিবাবু থমথমে মুখে ধরা গলায় বললেন—সমর আমার বন্ধুর ছেলে, বড় ভাল ছেলে ছিল, বড় ভালবাসতাম, সে যে এমনভাবে মরবে তা কোনদিন ভাবি নি।

ফটোর নিচে একগোছা ধূপ জ্বালিয়ে দিয়ে সভা সুরু হলো। ধনপতিবাবু ধরা গলায় বন্ধুপুত্রের

অনেক পর্যালোচনা করলেন। শেষে বললেন—ভাষা নিয়ে এই বিদ্বেষের কোন মানে হয় না। বাঙালীরা আমাদের প্রতিবেশী। প্রতিবেশীকে আঘাত করলে আমাদের নিজেদেরই আঘাত করা হয়, এই দুষ্টবুদ্ধি ভারতবর্ষকে বহু ভাষাভাষী খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত করে দেবে। আমরা ভারতবাসী—এক জাতি, এক ধর্ম, এক ঐতিহ্য—এ কথা মনে রেখে আমরা যেন সর্বতোভাবে এই ধরণের গুণ্ডামির প্রতিরোধ করি। প্রতিটি জীবন অমূল্য, জীবন আমরা দিতে পারি না, জীবন নষ্ট করার অধিকার আমরা কোথায় পেলাম? ইত্যাদি।

পুরো আধ ঘণ্টা বক্তৃতা করে ধনপতি থামলেন।

এক বিধবা মহিলা একপাশে কাঁদছিলেন, ধনপতি তাঁর কাছে গিয়ে বললেন,—বৌদি, আমি আর আপনাকে কি বলে সান্ত্বনা দোব, ভগবান আপনাকে সহ্য করার শক্তি দিন, এই প্রার্থনা করি।

সভা শেষ করে ধনপতি বললেন—আমায় পার্টির এক সভায় যেতে হবে। তুমি এখন আশেপাশে একটু ঘুরে-ফিরে দেখ, তোমাকে আমি সঙ্গী দিচ্ছি।

দুটি যুবককে সুধীনের সঙ্গে দিলেন।

বাঙালীপাড়ার কয়েকটা অঞ্চল সুধীনের জানা ছিল, সুধীন সেই দিকেই অগ্রসর হলো।

সেইসব পাড়ায় প্রায় বাড়ি বাসিন্দাশূন্য। অনেকগুলির জানালা-দরজা ভাঙা, একটি গৃহে আগুন দেওয়া হয়েছিল, খানিকটা পুড়ে গেছে। সুধীন দেখে আর ছবি তোলে। সঙ্গী যুবক দুজনের মুখে বিরক্তি ফুটে ওঠে, কিন্তু কথা তারা বলে না।

এক পাড়ার ছবি তোলা শেষ করে সুধীন আরেক পাড়ায় ঢুকলো। সেই পথে কিছুদূর অগ্রসর হতেই কয়েকটি যুবক এগিয়ে এলো, বললো—আপনি কে?

সঙ্গের যুবক উত্তর দিল—ধনপতি-বাবুর লোক।

—ধনপতিবাবুর লোক এসব ছবি তুলছে কেন?

—কলিকাতা থেকে এসেছে, খবরের কাগজের রিপোর্টার।

—কলিকাতার কাগজগুলোই যত নষ্টের গোড়া, তারা একটি হাঙ্গামা-হুজ্জৎ বাধাতে চায়। কতগুলি ছবি আপনি তুলেছেন, দেখি—

একজন সুধীনের হাত থেকে ক্যামেরাটি ছিনিয়ে নিল।

সুধীন রুখে উঠলো। তখনই আরেকজন সুধীনকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল মাটিতে। সঙ্গী দু'জন 'কি হচ্ছে কি হচ্ছে' বলে বাধা দিতে চেষ্টা করলো। আক্রমণকারীরা বললো—ঠিক হচ্ছে, এখানকার কোন ছবি বাইরে যাবে না। হৈ-চৈ করলে এইখানেই তোদের কোতল করবো।

সুধীনের ব্যাগ ও ক্যামেরাটি নিয়ে তারা বীরের মত রুখে দাঁড়ালো, হুকুম দিল—সোজা এই গলি থেকে বেরিয়ে যাও, না হলে এইখানেই শেষ করবো।

সুধীনের হাতে একগাছি লাঠিও ছিল না, কি করবে সে ভেবে পেল না। ছ'শো টাকা দামের ক্যামেরাটা তো এতো সহজে ছেড়ে দেওয়া যায় না।

গলির মুখে মোটরের শব্দ হলো। গুণ্ডাদের একজন বলে উঠলো—পুলিশভ্যান।

তখন তারা এক দৌড়ে গলির আরেক দিকে অদৃশ্য হলো।

সুধীনও চীৎকার করে উঠলো—পুলিশ। পুলিশ।

ভ্যান এসে ঢুকলো গলির মধ্যে। পুলিশ নামলো। সুধীনের সব কথা শুনে ধীরভাবে বললো—আমাদের সঙ্গে না নিয়ে আসা আপনার অন্যায় হয়েছে। আপনার ক্যামেরা আর পাবেন বলে মনে হয় না। পরে ক্যামেরার খোঁজ করা যাবে, আগে আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি।

—এখনি ওদের ধরলে আমার ক্যামেরা পাওয়া যাবে।

—অতো সহজ মনে করবেন না।

—একদল গুণ্ডাকে পাকড়াও করা আপনাদের পক্ষে সহজ নয়?

—না, ওদের পিছনে নেতারা আছেন, পরে আমাদের চাকরি নিয়ে টানাটানি হবে। না হলে এই দাঙ্গাবাজি আমরা এক ঘণ্টায় থামিয়ে দিতে পারতাম। এখন চোখের সামনে লুঠ হলেও দাঁড়িয়ে দেখতে হয়।

সুধীন বোকার মত তাকিয়ে রইল তাদের মুখের পানে।

পুলিশ বললো—ক্যামেরার মায়া ছাড়ুন, আপনাকে যে ছুরি মারে নি এজন্য ভাগ্যকে ধন্যবাদ জানান।

পুলিশ সুধীনকে ভ্যানে তুলে নিয়ে, ধনপতিবাবুর বাড়ির কাছে চৌমাথায় নামিয়ে দিয়ে গেল।

ধনপতিবাবু তখনও বাড়ি ফেরেন নি। তাঁকে তখন কোথায় পাওয়া যাবে ঠিকানাটা জেনে নিয়ে সুধীন একখানি সাইকেল রিক্সায় উঠে পড়লো।

রিক্সাওয়ালা তাকে একটি বাগান-বাড়ির সামনে নামিয়ে দিল।

বাগান পার হয়েই বৈঠকখানা। ঘরে ঢুকেই সুধীন চমকে উঠলো, তিনজন লোক ভিন গ্লাস মদ নিয়ে বসেছে, বোতলটা টেবিলের উপর রয়েছে। তাদেরই একজন ধনপতি।

ধনপতি চমকে উঠলো, বললো—তুমি এখানে এলে কি করে?

—আসতে বাধ্য হলাম। আমার ক্যামেরা কেড়ে নিয়েছে, আপনি এখনি একটা ব্যবস্থা করুন।

—ক্যামেরা কেড়ে নিয়েছে? কোথায়?

সুধীন বললো।

—নাঃ, ছেলে-ছোকরাগুলো বড় জ্বালাতন সুরু করলে, একটু সুস্থির হতে দেবে না। চল, তোমাকে নিয়ে একবার থানায় যাই।

গেলাসটা এক চুমুকে শেষ করে ধনপতি উঠে পড়লেন।

পথ চলতে চলতে ধনপতি বললেন—তুমি আমাকে মদ খেতে দেখে অবাক হয়ে গেছ, না? ওটা ডাক্তারের পরামর্শে খাই, না হলে সারাদিন পার্টি আর কায়রার দেখে এতদিনে থ্রম্বোসিসে মরে যেতাম। ষাট বছর বয়সে ওইটেই আমার এনার্জি। তুমিও রোজ দু-আউন্স

জানতে চাই

শ্রীনরেন্দ্র দেব

স্বাধীনতা পেয়ে পরাধীন দেশ
হয়েছে কি তার দুঃখের শেষ?
ঘুচেছে কি হাহাকার যত?
ভাঙা-পড়া মেটে কুটীরের পাশে
ছেঁড়া-রঙা নিশান উঁচু করে বাঁশে
ভুলেছে কি অভাবের ক্ষত?
দিনে-রাতে শুধু প্রাণপণে খেটে
না-খেয়ে মরেছে যারা খালি পেটে
কারখানা-কলে করে কাজ,
শুধাও সবারে, আজ কেন তারা
ফেরে আধমরা যেন দিশেহারা
ঘোচে নি তো ভিখারীর সাজ?
যে মাটি শোণিতে হয়েছিল লাল
বুকে তার কারা টানে আজ হাল,
বন্যার মুখে কে বাঁধে বাঁধ?
ধানের শীষ কি দোলে মাঠে মাঠে,
তরি-তরকারি মেলে হাটে, বাটে,
মাছের বাজারে ভরা সওগাত?
ছেড়েছে কি সুদ যত মহাজন?
জমেছে কি কারো হাতে কিছু ধন?
শোধ কি হয়েছে সব দেনা?
শাঁখা রুলি পরে এয়োতির সাজ
ধরেছে কি গাঁয়ে মা-বোনেরা আজ
নতুন শাড়ি কি হলো কেনা?

করে খেও, অনেক এনার্জি পাবে। ওরই জোরে ইংরেজরা এই দেশ শাসন করতো। ওয়াইন হলো এনার্জির ভিত্।

ধনপতির নেশা জমেছিল, বক বক করতে করতে চললেন। সুধীন কোন সাড়া দিল না।

থানায় ডায়েরি লেখানো হলো। কিন্তু হারানো ক্যামেরা যে আবার ফেরৎ পাওয়া যাবে, সে সম্পর্কে পুলিশ কোন আশাভরসা দিতে পারিলে না।

থানা থেকে বেরিয়ে ধনপতিবাবু বললেন, ক্যামেরা ও ফটো দুই গেল। আমার ছবি তা হলে কলিকাতার কাগজে আর বেরুবে না। একটা সুযোগ নষ্ট হলো। একখানা ফটো ছাপা হলে খুব ভাল হতো।

সুধীনের মন তিক্ত হয়েছিল, কোন জবাব দিল না।

ধনপতিবাবু বললেন, তুমি রিপোর্ট ভাল করে দিও, ক্যামেরার জন্য ভেবো না, আমি ঠিক ক্যামেরা উদ্ধার করে দোব। লীডারি করতে হলে পাবলিসিটির দরকার। কোন পাবলিসিটির সুযোগ কখনো ছাড়তে নেই। তা ছাড়া আজকের এই বক্তৃতা ছাপা হলে বাঙালী-আসামীর বিদ্বেষ কিছুটা কমবে—

সুধীন বললো—কমার দরকার নেই। বিদ্বেষ বাড়ুক, বেড়ে কোথায় যায় দেখি। আসামের সব ব্যাপারে বাংলার উপর নির্ভর করতে হয়, বাঙালীর সঙ্গে ঝগড়া করে তারা কতদিন চলতে পারে তা আমি দেখতে চাই। আমার ক্যামেরা কেড়ে নেবার শোধ আমি তুলবো।

—ক্যামেরা যদি না পাওয়া যায়, আমি তোমাকে ক্যামেরা কিনে দোব, ওর জন্য কিছু ভেবো না। মন খারাপ করো না। চল, একটু নদীর ধারে গিয়ে মাথাটা ঠাণ্ডা করে আসি।

ধনপতি সুধীনকে নিয়ে নদীর তীরে গেল। একপাশে বসে সে আবার বকতে সুরু করলো—ওই সমর ছেলেটির সঙ্গে আমার অনেক দিনের পরিচয়। ওর বাবা এসেছিল এখানকার কলেজে অধ্যাপকের চাকরি নিয়ে। খুব ভালো কর্মী ছিল। জেলেও গিয়েছিল। জেল খেটে, টি বি হয়ে সে মারা যায়। সমর তখন বি-এ পাশ করেছে। ছেলেটা আমাকে ধরলো চাকরির জন্য। কিন্তু এখানে এখন বাঙালী ছেলের চাকরি হওয়ার অনেক বাধা। আমাকে এমনভাবে ধরলো যে, কিছুতেই আর এড়াতে পারি না। শেষে একদিন মাথায় এক খেয়াল হলো, একদিন বললাম, 'এক কাজ করতে পারবে? এই যে গুণ্ডার উপদ্রব হয়েছে, ওইখানে একবার ঘুরে এসো, দেখি তোমার সাহস, তুমি কেমন কাজের লোক।'

ছেলেটা ব্যায়াম করতো, স্পোর্টস-ম্যান, দুঃসাহসী। বললো—'বেশ আমি ঘুরে আসবো।'

সেইদিনই সন্ধ্যাবেলা সমর গেল উপদ্রুত অঞ্চলে। গিয়েই সে ছুরি খেল। আর ফিরলো না। এতে আমার লাভই হলো, তাকে শহীদ করে আজকের এই শহীদসভা, আমি সভাপতি। বেদীতে মালা দাও, বক্তৃতা কর, ভাল ভাল কথা বল, কাগজে ছবি ছাপাও। এসব হলো লীডারির ভিত্। এই রকমের শহীদ মাসে একটা করে হলে ভাল হয়। মাসে একবার করে ছবি ছাপ হয়।

সুধীন এবার সত্যই অবাক হলো, বললো—আপনিই সমরকে পাঠিয়েছিলেন ছুরি খেতে?

—ছুরি খেতে পাঠাই নি, পাঠিয়েছিলাম গুণ্ডামনে। পাঠিয়েছিলাম সম্প্রীতির জন্য। সমর প্রাণ দিয়েছে গান্ধীজীর আদর্শের প্রতিষ্ঠা করতে —হি হি করে ধনপতি হেসে উঠলেন। সুধীনের মনে হলো তার মুখখানা অত্যন্ত নিষ্ঠুর, এক শিকারী বাঘের মত। এক মুহূর্তে মানুষটির উপর সকল শ্রদ্ধা নিঃশেষ হয়ে গেল।

সুধীন বললো—ক্যামেরা গেল, কাজ আর কিছু হবে না। আমি কাল সকালের ট্রেনেই কলিকাতা চলে যাবো।

চিকিৎসা

শ্রীপ্রণব রায়

এক যে ছিল ব্যাঙাচি
তা'র হ'ল ভাই ঘামাচি।
চুলকে মরে বেচারা,
শুকিয়ে গেল চেহারা।
ব্যাঙ-মা হ'ল ভেবেই খুন,
ভেবে ভেবে মুখটি চুন।
ভিজিট দিয়ে পাঁচসিকে
ডাকলো সে এক বদ্যিকে।
টাক মাথা আর ফোকলা দাঁত,
টিপল নাড়ী, দেখল হাত।
ঘামিয়ে খানিক টাক শেষে
ওষুধ দিল বাৎলে সে।
কম্পাউণ্ডার এককড়ি
বানিয়ে দিল এক বড়ি।
রুগী তখন হা ক'রে
ফেললো গিলে ধাঁ করে।
মিলিয়ে গেল ঘামাচি,
টুইস্ট নাচে ব্যাঙাচি।

মশাই

শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

"সে আজ অনেক দিনের কথা"—গল্প বলতে সুরু করলেন হিরণ্ময়ী দেবী। গল্পের আসর বসেছে তাঁর দেশের বাড়ি শ্যামতায়।

তাঁর এই বসতবাড়িটা এমন এক পরিবেশের মধ্যে যে, সেখানকার মানুষেরা পাখির ডাকে ঘুমিয়ে পড়ে, পাখির ডাকে জাগে। আঁধার-ঘেরা, ছায়ায় ঢাকা তাঁর এই পল্লীগৃহটি যেন স্বপনপুরের এক মায়াপুরী। রূপনারায়ণ নদের কোল ঘেঁষে, বঙ্গদেশীয় নির্মাণকলার ঢঙে টালির দ্বিতল অট্টালিকাটা আজও বহু মধুর স্মৃতি বহন করে রয়েছে।

প্রতি সন্ধ্যেবেলায় আমাদের গল্পের আসর জমত এই বাড়ির চকমেলানো পশ্চিম দিকের বারান্দাটার কোণে। ঝিল্লির আওয়াজ ও ছম-ছমানি অন্ধকারের মাঝে,—রূপনারায়ণের ভেসে-আসা হাওয়াতে ও হিরণ্ময়ী দেবীর গল্প বলার নিজস্ব ভঙ্গিমায় একটা যেন রোমাঞ্চের শিহরণ আমাদের মধ্যে জাগিয়ে তুলত। এই হিরণ্ময়ী দেবীকে আমরা বড়মা বলতুম।

আমরা বড়মাকে গল্পের খেই ধরিয়ে দিয়ে বলতুম—তারপর কি হোলো? —সেই যে, সেই অনেক দিনের আগের ঘটনাটা, সেইটাই আজ শুনব।

তিনি বলতে সুরু করতেন—হ্যাঁ তবে শোন্। সে আজ অনেক দিনের কথা। আমাদের বাড়িতে একটি ছেলে কাজ করতো, তার নাম ছিল 'মশাই'। খুব ছোট বয়সেই আমাদের বাড়িতে কাজ করতে ঢুকেছিল। বাড়ির সকলের ফাই-ফরমাশ তামিল করাই ছিল তার কাজ। সেই কাজের ফাঁকে ফাঁকে গিয়ে সে নদীর পাড়ের সাপুড়েদের সঙ্গে ভাব করেছিল। এক-আধবার সে রোজই সেখানে যেত। তাই নিয়ে আমরা খুব বকাবকি করতাম। তারপর থেকে সে লুকিয়ে লুকিয়ে যাওয়া-আসা করত। একদিন শুনলুম, ওই নদীর পাড়ের বড় সাপুড়ে রহিম শেখ মারা গেছে, আর তার সাপ খেলানোর সমস্ত জিনিসপত্র পেয়েছে আমাদের মশাই। সেদিন মশাইকে ডেকে রেগে বললাম—মশাই, তুই যদি ওই জ্যান্ত সাপের ঝুড়ি আর ঝোলাঝুলি বাড়িতে নিয়ে আসিস, তা হলে কর্তাকে বলে তোকে দূর করে দেবো। সেই থেকে মশাই আর রহিম শেখের উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া সাপুড়ের জিনিসপত্রগুলো নিয়ে যদিও বাড়িতে ঢোকার মি, কিন্তু আস্তানা করেছিল আর একজনের পরিত্যক্ত গোয়াল ঘরের মধ্যে। এখানকার কাজের অবসরে রোজই একবার করে সেখানে যেত এবং ওই জ্যান্ত সাপগুলোকে বাঁশি বাজিয়ে খেলাত। একথা প্রায়ই আমাদের কানে আসতে লাগল।

এ নিয়ে বাড়ির সকলেই খুব বকাবকি করল তাকে। অনেক ভয় দেখানো হোলো, অনেক বোঝানো হলো, ওসব বিষধর প্রাণী নিয়ে নাড়াচাড়া করতে বারবার বারণ করা হোলো। কিন্তু সেসব যে কিছুই শুনলো না সে, কিছুদিন পরেই তা আমরা জানতে পারলাম।

একদিন সকালে জানতে পারলাম যে, সে পাশের গাঁয়ে সাপ খেলিয়ে গিয়েছে। সেদিন তাকে আমি খুব রেগেই বললাম—এইবার তোর মরণবাড় বেড়েছে মশাই। সে শুধু মৃদু হেসে বলল—বড়মা, মরণ তো একদিন আসবেই, তবে অত ভয় করে লাভ কি?

আমি তার কথা শুনে অবাক হয়ে গেলাম, আর কিছুই বললাম না। আর এও বুঝতে পারলাম যে, ওকে আর ওই সাপ খেলানোর নেশা থেকে ফিরিয়ে আনতে কেউ পারবে না। আমার রাগারাগি বা বারণ প্রভৃতির কথা শুনে কর্তা বললেন, তুমি আর ওনিয়ে ওকে কিছু বোলো না, ওর যা খুশি করুকগে যাক। সেই থেকে আমি আর ওর ওই বিষয়ে কোন-কথাই বলতুম না।

তারপর বেশ কিছুদিন পরে লোকের মুখে জানতে পারলাম যে, মশাই সাপুড়েদের কাছ থেকে বিষ-ঝাড়ার মন্তর শিখে ফেলেছে। আর এও জানতে পারলাম যে, কয়েকজন সাপে-কাটা রুগীকেও সে তার মন্তরের জোরে বাঁচিয়েছে। এমনি করেই তার নাম ভাল সাপুড়ে বলে গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়লো। এর পর দূর-দুরান্ত গ্রামে তাকে ডেকে নিয়ে যেতো বিষ নামানোর জন্যে। ক্রমশঃ তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে লোকের মুখে মুখে-এবং সম্মান-প্রতিপত্তিও খুব বেড়ে গেল। আমাদের সংসারেও সে তখন হয়ে উঠল একজন গণ্যিমান্যি লোক। তখন সে শুধু আমাদের গাছপালার খবরদারি করে আর বাইরের ডাক এলে রুগী সারাতে ছোটে। মাঝে মাঝে জঙ্গলে যায় সাপ ধরে এনে শহরে বিক্রি করার জন্যে; আর সেই পয়সা দিয়ে সাপে-কাটা রুগীকে সাহায্য করে। এমনি করেই তার দিন কাটে। ক্রমশঃ মশাই তার বেশভূষারও পরিবর্তন করে ফেললে। গায়ে লাল রং-এর আলখাল্লা পরলে, চুল রাখলে ঘাড় পর্যন্ত নামিয়ে বড় বড় করে। মোট কথা, হাবভাবে ও সাজপোষাকে সে যে একজন শক্তিধর সাপুড়ে তা প্রমাণ করে দিলে।

এই সময় হঠাৎ একদিন আমাদের চোখে পড়ল, উঠোনের মাঝে পেয়ারা গাছটার গর্তের মুখে একটা গোখরো সাপ বাসা করে আছে। মশাইকে ডাকা হোলো সাপটাকে ধরবার জন্যে। মশাই তা দেখে দু-হাত তুলে নমস্কার করে বল্লে—অমন কথা বোলো না বড়মা—উনি হলেন মা মনসার সাক্ষাৎ বাহন। চরণবিলের মাঠ থেকে উনি আমার পেছু পেছু এইখানে এসে আশ্রয় নিয়েছেন। ওঁরে কখনো মারতে বোলো না। কোন ভয়ের কারণ নেই ওঁর কাছে।

এ নিয়ে যদিও আমরা শঙ্কিত হয়েছিলাম, কিন্তু মশাইয়ের কথার ওপর আর কারুর কথা বলার সাহস হোলো না। সুতরাং ওইভাবে সাপটা ওখানেই রয়ে গেল।

এর পর থেকে এক অভাবনীয় ব্যাপার ঘটলো বাড়িতে। বলেই বড়মা একটু থামলেন।

আমরা সেই অন্ধকার রাত্রিতে সামনেই পেয়ারা গাছটার দিকে চেয়ে একটু নড়েচড়ে বসলাম আরও উদগ্রীব হয়ে।

তারপর আবার বড়মা বলতে সুরু করলেন—সেই থেকে যখনই যে-কেউ 'মশাই' বলে ডাকতো, সাপটা গর্ত থেকে বেরিয়ে মাথা উঁচু করে দেখতো আবার গর্তে ঢুকে পড়তো। এই শুনে ও দেখে বাড়ির বাইরের লোকেরাও 'মশাই' বলে ডাকতো আর সাপটাকে ওই অবস্থায় দেখে যেতো।

সেই থেকে মশাইয়ের খ্যাতি আরোও বহুগুণ বেড়ে গেল। এখন সে-যে সত্যিকারের একজন শক্তিধর মানুষ, সে সম্বন্ধে কারুর আর সন্দেহ রইল না। এই দেখে সবাই ধরে নিয়েছিল যে, ওই বিষধর গোখরো সাপটার সঙ্গে মশাইয়ের নিশ্চয়ই একটা গভীর ও নিবিড় যোগাযোগ আছে। আর এই ধারণাটা আরোও বদ্ধমূল হোলো এর পরের একটা ঘটনায়।

তারপর একদিন হোলো কি, দূরের একটা গ্রামে মশাইকে ডেকে নিয়ে গেল সাপে-কামড়ানো একটা রুগীর বিষ নামানোর জন্যে। তিনদিন আর মশাই ফিরলো না। আমরা বাড়িসুদ্ধ সকলেই বেশ একটু শঙ্কিত হয়ে পড়লুম এবং শেষ পর্যন্ত খবর নেবার জন্যে লোক পাঠালুম সেই গ্রামে।

পরের দিন সকাল হতে-না-হতে বাড়িতে হৈ-চৈ পড়ে গেল। সকলের চেঁচামেচিতে ঘুম ভেঙে গেল আমাদের। উঠে একজন চাকরের মুখে শুনলুম, কাল গভীর রাত্রিতে মশাই ফিরে এসে ক্লান্ত হয়ে তার ঘরেতে শুয়েছে, কিন্তু এখনও এত জনের ডাকাডাকি চিৎকারে সে উঠছে না; আর ঘরটা ভেতর থেকে শেকল দেওয়া—কোন সাড়াই তার পাওয়া যাচ্ছে না। আমিও তার দরজার কাছে গিয়ে চেঁচিয়েই ডাকলাম; কিন্তু কোনোও সাড়া-শব্দ নেই। তখন দরজা

রসোগোল্লায় স্বর্গলাভ

শ্রীমতী পুষ্প বসু

সকালে উঠতেই টুলটুল ডাক পড়ল তাদের বাবার কাছে। গত রাত্রে বিয়ে বাড়ির নেমতন্ন খেয়ে ফিরতে বেশ রাত হয়ে গিয়েছিল, তাই সকালে ঘুম ভাঙতেও বেলা হয়ে গেছে, সেজন্যই হয়তো বাবা ডাকছেন, নির্ঘাত আজ কপালে বকুনি আছে। সামনেই পরীক্ষা, ভোরে ওঠা উচিত ছিল। কি আর করা যায়। গুটিগুটি গেল বাবার কাছে।

টুলটুল আর বল্টুকে আসতে দেখেই ডাঃ দাশগুপ্ত রাগে ফেটে পড়লেন, 'বলি—বিয়ে বাড়ি যেতে কে বলেছিল? এ্যাঁ, চারিদিকে হাম, বসন্ত, কলেরা, টাইফয়েড আর তোমরা কিনা নেমন্তন্ন খেতে গেছলে! কেন, বাড়িতে খেয়ে পেট ভরে না? লোভীর দল কোথাকার। হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলে কেন? এদিকে এসে এই ওষুধটা দু'জনেই খাও। ফের যদি শুনি এরকম, তাহ ল—'

তাহলের পর আর বলা হল না। রুগী এসে হাজির হল। ওষুধের বড়ি গলধঃকরণ করে দু' ভাই চলে এল ভেতর-বাড়িতে।

ডাক্তার দাশগুপ্ত মস্ত বিলেত ফেরৎ চিকিৎসক, বাড়িতে নানারকম বিধিনিষেধ আর কড়াকড়ির সীমা-পরিসীমা নেই। অবশ্য যা কিছু বিধি-ব্যবস্থা তাঁর রোগ সম্বন্ধে। নইলে এমনিতে তিনি সদাশিব মানুষ। সংসারের কোন সাতে-পাঁচে থাকেন না তিনি।

তবে—ঐ যা বলনুম, অসুখ-বিসুখ সম্পর্কে সর্বদা তিনি সচেতন। বাড়িতে পচা মাছ এল কি না অতিরিক্ত পাকা ফল কেউ খাচ্ছে কি না। বাজারের কচুরী, সিঙাড়া, নিমকি'র তো কথাই নেই, এমন কি রসগোল্লা সন্দেশ ইত্যাদি মিষ্টি খাবারও নয়, কাঁচা বাজার সব্জি ফল মূল এসবও ওষুধ দিয়ে ধুয়ে তবে নিস্তার। একবার বল্টুর জন্মদিনে কে এক হাঁড়ি বড় বড় রাজভোগ পাঠিয়েছিল। খাওয়া চলবে না—কিন্তু ফ্যালাও ত' দরুহ ব্যাপার। টুলটুল আর বল্টু হাঁড়ি আগলে বসে আছে—অতএব ডাঃ দাশগুপ্ত নিজে দাঁড়িয়ে থেকে এক ডেকচী ফটন্ত জলে রাজভোগগুলো ফাঁটিয়ে নেয়ালেন।

টুলটুল আর বল্টু জন্মাবধি এই আবহাওয়ায় মানুষ হয়েছে, তাদেরও, ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে বাজারের খাবার খেলেই মৃত্যু অনিবার্য।

ইতিমধ্যে একদিন হয়েছে কি টুলটুল আর বল্টুতে লেগেছে ভীষণ ঝগড়া। একেবারে যাকে বলে খণ্ডযুদ্ধ। তবে এটা কিছু আকস্মিক বা নতুন ব্যাপার নয়, এমন হামেশাই ঘটে থাকে, তবে হ্যাঁ, এবার ঝগড়ার মাত্রাটা যেন একটু বেশি।

দুই ভাই-এর চেহারাই বেশ হৃষ্টপুষ্ট। সুন্দর, রংও ফর্সার দিকে। টুলটুলের বয়েস চোদ্দ বছর আর বল্টুর দশ। দুটি ভাই-এর ভাবও যেমন ঝগড়াও তেমনি। যাকে বলে, না দেখলে প্রাণে মরি, দেখলে মারামারি।

এখন সেদিনকার ঝগড়ার ব্যাপারটা এবার বলি—

ঝগড়া খুব জোর পাকিয়েছে, বল্টু এবার মরিয়া হয়ে দাদাকে যা-তা বলছে। টুলটুল রেগে ক্ষেপে লাল হয়ে উঠেছে, এ্যাঁ, আমি বড় ভাই আমার সঙ্গে কিনা এইরকম বেয়াদপি।

বল্টু বলল, ওঃ দাদা হয়েছে ত' মাথা একদম কিনে নিয়েছে। বেশ করব বলব একশবার বলব।

টুলটুল বল্টুর কাছে অপমানিত হয়ে সোজা চলে গেল বাবা-মা'র কাছে নালিশ করতে।

কিন্তু কি মুস্কিল, বাবা-মা দুজনেই টুলটুলের কথাটায় আমলই দিলেন না, উল্টে বাবা ধমকে উঠলেন, যাও সকালবেলা বাজে বাজে কথা নিয়ে ঝামেলা করো না। যত বড় হচ্ছ বুদ্ধি-শুদ্ধি একেবারে গোল্লায় যাচ্ছে। দিন দিন একটি গর্দভ তৈরি হচ্ছ।

মা বললেন, 'তুমি যত বড় হচ্ছ, ছোট ভাইএর সঙ্গে এমনি বেষারেষি। ছি—ছি লজ্জার কথা, যাও পড়তে বসগে।"

টুলটুল তো বাবা-মা'র কথা শুনে রাগে দুঃখে ক্ষোভে একবারে ভেঙে পড়ল, চোখ দিয়ে এবার অজস্রধারে জল নেমে এল, না সত্যি অসহ্য। ছোট ভাই বলে তার সাতখুন মাপ? চিরদিন আমি এসব সহ্য করব? আমার মরণই ভাল।

কিন্তু এখন মরা যায় কি করে? টুলটুল তেতোলার ছাদে উঠে এসে গোঁজ হয়ে বসে ভাবতে লাগল।

তাই তো, এখন করি কি! তবে মরতে আমায় হবেই তা যে উপায়েই হোক। আচ্ছা, তেতোলার ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ি? না বাবা দরকার নেই, হয়ত বেঁচে থাকব হাত-পা খোঁড়া হয়ে, না ও সাঙ্ঘাতিক! আচ্ছা—তবে বাবার ডাক্তারখানায় তো অনেক বিষ আছে—কিন্তু না, হয়ত পাম্প করে বিষ বার করে দেবে, বেঁচে উঠবো। তারপর বিষে হয়ত গলা বুক জ্বলতে থাকবে। নাঃ ওসব হবে না আচ্ছা, ট্রেণে কিম্বা ট্রামে-বাসের তলায় শুয়ে পড়বে—না সে ভীষণ যন্ত্রণা হবে, ভেবে টুলটুল শিউরে উঠল তবে এখন করি কি! মরব আমি ঠিকই।

ডাক্তার আদেশ দিলুম। কিন্তু দরজা ভেঙে দেখা গেল মশাই বেঁচে নেই।

তা দেখে সারা বাড়ি শোকে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। সে কথা আজও মনে পড়লে বড় কষ্ট হয় বলে—বড়মা তাঁর চোখ দুটো আঁচল দিয়ে মুছে ফেললেন। তারপর ঘটলো এমন এক ব্যাপার যা শুধু অভাবনীয়ই নয়,—একেবারে কল্পনাতীত।

আমরা শ্রোতারা নিশ্বাস বন্ধ করে বসে রইলাম।

তিনি বললেন, যখন মশাইয়ের মৃত্যুর খবর শুনে সারা গ্রামের লোক এসে জড়ো হোলো বাড়িতে, তখন দেখা গেল পেয়ারা গাছের বাইরে সেই গোখরো সাপটা লম্বা হয়ে মরে পড়ে আছে।

তাই দেখে সবাই আমরা বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিলুম সেদিন।

বড়মা এইখানে এসে আবার একটু থামলেন এবং একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, জানিস, আজও মনে একটা রহস্য হয়ে রয়েছে সেদিনের সেই জোড়া মৃত্যুটা। আজও তাই বারবার মনে হয় মশাইয়ের সঙ্গে ওই সাপটার নিশ্চয়ই কোথায় একটা অলৌকিক যোগ ছিল, যা আমাদের জানা নেই।

এইরকম যে কত সত্যি ঘটনা শুনেছি হিরণ্ময়ী দেবীর কাছ থেকে তা আর এক দিনে বলে শেষ করা যায় না। এইবার বলি এই বড়মা বা হিরণ্ময়ী দেবী কে? ইনি হলেন অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সহধর্মিণী। আর এই পল্লীগৃহটি হোলো হাওড়া জেলার সামতাবেড় গ্রামের কথাশিল্পীর লেখনী-ধন্য আবাসস্থল।

অনেক ভাববার পর দুপুরবেলা টুলটুল শেষ সিদ্ধান্তে পৌঁছল। ঠিক আছে, বাবা বলেছিলো, রাস্তায় যে রসগোল্লা ফিরি করে, সেই রসগোল্লা কয়েকটা খেলে নির্ঘাত মৃত্যু। তবে আর রসগোল্লা খেতে ভালবাসি, আরামসে রসগোল্লা খেয়ে মরব। আমার কাছে জন্মদিনের টাকা আছে, একটু পরেই হেঁকে যাবে রসগোল্লা। এখন সব ঘুমিয়েছে। তারপর টুলটুল রাস্তায় চুপি চুপি গিয়ে দাঁড়াল।

রসোগোল্লা খেয়ে টুলটুল সন্ধ্যের দিকে নিজের বিছানায় সটান হয়ে শুয়ে পড়ল। রাতে খেতে ডাকল, টুলটুল সাজা বলে দিলে, শরীর খারাপ খাব না। আর খাবেই বা কোন পেটে। পেট ত' রসগোল্লায় ভর্তি হয়ে একেবারে জয়ঢাক। তার উপর ভয় উত্তেজনা উদ্বেগ তো আছেই।

তারপর আর কি—টুলটুল দেখছে সে মারা গেছে, মা ভীষণ কান্নাকাটি করছে, ডাক্তার লোকজনে বাড়ি ভর্তি। সবাই বলছে, ছেলেটার হল কি জ্বর নয় জারি নয়—এমন ভাল স্বাস্থ্য হঠাৎ হল কি? সবই অদৃষ্ট।

বল্টু এমন জব্দ, তার কাছে বারেবার এসে কেঁদ লুটিয়ে পড়ছে, ও দাদা আর কখনও করব না, যা বলবে তাই শুনব।

টুলটুল ভাবে এস এবার পথে এস, আর দাদা। দাদা আর নেই।

তারপর? তারপর আর কি টুলটুলকে শ্মশানে নিয়ে গিয়ে যেই অগ্নি দিতে যাবে, টুলটুল তখন আর্তনাদ করে উঠল—আগুন আগুন ওরে বাবারে।

চেঁচিয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে টুলটুলের ঘুমটা গেল ভেঙে চেয়ে দেখে সকাল হয়ে গেছে, চারিদিকে রোদ ঝলমল করছে, বল্টু এসে ডাকছে, ও দাদা, মা যে কখন থেকে ডাকছে, কাল সন্ধ্যে থেকে শুয়েছ এখনও ঘুম? পড়তে হবে না বুঝি। আবার ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে আগুন-আগুন করে চেঁচাচ্ছিলে কেন? স্বপ্ন দেখছিলে বুঝি, নাও এখন ওঠ।

টুলটুল চারদিকে চেয়ে ধড়মড়িয়ে উঠে গেল,—তারপর বল্টুকে কাছে ডেকে তার গলাটা জড়িয়ে ধরল।

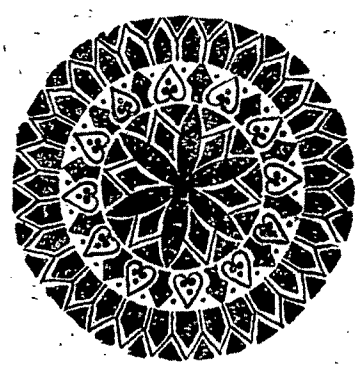

আলপনা

শিল্পী : শ্রীপ্রতাপমোহন মাইতি

কাকের ঘুম ভাঙা

শুনছ খোকা—

তোমরা আমাকে ভালোবাস না জানি। সকালবেলা আমি যদি আদর করে ডেকে তোমার ঘুম ভাঙাই,—তহলে তুমি বলবে, সেই বিচ্ছিরি কালো কাকটা ভোর থেকে 'কাকা' শব্দে জ্বালাতন সুরু করল। হত যদি কোকিল তা হলে না হয় বুঝতাম, সকালবেলা একটা গান শোনালে। কালো কাকের ডাকে ঘুম ভাঙল! আজ কপালে কী আছে কে জানে: কিন্তু বলে রাখছি খোকা, তোমরা আমাকে যত খারাপ মনে করো—আসলে পাখীটা আমি তত খারাপ নই। আমি তোমাদের সব চাইতে পরিচিত পাখী। আমাকে তোমাদের প্রতিবেশীও বলতে পারো। বললে, বিশ্বাস করবে কিনা জানি না, তোমাদের সংসারে আমিও একজন।

তোমাদের ঘরে যেমন মেনী বেড়াল আছে, বাঘা কুকুর আছে, গোয়ালে গাই আছে, হাঁস-মুরগী রয়েছে ওদের জন্যে তৈরী করা খাঁচায়,

স্বপনবুড়ো

বুটো খরগোস, আর গিনিপিগ পুষেছ তোমরা; তেমনি আমিও একজন তামাদের খুব কাছের প্রতিবেশী।

তোমাদের উঠোনে যত মরা ইঁদুর, আরশুলা, চামচিকে পড়ে থাকে, তোমাদের ঘুম ভাঙবার আগেই আমি সাফ করে ফেলি। বাড়ীতে পাঁটা কাটা হলে তার নাড়িভুঁড়িগুলো আমিই ত' তাড়াতাড়ি পরিষ্কার করে ফেলি। তবু তোমরা আমার ওপর খুশী নও। তোমরা বলো, ওই মনের অরুচি কালো কাকটা আবার কা—কা ডাক সুরু করেছে।

একটা ম্যাথর কিম্বা জমাদার মাইনে করে রাখলে যে কাজ করত, —আমি তারও চাইতে যত্ন নিয়ে তোমাদের ঘর-দোর উঠোন-বাগান সাফ রাখি। সেবার তোমার দিদির যখন বিয়ে হয়,—তোমার মনে আছে সে কথা? তখন তুমি বেশ ছোট। উঠোন ভর্তি বরযাত্রী দল। একটু পরেই কনেকে সভাস্থ করা হবে। গোধূলি লগ্নে বিয়ে। চারদিকে আনন্দের কলরব।

এমন সময় একটা চিল একটা মরা বেড়াল-ছানা এনে এ একবারে বিয়ের আলপনার ওপর ফেললে। বাড়ী শুদ্ধু লোক হৈ-হৈ করে উঠল। কিন্তু কেউ এগিয়ে এসে সেই মরা বেড়াল-ছানাটাকে সরিয়ে ফেললে না। পুরোহিত ঠাকুর মশাই রাগারাগি আরম্ভ করলেন, এ কী অলক্ষুণে কাণ্ড। শিগগির এটাকে সরিয়ে ফল। আর দেরী করা চলে না। নইলে বিয়ের লগ্ন বয়ে যাবে।

কিন্তু কেউ এগিয়ে আসে না। বিয়ে বাড়ীতে সবাই ভালো জামা-কাপড় পরে আছে যে। আমি তোমাদের ওই কোণের গন্ধরাজ গাছের ডালে বসে রগড় দেখছিলাম। যখন কেউ এগিয়ে এলো না, আমি এক ছুটে গিয়ে ছোঁ মেরে বেড়ালছানাটাকে তুলে নিয়ে দূরে বাঁশবনে ফেলে দিয়ে এলাম।

কিন্তু তোমাদের এক উঠোন ভর্তি লোক আমার এই উপকারের জন্যে কেউ ধন্যবাদ দিতে এগিয়ে এলো না। পরদিন সকালে জামাইকে নিয়ে প্রীতিভোজের জন্যে পুকুরে জাল ফেলা হয়েছিল। অনেক মাছ উঠেছিল জালে। আমি শুধু একটা ছোট মাছ নিয়েছিলাম। ভাবলাম, আমিও ত' বাড়ীর একট প্রাণী, আমারও ত' একটা পাওনা আছে। তাছাড়া আগের দিন বরযাত্রীকে সামনে বাড়ীর একটা ইজ্জত বাঁচিয়ে দিলাম। কিন্তু ব্যাপারটা কি হল জানো? তোমার এক মামা আমার ঠোঁট তার দিয়ে শেলাই করে দিল।

কাকেদের মধ্যেও যে একতা আছে—সেদিন তোমরা টের পেয়েছিলে। হাজার হাজার কাক সেদিন তোমার মামার কাজের প্রতিবাদ করতে এসে জুটেছিল। ওরাই পরে আমার ঠোঁটের তার খুলে দিয়েছিল। মানুষ এমনি অকৃতজ্ঞ যে, উপকারী প্রাণীরও ক্ষতি করতে ওরা পেছ-পা নয়।

আমি কিন্তু খোকা, কোনো দিনই তোমাদের পর ভাবি নি। ভোরবেলা উঠে সবাইকার ঘুম ভাঙিয়েছি। সেটা আমার নিত্যকর্ম। রোজ সকালে তোমার ঠাকুমা উঠে যখন উঠোনে গোবর জলের ছড়া দেয়—তার আগেই আমার উঠোন সাফ করা হয়ে গেছে। পচা, গলা, ময়লা

—না। কিছু পর ফেলে দিয়েছি বাড়ীর বাইরে। একদিন দু'দিন নয়,—এ আমার রোজকার কাজ। ওটা যেন আমার একেবারে অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। তারপর প্রত্যেকটি ঘরের জানলায় গিয়ে ডেকে-ডেকে তোমাদের ঘুম ভাঙিয়েছি; কেউ বিরক্ত হয়েছ, কেউ আড়মোড়া ভেঙে আবার পাশ ফিরে শুয়ে পড়েছ। আবার কেউ বা ধড়মড় করে উঠে বসেছ। আমি কিন্তু আমার নিত্যকর্ম ঠিক করে গেছি।

আর আমার তোমাদের এখানে ভালো লাগছে না। দিদিমণিরা একে একে সব বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ী চলে গেল। দাদাবাবুরা বড় হয়ে গাঁ ছেড়ে দূর দেশে চাকরী করতে চলে গেল। তবু আমি এখানেই মাটি-কাম ড় পড়ে ছিলাম। কিন্তু আর আমার মন-টি কছে না।

এখন আমার আর এক কষ্ট। খেতে পাই নে। আগে নানাভাবে দিব্যি খাবারটা জুটে যেত। দিদিমণিরা সকালবেলা নিজেদের খাবার থেকে রুটি, মুড়ি, বেগুণি, মোয়া—যখন যা জুটত ছুড়িয়ে দিত।

দুপুরবেলা বিদ্যে ঝি পুকুর ঘাটে মাছ ধুতে গেলে দু' একটা টুকরো ছোঁ মেরে নিয়ে নিতাম। ও হুঁস—হুঁস করত বটে, তবে আমার খাবারটা ঠিক জুটে যেত।

বিকেলে তোমার ঠাকুরদা'র রুটি করবার সময় মাখা আটার কয়েকটি গুলী আমার বরাদ্দ ছিল। গণেশ চাকর ওটা হাসিমুখেই আমায় দিত ওর সঙ্গে আমার একটা দোস্তি হয়ে গিয়েছিল কিনা। ছোকরা চাকর ত'; —বয়েস অল্প, তাই আমার সঙ্গে ওর জমত ভালো। এখন দেশের এমন হাল হল যে, মোটে খেতে পাই নে।

দিদিমণিরা চলে গেল,—যার যার শ্বশুর-বাড়ীতে। তাই সকালবেলা কেউ খেতে দেয় না। আর তোমাদেরই এখন মাছ জোটে না,—কিসের ওপর আমি ছোঁ মারবো বলো?

ঠাকুরদা গমের অভাবে রুটি খাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। একটু বেশী রাত্তিরে শুধু খৈ খায় তার সঙ্গে একটু দুধও জোটে না। বুড়ো মানুষটার। দেখে আমার ভারি কষ্ট হয়।

শাক-সব্জীর দাম আকাশ-ছোঁয়া হয়েছে। মাংস আর বাড়ীতে আসে না। আগে পাঁটা কাটা হত, নাড়ি-ভুঁড়িটা আমার কপালে জুটত। এখন সেদিক থেকও সব বন্ধ। দেখি, আর কষ্টে আমার বুক ফেটে যায়। আমার নিজের জন্যে যত না দুঃখ, তার চাইতে অনেক বেশী কষ্ট পাই তোমাদের কথা ভে ব।

এর পর তোমরা বাঁচবে কি করে?

দূর দেশে আমার যারা আত্মীয়-কুটুম্ব থাকে—তারা খবর পাঠিয়েছে সেখা ন চলে যেতে।

এক ঠাণ্ডা দেশে সাদা কাক আছে। তারাও কাকেদের মুখে খবর পাঠিয়েছে।

শুনছি খোকা, তোমায় পেতে হবে, কিন্তু কোনো ঘটা হবে না। তবু চোখ ভরে দেখে যাবো—এই আমার আশা।

তাই ত তোমাদের গন্ধরাজের ডালে এখনো এসে বসি।

পুরোহিত ঠাকুর বুঝি পাঁজিতে ভালো দিন-ক্ষণ দেখছেন? আমায় খবরটা দিও।

একচাষী ও তার বলদ

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

এক চাষীর একটা বলদ ছিল। চাষী তাকে দিয়ে লাঙল টানাতো, সময়ে সময়ে বোঝা বওয়াতো, দরকার হলে তার পিঠে চড়ে এ-গ্রাম ও-গ্রাম যেতো।

ক্রমে বলদটা বুড়ো হয়ে গেল। তাকে দিয়ে আর কোন কাজ হয় না। আবার তাকে বসিয়ে বসিয়ে খাওয়ানোও লোকসান।

চাষী ভাবলে বলদটাকে হাটে নিয়ে গিয়ে বেচে দেবে। কিন্তু হাড়-জিরজিরে বুড়ো বলদের কি বা দাম? যে কিনবে সে দাঁও মারবার ফিকিরে থাক ব। অথচ বলদটাকে আর রাখাও যায় না।

গাঁয়ের সব চেয়ে বুদ্ধিমান লোকটি তাকে একদিন ডেকে বললে: এত ঝঞ্ঝাট পোয়ানোর কি দরকার? মাঠে এখন অনেক ঘাস। ওকে মাঠে ছেড়ে দাও, চরে খাক।

চাষী ভাবলে, পরামর্শটা মন্দ নয়। কিন্তু চরতে চরতে বলদটা যদি কোথাও চ ল যায় বা কেউ ওটাকে ধরে নিয়ে যায়, তাহলে তো লোকসানের একশেষ হবে। বরং বলদটাকে চরাবার জন্যে তার ছোট ছেলেটার ওপর ভার দেওয়া যাক। ছেলেটা ডাগর হয়ে উঠছে, সংসারের কিছুই করে না, কেবল খাম-দায় খেলে বেড়ায়। ওর এখন থেকে কাজ-কর্ম শেখা দরকার। চাষী ছেলেটার ওপর বুড়ো বলদটাকে চরাবার ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হলো।

ছেলেটা বলদটাকে নিয়ে মাঠে গেল। মাঠে অনেক ঘাস। বলদটা ঘাস খাবার জন্যে এদিক ওদিক ঘোরে। ঘুরতে ঘুরতে অনেক দূর গিয়ে পড়ে। ছেলেটাকে গিয়ে বলদটাকে ফিরিয়ে আনতে হয়। সে ভাবলে, 'এ যে মহা ঝামেলায় পড়া গেল। বলদটার জন্যে একটু খলবারও বো নেই।'

সে দেখলে, মাঠের এক জায়গায় বেশ তাজা ও অনেক ঘাস। ঘাসগুলো যেমন লম্বা তেমনি ঘন হয়ে আছে। সে একটা খোঁটা এনে সেখানে পুঁতে বলদটাকে খোঁটায় সঙ্গে বেঁধে নিশ্চিন্ত হয়ে খেলায় মন দিলে। বলদটাও তাজা নরম ঘাস পেট ভরে খেতে লাগলো। কিন্তু দিন কয়েকের মধ্যেই সেখানকার ঘাস গেল কুরিয়ে। সেখান থেকে হাত কয়েক তফাতেই আবার সেই রকম ঘাস। বলদের দড়িটা হাত কয়েক বাড়িয়ে দিলেই বলদটা সেখানকার ঘাস খেতে পারে। কিন্তু ছেলেটা ত করলে না। তখন বলদটাই শু য় পড়ে গল লম্বা করে বাইরের ঘাস খেতে লাগলো। তাই দেখে ছেলেটা ভারি আমোদ পেল। ভাবলে, এ তো এক মজার খেলা। পরদিন সে বলদের দড়িটা দিলে ছোট করে। তার ফলে বলদ বেচারী নাগালের মধ্যে এক গাছি ঘাসও পেল না। সে পা চারখানা যথাসম্ভব টান ও গলা আরও লম্বা করে দিলে। কিন্তু তাতে কি হবে? সে সারাদিন না খেয়ে রইলো। ছেলেটা বলদটাকে নিয়ে এই খেলা আরও দুদিন খেললে। বলদটাও না খেতে পেয়ে মরে গেল।

বুড়ো বলদ মরলে কারই বা দুঃখ হয়! চাষী ভাবলে, আপদ গেল। মরা বলদ কেনার জন্যে লোক এলো এবং যে দাম হওয়া উচিত লোকটা তার চেয়েও কম দিয়ে বলদটাকে নিয়ে গেল। চাষী খুশী হয়ে বলদ-বেচা টাকা কটা হাঁড়িতে তুলে রাখলে। কিন্তু সেইরাত্রে সে স্বপ্ন দেখলে মরা বলদটা তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তার শরীরটা আরও হাড়-জির-জিরে হয়ে গেছে। সে ধুঁকতে ধুঁকতে যেন বলছে, "এবার তোমার সঙ্গে লেগে থাকবে।'

চাষীর ঘুম ভেঙে গেল। সে ধড়মড় করে উঠে দেখে, ভোর হয়েছে। অন্য চাষীরা বলদ আর লাঙল নিয়ে মাঠে চলে ছ তার তে বলদ নেই। সে মনিষ খাটতে শহরে গেল।

এমনি করে বেশ কিছু দিন গেল। কিসের যেন একটা বড় পরব এলো। চাষীর অনেক দিনের সাধ পরবে নতুন জুতো পায়ে দিয়ে বেড়াবে। সে বলদ-বেচা টাকা কটা নিয়ে শহরে গিয়ে একজোড়া বেশ মজবুত ও ভারি জুতো কিনে পায়ে পরে বাড়ির পথ ধরলো।

খানিক দূর চলেই তার মনে হলো, একটা বলদ যেন মস্ মস্ করে জাবর কাটতে কাটতে তার পিছনে খট্ খট করতে করতে আসছে। সে থমকে দাঁড়িয়ে পিছন ফিরে দেখে, কোথাও কিছু নেই। সে আবার চলে, আবার তেমনি শব্দ হয়। শেষে সে ছুটতে লাগলো। বলদটাও অমনি তার পিছু নিল। চাষী কিছুতেই বুঝতে পারলে না, সেটা তার নিজেরই জুতোর আওয়াজ। এমন বলবে বুদ্ধিও মানুষের কখন কখন হয়।

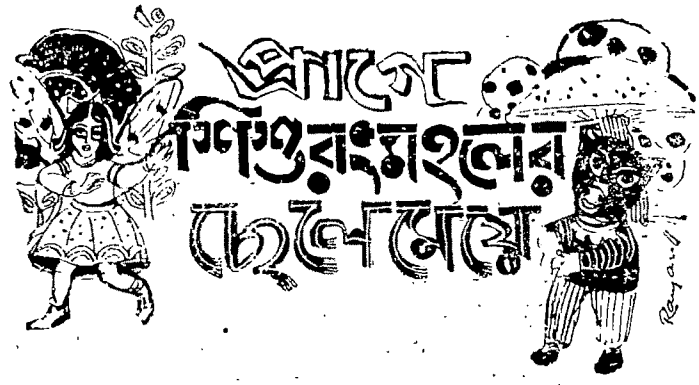

প্রাগ পূর্ব-য়ুরোপের সুন্দরী নগরী। প্রথম দৃষ্টিতেই এতো ভালো লাগল। এরোড্রোম থেকে বেরিয়েই চোখে পড়ল চারদিকে নতুন সৃষ্টির প্রয়াস। গত মহাযুদ্ধে যে নিদারুণ ক্ষতি হয়েছিল, তার চিহ্নমাত্র নেই। নতুন বাড়ী, নতুন কারখানা, খেলাধূলা - আমোদ-আহ্লাদের মধ্যে একটা কাজের আনন্দে উচ্ছল জাতির কথাই মনে করিয়ে দেয়।

কিন্তু কোথায় যেন এদের সঙ্গে আমাদের একটা সুন্দর মিল আছে। এরা কৃত্রিম সৌন্দর্য-বিলাসী নয়---কিন্তু সুন্দরকে এরা ভালোবাসে। কত শুনেছিলাম পূর্ব-য়ুরোপের লৌহ-যবনিকার কথা। কিন্তু কোথায় সে যবনিকা? প্রাগের আশেপাশে হাজার-হাজার বিদেশী পর্যটক আসছে বন্যার মত এই বসন্তে। বিদেশী মুদ্রা হাতে দিচ্ছে চেক্‌দের। আমাদের মত এরাও ডলার পাউণ্ড-ফ্রাঙ্ক---। নিত্যকার জীবনযাত্রা আমাদের মতই সরল। পোষাক-পরিচ্ছদে চাকচিক্য নেই। মোটা-সোটা মানুষগুলির ময়লা জামা-কাপড়ের আড়ালে একটি সুন্দর স্নেহাপ্লুত হৃদয় রয়েছে।

এগ্রিকাল্‌চারাল কলেজ হোষ্টেলে আমরা ছিলাম। সামনে খোলা মাঠ---এখানে ওখানে এবড়ো-খেবড়ো মাটির ও বাড়ী তৈরীর মালমশলা ছড়িয়ে আছে, তারই ধারে জাঙ্গিয়া-পড়া কলেজের ছেলেদের খালি গায়ে ফটবল নয়---অনেকটা ভলিবল জাতীয় খেলা। বলিষ্ঠ দেহ, খাবারে বিশেষত্ব বা বৈচিত্র্য নেই। খানিকটা আলু সেদ্ধ, মোটা রুটি আর Soup লাইনে দাঁড়িয়ে ছটেল কিচেন থেকে নিয়ে খাচ্ছে---তারপরই কেতাব-পত্র বা Tractor নিয়ে মাঠে। রাস্তার দু'ধারে চেরীফুলের বাহার। ওদিকে মাঠের পর মাঠ নবুজ ঘাসারে ভরে রয়েছে। বসতবাড়ী প্রোফেসর ও টিচারদের ইতস্তত সাজানো। শুধু হোষ্টেল আর কলেজগুলি multi storied.

প্রাগের সহরতলীতে নদী, পাহাড় আর উপত্যকার মেলা। তোমরা যারা শিলং-এর

শ্রীসমর চট্টোপাধ্যায়

বড়পানি দেখেছ, অনেকটা সেই রকম। সেখানে খুশি পিকনিকের জায়গা---অল্পস্বল্প খাবার নিয়ে বসে গেলেই হ'ল। নদীর নাম ভাল্‌ভা। এঁকে-বেঁকে কোথায় চলেছে---এদিক কার্লস্টিন কাস্‌ল্, ওদিকে ভাত্‌রা, সেপি। হেথায় হোথায় নদীর দু'ধারেই পাহাড়---আর তার গায়ে-গায়ে সুন্দর ছোট ছোট বাড়ী বেশীর ভাগই কাঠের তৈরী। শনি-রবিবার দু'ধারে চাঁদের হাট। নদীতে মোটর-বোট আর ক্যানোর মেলা। অসংখ্য রেস্তোঁরা। খাবার বৈচিত্র্য নেই যদিও। রোদ উঠলে এখানে কেউ ঘরে থাকবেই না। বসন্ত-স্নান বা সুইমিং কস্টিউম পরে জলে ঝাঁপাঝাঁপি।

লেখক সহ চেক্ স্কুট গায়ে চেক্ বোজেস্কু। আমরা যার নাম রেখেছিলাম রাঙ্গাদা।

হালচাল

(ছড়া)

মৌমাছি

হাল-চাল খুবতো কালো
সাদা টাকা বেবাক কালো,
কলকাতা নেই কলকাত্তা
দেড়ে-মেড়ে সব কত্তা
হিন্‌হি মিনদি দি-দি-র জয়
বলছে সব্বাই বার কি ভয়!

* * *

তেল-নুনলা জিরে
দামী সোনা হীরে
দালদা কি ঘী রে
কিছু পান কী রে!
পাবি কোথায় বল্ তো?
ধমক খেয়ে 'পিসি'র ভয়ে
সব জেগেছে ফলতা।

* * *

খালি পকেট, পুজোর বাজার
দোকানে লোক হাজার হাজার
থাকনা ঘরে হাজার অভাব,
লক্ষ্মী ছাড়ার অমনি স্বভাব।

* * *

পাড়ায় পাড়ায় বারোয়ারী
বারো ইয়ার পাণ্ডা তারি
ষণ্ডা-গণ্ডা সভাপতি
অগাধ ভক্তি মায়ের প্রতি।

* * *

আতপচাল, কলামুলো
বরণডালা এয়োর কুলো
ধূপ-ধুনুচি যজ্ঞির কাঠ
ওসব বাজে পুজোর ঠাট
নাটক জলসা আসল তাই
মাইকটা জোর সচল চাই।

রেলগাড়ীগুলি ভারি চমৎকার লাগল। ইলেক্‌ট্রিক আর কয়লার এঞ্জিন দুইই আছে। ঠিক আমাদেরই মত দৈনিক প্যাসেঞ্জার গ্রাম থেকে সহরে আসছে, লেখাপড়া কাজ শেষ করে ঘরে চলে যাচ্ছে। অনেকের হাতেই সহুরে সওদা-পত্র, ঠিক আমাদেরই মত। ছেলেমেয়েরা বলল, "সমরদা রেলে চড়লে কেমন হয়?" বল্‌লাম "ভালো"। তারপরই ঐ চমৎকার মোটর কোচের দিকে তাকিয়ে বলল, "এবার থাক্, এর পরের বার হবে!" পরের বার? এদের কতো আশা! তা হবে না কেন। পৃথিবী কত ছোট হয়ে গেছে আজ।

প্রাগের কথা বলতে গেলে মহাভারত হয়ে যাবে। শিশু-রংমহলের ছোটরা ওদেশটাকে যেমন ভালো বেসেছে, ওদেশের লোকেরাও ঐ শ্যামলা ছেলে-মেয়েগুলিকে তেমন আপন করে নিয়েছিল আট দিনের মধ্যেই। নানা ছোট ঘটনার মধ্যে তোমাদের পতায় একটি ছোট গল্পই বলব। সাত দিনে চেক্ শিক্ষা-দপ্তর C.L.T. গ্রুপকে তন্নতন্ন করে প্রাগের ও আশপাশের

দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখিয়েছেন। শেষ দিনটিতে রাঙ্গাদা ও রাঙাদি' (তিতিয়ানা ও বোজেস্কু) প্রভাতেই বলে উঠলো "চলো আজ তোমাদের একটি গ্রাম দেখাতে নিয়ে যাব।" আমরা তো হাত ধুয়ে বসেই আছি।

সেই Tatra Coach এল। সেই ড্রাইভার, যে আজ সাত দিন আমাদের বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছে। আজ তার সাথে আছে তার বাচ্চা মেয়ে মোনা---। ৪ বছর বয়স, হাসিখুসী কিন্তু স্পিক্‌টি নট্‌। কোচ চলল এগ্রিকালচারাল মহাবিদ্যালয় ছাড়িয়ে উত্তর দিকে। মাথার ওপর দিয়ে ইলেকট্রিক এঞ্জিন হুস্‌ করে একটা টানেলে ঢুকে গেল। মধুমন্তী বলল, "সমরদা।" আমি বললাম--- "Next time বরকে নিয়ে আসিস্‌।"

ভাল্‌ভা এঁকে-বেঁকে চলেছে---ডানদিকে টাট্‌রা রেঞ্জ---তাতে রৌদ্রের আড়ালে শ্যাম ছায়া। বাঁয়ে সম্মুখে প্রাগ নগরী। নিস্তব্ধ-উজ্জ্বল-সুন্দর। দেখতে পাচ্ছি Children's House কাস্‌লের আড়ালে। ঐতো National Theatre! ঐ যে University। পাহাড় চূড়োয় Stadium। ফুটবল খেলা-পাগল চেক্‌রা দলে দলে ছুটেছে--ডাচ্‌ টিমের সাথে শক্তির পরিচয় হবে। একটা পরিচ্ছন্ন প্রভাত। অনুভা বলল, "আমরা কেন ও রকম পরিচ্ছন্ন নই? আমাদের দেশও তো সুন্দর?"

নন্দিতা বলল, "এরা তো খুব অবস্থাপন্ন মনে হয় না---এইতো ড্রাইভার-সাদাসিধে পোষাক--- তবে আমাদের সহরে গ্রামে এতো জঞ্জাল কেন?" মনে-মনে ভাবলাম---এই ছোট মেয়েদের মধ্যেও নিজেদের দীনতার---আর্থিক নয় মানসিক---প্রশ্ন উঠেছে। ভগবানের সৃষ্টি প্রকৃতি। তার সকল অলংকার সরস সরল করে সাজিয়ে রেখেছে এদেশের লোক, আর আমরা প্রকৃতিকে নিজেদের দুষ্টু আচার-ব্যবহার দিয়ে নিঃস্ব পঙ্গু করে রেখেছি।

আবার গাড়ীতে উঠলাম।

গাড়ী এসে দাঁড়ালো পাঁচিল-ঘেরা এক বাগানে। রাঙ্গাদা বলল, 'সমরদা, আমরা Lidice গ্রামে এসেছি। গত মহাযুদ্ধে জর্মানরা এ-গাঁয়ের সমস্ত পুরুষ মানুষদের হত্যা করেছিল। এ তারই Memorial---আর ঐ অদূরে যেখানে দেখবে সবচেয়ে সবুজ ঘাস সেখানেই ঐ সহস্র শহীদদের সমাধি-বেদী।"

সমাধি ক্ষেত্রে কোন ইট্‌, কাঠ, পাথরের প্রাচুর্য নেই। Freedom fighterদের লুকিয়ে রাখার অভিযোগে গাঁয়ের ছেলেদের এই নৃশংস হত্যা। ভারতের ২৬টি ছেলেমেয়ে এসে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ালো এই পূত সমাধিক্ষেত্রে। মাঠের এধারে ওধারে বৃদ্ধা মহিলারা যাঁরা কাজ করছিলেন, তাঁরা কাজের মাঝে চুপ করে দাঁড়ালেন, আমাদের দেখে। রাঙ্গাদি বলল, "ঐ যাদের দেখছ---ওদেরই ছেলে বা স্বামী এই সমাধিতে আছে শুয়ে। ঐ যে ফুল দেখছ--- টাটকা তাজা। আজ ২০ বছর বাদেও ওরা রোজ প্রভাতে দিয়ে যায়।"

কি দেখছো গো? কেন। ন্যাশনাল থিয়েটার

ভারতবর্ষের প্রতিনিধির দল অর্ধবৃত্তাকারে সমাধির সম্মুখে এসে দাঁড়ালো। তারপর সমবেত-কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের গান ধরল তারা।

"আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে"

শিশু রংমহলের দলটি নৃত্যনাট্য পটিয়সী। গান তারা সাধারণ বাঙ্গালীর ছেলেমেয়েদের মতই গায়। কিন্তু সেই পূত সমাধিক্ষেত্রে ২৬টি ছেলে-মেয়ের কণ্ঠে বোধ হয় স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের গীতসুধর কণ্ঠ ভর করেছিল। অমন স্নিগ্ধ, দীপ্ত, পবিত্র গীতভঙ্গী আমি শান্তি নিকেতনেও শুনিনি। গীত সমাপ্তির পর পেছনে চেয়ে দেখি গাঁয়ের নরনারী। বোজেস্কু বাংলা জানে; তিতিয়ানা রবীন্দ্রনাথের বই চেক ভাষায় অনুবাদ করেছে। তাঁদের ও বৃদ্ধাদের চোখে জল। রাঙ্গাদা বলল "Thank you---a divine service."

সমাধিক্ষেত্র পেছনে ফেলে আমরা এসে কোচে উঠলাম। শ্রান্ত বাচ্চারা অঞ্জলিপুরে একটি সুস্বাদু কূপের জলপান করল। গাড়ী চলল New LIDICE গ্রামের ভেতর দিয়ে। কি সুন্দর গ্রাম। প্রতিটি কুটিরে T. V. রয়েছে। Community centre---বাজার, ক্লাব, রাস্তাঘাট সব হিসেব মত তৈরী।

LIDICEএর হত্যা-কাহিনী যখন পৃথিবীময় ছড়িয়ে যায়, তখন মিত্রপক্ষের সমস্ত দেশ মিলে এই গ্রামটি তৈরী করে দেয়। পুরাতন LIDICE লুকিয়ে রয়েছে---ঐ সমাধিক্ষেত্রে--- আর নতুন LIDICE তাদেরই সন্তানদের নতুন আশায়, নতুন জাতির দীপশিখা হয়ে জ্বলজ্বল করছে। এই শহীদ-তীর্থস্থানে দেশ বিদেশের লোক আসে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে। কোন তাজমহল এরা গড়েনি, কিন্তু মানুষের যে সম্ভাবনার ইঙ্গিত এই গ্রামটিতে অঙ্কুরিত হয়েছে সেটাই হল ভবিষ্যতের একমাত্র আশার ঝলক্‌।

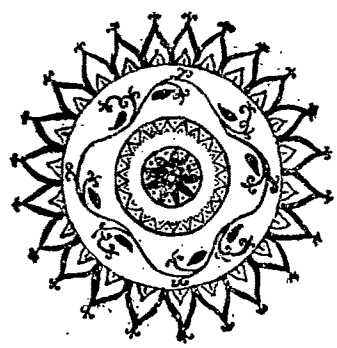

শিল্পী : কুমারীসুমিতারাণী পাল

পূজোর ছুটি

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

এই কটা দিন অমন করে মাগো
পড়তে আমায় বলিসনে কখখনো,
রইলো পড়ে নামতা হাতের লেখা—
এই কটা দিন করবো না আঁক কোন।
এখন মাগো শুধুই পুজোর ছুটি,
ছুটির গন্ধ আকাশ বাতাস জুড়ি'
বাবার দেখো ভাবার অন্ত নেই—
ছুটবে কোথায়, দার্জিলিং না পুরী।
ছুটির গন্ধে সবাই বাঁধন-হারা—
শিউলি ফুলের রং লেগেছে মনে,
খুশীর সে ঢেউ অবাধ মিঠে হাওয়ায়
ছড়িয়ে গেল কাশের বনে বনে।
আকাশ ভরা পেঁজা তুলোর রাশি
দুলকি তালে ছুটলো কোথায় দূরে,
ছুটির নেশায় সবাই মাতোয়ারা—
তাইতো সানাই বাজছে মিঠে সুরে।

সবাই খুশী, তবু আমার টিয়া
খাঁচার মাঝে অমন কেন করে,
ঝটপটিয়ে উঠছে বারে বারে,
ঘষছে মাথা লোহার শিকের 'পরে!
ছোঁয়নিকো জল, খাচ্ছে না মা ছাতু—
পোষা টিয়ার শরীর হল ক্ষীণ,
কেমন করে বুঝলো মাগো, বল—
এসেছে ওর পুজোর ছুটির দিন!

জোর বর্ষা নেমেছে। আষাঢ় মাস। কালো কাজল মেঘ সারা আকাশ জুড়ে তার তাণ্ডব লীলা সুরু করে দিয়েছে। জলের ঝাপটা, ঝড়ের হাওয়ার প্রলয় নাচনে, বিদ্যুতের কড়-কড়াৎ শব্দে কানে তালা লাগে আর কি। দিন দুপুরে রাজ্যের অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে গাড়াগাঁয়ের একটি স্কুলে।

বৃষ্টির নূপুরধ্বনি মাস্টারমশায় হরনাথ বাবুকেও মাতিয়ে তুলেছে। তিনি ছাত্রদের বললেন: দরজা-জানালা বন্ধ করে দে। আয় পড়াশোনা রেখে দিয়ে আজ বর্ষার আনন্দ উৎসবে সবাই গা ভাসিয়ে দিই। বলে নিজেই গান ধরলেন গুন্‌গুন্ করে:

ঘন নিবিড় নব নীল জালে,
চা কিন অনন্তনীল নভস্থল।

গরজে ভীম রবে, শুনে সচকিত সবে,
বরষে অবিরল কত নিরমল জল
তড়িৎ যার অঙ্গে, দুলিছে নানা রঙ্গে
আঁধারে আলোক কিবা করে ঝলমল।"

শ্রীসুধাংশু গুপ্ত

ছাত্ররা সমবেত কণ্ঠে গানের ঝংকারে মুখর করে তুললো গোটা স্কুলবাড়ি।

গান সবে শেষ হয়েছে, এমনি সময় একটি সুদর্শন ছেলে মাস্টারমশায়কে প্রশ্ন করে বসলে: স্যার দয়া ক র বলবেন কী ঐ গানটি কার রচনা?

ছাত্রটির প্রশ্ন শুনে মাস্টারমশায় ভারী খুশি হলেন। এই ভেবে তার আরো ভাল লাগলো ছেলেটির জানবার আগ্রহ দেখে। তার দিকে তাকিয়ে মৃদু হর সুরে বললেন,—তোমার অনুসন্ধিৎসা দেখে খুবই আনন্দ পেলাম। এ-গানটি বিখ্যাত গায়ক চিরঞ্জীব শর্মার (ত্রৈলোক্য নাথ সান্যাল) লেখা।

হরনাথবাবু বৃষ্টি একেবারে ধরে না গেলে ছাত্রদের ছেড়ে দিলেন না। নানা মজাদার, শিক্ষাপ্রদ ও হাসির গল্প শুনিয়ে তাদের তন্ময় করে রাখলেন। ছাত্ররা মাস্টারমশায়ের ছিলো পরম ভক্ত। চুপটি ক র মনোযোগ সহকারে তা শুনতে লাগলো। হাসির গল্পে তারা হেসে লুটোপাটি খেলে। যে ছেলেটি বর্ষার গানটির লেখকের নাম জানতে চেয়েছিলেন—তিনি হচ্ছেন প্রখ্যাত ঐতিহাসিক, শিশু সাহিত্যের যাদুকর যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

ঘটনাটি যোগেন্দ্রনাথ যখন সত্তর বছর আগে দেশের স্কুলে পড়েছিলেন সে সময়ের।

মোরগের লড়াই

শ্রীপরিতোষকুমার চন্দ

তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো মোরগের লড়াই দেখেছ। যারা দেখ নি তাদের এবার মোরগের লড়াই দেখাবো। হ্যাঁ, একটা কথা আগেই বলে রাখি,—এটা কিন্তু জ্যান্ত মোরগের লড়াই নয়। এটা বিশেষ কৌশলে তৈরী একটা পিচবোর্ডের খেলনা। চালালে মনে হবে সত্যিই যেন দুটো মোরগ লড়াই করছে। কি করে এটা তৈরী করতে হয় আমি ভেবে সেটাই বলে দেবো, খেলনাটা তৈরী করবে তোমরাই,—অবশ্য যদি করবার ইচ্ছে হয়।

প্রথমেই বই থেকে ১ ও ২ লেখা মোরগের ছবি দুটো কাচি দিয়ে কেটে নাও এবং পাতলা পিচবোর্ডে আঠা দিয়ে সেঁটে ভারী কোনো কিছুর তলায় চাপা দিয়ে রেখে দাও। বাইরে শুকোতে দিলে পিচবোর্ডটা দুমড়ে বেঁকে যাবে, তা'তে খেলনাটা ঠিক মতো কাজ করবে না। আঠা শুকিয়ে গেলে ছবি দুটোর ধার ধরে কাঁচি চালিয়ে কেটে মোরগ দুটো আলাদা করো।

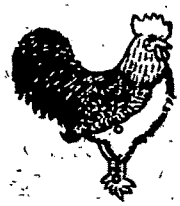
চিত্র ১

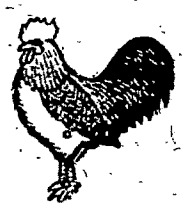
চিত্র ২

এবারে এক পিস মোটা পিচবোর্ড থেকে ছ' ইঞ্চি লম্বা ও আধ ইঞ্চি চওড়া দুটো সরু ফালি কেটে নাও এবং শিরীষ কাগজ ঘষে প্লেন করে, দুটোরই যে কোনো এক পিঠে চাইনিজ ইঙ্ক বা কালো রঙ লাগিয়ে কালো করে দাও। সেটা যদি করতে না পারো তবে কালো কাগজ আঠা দিয়ে জুড়ে দিলেও হবে। এখন দুটো ফালিরই এক দিকের প্রান্ত থেকে দু' ইঞ্চি ভেতরে ও অন্য প্রান্ত থেকে এক ইঞ্চি ভেতরে মাঝামাঝি জায়গায় খাতা সেলাই করা মোটা ছুঁচ দিয়ে এফোঁড় ওফোঁড় করে একটা করে মোট চারটে ফুটো করো। ছবির মোরগ দুটোরই পায়ে ও পেটে যে চারটে গোল দেওয়া আছে সেখা নও ঐ ভাবে ফুটো করো।

তারপর মোরগ দুটো মখোমুখি অবস্থায় উপুড় করে টেবিলের বা মেঝের ওপর রাখো এবং পিচবোর্ডের ফালি দুটোর কালো দিক নীচের দিকে করে সে দুটো মোরগ দুটোর ওপর সমান্তরালে লম্বালম্বি এমনভাবে রাখো যাতে ওপরের ফালিটার দু' ইঞ্চি দূরের ফুটোটা বাঁ দিকের মোরগের পেটের ফুটোর ওপর আর অপর প্রান্তের এক ইঞ্চি দূরের ফুটোটা ডান দিকের মোরগের পেটের ফুটোর ওপর থাকে। নীচের ফালির বেলায় এর ঠিক উল্টো হবে,—অর্থাৎ সেই ফালির দু' ইঞ্চি দূরের ফুটোটা ডান দিকের মোরগের পায়ের ফুটোর ওপর ও অন্য প্রান্তের ফুটোটা বাঁ দিকের মোরগের পায়ের ফুটোর ওপর থাকবে। কি ভাবে, কোথায় কোন্ ফুটো থাকবে এনং ছবিটা দেখলেই বুঝতে পারবে।

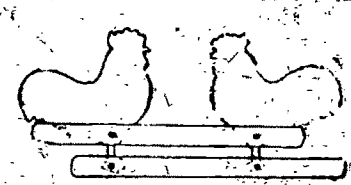
চিত্র ৩

এবার এই চারটে ডবল ফুটোর ভেতর দিয়ে আলাদা ভাবে টোয়াইন সুতো ঢুকিয়ে সুতোর প্রান্ত অপর দিকে বের করে সুতোর দু' প্রান্তেই, অর্থাৎ ফুটোর এদিক ওদিক—দু দিকেই মোটা করে গেরো দিয়ে এমন করে বেঁধে দাও যাতে মোরগ দুটো পিচবোর্ডের ফালি দুটোর সঙ্গে আটকে থাকে। খুব বেশী টাইট করে গেরো দেবে না।

বাঁধা শেষ হলে খেলনাটা চিৎ করে সেটার ফালি দুটোর বেশী করে বেরিয়ে থাকা প্রান্ত দুটো দু' হাতের দুটি করে আঙুল দিয়ে ধরে বার বার ভেতর দিকে ঠেলতে ও বাইরের দিকে টানতে সুরু করলেই দিব্যি মোরগের লড়াই সুরু হয়ে যাবে।

'কুতুবমিনার'
শিল্পী: শ্রীবিপ্লব সেন

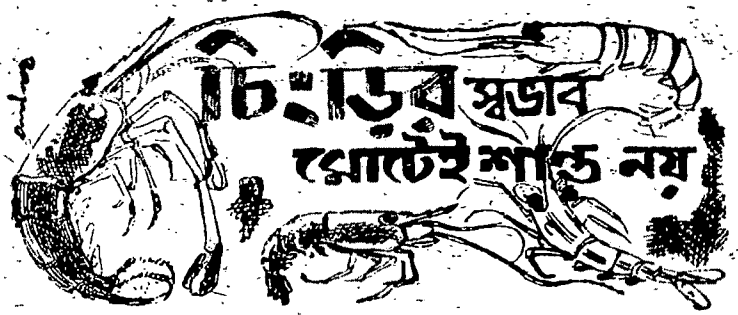

চিংড়ি—চিংড়ি আর চিংড়ি। গল্‌দা কিংবা মোচা বাগদা - চাপড়া - কড়াণে - ঘোড়া - কুচো ও কাদা প্রভৃতি চিংড়ি'র নাম তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছো, কি—তাই না! চিংড়ি আমাদের প্রধান খাদ্য। একে চলিত কথায় চিংড়ি মাছ বলা হয়, আসলে মাছের সঙ্গে এর কোনো সাদৃশ্য নেই।

শৈশবে চিংড়ির সাথে কাঁকড়ার সাদৃশ্য বিস্ময়কর। কে চিংড়ি-শিশু, কে কাঁকড়া-শিশু বুঝবার এতটুকু উপায় নেই। মনে হয়, যেন ওরা দুজনেই আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ। অবশ্য বড়ো হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এদের দেহাকৃতির তফাৎটা পরিষ্কার বোঝা যায়।

এরা খাল-বিল, পুকুর, নদী-নালা ও সমুদ্রে বাস করে। এই চিংড়ি মাছের স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে নিশ্চয়ই তোমাদের কিছু জানতে ইচ্ছে করে, কি তাই না। যদি বলি, চিংড়ির স্বভাব হুবহু তোমাদের মতোই। এতটুকু পার্থক্য নেই। হয়তো তোমরা বলবে ধ্যাৎ, যতো সব আজগুবি মিথ্যে বানান কথা। আমি কিন্তু তোমাদের সাথে একমত হতে পারলাম না। আমার মতে অর্থাৎ বিজ্ঞানীদের মতে চিংড়ির স্বভাব মোটেই শান্ত নয়। ওরাও তোমাদের মতো ঝগড়াটে। কেউ কারো সান্নিধ্য পচ্ছন্দ করে না। যেমনি করো না তোমরা। সত্যি! অদ্ভুত সত্যি!

জলের মধ্যে দুটো চিংড়ি মুখো-মুখি হ'লেই মারামারি অনিবার্য হয়ে পড়ে—আরম্ভ হয় গুঁতোগুতি, ধস্তাধস্তি। এরূপ খানিকক্ষণ চলার পর, যার শরীরে শক্তি বেশী সে-ই শেষ পর্যন্ত জয়লাভ করে। পরাজিত চিংড়ি অনেক সময় রণক্ষেত্র থেকে পালিয়ে গিয়ে প্রাণ বাঁচায়। তবে অক্ষত দেহে পালাতে পারে খুব কম জনাই। কম করে দু-তিনটে ঠ্যাং রণক্ষেত্রে ফেলে আসতে হয়ই। দু' তিনটে ঠ্যাং গেলো তো বয়েই গেলো, আবার গজিয়ে উঠবে। তোমরা নিশ্চয়ই জানো, টিকটিকির লেজ খসে পড়লে আবার দিন পনেরোর মধ্যেই গজিয়ে উঠে। তেমনি চিংড়ির ভাঙ্গা ঠ্যাং পুনরায় গজিয়ে উঠতে বেশী সময় লাগে না। সুতরাং ঠ্যাং বিসর্জন দেয়া পরাজিত চিংড়ির পক্ষে মোটেই অসুবিধার কারণ হয় না। এটা জেনে রাখো—পরাজিত চিংড়ি যদি কোনক্রমে রণক্ষেত্র থেকে পালাতে না পারে, তাহ'লে তার মৃত্যু সুনিশ্চিত। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

শ্রীসুনীল সরকার

শুধু তা-ই নয়, রণজয়ী চিংড়ি পরাজিত চিংড়ির মৃতদেহ পরমানন্দে উদরসাৎ করতেও দ্বিধাবোধ করবে না। স্বজাতির মাংস এরা খুব উপাদেয় খাদ্য বলে মনে করে।

এদের কোন দয়া-মায়া আছে বলে মনে হয় না। এ ব্যাপারে এরা বনের হিংস্র পশুকেও হার মানায়। তোমরা শুনলে আশ্চর্য হবে, ক্ষুধার সময় এরা নিজের সন্তানদেরও উদরসাৎ করতে কুণ্ঠা বোধ করে না। আশ্চর্য! তবে ডিম ফুটে ছানা বের না-হওয়া পর্যন্ত এদের স্নেহের অভাব হয় না। যেইমাত্র ডিম ফুটে বাচ্ছা বের হলো ওমনি ওরা হয়ে উঠে নির্দয় পাষাণ। সন্তানদের সঙ্গে আর কোনো সম্পর্কই থাকে না। কিন্তু ডিমের প্রতি থাকে এদের প্রখর দৃষ্টি। শত্রুরা এদের সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে কদাচিৎ ডিম অপহরণে সক্ষম হয়। ডিমের লোভে কই, শিঙ্গি বিভিন্ন জাতের মাছ প্রায়ই স্ত্রী-চিংড়িকে আক্রমণ করে। স্ত্রী-চিংড়ি ডিমগুলোকে সযত্নে বুকের নীচে ঢেকে রেখে চলাফেরা করে। ফলে, সহজে স্ত্রী-চিংড়ির বুকের নীচ থেকে ডিমকে ছিনিয়ে নিতে পারে না।

চিংড়ি ছাড়া অন্য কোন মাছ যদি কখনো এদের আক্রমণ ক'রে, তা'হলে এরা আত্মরক্ষার জন্যে পাল্টা আক্রমণও চালায়। চিংড়িকে হঠাৎ কেউ আক্রমণ করলে সে তার লেজটিকে বাঁকিয়ে এমন জোরে শত্রুকে আঘাত ক'রে যে, শত্রু পালাবার পথ খুঁজে পায় না। এতেও যদি কাজ না হয়, তবে এরা কাঁটাযুক্ত লম্বা দাড়া দিয়ে সাঁড়াশীর কায়দায় শত্রুর দেহে ভীষণ জোরে চেপে ধরে। ছেড়ে দে মা, কেঁদে বাঁচি বলে শত্রু তখন পৃষ্ঠপ্রদর্শন করতে বাধ্য হয়।

চিংড়ির অঙ্গে কতকগুলি মারণাস্ত্র আছে। যেমন লেজে একটি উপাঙ্গ ও মুখের সম্মুখে একটি উপাঙ্গ। এই দু'য়ের আঘাত যে সহ্য করতে পারবে সে সত্যি বীর। যেকোন শত্রুকে ঘায়েল করতে দু'টি উপাঙ্গই যথেষ্ট। তবে, এদের লেজের শক্তি প্রবল। মোটকথা এদের স্বভাব মোটেই শান্ত নয়, ঠিক তোমাদের মতো ঝগড়াটে ও চঞ্চল।

রামগরুড়ের হাসি!

শ্রীশুভা ঘোষ

রামগরুড়ের ছানা—
শুনলনাকো মানা
ফেল্‌ল হেসে, ফ্যাক্ করে সে
নেইকো কারণ জানা।
রামগরুড়ের হাসি
নিষেধ বাধা নাশি
উচ্চরোলে উঠল কেঁপে
হাল্কা হাওয়ায় ভাসি।
রামগরুড়ের বাসা—
হাসির দমক্ ঠাসা
আজগুবি সব চিন্তা মনে
করছে যাওয়া-আসা।
আপনি সে সব ভাবি
ভাবনা হাবিজাবি
আপনি হেসে গড়িয়ে পড়ে
শেষকালে খায় খাবি।
সবাই অবাক মানি
কবুল কানাকানি
দুঃখে যারা কাঁদল তাদের
পড়ল চোখে ছানি।

পুরাকাহিনী

শ্রীমতী বেলা দে

সৃষ্টির দুর্ভেদ্য রহস্য ভেদ করবার কৌতূহল নিয়ে অপরিণতবুদ্ধি মানুষ একদিন যেসব আলৌকিক কাহিনী রচনা করেছিল, তাকেই আমরা বলি পুরাকাহিনী। পুরাকাহিনী যতই প্রাচীন এবং অবিশ্বাস্য হোক না কেন, তবুও পুরাকাহিনী শুনতে ভাল লাগে। পশুপক্ষীর আকৃতি ও প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও অনেক সময় পুরাকাহিনী রচিত হয়ে থাকে। যেমন সাপের জিহ্বা দ্বিখণ্ডিত কেন, এ-বিষয়ে একটি কাহিনী প্রচলিত আছে।

সমুদ্র মন্থনের পর দেবতাগণ কুশাসনে বসে অমৃত পান করলেন। তারপর অসুরদের অমৃত থেকে বঞ্চিত করবার জন্য তাঁরা যখন অমৃতভাণ্ড নিয়ে সে স্থান থেকে পালিয়ে গেলেন, তখন নাগগণ সেখানে এসে হাজির হলো। তারা দেখলে অমৃত পান করবার আর কোনো আশা নেই; তারা তখন নিরুপায় হয়ে দেবতাগণ যে কুশাসনে বসেছিলেন, তাই জিব দিয়ে লেহন করতে লাগল। কুশের তীক্ষ্ণ ধারে তাদের জিব দু'খানা হয়ে গেল। সেই থেকেই সাপের জিব দ্বিখণ্ডিত।

আর একটি কাহিনী বলি—ইষ্টিকুটুম পাখীর কি ভাবে জন্ম হল এবং কেন তার রং হলুদবর্ণ হ'ল এবং কেনই-বা এরা 'ইষ্টিকুটুম ইষ্টিকুটুম' বলে সর্বদা ডাকে, এ সম্পর্কে পুরাকাহিনীতে বর্ণিত আছে যে, এক গৃহস্থের বাড়ীতে কুটুম্ব এসেছিল। শাশুড়ী বউকে ভাল করে রান্না করতে বললেন। কিন্তু বউ তেমন রাঁধতে জানত না; সে তরকারীতে বেশী হলুদ দিয়ে ফেললে, কিছুতেই হলুদের রং ফেরাতে পারলো না। অবশেষে বিরক্ত হয়ে সেই তরকারী-শুদ্ধ হাঁড়িটা নিজের মাথায় ভেঙ্গে দিলো। সঙ্গে সঙ্গে তার সর্বাঙ্গ হলুদবর্ণ হয়ে এক পাখীর রূপ ধারণ করে উড়তে লাগল। হাঁড়ির তলায় যে কালি ছিল, তা তার মাথায় লেগে গেল, মাথাটা কালো রং ধারণ করলো। কুটুম্বের জন্যই তার পাখীরূপে জন্মাতে হলো বলে কুটুম্বের কথা সে আর ভুলতে পারল না, তাই 'ইষ্টিকুটুম ইষ্টিকুটুম' বলে ডাকতে লাগল। আজ পর্যন্ত তার সে ডাকের বিরাম নেই।

আবার রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী নিয়ে কিছু কিছু পুরাকাহিনী রচিত হয়েছে, যেমন কুশের জন্ম সম্পর্কে। সীতা যখন শিশুপুত্র লবকে নিয়ে বাল্মীকির আশ্রমে বাস করছিলেন সেই সময় একদিন তিনি নদীতে জল আনতে যাবার সময় লবকে মুনির কাছে বসিয়ে রেখে জল আনতে গেলেন। বাল্মীকি তখন রামায়ণ রচনায় মগ্ন, এদিকে লব কোনো দিকে না দেখে, মা যে পথে গেছেন সেই পথে হাঁটতে সুরু করে দিলো। সীতা পিছন ফিরে দেখেন, লব এসেছে। তিনি তখন পুত্রকে নিয়ে আশ্রমের পথে চললেন। এদিকে ঋষি দেখলেন লব নেই, তখন আশঙ্কা করলেন নিশ্চয়ই সে নদীতে ডুবে মারা গেছে। সীতাকে তিনি কি বলে সান্ত্বনা দেবেন? তখন, তিনি যজ্ঞ কুশ দিয়ে ঠিক লবের মত একটি পুত্তলিকা গড়ে তাতে প্রাণ সঞ্চার করলেন। লব সীতার সঙ্গে আশ্রমে ফিরে এলো, ঋষি তো অবাক! সীতা জিজ্ঞাসা করলেন, একে কোথায় পেলেন বাবা? বাল্মীকি সব বললেন। তারপর বললেন, একে তুমি পালন কর। কুশ দ্বারা একে নির্মাণ করেছি, তাই এর নাম দিলাম কুশ।

সীতাদেবী সাগ্রহে শিশুটিকে নিজের সন্তানরূপে গ্রহণ করে পালন করতে লাগলেন। এই ভাবে কুশের জন্ম হল।

এমনিধারা বহু পুরাকাহিনী বাংলা দেশে প্রচলিত আছে।

দেশের কাজ

শ্রীসুকোমল বসু

'আগুন! আগুন! আগুন!
বাঁচাতে হ'লে এই বেলা সব পরোপকারে লাগুন!
নইলে পরে মরবে পুড়ে একটি পরিবার
ছেলে বুড়ো, কচিকাচা—কারু নেই নিস্তার!
উত্তেজনায় লোকটা যখন কথাগুলি বলে
পথের মানুষ চারিদিকের জমলো দলে দলে!
'কোথায় আগুন? কোন্ বাড়িতে? বলুন তাড়াতাড়ি
দমকলকে খবর দেবো—বিপদ যখন ভারী!'
'—বাড়িতে নয়—আগুন পেটে—ক্ষুধার আগুন ভাই
সপরিবারে কাল থেকে যে কিছুই খাই নাই।
দমকল কি নিভাতে পারে পেটের ক্ষুধার আগুন
চাঁদা তুলে নেভান আগুন—দেশের সেবায় লাগুন!'
পথচারী বলে—'লোকটা করেছে বোধ হয় নেশা'
হলাকুটা বলে—'নেশা নয় ভাই—ওটা আমার পেশা!'

নদীকূলে

শিল্পী : শ্রীগোপাল ভট্টাচার্য

শাঙন অভিসার

শ্রীশান্তি পাল

বনতলে বাজে জল-তরঙ্গ,
উঠে ঝলকিয়া দামিনী ;
ঝঞ্ঝা-মথিতা নিশা আঁধিয়ার-
একেলা চলেছে কামিনী।
কাঁদিছে শাঙন ঝর-ঝর ধারে—
জোনাকির দীপ জ্বলে ঝোপ-ঝাড়ে
ঘন ঘন মেঘ-ডম্বরু বাজে—
উঠিছে রুদ্র রাগিণী।
উঠে ঝলকিয়া দামিনী॥

হাতে পারিজাত কুসুমের মালা
চলে বামা ধীর-গমনে ;
স্বপ্ন-বিভোল হৃদি উচ্ছল
নীরব-নূপুর চরণে ;
কানড়-কবরী পড়েছে খসিয়া
ভিজা শাড়ি রহে তনুটি বেড়িয়া।
শুভ্র ললাটে সিন্দুর লেখা
গলিয়া পড়িছে বসনে।
চলে বামা অভিসরণে॥

সন্ধান

সাধন চৌধুরী

উদ্বেলিত আনন্দের তাপে
গোপন ঘনিষ্ঠ সংলাপে
জীবনের যোগসূত্র যৌবনের স্তূপে
আজি আলোড়িত। এলোমেলো স্বপ্নের
স্বরূপে
নিভৃত—যা' ছিল নিথর
অনন্ত ঝংকারে প্রিয়া তোমার মেদুর
উত্তর
মুখরিত করিয়াছে সব।
শান্তি-সমন্বয়ে
তুমি আমি আছি বাঁধা ধ্রুপদী হৃদয়ে।
ওগো প্রিয়া, তোমার মদির অমিয়া
অলক্ত রেখাতে
বিদ্রূপের বালিবাঁধে ধূলির লেখাতে
তুমি কী এনেছো আজ পরিচিত সুলভ
সুষমা—
অলৌকিক আকিঞ্চনে ওগো মনোরমা!
তনুর তন্ত্রে তন্ত্রে তব প্রেম, প্রীতি
অনাবৃত করিয়াছে পুরাতন স্মৃতি
তৃপ্তির তাপস্পর্শে। আকাঙ্ক্ষার আম্র-
শাখা
আঁকাবাঁকা
অমৃত মূর্চ্ছনায়
পাখির কাকলি ঢালে তৃষাতুর দিনের
ধূলায়।

দুস্তর ব্যস্ততায় দ্বিধা দ্বন্দ্বে জীবনের
দীর্ণ বালিচর—
ঘুনের মরুতে প্রিয়া, খুঁজে খুঁজে প্রীতির
নির্ঝর!

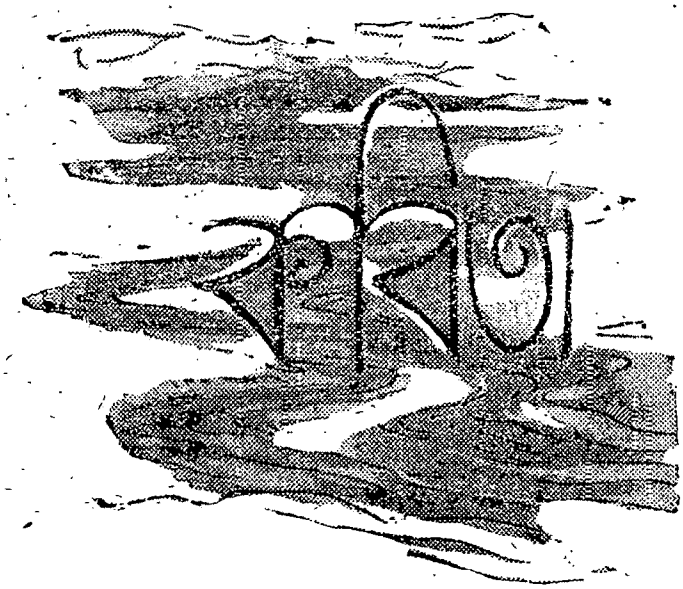

স্বর্গ বহু দূর

বিশ্বজিৎ মতিলাল

মগ্ন সভ্যতা। মানব-মানবীর নিষ্ফল
হাহাকার
শুনতে পায় না।
মুখর শতাব্দী। খুঁজে ফেরে পতিতের
পুরস্কার।
ভেঙে ফেলে আয়না,
তুমি আমি কেঁদে মরি।
হে ঈশ্বর, করজোড়ে প্রার্থনা করি,
আমাকে সভ্যতা ভুলিয়ে দাও!

বিস্মরণ আসে যদি, আশীর্বাদ ভাবি,
মুছে যায় হৃদয়ের সাতরঙা ছবি।
স্মৃতির বিষবাষ্পে একাকার সব,
ঘুম ভাঙে সভ্যতার।
সময় তো বসে নেই, মানবতা শব।

ঈশ্বর, তোমায় ধন্যবাদ, স্বর্গ বহু দূর!

প্রত্যয়

সুধীরকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

বিস্ময় বিস্ময়
পূর্ণতার পাশাপাশি ক্ষয়।
জন্ম-বৃদ্ধি-মৃত্যুর মহিমা
এবং ব্যর্থতা। সময়ের সীমা
বাসনার শব। তাই
তুমি আমি সব কিছু পাই,—
তারপর সকলই হারাই।

সাধনা সাধনা
সত্যের আরধ্ব আরাধনা
সত্যহীন শক্তিহীন। অন্ধবেগ
অন্ধকারে অগ্রসর। মহৎ আবেগ
বারে বারে অবসন্ন। তথাপি বিশ্বাস
আছে
সময়ের কাছে
তুমি আমি যা কিছু হারাই
বারে বারে ফিরে ফিরে পাব।

স্মৃতিগন্ধা

বটকৃষ্ণ দে

বাইরে ঝম্‌ঝম্‌ বৃষ্টি,
ঘরে, বাজে রেকর্ড-প্লেয়ারে
পঙ্কজ মল্লিক,
'আমার প্রিয়ার ছায়া'! চোখে ভাসে
তুমি'—কোন্‌ দূরে
মাধবীলতায়-ঢাকা জানালায়
দাঁড়িয়ে করুণ-দৃষ্টি
ছলছল ; প্রিয় পরবাসে
বিনিদ্র বৃষ্টির রাত্রি
জাগে একা ; জোনাকী-জ্বালায়
খুঁজে মরে কবেকার
হারানো হৃদয়, অধকারে!

বৃষ্টি শেষ ; শান্ত ভোর ;
উজ্জ্বল সূর্যের সীমানায়
দেখি তুমি এসে গেছ
ঝলমল স্মৃতিময়তায়॥

যখন রব না আমি

তমিতা পালিত

যখন রব না হেথা আমি,—
শুধাবে না কেহ মোর নাম।
দু'দিনের হাসি-কান্না মাঝে-
জীবনের এই পরিণাম।
সব শেষে শুধু দুটি কথা,
দু' মিনিট মাত্র নীরবতা।
তারপর সহজ সরল—
ভাববার অবসর কোথা!

তবু দেখ বাঁচবার শখ
মানুষের মনে অহরহ।
দ্বন্দ্বের বিরাম নেই—
ভুলে যায় জীবনের দাহ!

পুষ্প-সাধ

বন্দে আলী মিয়া

শোনো গো মাধবী, সূর্য কিরণে আজ দুঃসহ জ্বালা
মৌন হয়েছে ভবন কপোত পরম উষ্ণতায়,
একটি প্রহর প্রগলভতায় কাটুক এমন বেলা—
মধ্য যুগের নামে প্রশান্তি তোমার বেপথু বুকে।

মোর জীবনের তন্দ্রা জমেছে তব কণ্টক মনে
একটি রাতের সীমানা পেরিয়ে এসেছে স্বপ্ন সাধ।
শিথিল হয়েছে নীবি-বন্ধন তোমার তনিমা তটে
দুইটি নয়নে কামনাবহ্নি জ্বলিছে অনির্বাণ।

এখনো আকাশে দিবা-রাত্রির চলিতেছে পাশা খেলা
হংসবলাকা ধূসর মেঘেতে মেলেছে অযুত ডানা।
মনের নূপুর বাজিয়ে চলেছে গ্রহ হতে গ্রহলোকে
সূর্য কিরণে ঝরিছে নিয়ত তোমার দহন জ্বালা।

হে মাধবী হের, রিক্তপাত্র—হলাহল নাহি আর
শূন্য ভুবনে শবনিছে ঝঞ্ঝা—নামিছে অন্ধকার—
কুসুমশয্যা বিছাও এবার বিজন বিটপীতলে
তোমাতে আমাতে হোক পরিচয় জীবনের শেষ ক্ষণে।

টেলিফোন

শান্তনু দাস

কুয়াশা কিছু, বৃষ্টি কিছু, নরম মোমের গালু
স্নায়ুতন্ত্রী দ্রুতলয়ের শ্লোগান হরতাল,
দৃশ্যপটে স্মরণীয়, কিছু চোখের ভ্রম;
প্রিয়তমা লাগবে ভালো তোমার টেলিফোনঃ

মৃদুলয়ে ঘণ্টা বাজে নাকি মনের সুর
বেদনা কি ভালবাসার নরম অংকুর?
অংকুরিত জাফরানী রং ফুলভারের শাখা,
বৃষ্টি বুঝি নরম হাতে পরায় দুটো শাঁখাঃ

কুয়াশা কিছু, বৃষ্টি কিছু, কিছু রোদের ঝাঁপি,
দৃষ্টি গেল দেশান্তরে, মনের নাগাল মাপি—
ঝাঁপি থেকে চলকে পড়ে অসংবৃত্ত কোণ,
প্রিয়তমা, লাগছে ভালো তোমার টেলিফোন।

রাত্রির হৃদয় হ'য়ে

নীহারকান্তি ঘোষদস্তিদার

হৃদয় নির্জন হ'লে, রাত্রির মতন
হ'য়ে যায় মন।
কথারা হারিয়ে যায়। শান্ত মগ্ন প্রশান্তির ভীড়ে
তারার আলোর মতো অনির্বাণ জেগে থাকো তখন তিমিরে।
তুমি স্থির অকম্পিত তখনি তো হও—
তখনি তো স্পষ্টতায় আকাঙ্ক্ষার মতো এসে সব কথা কও।
তখনি তো ফিরে পাই তোমার জীবন থেকে সুতীব্র উত্তাপ—
ব্যর্থতার যতো গ্লানি, ক্লান্ত পঙ্গু ভীরুতার যতো অভিশাপ
নিশ্চিহ্ন তখন সব। তুমি স্বচ্ছ আকাশ তখন।
পৃথিবীর ভালোবাসা তখনি তো ফিরে পায় আমাদের মন
বলিষ্ঠ প্রত্যয় নিয়ে। সেই গাঢ় সুনির্ভর প্রত্যয়ের কাছে
চঞ্চল দিনেরা সব শপথের মতো হ'য়ে আছে।
তীব্র তীক্ষ্ম অটল শপথ—
রাত্রির হৃদয় হ'য়ে যে শপথ ভেঙে দেয় জীবনের দুর্লঙ্ঘ্য পর্বত।

টুকরো

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

সব আলো জেবলে দিই,
অন্ধকার তবু থাকে আনাচে-কাণাচে ওৎপেতে।
কথা বলে বলে ক্লান্ত,
অব্যক্ত কথার ব্যথা তবু থাকে সারা বুক জুড়ে।
অফুরন্ত অন্ধকার, অনন্ত আকুতি,
এই নিয়ে সমগ্র জীবনই পথ চলা!

কখনো কখনো মিলি বিচ্ছেদের বিবর্ণ মাটিতে...
তখনই একত্ব আসে তোমাতে আমাতে।
স্বল্পায়ু সে-বিরতির পালা শেষ হয়,
বিহ্বল তরঙ্গ ফের স্ফীত ফণা তোলে
আদিগন্ত বিরোধের,
যে-হেতু শাশ্বত সত্য বিরহই, না-পাওয়াই প্রেম!

তৃষ্ণার অতৃপ্ত পাখীগুলো
উড়ে গেল একে একে অস্থির পাখায়!
চলে গেল গিরি নদী মরু পার হয়ে
দু-ফোঁটা জলের জন্যে।
শ্রাবণের অজস্র প্লাবন নামল যে তার পরই,
জানল না বেচারী পাখীরা!

মড়ায় কি কথা বলে?
হাত নেড়ে নেড়ে তুমি বলছো কি বলো ত'?
বলছো, মৃত্যুই শেষ? তারপর ফাঁকি আর ফাঁকা
আগাগোড়া.....অতএব শ্রেয় বেঁচে থাকা!

জীবনের চলতি পথেই
পেলাম হঠাৎ খুঁজে একদিন না ভেবে না বুঝে,
জটিল গ্রন্থির শেষ খেই।
আমার পথের প্রেম সুরু হল
জেনো সেখানেই!

এখনো সময় আছে

গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়

এখনো সময় আছে? আমার রক্তাক্ত বুকে হাত
রেখে সে আমায় বললে, 'হারিও না হৃদয়ের বল;
আসুক দুরন্ত ঝড়, হোক না শিয়রে বজ্রপাত;
আমি আছি পাশে।' একি স্বপ্ন? নাকি মায়াই কেবল?

বিক্ষুব্ধ সমুদ্রে আমি নিক্ষিপ্ত হয়েছি রূঢ় ঝড়ে;
জানি না কাটাতে ঢেউ, কোনোদিন শিখি নি সাঁতার,
ভাসমান কাষ্ঠখণ্ড প্রাণপণে ধরেছি আঁকড়ে;
কিছুই দেখি না চোখে, চারিদিকে কেবলই আঁধার।

কে তুমি সাহস দাও? কারুণ্যে সর্বদা প্রজাগর!
দু'চোখের জলে পথ ভিজে গেছে, আগুন লাভায়
নিঃশব্দে পুড়েছে বুক; ক্ষুধা-তৃষ্ণা করেছে কাতর;
কেটেছে বৎসর, মাস, প্রহর পরম প্রতীক্ষায়।

অর্থ প্রেম যশ নয়, শান্তি চেয়ে পেয়েছি বঞ্চনা;
'এখনো সময় আছে'—কেন দাও এমন সান্ত্বনা!

মহালয়া

বিমলচন্দ্র ঘোষ

মনমরা আলো নিভে যায়,
হাওয়ায় হাওয়ায় মনোহীন সুর
ঝিঁঝিদের অশান্ত পাখায় ঝঙ্কার
তোলে।
ম্রিয়মাণ বনচূড়ায়
ফুলেরা রঙ হারায়
বিমর্ষ সৌরভ রাত্রি ভারাক্রান্ত।

কালকান্তা তামসীর শরীরে,
তিমিরকম্প চুলে,
রাতকানা জোনাকিরা
অসংখ্য কামনাকণার দীপ্তচাঞ্চল্যে
ঘুমুতে পারে না।
আমাদেরও চোখ সূর্যসন্ধানী।

জন্ম আর মৃত্যুর মাঝখানে
জীবন-সেতু সরু সময় দুলছে,
মাথায় চাপানো পাহাড়প্রমাণ অস্থিরতা।
মুক্তি কোথাও নেই,
অন্ধ গুরুরা যুগ যুগ থেকে বলেঃ
'আলো জ্বালিয়ে সূর্যের মুখ দেখো!'
কালকান্তা তামসীর মুখে
মনোহীন হাসি!
আমরাই কেবল হাসতে গিয়ে
ভয়ে আঁৎকে উঠি।

সেতু

রমেন্দ্র ঘটক চৌধুরী

একটা দুঃস্বপ্ন যেন—রাত্রি আর হৃদয়ের
অশরীরী শিরশিরে ভয়
অশালীন মানবতা—কুড়ে কুড়ে ব্যর্থতার,
কাব্যের গাম্ভীর্য ছেড়ে
শিশুদের ছড়ার কথন—
যা কিছু আদিম প্রাপ্য
বিশ-শতে এতটুকু প্রলেপ মতন
এক থালা ঢেঁকি-ছাটা লাল লাল ভাত
মানুষের যাত্রাপথে কুকুর ও কুকুরীর
যৌন অভিচার।
গোবিন্দ-ভোগের অন্ন আমিষ ও নিরামিষে
পাহাড় প্রমাণ
মাছিটা শেখেনি কিছু তারি পর বার
কয় স্বচ্ছন্দ ভ্রমণ
অনার্য অন্নের ছোঁয়া পায়ে পায়ে যোগ টানে
একূল ও ওকূলের দীর্ঘ অন্ধকার।

একটা দুঃস্বপ্ন ভাঙে রাত্রির প্রত্যেক প্রহরে
তের-তলা বাড়িটার স্বয়ংক্রিয় ঘণ্টার আওয়াজ
আর দূরে—
বগীর সক্রিয় আত্মা ধানুকার প্রাচীন
মন্দির
একটি নতুন মূর্তি
দুই কাল ব্যবধান সেতুর উপর।

হেঁ-হেঁ আলীর ছড়া

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

কাণ্ড

মহকুমার সদরে ভাই
দেখে এলাম কাণ্ড
একজন ডালে একজন পাতায়
খোঁজে গাছের কাণ্ড
দেখতে তালপাতার সেপাই
মাথাগুলো প্রকাণ্ড

তাকায় না ফলফুলে
লক্ষ্য একদম মূলে
বলে না অবিশ্যি খুলে
তারা ছাড়া বাকি সবাই
কেন অকালকুষ্মাণ্ড

এ কয় ওরে, শিখো রে
পৌঁছুতে হয় কী ক'রে
সোজা সটান শিকড়ে
ব'লে যেই না হাত ছেড়ে দেয়
চিৎ ক'রে দেয় ব্রহ্মাণ্ড॥

বাঘে

চরাতে নিয়ে গিয়েছিলম গো মালিক
তিন শো শব্দ গো
মালিক
তিন শো শব্দ
ফিরে এলম গো মালিক
তিনটে-কম গো
মালিক
তিনটে কম

একটি ছিল অগ্নে
সেটিকে পেয়ে বাগে
খেয়ে নিলে হালুম গো মালিক,
খেয়ে নিলে হালুম।

দুটিকে দিলে খোঁয়াড়ে
ও পাড়ার সেই চোয়াড়ে।
একটি ভূত
একটি ভগমানের পুত—
ভালবাসা ছিল সব্বার আগে গো মালিক
ছিল গো মালিক আগে—
তাকেই খেলে বাঘে॥

তিন্তিড়ী

তেঁতুলতলায় শব্দ কিসের
বিশ্রী বিদিকিচ্ছিরি—
কে ওখানে? কে হে?

আজ্ঞে, আমি হেঁ-হেঁ—
অন্ধকারে চোখটা জ্বেলে
খুঁজে বেড়াচ্ছি তিন্তিড়ী।

ঢুকব কি না ঢুকব দেহে—
মুখপুড়িটা আমায় ফেলে
দিয়েছে দেখুন, কী বিষম সন্দেহে॥

শেষোক্ত

গোপাল ভৌমিক

বিরান্বিত লয়ে বাঁচি
এ কামনা সরজাত। তবু
ঘটনাচক্রের সাথে
প্রতিদিন চলি দ্রুততালে।
তাই মাঝে মাঝে যদি তালভঙ্গ হয়
অপরাধ নিও না নিবেদন করি।

জানি দাবী অর্থহীনঃ
আমি যা বোঝাতে চাই
সে তোমার বোধের অতীতে।
সকলের সাথে এক করে
আমাকে দেখার ফলে
তোমার বিচার ভুল মনেই হবে না।

অথচ আমার মন
আহত শিশুর সরলতা
নিয়ে ভাববে সুবিচার পায়নি সে মোটে।
কে-যে দোষী কে-যে ঠিক
ভেবে ভেবে দিন কেটে যায়,
সব কিছু দেরি করে এ কপালে জোটে।

সীমাহীন অপেক্ষায়
থাকতে কাতর নই বলে
যন্ত্রণায় ফেটে পড়া এ অভ্যাসে নেই।
জানি সূর্য সকলের
কম বেশি জুটুক উত্তাপ;
শেষ কথা বলবে কে, আমি তুমি নই।

ছাতিটা খোলো

মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

আহা কী সূর্য এখানে দাঁড়িয়ে আয়না ধরে,
ইউরেশিয়ার দুপুর ঝলসে চামড়া হল,
ইস্পাতে গড়া সাঁকোর অস্থি বায়না ধরে,
টোকিওর পথে দেবযানী তবে ছাতিটা
খোলো!

প্যাগোডার দেশ এই পথে ধস নেমেছে কিনা,
পাথর আর খনি নড়িয়েছে টাইফুন কি এসে?
বন্যার ঘায় কর্পূর-কায় শিকোকু-বীণা
গুহার প্রান্তে চিত্রাপিত উঠছে ভেসে!

কালরাতে ভূমিকম্প হয়েছে ল্যাকার বনে,
পাইন আর ওক, তু'ত গাছ ছিল কী হাসি
হেসে,
ভঙ্গ দিয়েছে মঙ্গোলীয়ের কঠিন রণে,
পৃথিবীকে তবু তারা শেষ ভালো গেছে তো
বেসে।

ঘণ্টা পড়েছে কত রাত্তিরে—কে শুনেছিল?
জলকল্লোলে অশ্বের পটু পদধ্বনি,
কে জানে তাঁবুতে ছিল কতগুলো
ডানলোপিলো!—
দেখাবে বলে কি দড়ি-কণ্ঠির প্রদর্শনী?

এখন কেমন ফুলগুলি দেখো ইয়োকোহামায়,
ফরমোজা তুলে ধরেছে আপেল ফলের থোলো,
থামারে থামারে ফুজিয়ামা কত রৌদ্র নামায়,
কড়া রোদ্দুরে দেবযানী তবে ছাতিটা খোলো!

যখন তাকেই দেখি

আবুল কাশেম রহিমউদ্দীন

বিস্ময়ে অবাক হই, যখন সে মৃদুকণ্ঠে তার
বেদনার দিব্যসুর বিজয়িনী বেহালার মতো
করুণ বেহাগে বলেঃ সুখী আমি, সুখী এ-সংসার,
স্মৃতির ছড়ের টানে এ-জীবন-তন্ত্রীতে নিয়ত
দুঃখের বিচিত্র মীড় নীল প্রেমে কখনো সাগর,
কখনো আকাশ ছেয়ে গুমরেওঠা মেঘের প্রণয়।

প্রত্যহ বাসন মাজে, জল তোলে বেলা-অবেলায়,
মাজা বাসনের মতো আজও তার স্বচ্ছ সাদা মন
এ-কাজে ও-কাজে মেলে দিন কাটে অস্থির খেলায়।
নিষ্ঠার নিক্তিতে মেপে না দেখেই পুণ্যের ওজন
সতীন সন্ধ্যার তটে গাঢ় ক'রে এয়োতীর রেখা
কল্পনার তুলসীতলে জেবলে দেয় রাত্রির হৃদয়।

স্বপ্নের আঠারো শিব-রাত্রির সাধনা শেষ ক'রে
হয়তো বা অন্য এক জরিতার স্বামীকে জেনেই
দিয়েছিল মত; আজ মোহের বসন্ত গেছে ঝ'রে
সে-লোকটা ফিরে গেছে প্রথমার পুরোনো দিনেই।
তাই মহাভারতের এ-যুগের সে-ও কি লপিতা
বিরহের চিরতীর্থে উপমার আশ্চর্য প্রত্যয়!

প্রত্যহ অবাক হই, কাজের অরণ্যে প্রতিদিন
যখন তাকেই দেখি আরণ্যক ফুলের মতন,
হৃদয় পাপড়ি মেলে প্রতি ব্যস্ত দিবসের ঋণ
শোধ করে; শব্দহীন গানের সৌরভ সম্ভাষণ
প্রতিটি প্রাণের জন্য অধীর আগ্রহে তুলে ধ'রে
দৈন্যের দিগন্তে আনে বর্ণের বিচিত্র সমন্বয়॥

তিন শূন্য

শ্রীমতী ভক্তি দেবী

তোমার সাথে এই যে আমার কাটাকুটির খেলা,
বৃথা কাজে নষ্ট করা সারা দুপুর বেলা।
কী দিয়েছি কী পেয়েছি ক'রেই কষি গণ্যি
তুমি দিলে ঢ্যারা বন্ধু, আমি দিলেম শূন্যি।

চার লাইনের ছক্ কাটা এই গণ্ডী বাঁধার খেলা
সকল দানই বাতিল হোল, গড়িয়ে গেল বেলা।
শেষের খেলায় জিতলে তুমি, রইলো তোমার জিত
হার মেনেছি তোমার কাছে, সেটাই আচম্বিত।

সময়টাকে চুরি করে দাগ মিলালো শ্লেটে
ছাইয়ের গাদা রইলো পড়ে খালি চায়ের পেলেটে।
সামনে পড়ে হাসছে দেখি তিনটে তোমার শূন্য
আমার এ হার তোমার কাছে, তাতেই আমি ধন্য।

এপার ওপার

নচিকেতা ভরদ্বাজ

এ প্রাণ-প্রবাহ থেকে তবে কোন অন্বিষ্ট জগতে
ফিরে যেতে চাই আমি? আমার হৃদয়-মন অন্ধকার
আকাঙ্ক্ষার শর
বুকে করে কী যে চায়, কী হতে সে চেয়েছে এখানে?
সমস্ত আনন্দের অন্তিম শরতে
শুভ্র চৈতন্য সব ঢেকে যাবে, শান্ত নীল নিঃসীম নীরব
কী বিবিক্তি-সমাহিতি—জীবনের সহজ বিজ্ঞানে
এখানে ছড়িয়ে পড়বে, শেষ পাতাটিও ঝরে যাবে।
বিপন্ন পদচিহ্ন পড়ে থাকবে করুণ কিংখাবে
অনাহত অন্ধকারে পরিবৃত হয়ে যাবে সব।

অথচ জীবন মানে কী দুরূহ সংজ্ঞার আলোক!
লোকময়,—অথবা সে লোকাতীত শ্লোক
ছন্দোশীল হয়ে আছে—দ্যাখো চারিদিকে—,
সোনার খাঁচায় তবু হীরামনটিকে
বাঁচিয়ে তো রাখতে পারে নি
অদ্যাবধি কেউ।
সময়ের কাছে শুধু আমরা তবু থেকে যাই ঋণী
বার বার। অথচ সমুদ্র-জাত একটিও ঢেউ
কূল খুঁজে পায় নি এখানে
কোনো মোহানায়।
তবুও ময়ূরপঙ্খি কারা যেন সযত্নে ভাসায়
অনিন্দিত আলোর সম্মানে
সম্মিলিত সহজিয়া গানে!
অথচ জীবন-মৃত্যু স্তব্ধ একাকার
এপার ওপার!

হৃদয় হৃদেই

রমেন্দ্রনাথ মল্লিক

হৃদয়-হৃদেই গিলে-করা স্রোত কত কথা ছলনায়
বলো বা না-বলো যেমন যা ইচ্ছা অপরূপ রচনায়,
তুমি শুধু কেন জীবন ধারণে জেনেছ রূপালী দিন
অনেক আশ্চর্য কথাকলি শুনি আমি তো চিন্তায় লীন।

কত জানি ভাব জীবন চরিতে কত গান কত সুর
অনন্ত কালের পিপীলিকা স্রোতে চলে যাত্রী বহুদূর
তবু এই চলা দুদিনের পথে চিরন্তনী চেতনায়,
বুদ্ধি ও বোধের আলো ও আঁধারে ঘোরে কোন্ ঠিকানায়!

এবং যখন কোনো আশ্চর্যের অনুভূতি অবসাদ,
হৃদয়ের সুর সমারোহ কেন ; সবটুকু মধুস্বাদ
দূর চক্রবালে নয়তো সেখানে থাকবে না কোনো কালে
সকল চেতনা কাছে টানে ঠিক জীবনে জীবন চালে।

ঢেউ কুচি-কুচি হৃদয়-হৃদেই আশা-নিরাশায় মেশা
বিচিত্রতারই তটে তটে দেখি ভাবনা ভরানো নেশা!

কোথাও আশ্রয় নেই

মৃত্যুঞ্জয় মাইতি

আলো অন্ধকারে দিনে তীর্থে পথে বাইরে ও ঘরে
অথবা বিকেলে কোনো উদাসীন নদীর প্রহরে
সবখানে ফিরে ফিরে তার সাথে শুধু দেখা হয়;
সে যেন সূর্যের ছবি দিগন্তের উজ্জ্বল বিস্ময়
যে দিকে ফেরাব মুখ শুভ্র আলো চোখে এসে পড়ে,
গভীর প্রেমের মতো সে রয়েছে রক্তের স্বাক্ষরে!

এই অপরাহ্নে ভাবি তার কাছে সঁপে দিয়ে আসি
পাপ পুণ্য প্রেম ক্ষমা পৃথিবীর ভালোবাসাবাসি,
জীবনের যতো দুঃখ যন্ত্রণার অন্তহীন ভার,
সবকিছু তাকে দিয়ে ফিরে যাব পথেই আবার!
এখন পশ্চিমপ্রান্তে অস্তমিত সূর্যের প্রণামী,
খুঁজে দেখি সে আশ্রয় কেউ নয়, কেউ নয় 'আমি'!

শ্রীশ্রীদুর্গা

(১১ পৃষ্ঠার পর)

"শুচির্ভূত্বা মহাবাহো সংগ্রামাভিমুখে স্থিতঃ।
শরাজয়ায় শত্রূণাং দুর্গাস্তোত্রমুদীরয়॥"

ভীষ্ম পঃ—২৩ অঃ।

শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক অর্চিতা হইয়া ভগবতী দুর্গা শ্রীবাসুদেবকে বহু উৎকৃষ্ট বর প্রদান করেন---ইহাও পুরাণ গ্রন্থে উল্লিখিত আছে।

রামায়ণে দুর্গার্চনার বিশেষ উল্লেখ না থাকিলেও শ্রীরামচন্দ্রের দুর্গার্চনা বিবরণ দেবী ভাগবত ও কালিকা পুরাণাদিতে উল্লিখিত আছে। আদি-কবির রামচরিতই মুখ্য উপজীব্য এবং করুণ-মধুররসে আপ্লুত মহর্ষিকণ্ঠ তাই মুখ্যনায়ক শ্রীরামচন্দ্রের বীর-কারুণ্যপ্রেমমধুর জীবনচিত্রটিই প্রাণ ভরিয়া আঁকিয়া দিয়াছেন। অনুপম রামভক্তি সাধনায় সিদ্ধ মহর্ষি বুঝি বা অতলমধুর রামরচিত-সুধাসমুদ্রে ডুবিয়া প্রাণ ভরিয়া সেই অমৃত পান করিয়াছেন —অন্যদিকে দৃষ্টি ফিরাইবার অবকাশ কোথায়? কিন্তু মূল প্রকৃতি দেবী সীতাকে মহার্ঘ্য রত্নাসন দান করিয়া ঋষি মহাশক্তির চূড়ান্ত মর্যাদা রক্ষা করিয়াছেন।

শরৎকালে দুর্গোৎসব বাঙালার বাহিরে নবরাত্র ব্রতাদিরূপে প্রতি-পালিত হয়। বাংলা দেশে দুর্গাপূজা একটি বিশিষ্ট আনন্দময় পুণ্যোৎসব। ইহাকে বাঙালীর জাতীয়োৎসব বলা যাইতে পারে। এত সমারোহ এবং ধনী-দরিদ্র, বিদ্বন্মূর্খ ও উচ্চ-নীচ নির্বিশেষে এমন আনন্দ ও বিমল উদ্দীপনা আর কোথাও দৃষ্ট হয় না। বাঙালী বিশ্ব-জননীকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। মাতৃনাম শ্রবণ, কীর্তন, মাতৃরূপ চিন্তন ও মাতৃ-মহিমানুভূতিতে সে আত্মহারা। সকল বাৎসল্য, করুণা ও মাধুর্য মাতৃপ্রেমের সুধাসমুদ্রে অপূর্বভাবে মিশিয়া গিয়াছে এই উৎসবে। বাঙালীর রসানুভূতি অনুপম ভক্তিরসে সমন্বিত হইয়া যে আনন্দ-মন্দাকিনী রচনা করিয়াছে, তাহাতে অবগাহন করিয়া বাঙালী এখনো বাঁচিয়া আছে। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের মাতৃবন্দনা ও দেশপ্রেমের উৎস—এই মাতৃমন্ত্রেরই সাধনা। ছিন্ন, খণ্ডিত, দৈন্যক্লিষ্ট এই দেবভূমিতে আবার আনন্দ ও মিলনের মন্ত্র ধ্বনিত হোক। সকল রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব, কোলাহল ও হীন স্বার্থপরতা হইতে মুক্ত হইয়া বাঙালী আবার অভয় মঙ্গল মাতৃমন্ত্রে দীক্ষালাভ করিয়া ধন্য হোক।

ওঁ সর্বস্বরূপে সর্বেশে সর্বশক্তি সমন্বিতে।
ভয়েভ্যস্ত্রাহি নো দেবি দুর্গে দেবি নমোঽস্তুতে॥

ওঁ

পুরানো মামলার কাহিনী

(৩২ পৃষ্ঠার পর)

জীবদ্দশাতেই সেই ছেলে নিঃসন্তান অবস্থায় মারা গেলেন। মারা যাবার আগে তিনি তাঁর স্ত্রীকে দত্তক নেবার অনুমতি দিয়ে গিয়েছিলেন। সন ১২০৮ সালে (ইংরিজি ১৮০১) বৌরাণী জয়মণি শ্বশুর রাজা রাজবল্লভ-এর সম্মতিক্রমে তাঁরই পরামর্শে চুঁচড়োর সোম বংশেরই একটি ছেলেকে পোষ্যপুত্র নেন। ছেলেটির বাবা কৃষ্ণমোহন সোম ১২০৮ সালের ৭ই শ্রাবণ তারিখের এককেতা দলিল-মারফৎ সকলকে জানিয়ে দিচ্ছেন যে, তিনি ঐ দিন তাঁর সেজো ছেলে শত্রুঘ্ন সোমকে বাগবাজার নিবাসিনী শ্রীমত্যা বধূরাণী জয়মণিকে দত্তকরূপে দান করলেন। অতঃপর ঐ ছেলের উপর তাঁর আর-কোনো দাবি-দাওয়া রইল না। ঐ ছেলে রাজা রাজবল্লভেরই পরিবার-ভুক্ত হলেন।

রাজবাড়িতে যেতেই শত্রুঘ্নের নাম পালটে দেওয়া হল। রাজবল্লভ মুকুন্দবল্লভের সঙ্গে মানানসই করে তাঁরা নতুন নাম রাখা হল গৌরবল্লভ। রাজকুমারের মতো গালভরা নাম পেলেন বটে, কিন্তু রাজপদ পেতে গৌরবল্লভকে বেশ-কিছু বেগ পেতে হয়েছিল। বৌরাণীর দত্তক নেওয়ার অল্প-কিছুদিন পরেই রাজা রাজবল্লভ মৃত হলেন। তাঁর মৃত্যু হতেই গোল বেধে গেল। তাঁর এক ভগ্নীর বিবাহ হয়েছিল মুর্শিদাবাদেরই মিত্তিরদের ঘরে। মিত্তিররা ধন-সম্পদে রাজ-বল্লভদের চেয়ে খানিকটা খাটো হলেও কুলমানে তাঁরা সোমেদের অনেক উঁচুতে। রাজবল্লভ নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যাওয়ায় তাঁর চার ভাগনে—জগন্নাথপ্রসাদ, কাশীনাথ, গোলকনাথ আর গোপীনাথ—তাঁর বিপুল সম্পত্তি উত্তরাধিকারসূত্রে দাবি করে বসলেন। গৌরবল্লভ তখন নাবালক।

মিত্তিররা সুপ্রীম কোর্ট থেকে ডিক্রি পেয়ে রাজবল্লভের সমস্ত সম্পত্তি দখল করে নিলেন। মুকুন্দবল্লভ আর বৌরাণীর নামে যে সব সম্পত্তি ছিল, তা অবশ্য পেলেন না। আর, নগদ টাকাও রাজবল্লভ যে রেখে গিয়েছিলেন তারও হিসাব মিলল না। মিত্তিরদের তরফ থেকে আদালতে বলা হলো যে, সম্পত্তি রাজবল্লভের। রাজবল্লভ তাঁর পুত্রবধূকে দত্তক নিতে অনুমতি দিতে পারেন না, দিলেও সে-অনুমতি কোনো কাজের জিনিষ নয়। সুতরাং তাঁর পুত্রবধূ যাঁকে দত্তক নিয়েছেন বলছেন, তিনি রাজবল্লভের ত্যক্ত সম্পত্তি পেতে পারেন না। গৌরবল্লভ নাবালক থাকার দরুণই বোধ হয় তাঁর তরফ থেকে মামলার তদ্বির তেমন ঠিক হয় নি। তবে সুপ্রীম কোর্টের জজেদের মনে খানিক ধোঁকা লেগে থাকায় তাঁরা মিত্তিরদের ডিক্রি দিয়েও রায়ে বলে রেখেছিলেন, যদি কোনো সময় রাজা রাজবল্লভের অন্য-কোনো উত্তরাধিকারী বের হন, তাহলে তিনি এ সম্পত্তির জন্যে আবার মামলা করতে পারবেন, ঐ ডিক্রি তার বাধা হবে না।

এরপর, ১৮২৩ সালে, গৌরবল্লভ সাবালক হতেই তিনি ঐ ডিক্রি রদের জন্যে মামলা ঠুকে দিলেন। এবার তাঁর দিক থেকে তদ্বির ভালো হয়েছিল। কৃষ্ণমোহনের লেখা দত্তকী দলিল আদালতে প্রমাণ করা হল। আত্মীয়-কুটুম্ব অনেকেই দত্তক নেওয়া সম্বন্ধে সাক্ষী দিলেন। বাড়ির মেয়েদেরও বাড়ি বসে কমিশনে এজাহার নেওয়া হল। জজও ছিলেন গুণী ব্যক্তি। অনেক কষ্ট করেই তিনি জটিল হিন্দু-আইন আয়ত্ত

করেছিলেন। কিন্তু তিনিও দু-পক্ষের কৌঁসুলীদের তর্কাতর্কি শুনে মন স্থির করতে না পেরে, সুপ্রীম কোর্টের জজ-পণ্ডিতদের শরণাপন্ন হলেন। দু-পক্ষই যখন বেশ ঘাসালো তখন দু রকম মতেরই সমর্থনে স্মৃতিশাস্ত্রের নজিরের অভাব হল না। জজ-সাহেব একটু ফাঁপড়েই পড়ে গেলেন। কিন্তু তিনি ছাড়বার পাত্র ছিলেন না। এক-এক করে একান্ন জন স্মার্ত পণ্ডিতের মতামত সংগ্রহ করে আনালেন। তারপর নিজেই সে সব নিয়ে আলোচনা করে মনে মনে ব্যাপারটার একটা মীমাংসা করে ফেললেন।

১৮২৪ সালের ২৪শে মার্চ তারিখে জজ-সাহেব, সার ফ্রান্সিস ম্যাকনটন, তাঁর রায় দিলেন : জয়মণির দত্তক নেওয়ার বিষয়ে রাজবল্লভের সম্মতি-অনুমতি ছিল কি না-ছিল, সে-কথা এখানে—একেবারেই অবান্তর। আসল দেখবার বিষয় হচ্ছে, জয়মণিকে দত্তক নিতে তাঁর স্বামী অনুমতি দিয়ে গিয়েছিলেন কি না? দিয়ে যে গিয়েছিলেন, তার প্রমাণ বেশ স্পষ্ট করেই পাওয়া গেছে। এখন দেখতে হবে, ঐ দত্তক দান ও গ্রহণ হিন্দুশাস্ত্র-অনুযায়ী হয়েছে কি না। হয়েছে যে, সেটা নিঃসন্দেহেই প্রমাণ হয়েছে। সুতরাং জয়মণি যাঁকে দত্তক নিয়েছেন, তিনি সর্বতোভাবে রাজা মুকুন্দবল্লভের ঔরসজাত পুত্রের সামিল। অতএব বাদী গৌরবল্লভ রাজা রাজবল্লভের পৌত্র হিসাবেই তাঁর পিতামহের সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী। রাজা রাজবল্লভের যে সম্পত্তি এখন প্রতিবাদী মিত্রদের অধিকারে আছে, তার এ-যাবৎ আয়সুদ্ধ তাঁরা তা বাদী গৌরবল্লভকে ফিরিয়ে দেবেন—এই হল এই আদালতের হুকুম।

এর দু-বছর পর সুপ্রীম কোর্টের মাস্টার-সাহেব রাজবল্লভের সম্পত্তির আয়ের একটা হিসেব নিয়ে কোর্টের কাছে এক রিপোর্ট পেশ করলেন। তখন সার ফ্রান্সিস ম্যাকনটন আর জজ নেই, রিটায়ার করেছেন। সার এডওয়ার্ড গ্রে চিফ জস্টিস, মিস্টার জস্টিস বুলার আর মিস্টার জস্টিস ক্র্যাক্স—এই তিন জন জজ মিলে মাস্টার-সাহেবের রিপোর্ট অনুমোদন করে গৌরবল্লভকে ডিক্রি দিলেন। বেশ মোটা অঙ্কেরই টাকা মিত্তিরদের উগরে দিতে হল।

দত্তক নেওয়ার ফলে রাজা রাজবল্লভের বংশরক্ষা হয়েছিল বটে। হয়তো তাঁর পারলৌকিক সদ্‌গতিও হয়েছিল। তবে তাঁদের তিন পুরুষ ধরে ইতিহাসের পাতার উপর আঁচড় কাটাটা রাজা রাজবল্লভের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। তাঁর বংশের পরবর্তী আর-কেউ কোনো রকম একটুও প্রতিষ্ঠা অর্জন করে যেতে পারেন নি। গৌরবল্লভের এক ছেলে ছিল, রুক্মিণীবল্লভ। কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে আর কোনো খবর পাওয়া যায় না। রাজা রাজবল্লভের সেই বিশাল সম্পত্তিরও যে কি গতি হল, তা কে জানে? তবে উত্তর-কোলকাতার বাগবাজার অঞ্চলে তাঁর নামে একটা রাস্তা এখনো পড়ে আছে বটে।

বিদ্রোহী

(ম্যারী, ই, ইভান্স)

যখন মৃত্যু হবে
আমি নিশ্চিতভাবে জানি
সমারোহের সংগে আমার
অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হবে...
আর কৌতূহল সন্ধানীরা
দেখতে আসবে
আমি সত্যি মরেছি
নাকি আবার সকলকে
ঝামেলায় ফেলবার চেষ্টা করছি।

অনুবাদক: সজল বন্দ্যোপাধ্যায়

সুন্দর

সুধীর বেরা

জীবন ভ'রে চেয়েছি সুন্দরকে।
সুন্দরের সাধনাই জীবন।
বন্ধ মনের দুয়ারগুলি যেই খুলেছি—
জানালার ফাঁক দিয়ে দেখা দিল
দূর দিগন্তে দিনান্তের
হাতছানি
ধূসর আবছায়ার অস্পষ্টতায়
সুন্দরের অভিষেক।

রঙে রসে সুন্দর
সে চির নূতন,
সে চিরকালের।
নীল আকাশের বিস্তারের মধ্যে
কল্পনার অসীমত্বে—
সে সীমাহীন,
অবিনশ্বর।

ফুল সুন্দর, পাখি সুন্দর,
সুন্দর মৃত্তিকার ধরণী,
চোখের জলে হাসিকান্নায়
চির সুন্দর,
তাকে চিনেছি।
সে সুন্দর সবচেয়ে সুন্দর।
তার মাটির কণায়
বিশ্বের রূপ প্রতিফলিত।

দূরের সুন্দরকে
ঘরের ভিতর পাই,
নিজের সুন্দর বিশ্বের সুন্দরে
এক হয়ে যায়—
প্রাণে প্রাণে আনে তার স্পর্শ,
সুন্দরের বরাভয়।
সুন্দর তোমায় ভালবাসি
তোমার কাছেই
আমার চাওয়া-পাওয়ার নির্বাণ।

পিপাসা

শ্রীইলা বসু

যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি তুমি! নারী আমি!
পুরুষ ও শক্তির মিলিত মিলন লীলাভূমি।
মর্তের সুখের স্বর্গ এনে দিলে
আমাদের হাতে
ভাবিলে ধরিয়া লব পূর্ণপাত্র তব।
কত দীর্ঘকাল ধরি দেব-ঋষি-নর-নারী
কোন্ পিপাসার লাগি ঘুরিয়া মরিছে সবে
যেন নীড়হারা সঙ্গীহারা ব্যর্থ সে কপোতী।
যে অমৃত অমরতা তরে
ঘুরিয়া মরিছ তুমি অরণ্যে গুহায় আর—
নর মনোভূমে,
আমিও তাহারই লাগি জপিতেছি রাত্রিদিন
এক জপমালা।

হে যাজ্ঞবল্ক্য সন্ন্যাসী
সমগ্র নারীর আমি প্রতিনিধি
মৈত্রেয়ী তাপসী।

দ্বিতীয় বন্ধন

(সম্পূর্ণ উপন্যাস)

নমিতা চক্রবর্তী

'জীবন যখন শুকায়ে যায়, করুণাধারায় এসো।' পাশের বাড়ীতে রেডিয়োর গান। উঃ, কি অসহ্য! কত চিন্তা ক'রে, খরচ ক'রে প্রচুর টাকা পার্ক ষ্ট্রীটে বাড়ী—এখানেও শুনতে হ'চ্ছে 'করুণাধারায় এস।' এসো এসো ক'রে গলা তো ফাটানো হচ্ছে সেই সত্যযুগ হতে, করুণাধারা কি এসেছে কোনোদিন?

সামনের জানালাটা বন্ধ করে দিলেন সিদ্ধার্থ রায়। তবু শোনা যাচ্ছে। নরমগলার গুন্‌গুন্ গান এসে পৌঁছচ্ছে কানে। 'করুণাধারায় এসো'—ছোটবেলা, সাত-আট বছর বয়সে সিদ্ধার্থ শুনেছেন এ-গান। মা গাইত। গানের সুর-তাল বুঝবার বয়েস হয়নি তখন, কিন্তু কথাগুলো একেবারে বুকের মধ্যে ঢুকে বাসা বেঁধে বসে আছে। এখনো গানটা শুনলে মা এসে কাছে দাঁড়ায়, কাছে আসে অনেকদূরে ফেলে-আসা ছেলেবেলা। ছেলেবেলা, সেই ভয়ানক দুর্যোগের বেলা। মা'র সঙ্গে একটু গুড়, সাঙ্ঘাতিক একটা বাবা, মায়ের করুণ মুখ আর অগুণতি ভাই-বোন। ভাল ক'রে জ্ঞান হবার আগেই সিদ্ধার্থ তিনজনের দাদা। সাত বছর বয়স হতে দোকান, থলি হাতে বাজার, সস্তা জিনিষের খোঁজখবর। বয়েস বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে আরো অনেক ভাইবোনের দাদা হয়ে গেলেন তিনি। চোদ্দটি ভাইবোন হয়েছিল তাঁর। বাঁচেনি সবাই। কেউ আঁতুড়ে, একটু বড় হয়ে কেউ সংখ্যা কমিয়ে দিয়েছিল আশাতিরিক্তরূপে। এখন, এই পঞ্চাশ বছর বয়সে এক বোন আর একটি ভাই অবশিষ্ট আছে মোটে।

পৈতৃক একটা একতলা বাড়ী পেয়েছিল সিদ্ধার্থের বাবা। চাকরিও। শরবিন্দু রায় রিটায়ার করবার সময় বিদায়-সভা করেছিল অফিসের সবাই মিলে। তখন ইংরেজ আমল। বড় সাহেব সভাপতি। চোস্ত বাংলায় বক্তৃতা। দুইটি রসগোল্লা খেয়ে পিঠ চাপড়ে বুড়ো হেড ক্লার্কের প্রশংসা করলেন সাহেব। সত্তর বছর বয়সে কিন্তু বুড়ো হননি শরবিন্দু। হাঁটতে পারেন একদমে পাঁচ মাইল, গোটা রুইমাছের মাথা হজম, চোখের তেজ হার মানায় বাইশ বছরের ছোকরাকে অনায়াসে এক্সটেনশন পেতে পারতেন; কিন্তু আর ভাল লাগল না চাকরি করতে। পনেরো বছর বয়সে ঢুকেছেন অফিসে, আর কত। সুবিধেমত বড় সাহেবকে ধরলেন। ছেলে লায়েক হয়েছে, এবার তাকে ঢুকিয়ে নেওয়া হোক। সে পাশ দিয়েছে একটা, হাতের লেখা মুক্তার মতো। রাজী হলেন সাহেব। পরদিনই চাকরি পেল সিদ্ধার্থর বাবা দিবাবিন্দু। সেই ছাতা, পান, টিফিনের বাক্স, সাড়ে ন'টা সাড়ে ছ'টা—অবিকল শরবিন্দু রায়, কেবল বয়েসটা কম।

চাকরি ছেড়ে শরবিন্দু বেঁচেছিলেন আরো পনেরো বছর মাছ-দুধ খেয়ে, দুপুরের ঘুম, বিকেলের বেড়ানো সেরে পঁচাশি বছরের হলেন দিবাবিন্দুর বাবা। তারপর একদিন দুম ক'রে মরে গেলেন কাউকে না ভুগিয়ে। স্ত্রী গত হয়েছিল অনেক আগে। একটি টাক-পড়া সিঁথিকে সাদা করবার সুযোগ পেলেন না শরবিন্দু; বাড়ীতে কান্নাকাটি হ'ল না বিশেষ। বাপের সিন্দুক মার্কা বাক্সটার উপর অনেক ভরসা ছিল দিবাবিন্দুর। কিন্তু তালা খুলতে বের হ'ল বঙ্কিম চাটুজ্যের হলদে হয়ে যাওয়া পদ্যের বই 'ললিতা ও মানস' আর মায়ের বিয়ের আট হাতি চেলীখানা। বাক্সের দেউলে অবস্থা দেখে, বাপকে জোচ্চোর বলে কষে কয়েকটা গাল লাগাল দিবাবিন্দু। শ্রাদ্ধ সারল নমো নমো ক'রে। মিনমিন ক'রে একটু আপত্তি জানাতে গিয়ে স্ত্রী কড়া ধমক খেল।

টাকা না রেখে গিয়ে ভালই করেছিলেন শরবিন্দু। দিবাবিন্দু ভয়ানক মদ খেত। মাইনে, স্ত্রীর গয়না, দামী সেকেলে বাসন—সব উড়ে যেত দিবাবিন্দুর মদের জন্য। মদ খেত, কিন্তু খারাপ মেয়েদের প্রতি দৃষ্টি ছিল না দিবাবিন্দুর। ছি, ছি, চরিত্র খারাপ হয় ওতে। সুতরাং স্বামীকে চরিত্রবান রাখবার জন্য চোদ্দবার গর্ভধারণ করে একেবারে শীর্ণ হয়ে গিয়েছিল সিদ্ধার্থের মা নয়নতারা।

নয়নতারা। কে যেন সেই পাতলা শ্যামবর্ণা মেয়েটির নাম রেখেছিল নয়নতারা। রোগা শরীরের মস্ত দুটি উজ্জ্বল চোখের মতো দিবাবিন্দুর রুগ্ন ক্ষয়ে যাওয়া সংসারে জেগে থাকত নয়নতারা।

মা'কে ভাবলেই মনে পড়ে, তার আঁচল ধরে পায়ে পায়ে বেড়াচ্ছে একদল রুগ্ন ক্ষুধার্ত শিশু। আর এক রাতের কথা কখনো ভুলবেন না সিদ্ধার্থ। গভীর রাতে ঘুম ভেঙে সিদ্ধার্থ দেখেছিলেন—বাবা মারছে মাকে। গালে, পিঠে, মাথায় মারছে চড়, কিল, ঘুষি—

বাবার উপর সেদিন ঘৃণায় মন ভরে গিয়েছিল। পরদিন সকালে উঠে সিদ্ধার্থ দেখেছিলেন

Nautron

নিউট্রনের

আকর্ষনীয় মডেল

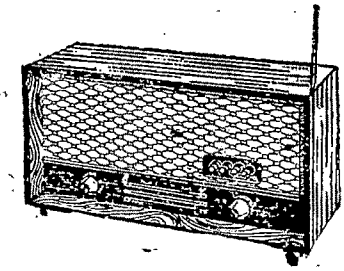

"মিলানো"—টি-এন-টি ৮৫৪, ৯ ট্রানজিসটর ও ডায়ডস, ৩ ব্যাণ্ড, ৪ পুশ বাটন। মূল্য ৩০৮৲।

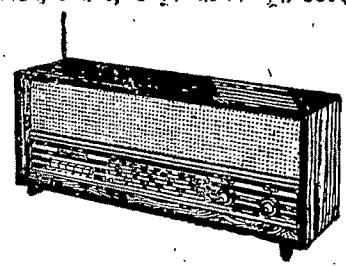

"এপোলো"—টি-এন-টি—৮৫৩, ৯ ট্রানজিস্টর ও ডায়ডস, ৩ ব্যাণ্ড, ৫ পুশবাটন। মূল্য ৩৫০৲।

"ভেনাস"—৫৫৭ এন এ/এন ইউ
এ সি ও এসি/ডিসি
৫ ভালব, ৩ ব্যাণ্ড, মূল্য ৩১৫৲।

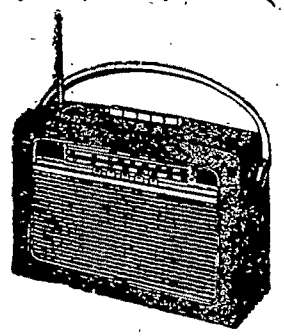

"জিপসী"—পোর্টেবল টি-এন-পি ৮৫৬
৯ ট্রানজিসটর ও ডায়ডস, ৫ পুশ বাটন, ৩ ব্যাণ্ড
মূল্য—৩২৮৲।

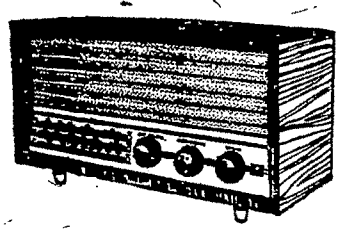

"নেপচুন"—টি, এন, আই ৮৩৯
৯ ট্রানজিষ্টর ও ডায়ডস, ৩ ব্যাণ্ড, মূল্য ৩১০৲ টাকা।
"সুপার জনতা"—এসি/ডিসি ৪৫৬ এন ইউ
৫ ভালব, ৩ ব্যাণ্ড, মূল্য ১৬৫৲।
"জুপিটার"—টি, এন, ই—৬২৯
৯ ট্রানজিষ্টার ও ডায়ডস, ২ ব্যাণ্ড। মূল্য ১৬৫৲।

বিশদ বিবরণের জন্য লিখুন।
পরিবেশক:

নান এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ

৯এ, ডালহৌসী স্কোয়ার ইষ্ট, কলিকাতা-১

মায়ের ভালসিটে পড়া মুখ। নানা ছুতোয় কেঁদেছিলেন সমস্ত দিন আর বাবার হাতে নির্দয় মার। মার খেয়ে বাবাকে ভালবাসবার দায় হতে চিরদিনের জন্য বেঁচে গিয়েছিলেন তিনি। বয়েস বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ল ঘৃণা। নিবিড় ঘৃণা অত্যাচারী বাপকে, তীব্র ঘৃণা নিজেকে রক্ষা করবার চেষ্টাহীনা মাকে। কি দুঃসহ দারিদ্র্য। মায়ের শরীরে রক্ত নেই। খাদ্য নেই, বস্ত্র নেই—বার বছরের বোন প'রে আছে ভাইদের প্যাণ্ট গেঞ্জি। আবার আসছে নতুন শিশু। যন্ত্রণায় পাগল হয়ে উঠেছিলেন সিদ্ধার্থ। কতদিন ভেবেছেন রাতের আঁধারে ঢিল ছুঁড়ে বাবার মাথা ফাটাবেন, শ্বাসরুদ্ধ করে দেবেন মায়ের গলা টিপে ধরে। কিন্তু মা-ই বাঁচিয়ে রাখতেন তাঁকে। হাতের কাজ সারতে সারতে নয়নতারা গুন্‌গুন্ করতেন—'করুণাধারায় এসো'। আশ্চর্য ঠাণ্ডা নরম একটা অদেখা কিসের স্রোত ছড়িয়ে পড়ত সিদ্ধার্থের গায়ে, ঢুকে যেত বুকের মধ্যে, জুড়িয়ে আসত সব জ্বালা। চেয়ে দেখতেন কিসের একটা আলো ঘিরে আছে মাকে। বাবার অত্যাচার আছড়ে এসে পড়ছে, কিন্তু অতিক্রম করতে পারছে না আলোর ব্যবধানটি।

বড় পড়াশুনো ভালবাসতেন নয়নতারা। দুপুরবেলা বাচ্চাদের মেঝের সিমেণ্ট মুছে শুইয়ে দিতেন, তারপর কোথা হতে টেনে বের করতেন ছেঁড়া ময়লা বই। সিদ্ধার্থকে বুকের কাছে টেনে নিতেন মা, মাথার চুলে বিলি কেটে কেটে বলতেন বোপদেব, আরুণি, বিদ্যাসাগর—সবার গল্প। রাতের বেলা ঘরের ঢালা বিছানায় অনেক ভাইবোনের প্রথম হ'য়ে শুয়ে মায়ের কাছ হতে দূরে থাকতেন সিদ্ধার্থ। কিন্তু নিরালা দুপুরে কোলের মধ্যে, একেবারে বুকে তুলে নিতেন মা।

তাঁর নামও মায়ের দেওয়া। দিবাবিন্দু নাম রেখেছিল নিশাবিন্দু। নয়নতারা বললেন—ও নামের মানে নেই কোন। নামের আবার মানে? হুঁঃ, যত সব। যাক্‌গে, রাখুকগে যা ইচ্ছা নাম। গুয়োরের পাল বিইয়েছে, একটা ক'রে নাম তো দিতে হবে ডাকবার জন্য। ও নিয়ে আর মাথা ঘামাল না দিবাবিন্দু।

সিদ্ধার্থ কিন্তু সেই অল্প বয়সেই বুঝেছিলেন মায়ের আশা। বিদ্বান হবে, বিদ্যাসাগরের মতো বিদ্বান হবে নয়নতারার ছেলে। কি কষ্টের পাঠ্যজীবন। তিনটা টিউশনি, খবরের কাগজ বিক্রি। মা মরে গেলেন আই-এসসি পরীক্ষার খবর বের হবার দু'দিন আগে। সেকেণ্ড হয়ে পাশ করবার খবর জানাতে পারলেন না মাকে সিদ্ধার্থ। সন্তান প্রসব করতে গিয়ে মারা গেলেন নয়নতারা। আর শক্তি ছিল না তাঁর। সিদ্ধার্থ জানতেন মা মরে যাবেন। গতবার হাসপাতালে ভুল কাণ্ড হয়েছিল। ভীষণ রাগ ক'রে দিবাবিন্দুকে গাল দিয়েছিল ডাক্তার। সেও সহ্য করবার মানুষ নয়। নার্স, ডাক্তার সব জড়ো হল। হাতাহাতি বাধে আর কি। বণ্ড সই ক'রে ভালভাবে জ্ঞান ফিরবার আগেই নয়নতারাকে বাড়ী নিয়ে এল দিবাবিন্দু। এগারো মাসের মাথায় আবার বাচ্চা। এবার আর হাসপাতাল নয়, কর্পোরেশনের দাই। ঝরে গেল নয়নতারার প্রায় বোঁটা-খসা জীবন। আলতা, সিঁদুর, লালপাড় শাড়ি, দেবদারু দিয়ে বানানো ঠাসা ফুলের তোড়া—সব এল বিধিমত। চোখ বুজে সাদা মোমবাতির মতো শুয়ে রইল নয়নতারা। মুখাগ্নি ক'রে একটা শান্তির নিশ্বাস ফেললেন সিদ্ধার্থ। আর গভভারখিন্না মা'কে দেখে ঘৃণা করতে হবে না, মনের আকাশ জুড়ে চিরদিন তারা হয়ে ফুটে থাকবেন নয়নতারা মা।

বেশীদিন অপেক্ষা করা পোষালো না দিবাবিন্দুর। সাড়ে আটটায় রান্না, টিফিনের বাক্স ভ'রে লুচি-হালুয়া। রাত্তিরে ঝাল করে মেটে চচ্চড়ি, আবার এক ঘণ্টা ধরে পা-টেপা। স্ত্রী বাদে কারোর সাধ্য নেই এত ঝামেলা পোহাবে। কোথা হতে যোগাড় হ'ল হাড় শক্ত, অনেক মাংস বাইশ-তেইশ বছরের এক অরক্ষণীয়া সরলাবালা। কয়েকটা মঠ পড়ে তুকে স্ত্রী বানিয়ে ফেলল দিবাবিন্দু; ঘরকন্নার চক্কা চলল সোজা হয়ে। বেশী বুদ্ধি নেই সরলাবালার। সে জানে রূপ-গুণ নেই তার। অসম্ভব খাটুনি আর বকুনি খেয়ে কেটেছে মামার বাড়ীর জীবন। এখানে মামার বয়সী এক মিনসে সোয়ামী। কাজের ত্রুটি হ'লে লড়-চাপড়টা দেয়, আবার আদর-সোহাগও আছে। কিনে আনে শ্রীরামপুরী তাঁতের শাড়ি। লেস-লাগানো সায়া। সুতরাং ভালই আছে সরলা। সকালে উঠে কালী-দুর্গা স্মরণ করতে করতে সে টিপে টিপে মারে ছারপোকা তোষক-বালিশ উল্টে। তারপর এক খাবলা জল মুখে ছিটিয়ে ঘুঁটে-কয়লা ঢালে উনুনের গর্তে। দৌড়ে দৌড়ে বিছানা তোলে, ঘর ঝাঁট দেয়। সতীনের ছেলে-মেয়েকে দেয় বাসি রুটির জলখাবার। বড় ছেলেকেও যত্ন করতে ইচ্ছা হয় সরলার। ভাবে মাছের ডিম, দুধের সরটুকু দিয়ে আস্তি জানাবে। কিন্তু ভয় পায়। যে নোলা সোয়ামীর, টের পেলে খতম করে দেবে মাথা ফাটিয়ে।

দিবাবিন্দু লাগল সিদ্ধার্থর পিছনে। ঢের হয়েছে ল্যাখা-পড়া। এবার চোকি চাকরিতে। বিয়েও দেব এখন ডাগর দেখে একটা মেয়ে এনে। চাকরি? বাপের দিকে চাইলও না সিদ্ধার্থ। দিবাবিন্দু উনিশ বছরের ছেলের সঙ্গে পেরে উঠল না। বাড়ীতে থাকে এই মাত্র, খাইখরচা গুণে গুণে দেয় মাসে তিরিশ টাকা, বেশী বললে হয়তো যাবে বাড়ী ছেড়ে; তিরিশটা টাকা নষ্ট। ছেলের সঙ্গে না পেরে দিবাবিন্দুর রাগ চড়ে গেল। সরলাবালা লাথি খেল কয়েকটা। বাঁজা মেয়ের ভাগদ বেশী শরীরে, লাথি খেয়েও দিব্যি হেঁটে চলে বেড়াতে লাগল সরলা।

দিবাবিন্দুর পায়ে লাগল গরম হলুদ-চুনের পলেস্তারা।

গজরাতে গজরাতে দিবাবিন্দু মেয়ে বিভাবতীর বিয়ে দিল মুস্কো ভুঁড়িওলা একটা মানুষের সঙ্গে, আর অনিরুদ্ধকে ঢুকিয়ে দিল নিজের অফিসে। ততদিনে সিদ্ধার্থ ভাল ক'রে এম-এসসি পাশ করে ফেললেন আর-চেষ্টা করে যোগাড় হ'ল একটা স্কলারশিপ। কোনমতে বাপের পায়ে একটা আঙুল ঠেকিয়ে চলে গেলেন ইংলণ্ডে।

থালার ভাতে, বাটির ঝোলে মাখামাখি সরলার শাড়ি। পোষা কুকুরটা লাঠি খেয়ে কেঁউ কেঁউ করতে লাগল, মুদি ভয় পেল তাগাদায় এসে। অবশেষে একটা স্ট্যাম্প কাগজে সিদ্ধার্থকে ত্যজ্যপুত্র করে একটু রাগ কমল দিবাবিন্দুর। অনিরুদ্ধকে কাছে ডেকে জানতে চাইল তার জুতো আছে কিনা, বিভার বাড়ীতে পাঠিয়ে দিল এক বাক্স সন্দেশ।

বাংলা দেশের কলকাতায় যখন এত কাণ্ড হচ্ছে তখন লণ্ডনের একটা গ্যাস ছাড়া খুপরি ঘরে বসে একমনে পড়ছেন; নোট লিখছেন সিদ্ধার্থ। কেমিস্ট্রি, রসায়ন তাঁর পাঠ্য বিষয়।

কত দুঃখ, কত যন্ত্রণা জীবনে। আবার কত সুখ, কত আশা। মানুষ দুঃখকে জয় করে চিরসুখী হতে চাইল। তপস্যা করতে লাগল দুই দল হয়ে মানুষ দুঃখ জয়ের মন্ত্র আবিষ্কার করবার জন্য। জ্ঞানীরা বলল,—জন্মটাই দুঃখের কারণ, বাসনা বেঁধে রাখে মানুষকে যন্ত্রণার সঙ্গে। পৃথিবী একটা মায়া, বিভ্রম। মায়াকে জয় করলে পৃথিবী উড়ে যাবে তার জন্ম-মৃত্যু, সুখ-দুঃখ নিয়ে।

এমন পৃথিবী আর থাকবে না? বাসনা-কামনার বিচিত্র বর্ণে জীবনের শোভা বদলাবে না ক্ষণে ক্ষণে? কেউ চাইল না এমন দুঃখ-মুক্তি। জীবনে শোক-দুঃখ, জরা-মৃত্যু আছে। আবার আছে তো আনন্দের সহস্রধারা, যৌবনের বর্ণালী, সৃষ্টির বিস্ময়। বিজ্ঞানী তাই বেঁচে থাকবার উপায় খুঁজতে লাগল। মাটি, পাথর, অগণিত প্রাণীর মধ্যে যে রস লুকিয়ে আছে তাদের বের করে নেবে, এক করে মিশিয়ে প্রস্তুত করবে অমৃতরস। জীবনদায়িনী শক্তি উদ্ভূত হবে জীবন হতে। ভারতবর্ষেও একদল লেগেছিল এই রসের সন্ধানে। অমৃতে অমর হবে মর্তজন; মৃত্যু, রোগ-জরাকে স্তব্ধ করবে অঙ্গুলী হেলনে; মানুষকে তারা অমর করতে পারেনি। জরা-মৃত্যু হতে মুক্তি ঘটেনি জীবনের, কিন্তু তাদের তপস্যা যে ব্যর্থ হয়নি, তার পরিচয় অজন্তা ওহার চিত্রময়ীদের অনন্ত যৌবনে। সেই রসস্পর্শে কত তামার মূর্তি, দিল্লীর লোহার স্তম্ভ আজো অম্লান।

এই রসচর্চা হ'ত গ্রীসে। লিউকিপ্পাস হতে অ্যারিস্টোটল এই নিয়ে কত আলোচনা করলেন। তারপর রসায়নবিদ্যা প্রবেশ করল মিশরে, কালো মাটির দেশ কিমিয়াতে। কালো মাটিকে নিষেধিত ক'রে তার নির্যাস বের করবার কৌশল আবিষ্কার করল মিশরবাসী। লোহা, কাঁচ, নানা বলকারক পানীয় বা মাল তারা পৃথিবীর নানা দিক হতে অনুসন্ধানীর দল ভিড় জমাল মিশরে। কিমিয়া-বিদ্যা শিখবে তারা। মিশরের সংস্কৃতি কেন্দ্র আলেকজান্দ্রিয়া। আরব আক্রমণে আলেকজান্দ্রিয়ার প্রাণস্পন্দন রুদ্ধ হয়ে গেল। আরবরা আগুন দিয়ে লাইব্রেরীর তিন লক্ষ বই পুড়িয়ে ছাই করে দিল। লাইব্রেরী নষ্ট করল বটে, কিন্তু আরবরা শিখে নিল মিশরের রসায়নবিদ্যা। বাগদাদে প্রবেশ করে কিমিয়া নাম ধরল অ্যালকেমি। তামা, পারদকে সোনা করবার জন্য, মৃত্যু জয় করে অমর হবার পথ দেখিয়ে দিতে পণ্ডিত জবির ইবন হাইয়ান এবং আররাজী ওইবন সিনার রাশি রাশি বই লিখলেন।

রসায়নের এই পুরানো ইতিহাস প্রথম যৌবনে সতেরো বছর বয়সে কেমিস্ট্রি ক্লাসে প্রফেসর মৈত্রর কাছে শুনেছিলেন সিদ্ধার্থ। বুড়ো, পাকা চুল, ডবল চশমা চোখে মাস্টারটা বড় বেশী বকবক করে। অনেকে পালিয়ে যেত ক্লাস ছেড়ে। সিদ্ধার্থ আর তারই মতো কয়েকটা ছেলে মুগ্ধ হয়ে বসে বসে শুনত।

সেই মুগ্ধতার দিন কবে কেটে গিয়েছে। ইউরেনিয়াম, থোরিয়ামকে যখন হাইড্রোজেন আর হিলিয়াম দিয়ে পৃথিবীতে অগ্নিকুণ্ড জ্বালানো হয়েছে, তখন বুড়ো মাস্টার মশাই নিশ্চয় বেশী বাজে কথা বলবার জন্য ধমক খেতেন সিদ্ধার্থের কাছে।

'করুণাধারায় এসো'—বারবার আজ মনে পড়ছে মাকে।

দেশ সেবায় নিয়োজিত,

অ্যালবার্ট ডেভিড লিমিটেড

কলিকাতা—৫০

নীতি ও বিজ্ঞানানুযায়ী ঔষধ প্রস্তুতকরণের অগ্রণী

— ব্রাঞ্চ সমূহ —

বোম্বে - মাদ্রাজ - দিল্লী - নাগপুর

বেজওয়াডা - শ্রীনগর - গৌহাটী

মুক্তি আসন্ন

শ্রীবিষ্ণু পিক্‌চার্স প্রাঃ লিঃ
নিবেদন

ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্তর

তাপসী

বঙ্গ-সফল নাটকের

চিত্ররূপায়ণ

পরিচালনা
অগ্রদূত

সঙ্গীত
গোপেন মল্লিক

রূপায়ণে
সন্ধ্যারাণী
সন্ধ্যারায়
অনুপকুমার
কমলে মিত্র
পাহাড়ী সান্যাল
দিলীপরায়
জ্যোৎস্না বিশ্বাস
বনানী চৌধুরী
সরযুবালা
রেণুকা রায়
মিউলী মজুমদার
ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়

পরিবেশনা: শ্রীবিষ্ণু পিক্‌চার্স প্রাঃ লিঃ

কেন, কেন এমন হ'ল? গানটা শেষ হয়ে গিয়েছে। শরীরটা একটু খারাপ, তাই চলতে হচ্ছে ডাক্তারের নির্দেশ শুনে। না, মরতে চান না সিদ্ধার্থ। অনেক সংগ্রাম ক'রে আজ জয়ী। থরে থরে সাজিয়েছেন ভোগের উপচার। পঞ্চাশ বছর বয়সেও অটুট স্বাস্থ্য। শক্ত দাঁত, চোখের তেজ প্রখর, চুলে নেই সাদার ছাপ। যৌগিক আসন, চর্বিহীন খাদ্য। আরামের তাকিয়ায় বসেছেন ঠেসান দিয়ে, সাকীরা আনছে আঙুর-চোয়ানো মাধবিকা। এখন মরণ কি? শরীরটা গোলমাল করবার ইসারা দিতেই সামলেছেন নিজেকে। পরিমিত পান, সংযত নৈশবিহার।

চেয়ারে হেলান দিলেন সিদ্ধার্থ রায়। মায়ের সঙ্গে সঙ্গে আজ মনে পড়ছে শীলাকেও। শীলা পাল ইংলণ্ডে গিয়েছিল নার্সিং-এর শেষ পরীক্ষা দিতে। দুর্দান্ত মেয়ে। রূপের চেয়ে গ্ল্যামার তার বেশী। নাচতে পারে নিগ্রো হ'তে আমেরিকানের সঙ্গে রাত ভরে, ককটেল পার্টিতে হাত বাড়ায় শেষ রাউণ্ড পর্যন্ত। সিদ্ধার্থর ভাল লাগল শীলাকে। মনে হ'ল যোগ্য জীবন-সঙ্গিনী। শান্ত, চোখ-নামানো মেয়ে দেখলেই মাথায় রক্ত উঠে যেত তখন। শীলার সঙ্গে বন্ধুত্ব, প্রেম—হ্যাঁ, তখন প্রেম বলেই মনে হয়েছিল ব্যাপারটা।

ভাল চাকরি রিসার্চ ল্যাবরেটরীতে; ভারী হাতে গুণতে হচ্ছে ইন্‌কাম ট্যাক্স। নানা সুবিধার কথা চিন্তা করে বিয়ের প্রস্তাব করলেন সিদ্ধার্থ। বিয়ে, সম্পর্কটাকে লিগালাইজ ক'রে নেওয়া আর কি। সোফার উপর একটা পা তুলে শুয়েছিল শীলা। লাফিয়ে উঠে একপাক নেচে, সিদ্ধার্থকে কয়েকটা সশব্দ চুম্বন দিয়ে ফেলল।

বিবাহিত জীবন। দাম্পত্য জীবন কিন্তু অসহ্য হয়ে উঠল দুজনেরই। ভাল চাকরি, স্ত্রী। সিদ্ধার্থর ইচ্ছা হ'ল একটি সন্তানের। বাচ্চা! হেল! নাক কুঁচকাল শীলা। মতান্তর পৌঁছাল মনান্তরে। দেড় বছরের মধ্যে ডাইভোর্স স্যুট আনল শীলা। অসংখ্য দোষ সিদ্ধার্থর। শব্দ করে খায়, নাক ডাকে। গায়ে অসম্ভব হেয়ার, আঙুলি ইন্ সুপ, মনস্টার ইন্ বেড। চোখের জলে শীলা আবেদন জানাল অব্যাহতি পাবার জন্য। একটি অসহায় তরুণীর দুঃখে বিগলিত হলেন ইংরেজ বিচারক। ডাইভোর্স মঞ্জুর হ'ল। নিশ্বাস ফেলে বাঁচল দুজনেই। শীলা আমেরিকা চলে গেল এক আমেরিকানের কাঁধে চেপে আর বেশ ভারী পকেট নিয়ে সিদ্ধার্থ ফিরে এলেন দেশে।

দেশে—তাও আজ অনেক বছর হয়ে গিয়েছে। বিলেতি ডিগ্রীর জোরে মিলতে পারত ভাল চাকরি, কিন্তু চাকরিতে প্রবৃত্তি হয়নি। শেয়ার কিনে ডিরেক্টর হলেন সুশ্রুত কেমিকেলের। আজ মস্ত বড় হয়েছে কোম্পানী। সিদ্ধার্থ ম্যানেজিং ডিরেক্টর। ফিনাইল, ব্লিচিং পাউডার, টিংকচার বেনজিন। বেবী ফুড, কিছু পেটেণ্ট ওষুধও বের হয়েছে নিজেদের ল্যাবরেটরী হতে। প্রচুর লাভ। মস্ত বড় এয়ার-কণ্ডিশনড্ বাড়ী, তিনখানা গাড়ী। ধনী সিদ্ধার্থ রায় বিয়ে করতে পারতেন, আজো পারেন সমাজের সেরা মেয়ে, কিন্তু প্রবৃত্তি নেই। দিবাবিন্দুর দরকার ছিল বিবাহিতা স্ত্রীর। স্ত্রীতে মন লাগে না সিদ্ধার্থর। প্রতি রাত্রে এক নারী, অফুলি টেল্টলেস্। যার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী নেই রক্তচক্ষু নিয়ে, যে অবাধ, অকলঙ্ক, তা-ক দেখে কোন্ পুরুষের রক্ত হবে উদ্দাম? সুন্দরী, বাক্‌পটিয়সী, নির্লজ্জার অভাব নেই পৃথিবীতে। দরাজ হাতে ব্যাঙ্কের চেক—হোটেলের ঘর হবে কুঞ্জবন, ইন্দ্রকে ফেলে উর্বশী ছুটে এসে হবে অঙ্কশায়িনী। নতুন প্রবচন সৃষ্টি করেছেন সিদ্ধার্থ—ধন-লভ্যা বরাঙ্গনা।

কিন্তু নয়নতারা, শৈশব-স্বপ্ন ভাঙেনি যার, কি আশা রেখেছিল সেই অবোধ কিশোরী তার সন্তানের উপর? আশা করবার মত শক্তি কি ছিল তার? নাঃ, রেডিয়োর গানটা ছেলেবেলাকে নাড়া দিয়ে, মনটাকে একেবারে ড্যাম্প করে দিয়েছে।

'অনন্ত!' দরজায় বসা চাকরকে ডাকলেন সিদ্ধার্থ।

'হুজুর।' অনন্ত এসে ঘরে ঢুকল।

'হুইস্কি'—পানীয় দেবার আদেশ।

'সোডা নেই হুজুর।'

'নেই? ঠিক আছে, অমনি দে।' চেয়ারে পিঠ ছেড়ে দিলেন সিদ্ধার্থ। ঘড়িতে এগারোটা।

'কি, যাচ্ছিস না যে?' দরজার কাছে দাঁড়ানো কাঁচুমাচু মুখ অনন্তর দিকে চাইলেন সিদ্ধার্থ। পুরানো চাকর, দশ বছরের সঙ্গী। অনেকটা স্বাধীনতা পায়, এত রাতে মদ দেবার ইচ্ছা নেই বোধ হয়।

'যা, নিয়ে আয়।'

'কুসেটের চাবি দিদিমণি নিয়ে গিয়েছে হুজুর।

'চাবি নিয়ে গিয়েছে?' সোজা হ'য়ে বসলেন সিদ্ধার্থ। শয়নঘর সংলগ্ন ছোট কামরাটির চাবি থাকে এই টেবিলের উপর, আজ দেবযানী নিয়ে গিয়েছে।

দেবযানী? কেউ না, কিছু না। বছর কয়েক হ'ল বিধবা হয়েছে নিঃসন্তান বোন। সিদ্ধার্থ বিভাকে নিজের কাছে এনে রেখেছেন। তার সঙ্গে আছে অনাথা ভাসুরঝি। বিভা রুগ্না, সুতরাং এক বছর ধরে গৃহিণীহীন সংসারে ঠাকুর-চাকরের একাধিপত্য সংযত করছে দেবযানী। দেবযানী শান্ত, প্রায় চোখে না পড়ার মতো একফালি মেয়ে। একটু গ্রাম্য। তা সিদ্ধার্থকে যত্ন-টত্ন করে মন্দ না। পলতার ঝোল, শুক্তো, ঠাণ্ডা ঘোল তার জন্যই সিদ্ধার্থ পেয়ে থাকেন খাবার টেবিলে। ধোবার ব্যাপার-ট্যাপারও দেবযানীই দেখে বোধ হয়। একবার

বয়সটাই সব নয়···অতীত ঐতিহ্যের মূল্য নিঃসন্দেহে অসামান্য, তবু শুধুমাত্র তাই সম্বল করে কোন প্রকারে দিনপাত করতে আমরা চাই নি। বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগে যে সব প্রতিষ্ঠান শিল্পায়নের দ্বারা দেশকে আত্মনির্ভর করার পুণ্য ব্রত নিয়ে পদক্ষেপ করেছিল সেই পথিকৃৎদের মধ্যে মার্টিন বার্ন সংস্থা অন্যতম। সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিচক্ষণতা এবং ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সর্বজনগ্রাহ্য সূত্রগুলি যথাযথভাবে অনুসরণ করাই আমাদের সিদ্ধিলাভের মূল-মন্ত্র। আমরা কখনও স্থিতাবস্থার সঙ্গে আপোস করি নি, কিংবা উৎপাদনের পরিমাণ না বৃদ্ধি করে পণ্য-দ্রব্যের চাহিদা স্বতঃই প্রসার লাভ করবে এমন আশাও পোষণ করি নি। আমাদের বিশ্বাস বর্তমানে যে সমৃদ্ধি এবং সুসম অখণ্ডতা আমরা লাভ করেছি তা সম্ভব হয়েছে এই সব কারণেই। যতটুকু সুনাম আমরা অর্জন করতে পেরেছি সর্বপ্রযত্নে তা রক্ষা করতে আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

বয়সটাই সব নয়...

মার্টিন বার্ন গোষ্ঠীর অন্তর্গত শিল্প-প্রতিষ্ঠান ঃ

দি ইণ্ডিয়ান আয়রন অ্যাণ্ড স্টীল কোম্পানি লিমিটেড ঃ বাৎসরিক দশ লক্ষ টন ইস্পাত তৈরী হয় এঁদের বার্নপুর কারখানায়। বার্নপুর বর্তমানে উৎপাদন শক্তি আবার দ্বিগুণ করার দ্বিপর্যুক্ত এক নতুন পরিকল্পনায় ব্যস্ত কুলটিতে এঁদের ঢালাই কারখানাটি কমনওয়েলথের মধ্যে সর্ববৃহৎ। এই কারখানার উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধি ও নতুন কর্মপদ্ধতি প্রয়োগে এঁরা সর্বদাই সচেষ্ট।

দি ইস্কো স্ট্যানটন পাইপ অ্যাণ্ড হাউজিং নামে সম্প্রতি এই কোম্পানির অন্তর্গত একটি নতুন প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধন করা হয়েছে—এঁদের কারখানাটি হল উজ্জয়িনীতে। অতি আধুনিক পদ্ধতিতে স্পান পাইপ ও অন্যান্য আনুসঙ্গিক জিনিস এখানে তৈরী হবে।

বার্ন অ্যাণ্ড কোম্পানি লিঃ—হাওড়া ঃ গোড়াপত্তন ১৭৮১ সালে। ভারতের প্রথম ঢালাই কারখানা—মালগাড়ি প্রভৃতি নানাবিধ রেলওয়ে সামগ্রী এবং ইস্পাতের বড় বড় কাঠামো ইত্যাদি প্রস্তুতকারক।

বার্ন অ্যাণ্ড কোম্পানি লিঃ রিফ্র্যাক্টারি গোষ্ঠী ঃ চারটি রাজ্যে অবস্থিত আটটি কারখানা—যাবতীয় রিফ্র্যাক্টারি সামগ্রী প্রস্তুতকারক। ইস্পাত কারখানা, বিজলী উৎপাদন কেন্দ্র, রেলওয়ে—এক কথায়, যেখানেই ফার্নেস ব্যবহার করা হয় সেখানেই বার্ন কোম্পানির রিফ্যাক্টারির প্রয়োজন।

দি ইণ্ডিয়ান স্ট্যাণ্ডার্ড ওয়াগন কোম্পানি লিঃ, ভাস্তারা ঃ একান্তভাবে মালগাড়ি নির্মাণে অগ্রণী প্রতিষ্ঠান। বস্তুত এদেশে মালগাড়ি নির্মাণ শিল্পের প্রধান উদ্যোক্তা বলা চলে। বর্তমানে এখানে ভারী শিল্প ও মোটর গাড়ির জন্য প্রিং, ফোর্জিং, স্ট্যাম্পিং প্রভৃতিও প্রস্তুত হয়।

দি হুগলি ডকিং অ্যাণ্ড এঞ্জিনীয়ারিং কোম্পানি লিঃ ঃ ১৮১৭ সালে প্রতিষ্ঠিত। শিপ বিল্ডিং ইয়ার্ড, ড্রাই ডক ইত্যাদি সর্ববিধ ব্যবস্থাসম্পন্ন জাহাজ তৈরি ও মেরামতের কারখানা।

রবার্ট হাডসন (ইণ্ডিয়া) লিঃ ঃ ছোট রেলের নানাবিধ সামগ্রী প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানগুলির অগ্রণী। বিবিধ খনিজ শিল্পের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত।

লাইট রেলওয়ে কোম্পানি ঃ ভারতের প্রথম ছোট রেল প্রতিষ্ঠানগুলির অন্যতম—চারটি রাজ্যে ছ'টি রেলওয়ে প্রতিষ্ঠান।

ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোং ঃ বিজলী উৎপাদন ও সরবরাহের কয়েকটি অগ্রণী প্রতিষ্ঠান। উত্তর ও মধ্যপ্রদেশের বিস্তৃত অঞ্চলে বিজলী উৎপাদন ও সরবরাহ করে।

দি ভন বার্ন ক্রেন কোম্পানি লিঃ— ম্যাঞ্চেস্টারের ভন্ ক্রেন কোম্পানির সহযোগিতায় হস্তচালিত ও বিদ্যুৎচালিত ওভারহেড ট্রাভলিং ক্রেন প্রস্তুতকারক। চেনপুলি ব্লকও প্রস্তুত করে।

রেরোল বার্ন লিমিটেড ঃ ইংলণ্ডের এ. রেরোল অ্যাণ্ড কোম্পানি লিমিটেড-এর সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত এই কারখানায় বিশেষধরনের ইলেক্‌ট্রিক সুইচগীয়ার তৈরী হবে।

মার্টিন বার্ন লিমিটেড

কলিকাতা নয়াদিল্লী বোম্বাই কানপুর পাটনা

mb

শুনেছিলেন সিদ্ধার্থ, কি যেন হারাবার জন্যও বকছে বোবাকে। কিন্তু ওর যত করবার ইচ্ছাটা যে এত দূরে পৌঁছেচে, একেবারে কুনেটের চাবি নিয়ে যাওয়া—, একটু আশ্চর্য হলেন সিদ্ধার্থ। এতটাই সাহস! ব্যাপার কি।

ব্যাপার আস্তে আস্তে বিবৃত করল অনন্ত। ডাক্তার বোস বলেছেন হুজুরের প্রেসারের ভাব ভাল নয়, লিভারেও যেন একটু গোলমাল। খুব সাবধানে না থাকলে স্বাস্থ্য ভেঙে পড়বে। আরক-টারক আর না খেলেই ভাল। দিদিমণি তাই—

'হুঁ। কিন্তু তোর দিদিমণি এসব খবর জানল কেমন করে? তুই বলেছিস, ষড়যন্ত্র করছিস?'

সবনাশ। জিভ কাটল অনন্ত। গরু নয়, শূয়োর নয়; জলীয় দ্রব্য, তাই বন্ধ করবার জন্য ষড়যন্ত্র করবে অনন্ত তার দেহে প্রাণ থাকতে? সে কি জানে না একটু আরক না হ'লে হুজুরের কত কষ্ট হয়?

'তবে? চাবি পায় কি করে দেবী, তুই না দিলে?'

'আজ্ঞে, দেবী দিদি ডাক্তারবাবুর চেম্বারে নিজে গেল যে সেদিন।' কাঁদ কাঁদ হল অনন্ত।

'চাবি দিতে চাইনি মোটে। কিন্তু কথা শোনে না যে। চোখ রাঙিয়ে নিজের হাতে চাবি তুলে নিল টেবিল হতে। লিস্টি করে এনেছে সব খাবার-দাবারের। দেখছেন তো আজকাল ইস্পরর্জ। খাবার মোটে আসে না টেবিলে—কেবল হাড়সিদ্ধ জলটুকু ছাড়া।'

বটে। ও, তাই তো, খাবারে সত্যি তো পরিবর্তন ঘটেছে। ভাল আছেন, তাই আপত্তি করবার কথা মনে হয়নি। মনিবকে চুপ করে থাকতে দেখে সাহস পেল অনন্ত।

'দিদিমণি হরলিক্স্ ক'রে রেখে গিয়েছে ফ্লাস্কে। দেব?'

হরলিক্স্! হাসলেন সিদ্ধার্থ। স্কচ্ হুইস্কির বদলে হরলিক্স্! হঠাৎ যেন অনেক বছরের সেতু পার হয়ে মা এসে দাঁড়াল সামনে—পেট নেমেছে, আজ আর চা খায় না সোনা, চিনির জল এনেছি লেবু চিপে। ইস্, রবীন্দ্রনাথের গানগুলো মানুষকে ডেঞ্জারাস্‌লি সেন্টিমেন্টাল ক'রে তোলে।

'আচ্ছা দে'—হরলিক্স্-এর জন্য হাত বাড়ালেন সিদ্ধার্থ। ঈষদুষ্ণ পানীয় শরীরের অভ্যন্তরে নামতে লাগল ধীরে গলা-বুক ভিজিয়ে। পায়ের উপর চাদর টেনে দিয়ে আলো নেভাল অনন্ত। একটা নরম ঠাণ্ডা অন্ধকার, পাতলা ঘুম আসছে। দেবযানী তাঁর অসুখ হবার আশঙ্কায় কুসেটের চাবি নিয়ে গিয়েছে, হরলিক্স্ রেখেছে ফ্লাস্কে ভরে। বেশ মেয়েটা।

কাজে বসবার আগে একটা ছোট পেগ অভ্যাস সিদ্ধার্থের। অনন্তই ঠিক ক'রে রাখে বরাবর। আজো এনে দিয়েছে সেই। একটা চুমুক, আর একটা। মুখ তুলে চাইলেন অনন্তর দিকে। লিকারের গন্ধ; কিন্তু স্বাদটা—

'এই! কি দিয়েছিস?'

শতবার দুর্গানাম জপছিল অনন্ত। আজ এক লাথিতে নিশ্চয় যাবে প্রাণ। হাতে-পায়ে ধরেছে দেবী দিদির, কি কঠিন মেয়েমানুষ! একটা কথা শোনে নি। গ্লাস ভরে দিয়েছে বিলকি-ছিলকি কিসের শরবৎ, এক ফোঁটা মদ মিশিয়ে। এখন, এখন কি হবে?

'কথা বলছিস না কেন? কি এটা?'

'আজ্ঞে দেবী, দেবী দিদি'—দাঁতে দাঁতে বাড়ি খেল অনন্ত।

'ডেকে নিয়ে আয় দেবযানীকে।'

সামনে হতে পালিয়ে গিয়ে বাঁচল অনন্ত।

'আমাকে ডেকেছেন?' দেবযানী বিভার ভাসুরঝি। বিভার বর্ণনা মতো—পরের দোরে পড়ে থাকবার দরুণ একটুও ম্রিয়মাণ নয় কথাবার্তা।

'কি দিয়েছ গ্লাসে?'

'একটা শরবৎ। ভাল লাগেনি? ও, খেয়ে ফেলেছেন। আর একটু দেব?'

'না না। আর চাইনে। কিন্তু কি দিয়ে বানিয়েছ শরবৎ? বসো, বসো ঐ চেয়ারটায়।'

'টমেটোর রস, তাতে আদার রস, দারচিনি, মরিচের গুঁড়ো আর আপনার মাথা ধরবে তাই একটু জিন।'

'আরে এ যে একেবারে ককটেল বানিয়েছ। শিখলে কোথায়?'

'ও আমি মাথা হতে বানিয়েছি।'

'যে মাথাটা এখন ঘাড়ের উপর আছে? বেশ মাথা।' মাথাটা একটু দেখলেন সিদ্ধার্থ। ঘন শক্ত চুল, সরু সাদা সিঁথি।

'আচ্ছা মতলব তো এসেছে মাথায়, একেবারে অরিজিন্যাল।'

'অরিজিন্যাল হবে কেন? পুজোতে তো লাগে।'

'পুজোতে? মা-দুর্গাকে ককটেল?'

হেসে ফেলল দেবী—'ককটেল নয়, মধুপর্ক। ওতে লাগে দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু—।'

'বেশ, বেশ। তা ব'লে আমাকেও ওটা দিয়ো না যেন। কেমন আছে বিভা? ডাক্তার এসেছিল?'

'এসেছিলেন। আছেন এক রকম। একটু বেড়াতে টেড়াতে গেলে—'

'গেলেই পারে। ছোট গাড়ীটা বের করতে বল। তুমিও যাও। বেশ খানিকটা হাঁটতে বল গঙ্গার পার ধরে। ঘুম হবে রাতে।'

'দেখি।' উঠল দেবযানী।

বেশ মেয়েটি। মনে মনে ভাবলেন সিদ্ধার্থ। ককটেল বানাবার ফন্দিটা বের করেছে বেশ তো। যা ভেবেছিলেন তেমন নিরীহ নিড়বিড়ে নয় মেয়েটা। বিয়ে দিতে হবে ওর একটা, কিন্তু বিভাকে নিয়ে হবে মুস্কিল তা হলে। একটা ভাল দেখে ঝি-টি রাখলে—দেখা যাক। কাজে মন দিলেন সিদ্ধার্থ।

একটি ভেজিটেবল ঘি প্রস্তুত করবার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে সম্প্রতি। সিদ্ধার্থের

With Best Compliments

FROM

Chung Wah Restaurant

Phone No. 23-5220

আপাত নেই, কিন্তু কতকগুলি জিনিস বোঝাতে হবে ডিরেক্টরদের। এ-দেশে রান্নার জন্য সরষে, বাদাম, তিল আর নারকেলের তেল ব্যবহার করা হয়। ভিটামিন এ ডি এ সব তেলে নেই বললেই হয়। একে তো ঘি-মাখন-চর্বির তুলনায় এই উদ্ভিদ হতে তৈরী ফ্যাটগুলি অনেক নিকৃষ্ট, তারপর বনস্পতি তৈরী করবার সময় তেলের মধ্যে যে হাইড্রোজেন পাস করাতে হয়, তার ফলে যেটুকু ভিটামিন স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে, তাও নষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং ভেজিটেবল ঘি-গুলো নামে মাত্রই ঘি। ফুড ভ্যালু নেই বিন্দুমাত্র। ভেজিটেবল ঘি বের করতে হ'লে তার সঙ্গে উপযুক্ত পরিমাণ ভিটামিন এ ডি মিশিয়ে তার খাদ্যমূল্য বাড়িয়ে তবেই প্রস্তুত করা হোক—সিদ্ধার্থর এই মত। কিন্তু অন্য ডিরেক্টরগণ গাঁইগুঁই করছেন। সিদ্ধার্থের ফরমূলা অনুসরণ করতে গেলে খরচ পড়বে বেশী, ওদিকে দাম বাড়াতে পারা যাবে না, কারণ তাহলে বাজারে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হেরে যাবে সুশ্রুত লেবরেটরীর মাল।

ম্যানেজিং ডিরেক্টরের বিদ্যা আর-ব্যক্তিত্বের কাছে অন্যদের হার মানতে হয় সর্বদা; মেজর শেয়ারও কণ্ট্রোল করেন তিনিই। একটু নীতির অদল-বদল করলেই যা হচ্ছে তা হতে পাঁচগুণ বেশী লাভ করতে পারে কোম্পানী। কিন্তু উপায় নেই। এদিকে তো পয়লা নম্বরের জিবড়। মদ-মাংস-মেয়েমানুষের বেলা রুচি আর সময়। অবশ্য ব্যবসায়ে লাভ-ক্ষতির দুটো পাল্লাই সিদ্ধার্থ রায়ের দিকে হেলে পড়ে, তাহলেও সবাই যখন লাল হতে লালতর হচ্ছে, তখন সুশ্রুত কেমিকেলের এতটা সাধু সেজে থাকবার দরকার কি?

দরকার যে আছে তাই বিশদভাবে বর্ণনা করছিলেন সিদ্ধার্থ নিজ বক্তব্যের মধ্যে। কাল মিটিং, সুতরাং কাজ শেষ করতে ঘড়ির কাঁটা গিয়ে পৌঁছাল বারোটার ঘরে। রাতের খাবারের তাগাদা দিতে ইতিমধ্যে পাঁচ-ছ'বার অনন্ত ঢুকেছে ঘরে, হাত নেড়ে তাকে বিদায় করেছেন সিদ্ধার্থ। কাজের সময় এ-ঘরে কেবল অনন্ত ছাড়া ঢুকবার হুকুম নেই কারোর। দেবী ছটফট্ করেছে, অনন্তকে পাঠিয়েছে বার বার, তারপর শুতে চলে গিয়েছে একটু আগে। সিদ্ধার্থকে এতটা যত্ন করা পছন্দ নয় বিভার।

'মামার শালা কাকীর ভাই
তার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নাই।'

কি সম্পর্ক যে তার জন্য একেবারে প্রাণপাত? দেবী ঘরে আসতেই ঝাঁঝিয়ে উঠল বিভা—

'তোর কি? খায় খাবে, না খায় উপোস করে থাকবে। মাতাল-দাঁতাল সমান—এত রাতে ওঁর ঘরে—'

'কি বাজে কথা বল, ওঁর ঘরে গিয়েছি নাকি আমি? সিঁড়িতে বসে ছিলাম।'

তুই কি ওর ঝি নাকি যে সারাক্ষণ ফিরছিস পায়ে পায়ে?'

'ঝি না তো কি? খেতে-পরতে দিচ্ছে, মাথা গুঁজে আছি।'

'মাইনে? মাইনে দেয় তোকে? শোন দেবী, কাল হতে খাবার ঢেকে রেখে আসবি দশটার মধ্যে। বুঝলি?'

'বুঝেছি, এখন ঘুমাও।' শুয়ে পড়ল দেবযানী।

লেখা শেষ হয়েছে, একবার চোখ বুলিয়ে নিচ্ছিলেন সিদ্ধার্থ। কাল সকালে উঠে টাইপে দিতে হবে। টাইপিস্টকে ডিরেকশন দেওয়া আছে বাড়ীতে আসবার জন্য। ফোন। কে? কে? দেবী? দেবযানী?

'কি ব্যাপার, ফোন কেন?'

'অনেক রাত হয়ে গিয়েছে, এখন শুয়ে পড়ুন।' নরম গলা ভেসে এল ওধার হতে।

'অনেক রাত? তাই তো, দুটো বাজে।'

'এত রাতে আর খাবেন না। হরলিক্স্ আর বিস্কুট আছে।'

ফোন ছেড়ে দিয়েছে দেবী। বাথরুমে ঢুকে চোখে-মুখে জল ছিটাতে ছিটাতে ভাবলেন সিদ্ধার্থ একটা কথা। হঠাৎ এত যত্নের আতিশয্য কেন? বিয়ে দেবার কথাটা বলেছে বুঝি বিভা! মেয়েরা একেবারে—। কোনোমতে একটা বিয়ে হলেই যেন স্বর্গসুখ লাভ।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত

১.	বাইশ কবির মনসামঙ্গল বা বাইশা—শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য	...	মূল্য ১০·০০
২.	বাংলার বৈষ্ণবভাবাপন্ন মুসলমান কবি—শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য	...	মূল্য ৫·০০
৩.	গোবিন্দ দাসের পদাবলী ও তাঁহার যুগ—ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার	...	মূল্য ১৫·০০
৪.	প্রাগৈতিহাসিক মোহেন-জো-দড়ো—শ্রীকুঞ্জগোবিন্দ গোস্বামী	...	মূল্য ৫·০০
৫.	বিদ্যাপতির শিবগীত—শ্রীসুধীরচন্দ্র মজুমদার কর্তৃক সম্পাদিত	...	মূল্য ৪·০০
৬.	বেদান্তদর্শন ভেদাভেদবাদ—শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য ২য় খণ্ড—মূল্য ১০·০০ ;	...	৩য় খণ্ড মূল্য ১৫.০০
৭.	মহাকবি গিরিশচন্দ্র ও তাঁহার নাট্যসাহিত্যে অবদান (গিরিশ বক্তৃতামালা)—শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত	...	মূল্য ৩·০০

1.	Acharya P. C. Roy Centenry volume	...	Rs. 15·00
2.	An Enquiry into the nature & Function of Art by Dr. S. K. Nandi	...	Rs. 10·00
3.	Bengali Folk Ballads from Mymensingh by Dr. DUSAN ZBAVITEL.	...	Rs. 12.00
4.	Classical Indian Philosophies their Synthesis in the Philosophy of Sri Ramkrishna by Dr. S. C. Chatterjee	...	Rs. 5·50
5.	Elements of the Science of Language by J. J. S. TARAPOREWALLA	...	Rs. 20·00
6.	Ethics of the Hindus by Dr. S. K. Maitra	...	Rs. 8.00
7.	Harendra Kumar Mookerjee volume by P. N. Banerjee (Editor-in-Chief)	...	Rs. 20.00
8.	History of Sanskrit Literature by Dr. S. N. Das Gupta & Dr. S. K. De	...	Rs. 30.00
9.	Hundred Years University of Calcutta. Vol. I. & II	...	Rs. 15.00
10.	Industrial Finance in India by Dr. S. K. Bose	...	Rs. 18.00
11.	Kamala Lecture (Indiaism & the Indian Synthesis by Dr. S. K. Chatterjee	...	Rs. 8.00
12.	Kamala Lecture (Indian Culture & Religious Thought by Sri Anantasayanam Iyangar	...	Rs. 5·00
13.	Logic Value & Reality by Dr. B. K. Bhattacharya	...	Rs. 10.00
14.	Nepali Language—its History & Development by Dr. Dayanand Srivastava	...	Rs. 10.00

বিস্তৃত বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন :—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশন বিভাগ, ৪৮, হাজরা রোড, কলিকাতা—১৯ ফোন : ৪৭-১৭৬৬

অনন্ত ঘুম চোখে গ্লাস ভরে দিল গ্লুকোজ। দুখানা বিস্কুট।

'ঠিক আছে। যা, ঘুমো গিয়ে। ঠিক ছ'টায় আসবে নবেন্দু টাইপ করতে। আমাকে ডেকে দিস।'

ঘুম ভাল হ'ল না। মিটিং, দেবযানী, বিভা, টমেটোর রস—আবোল-তাবোল স্বপ্নের উৎপাত। সকালেও দেখা গেল আরো উৎপাত। টাইপিস্ট নবেন্দুর জ্বর, একশ পাঁচ উঠেছিল রাতে, সুতরাং—সুতরাং আর কি। নিজেই ব্যস্ত হয়ে বসলেন সিদ্ধার্থ রায় রেমিংটন নিয়ে।

'আপনি তো কাল কিছু খাননি, এখন একটু—' অনন্ত ধমক খেয়ে ডেকে এনেছে দেবীকে। তাকেও একটা কড়া ধমক দেবেন ভেবে মুখ তুলতেই মনে পড়ল গত রাতের কথা। হোক স্বার্থের জন্য, তবু তো রাত জেগে ছিল, ফোন ক'রে সচেতন করেছে। রাগ করতে আর ইচ্ছা হ'ল না।

'দেখছ তো মুস্কিলে পড়েছি, নবেন্দুর জ্বর।'

'আমি করে দেব টাইপ?' আস্তে আস্তে বলল দেবযানী।

'তুমি?' আশ্চর্য হলেন সিদ্ধার্থ। 'টাইপ জান নাকি তুমি?'

'দু' বছর শিখেছি তো স্কুল ফাইন্যাল পাশ করবার পর।'

'পারবে? বানান ভুল করবে না তো?'

'দেখি। আপনি স্নান করে আসুন। না বুঝতে পারলে আপনাকে জিজ্ঞেস করে নেব বানান।'

কাগজ পড়তে লাগলেন সিদ্ধার্থ। স্পীড নেই, ভয়ানক আস্তে আস্তে টাইপ করতে লাগল দেবী। দেরি হ'ল, কিন্তু ভুল নেই। কয়েকটা জায়গায় সাহায্য করলেন সিদ্ধার্থ।

'বাঃ বেশ! খুব কাজের মেয়ে তো।' প্রশংসা শুনে হাসল দেবযানী। আঁচল তুলে মুছল কপালের ঘাম। ছেঁড়া আঁচল, সিদ্ধার্থ দেখলেন লম্বা সেলাই আঁচলের মাঝখানটায়।

এবারের মিটিং সহজে শেষ হবে না, বিরুদ্ধ মুখগুলি দেখতে দেখতে ভাবলেন সিদ্ধার্থ।

একথা সত্যি, ম্যানেজিং ডিরেক্টরের প্রতি অসন্তুষ্টি জন্মেছিল অন্যান্য ডিরেক্টরদের মনে।

সাড়ে সাতটায় মিটিং শেষ। ম্যানেজিং ডিরেক্টরই জিতেছেন। কিন্তু খুশী হয়নি অনেকে, এটা ভালই বোঝা যাচ্ছিল। বোর্ড রুম হতে বের হয়ে সোজা গাড়ীতে গিয়ে বসলেন সিদ্ধার্থ। ভয়ানক ক্লান্ত লাগছিল নিজেকে। সাধারণত এমন ক্লান্তি ঘোচাতে অন্য রকম ব্যবস্থা করেন, আজ মনে হ'ল বাড়ীর কথা। বাড়ী কোনোদিনই বাড়ীর অর্থে আকর্ষণ করে না তাঁকে। থাকবার একটা ব্যবস্থা, এইমাত্র। আজ হঠাৎ মনে হ'ল হয়ত দেবযানী বসে আছে, হয়ত ছটফট করছে তাঁর দেরি দেখে। ড্রাইভারকে তাই বললেন—'বাড়ী।'

স্নান করে কিছু খাওয়া। অনন্ত তটস্থ হয়ে সামনে দাঁড়িয়ে। প্রায় সমস্ত জীবনটাই তো চলে গেল এমনি করে, আজ যেন একটু ব্যতিক্রম চাইছিল মন। একটু হাসি, দু'টি কথা—সন্ধ্যাবেলাটা ভাল লাগত। নিজেকে অনুকম্পা করে হাসলেন সিদ্ধার্থ রায়। পঞ্চাশ বছরে পৌঁছে হঠাৎ বুড়ো হয়ে গিয়েছেন। বুড়ো বই কি! না হ'লে বাড়ীর জন্য ছুটে আসা কেন। বাড়ী দরকার শিশু আর বৃদ্ধের। যৌবনের জন্য সমস্ত পৃথিবী রয়েছে তার অজস্র আনন্দ নিয়ে। বুড়ো না হ'লে সমস্ত দিনের বিরুদ্ধতার মধ্যে চব্বিশ বছরের বোকা-বোকা মুখ দেবযানীকে বার বার মনে পড়বে কেন? কেনই বা বাড়ী ফিরবেন তার অপেক্ষা করে থাকবার কথা ভেবে?

ইচ্ছা ছিল, কিন্তু অপেক্ষা করে থাকতে পারেনি দেবযানী। বিভার সঙ্গে তাকে যেতে হয়েছে বিভার ছোড়দা অনিরুদ্ধর বাড়ীতে। পৈতৃক বাড়ীর মালিক অনিরুদ্ধ। বাপ ত্যাজ্যপুত্র না করলেও সিদ্ধার্থ কখনোই এ বাড়ীতে আসতেন না। তবে ভাঙা-চোরা মেরামত করতে, তুলতে দোতলায় দু'খানা ঘর ভাইকে হাজার কয়েক টাকা দিয়েছেন তিনি।

মাসের মধ্যে তিন-চারবার এ বাড়ীতে এসে বড় ভাই-এর নিন্দে-মন্দ না করতে পারলে বুকের ধড়ফড়ানি বেড়ে যায় বিভার। সিদ্ধার্থর নিন্দে করবার সময় সে বাপ-মা, স্বামী, শ্বশুরবাড়ীর প্রত্যেকের কিছুটা নিন্দে করে চাটনি হিসেবে।

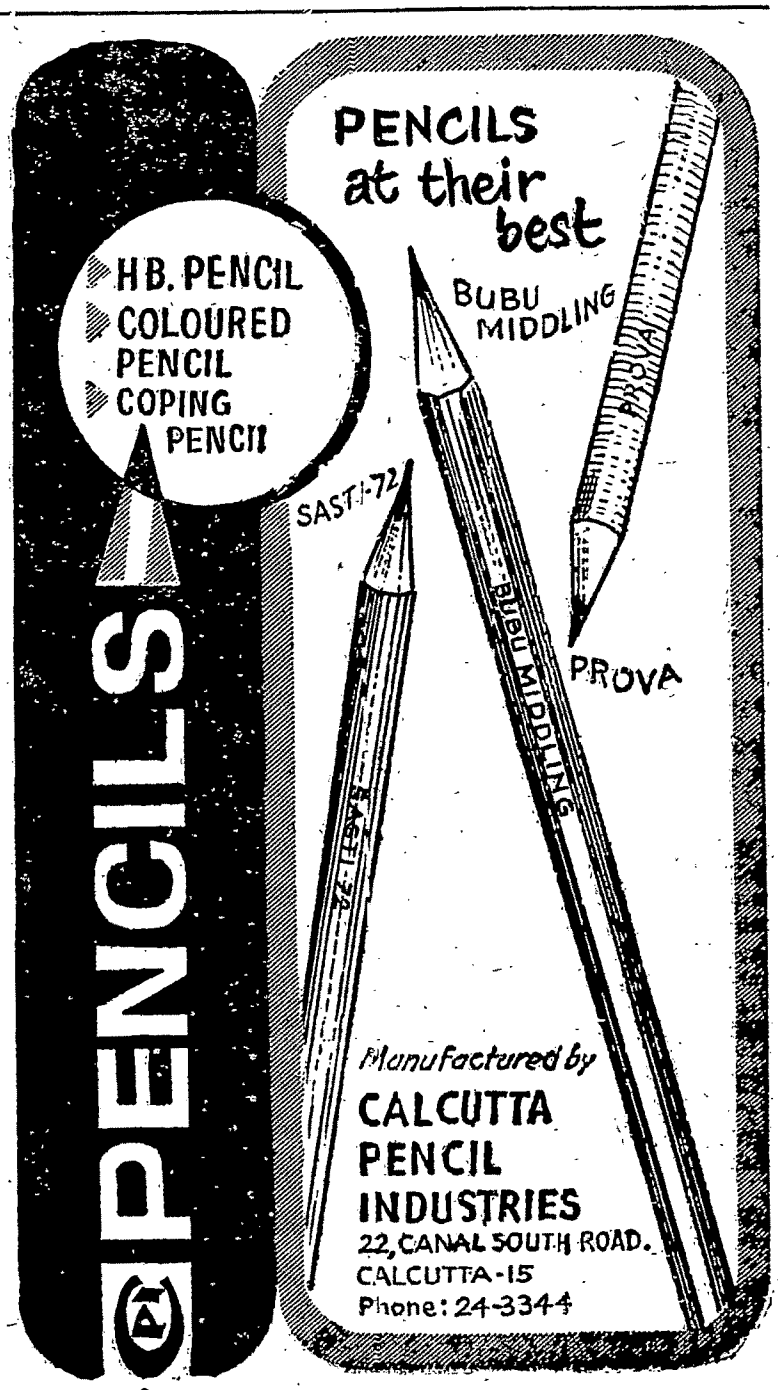

সরলাবালা বিভার একনিষ্ঠ শ্রোত্রী। সত্যি সত্যি ভালমানুষ সে। সবার কথাই শোনে মন দিয়ে। বছর দশেক হ'ল বিধবা হয়ে স্বামীর নির্বাতন হতে অব্যাহতি পেয়েছে। ছেলেমেয়ে নিজের হয়নি এবং তার জন্য কোন ক্ষোভ আছে বলেও মনে হয় না। সিদ্ধার্থ সরলাকে একশ টাকা ক'রে মাসে দেন, সুতরাং শাশুড়ীকে রীতিমত মেনে চলে অনিরুদ্ধর বৌ বীণাপাণি। শেষ বয়সে সুখেই আছে সরলাবালা। চারধাম তীর্থ হয়ে গিয়েছে বড় ছেলের কল্যাণে, মাঝে মাঝে গাড়ী পাঠিয়ে দেয় মা-কালীকে দর্শন করবার জন্য। বাড়তি টাকা দেয় পালপর্বে।

সৎমায়ের প্রতি সাহাগের অভ নেই, যত শত্রুতা ভাই-বোনের সঙ্গে। নিজের তো ছেলে-পুলে নেই, আটকুড়ো, নির্বংশে, চোখ টাটায় ন্যাই-এর ছেলেমেয়ে দেখে। চার বছর আগে একেবারে সর্বনাশ করেছে অনিরুদ্ধর। সন্তান হবে তাই একটু কাহিল শরীর বীণার। কার না শরীরটা একটু ম্যাজমেজে হয় এমন সময় ? তা কি রাগ বাবুর। তিনি আবার এসে-ছিলেন, বিজয়ার প্রণাম ঠুকতে মাকে। কল-তলায় ভিরমি খেল বীণা। টং করেও হতে পারে। ভাসুরের আদর খাবার লোভে চংই ধরেছিল নিশ্চয়। এই যে বিভা—দিন-রাত কুটছে বুকের মধ্যে, কই বলুক দেখি কেউ, কোনদিন ভিরমি খেয়েছে কিনা সে। তা বীণা ভিরমি খেতে কি হুলস্থুল কাণ্ড। ভাসুর হয়ে ছুঁয়ে দিল ভাদ্র-বৌকে। একেবারে কোলে করে তুলল নিয়ে গাড়ীতে, হাসপাতালে। সে কি যে-সে হাসপাতাল, একেবারে বড়লোকের জায়গা। হাজার হাজার টাকা উড়তে লাগল মিনিটে। এত খরচাপাতি করে বের হ'ল তো এক মরা কন্যা। তখন ছেই মারি তো হেই-মারি ভাইকে। শোন কথা, আট-আটটা সন্তান হয়েছে, এক-আধটা তার মধ্যে মরা হবে না ? তাই নিয়ে এত লাফালাফি। তারপর করল কি কাণ্ড—ধমকে ধমকে ভাইটাকে ক'রে ফেলল ভিজে বেড়াল। সুড়সুড় করে অনিরুদ্ধ কাগজে দস্তখত দিল, অমনি ডাক্তাররা মিলে বীণার পেটটাকে কেটে একেবারে ছয়খান করে ফেলল। আর ছেলে হবে না বৌয়ের। মরে হেজে আছে তে পাঁচটা সন্তান, এরই মধ্যে ছত্রিশ বছর বয়সে বাঁজা হয়ে বসেছে বীণা। বলিহারি সাহস বৌদির। বিভারা ছিল চোদ্দজন, দাঁড়িয়েছে এখন তিনজনে এসে। পাঁচটা গুঁড়োতে ভরসা কি ? ওর মধ্যে একটাও যদি না থাকে, তাহলে ? তখন কি হবে কাণ্ডটা ?

জিভ দিয়ে আগুন ছড়ায় বিভা। ওকে ভয় না পেলেও ওর জিহ্বাকে ভয় পায় সবাই।

নয়নতারার দেহ মন্থন করে যে বিষ উঠেছিল তার সবটুকু সঞ্চিত রয়েছে বিভার মধ্যে। আটটি কন্যা-সন্তান জন্মেছিল নয়নতারার, বিভাই বেঁচে গেল শেষ পর্যন্ত। বড় হ'ল, বিয়ে হ'ল, এমন কি বিধবা পর্যন্ত হয়ে বুড়ী হবার জন্য বেঁচে রইল। কেন বাঁচল বিভা ? প্রভা, শোভা, হাবলি, আয়িদের মতো ও কেন মরল না জ্বরে, আমাশায় ভুগে ? বাচ্চাদের ভেজানো কাঁথা, ময়লা সাফ করে, খেয়ে এঁটো পাত কুড়ানো ভাত পনেরো বছরের হ'ল বিভা আর সেই সময় মা সর্বনাশী মরল দাঁত বের করে। স্বর্গে গেল নয়নতারা ; বিভা পচতে লাগল নরকে। নরক নয়ত কি। মা থাকতে তবু আড়াল-আবডাল ছিল ; এখন পড়ল সোজাসুজি বাপের সামনে, যে বাপ লাথি মেরে ছাড়া ছোঁয়নি, ডাকেনি হারামজাদী ছাড়া অন্য নামে।

না, মিথ্যে বলবে না বিভা। সরলা তাকে কষ্ট দেয় নি। কিন্তু জন্ম-জন্ম পাপের ফলে দিবাবিন্দুর মেয়ে হয়ে যে জন্মেছে, তাকে সুখ দেবার সাধ্য কি সরলাবালার ? দুপুর রাত্তিরে মদ খেয়ে টং হয়ে বাড়ী ফিরতো বাপ। সৎমাকে জড়িয়ে ধরে আদর—সরলা, সরলে, প্রাণেশ্বরী, আর হড় হড় ক'রে দুর্গন্ধ বমি। রাতের ডিউটি নিয়েছিল ছোড়দা। বড় ভাইটা দোর-জানলা বন্ধ করে মরে থাকতো

সাহিত্য সংসদ প্রকাশিত

রচনাবলী সিরিজ

বঙ্কিম রচনাবলী

বঙ্কিমচন্দ্রের সমগ্র উপন্যাস (মোট ১৪টি) একত্রে, প্রথম খণ্ড [১২·৫০]।
উপন্যাস ব্যতীত সমগ্র সাহিত্য-অংশ একত্রে, দ্বিতীয় খণ্ড [১৫·০০]
শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল কর্তৃক সম্পাদিত এবং জীবনী ও সাহিত্য-সাধনা আলোচিত।

দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সমগ্র রচনা দুই খণ্ডে সন্নিবিষ্ট। প্রথম খণ্ড [১২·৫০]। দ্বিতীয় খণ্ড [১৫·০০]
ডক্টর রথীন্দ্রনাথ রায় কর্তৃক সম্পাদিত এবং জীবনী ও সাহিত্য-সাধনা আলোচিত।

রমেশ রচনাবলী

রমেশচন্দ্র দত্তের সমগ্র উপন্যাস (মোট ৬টি) একত্রে [৯·০০]। শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল কর্তৃক সম্পাদিত এবং জীবনী ও সাহিত্য-সাধনা আলোচিত।

মধুসূদন রচনাবলী

মধুসূদনের সমগ্র রচনা ইংরেজিসহ একত্রে। ডক্টর ক্ষেত্র গুপ্ত কর্তৃক সম্পাদিত এবং জীবনী ও সাহিত্য-সাধনা আলোচিত। প্রকাশন অপেক্ষায়।

সাহিত্য সংসদ
৩২ এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড ঃ ঃ কলিকাতা-৯

প্রাচীন দুর্গের সীমানায়

দুর্গাদাস সরকার

কাঠে কাঠ বাঁধা পোলের ওপরে দাঁড়াবে কতক্ষণ—
নিম্নে উজান নদী।
দক্ষিণে ঐ পাহাড়ের গায়ে ইটের তৈরি তোরণ;
প্রাচীন দুর্গে পৌঁছাতে পারি যদি।

কোন কালে যেন এসেছিল কেউ; জীপের চাকার দাগ
আমাদের পদচিহ্নে থাকুক আঁকা।
পিছনে আমরা তাকাবো না ফিরে, আকাশে অস্তরাগ।
আর চিরকাল ভাঙা পোলটাই ফাঁকা।

বন পার হলে চূর্ণ প্রাচীর, খলমকুচির স্তূপ;
সিংদরজায় সান্ত্রী গর্জাবে না।
শূন্য প্রাসাদ, সেই দরবার একদম নিশ্চুপ;
কোনোখানে নেই বল্লমধারী সেনা।

হঠাৎ দেয়ালে কান পাতলেই গা করবে শিরশির;
হয়তো তখন দূরের হুক্কাহুয়া
শুনতে শুনতে রাজত্বপাট করবে মগজে ভিড়;
তবু নয় নাকি পৃথিবীর কিছু ভুয়া।

সোনায় বাঁধানো হস্তীদন্ত হয়তো মিউজিয়ামে
রাখা আছে; আজ হাতীর লড়াই নেই।
বাজে না ঘণ্টা, ঘণ্টা বাজে না প্রতিটি প্রহর যামে;
চোখ ঘোরে কোন রাজার সন্ধানেই।

বধ্যভূমিটা তেমনি রয়েছে, সেটা পার হতে পারছি কই?
চারিদিক থেকে জড়ায় বর্তমান;
ঊর্ধ্বশ্বাসে নামতে গেলাম—কোথাও খুঁজে যে পাই না মই;
প্রাচীন দুর্গ আড়ি পেতে আছে কান।

পোলের নিম্নে উজান নদীর কঠিন কোমল জলোচ্ছ্বাস
হাসছে কেমন, হেসেছে যেমন একা
রাজত্ব গড়ে ওঠে নি যখন, কেবল একটি শুভ্র হাঁস
জলের ওপরে আঁকতো রজতরেখা॥

কি দুর্গতি বিভার। দু'হাতে পরিষ্কার করতে হত সেই নরক, আর কি মার! খামচা খামচা চুল উঠে আসতো দিবাবিন্দুর হাতে। পিঠটা এখন পর্যন্ত যেন জ্বলে যাচ্ছে খিমচি-কাটা ঘায়ের জ্বালায়।

তারপর বিয়ে। বাপের এক বন্ধু, এক গেলাসের ইয়ার। একদিন এল বর সেজে, একটা বদ্ধদৈত্য যেন। কত কাঁদল বিভা, মরণ ডাকল হাতজোড় করে। ছোড়দার সামর্থ্য নেই, কিন্তু দাদা? ওকি বাঁচাতে পারত না সেদিন বিভাকে? একটা চোখের পাতাও নাড়ল না পাষণ্ড। বিয়ে হয়ে গেল বিভার।

শ্বশুরবাড়ী, না অগ্নিকুণ্ড কোলে একটা শিশু নিয়ে বিধবা জা ধুঁকছে, জা মরে গেল, অনাথা হ'ল দেবযানী। কিন্তু তাকে বুকে তুলে নেবার সাধ্য আর নেই বিভার। তার মধ্যে মা হবার জন্য যে মেয়েটা বসে ছিল, সে তখন মরে গিয়েছে। তবু দেবীকে ভালবাসল বিভা।

তারপর আবার এল মৃত্যু। আঃ, মৃত্যুর হাতে যে অমন শান্তি থাকতে পারে, কোনো দিন বুঝতে পারেনি বিভা। স্বামী ব্রজেশ্বর লিভারের সিরোসিস রোগে মরল। শ্মশানে চলে যায়নি শব। আত্মীয়-বন্ধু কেউ নেই, নেই ফুটো পয়সা, পাড়াপড়শী জটলা করছে উঠানে দাঁড়িয়ে। তাদের মধ্যেই কেউ হয়ত ফোন করে থাকবে বিখ্যাত-ধনী সিদ্ধার্থ রায়কে।

আধঘণ্টার মধ্যে দরজায় মস্ত বড় মোটর এসে দাঁড়াল। পকেট হতে বের হ'ল একশ টাকার নীলচে নোট। দু'ঘণ্টার মধ্যে বিভাকে নিয়ে এলেন সিদ্ধার্থ পার্ক স্ট্রীটের মস্ত বড় বাড়ীতে। কত সুখ, কত আরামের আয়োজন! কেন, এখন কেন? আজ বিভা কি করবে সুখ দিয়ে? নরুণ-পাড় তাঁতের শাড়ি, আতপ চালের ভাত—এই তো দরকার। বুকের অসুখে ধরল। প্রথম প্রথম ব্যস্ত হত ভাই, এখন আমলই দেয় না। একটা ডাক্তার দিয়েছে ঠিক করে, সকালবেলা একটা ধর্মের ডাক, ব্যস। সব হ'ল। মাসের মধ্যে কয়েকবার এ বাড়ীতে এসে দুটো দুঃখের কথা বলতে পারলে তবু বুকটা হালকা হয়। কিন্তু আসাই হয় না। শত্রুতা করছে দেবী; কথা বলতে বসলেই মুখে হাত চাপা। আরে বাবা, বুকের মধ্যে জ্বলছে আগুন, দাউ দাউ, এক ফোঁটা জল ঢেলে নেভাবে তাকে।

অনেকক্ষণ ধরে সিদ্ধার্থের অমিতাচারের বিবরণ শুনল সরলা নীরবে, তারপর বিভা দম নেবার জন্য থামতে জিজ্ঞেস করল:

'তা শরীরটা এখন আছে কেমন তোমার?'

'শরীর? দেখছ না ফুলেছি, শোথে ধরেছে যে, আর সাদা, একেবারে রক্তশূন্য।'

বিভার পুষ্ট শরীরের দিকে চেয়ে মাথা নাড়ল সরলা। বিভা তার বাবার মতো দেখতে। ছেলে দু'জনই পেয়েছে নয়নতারার শান্ত চোখ দুটি। অনিরুদ্ধর আজ ছুটি। সে বাড়ী ছিল, শুনছিল বিভার ঝড় ছোটানো। এখন বেগ থামতে বেরিয়ে এল ঘর হতে।

'বিভা যে, ভাল আছিস?'

'তবু ভাগ্য! এতক্ষণে বের হ'লে ঘর হতে।'

'আরে, আমি একটু ঘুমিয়েছিলাম। তোর খবর কি?'

'আমি আবার একটা মানুষ, তার আবার খবর। তোমার খবর বল। গেছলে তো বড়কর্তার কাছে, একটা ব্যবস্থা হ'ল নীরুর?'

অনিরুদ্ধর বড় মেয়ে নীরার সম্বন্ধ ঠিক হয়েছে, ছেলেটি ভাল, কিন্তু টাকা চায়।

'বললেন তো ঠিক করতে। দেখা যাক কি হয়।'

'তবু ভাল, কথা দিয়েছে। আমি তো দেবীর জন্য বলে বলে হয়রান, একটা আধলাও বের করতে পারছি না। দাসীবৃত্তি করে খাচ্ছে মেয়েটা।'

'দেবীর আবার বিয়ের ভাবনা! অমন লক্ষ্মী মেয়ে!'

পাখা — নগদ ও সহজ কিস্তিতে—জি, ই, সি, বুশ TELERED, ট্রানজিষ্টার অলওয়েভ ও লোকাল
এলায়েড রেডিও ইণ্ডাষ্ট্রীজ
(ন্যাশনাল ইকো পাওয়া যায়)
প্রেসার কুকার
শো রুম ২৩, গড়িয়াহাট রোড, বালিগঞ্জ কলিঃ-১৯
১৫৩।এ, বিবেকানন্দ রোড, কলিঃ-৬
ফোন ঃ ৩৫-৪৬২৬
রেডিও

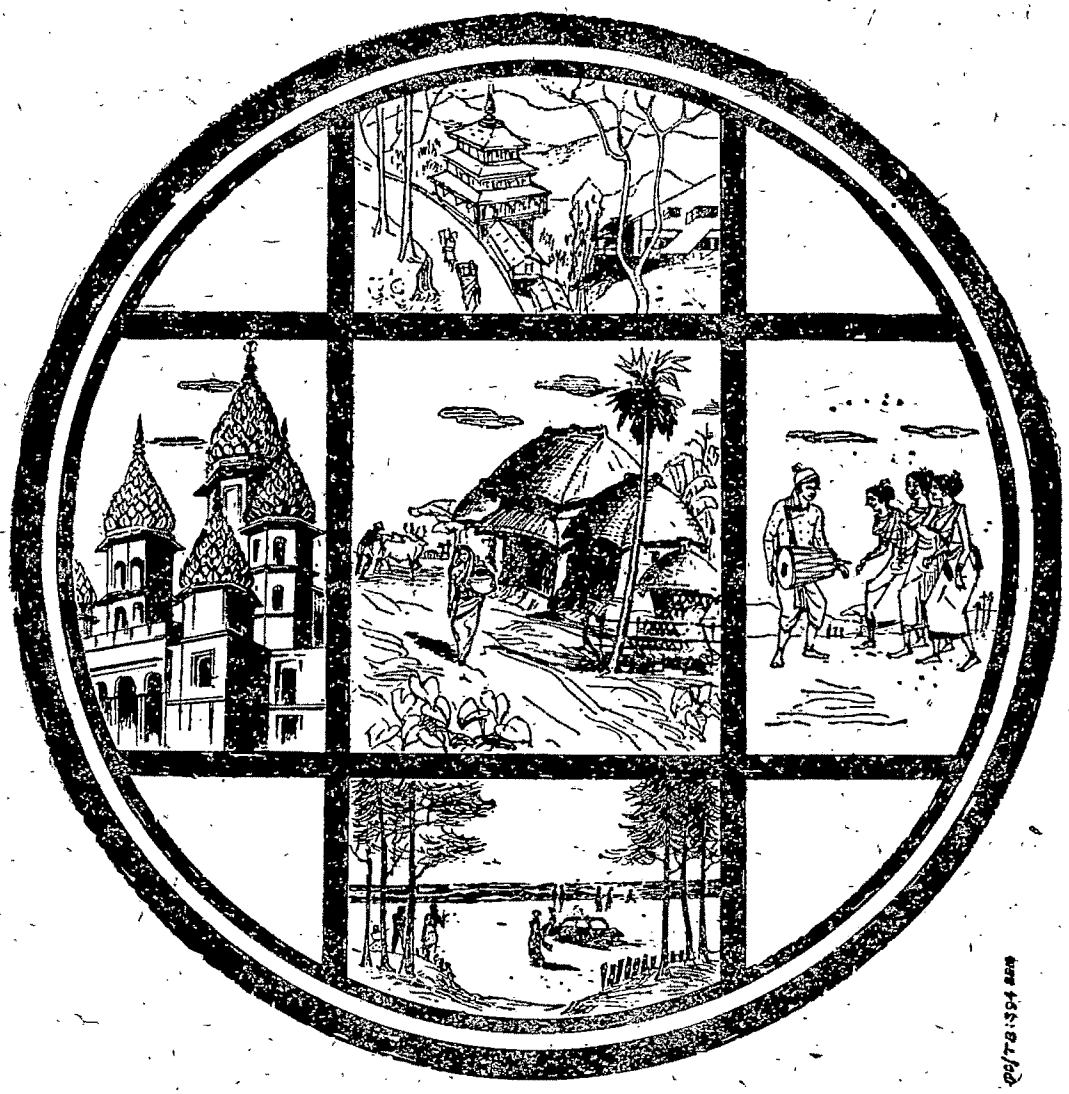

শারদীয় আনন্দের মধ্যে পশ্চিমবাংলাকে চিনুন

পশ্চিম বাংলার বহু দর্শনীয় স্থান দেখার আদর্শ সময় আশ্বিনের বিস্তীর্ণ স্বচ্ছ অবকাশ। তখন প্রকৃতি আনন্দের অজস্রতায় সরস সবুজের সোনা গলানো রৌদ্রে ঝলমল করে ওঠে। প্রকৃতির সাথে সাথে মানুষও আনন্দময় হয়ে ওঠে, প্রতিটি গৃহ হয় উৎসবে মুখর।

প্রকৃতি ও মানুষের সব—ভোলা আনন্দের মধ্যে বেরিয়ে পড়ুন, দেখুন দুর্গাপূজায় দেশ জোড়া সমারোহ···ঝাউবীথি-মণ্ডিত দীঘার সমুদ্র সৈকত,···দার্জিলিঙে, তুষারমৌলি হিমালয়ের ধ্যানগাম্ভীর্য্য···

ট্যুরিষ্ট ব্যুরো

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

৩২, ডালহৌসি স্কোয়ার (ইষ্ট), কলিকাতা-১ টেলিফোন : ২৩-৮২৭১

'লক্ষ্মী তো কত। বাপ-মা খেয়ে বসে আছে অবোধ বয়সে। দাও না একটা ছেলে দেখে, মেয়েটার গতি না হ'লে মরতে পারছি না।'

'এখনি মরবি কি। বেশ তো আছিস। ছেলে? তা, ছেলে তো আছে একটি। ভালই, তবে জজ-ম্যাজিস্ট্রেট নয়।'

'যত কথা তোমার। কত জজ-ম্যাজিস্টর আসছে ওর জন্য। কে ছেলে? কি করে?'

'ছেলে তোর দেখা। আরে তোর ছোট-বৌদির ভাই নবু। তার সঙ্গে দিবি? টাইপবাবু দাদার অফিসে। দেড়শ টাকা পায়, বোনাস আছে।'

'ওমা। নবেন্দু? সে তো সোনার চাঁদ ছেলে। দাও না ছোড়দা ঠিক করে। কত্তা কে ছেলের?'

'সেয়ানা ছেলে, তার আবার কর্তা কে? নিজেই নিজের কর্তা। তবে বাপ-মাকে বলতে হবে একবার। আপত্তি হবে না। এ তে করণীয় ঘর।'

'তবে উদ্যোগী হয়ে বিয়েটা লাগিয়ে দাও। তুমি কিছু বলছ না যে বৌদি? দেবীকে পছন্দ নয় তোমার?'

'দিব্যি মেয়ে দেবী। তবে বয়সে মানাবে কি? তুমি বলছিলে দেবীর চব্বিশ, নবু ছাব্বিশে পা দিয়েছে এই আষাঢ়ে।' ননদের হাতে ফুটবলের শরবৎ দিতে দিতে বলল বীণা।

'ওতে আটকাবে না, কত বিয়ে হচ্ছে আজকাল বয়সে বড় মেয়ের সঙ্গে।' কলঘরে ঢুকে গেল অনিরুদ্ধ।

'বাঃ, বেশ হয়েছে মাছের ঝোল। তুমি রান্না করেছ বুঝি?' খেতে খেতে জিজ্ঞেস করলেন সিদ্ধার্থ।

'ভাল হয়েছে? আর একটু দেই তাহলে?' আস্তে দেবী প্লেটের উপর আর দু'টুকরো মাছ তুলে দিল।

'সুন্দর হয়েছে। এই। আর না। হেভী হয়ে যাবে খাওয়া। ভাল রাঁধতে পার, টাইপ করতে পার ভাল। আবার পেটেণ্ট শরবৎ। খুব কাজের মেয়ে তো।'

চোখ দিয়ে দেবযানীকে দীর্ঘ স্নেহস্পর্শ দিলেন সিদ্ধার্থ।

পানপাত্র ভরে দিতে, রোমাঞ্চকর করতে রাত মেয়েদের দরকার। সিদ্ধার্থও বার বার ডেকে এনেছেন, আবার আসর ভাঙবার পর তাদের বিদায় দিয়েছেন অবহেলায়। যৌবনের দীপ্ত দিনে শীলাকে নিয়ে পেতেছিলেন প্রেমের বাসরশয্যা। বাসরশয্যা। কণ্টকশয্যা। আগুন দিয়ে বানানো বিছানা। দেড় বছরেই পাগল হয়ে উঠেছিলেন। সকালে উঠে দেখতে হত ফোলা চোখ, রং মাখা, লাস্যময় এক রমণীকে। দুপুরে, বিকেলে, রাতে সেই এক নারী। কখনো একটি ছোট নিরীহ মা, কখনো আদুরে স্ত্রী হয়ে দেখা দিত না শীলা। এক উদ্ধতযৌবনা নারী সিদ্ধার্থের সমস্ত দিন-রাত অধিকার করে রাখত। ইচ্ছা হ'ত স্যাকস ছেড়ে শীলা নিজেকে সাজাক লালপাড় একটি শাড়ি, সিঁদুর টিপে। ম্যাডোনা হয়ে বসুক সে শিশুকে বক্ষ-পীযুষ পান করাতে। ক্ষণে ক্ষণে এই নারী আবিভূতা হোক জীবন ভরে নতুন নতুন রূপে। সেবায়, সৃষ্টিতে, প্রেমে লোভনীয়া, অপ্রাপনীয়া হয়ে উঠুক শীলা।

শীলা তো জানতো না দৈত্যকে ঘুম পাড়াবার বশ করবার মন্ত্র। মনকে বাদ দিয়ে শরীর নিয়ে কারবার যার, সে কি কখনোই সে মন্ত্র জানতে পারে? সিদ্ধার্থকে শান্ত করতে পারল না শীলা, বরং নয়নতারার ছেলের মধ্যে জাগিয়ে দিল দিবাবিন্দুকে। আর সেই ভয়ানককে সহ্য না করতে পেরে পালিয়ে গেল বাঁধন কেটে।

বিকট বিরাট মরুভূমির তৃষ্ণা নিয়ে যে দৈত্যটা জেগে উঠেছিল সিদ্ধার্থর মধ্যে, কুড়ি বছর ধরে যে নিরঙ্কুশ হয়ে ছুটিয়েছে তার অমিতাচারের রথ, এতদিনে যেন একটু শ্রান্তি এসেছে তার মনে। চোখের কোণে ঘুমের আবেশ, জল নামছে ঝিরঝির করে, তৃষ্ণা-জুড়ানো ঠাণ্ডা জল।

একটি মেয়ে। চব্বিশ বছরের ক্ষীণ তনু, শুকনো মুখ। গরম ভাত তুলে দিচ্ছে থালায়, শরবৎ আসতে দেরি হ'লে পথের দিকে চোখ পাতা, ছুটে আসা গাড়ীর হর্নের শব্দ শুনে।

মনের কোন্ গভীর শয়নে মূছিত নাধুর্যের ঘুম ভেঙেছে, একটু একটু ক'রে উঠে আসছে উপরতলায়। কন্যাকে কেন শ্রী বলে? নয়নের অমৃতবর্তিকা? যদি একটি মেয়ে থাকতো সিদ্ধার্থের—সুমিতশ্রী, সস্মিতমুখী মেয়ে। কেবল দরজায় দাঁড়িয়ে থাকতো না, দৌড়ে এসে গলায় পড়তো। শত কৈফিয়ৎ তলব করতো দেরি করে ফিরবার জন্য। দেবযানী শুধুই পোষ্য। সর্বদা ত্রস্ত হয়ে থাকে, কিন্তু ওই বাড়ীতে টেনে আনছে আজকাল সিদ্ধার্থকে। ভাল, বড় ভাল মেয়েটি।

'বেড়াতে গেলে হয়, বিশ্রাম পাবেন তা' হলে।'

'আসল কথাটা কি জান—' চুরুটের এক মুখ ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললেন ডাক্তার বোস—'ডক্টর রায়ের মানসিক বিশ্রামই বেশী দরকার। উল্কার মতো চলছেন, শরীর যা খাটছে, মনকে খাটাচ্ছেন তার চেয়ে অনেক বেশী। ওঁর কেবল ওঁর নয়, এ বয়সের প্রত্যেক পুরুষেরই দরকার হয় একটা ভাল রকম সংসারের। ছেলেমেয়ে।' অবশ্য তুমি তো ওঁর মেয়েরই মতো।' দেবযানীর দিকে চেয়ে ছোট একটু হাসলেন ডাক্তার।

ডাক্তার বোসের চেম্বারে এসেছিল দেবযানী। ভয়ানক খাটছেন সিদ্ধার্থ গত তিন মাস ধরে। কি একটা নতুন জিনিষ বের করবে কোম্পানী। দিন-রাত তাই ল্যাবরেটরীতেই পড়ে থাকেন। চেহারা খারাপ হয়েছে। লোহার মতো শরীরে যেন অবসাদের চিহ্ন। কলকাতায় থাকলে বিশ্রাম হবে না, এ তো জানা কথাই। এবং তাই বললেন

Phone
34-1661/2
34-3923

Telex
391

Cable
DHARMIK

With the Compliments of :-

BANIJ UDYOG PRIVATE LTD.

IMPORTERS,
EXPORTERS,
INDENTING
&
COMMISSION
AGENTS

P15, NEW C. I. T. ROAD,
(off India Exchang Place)
CALCUTTA-12.

ডাক্তার। কি, কি বলছেন উনি? মেয়ের মতো দেবযানী সিদ্ধার্থ রায়ের? আহা, কি বা-কথার শ্রী! মেয়ের মতো—। ওর মতো একটা মন্ত মেয়ে থাকতে পারতো যেন সিদ্ধার্থর। এমন রাগ হয় আজে-বাজে কথা শুনলে। যাক গে। দরকারী কথা শেষ করলো দেবী।

'পুরী—পুরী গেলে কেমন হয়?'

'পুরী তো ভাল। ওঁকে স্যুটও করবে। ছটফটে স্বভাব তো, সমুদ্রের সঙ্গে কুস্তি করে সময় কাটাতে পারবেন। ও সব পাহাড়-ফাহাড়ে অসুবিধা কি জান—ওভারকোট চাপিয়ে সকাল-বিকেল বেড়ানো—ক'দিনেই অধৈর্য। ফের কলকাতা।'

'ঠিক আছে, পুরীই যাবো।'

হ্যাঁ, আবদার করে ধরে পড়, শুনবেন। বাইরে অত শক্ত দেখলে কি হবে, ভেতরে ভেতরে ভারী নরম মানুষটা। অফিসের স্টাফ তো প্রাণ দিতে পারে ম্যানেজিং ডিরেক্টরের জন্য। কেবল—' ভ্রূ কুঁচকে থেমে গেলেন ডাক্তার বোস। না, ও সব আলোচনা করা যায় না দেবযানীর সঙ্গে। তবে ভালই হয়েছে এ মেয়েটা থেকে। একটু বাৎসল্য-টাৎসল্য আসবে মনে, এই আর কি। বুড়ো বয়সে দরকার সেন্টি-মেন্টের।

সারাদিন ধরে ভাবল দেবযানী কি করে কথাটা বলবে। মনে মনে যা তৈরী হয়, মুখে উচ্চারণ করে দেখে কেমন যেন ছেলেমানুষী হয়ে যাচ্ছে। চব্বিশ বছরের একজন মহিলা একটা দরকারী কথা আলোচনা করছেন, এমন একটা গাম্ভীর্য আনা যাচ্ছে না। সেদিন, তার পরও দুদিন, সমস্ত রাত-দিন বাইরে কাটালেন—সিদ্ধার্থ। চতুর্থ দিনে বাড়ী এলেন সন্ধ্যাবেলা। দাড়ি কামানো হয়নি, রুক্ষ চুল। অনন্ত জানাল—আরকও খেয়েছে হুজুর ক'দিন প্রাণ ভরে।

ভীষণ রাগ হ'ল দেবযানীর। আশ্চর্য মানুষ, একটুও মায়া নেই নিজের উপর।

'বুঝলে কাকী, তোমার ভাই মরবে শীগগির।' বিভাকে সচেতন করতে চাইল দেবী। আদতে সেই তো আপন জন সিদ্ধার্থের। বলতে পারে না ভাইকে একটু সাবধানে থাকতে?

'মরবে? কি করে জানলি তুই? ডাক্তার বলেছে বুঝি? প্রেসার বেড়েছে? ভালই হয় ওটা মরলে।' খুশী হয়ে বলল বিভা।

কি বিশ্রী। 'উনি মরলে খুশী হও তুমি? তাহ'লে থাকবে কোথায়?' বিরক্ত হ'ল দেবী।

'আমার আবার থাকা। তোর বিয়েটা হলেই বাঁচি, নবু কি আর দেবে না একদলা একবেলার পিণ্ডি, তুই কি ফেলে দিবি আমাকে?'

ঘর ছেড়ে চলে গেল দেবযানী। সাধ করে আর অমন হয়ে গিয়েছেন উনি। এই ত সব আত্মীয়-স্বজনের নমুনা।

'কি, ভাল?' তিনদিন পর দেবীকে দেখে সিদ্ধার্থর শরীরের উপর দিয়ে।

'তোমার পাঠানো খাবারগুলো বিশেষ খেতে পারিনি কিন্তু, অন্তাটাই সব শেষ করেছে। কি রকম চেহারার জৌলুষ বেড়েছে ওর দেখছ তো? খাটটা ওধারে সরিয়েছ?'

শোবার ঘরের চেহারা বদল দেখতে দেখতে বললেন সিদ্ধার্থ।

'ঘরটা অন্য রকম দেখাচ্ছে। ভাল লাগে না?'

'তা তো লাগছে। তোমাকেও অন্য রকম দেখছি, চুপচাপ কেন?'

'আপনি বাড়ীতে মোটে আসলেন না এত দিন।' ভারী গলা, নীচু চোখ দেবীর।

'এতদিন? কতদিন? চল খেতে দেবে। ভারি খিদে পেয়েছে। এখন কিন্তু তোমার পলতার ঝোল খাবো না।'

হেসে ফেলল দেবী:

'রাতে বুঝি পলতার ঝোল হয় কখনো?'

'হয় না? কি হয় তবে?'

কোলের উপর তোয়ালে টেনে নিলেন সিদ্ধার্থ।

'আবার কালকেও বাইরে থাকবেন সমস্ত দিন?' জলের গ্লাসটা কাছে এগিয়ে দিতে দিতে জিজ্ঞেস করল দেবী।

'নাঃ, কাল আর নয়। এখন ক'দিন ছুটি নেব।'

'ছুটি।' চোখ চকচক্ করে উঠল দেবীর।

With best compliments from :-

Mahesh Industries Corporation

65, Cotton Street, Calcutta-7

Gram : Mahindust **Phone : 33-1407**

Works : 24, B. T. Road, Kamarhatty.

Manufacturers of :-

Tar Boilers, Asphalet Mixers, Sheepfoot Rollers
Trailers, Tipping Wagons and fabricators.

বিশ্ববিখ্যাত
জ্যোতির্বিদ

জ্যোতিষ-সম্রাট, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য জ্যোতির্ণব, তন্ত্রবিশারদ রাজজ্যোতিষী এম্‌-আর-এ-এস্‌ (লণ্ডন) প্রেসিডেন্ট অল ইণ্ডিয়া এষ্ট্রোলজিক্যাল এণ্ড এষ্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটী (স্থাপিত ১৯০৭ খৃঃ) ইনি দেখিবামাত্র মানব জীবনের ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান নির্ণয়ে সিদ্ধহস্ত। হস্ত ও কপালের রেখা, কোষ্ঠী বিচার ও প্রস্তুত এবং অশুভ ও দুষ্টগ্রহাদির প্রতিকারকল্পে শান্তি-স্বস্ত্যয়নাদি, তান্ত্রিক ক্রিয়াদি ও প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ কবচাদির অত্যাশ্চর্য্য শক্তি পৃথিবীর সর্বশ্রেণী (অর্থাৎ **ইংলণ্ড, আমেরিকা, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, চীন, জাপান, মালয়, সিঙ্গাপুর, জাভার** মনীষীগণ) কর্ত্তৃক প্রশংসিত। বহু **পরীক্ষিত কয়েকটি অত্যাশ্চর্য্য কবচ**

(জ্যোতিষ-সম্রাট)

ধনদা কবচ—ধারণে অল্পায়াসে প্রভূত ধনলাভ, মানসিক শান্তি, প্রতিষ্ঠা ও মান বৃদ্ধি হয়। (সর্বপ্রকার আর্থিক উন্নতি ও লক্ষ্মীর কৃপালাভের জন্য প্রত্যেক গৃহী ও ব্যবসায়ীর অবশ্য ধারণ কর্ত্তব্য) সাধারণ ব্যয়—৭-৬২, শক্তিশালী, বৃহৎ ২৯—৬৯, মহাশক্তিশালী ও সত্বর ফলদায়ক—১২৯—৬৯ **সরস্বতী কবচ**—স্মরণশক্তি বৃদ্ধি ও পরীক্ষায় সুফল ৯·৫৬ বৃহৎ—৩৮·৫৬ **বগলামুখী কবচ**—ধারণে অভিলাষিত কর্ম্মোন্নতি, উপরিস্থ মনিবকে সন্তুষ্ট ও সর্বপ্রকার মামলায় জয়লাভ এবং প্রবল শত্রুনাশ। ব্যয় ৯·১২ বৃহৎ শক্তিশালী ৩৪·১২, মহাশক্তিশালী ১৮৪·২৫ (এই কবচে ভাওয়াল সন্ন্যাসী জয়ী হইয়াছেন)। **মোহিনী কবচ**—ধারণে চিরশত্রুও মিত্র হয়, ১১-৫০, বৃহৎ ৩৪—১২ মহাশক্তিশালী ৩৮৭—৮৭।

গুণমুগ্ধ কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি

হিজ্ হাইনেস্ মহারাজা আটগড়, হার হাইনেস্ মাননীয়া ষষ্ঠমাতা মহারাণী ত্রিপুরা ষ্টেট, কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মাননীয় স্যার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় কে-টি, সন্তোষের মাননীয় মহারাজা বাহাদুর স্যার মন্মথনাথ রায়চৌধুরী কে-টি, উড়িষ্যা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মাননীয় বি,কে,রায়, পশ্চিমবঙ্গের প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শ্রীঅজয়কুমার মুখার্জ্জী, কলিকাতা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রীশঙ্করপ্রসাদ মিত্র, আসামের মাননীয় রাজ্যপাল স্যার ফজলআলী কে-টি, কলিকাতা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি মঃ জে, পি, মিত্র

প্রশংসাপত্র সহ ক্যাটালগের জন্য লিখুন। হেড অফিস ৫০-২, (ব) ধর্মতলা ষ্ট্রীট (প্রবেশ পথ ৮৮।২, ওয়েলেসলী ষ্ট্রীট) "জ্যোতিষ-সম্রাট ভবন", কলিঃ—১৩। ফোন : ২৪-৪০৬৫। সময়—বৈকাল ৫টা—৭টা। **ব্রাঞ্চ অফিস**—১০৫, গ্রে ষ্ট্রীট, "বসন্ত নিবাস", কলিকাতা—৫ ফোন : ৩৫-৩৬৮৫। সময়—প্রাতে ৯টা—১১টা।

মহিলার সব পদমর্যাদা ভুলে, একেবারে ছেলে-মানুষের মত বলে ফেলল সে—

'বেড়াতে গেলে হয় তা'হলে।'

'বেড়াতে? বেড়াতে যাবে?' খাওয়া বন্ধ করে দেবযানীর দিকে চাইলেন সিদ্ধার্থ। 'কোথায় যেতে চাও?'

শোন, কথা। দেবী বুঝি বেড়াতে যাবে! কিন্তু প্রসঙ্গ যখন উঠেছে তখন সুযোগ হারালে চলবে না। 'পুরী গেলে হয়।' মরিয়া হয়ে বলে ফেললো দেবী। কানগলা গরম।

'পুরী? সমুদ্র দেখনি?'

সমুদ্র! হাসি পেল দেবযানীর। কত কি-ই দেখেছে সে, বাকী কেবল সমুদ্র দেখা!

'বেশ, পুরী। ঠিকঠাক করে ফেল, কালকেই যাব।' খাওয়া শেষ করে উঠে পড়লেন সিদ্ধার্থ, এবার শোবেন।

ভর পেল দেবযানী। কি বললেন উনি, কিছু বোঝা গেল না। ঠিকঠাক করে ফেলবে দেবী? কি ঠিক করবে? ওঁর জামা-কাপড়, চাদর-বিছানা? সুটকেশ-হোল্ড অল? রাত ভরে অস্বস্তি। কিন্তু সব-পরিষ্কার হ'ল সকালবেলা। বোনকে দেখতে এসে চেয়ারে বসলেন সিদ্ধার্থ।

'কেমন আছিস? চল্ আজ রাতের ট্রেনে পুরী।'

পুরী! চমকে গেল বিভা। পুরী—জগন্নাথ শ্রীক্ষেত্র। পুরী যেতে বলছে দাদা?

'কি, চেয়ে আছিস বোকার মতো, কথা বুঝতে পারিস না? পুরী হতে বেড়িয়ে আসবি। বেশী পোঁটলা-পুঁটলি বাঁধিস নে।'

চলে গেলেন সিদ্ধার্থ। শোনা গেল ভারী পায়ের শব্দ।

সত্যি কথা বলেছিল ডাক্তার। সমুদ্র ভুলিয়ে রাখল ব্যস্ত মানুষটাকে। সকালবেলা ধনুস্তরীর সোনার কলস উঠে আসে সমুদ্রের বুক চিরে। তোয়ালে জড়িয়ে দু' ঘণ্টা স্নান, চিলকা, কোণারক। ভুবনেশ্বরও হ'ল একদিন। বিভার আটকে-টাটকে বাঁধা শেষ, হরিদাস মঠের এক কৌপীনবন্তকে ধরেছে সে। মন্ত্র নেবে।

'কি? কেমন লাগছে?' বেড়াতে বেড়াতে একটা দোকানের কাছে দাঁড়ালেন সিদ্ধার্থ। কালো হলুদ সাদা ঝিনুক মিশিয়ে মালা।

'নাও মালা।'

'ওমা! মালা দিয়ে কি করব আমি?'

'কেন? পরবে।'

'ও তো বাচ্চারা পরে।'

'তাই বুঝি? বুড়ি হয়ে গিয়েছ তুমি? নাও, পর।'

অগত্যা একটু লাল হয়ে, মনে মনে বিস্তর আপত্তি জানিয়ে দেবযানী পরল একটা মালা। মালা পরা দেখতে দেখতে হঠাৎ সিদ্ধার্থ দেখতে পেলেন, হার নেই দেবীর গলায়। তাই তো, কোনো গয়নাই নেই যে ওর। হাত গলা কান সব নিরাভরণ। কলকাতা ফিরে—

'এস বসি একটু, অনেকটা হাঁটা হয়েছে।'

একটু উপরের দিকে উঠে এলেন সিদ্ধার্থ। এতক্ষণ হাঁটছিলেন সমুদ্রের পাড় ঘেঁষে। বারে বারে ফেনা ভিজিয়ে দিচ্ছিল পায়ের পাতা, দেবীর শাড়ি।

হাঁটুর উপর থুতনি রেখে বসল দেবযানী। চাঁদ উঠেছে, একফালি জ্যোৎস্না এসে পড়েছে দেবীর বুকের শাড়িতে, ঝিনুকের মালাটি যেখানে একটু দুলে রয়েছে তার উপর।

'শুকুপক্ষে সমুদ্র ভারি সুন্দর', বললেন সিদ্ধার্থ।

'কৃষ্ণপক্ষে ভাল নয়?' দেবী জিজ্ঞেস করল।

'ভাল, কিন্তু কি জান—একেই তো মহা সোরগোল করছে সব সময়, তার ওপর যদি আবার অমাবস্যার চাদর মুড়ি দেয় সমুদ্র, তা'হলে কেমন যেন ভয় ভয় করে।'

ঠিক ওঁর মতো! মনে মনে বলল দেবী। কি চমৎকার, আবার মাঝে মাঝে ভীষণ গম্ভীর। ভয় করে তখন।

'বাদাম খাবে? এই বাদাম।'

—'আপনি খাবেন?'

—'আমি? দাঁত পড়ে যাবে যে। নাও।'

হাত পেতে বাদাম নিল দেবযানী। কিন্তু মুখে দিল না। আহা, কত যেন দাঁত নড়ছে! মাংসের হাড় ভাঙেন মড় মড়, তখন কিছু হয় না দাঁতের। কি যে অভ্যাস—সব সময় বয়েস গুণে কথা বলা।

'আপনি অনেকবার পুরী এসেছেন?'

—'তা এসেছি বার কয়েক। কিন্তু প্রথম বারের মতো অত ভাল কখনোই লাগে না। তোমার ভাগ্য—এই বয়েসে প্রথম দেখলে সমুদ্র।'

এই বয়েস! কি রকম বয়েস আবার সমুদ্র দেখতে লাগে? ভাবল দেবী: 'আপনি কত বছরে দেখেছেন প্রথম?'

'আমি? আমিও তখন প্রায় তোমার বয়সীই ছিলাম। আমার মা'—গলা পরিষ্কার করলেন সিদ্ধার্থ—

'আমার মায়ের অস্থি সমুদ্রে বিসর্জন দিতে এসেছিলাম।'

'মা—আপনার মা?'

'হ্যাঁ, মা খুব সমুদ্রের কথা বলত। সব রকম জলই ভালবাসত মা। নালা, ডোবা, নদী, সমুদ্র—সব।'

আস্তে আস্তে মায়ের কথা অনেক বললেন সিদ্ধার্থ দেবীর কাছে। কখনো, কোনোদিন যে কথা কাউকে বলেন নি, তাই বললেন। নিজেও জানতেন না মায়ের স্মৃতি এমন উজ্জ্বল হয়ে আছে এখনো বুকের মধ্যে। প্রথম সুযোগেই এতদিন পরে সব বের হয়ে এল।

একটি অল্পবয়সী, মেয়ের বয়সী মেয়ের কাছে মর্মকথা বললেন সিদ্ধার্থ। কান পেতে শুনলো দেবী।—আহা! মাকে বড় ভালবাসেন উনি।

সমুদ্রপাড় ছেড়ে দশটায় হোটেলে এলেন সিদ্ধার্থ।

এত রাত। একটু বিরক্ত বিভা। অবশ্য সেও ফিরেছে এক্ষুণি নামকীর্তন শুনে।

'তোমাদের মায়ের গল্প শুনছিলাম, বুঝলে কাকী।' শুতে শুতে বলল দেবযানী।

মায়ের গল্প। হঠাৎ সমুদ্র থেকে উঠে এল একটা নোনা ঝাপটা, উড়িয়ে নিয়ে গেল পীক্ষেত্রের মাহাত্ম্য, গোস্বামী মঠের প্রশান্তি।

ভালই কাটল পনেরোটা দিন। বিভার হাট শান্ত। দেবযানী তিনবছর একসঙ্গে সঙ্গে থেকেও যা হয়নি, তা হ'ল পনেরো দিনে। অনেকটা কাছে চলে এসেছে সিদ্ধার্থর।

দেবীর বিয়ের কথা ভোলেনি বিভা। একদিন গরদের চাদর গায়ে জড়িয়ে সে চলে এল নবেন্দুর বাড়ী। বিধিমত প্রস্তাব পেশ করল নবুর মায়ের কাছে

বড়লোক মা হ'লেও বড়লোকের বোন বিভা—তারই দেওর-ঝি। মেয়ে বললেও হয়। ও ছাড়া কে আছে আর দেবযানীর? লোভে চক্‌চক্ করল মায়ের চোখ। পাওনা-থোওনা চবে ভালই।

নবেন্দুর টাইপে সেদিন ভুল হ'ল বারে বারে। বড় সাহেব বর সঙ্গে একটা বিরাট আত্মীয়তা স্থাপন করে, উল্লাসিক হয়ে রইল সহকর্মীদের প্রতি।

'দেবী, শোন্, নবুকে দিয়ে টাইপ করাচ্ছে দাদা। একটু খেতে দে ভাল করে।' দেবযানীকে চুপি চুপি ডেকে বলল বিভা।

'ও তো খেয়েছে চা।'

'খেয়েছে? ইস্! আগে মনে হ'ল না, এ ঘরে ডেকে খেতে দিতাম মালপোয়া। রাধা-গোবিন্দের ভোগ দিয়েছি। বুড়োটা আছে নাকি ওখানে? না থাকলে ডেকে পাঠাব।'

'উনি স্নান করতে গিয়েছেন।' চলে গেল দেবী। কাকীটা একদম বাজে। নিজের ভাইকে কেবল বুড়ো বুড়ো।

ক'দিন ধরেই দেবীর জন্য কিছু গয়না কিনবার কথা ভাবছিলেন সিদ্ধার্থ। গুরুজন, বিভার সম্পর্ক ধরে মামা বলেই ডাকে বোধ হয় তাঁকে আড়ালে দেবী। ভারি ভাল মেয়ে, লক্ষ্মী। সন্ধ্যায় ফিরবার পথে গাড়ী থামালেন সরকারের দোকানে। চুড়ি-বালার অর্ডার। হার আর দুল কিনে নিলেন ভাল দেখে।

মেয়েদের বহু উপহার দিয়েছেন জীবন-ভরে সিদ্ধার্থ রায়, কিন্তু এমন ছলছল করে ওঠেনি বুকের মধ্যে কখনো। সুন্দর হার, সুন্দর মানাবে দেবযানীর শাঁখের মতো গলায়। গাড়ীর মধ্যে চোখ বুজে দৃশ্যটা একটু ভোগ করে নিলেন সিদ্ধার্থ। হার পরে লাজুক হাসি। একবার তুলবে আবার নামাবে চোখের পাতা। পা ছুঁয়ে একটি প্রণাম।

ঘরে ঢুকেই দেখতে পাওয়া গেল দেবযানীকে। নতুন পর্দা টাঙাচ্ছে জানালায়।

'দেবী, কি করছ? এখানে এস।'

ডাক শুনে ঘুরে দাঁড়াল দেবী, এক ঝলক আলো পড়ল, উজ্জ্বল দেখালো তাকে।

'কাছে এস, দেখ কি এনেছি তোমার জন্য।'

'আমার জন্য?' ঘরের মাঝখানে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল দেবী। অগোছালো চুল কপালে, অবিন্যস্ত শাড়ির আঁচল।

দেবী কাছে আসবে না বুঝে নিজেই এগিয়ে গেলেন সিদ্ধার্থ। একেবারে সামনে এসে, একটু ঝুঁকে হারটা পরিয়ে দিলেন গলায়, কণ্ঠটি বেড়লো কণ্ঠমালা, লকেট দুলতে লাগল মৃদু মৃদু। একটা চুলের গুছি উড়ে এসে লাগল সিদ্ধার্থের কপালে, নিশ্বাস লাগল মুখে।

'বাঃ! সুন্দর দেখাচ্ছে, এত রোগা কেন তুমি?' হঠাৎ কি মনে হ'ল, হাত বাড়িয়ে সিদ্ধার্থ টিপে দিলেন দেবীর গাল।

নিমেষে রক্তবর্ণ হ'ল দেবীর মুখ এক বার বড় বড় চোখ তুলে চাইল সিদ্ধার্থর দিকে, তারপর ছুটে পালাল দোতলায় বিভার ঘরে।

'কাকী দেখ, মাইনে পেয়েছি।'

'ওমা, হার! দাদা দিল? ভালই হয়েছে, বিয়ের জন্য গয়না তো চাই কিছু। চলে এলি যে বড়? খাবার দিবিনে?'

'সব ঠিক আছে, অনন্ত দেবে, মাথা ধরেছে আমার।'

আরাম ও স্বাচ্ছন্দের জন্য—

"জয়গুরুর" নিম্নলিখিত মার্কা গেঞ্জী ব্যবহার করুন

ফিনলে—গ্রেটম্যান—

নিউলাইট—সান্‌রে—

রাজঘাট সোসাইটি—

ভেলভেট ব্রেসলেট—

এ্যাক্টর - গোল্ডেন ষ্টার—

তাজমহল - প্রিন্স অফ সিটি—

ও

২২৪০

জয়গুরু হোসিয়ারী মিলস্

পি. ২৬, স্যার রাজা রাধাকান্ত দেব লেন, কলিকাতা-৫

ফোন—৫৫-২৭৩৮

শুয়ে পড়ল দেবী। সত্যি ঝিমঝিম করছে সমস্ত শরীর, উনি, উনি কি ভাবলেন তাকে পালাতে দেখে। বোকা?

বোকা। একেবারে বোকা দেবযানী। জানে না গুরুজনদের আদরে লাল হতে নেই, পালাতে নেই বয়স্ক পুরুষের হাতের স্পর্শ পেলে; ওতে যে ঘুমন্ত বাঘকে জাগিয়ে দেওয়া হয়। ছোট মেয়েটির মতো, অবোধ কিশোরীর মতো দেবীকে স্নেহ করেছিলেন সিদ্ধার্থ। ওকে দেখতে ভাল লাগত। ভাল লাগত কাছে এলে। কে বসে বিচার-বিশ্লেষণ করেছে, প্রতি তন্তু তুলে ডিসেকশন করে দেখেছে সেই ভাল লাগার স্বরূপ। কখনো কল্পনাও করে নি অন্য কিছু সিদ্ধার্থ। দেবীর বিয়ে দেবেন একটি সুপাত্র খুঁজে তাই বরঞ্চ ভেবেছেন দু'একবার।

কিন্তু লাল হ'ল, পালাল কেন দেবী? নিমেষে যে বিপর্যয় ঘটে গেল। শিরায় শিরায় রক্ত পাগল হয়ে উঠল, দিবাবিন্দুর রক্ত। নারী-দেহের গন্ধ-স্পর্শের জন্য ঝড় উঠেছে। উত্তাল-উদ্দাম কামনার সমুদ্র।

আমাশয়ে ভুগছেন?
নূতন বা পুরাতন (এমেবিয়েসিস্) যেমনই হউক "আমমহারাজ" ব্যবহারে নিশ্চয়ই আরোগ্য। দুদিনেই ফল। ২০টি বটী ৩·৫০।
নবদ্বীপ আয়ুর্বেদীয় ফার্মেসী
১৩৭, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা-৬
ফোন: ৩৫-৭২৪৮

বন্দুক
বিবিধ আগ্নেয়াস্ত্র এবং যাবতীয় শিকার সরঞ্জামের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান।
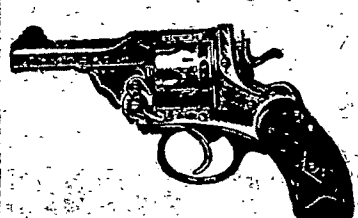
ইষ্ট ইণ্ডিয়া আর্ম্মস্ কোং
১, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৩
ফোন: ২৩-২৯৮৯ টেলিগ্রাম: ডিফেনডার

দেবীর রূপ নেই। লাবণ্যও নেই। ওষ্ঠে বক্ষে নিতম্বের দোলায় নেই আমন্ত্রণের ইসারা। স্নেহে-মমতায় ওকে সাজাতে গিয়েছিলেন সিদ্ধার্থ। মায়া হয়েছিল রোগা মেয়েটিকে দেখে। কিন্তু লাল হ'ল কেন দেবী? কেন মনে পড়িয়ে দিল ওর দেহটা নারী-দেহ—যে দেহকে নিষ্পিষ্ট, নিষ্পেষিত করে ভোগ করা যায়, দূরে ছুঁড়ে ফেলা যায় রাত্রিশেষে।

বাধা দেবে? কে বাধা দেবে সিদ্ধার্থকে যদি দেবীকে তিনি তুলে নিয়ে আসেন শয্যা হতে এই গভীর রাতে? বিছানায় উঠে বসলেন সিদ্ধার্থ। এ কি ভয়ানক তৃষ্ণা! সমস্ত অণু-পরমাণু পাগল হয়ে উঠেছে এক তুচ্ছ মেয়ের জন্য। এক্ষুণি এই মুহূর্তে চাই দেবীকে। ওর রক্ত-মাংস, প্রতি অস্থি-সন্ধি হতে শুষে নিতে হবে নির্যাস, তবে বুঝি মিটবে এই অশান্ত উন্মাদ তৃষ্ণা।

দরজা পার হয়ে বারান্দায় এলেন সিদ্ধার্থ সিঁড়ি পার হয়ে দোতলার ঘর। আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে পালিয়ে গিয়েছে সেই ঘরে দেবী। ওকে আনতে হবে। অধীর হয়ে উঠেছেন সিদ্ধার্থ। মত্ত আবেগে থর থর করে কাঁপছে প্রতিটি অঙ্গ, কিন্তু অগ্রসর হতে পারছেন না যে। একটু পা বাড়ালেই দেবী। শুয়ে আছে নিশ্চিন্তে রোগা শরীর, শান্ত চোখ নিয়ে। ওকে আড়াল করে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে নয়নতারা—যে মাকে সিদ্ধার্থ তীব্র ঘৃণা করেছেন, গভীর ভালবেসেছেন।

সমস্ত শরীর মিনতি করছে গভীর তৃষ্ণায় —দাও, দাও, পেতে দাও ছোট জলকণাটি। একটি জলকণা অজস্র, সহস্র হবে, ভিজিয়ে দেবে মরুভূমি, সব তৃষ্ণার ঘটবে অবসান।

অনেকদিন, প্রায় এক বছর পর রাত বারোটায় আবার মোটর বের করলেন সিদ্ধার্থ রায়।

অমিতাচারের বন্যায় ভেসে গেলেন সিদ্ধার্থ। জ্বলন্ত আগুন ঢালতে লাগলেন গলায়। রাশি রাশি নারী-মাংস ভোগ। মুখ শুকিয়ে বেড়ায় অনন্ত। তিনতলায় সিদ্ধার্থর সামনে আসতে পারছে না দেবী। অনবরত শোনা যাচ্ছে অনাচারের কাহিনী। মাঝে মাঝে নবেন্দুই এসে সালঙ্কারে বর্ণনা করছে সাহেবের সম্বন্ধে এক মনোজ্ঞ বিবরণ।

কোন ব্যারিস্টার সাহেবের বৌকে নিয়ে নতুন কেলেঙ্কারি। ব্যারিস্টার ঝানু লোক, ক ভকে থেকে ঠিক ধরেছে হাতেনাতে। কোর্ট পর্যন্ত গড়িয়েছে ব্যাপার। এক লাখ টাকা দিতে হবে খেসারত। তারপর ডাইভোর্স হয়ে গেলে হয়ত করতে হবে বিয়ে এই ব্যারিস্টারের তালাক দেওয়া বৌকেই। ধড়িবাজ মেয়েলোক, ছাড়বে না সহজে।

পত্রিকার আইন-আদালতের কলমে নাম না দিয়ে বের হচ্ছে এক শিল্পপতির, এক মহা পণ্ডিতের ব্যাভিচারের কাহিনী। কাটতি বেড়ে গিয়েছে কাগজের। প্রতি মঙ্গলবারে কাগজ এনে পড়ে নবেন্দু, মালা জপ করতে করতে বিভা শোনে। বিয়ের প্রস্তাব হবার পর হতে বিভার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বেড়ে গিয়েছে নবেন্দুর। সিদ্ধার্থ রায় বাড়ী থাকেন না প্রায়, সুতরাং অবাধ আলোচনা চালাতে বাধা নেই। দেবযানী বাথরুমে দরজা বন্ধ ক'রে কাঁদতে থাকে। কেন, কেন এমন হল। এখানে কত-দিন ধরে আছে। আগে কি ছিল জানে না দেবী, কিন্তু গত তিন বছরে তো দেখেনি সে কোনো ব্যাভিচার, অনাচারের চিহ্ন। গরীব হলেও নিজের বাড়ীতে অনেক সময় সুখে থাকে মানুষ। সুখ কাকে বলে, স্বস্তি কি জিনিস কুড়ি-একুশ বছরের আগে জানত না দেবী। বাবাকে দেখেনি। অবশিষ্ট এক কাকা—তার ভয়ে তটস্থ হয়ে কাটত দিন। স্কুল ফাইন্যাল পাশ করে টাইপ শিখছিল দেবী, ভেবেছিল চাকরি নিয়ে চলে যাবে এ বাড়ী ছেড়ে। মা একদিন মারা গেল, কাকাও জানতে পারল দেবীর টাইপ শিখবার কথা। কি কুৎসিত গাল সেদিন দিয়েছিল কাকা, তা মনে করলে আজ পর্যন্ত কান গরম হয়ে ওঠে। সদ্য মাতৃ-বিয়োগের দুঃখকে সংজ্ঞাহীন করে দিয়েছিল কাকার অশ্লীল মন্তব্য। ছেলেদের সঙ্গে এক স্কুলে টাইপ শেখা? টাইপ স্কুল তো ব্যবসা করবার জায়গা। আরো বহু জঘন্য উক্তি, শারীরিক নির্যাতনও কিছু সহ্য করতে হয়েছিল। পুরুষ সম্বন্ধে দেবীর আতঙ্ক শিশুকাল হতে। কাকীর বাবা পুরুষ, পুরুষ নিজের কাকা। লাল চোখ ময়লা জামা-কাপড়। কি কুৎসিত ভাষা, অঙ্গভঙ্গী। পুরুষ দেখলে ভয়ে কাঠ হয়ে যেত দেবযানী। মরবার কিছুদিন আগে তার একটা বিয়ের ব্যবস্থা করেছিল কাকা, নিজের মতো এক নরপশুর সঙ্গে। কাকী না থাকলে হয়তো হয়ে যেত বিয়ে। কিন্তু নির্দয় মার খেয়েও কাকী ভেঙে দিয়েছিল সম্বন্ধ। কাকীর জিভেও বিষ, সেই বিষের সামনে কাকার হার মানতে হয়েছিল। অবশ্য তখন রোগে ভুগে কিছু কাহিল ছিল শরীর।

কাকার মৃত্যুর কিছুক্ষণের মধ্যেই কাকীর ভাই সিদ্ধার্থ রায় মস্ত গাড়ী করে নিতে এলেন তাদের। ঠাণ্ডা হয়ে গেল দেবীর সমস্ত শরীর একটা ভীষণ ভয়ে। পড়শীরা ফিস্ ফিস্ করছিল—পাকুড়া বদমাইস, মদ ছাড়া জল ছোঁয় না জীবনে। দেবীর দিকে চাইছিল তারা অর্থপূর্ণ চোখে। চোখ নীচু করে বসেছিল দেবী, শুনছিল ভরাট গলায় সংক্ষিপ্ত কথা। তারপর এক সময়ে শাড়ির আঁচলে সাত পাকে ছড়িয়ে শরীর কাকীর পিছু পিছু দেবযানী গাড়িতে গিয়ে উঠেছিল। কবে যেন কিসে পড়েছিল দেবী—'আপনা মাংসে হরিণা বৈরী'—নিজের মাংসই হরিণের শত্রু। তারও। তার

ছুড়ি বছরের বয়েসটা তার শত্রু। নিজের দুর্গতি সম্বন্ধে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ ছিল না দেবযানীর। পুরুষের এক পরিচয়ই শুনে এসেছে সে জ্ঞান হবার হবার পর—হতে-নারীর প্রভু। মেয়েদের অস্থি রক্ত মাংস, ইহকাল পরকাল—সমস্ত বিক্রীত হয়ে আছে পুরুষের পায়ে। মস্ত বড় বাড়ীতে মস্ত গাড়ী করে তাদের নিয়ে যাচ্ছেন সিদ্ধার্থ। সেখানে কে রক্ষা করবে দেবীকে। কাকী? উনি তো কাকীর ভাই। সিদ্ধার্থ রায় একটা বিয়ের ছুতোও করবে না। ভাবতে ভাবতে চোখ দিয়ে জল পড়ছিল নিজের দুর্গতির ছবি কল্পনায় দেখে। তারপর চমকে উঠেছিল দেবী, এক হাতে তাকে জড়িয়ে ধরেছেন সিদ্ধার্থ। বাড়ী পর্যন্ত পৌঁছাবার তর সয়নি তাঁর। কিন্তু না না, মিথ্যে অত চমকেছে দেবযানী। গাড়ীর দরজা ভাল ক'রে বন্ধ ছিল না, ঝাঁকুনি লেগে খুলে গিয়েছে। এক্ষুণি রাস্তায় পড়ে যেত দেবী। দেবীকে এক হাতে ধরে, একটু ঝুঁকে দরজা বন্ধ করলেন সিদ্ধার্থ। পুরুষের প্রবল নিশ্বাস লাগল দেবীর গায়ে।

বাড়ীতে পৌঁছে তাদের নিয়ে গেলেন সিদ্ধার্থ দোতলার মস্ত বড় একটা ঘরে। চাকর-ঝিদের গম্ভীর গলার দরকারী আদেশ, তারপর চলে গেলেন ঘর ছেড়ে। এতক্ষণে চোখ তুলে চাইল দেবী সেই চলন্ত মানুষটির দিকে। পিছন ফিরে সিঁড়ি দিয়ে উঠছেন ছ' ফুট লম্বা, শ্যাম-বর্ণ পুরুষ। মাথার কোঁকড়া চুল আর শক্ত চওড়া পিঠ দেখতে পেলে দেবযানী।

ভয় কাটতে গেল কিছুদিন। গলার আওয়াজ শুনলেই চমকে উঠত দেবী। বুঝি চাকরদের হুকুম করছেন দেবীকে শোবার ঘরে পৌঁছে দেবার জন্য। বিভা দুধ-ঘি খেয়ে শরীরটা সারিয়ে ফেলল কিছুদিনের মধ্যে। কিন্তু হার্ট ট্রাবল শুরু হ'ল। বুক-ধড়ফড় দিন-রাত। ব্যস্ত হয়ে ডাক্তার ডেকে আনলেন কাকীর দাদা। তারপর চুপ করে গেলেন। ক্রমে দেবীও বুঝল মনের অসুখ কাকীর। ছোট হতে সারাদিন পরিশ্রম ক'রে অভ্যাস, ভাল লাগে না দিনরাত বসে থাকতে। ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল দেবী। বিশৃঙ্খলার শেষ নেই। হরদম কাপড় হারাচ্ছে ধোবা; ভীষণ গরমে পেঁয়াজ-রসুন-লঙ্কা দিয়ে মাংস রাঁধছে বাবুর্চি মার্কা ঠাকুর। দু'টো ফ্রীজিডেয়ার, তবু ফল পচে যাচ্ছে বারমাস।

আস্তে আস্তে কি করে যেন সব ব্যবস্থা চলে এল দেবীর হাতে। সিদ্ধার্থ রায়কে দেখতে পেল ভাল করে। কাকীর অসুখের প্রশ্ন করেছিলেন সিদ্ধার্থ দেবীকে ডেকে। শক্ত চোয়াল, খাড়া নাক। কি গভীর চোখের দৃষ্টি। খারাপ মানুষ? মদ খায়? মেয়েদের সম্মানের দাম নেই ওঁর কাছে? বাজে, একদম বাজে। মিথ্যে কথা সব। অমন ছলছলে করুণ চাখের চাওয়া যাঁর তিনি কখনো খারাপ

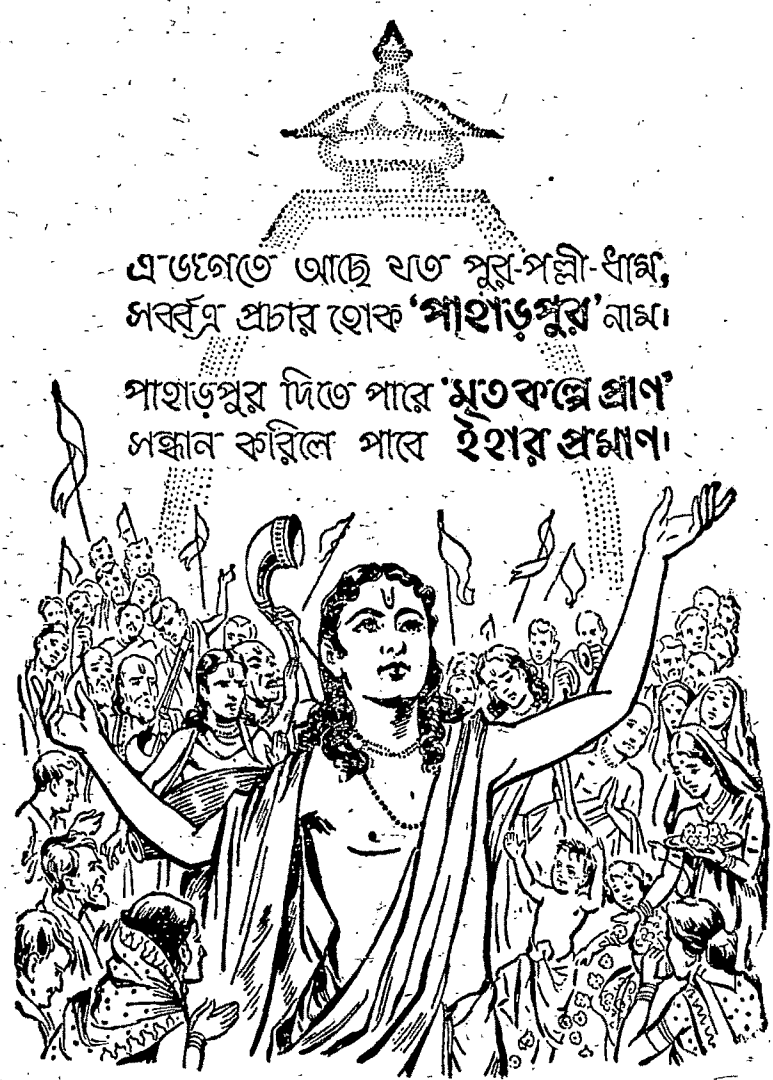

হতে পারেন? পৃথিবীটাই যে ভীষণ খারাপ। ভালকেও খারাপ বানায়। সেই যে প্রথম দিন—আর একটু হ'লেই রাস্তায় পড়ে টুকরো টুকরো হ'ত দেবী, উনি বাঁচিয়েছিলেন অপমৃত্যুর হাত হতে। জীবন বাঁচিয়েছেন দেবীর। প্রতিদানে কি দেবে দেবী? কৃতজ্ঞতা ধন্যবাদ, সেবা?

দিনে দিনে ভালবাসল সিদ্ধার্থকে দেবযানী। তার গলার স্বরে দুরু দুরু করে উঠত বুকের মধ্যে, দৃষ্টিতে জাগত রোমাঞ্চ।

বাইশ বছরের মেয়ে ভালবাসল একটি আটচল্লিশ বছরের প্রৌঢ়কে—এ কি অসম্ভব ব্যাপার। কেন, অসম্ভব কেন? প্রাজ্ঞ শালকে

৺শারদীয়ার সাদর সম্ভাষণ গ্রাহকদিগকে জানাইতেছি—

ইঞ্জিনের পার্টস, পাম্পিংসেট, ইলেকট্রিক মোটর ও সুইচ, ধানকল, আটাকল, চিড়া-কুটা মেসিন ও তাহার পার্টস আমরা সর্বদা বিক্রয়ার্থ মজুত রাখি। বটনমিল, জুটমিল ও কোলিয়ারির যাবতীয় ষ্টোরস্ সরবরাহ করি। মফঃস্বলের ক্রেতাদিগের একমাত্র শ্রেষ্ঠতম পরিবেশক। আপনাদের সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

ভরদ্বাজ মেসিনারী
সাপ্লাই এজেন্সী
২০, নেতাজী সুভাষ রোড, (একতলা)
কলিকাতা-১
ফোন: ২২-২৮৫৫

জড়িয়ে তবে কেন মকুলিতা হয় তরুণী মাধবী? রসালের সোহাগে কেন গলে পড়ে স্বর্ণলতিকা? যখন চোখ তুলে তাকান সিদ্ধার্থ, সেই গভীর কালো চোখ, যখন মৃদু হাসেন কঠিন সূক্ষ্ম অধরে তখন তাকে ভালবাসে দেবী, ভালবাসে সেই হাত দু'টি, যে হাতে প্রথম জড়িয়েছিলেন তাকে।

তরুণী মেয়ের ভালবাসা কি কেবল সেবা করে, কাছে দাঁড়িয়ে তৃপ্ত হয়? আরো কাছে আসতে চায় দেবী, একেবারে কাছে। একা বিছানায় দুপুর রাতের স্বপ্নে দেবযানী দেখে বেনারসী সিঁথিমৌড়ে সেজে সিদ্ধার্থির পিছন পিছন সে গিয়ে পৌঁছেচে তিনতলার দক্ষিণ খোলা মস্ত ঘরটিতে। শুভ্র সুন্দর প্রশস্ত শয্যা, কঠিন দৃঢ় বাহুপাশ। অসহ্য সুখের অনুভূতিতে ঘুম ভেঙে যায় দেবীর। বিহ্বল চোখ চেয়ে দেখে তিনতলার ঘরে তখনো আলো জ্বলছে।

কি হ'ল? কেন এমন হয়ে গেলেন সিদ্ধার্থ! এ যুগে তপস্যা আছে? তা'হলে অনাহারে অপর্ণা হয়ে তপস্যা করত দেবী, নিত কলঙ্কভঞ্জন ব্রত। হায় রে সুন্দর সেকাল! কেন হারিয়ে গেল পুঁথির পাতার সেই সত্যযুগ? সব সাধনার সিদ্ধি মিলত তখন, নারায়ণকেও বৈকুণ্ঠ ছেড়ে নামতে হ'ত পৃথিবীতে। চোখের জল মুছতে মুছতে কালো হয়েছে দেবীর চোখের কোল। রাগ করল বিভা—

'কি-ছিরি হচ্ছে তোর দিন দিন দেবী? বিয়ে সামনে, নিত্যি আসছে নবু। তোকে দেখে যদি বিগড়ে যায়?'—

—'যায় যাবে।' ঝাঁঝিয়ে চলে যায় দেবী কাকীর সামনে হতে।

বারে বারে ঘুঘু তুমি খেয়ে যাও ধান, এইবার ঘুঘু তব বধিব পরাণ। হাজার টাকা করে রোজ টাকা খরচ হচ্ছে মামলার জন্য। পাপের ধন প্রায়শ্চিত্তে যাচ্ছে। পাপের ধন নয়? ওই হ'ল। ব্যবসার টাকা, পাপেরই ধন। মানুষকে না ঠকালে টাকা হয় ব্যবসাতে? যাকগে। গুরু গুরু। পার কর কৃষ্ণচন্দ্র। এখন দেবীর বিয়েটা হ'লেই বাঁচে বিভা। নিষ্কৃতি পায় পাপপুরী হতে। তা নবুও বড় সেয়ানা ছেলে। টাকার খাঁকতি। টাকা-পয়সা হাতে না পেয়ে মুকুট দেবে না মাথায়।

'শুনেছিস তুই দেবী? বুড়োর জরিমানা হয়েছে নাকি এক লাখ টাকা! সেই যে ফটফটে ইংরেজী বলা মেয়েমানুষটা আসত দাদার সঙ্গে কতদিন? ও তো একটা ব্যারিস্টারের বৌ। মহা চালাক স্বামী-স্ত্রী। এমন জড়িয়েছে যে, জরিমানায় টাকা না দিলে জেল হবে। ভালই হয় ওর জেল হলে। কিন্তু তোর বিয়ের টাকাটা পাই কোথা! শোন—'এবার গলা খাটো করল বিভা: 'দাদার আয়রণ সেফের চাবি-টাবি তো থাকে তোর জানা জায়গায়, টাকা নেই নগদ ওখানে?'

ছট্ ফট্ করে উঠে পড়ল দেবী। কি করবে, কোথায় যাবে! একটা সংবাদ পাওয়া তো দরকার। খুঁজে বের করল অনন্তকে —'অনন্ত!'

'কি বলছ দিদি?' শুকনো মুখ অনন্ত দাঁড়াল সামনে এসে।

'ওঁর কেস করছে যে উকিল, তার বাড়ী জান?'

'জানি। উকিল নয়, ব্যারিস্টার। তিন নম্বর সিলভি প্লেসে বাড়ী। হুজুরের সঙ্গে গিয়েছি দু'তিন বার।'

'আমাকে সেখানে নিয়ে যাবে?'

তোমাকে?' আঁৎকে উঠল অনন্ত। 'হুঁশে কর। অমন কথা ভেব না। আরো কেলেঙ্কারির কথা উঠবে তা হ'লে।'

তা উঠবে—মনে মনে বুঝল দেবী। কিন্তু একটা খবর।

বিকেলে নবেন্দু এল। বিভা স্নান করছে, চা নিয়ে গেল দেবযানী।

'একি! আপনি, তুমি, তুমি কেন?' অনেকটা কেসে ফেলল নবেন্দু।

'কাকী স্নান করছে।' শান্তগলায় বলল দেবী। একটু চুপ চাপ। চা খেতে খেতে চোর চোখে দেবীর দিকে চাইতে লাগল নবেন্দু—ব্যাপার কি! ব্যাপার বোঝা গেল তক্ষুণি। বেশী সময় হাতে নেই, বিভা আসবে স্নান করে।

—'আচ্ছা, ওঁর, ওঁর মকদ্দমাটার খবর কি?'

দেবীর প্রশ্নে চমকে উঠল নবেন্দু। ও! এই! এই জন্যই চা আনা হয়েছে শ্রী-হস্তে! তা অমন কৌতূহল স্বাভাবিক।

'ফাইন হয়েছে নাকি এক লাখ টাকা?' জানতে চাইল দেবী।

'কে বলল? বিভাদি? বিভাদির যত বাড়ানো কথা। মামলাই এখন পর্যন্ত শেষ হয় নি। আন্দাজে বক মারা হচ্ছে। একগো গিনির ব্যারিস্টার সিন্‌হা আছেন ডক্টর রায়ের পক্ষে। গট আপ কেস।'

'মিথ্যে? সে কি!'

দেবীর বিস্ময়ে মজা লাগল নবেন্দুর। বাড়ীর মধ্যে থাকে, জানে না পৃথিবীর আধুনিক হালচাল। কিছু জ্ঞান দিল দেবীকে—

'কণাদ বোস তো ব্রিফ্‌লেস ব্যারিস্টার। সবাই জানে বৌকে দিয়ে ব্ল্যাকমেল করছে ও। তিন বছর আগে এক পার্শীর কাছ হতে আদায় করেছিল তিরিশ হাজার টাকা। ইদানীং মন ভাল যাচ্ছিল না স্যারের। অন্য ডিরেক্টরদের সঙ্গে বিরোধ লেগেছে ভেজিটেবল ঘিয়ের ব্যাপারে। সতর্ক ছিলেন না, তাই ফাঁদে আটকাতে পেরেছে কণাদ বোস। না হ'লে পাকা খেলোয়াড় উনি ওঁকে জব্দ করবে কে! বলে কত কাণ্ড—'

কেউ যেন দেবীর কানে গলানো সীসে ঢেলে দিচ্ছিল। বিভা এসে ঘরে ঢুকল।

হিন্দুস্থান জেনারেল ইনস্যুরেন্স

—সোসাইটি লিমিটেড—

সেবা ও নিরাপত্তার জন্য

চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর ঃ

শ্রী পি, এন, তালুকদার এম-এ (ক্যান্টাব)

—শাখাসমূহ ঃ—

বোম্বাই, মাদ্রাজ, লক্ষ্ণৌ, নয়াদিল্লী, হায়দরাবাদ (ডেকান), কোচিন, বাঙ্গালোর, কটক, ইন্দোর, আসানসোল, নাগপুর, গৌহাটী, পাটনা, জলপাইগুড়ি, কাটিহার, ঢাকা, বরোদা, ডিব্রুগড়, ধানবাদ, জামসেদপুর, কোডারমা, নওগাঁ।

হেড অফিস ঃ

হিন্দুস্থান বিল্ডিংস, কলিকাতা—১৩

অগ্নি-নৌ-মোটর এবং অন্যান্য বহুবিধ দুর্ঘটনার বীমা লওয়া হয়।

গল্প করছে দু'জনে। কি বেহায়া মেয়ে বাবা! আশীর্বাদ পর্যন্ত হয় নি—গুজ গুজ ফুস ফুস।

'কি কথা হচ্ছে?' গম্ভীর স্বর বিভার।

'এই, সিদ্ধার্থবাবুর কথা জিজ্ঞেস করছিল দেবযানী,' নবেন্দু বলল।

'হুঁ।' হঠাৎ মনে পড়ল নিজের সম্পর্কের কথা।

'ও কেন জিজ্ঞেস করবে? আমার ভাই, আমি করব। 'তোর কি?' দেবীর দিকে চাইল বিভা।

'আমার আবার কি।' দেবযানী উঠে চলে গেল।

দেবযানীর আবার কি। কিচ্ছু না। দেবী তো কেউ না সিদ্ধার্থর। কোর্ট, বিরুদ্ধ মুখের দর্শক, পত্রিকার রিপোর্টার, জজের কপালে ভ্রূকুটি। একধারে বসে, হয়তো বা আসামীর কাঠগড়ায় সিদ্ধার্থ। সেই গম্ভীর মুখ, গভীর দৃষ্টি—চোখে জল এল দেবযানীর। যদি অনসূয়ার মত হত দেবী, চোখে জলের বদলে বিদ্যুৎ বর্ষণ করে বলত—সিদ্ধার্থ মুক্তি না পেলে, পৃথিবীর সব বিচারাসন কলঙ্কিত হয়ে যাবে। দেবযানীর যে কোন সাধ্য নেই। বোকা, অশিক্ষিত সহায়-সম্বলহীন একটা মেয়ে। কিচ্ছু নেই? ছাদের তপ্ত মেঝেতে গড়াগড়ি করে কাঁদছিল দেবী। উঠে বসল, মুখ মুছে খোঁপায় জড়াল ধুলো-মাখা চুল। কিছু নেই কেন। ভালবাসা আছে দেবীর। সবার চোখ ধিক্কার দিক, কটু জিহ্বা হতে ঝরুক বিষ, দেবী তার বুক ভরে রেখে দেবে অমৃত। মুছে দেবে সব কলঙ্কের কেদ। ভালবাসার জোর বাড়ল, শক্ত হ'ল দেবীর মন। নীচে নেমে অনন্তকে বলল তিনতলা পরিষ্কার করে রাখতে। বাইরের দুর্গন্ধ আবর্জনা পার হয়ে, বাড়ী এসে সিদ্ধার্থ দেখবেন তার জন্য অপেক্ষা করে আছে শুভ্র শয্যা, ভালবাসায় ভরা একটি হৃদয়? যদি তাতে রুচি না থাকে সিদ্ধার্থর? যদি মুখ ফিরিয়ে নেন? তবু হার মানবে না সে। অপেক্ষা করে থাকবে। দীর্ঘদিন অপেক্ষা করে থাকবে দেবী, সিদ্ধার্থর তাকে ভালবাসার মতো অবসর হবার জন্য।

পত্রিকায় সংবাদ বের হল, মিথ্যা অভিযোগ প্রমাণ হয়েছে। এক কলম তীব্র মন্তব্য হ'ল আধুনিক দেউলে স্বামীদের সম্বন্ধে। পাশ্চাত্য শিক্ষাকেও কড়া গাল। সিদ্ধার্থ রায় বাড়ীতে আছেন দু' দিন ধরে।

ছ' মাসের ব্যবধান। তারপর বিশ্রী গোলমাল; দেবী সামনে গেল না, যদি খারাপ লাগে ওঁর।

কিন্তু একটা প্রত্যাশায় উৎকণ্ঠিত হয়ে রইল—একবার ডাকবেন নাকি! আগের তো দরাজ গলায় যদি নাও ডাকেন, অনন্তকে বলবেন নাকি—ডেকে নিয়ে আয় দেবীকে।

দেবীকে ডাকল না কেউ। কত যত্নে বানানো খাবার, তাও স্পর্শ করলেন না সিদ্ধার্থ। তিন দিন, কি খাচ্ছেন তিন দিন ধরে? অস্থির হয়ে উঠল দেবী। অনন্তকে জিজ্ঞেস করল; অনিশ্চিতভাবে মাথা নাড়ল অনন্ত।

'কাকী। তোমার দাদার বোধ হয় অসুখ করেছে। কিছু খাচ্ছেন না, শুয়ে আছেন চুপচাপ।' আর থাকতে না পেরে বিভাকে বলল দেবী।

'খাচ্ছে না? শুয়ে আছে? মরণ দশায় ধরেছে ওকে। আমি? আমি কি করব। না বাপু, ঐ মেচ্ছের-ঘরে ঢুকে জাত-জন্ম খোয়াতে পারব না আমি। আর তোরই বা এত আদিখ্যেতা, কিসের, খবরদার, যাবিনে তিনতলায়।'

তিনতলায় যেতে বারণ। সিদ্ধার্থই অনন্ত ছাড়া কাউকে তিনতলায় যেতে বারণ করেছেন। বারণ মানতে পারল না দেবী। চারদিনের সকাল বেলায় অভুক্ত পাত্র ফিরে এল দেখে, উপরে উঠে এল সে।

খাটের উপর শুয়ে আছেন সিদ্ধার্থ। গায়ে চাদর চোখ বোজা। এক পা, এক পা করে কাছে এসে দাঁড়াল দেবী। অসুখ করেছে। একবার দ্বিধা, হাত রাখল কপালে—ইস্, কি গরম।'

চোখ খুলে গেল সিদ্ধার্থের। জ্বরের ঝাপসা, লাল চোখ। কান্না পেল দেবীর। এত অসুখ করেছে, আর অভিমান করে দূরে বসে আছে সে। আস্তে আস্তে চোখ বুজলেন সিদ্ধার্থ। আবার কপালের উপর হাত রাখল দেবযানী। এবার আর হাত তুলল না, কপাল, মাথা, চুলের মধ্যে বিচরণ করতে লাগল তার হাত। আগুন গরম মাথা। আস্তে আস্তে অনন্তকে ডাকল ইশারায়।

'অনন্ত।' দরজায় দাঁড়ানো অনন্ত এলো সামনে।

'এত জ্বর, কিছু বলনি আমাকে!'

বিব্রত চোখে, করুণ মুখে চাইল অনন্ত। কতবার দিদিমণিকে ডাকবার কথা বলেছে অনন্ত, ডাক্তার বাবুকে ফোন করতে চেয়েছে।—না না, কেবল না বলেছেন হুজুর।

—'অনন্তর দোষ নেই, আমিই বারণ করেছিলাম তোমাকে ডাকতে।' দেবীর হাতটি নিজের মুঠিতে তুলে নিলেন সিদ্ধার্থ।

ডাক্তার এলেন। হাই টেম্পারেচার। ডবল নিউমোনিয়া, টাইফয়েডের সঙ্গে। একান্ন বছর বয়েসটা খারাপ। গম্ভীর হ'ল সবার মুখ। আরো দু'জন বিশেষজ্ঞ। নার্স। ভয় পেয়ে বিভার হাট গোলমাল করা থামাল। দিনে একবার করে বিভা উঁকি মারতে লাগল তিনতলার দরজায়।

জ্ঞান নেই রোগীর। মাথায় বরফ ভর্তি ব্যাগ, কত রকমের ঔষধ, ইনজেকসন।

'একবার দেখতে গেলে হ'ত দাদাকে।' স্বামীকে বলল বীণা, অনিরুদ্ধর স্ত্রী। ভাসুরকে খানিকটা ভালই বাসে সে। বীণার জীবনরক্ষা করেছেন তিনি। বাড়ীর জন্য টাকা, মেয়ের বিয়ে—ভাসুর না থাকলে সম্ভবই হ'ত না নীরার জন্য অমন ভাল ছেলে আনা। বীণার স্বামী ভাল মানুষই, কিন্তু ননদ বিভাকে বড় ভয় পায়।

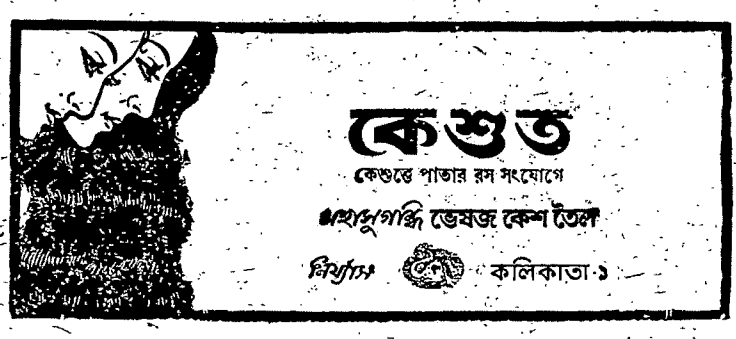

যে ভয়ানক জিভ। বীণার মনের খবর পেলে একেবারে বিষ ছড়িয়ে কালো করে দেবে বিশ্ব-সংসার। তাছাড়া শোনা গিয়েছে দাদার বাড়ীতে বিভাই নাকি সর্বেসর্বা। সুতরাং অনেক ইতস্তত করে তবে ভাস্বরকে দেখতে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করল বীণা। অনিরুদ্ধ অফিস হতে ফিরে খাচ্ছিল ময়দা দিয়ে বানানো পরটা আলু আর হালুয়া সহযোগে। অনেকদিন পরে ময়দা, সুজি পাওয়া গিয়েছে রেশনে। অনিরুদ্ধ ভাল-মন্দ খেতে বড় ভালবাসে। ময়দা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিনে এনেছে সুরুচি বনস্পতি এক টিন। দাদার কোম্পানীর ভেজিটেবল ঘি, গাওয়া ঘিয়ের চেয়ে স্বাদ ভাল। বাধা পেল খেতে বসে। একমনে খাচ্ছিল, বৌ তুলল দাদার কথা। আচ্ছা, অসুখ-বিসুখের আলোচনা কি খাবার সময় না তুললেই হয় না? রাগ হ'ল অনিরুদ্ধর।

'গেলে তো হয় জানি, যাও না মানকেকে নিয়ে। গলা টিপে বের করে দেবে দরওয়ান। দেখি আর দু'খানা পরটা, আলু ভাজা আছে নাকি?'

খাবার পর এক গ্লাস জল খেয়ে গলা দিয়ে গড়গড় আওয়াজ বের করল অনিরুদ্ধ। বেশ খাওয়া হয়েছে। মনটা খুশী। খোঁজ-খবর নিল বৌয়ের।

'তোমার জন্য রেখেছ তো? নেই। কি যে কর! শেষে আর তিনখানা না দিলেই হ'ত আমাকে। এই মিনি, আধখানা রেখে দে না তোর মায়ের জন্য। কি রাগ হ'ল? আচ্ছা, আচ্ছা বাপু। রাখিস নে। কাল দু'খানা বেশী বানিয়ো। বুঝলে।

পাটির উপর শুয়ে পড়ল অনিরুদ্ধ, পাখার বাঁট দিয়ে পিঠের ঘামাচি মারল পুট পুট। আরামে মুখ কুঁচকালো। 'এই! কি করছ? উনুন ধরাবে? আরে এইত হল মোটে বিকেলের খাবার। রাতের রান্না, ও হবে এখন। আমার পায়ের তলাটায় একটু শুড়শুড়ি দিয়ে দাও তো। শালা নতুন জুতো পায়ের ছকা সেরেছে একেবারে।'

আরাম পেয়ে নাক ডাকল অনিরুদ্ধর। স্বামীর পা ছেড়ে বীণা গিয়ে ঢুকল শাশুড়ীর ঘরে।

'বুঝলেন মা, একবার দাদাকে দেখতে গেলে হ'ত না? অসুখে পড়ে আছেন কতদিন ধরে।'

গর্তে বসা বোকা চোখ তুলে সরলাবালা দেখল বীণাপাণিকে। কোন কিছু ভাবা কিম্বা চিন্তা ক'রে করা আসে না সরলার। কিন্তু বড় ছেলেকে সে ভালবাসে খুব। সিদ্ধার্থর অসুখ শুনে অবধি কাঁদছে, বুকের রক্ত মানত করেছে মা-কালীর কাছে। তাকে দেখতে যাবে? সেই সাহেবদের পাড়ায় মস্ত বড় বাড়ীতে থাকে সিদ্ধার্থ। বিভার কথায় মনে হয়, সে বাড়ীতে একবার ঢুকলেই জাত-জন্ম আর থাকে না।

'যাবেন দাদাকে দেখতে?' আবার বলল বীণা।

তোমার উপমা

প্রদ্যোদ মুখোপাধ্যায়

তোমার উপমা যেন রৌদ্রস্নাত আশ্বিনের দিন
স্বচ্ছ দুটি স্মিত চোখে নীলিমার প্রশান্তি জড়ানো,
শুচিশুভ্র বরতনু, মেঘ-মুক্ত দৃষ্টির সম্পাতে
আমার শোণিতে দিগ্বিজয়ী হ্রেষা অকস্মাৎ আনো।

মাঝে মাঝে সে আকাশে হানা দেয় অকাল শ্রাবণ
অশনি-সঙ্কেতে মেঘ জমে ওঠে ভ্রূকুটি-কুটিল,
ততটা বর্ষণ তবু হয় না তো যতটা গর্জন,
একচোখে হাসি, যবে অন্যচোখে অশ্রুর মিছিল।

আলো আর ছায়া যেন দুটি শিশু, তুমি-ই তাদের
সযত্নে লালন করো হেসে-হেসে স্নেহের দোলনায়;
আমিই দর্শক এই রঙ্গমঞ্চে, দৃশ্য-দৃশ্যান্তের
অভিমানে-অনুরাগে, উচ্ছ্বসিত নাট্য-প্রতিভায়।

তোমার প্রসাদে দিনগুলি ভরে ওঠে স্বতোৎসারে
যেমন অঙ্কুর ফুলে, ফুল পূর্ণ হয় ফলভারে।

'ওখানে, ওখানে যে খিস্টানের ভাব, বিভা বলে।'

'ঠাকুরঝির যত কথা। চুপ ক'রে থাকুন আপনি। ঠিক নিয়ে যাচ্ছি।'

বেশ হয়েছে বিশ্রাম। শনিবারে সিগারেট খায় অনিরুদ্ধ, দু'টান দিয়েছে, সামনে এসে দাঁড়াল বৌ। তিন বছর যাবৎ ছেলেমেয়ে হচ্ছে না বীণার। হবেই না আর। পেট কাটা হয়ে গিয়েছে। সন্তান হওয়া বন্ধ, তাই বীণার শরীর নিটোল, আটত্রিশ বছরে ফের যুবতী হয়ে উঠেছে সে। খোঁপাটা বাঁ হাত দিয়ে চাপড়াতে চাপড়াতে বীণা বলল—

'মা কাঁদছে।'

'সে কি। কাঁদছে কেন? কষের দাঁতটায় আবার যন্ত্রণা—'

'কি যে বুদ্ধি তোমার। সে দাঁত তুলে ফেলা হয়েছে না? যন্ত্রণা হবে কি ক'রে? মা দাদাকে দেখতে যাবার জন্য কাঁদছে।'

'তা কান্না কেন। গেলেই হয়। তুমিও চল। একখানা ধোঁয়া ধুতি দিয়ো আমাকে।'

অনেক কাণ্ড ক'রে আসা, কিন্তু চোকাই গেল না রোগীর ঘরে। ডাক্তারের বারণ, দেবী ছাড়া কেউ ঢুকবে না ঘরে। 'একা দেবী কেন? আপনি?' বীণার প্রশ্নে মুখ ভ্যাঙচালো বিভা।

'কেন আবার। ওই তো সর্বেসর্বা। উড়ে এসে জুড়ে বসেছে হারামজাদী, আমি কেউ নই, ওর রাজত্ব। চাবি রেখেছে, টাকা-পয়সা নাড়ছে, গুজ গুজ করছে ডাক্তারদের সঙ্গে। না খেয়ে, না নেয়ে মড়া পাহারা দিচ্ছে শকুনি।'

কি কাজে নীচে এসেছিল দেবী, বীণাদের দেখে ঘরে ঢুকল। হতশ্রী মলিনমুখী মেয়েটিকে দেখে বুকে ঘা লাগল বীণার। আরামও পেল একটু—একেবারে মরুভূমিতে বাস নয় ভাস্বরের, আছে ছিটে-ফোঁটা জল।

'তোমার চেহারা যে বড় খারাপ হয়ে গিয়েছে দেবী। নিজেকেও একটু দেখো। তুমি পড়লে—', হাত ধরে কাছে দেবীকে বসাল বীণা।

'ও পড়লে?' দাঁতে দাঁত ঘসল বিভা। 'মুদ্দোফরাস ডেকে বিদায় করব। তুমি আবার ওকে সোহাগ দেখাতে বসেছ। পয়লা নম্বরের বজ্জাত বেহায়া মেয়ে। তোমার ভাইকে তো হাত করে ফেলেছে বিয়ের আগেই, রাখছ সে খবর?'

বীণা চুপ ক'রে রইল। সরলাবালা বিভার রূপোর গৌর-নিতাই-এর রূপ দেখে সেখানেই বসে ছিল মুগ্ধ হয়ে। অনিরুদ্ধ বাইরে। কিন্তু

বেবী ভিটাল মিশ্রি
পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক
সর্বত্র প্রদর্শিত ও বিক্রীত
প্যারিলাল এণ্ড কোম্পানী

চোখ তুলে একবার চাইল দেবী। না, বীণা মামী ভুল বোঝে নি। ভাইকে হাত করবার খবরে দুশ্চিন্তা হয় নি তার।

বাইশ দিন পর চোখ মেললেন সিদ্ধার্থ।

জটিলব্যাধি ও প্রতিকার

হতাশ রোগী সুযোগ লউন

বিবাহিত, অবিবাহিত, তরুণ, বৃদ্ধ, স্ত্রী ও পুরুষ যে কোন রোগী, যাঁহারা নানাপ্রকার জটিল রোগে আক্রান্ত, তাঁরা সুদক্ষ চিকিৎসকের চিকিৎসায় রোগমুক্ত হউন। উহা ছাড়া স্মৃতিশক্তিহীনতা সকল প্রকার মূত্ররোগ, শক্তিহীনতা, অম্লশূল, অজীর্ণ, অক্ষধা, অনিদ্রা, যাবতীয় পুরাতন আমাশয়, পেটের রোগ, রক্তদোষ, সর্বাঙ্গ বেদনা হার্ণিয়া, কোষবৃদ্ধি, ফাইলেরিয়া একশিরা ইত্যাদি যাবতীয় উপসর্গাদি সম্পূর্ণ বিনা অস্ত্রে কেবল সেবনীয় ও বাহ্য ঔষধ দ্বারা আরোগ্য হয়। সাক্ষাতে অথবা রোগ বিবরণ লিখিয়া ব্যবস্থা লউন। **হিন্দ রিসার্চ হোম,** ১৫, শিবতলা লেন, শিবপুর, হাওড়া। ফোন : ৬৭-২৭৫৫।

এস. কে. ভট্টাচার্য্য

—এণ্ড কোং—

১৩৮, ক্যানিং স্ট্রীট, (দ্বিতল)

ডিজেল ইঞ্জিন জি, ই, সি, ইলেকট্রিক মোটর ১ ঘোড়া—৩০০ ঘোড়া জেনারেটিং সেট প্রভৃতির একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

এস. কে. ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং

ফোন : ২২-৭৩৭২ ২২-৫২৭৫

'এত দেরি করলে কেন আসতে? জান, আমি তিনটে থেকে ঘড়ি দেখছি।'

সব ঝাপসা; একটি মুখ নত হয়ে আছে মাথার কাছে।

মা। নদ্য বিকশিত চৈতন্যে প্রথম ভেসে এল মা। কেমন ক'রে যেন এতগুলো বছর ঝরে গেল জীবন হতে—বালক বয়েস, রোগের বিছানা, মায়ের মুখ। মা ব'লে হাত বাড়ালেন সিদ্ধার্থ, কম্পিত হাতখানা গিয়ে পৌঁছাল নরম মুঠির মধ্যে। এক হাতে সিদ্ধার্থর হাত ধরে, অন্য হাতে মুছে নিতে লাগল দেবযানী সিদ্ধার্থর কপালের বিন্দু বিন্দু ঘাম।

সেই নরম হাতটি কিন্তু আর ছাড়তে পারলেন না সিদ্ধার্থ। শক্তিমান পুরুষের জন্য আছে সমস্ত পৃথিবী, অসুস্থ রুগ্নের কি আছে বিছানা ছাড়া? আর সেই বিছানার পাশে যদি থাকে একটি করুণ মুখ! কত ডাক্তার, পটু নার্স। কর্মচারী; ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে মিলিয়ে যত্ন। কিন্তু সমস্তক্ষণ মন পড়ে থাকে একটি অপটু হাতের সেবা, অসময়ে দেওয়া ফলের রসের দিকে। উৎকণ্ঠা ভরা চোখ দু'টি দেখতে দেখতে শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েন সিদ্ধার্থ।

রাতের বেলাও দেবযানী রোগীর ঘরেই একটি ইজি-চেয়ারে শুয়ে থাকে। আপত্তি করে নার্স-ডাক্তার।

'আর না, আর রাত জাগতে হবে না। এবার বিশ্রাম করুন। ভীষণ ক্লান্ত হয়েছেন আপনি। ভয় নেই, কোনো ভয় নেই। আমরা তো আছি।'

সিদ্ধার্থের মুখের দিকে চায় দেবী। চুপ করে থাকেন সিদ্ধার্থ। মনে মনে ভাবেন—ভয় নেই আবার! খুব ভয় আছে। হয়তো এই রাতই পৃথিবী ত শেষ রাত সিদ্ধার্থর। কিন্তু ভয় পাবে কে? ওই ভাঁড়াটে নার্স, একশো টাকা ফী-নেওয়া রাতের ডাক্তার? ওদের ভয় পাবার কি আছে? তাঁর নাড়ীর স্পন্দন দ্রুত কিম্বা ক্ষীণ হ'লে নার্স ডেকে তুলবে ডাক্তারকে পাশের ঘরে গিয়ে। একটা ইন্‌জেকশন্। একটুক্ষণ চুপচাপ। সাদা চাদরে ঢেকে দেবে শরীর। তারপর দামী খাট আসবে, রাশি রাশি রজনীগন্ধার স্তবক, মাথা নীচু কর্মচারীর দল দাঁড়িয়ে থাকবে চুপচাপ। কে ভয় পাচ্ছে? কেউ না। দেবী? খুব ভয় পাচ্ছে দেবী। না না। দেবী যাবে না এ-ঘর ছেড়ে। ও থাকুক এ-ঘরে। গভীর রাতে নিঃশব্দ পদ-সঞ্চারে যখন আসবে মৃত্যু, একবার থমকে দাঁড়াবে, একটি রাতজাগা ক্লান্ত করুণ মুখ দেখে। সিদ্ধার্থকে বের করে নেবে। আর আর্ত করুণ কান্নার রোল তুলে, শূন্য খাটে আছড়ে পড়বে দেবী। শক্ত ক'রে দেবযানীর হাত ধ'রে থাকেন সিদ্ধার্থ।

একটু একটু করে সরে দাঁড়াতে লাগল মৃত্যু। শক্ত স্বাস্থ্য লড়তে লাগল ডাক্তারদের পক্ষ নিয়ে। তিরিশ দিন পরে গলানো ভাত, মুরগীর স্টু পথ্য পেলেন সিদ্ধার্থ। সন্ধ্যা পর্যন্ত চোখ ফুলিয়ে ঘুমাল দেবযানী।

সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে। ত্রস্ত পায়ে ঘরে ঢুকল দেবী। 'ইস, কমলা লেবুর রসটা? খান নি?' নার্স মাথা নাড়ল। কেন? ওপাশ ফিরে শুয়ে আছেন সিদ্ধার্থ। রাগ হয়েছে, দেবযানী দেরি ক'রে ধরে এসেছে ব'লে রাগ। একটা অদ্ভুত অনুভূতিতে ভরে গেল দেবীর মন।

'রাগ হয়েছে বুঝি'?

জোরে জোরে মাথা নাড়লেন সিদ্ধার্থ। মাত্রাধিক্যে বোঝা গেল খুব রাগ।

'শুনুন, শুনুন না।' টেনে টেনে মুখ ফেরাল দেবী। কমলা লেবুর রস খাওয়াল, তারপর পাশে বসে আস্তে আস্তে আঙুল মটকে দিতে লাগল।

'এত দেরি করলে কেন আসতে? জান, আমি তিনটে থেকে ঘড়ি দেখছি।'

চোখে জল এল দেবীর। সিদ্ধার্থ রায় পথ চেয়েছিলেন দেবযানীর জন্য বেলা তিনটা হতে।

শক্ত পথ্য। স্নান। রেলিং ধরে ধরে সিদ্ধার্থ একদিন নেমে এলেন দোতলায় বিভার ঘরে।

'তোর বুকটা এখন কি বলে?' বোনকে জিজ্ঞেস করলেন।

বুকটা? ভালই তো ছিল বুকটা এতদিন। আজ হঠাৎ দাদা জিজ্ঞেস করবার সঙ্গে সঙ্গেই যেন লাফাতে লেগেছে ধক্ ধক্ করে। কিন্তু সে কথা কি বলা যায়। হাজার হোক মায়ের পেটের ভাই, উঠে এসেছে মরণবর হতে।

'ভালই আছিস তা হলে? কিছু দরকার

আছে নাকি? এঃ, ওবাড়ীতে মা'কে টাকা পাঠানো হয় নি কতদিন'।

'তা আর হয় নি। তোমার চাবি তো থাকে দেবীর কাছে, আলমারি খুলে খুলে টাকা দেয় সবাইকে। মা'কেও পাঠিয়েছে টাকা দরওয়ানের হাত দিয়ে।' প্রায় দেবীর নামে বলবার মতোই বলল বিভা। ভারি ভয় পেয়েছে সে। ভয় ছিল অনেকদিন—সেই এ বাড়ী ঢুকবার প্রথম দিন হতে। বাপ-ভাই-এর রীত-চরিত্র জানতে বাকী নেই তার। মেয়ে-রক্তের গন্ধে পাগল হয়ে ওঠে পুরুষবাঘ, খাপ পেতে থাকে সুযোগ মত শিকার ধরবার জন্য। লজ্জা সরম ভুলেছে দাদা, দিনরাত কেবল দেবী আর দেবী। রাশি রাশি গয়না, কাপড়। বেড়াতে নিয়ে যাচ্ছে মোটর করে। কে-জানে গিয়েছে কি না জাত-ধর্ম, চোদ্দ পুরুষ হয়েছে কি না নরকস্থ। এবার বিয়ের জন্য উঠে পড়ে লাগতে হবে। মেয়েটাও বোকার একশেষ। ভাবনা নেই ভবিষ্যতের জন্য।

দেবী ঘরে আসতে ঝাঁঝিয়ে উঠল বিভা।

'প্রাণ-মন দিয়ে তো খুব সেবা করছিস। হরলিক্স আর বেদানার রসে ফুল ফুটছে শুকনো কাঠে। তুই, একটা সেয়ানা পাগল, বোঁচকা আগল। নিজের কিছু ব্যবস্থা করে নিবি তো?'

'আমার আবার কি ব্যবস্থা করব?' আশ্চর্য হ'ল দেবী।

'ব্যবস্থা? হা ভগবান! কার্তিক মাসটা মাঝে, অগ্রহায়ণের সাতুই বিয়ের দিন, টাকাপয়সা লাগবে না?'

'একেবারে ঠিক করে ফেলেছ বিয়েটা?'

'না, বিয়ে ঠিক করব কেন, ধুমাবতী হয়ে নাচবেন আপনি।'

'বিয়ে করব না আমি।'

'তোর ঘাড় করবে হারামজাদী। একটা মাস, তারপর দেখব কতবড় বজ্জাত তুই।'

রাগে বিভা প্রা পাগল হয়ে উঠল। প্রচুর গাল, তারপর কাঁদতে লাগল—হাতে ক'রে মানুষ করা মেয়ে। সাত চড়ে কথা বলত না যে মেয়ে, একেবারে গোল্লায় গিয়েছে সে অসৎ সঙ্গে পড়ে।

সুস্থ হলেন সিদ্ধার্থ। পাঁচ মাস পর শরীর তয় তয় করে পরীক্ষার পর রায় দিলেন বড় ডাক্তার—

'ভাল হয়ে গিয়েছেন আপনি। কাজকর্ম আরম্ভ করে দিন।

'হ্যাঁ, ভালই আছি। কাজ? অফিসে তো যাচ্ছি গত মাস হতেই।'

'এইরে! তা ব'লে অত স্মার্ট হবেন না। অনিয়ম চলবে না মোটে। একজন শক্ত অভিভাবক দরকার আপনার।'

'তা আছে।' দেবযানীর দিকে চেয়ে হাসলেন ডাক্তার বোস।

—শুনলে তো? খু শক্ত হতে হবে তোমাকে। —আর বলবেন না, ওর গিন্নিপনার জ্বালায় প্রাণ গেল আমার।' হাসলেন সিদ্ধার্থ।

'প্রাণ যেত। প্রাণ বাঁচত না, দেবযানী না থাকলে। কি যে করেছে দুটো মাস। উনি একটা টনিক খাবেন নাকি?' ডাক্তার বোস চাইলেন সিনিয়ারের দিকে।

'নাঃ টনিকের দরকার নেই কিছু। বেশী টনিকে আবার প্রেসার বাড়বে রেগুলার ডায়েট, ওয়ার্ক—রেগুলার লাইফ—সবচেয়ে ভাল টনিক এ বয়সের'।

ডাক্তারবা চলে গেলেন। দেবযানীর দিকে চাইলেন সিদ্ধার্থ। ও না থাকলে বাঁচতেন না তিনি।

'শুনলেন তো ডাক্তারদের কথা, শুনতে হবে যা বলি।' খব ভারিক্কি ভাব দেবীর। এখন আশ্রিতার ভীত-চকিত ভাব একেবারে নেই দেবযানীর। শরীরও ভাল হয়েছে। ভরে উঠেছে বুক গাল চোখের কোল। ওর একটা বিয়ে—কয়েক মাস আগের উন্মত্ততা মনে করে হাসলেন সিদ্ধার্থ। ভাগ্যিস কিছু বুঝতে পারে নি মেয়েটা। অসুখ হয়ে ভালই হয়েছে, শান্ত হয়ে গিয়েছে মন। শেষবার নিভবার আগে ভয়ানক হয়ে জ্বলে উঠেছিল আগুন, কিন্তু ভস্ম কর ত পারে নি সিদ্ধার্থকে।

দেবযানীর প্রতি সিদ্ধার্থের আসক্তি দেখে ভয়ে কাঠ হয়ে গেল বিভা। কি করে সে! প্রতিবাদ জানালে গলায় পা দিয়ে মেরে ফেলবে ভাই। নবুকে কোনো কথা বললে পত্রপাঠ পালাবে। হায়, এই রাক্ষসটার আশ্রয়ে আসবার আগে দেবযানীকে গলায় পা দিয়ে মারে নি কেন বিভা!

বিভা কিন্তু মিথ্যে ভয় পাচ্ছিল। পুরুষ যখন কামনার মদ আকণ্ঠ পান করে মাতাল হয়ে ওঠে, সেই বীভৎস রূপই জানা ছিল বিভার। নিজের বাবাকে দেখেছে সে। নয়নতারা বেঁচে থাকতে তবু কিছুটা আড়াল ছিল, সরলাকে নিয়ে উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল দিবাবিন্দু। দিবাবিন্দুর বয়েস হয়েছিল, অমিতাচারে শীর্ণ, আর সরলাবালা স্বাস্থ্যের প্রাচুর্যে ভরপুর বন্ধ্যা যুবতী। নিজের অক্ষমতার রাগে অন্ধ হয়ে, কদর্য অত্যাচারে, আঘাতে সরলাকে আধমরা করে ছেড়ে দিত দিবাবিন্দু।

নিজের স্বামী। বুজেশ্বরের উদ্দেশে একটা অকথ্য গাল উচ্চারণ করল বিভা। সিদ্ধার্থও পুরুষ। নিরাশ্রয় হয়ে তার খপ্পরে এসে পড়েছে দেবযানী। সরলা, বিভার তবু স্ত্রী নামে একটা ময়লা কাপড় পরা ছিল। দেবীকে যে অনাবৃত, অপাংক্তেয় রক্ষিতা বলে ছেড়ে দেবে সিদ্ধার্থ পৃথিবীর মাকে। দেবযানীকে ভালবাসে বিভা। যে মেয়ে মা হবার সমস্ত সম্ভাবনা নিয়েও নিজস্ব অধিকার হতে বঞ্চিত হয়ে রইল, তার বিকৃত মাতৃত্ব-রস দেবীকে ঘিরে সতত উৎসারিত হত। বিকৃত

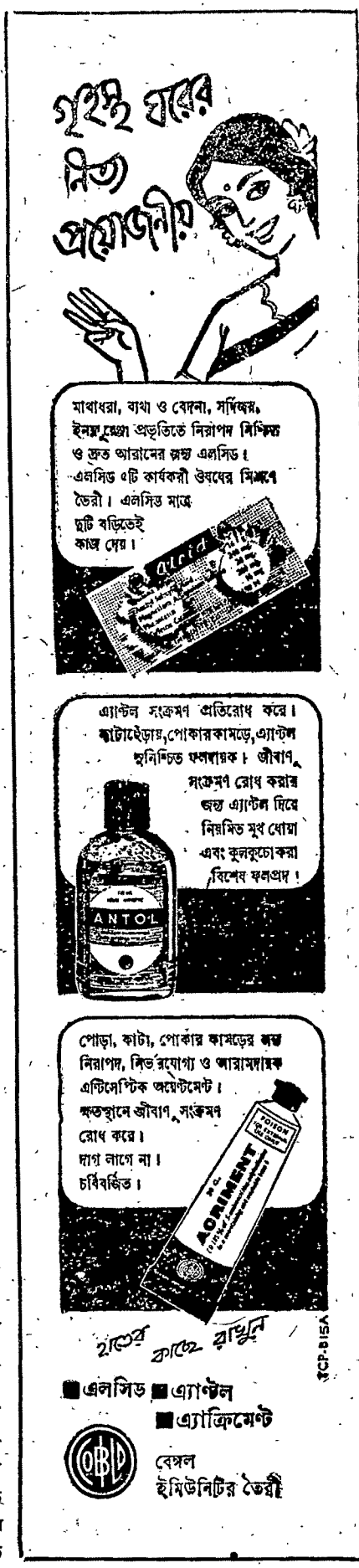

বল, কুৎসিত ভাষা নিয়ে বিভা ভাই দেবযানীকে রক্ষা করবার জন্য চেষ্টা করছিল। ভালবাসা আবার কি? মন ভুলানো কথা বৈ ত নয়। সিদ্ধার্থও কি জানত ভালবাসা কাকে বলে? কি তার রূপ? দিবাবিলুর ছেলে নারী-মাংসের ভোগ নিয়ে কাপালিক হয়ে বসেছিল নারীর শবের উপর।

কিন্তু নয়নতারা! 'জীবন যখন শুকায়ে যায় করুণাধারায় এসো'—সেই সুর যে বাসা বেঁধেছিল মর্মমূলে, বালুভূমির গভীরে ছিল একটি জলধারা। সেই ধারা, ভালবাসা—প্রেম উঠে এল গোপন হৃদয়-শয়ন ছেড়ে। দাঁড়াল সিদ্ধার্থের মুখোমুখি, করুণ মধুর চোখ দু'টি স্থির হয়ে রইল সিদ্ধার্থের চোখের উপর। আগুন নিভে গিয়েছে, স্নিগ্ধ দীপ, চন্দনগন্ধ।

দেবযানীর বিয়ে দিতে হবে। প্রতিমাটিকে সাজিয়ে বসিয়ে দিতে হবে মন্দিরে। দু'দিন শুধু দুটি দিন থাকুক সে কাছে কাছে। দুপুর বেলার একটু বিশ্রাম। পার হয়ে এসেছেন মরুভূমি, দিগন্তে পৌঁছাবার আগে আরো আছে মরুপথ। নির্ঝরিণীর পাড়ে বসে একটু শুনবেন তার কলধ্বনি, দেখবেন ছোট ছোট ঢেউগুলি। পান? না না। সে অমৃতরস অঞ্জলি ভরে পান করবার অধিকার নেইত সিদ্ধার্থের। হায়, অপচয়িত যৌবন! উচ্ছৃঙ্খল জীবন! সামনে রাত্রি। উষার সঙ্গে কি মিলন হয় নিশীথ রাত্রির! সমস্ত বোঝেন সিদ্ধার্থ, তবু অন্তর ভরে একটা আর্ত চীৎকার। প্রৌঢ় সিদ্ধার্থের বুকে বসে কাঁদছে বালক, যুবক সিদ্ধার্থ। পেতে দাও, পেতে দাও দেবযানীকে একেবারে বুকের মধ্যে একান্ত করে। কি আশ্চর্য! সূর্য যখন অস্তবেলায়, তখনো তার এমন বর্ণালী। দেবী যখন চোখ তুলে হাসে, ছোঁয়া লাগে যখন হাতের, আনন্দে ভরে যায় শরীর। এ কি মায়ায় বহু অভিজ্ঞ প্রৌঢ়কে! কিন্তু দেবী কেন ঘুরে ঘুরে কাছে আসে? কেন অভিমানে ঠোঁট ফোলায় বাড়ী ফিরতে দেরি হ'লে? বয়সের, সম্মানের বেড়া পার হয়ে কেন পৌঁছে যাচ্ছে দেবী অন্তরঙ্গতার অন্দরে।

বোকা মেয়ে! ভালবেসেছে সিদ্ধার্থকে। ওর বাপের বয়সী এক পুরুষকে। তাই ও সুন্দরী হয়ে উঠেছে? সুন্দর সেজে প্রত্যেক দিন বসে থাকে সিদ্ধার্থের পথ চেয়ে। ক্ষণে ক্ষণে লাল হয়ে ওঠে মুখ, কিসের প্রত্যাশায় স্ফুরিত হয় পুষ্ট অধর।

বিভা কি জানে—পুরুষ যাকে ভালবাসে, তাকে রক্ষাও করে। কেবল পৃথিবীর অনাচার হতে নয়, নিজের কাছ হতেও পুরুষ যত্নে রক্ষা করে তার ভালবাসার ধনটিকে। দেবীর কোনো ভয় নেই, কিছু ভয় নেই সিদ্ধার্থের কাছে।

'দাদা!' সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে দাঁড়ালেন সিদ্ধার্থ। বিভা ডাকছে। এমন করে কখনো ডাকে না সে। একটু আশ্চর্য হলেন সিদ্ধার্থ।

'কি বলছিস?'

'দেবীর তো একটা বিয়ে দিতে হবে এখন।'

'হুঁ, মনে আছে আমার। পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেব।'

'পত্রিকা লাগবে না দাদা। নবু, ছোড়দার শালা—তোমার অফিসে চাকরি করে। তার সঙ্গে—।'

'কে নবু? ও! নবেন্দু। ক্ষেপেছিস! কি আছে ওর যে, দেবীর সঙ্গে বিয়ে দিবি।'

সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেলেন সিদ্ধার্থ। ভয়ে চুপ করে রইল বিভা।

কি আছে নবেন্দুর! কি না আছে? জোয়ান বয়েস, সুস্থ শরীর, স্বজাত। আবার কি চাই বিয়ে করবার জন্য? সব বজ্জাতি। পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেবে না আরো কিছু।

কি আছে নবেন্দুর? কাপড় বদলাতে বদলাতে ভাবছিলেন সিদ্ধার্থ। যৌবন আছে নবেন্দুর। ছাব্বিশ বছর বয়েসটাই যে মহারাজ করে রেখেছে ওকে। আয়নায় চোখ পড়ল—রগের কাছে দু'টি সাদা চুল, নাকের পাশে রেখা জেগেছে।

এদিকে উদ্বিগ্ন হয়ে বসেছিল দেবযানী। ক'দিন হতে রাত এগারোটায় অফিস হতে ফিরছেন সিদ্ধার্থ।

'ভাল হবে না কিন্তু।'

'কেন? কি করেছি?' চেয়ারে বসতে বসতে বললেন সিদ্ধার্থ।

'কি চুক্তি ছিল? আমার কথা মত চলতে হবে।'

'তাইত চলছি, অফিস আর বাড়ী। একদম, গৃহ-পালিত।'

'আহা! আর শুতে যে রাত বারটা?'

'দাঁড়াও, বাজেট-মিটিং শেষ হোক, সন্ধ্যের সময় শুয়ে পড়বো। এ কি, তোমার প্লেট কই?'

আজকাল দেবী রাত্রে সিদ্ধার্থের সঙ্গে খায়।

'আমি খাবো না।'

'সে কি? কেন? জ্বর হয়েছে? না; কপাল তো ঠাণ্ডা।'

'জ্বর হবে কেন? রাগ হয়েছে আমার।'

'ও, আচ্ছা। রাগ হয়েছে। এখন এই ফাইটা—' দেবীর মুখে একটুকরো মাছ পুরে দিলেন সিদ্ধার্থ।

'দিদিমণির প্লেট দে অনন্ত।'

'জানেন কি মজা হয়েছে?' খেতে খেতে বলল দেবী।—'আপনার বি-এসসি ডিগ্রী নেবার গাউন পরা ফটো পেয়েছি একটা বাক্সের মধ্যে।'

'তাই নাকি। আমিও মজার খবর পেয়েছি একটা।'

—'কি খবর শুনি।'

—'সে একেবারে বিরাট রোমাঞ্চকর সংবাদ। নবেন্দু নামক তরুণটি দেবযানী নাম্নী তরুণীকে বিয়ে করবার জন্য ক্ষিপ্ত হয়েছেন।'

With Best Compliments of :

Singhania & Sons Private Ltd.

B-15, NEW C. I. T. ROAD,
CALCUTTA

Telephone : 34-5371

১৯২৭ থেকে ১৯৬৫

প্রায় চল্লিশ বছর ধরে সেরা রেডিওই পরিবেশন করে আসছি। শার্প ঝংকার সেরা রেডিও। জাপানের প্রখ্যাত হায়াকাওয়া ইলেকট্রিক কোম্পানীর **শার্প** রেডিও ভারতে প্রস্তুত হচ্ছে **শার্প ঝংকার** নামে। প্রস্তুত করছেন হায়াকাওয়া কোম্পানীর সহযোগিতায় বম্বের ইণ্ডিয়ান প্ল্যাস্টিক্স লিমিটেড।

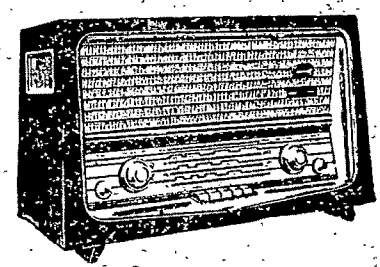

মডেল এইচ এফ ৪৬৪; ৬ ভাল্‌ভ ৪ ব্যাণ্ড, ৩টি স্পীকার, এসি; মূল্য—৫৪১·৬৬ প:

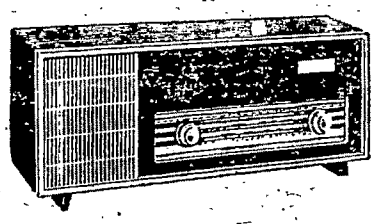

মডেল ভিসি ০৫৩; ৫ ভাল্‌ভ ৩ ব্যাণ্ড, এসি-মূল্য—৩০৩৲, এসি/ডিসি—মূল্য—২৭৮৲

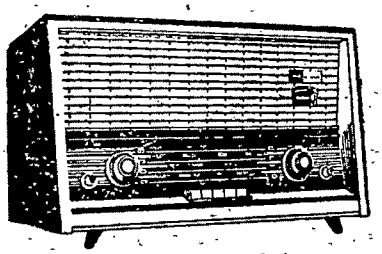

মডেল ইউ এল ১৬৪ এসি ২৬৪ এসি/ডিসি, ৬ ভাল্‌ভ ৪ ব্যাণ্ড; মূল্য—৪১৫৲

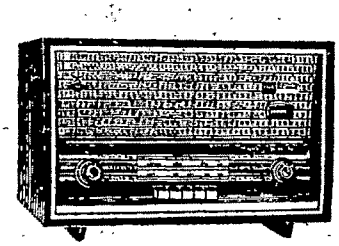

মডেল ৫এ৪৬; ৬ ভাল্‌ভ, ৪ ব্যাণ্ড এসি মূল্য—৩৯০৲

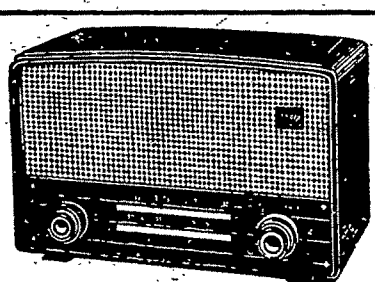

মডেল ইউ সি ১৪৩, ৪ ভাল্‌ভ ৩ ব্যাণ্ড, এসি/ডিসি মূল্য—১৬৫৲

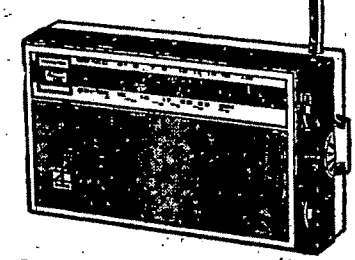

মডেল বি জেড ৪৯০; ৪ ব্যাণ্ড, পোর্টেবল্, চামড়ার কেসসহ মূল্য—৪৩১৲

ওপরের সব দামই এক্সাইজ ডিউটি সমেত, বিক্রয় কর স্বতন্ত্র।

একমাত্র পরিবেশক:

রেডিও সাপ্লাই স্টোর্স প্রাইভেট লিমিটেড

৩ ডালহৌসী স্কোয়ার, কলিকাতা-১। ফোন: ২৩-৫৯২১-২

RSP-65

'কে নবেন্দু? ভ্রূ কুঞ্চিত করল দেবী।

—'নবেন্দুকে চেন না? টাইপিস্ট।'

'ও। বীণা মামীর ভাই নবু। ও তো ছোট আমার চেয়ে বয়সে।'

'ছোট? দু'বছরের বড় তোমার চেয়ে।'

'ইঃ! কুষ্ঠি দেখেছেন আপনি?'

'আমি দেখব কেন। যে দেখবার সেই দেখেছে। স্বয়ং কন্যা-কর্ত্রী।'

'কাকী? ও তো বছর ছয় নির্ঘাত হাতে রেখেছে। আমি অনেক বড় নবুর।'

'মিছিমিছি বয়েসটা বাড়াচ্ছ কেন?'

'কি হয় বয়েস বাড়ালে?'

'বুড়ী হয়ে যাবে। আবার কি হবে।'

'আহা। নবুর চেয়ে বড় হলেই যেন বুড়ী হবো। বুড়ী হতে এখনো অনেক দেরি আমার।' নিশ্চিন্ত মুখে খাওয়া শেষ করল দেবযানী।

বাজল রাত সাড়ে এগারোটা। নীচে নামল দেবী। এখন আর কিছু মুখে বলে না বিভা, কেবল আর্ত ব্যাকুল দুই চোখ চেয়ে, জেগে বসে থাকে দেবীর অপেক্ষায়।

দুই চোখ মেলে শুয়েছিলেন সিদ্ধার্থ। অন্ধকারে দেখছিলেন তিনি একজনকে। একটি উনিশ বছরের ছেলে। পিঠের কাছে ছেঁড়া গাট, এলোমেলো চুল, ক'দিনের না-কামানো পাতলা দাড়ি। মাতৃবিয়োগ হয়েছে ছেলেটির। মা মরে গিয়েছে, নিজের চোখে পুড়ে ছাই হতে দেখেছে মা'কে। তবু সেই বোকা ছেলেটা পথে বেরিয়ে পড়েছে—ওর মা'কে খুঁজে বের করবে। মায়ের তৃষ্ণা যে মেটে নি। দু' বছরের শিশু স্বপ্নে কেঁদে হাত বাড়িয়েছে মায়ের জন্য। মা কই। মাঝখানে শিশুর ব্যবধান। যত দিন গিয়েছে তত বেড়েছে সে ব্যবধান। মায়ের ছেড়ে আসা শাড়ি আঁচল মুখে পুরে, মুখ ডুবিয়ে সেই মা-গন্ধ-মাখা শাড়ি, ঘুমিয়ে পড়েছে অবোধ শিশু। দীন চোখে দেখেছে ভাইবোন—মায়ের কোলে, মায়ের কাছে। সিদ্ধার্থর মা—তাদের সবার মা।

নয়নতারা বুঝি জানত সিদ্ধার্থর সে আতি। সময় পেলেই তাই কোলে টেনে নিত ছেলেকে। মরবার তিন দিন আগেও ভাত মেখে দিয়েছে লেবু-নুনে সুস্বাদু করে। মা সিদ্ধার্থর সমস্ত আকাশ জুড়ে ছিল। আবার নিবিড় ঘৃণা মা'কে। কেন একটা প্রতিরোধ রচনা করছে না, কেন বাঁচবার জন্য চেষ্টা নেই মায়ের এক তিল।

তারপর বড় হ'ল, পণ্ডিত হ'ল, কত মান-খ্যাতি। তখনো কিন্তু সেই অবোধ প্রতি মেয়ের মধ্যে খুঁজছে তার মা'কে। এল শীলা পাল। এ মেয়েকে কোনোদিন কেউ অত্যাচারে শীর্ণ করে ফেলতে পারবে না। ভারি খুশি মন। কিন্তু শীলার মধ্যে সেই শান্ত জ্যোতি কই, সেই আলোর পরিমণ্ডলী? মৃদু হেসে, নম্রত নয়নে শীলা তো এসে দাঁড়াল না মধুযামিনীর বাসর-ঘরে। ওর সঙ্গে সঙ্গে যে চলে এসেছে নাচের ফ্লোর, শ্যাম্পেনের পেয়ালা, কড়া আলোর রোশনাই সিদ্ধার্থর থাকবার, বাঁচবার, ভালবাসার ছোট্ট ঘরটুকুর মধ্যে।

তাইতো ঘরকে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে বেরিয়ে পড়ল সিদ্ধার্থ। মাথার উপর গ্রীষ্মের দুপুর বেলার সূর্য জ্বলছে, পায়ের নীচে তপ্ত পথ। কত মেয়ে এল জীবনে, কোথাও মা নেই, উৎসব শেষে শ্রান্ত সিদ্ধার্থর ঘুমে এলিয়ে পড়া মাথা কেউ তুলে দিল না বালিশে, মুছিয়ে দিল না স্বেদাক্ত কপাল কোমল স্পর্শ দিয়ে কোনো মেয়ে। টাকার বদলে হাসি। মমতা নেই কোনোখানে।

ঘরের মধ্যে একপাশে পড়ে থাকা, অনাথা, উপেক্ষিতা দেবযানী—চব্বিশ বছরের মেয়ে। ওর মধ্যে কি এতদিন ধরে বসে আছে নয়নতারা? যে ছেলের মা পেয়ে তৃষ্ণা মেটেনি, তার জন্য বসে আছে চুপ করে?

মস্ত বড় পণ্ডিত, ডক্টর সিদ্ধার্থ রায় হাসলেন জীবন-দেবতা ব'লে সত্যি আছে কিছু? না কেবল কবিদের মাতলামী! সেই দেবতাটি কিন্তু প্রথম জ্ঞান হতেই ভ্রূ-কুঞ্চিত করে চেয়েছেন সিদ্ধার্থর দিকে। তারপর অনেক সাধনা—ধৈর্য, কষ্ট। আজ ধন-মান অনেক জমেছে। যদি দেবতাটি আজ সামনে আবির্ভূত হন, কি চাইবেন সিদ্ধার্থ? তাঁর অফিসের দেড়শ টাকা মাইনের টাইপিস্ট নবেন্দু ঘোষ হতে? নবেন্দু সিদ্ধার্থ হতে পারবে কিছু চেষ্টা করলেই। সিদ্ধার্থ কোনো দিন ফিরে যেতে পারবেন না ও-বয়সে। মানুষের সবচেয়ে বড় মূলধন তার বয়স।

কণ্ঠতালু ভয়ে শুকিয়ে গেল বিভার। কি অনাচার! হিন্দুর ঘরের মেয়ে সে, স্বামীর উৎপীড়নের উপরেও জেগে থাকে পরলোকের আশা। ধর্ম পাশে দাঁড়িয়ে সহ্য করতে শেখায় মেয়েকে। আর যত বড় মন-মজানো প্রলোভনই আসুক না কেন ধর্মের চেয়ে শক্তি কারোর বেশি নয়। অনন্ত সুখের প্রতিশ্রুতি আছে ধর্মের তহবিলে, তবে সে সবই ভবিষ্যতের জন্য। আজকের—বর্তমান জন্মের কষ্টটা যে যত হাসি মুখে সহ্য করবে, পরকালটা ততই উজ্জ্বল তার। এ-দেশের মানুষ পরকালের লোভে ইহকালে উপোস করে শুকিয়ে মরে, তবু হাত বাড়ায় না অন্যের উছলে পড়া ভাঁড়ারঘরে। বাপরে, পাপ হবে যে! কাঁটার বিছানাতে শোওয়া সন্ন্যাসীর সামনে দুলতে থাকে মন্দারকুসুমের শয্যা আর গা-পা টেপবার জন্য শত শত অপ্সরী। স্বর্গের অখণ্ড সতীলোকের লোভে মেয়েরা সয়ে নেয় ইহলোকের নরক-যন্ত্রণা।

বিভার মনে হ'ল, সিদ্ধার্থর আচরণ অবশ্য ঠিক ধর্মানুমোদিত নয়। কিন্তু ভাই পুরুষমানুষ। পুরুষদের এই সব নৈতিক ব্যাপারে শাস্ত্রীয় অনুমোদন আছে খানিকটা। ওদের পাপটাপ কিছু কম হয়। কিন্তু দেবযানী? সে তো মেয়ে। ধর্মের মন্ত্রে স্বামী হল না যে পুরুষ, তাকে ভজনা ক'রে কুম্ভীপাকে ডুববে যে ও। কেবল কি ও? ওর সাত-পুরুষও হবে নরকস্থ। যে স্বামী জীবনে অকথ্য কষ্ট দিয়ে গিয়েছে তার নরকবাসের সম্ভাবনাও ব্যথিত করল বিভাকে। তাছাড়া দেবীর বাপ ঠাকুর্দা? তারা বিশেষ খারাপ লোক

কারিগরী শিক্ষাই
ছাত্রদের ভবিষ্যৎকে সুদৃঢ় ক'রে তুলবে

নিম্নলিখিত কোর্সগুলি আমরা শিক্ষা দিয়া থাকি—

১। টার্নার ও ফিটার মেসিনশপ ট্রেনিং
২। ইলেকট্রিশিয়ান ওয়্যারম্যান
৩। রেফ্রিজারেটর মেকানিক্স
৪। রেডিও মেকানিক্স
৫। ইলেকট্রিক্যাল সুপারভাইজার
৬। মেসিনিষ্ট
৭। ড্রাফ্টস্‌ম্যানশিপ সিভিল ও মেকানিক্যাল
৮। মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং
৯। রেডিও ইঞ্জিনিয়ারিং
১০। রেফ্রিজারেশন এয়ার কণ্ডিশন
১১। টাইপ ও শর্টহ্যাণ্ড
১২। বুক-কিপিং ও একাউন্টেন্সী

—মনি অর্ডারে ৭৫ পয়সা পাঠাইলে ডাকে প্রস্পেক্টাস পাঠানো হয়—

সৌরেন্দ্রনাথ কলেজ অফ কমার্স এণ্ড টেকনোলজি

৯৯-বি, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী (বহুবাজার) ষ্ট্রীট, ছিতলে
কলিকাতা-১২ • স্থাপিত ১৯৩৯ • ফোন: ৩৪-৬৫২৬

ছিল বলে শোনে নি বিভা। মেয়ের জন্যই তাদেরও নরক হবে।

প্রায় কাঁদতে কাঁদতে বিভা গিয়ে উপস্থিত ছোড়দার বাড়ি। রবিবারের বাজার। ঘণ্টা ধরে ঘুরে ঘুরে জিনিষপত্র কিনেছে অনিরুদ্ধ। বৌকে নির্দেশ দিয়েছে কুঁচো মাছ দিয়ে আমড়ার টক অবশ্যই রাঁধতে। মাত্র মাছ-চচ্চড়ির কাঁটা-খানা চুষে ফেলেছে মাটিতে, অর্ধেক খাওয়াও হয়নি; একেবারে রোল তুলে বিভা এসে পড়ল সামনে। এই, এইগুলোই মোটে পছন্দ করে না অনিরুদ্ধ। নিপাট ভাল মানুষ সে। বাড়ীতে নানান ঝামেলায় তেতো-বিরক্ত হয় মেয়েরা। দু'টো রাগ-ঝাল শুনতেই হবে পুরুষদের। অফিসের চোখ গরম, পাওনা-দারের শাসানি, ট্রাম-বাসের গুতোনি—সব সহ্য হয়, মেয়েমানুষের দু'টো কথা সহ্য করলেই দোষ? ওরাই বা যায় কোথায়, তাহলে। কিন্তু ঐ খাবার সময়টা বাদ দিয়ে। খাবার সময় দু'টো ভাল-মন্দ কথা, কাল কি রান্না হবে তার ভালো-পরামর্শ—মন-মেজাজ ভাল হয়ে যায় কত! কি যে বোকা হয়েছে দাদা, পণ্ডিতমূর্খ যাকে বলে। মেয়েমানুষ! আরে বাবা! একটা রুই মাছের টাটকা মগজে যে স্বাদ, তা কি পাবে পৃথিবীর সেরা সুন্দরীর মধ্যে? তারপর ঝামেলা কত, এইবারই তো মরতে মরতে বেঁচে গেল। সেদার পয়সা, গাড়ী আছে, ঠেলাঠেলি ভিড়ের ভয় নেই।—যাও লেক বাজার, যদুবাবু, গড়িয়াহাট—যেখানে প্রাণ চায়। মনের আনন্দে মাছ, মাংস, ডিম, নধর সবরী কলা, দশ আনা দামের সন্দেশ কিনে আন। লাগাও কালিয়া কোপ্তা কোর্মা। তা না, মেয়েমানুষ!

যে আসক্তি ছিল দিবাবিন্দুর মধ্যে দেহজ-ভোগে, তাই অনিরুদ্ধর মধ্যে এসেছে ভোজ্য-লালসায়। খেতে ভালবাসে অনিরুদ্ধ। বীণার হাতের রান্নাও ভাল। পঞ্চপদে রেঁধে স্বামীকে খাইয়ে খুশি হয় সে। বিভা আজকাল তার রাধা-মাধবের কাছে মালপোয়া ভোগ দিয়ে যেমন খুশি হতে শিখেছে, তেমনি খুশি হয়।

স্বামীর খাবার সময়ে গোলমাল পছন্দ নয় বীণার। ননদের রাগ উপেক্ষা ক'রেই, বলে ক'য়ে বিভাকে তুলে নিয়ে এল শাশুড়ীর ঘরে।

'ততক্ষণ মায়ের সঙ্গে কথা বল ঠাকুরঝি।'

'আমার যে ছোড়দার কাছে দরকার ছিল।'

'বেশ তো। খেয়ে নিন উনি, তুমিও সুস্থির হয়ে বসো।'

সুস্থির হয়েই বসল বিভা। আজকাল সুস্থির হতে শিখেছে সে। কে তাকে স্থির হতে, শান্ত হতে শেখাল? ঐ যে ছোট দু'টি মূর্তি—গৌর-নিতাই। তাদের কাছে বসে, মালা গেঁথে, সলতে পাকিয়ে, তৈরি করে সকাল-দুপুর-বিকেলের ভোগ, কখন যেন শান্ত হয়ে এসেছে মন। সব কিছুর উপরেই আর বিষ ঢালতে ইচ্ছা হয় না। দেবী না হয়ে যদি হ'ত আর কেউ, তা হ'লে চুপ করেই থাকত বিভা। কিন্তু ও যে দেবী। ছোট ছোট দাঁত দেখিয়ে হাসত দেবী—কাকীমা। তাকে বুকে চেপে চুপি চুপি শেখাত বিভা—মা বল, শুধু মা।

পাটিতে গড়িয়ে, ঢেকুর তুলে, খড়কে দিয়ে খুঁচিয়ে পানের কুঁচি, ব্যাপার শুনলো অনিরুদ্ধ।

'দাদার সঙ্গে খারাপ দেবী? বলিস কি? তুই ভুল বুঝেছিস বিভা। দাদা অমন নয়।'

'নয়?' বিভা বর্ণনা করতে যাচ্ছিল সিদ্ধার্থর অনাচার, বীণা বাধা দিল।

'ও সব কাগজ-পত্রিকার কথা বাদ দাও ঠাকুরঝি। ওরা তো হয় কে নয়, নয়কে হয় করছে দিন-রাত। নবু বলেছে মিথ্যে ওর বারো-আনা, তাছাড়া প্রমাণও তো হয়েছে মিথ্যে বলে।'

'মিথ্যে? মদ খায়—সব মিথ্যে?'

'সে সব দিয়ে আমাদের দরকার কি? দেবীর কথা বল। দেখেছ কিছু নিজের চোখে?'

না। স্বীকার করতে হল বিভাকে, অন্যায় কিছু দেখেনি চোখে। কিন্তু দিন-রাত সময় পেলেই থাকে কাছে কাছে। আর দাদাও ডাকছে, বেড়াতে নিয়ে যায়। গয়না, কাপড় দিচ্ছে অনবরত।

'ব্যস! তা হ'লেই খারাপ হ'ল? তোমাদের বাপু ভাল করাও দায়। প্রাণ দিয়ে সেবা করেছে দেবী রোগের সময়, একটা মায়া-মমতা জন্মেছে মেয়েটার উপর।' চুপ করে শুনল বিভা। আগে হলে রাগে জ্বলে যেত শরীর, বকে-ঝকে অস্থির করে দিত বীণাকে। এখন রাগের জোর যেন

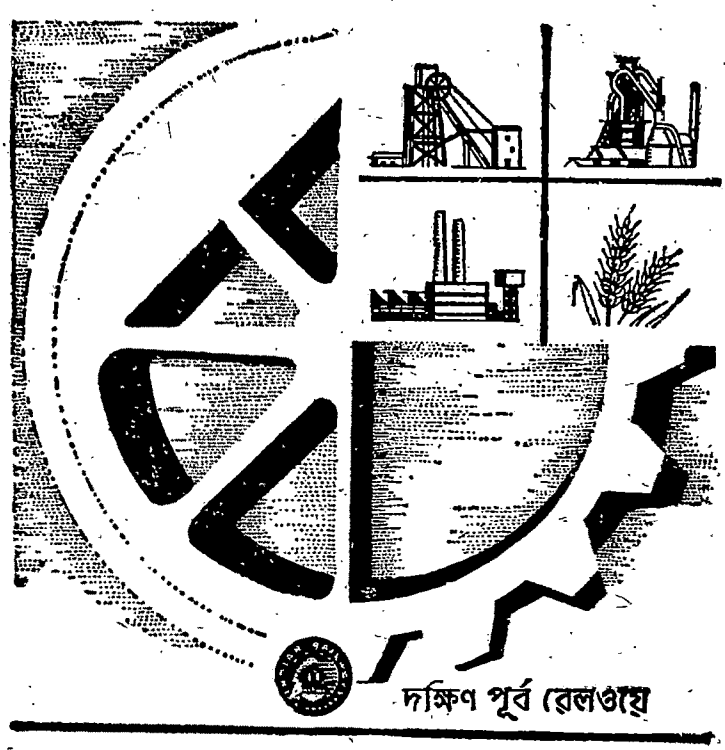

ক'মে গিয়েছে মায়া-মমতা ? তাই হবে হয়তো। মায়া-মমতাই তো রয়েছে দেবীর উপর দাদার। হে গোবিন্দ। তাই কর। আর কষ্ট দিয়ো না বিভাকে। নিশ্চিন্ত হ'য়ে ও চন্দন ঘষুক, জ্বালিয়ে দিক ধূপ-বাতি। চৈতন্যলীলা পড়ে নিরিবিলিতে ফেলতে পারুক দু'ফোঁটা চোখের জল।

একচল্লিশ বছর বয়সে প্রথম শান্তি জেনেছে বিভা। যে সংসারের স্বপ্ন ছিল, সাধ মেটেনি, সেই সংসার তাকে দিয়েছেন গৌর-নিতাই। বীণার যুক্তিতে কষ্টটা কমল বুকের। বিকেলে সরের নাড়ু দিয়ে বৈকালী দিতে হবে, বানানো হয়নি। উঠে পড়ল বিভা :

'আমি যাই বৌদি, ছোড়দার তো নাক ডাকছে, মাও ঘুমাচ্ছে ভোঁস-কুমড়ী হয়ে। দেখত ড্রাইভার মড়া আছে নাকি গাড়ীতে।'

দরজার কাছে এসে ননদকে বিদায় দিল বীণা। 'পাগলামি কর না। যদি হয়ও তেমন তেমন কিছু, বিয়ে দিলেই হবে।'

'বিয়ে ?' চমকে দাঁড়িয়ে পড়ল বিভা।

'দোষ কি বিয়েতে? সম্পর্ক? বিয়ে আটকাবার মতো সম্পর্ক নয়তো দেবীর সঙ্গে দাদার।' বুঝানোর মতো ক'য়ে বলল বীণা।

'আর বুড়ো যে দাদা, দেখতে পাও না?' এবার রাগ হ'ল বিভার।

'কোথায় বুড়ো। এঁর চেয়েও ছোট দেখায় দাদাকে। যাক্‌গে, বাজে ওসব ভাবনা ভেবে লাভ নেই। তুমি বিয়ে দেবার চেষ্টা কর দেবীর।'

'নবুর সঙ্গে বিয়ে তো ঠিকই আছে।'

'নবুর সঙ্গে দেবীকে মানাবে না ঠাকুরঝি, মোটে দু'বছরের ছোট। কিন্তু আমার অমত নেই জেনো। দিতে হয়, দাও।'

মনে খানিকটা শান্তি নিয়ে বাড়ী ফিরল বিভা।

একটা বিরুদ্ধতা দেখা দিয়েছে কর্মজীবনে। ন'জন ডিরেক্টর—তাদের মধ্যে অনেকেই অসন্তুষ্ট সিদ্ধার্থ রায়ের প্রতি। রিসেণ্ট যে ঘটনাটা কাগজে ফ্ল্যাশ করেছে ম্যানেজিং ডিরেক্টরের সম্বন্ধে, তাতে কোম্পানীর সম্মান ক্ষুণ্ণ হয়েছে। চরিত্র সম্বন্ধে সুনাম অবশ্য কখনোই নেই সিদ্ধার্থ রায়ের, কিন্তু বিদ্যা, কর্মক্ষমতা তাঁকে এতটা উঁচুতে তুলেছিল যে, নৈতিক স্খলন নিয়ে কেউ উচ্চবাচ্য করতেন না। মদ খাওয়া আভিজাত্যের চিহ্ন, নারীঘটিত বিষয়গুলি সর্বদাই নেপথ্যে থেকে যায়, সুতরাং তাই নিয়ে মাথা ঘামাতে বসে না কেউ। প্রৌঢ় বয়সেও যদি বিয়ে করতে ইচ্ছুক হতেন সিদ্ধার্থ, দুর্নাম কখনো প্রতিবন্ধক হত না হাই সার্কেলে পাত্রী নির্বাচনের সময়ে। এখনো যদি সুজয় সরখেলের ডিভোর্সড্ ওয়াইফ লরা পাইনকে বিয়ে করেন, সমাজের মাথায় বসবে এসে লেডী রায়।

পত্রিকায় নাম বের হয়নি, কিন্তু এক মহা-পণ্ডিতের কলঙ্ক কাহিনী রসিয়ে রসিয়ে ভোগ করেছে মহানগরী। অবশ্য কেলেঙ্কারির খবর সব দেশে সব সময়ে কর্ণসুখকর। সবাই বলেন—যেতে দাও—যেতে দাও সব বাজে কথা। ও পড়তে আর প্রবৃত্তি হয় না। কিন্তু চোরা চোখ বাড়িয়ে উৎসুক থাকেন খবরটা সবিস্তারে পড়বার জন্য। সিদ্ধার্থ রায়ের খবর আবার বেরিয়েছে বাংলা কাগজে। খুকুমণি হতে নিধি পর্যন্ত সবাই পড়েছে। নাম-ধাম, পেশা না লিখেও সিদ্ধার্থকে যথোচিতভাবে সাড়ম্বরে প্রকাশ করেছেন চতুর সাংবাদিক। নাইলন পরা তনুর লাবনি যেমন অনাবৃত দেহের চেয়ে অধিক মনোহর, তেমনি রহস্যের আবরণ প'রে সিদ্ধার্থও হয়ে উঠেছিলেন রোমাঞ্চকর নায়ক।

ক্যান্‌ভাসার—অর্থাৎ মেয়ে ক্যান্‌ভাসার চট্‌পট্ চাকরি ছেড়ে দিল কয়েকজন। মান-মর্যাদা থাকে না এখানে চাকরি করলে। সুশ্রুত কেমিকেলের জিনিষ শুনলেই সবাই তাকায় কেমন যেন অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে। দুবাহু মিটিং হ'ল না কোরামের অভাবে। মুখে কিছু বলা যায় না, হাবভাবে স্পষ্ট বুঝতে দিচ্ছেন সবাই—ম্যানেজিং ডিরেক্টরের উপর সন্তুষ্ট নন তাঁরা।

ব্যাপার বুঝলেন সিদ্ধার্থ। চিন্তা করতে লাগলেন। দোষ দেওয়া যায় না কাউকে। কুড়ি বছরের অনভিজ্ঞ ছেলের চাইতেও বোকার মতো ফাঁদে পড়েছিলেন তিনি।

গান

রমেন চৌধুরী

ধূলির ধরণী সোনা বলে গণি'
যা তোর দয়ার দানে,
সবুজের ঢেউ জুড়ায় নয়ন
ক্ষেতভরা ধানে ধানে।
কুলু কুলু নদী বয় অবিরল
খরা দিনে দেয় তৃষ্ণার জল
গাছে গাছে ফল, শাখায় শাখায়
মেতে ওঠে পাখি গানে।

বরষার মেঘ ভরসা দানিতে
করে নভে আসা-যাওয়া,
আহা মরি মরি উঠি গো শিহরি
মধুর ভোরের হাওয়া।
স্মৃতির মতন রাখালের বাঁশি
কবিরে তোমার করে যে উদাসী
বার বার আসি এ তীর্থে যেন
মাগো এই সাধ প্রাণে।

কণাদ বোসের বৌকে নিয়ে মস্ত বড় কাণ্ড হয়ে গিয়েছে কয়েক বছর আগে। এক বড়লোক পার্শী তিরিশ হাজার টাকা দিয়ে চুপ করিয়েছে স্বামীকে। কোর্ট পর্যন্ত না গড়ালেও সবাই জানে সেই ইতিহাস। মনের একান্ত দুঃসময়ে সিদ্ধার্থ ক ওরা আটকেছিল। অব্যাহতি পেয়েছেন, কিন্তু খরচপত্র করতে হয়েছে প্রচুর, কলঙ্কের জমাটকা তো ফাউ। নানা রকমে ত্যক্ত হচ্ছিলেন সিদ্ধার্থ। একটা অবাঙালী ডিরেক্টর বিরক্ত করে মারছে। সব পরিকল্পনাতেই বাধা, বাঙালীও কয়েকজন সায় দিচ্ছেন তার কথায়। রক্তশূন্যতার জন্য একটা টনিকের ফরমুলা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিলেন সিদ্ধার্থ। কিছু না জানিয়ে, অনুমতি না নিয়েই ম্যানেজিং ডিরেক্টরের ঘরে ঢুকে পড়ল একটি মেয়ে, ক্যানভাসার। বিরক্ত হয়ে তাকালেন সিদ্ধার্থ, ভ্রূ কুঁচকে গিয়েছে। অপেক্ষা করলেন স্বাগতা মিত্র কি বলে তা শুনবার জন্য। স্বাগতা নতুন এসেছে কাজে, অফিসের নিয়ম-কানুন জানে না সে। সিদ্ধার্থ দেখলেন অল্পবয়সী মেয়েটির চোখে জল। মনটা নরম হল। বসতে বললেন।

'কিছু বলবে ?'

'হ্যাঁ।' থর থর করে কাঁপছে মেয়েটির ওষ্ঠ-অধর।

'কি ব্যাপার ?' অনেক ধৈর্য আর সময় নষ্ট করে ব্যাপার শুনলেন সিদ্ধার্থ। তিন-চারটে বাড়ীতে আজ কুৎসিতভাবে ইঙ্গিত করেছে তাকে। ক্যানভাসারের কাজে কাপড়-চোপড় ভাল পরতে হয়। স্যুট এবং পোষাকে ভাল-রকম আভিজাত্য না দেখালে এ চাকরি করা যায় না। স্বাগতার চেহারা, পোষাক আর

GRAMS : MAJUSILK PHONE : 23-1378

maidenform
ALLO-ETTE
SIZES 32 TO 44... A,B,C CUPS

MAJULA
PRIVATE LIMITED
6/3B, LINDSAY STREET, CALCUTTA - 16.
• Fully Airconditioned

জ্ঞান ও বিজ্ঞানের দ্বারা
প্রমানিত

বৈদ্যনাথ ঔষধ

সদা ব্যবহার করুন

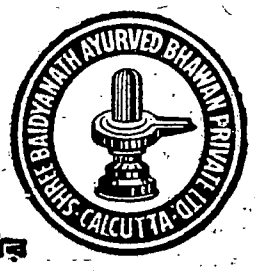

আয়ুর্বেদীয় ঔষধের
সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান

শ্রী বৈদ্যনাথ
আয়ুর্বেদ ভবন প্রাইভেট লিঃ

কলিকাতা · পাটনা · ঝাঁসী · নাগপুর · এলাহাবাদ · নৈনী

বৈদ্যনাথের ঔষধাবলী ভারতের সর্বত্র ৪০০ বিশিষ্ট এজেন্ট ও
৩০,০০০ এজেন্ট মারফৎ সর্বত্র একই দামে সরবরাহ হয়।

ম্যানেজিং ডিরেক্টরের নাম জড়িয়ে বিশ্রী কথা বলেছে। ফলে ফুলে কাঁদতে লাগল সে।

স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন সিদ্ধার্থ

অ্যাজেণ্ডায় ম্যানেজিং ডিরেক্টরের রেজিগনেশন আইটেম দেখে বিপক্ষ দল খুশি হলেও স্বপক্ষীয়গণ প্রবল আপত্তি জানালেন; এবং তাঁরাই সংখ্যাধিক্য। রবিবার বিকেলে বাড়ীতে দেখা করতে এলেন রঞ্জিত সামন্ত, তাঁর শেয়ার সব চেয়ে বেশি।

'কি দেখছি অ্যাজেণ্ডায়?' গম্ভীর মুখ সামন্তর।

'কি?' চুরুটের বাক্স এগিয়ে দিলেন রায়।

'আপনি ছেড়ে দেবেন কোম্পানী?'

'হ্যাঁ, আমার শেয়ারগুলো আপনি কিনে নিন। বাজারে ছাড়লে অসুবিধে। কিনে নেবে বলিকরণে লোকেরা।'

'কিন্তু ছাড়বেন কেন আপনি? আমার কথা শুনুন ডক্টর রয়, মেয়েদের মতো সেণ্টিমেণ্টাল হবেন না। আর ইউ সিয়োর যে আপনাকে অপদস্থ করবার জন্য বলিকরণ প্রভোক করেনি কণাদ বোসকে?'

'লিকরণ?'

'হু নোজ! আপনার কেসটা ঘটবার সাত দিন আগে কণাদকে দেখা গিয়েছে বলিকরণের সঙ্গে। সুন্দর দাঁড়িয়েছে কোম্পানী। স্ট্যাণ্ডার্ড প্রডাকশন। আপনি চলে গেলে তো রাজত্ব বলিকরণের। এমনি করেই প্রভাত লেবরেটরী চলে গিয়েছে ওর কণ্ট্রোলে।'

'ব্যাকটিরিও ফাজ বের করবার স্কীম তো অ্যাপ্রুভড্ হ'ল না।'

'হবে। সেদিন আটকা পড়ে আসতে পারলাম না মিটিং-এ; সুকেশ গুহও ইনফ্লুয়েঞ্জায় পড়ে। অন্য যারা এসেছিল, তারা তো বুঝতেই পারে না যে গঙ্গাজল গোবর হ'তে জীবাণু এনে কি করে টাইফয়েডের সস্তা দামের ওষুধ বের করা যায়।'

'নানা বিশ্রী গোলমাল। মেয়েগুলি—' হাসলেন সিদ্ধার্থ রায়।

'লেট দেম গো।' পায়ের উপর পা তুলে চুরুট ধরালেন সামন্ত।

'একবার ঘুরে আসুন ইয়োরোপ হতে, ড্যাম্প দেশের ফাঙ্গাস ঝরে গিয়ে ঝরঝরে হয়ে যাবে মন-টন।' এরকম তো ছিলেন না আপনি। ডোণ্ট মাইণ্ড ডক্টর রয়, এ বিট ফ্রেণ্ডলি কিউরিয়সিটি—হোয়াট ইজ দি ম্যাটার?'

সামন্তর ফ্রেণ্ডলি কিউরিয়সিটির উত্তর এড়িয়ে গেলেন সিদ্ধার্থ। আগের কথার সূত্র ধরে বললেন—

'এরকম ছিলাম না? কি রকম ছিলাম তবে?'

'ওঃ ব্রাইট অ্যাণ্ড ব্রিলিয়াণ্ট সেই পনেরো বছর আগের আপনি। পিপল সে?

হোয়াট দে সে? লেট দেম সে, বাঁকা করে সিগার মুখে।—রীতিমত ভক্ত হয়ে পড়েছিলাম তো আমরা আপনার।'

অনেক দিন পরে বেশ কাটল বিকাল, সন্ধ্যার কিছুটা। মনটা নরম হয়ে গিয়েছে। ঠিক লেছে সামন্ত।

উপরে উঠতেই দেখা হ'ল দেবযানীর সঙ্গে।

'আজকাল বাড়িতেও কাজ করবেন আপনি?'

'বাড়িতে? কাজ? না না। সামন্ত এসেছিল একটা ডিসকাশন করতে। বিভা কই?'

'কালী সল্ত বানাচ্ছে পেঁজা তুলো দিয়ে।'

'সলতে? সলতে দিয়ে হবে কি?'

'কাকীর ঠাকুরদের কাছে প্রদীপ জ্বালবে।'

'ঠাকুর? আজকাল ভাল আছে বিভা, কি বল? ডাক্তার দেখি না তা আসতে। রাতে ঘুম হয়? রীগটা একটু কমেছে বলে মনে হচ্ছে।'

কথা বলতে বলতে বোনের ঘরের দিকে ফিরলেন সিদ্ধার্থ। মস্ত বড় ঘর। পূব দিকের জানালার তলায় কাঠের সিংহাসন পেতে ঠাকুর সিয়েছে বিভা। ঘরটা জুড়ে সংসার। ছোট মেয়েরা যেমন পুতুলের ঘর সাজায়, তেমনি ঘর সাজিয়েছে বিভা। মনে মনে ভাবলেন সিদ্ধার্থ। কুঁচি কুঁচি করে ওছানো ছোট ধুতি শাড়ি, মশারি-তোষক-বালিশ। সব পুতুলের মাপে। একপাশে পা ছড়িয়ে বসেছে বিভা, গুজ গুজ ক'রে ছড়ার মতো কি বলছে।

'কি! গান করছিস নাকি?'

ভাইকে দেখে উঠে দাঁড়াল বিভা। —'গান নয়, শতনাম।'

'বেশ বেশ! ভাল আছিস তাহলে।' মনে মনেও প্রতিবাদ না করে বিভা মেনে নিল ভাল আছে সে। বোনের মুখের দিকে তাকিয়ে একটু আশ্চর্য হলেন সিদ্ধার্থ। সর্বদা বিরক্ত কপালে প্রসন্নতার আলো, চোখের কুটিল দৃষ্টিও যে দেখতে পাচ্ছেন না।

'কথা বলছিস না কেন?' চেয়ারে বসলেন সিদ্ধার্থ। 'কোথাও বেড়াতে যাবি? এবার কিন্তু আমি নিয়ে যেতে পারব না। অনেক কাজ আছে। ভাল লোক দেখে সঙ্গে দেখিয়ে আনবে।'

'বেড়াতে? বেড়াতে আবার যাব কোথায়?' উদাসীন উত্তর বিভার। হঠাৎ উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল। একটা কথা মনে পড়েছে।

'একবার নবদ্বীপধাম দেখাবে দাদা?'

হঠাৎ বুকের মধ্যে কেমন যেন করে উঠল সিদ্ধার্থর। কোন দিন কারোর আবদার মেটাতে হয়নি তাঁকে। অনেকগুলো ভাইবোন ছিল, বাসি রুটির সঙ্গে গুড়ের পরিমাণটা একটু বেশি হ'লেই সব চাওয়ার ইচ্ছে মিটে যেত তাদের। আবদার করবে? আবদার করা কাকে বলে তা জানতই না তারা।

আজ জীবনে প্রথম, এই ঘরটিতে বসে, বিভার একটি কথায় সিদ্ধার্থ পৌঁছে গেলেন তাঁর বিস্মৃত শৈশবে। কোমরে কাপড় জড়ানো চোদ্দ বছরের ছেলে দাঁড়িয়েছে উঠানে। ছোট বোন আবদার ধরেছে—বেড়াতে যাব দাদা।

দাদার মনের খবর পাবার কথা নয় বিভার। বরং সিদ্ধার্থকে চুপ করে থাকতে দেখে একটু ব্যস্ত হ'ল সে। শ্রীধাম নবদ্বীপে যেতেই হবে একবার। সেই শ্রীধামে—

'অদ্যাপিও লীলা করে গোরা রায়।
কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥'

গোরাচাঁদের লীলা দেখবে এমন ভাগ্যবতী নয় বিভা। কিন্তু দেখা তো যাবে শ্রীবাসের অঙ্গন, অদ্বৈত মহাপ্রভুর পাট।

'দাদা।' বিভা ডাকল।

—'ঠিক আছে।' গলা পরিষ্কার করলেন সিদ্ধার্থ।

'নবদ্বীপে যাবি। ও তো ঘরের কাছে। মথুরা-বৃন্দাবনও ঘুরে আয়। দেবীকে বল গুছিয়ে নিতে।'

দেবী। সব মনে পড়ে গেল বিভার। কি ভাবছে নবদ্বীপ-বৃন্দাবন। তার আগে দেবীর বিয়ে দিতে হবে না?

—'দাদা, দেবীর বিয়ের কিন্তু সব ঠিক করেছি। এবার টাকা-পয়সার ব্যবস্থা করে দাও।'

বিভার কথায় সিদ্ধার্থও ফিরে এলেন বর্তমানের ভূমিতে।

—হ্যাঁ, দেবীর বিয়ে দিতে হবে। বিজ্ঞাপন দিচ্ছি কাগজে।'

—'কি হবে বিজ্ঞাপন দিয়ে? দিব্যি ছেলে নবু। ওর সঙ্গেই বিয়ে দেব।'

—'নবুকে যে পছন্দ নয় দেবীর।'

—'পছন্দ নয়?' জ্বলে উঠল বিভা। 'কাকে তবে পছন্দ মহারাণীর শুনি? নবুকে পছন্দ নয়, নবুর পায়ের যোগ্য ও?'

—'দেবী যে বলছে—নবু ওর চাইতে বয়সে ছোট।'

—'ছোট? মিথ্যে কথা বলেছে হারামজাদী। নবু ওর চেয়ে কম করে দশ বছরের বড়।'

—'সে কি রে। একেবারে দশ বছরের বড়? কত বয়স হ'ল দেবযানীর?'

—'কত আর? পনেরো-ষোল হবে আর কি।' একবারও ঢোক না গিলে বলল বিভা।

'বিজ্ঞাপন, বাছাবাছির দরকার নেই। ওকে বিদেয় কর শীগ্‌গির। অরক্ষণীয়া মেয়ের আবার বর বাছতে হবে!'

—'আচ্ছা।' হাসতে হাসতে ঘর হতে বের হয়ে এলেন সিদ্ধার্থ।

—'হাসছেন যে?' টেবিলের উপর ঝাড়ন বুলাতে বুলাতে জিজ্ঞেস করল দেবযানী।

—'বিভা তাড়াতাড়ি বিদায় করে দিতে বলছে তোমাকে। পাত্র বাছাবাছি করলে চলবে না। সকাল বেলা যাকে দেখা যাবে তার হাতেই দান। অরক্ষণীয়া হয়ে উঠেছ কিনা।'

—'কাকী তো রোজ সকালে সবার আগে দেখে জমাদারের মুখ।'

—'এই সর্বনাশ! কাল হতে ওকে দশটার আগে আসতে বারণ করে দাও। যদি ঝোঁক চাপে তোমার কাকীর, সামলাতে পারব না। এদিকে আবার পনেরো-ষোল বছর বয়েস হ'ল তো তোমার।'

ভীষণ হাসল দেবী: 'দেখুন বলেছিলাম না, অনেক বয়েস হাতে রেখে তবেই বাকী কথা বলবে।'

সিদ্ধার্থও হাসলেন। কয়েক মাস ধরেই হালকা কথা, হাসিতে দেবী ভরে দিচ্ছে তাঁর অবসর সময়। আর বেশি দেরি নেই। আবার চলা শুরু হবে। একলা চলার পথে কান ভরে বাজবে ছোট ছোট জলতরঙ্গের মূর্ছনা। জমা করে রাখছেন পাথেয় হিসাবে। ভাল কথা মনে পড়িয়ে দিয়ে গিয়েছে রঞ্জিত সামন্ত। ইয়োরোপ। এ দেশ ছেড়ে চলে যাবেন। কি হবে রক্ত বাড়ার টনিক বানিয়ে, বেবী ফুডের ফুড-ভ্যালু বাড়াবার জন্য ঝগড়া করে? জরা-ব্যাধি হতে তিনি তো মুক্তি দিতে পারবেন না জীবনকে। তপস্যায় বসে দৃঢ়চিত্ত হয়ে মৃত্যুপণ করবেন না, দুঃখের হেতু উদ্‌ঘাটনের জন্য। কেন এসেছিলেন কুড়ি বছর আগে এদেশে ফিরে, আজ তা ঝাপসা, অস্পষ্ট। সেদিনও কিন্তু পরিষ্কার পথ সামনে দেখতে পান নি; তবু কিসের ইঙ্গিত, কোন্ একটি তরুণী মায়ের মস্ত আশা যেন ভেসে এসেছিল তাঁর কাছে নিজের সিদ্ধার্থ নামটিতে ভর করে।

এত নাম থাকতে সিদ্ধার্থ নাম রাখল কেন নয়নতারা তার প্রথম ছেলের? কোন্ তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করবে সে? বুঝি মায়ের কিছু বোঝা, কিছু না বোঝা ইচ্ছাই সিদ্ধার্থকে রসায়নের ছাত্র করেছিল, তাই কি তিনি প্রাণপাত করছেন ল্যাবরেটরীর জন্য।

কি বাজে ভাবনা। জলো মাটির দেশ, মনকেও জলো করে দেয়। সিদ্ধার্থ আবার ফিরে যাবেন ইয়োরোপে। জীবন যেখানে অতি দ্রুতবেগে ছুটছে, যে জীবনের সঙ্গে তাল রাখতে গিয়ে ধীরে ধীরে আজ শিথিল হচ্ছে পৃথিবীর গতি, পশ্চিমের জানালা দিয়ে তার স্বরূপ দেখবেন।

বিভার জন্য চিন্তা নেই। ও বোঝেনি, কিন্তু সিদ্ধার্থ আজ দেখে এসেছেন, করুণাধারার সামনে এসে পৌঁছেছে বিভা। দিবাবিন্দু যার শ্বাস বন্ধ করেছিল, বৃজেশ্বর যাকে মেরে ফেলেছিল, তার উপর ঝরে পড়েছে করুণাধারা। ছোট দুটি মূর্তি বাঁচিয়েছে বিভাকে। ও হাসতে শিখেছে। গুন্ গুন্ করে গানের সুরে শতনাম কীর্তন করতে শিখেছে। নবদ্বীপে একটি ছোট বাড়ি, ব্যাঙ্কে কিছু টাকা, চলে যাবে বিভার বাকী জীবন।

দেবযানী দেখছিল সিদ্ধার্থর ব্যর্থ চেষ্টা। কত চিঠি, নামী ঘটক। কত পাত্র। রূপবান, গুণবান, বিত্তবান। পছন্দ হচ্ছে না, কাউকে পছন্দ হচ্ছে না সিদ্ধার্থর। সত্যি সত্যি মন স্থির করতে পারছিলেন না তিনি। কে বুঝবে দেবীকে। চোখ তুলে ছোট হাসিটুকু, অসমাপ্ত কথার ধ্বনি, স্রোতের মতো চলে যাওয়া। এ সব দেখবার জন্য চোখ নিয়ে না এলে কি হবে দেবযানীকে দেখিয়ে। ও তো কেবল একটি মেয়ে নয়। কাজ করা, কথা বলা—রোজকার প্রয়োজনের জন্য একটি মেয়ে নয় দেবী। দেবী যখন খেতে দেয়, বাক্স খোলে, হাত তুলে চুল সরায় কপাল হতে, সিদ্ধার্থ সেই আলোটি দেখতে পান ওর চারদিক ঘিরে, যে আলোটির মধ্যে বসেছিল নয়নতারা। সেই আলো দেখতে পায় নি দিব্যবিন্দু। তাই ত করুণাধারায় কখনো সিক্ত হতে

সঙ্গীত-যন্ত্র

কেনার ব্যাপারে আগে মনে আসে

ডোয়ার্কিনের

কথা। এটা খুবই স্বাভাবিক, কেন না সবাই জানেন, সঙ্গীত-যন্ত্র নির্ম্মাণে ডোয়ার্কিনের প্রায় ৯০ বছরের অভিজ্ঞতা তাদের প্রতিটি যন্ত্রকে নিখুঁত রূপ দিয়েছে।

ডোয়ার্কিন এণ্ড সন্

প্রাইভেট লিঃ

৮।২, এসপ্ল্যানেড, ইস্ট ঃ ঃ কলিকাতা—১

পারে নি। অসীম ধৈর্যভরে বুকে নিয়ে মরে গেল একদিন জীবনকে অভিশাপ দিতে দিতে।

তাড়া তাড়া চিঠির মধ্যে সিদ্ধার্থকে হতাশ-মুখে বসে থাকতে দেখে হাসত দেবযানী। মনে মনে বোধ হয় ভাবত—আমার যোগ্য পাত্র কি বের করবে তুমি। দেখতে তো পাও না, গলানো রেডিয়ামে আমি স্নান করে উঠেছি। কোহিনুরের চেয়েও বেশী দাম। ও ছাই ডিগ্রী আর মোটা মাইনের লোক কি আমার যোগ্য হতে পারবে? তুমি ভালবাস আমাকে, তাই ত অমূল্য হয়ে গিয়েছি।

ঠিকই বুঝেছিল দেবী—সিদ্ধার্থ ভালবেসে-ছেন তাকে। স্নেহ-মমতা-করুণা নয়, নরনারীর প্রেম। কিন্তু কাছে এগিয়ে আসতে পারছেন না। বাধা; কিসের বাধা? বয়সের? দেবী যদি বিদ্যা-বিত্তের হিমালয়ের চূড়ার মত বাধাগুলি টপকে যেতে পারে, তুমি পার না একটু ব্যবধান ঘোচাতে? তবে থাক বসে তোমার দুঃখ-দুঃখ মুখ নিয়ে। আর এক পাও নড়বে না দেবী।

দেবী নড়বে না কিন্তু এগিয়ে আসতে কি বাধে সিদ্ধার্থ? বয়সের বাধা যে সব চেয়ে বড় বাধা—যে সত্যি সত্যি ভালবাসে তার কাছে। রাখাল ছেলেটা স্পর্ধাভরে পদ্মপাতায় প্রণয়-লিপি লিখে ভাসিয়ে দিতে পারে রাজকন্যার স্নানের জলে। তলোয়ার-সম্বল সৈনিক স্বয়ম্বর-সভা হতে তুলে নিতে পারে স্বয়ম্বর-লক্ষ্মীকে সম্রাটের মুখের উপর তড়ি মেরে। যৌবনের রাজপাটে সে যে রাজেশ্বর। সেকালে শোনা যায়, চ্যবন মুনি সুকুমারী সুকন্যাকে বিয়ে করে-ছিলেন। চঞ্চলতার শাস্তি দেবার জন্য সে বিয়ে। গৌরীকে নিয়েছিলেন শিব। তিনি তো হয়ে-ছিলেন তখন নবযৌবনের প্রতিমূর্তি। লালসার তাড়নায় ধনী আনতে পারে বটে তরুণী নববধূ কিন্তু দর্শকের চোখ সমবেদনায় সজল হয়ে ওঠে।

অন্যথা, নিজের একান্ত পোষ্য দেবীকে আজ যদি স্ত্রী ক'রে নেন সিদ্ধার্থ, ভালবাসা কি দেখবে কেউ? করুণাধারা আবিল হয়ে উঠবে সমালোচনার বিষে। তার চেয়ে এই ভাল। গম্ভীর সিদ্ধার্থ অভিভাবক দেবযানীর। যোগ্য পাত্রে সমর্পণ করবেন তাকে। কেউ বুঝবে না জীবনকে বঞ্চিত করলেন তৃষ্ণার পানীয় কেড়ে নিয়ে নিজ হাতে।

বিভা খুব খুশী হ'ল তার গৌরাঙ্গদেবের মাহাত্ম্য দেখে। মহাপাষণ্ড ভাই একেবারে গদগদ হয়ে উঠেছে। কিনে আনছে রূপোর সিংহাসন, চন্দনের পাখা। সেবার জন্য শত রকমের আয়োজন। রাধারাণীরও হ'ল বেনারসী, সোনার হার। সোনার বাঁশী মাধবের জন্য। ঝুড়ি ঝুড়ি ফল-মিষ্টি ভোগ বানাতে বানাতেই কেটে যায় গোটা দিনটা এক মিনিটের মতো।

—আপনি গৌরাঙ্গদেবের ভক্ত নাকি? জানতাম না তো? মুরগীর রোস্ট সিদ্ধার্থর প্লেটে তুলে দিতে দিতে বলল দেবী।

—তুমি কি জান আমার?

'অনেক কিছু জানি না, তার সঙ্গে এটাও অজানা ছিল যে মুরগী-খাওয়া বৈষ্ণব আপনি।'

—'শুধু মুরগী? গরু, শূয়োর—'

—'গরু! এ মাগো!'

—'আমি কোনো ধর্ম, কোনো ভগবান মানতাম না।' বললেন সিদ্ধার্থ রায়—'এখন সব ধর্ম, সব দেবতাকে মানছি।'

—'সব দেবতা? খোস-পাঁচড়ার দেবতা ষেঁটু ঠাকুরকেও?'

হাসি উপচালো দেবীর দু' চোখে।

হাসলেন না সিদ্ধার্থ। খাওয়া থামিয়ে একটু-ক্ষণ চুপ করে রইলেন, বললেন—

'আজ মানি সব দেবতাকে। ষেঁটু ঠাকুরের কম মাহাত্ম্য আছে বলে ভেব না। খোসের চুলকানিতে যখন পাগল হয়ে মানুষ শরীর রক্তারক্তি করে, ছড়িয়ে দাও তার গায়ে এক ফোঁটা ষেঁটুর চরণামৃত, দেখবে কষ্ট কমে গিয়েছে রোগীর।'

—'সত্যি, কি করে যে হয়! আমিও দেখেছি ফিট হয়ে চুল ছিঁড়ছে, বালিতে মুখ ঘষে ঘষে ফেনা তুলছে। একটা মাদুলি এনে দিল, আর একদম ভাল।'

—'তাই ত সব ধর্ম, দেবতা, মাদুলি, জলপড়া পর্যন্ত মানছি দেবী।' ন্যাপকিনে মুখ মুছলেন সিদ্ধার্থ। একটু থেমে আবার বললেন—

'আমার কথা বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে চেষ্টা কর। সব রোগের বড় ডাক্তার জেনো রোগী নিজে। শীগ্‌গির এমন দিন আসবে পৃথিবীতে যখন বিজ্ঞানীরা বলবেন, সত্যযুগের গাঁজাখুরি গল্প-গুলি সব ঠিক। কেবল নিজের ইচ্ছা দিয়ে জগৎ-সংসার কণ্ট্রোল করতে পারে মানুষ। আধি-ব্যাধি তো তুচ্ছ বিষয়।'

—'ওমা! অসুখ হলে ওষুধ লাগবে না?'

—লাগবে না ওষুধ, মনে-প্রাণে যদি একবার ভাবতে পারো, আমি সুস্থ। আমার কোনো অসুখ নেই, তক্ষুণি সব অসুখ ছেড়ে যাবে। কিন্তু অমন মস্ত জোরে কথা বলবার মতো শক্তি নেই ত আমাদের—তাই এল ডাক্তার, স্বস্ত্যয়ন, মাদুলি—মানুষের মনের জোর বাড়াবার মন্ত্র।'

—'বা রে! ডাক্তারের ওষুধে তো ভাল হয় মানুষ।' তর্ক করতে চাইল দেবী।

—'তেমনি ভাল হয় মাদুলি নিয়েও অনেক সময়। তারকেশ্বরে হত্যা দিয়ে ফল পাওয়া গিয়েছে, সেই শুকনো ফুল ধোয়া জল খেয়ে ক্যানসার সেরে গিয়েছে, এমন খবরও জানি।'

—'সত্যি! কি আশ্চর্য কি করে যে সারে—'

'আমিও কম আশ্চর্য হই নি আগে,' আস্তে আস্তে বললেন সিদ্ধার্থ।

'তারপর অনেক ভেবে বুঝেছি, কেমন করে আলট্রা-ভায়োলেট রে-এর চেয়ে বেশী শক্তি হ'ল সেই ফলের। সেই শুকনো ফলটি যে তখন

CALCUTTA INDUSTRIAL
CHEMICALS & MINERALS
CO. PRIVATE LTD.
43, Dharamtola Street
CALCUTTA-13
Phones:
24-1004
24-1005
Grams:
"GANDHAK"
Calcutta
Manufacturers of:
GLUE; ALUMINIUM AND ZINC STEARATES; COPPER, LEAD, COBALT AND MANGANESE NAPHTHENATES; WHITE AND BROWN FACTICE, ETC.

আর ফুল রইল না। ভগবানের দেওয়া পাশুপত অস্ত্র হয়ে গিয়েছে। লড়াই করবে ব্যাধির সঙ্গে। এই বিশ্বাসের ফলেই তখন হতে পূর্বব্যাধি বিমোচক এক রসের সিক্রিশন্ হয়। চিরদিন ধরে পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা এই রসেরই সন্ধান করছেন। জীবনের, সৃষ্টির কারণ যে অমৃতরস তাই বেরিয়ে আসে, দূর যায় সব ব্যাধি। শিথ্যেই মাছের তেলে, পশুর যকৃতে শক্তি বাড়ানোর নির্যাস খোঁজ করে মরছে মানুষ। ও আছে মানুষের নিজের মধ্যেই।

'এটা কি জানো? মুক্তো ফলবার গল্প শুনেছ তো? কেবল শুক্তি থাকলেই চলবে না; তার উপর বর্ষণ হবে স্বাতীনক্ষত্রে ঝরা বৃষ্টির জল, তবেই দেহ হ'তে এক অদ্ভুত রস বের হবে। মানুষের সম্বন্ধেও একই কথা। একটি পরমক্ষণে; অনুভূতির স্পর্শ লেগে ক্ষরিত হয় যে নির্যাস, তাকে পেলে তবেই রাসায়নিকদের চেষ্টা সফল হবে। মৃত্যু-ব্যাধি-জরাকে তাঁরা হারাতে পারবেন। না হ'লে ল্যাবরেটরীতে বসে জীবনপাত করলেও কোনো ফল হবে না।'

গম্ভীর গলা থেমে গেল। ঘর ভরে আছে সেই শব্দের তরঙ্গ। মগ্ন হয়ে বসে রইল দেবযানী। সিদ্ধার্থ কি বললেন, ভাল বুঝতে পারে নি সে। শুধু শব্দের গভীরতা, বলবার আগ্রহতা আচ্ছন্ন করে দিল তাকে।

সিদ্ধার্থও বুঝেছিলেন দেবী তাঁর কথা বোঝে নি। কিন্তু থামতে পারলেন না তিনি। দেবীকে উপলক্ষ ক'রে নিজেকেই যেন শোনাতে লাগলেন নিজের উপলব্ধি। বলতে লাগলেন আবার—

'সেই মহা আশ্চর্য সময়টা যে কখন আসে তা নিজেও বুঝতে পারে না মানুষ। কারোর জীবনে হয়তো আসেই না, আবার কারোর জীবনে এক মুহূর্তের জন্য আবির্ভাব হয়। অমনি মানুষ অসীম শক্তির অধিকারী হয়ে ওঠে। রোগ গ্রেম যায়, সব নীচতা, পশুত্ব অতিক্রম করে অনেক উঁচুতে পৌঁছে যায় সে। সেই দুর্গম পথে তাকে টেনে উপরে তোলে তার ভগবান, তার ভালবাসা। আশ্চর্য আলোর রশ্মি লেগে জীবন-রস ক্ষরিত হয় জীবন হ'তে।'

'কিন্তু গৌরাঙ্গ দেব—' আস্তে আস্তে বলল দেবী। স্বপ্নাবিষ্ট হয়ে যেন কথা বলছিলেন সিদ্ধার্থ। এমনি হয় তাঁর মাঝে মাঝে। প্রচণ্ড বাস্তববাদী হয়ে যখন দুর্দান্ত বেগে জীবন ভোগ করছেন। হঠাৎ তখন স্বপ্ন-দেখা মানুষের মতো থমকে দাঁড়িয়ে পড়েন। দেবীর প্রশ্নে সচেতন হলেন, হাসলেন:

'হ্যাঁ, গৌরাঙ্গ দেব। বিভাকে তো আমার চেয়ে বেশী জান তুমি। ও কি বেঁচে ছিল এতদিন? একটা কুৎসিত কদর্য সত্তা বেড়াচ্ছিল ওর শরীর আশ্রয় করে। জন্ম হতেই যে বিভা মরা। একান্ত বাচ্চা বয়স হতে ওকে মেরেছে ওর বাবা। অভাব, উৎপীড়ন মেরেছে। যৌবনে মেরেছে আমি। কিন্তু এক্ষুণি বললাম না তোমাকে—

মায়াজাল

রাণা বসু

—মাসিমণি, আমি নাগর-দোলায় চড়বো।
'নাগর-দোলায় চড়ে না, মাথা ঘুরবে।
চলো আমরা মেলা দেখি।'
—মাসিমণি, আমি পুতুল-নাচ দেখবো।
'বড্ড ভিড়, ওখানে ঢুকলে কষ্ট পাবে।
টিয়া আমার হাত ধরো, হোঁচট খাবে।'
—মাসিমণি, ওই সুন্দর পুতুলগুলোর একটা কিনে দাও না।
'পুতুল নিয়ে কী হবে। তোমার অনেক পুতুল আছে।'
—না, আমি একটা পুতুল নেবোই।
'মেলায় এসে অসভ্যতা। তুমি থাকো, আমি চললুম।'

শিশুরা কী অসহায়!

'খুকু-মা, তুমি কাঁদছো কেন? দোলায় চড়বে?'
—না।
'পুতুল-নাচ দেখবে?'
—না।
'সুন্দর একটা পুতুল নেবে?'
—না। আমি কিচ্ছু দেখবো না, কিচ্ছু নেবো না।
আমায় মাসিমণির কাছে নিয়ে চলো,
আমি মাসিমণির কাছে যাবো॥

পরিবেশক: জনতা ট্রেডিং কর্পোরেশন ৩, কারবালা মহম্মদ ষ্ট্রীট, কলিঃ-১

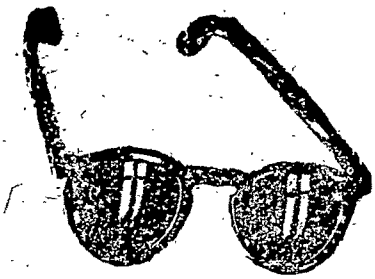

অভিজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা চক্ষু পরীক্ষা করাইয়া ন্যায্যমূল্যে পছন্দসই চশমার জন্য নির্ভরযোগ্য স্থান।

ঘোষের আই ক্লিনিক এণ্ড অপটিক্যাল ইনডাস্ট্রি

৪৯০, জি, টি রোড, শিবপুর, হাওড়া।

ফোন ঃ ৬৭-৩৩৭২

এ. সরকার এণ্ড সন্স

সন ম্যাণ্ড গ্র্যাণ্ড সন্স অবলেট

এম. বি. সরকার

ট্র্যাডিশ্যনাল জুয়েলার্স

১৭১।১এ রাসবিহারী এভিন্যু

বালিগঞ্জ কলিকাতা

ফোন ঃ ৪৬-৬২৫৮

—পূজার গান—

● নতুন 'হিজ মাস্টার্স ভয়েস' এবং 'কলম্বিয়া' রেকর্ড ● "স্টার" ৪-স্পীড রেকর্ড প্লেয়ার, প্লেবয় ও কমেট রেকর্ড রিপ্রোডিউসার ● 'এভারেস্ট' ট্রানজিষ্টর রেডিও-গ্রাম ● নতুন মডেল "হিজ মাস্টার্স ভয়েস" রেডিও ও ট্রান-জিষ্টর—টেবিল ও পোর্টেবল পোর্টেবল ট্রানজিষ্টর ও অন্যান্য ট্রানজিষ্টর রেডিও আমাদের কাছে দেখে শুনে বেছে নিন।

উত্তর কলিকাতার সর্বজনপ্রিয় বিপণি

রেডিওটেকনিকস্

৬৪-এ, যতীন্দ্রমোহন এভিনিউ

(গ্রে ষ্ট্রীট জংশন), কলিকাতা-৫

ফোন ঃ ৫৫-৪৮৩১

মৃতসঞ্জীবনী ওষধ, মৃত্যু-প্রতিরোধক শক্তি আছে প্রাণীর শরীরে। আশ্চর্য আলোর তাপ লেগে সেই ভিটামিনগুলি সক্রিয় হয়ে ওঠে। এক ধরণের কেমিক্যাল অ্যাকশন আর কি। বিভাকে তাপ দিয়েছে গৌর-নিতাই। আফটার অল সি ইজ মাই সিস্টার। একটা কৃতজ্ঞতা বোধ করছি গৌরাঙ্গ দেবের প্রতি। খাট-ফাট বানিয়ে দিচ্ছি তাই। কি চেয়ে আছ? কিচ্ছু বুঝলে না তো। যাও, শুয়ে পড়গে। রাত হয়েছে।'

দেবীর মাথায় হাত দিয়ে একটু নেড়ে সিদ্ধার্থ চলে গেলেন। দেবযানীও উঠল। বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল। ঝোপ-ঝোপ গাছের আলো-ছায়া রাস্তায়।

কিছু বুঝতে পারে নি দেবী? কিছু বুঝেছে। আশ্চর্য আলো, আলট্রা-ভায়োলেটের রশ্মির চেয়ে যার তেজ, শক্তি বেশী, সেই আলো এসে পড়েছে দেবীর উপর। স্বাতীর জলে জন্মেছে মুক্তো। তাই ত দেবীর অহঙ্কার, স্পর্ধার শেষ নেই। রাণী হয়ে উঠেছে ও। কিছু ভয়, সঙ্কোচ নেই তার মস্ত বড় বিদ্বান, বড়লোক, নৈতিক চরিত্রহীন প্রৌঢ় ডক্টর সিদ্ধার্থ রায়কে। ভগবান নন, হিমোগোবিন নয়, ভালবাসা। ভালবাসার শক্তিতে দেবযানী সিদ্ধার্থের মতো বড় হয়ে উঠেছে, তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। আরো কাছে যাবে, মিশে যাবে একাত্ম হয়ে। সেই যে বললেন—কেমিক্যাল অ্যাকশন, তাই হবে। জীবন হতে ক্ষরিত হবে জীবন-রস। দু'জনের জীবন মিলে তখন এমন একটা ব্যাপার হবে যে অনেক চেষ্টা করেও আলাদা করা যাবে না প্রাণ দু'টো।

অনেক চেষ্টা করেও যোগাড় হচ্ছে না মনোমত পাত্র। প্রচুর যৌতক, কিন্তু যৌতক-লব্ধ পাত্রপক্ষ এগিয়ে আসছে না কেন? কিছুটা অগ্রসর হয়ে থেমে যাচ্ছে সবাই। দু'টি পাত্রের বাবা দেখে গেলেন দেবীকে। অনেক উৎসাহ নিয়ে প্রচুর প্রশংও করলেন। ঘাড় গুঁজে বসে থাকাটা কন্যার লজ্জাশীলতা বলে ধরে নিয়ে, লজ্জাই যে নারীর একমাত্র ভূষণ, সে সম্বন্ধে দৃঢ় মত প্রকাশ করলেন। কিন্তু কয়েকটা চিঠির পর একেবারে চুপচাপ।

নাঃ, বুড়োদের দিয়ে হবে না। উপযুক্ত স্বাধীন পাত্র নিয়ে এস কয়েকটা। স্বাধীন পাত্র খোঁজে নেই? সিদ্ধার্থর প্রশ্নে চোখ কপালস্থ করল নীলমণি মাত্র। তার খোঁজে নেই পাত্র? একেবারে সায়েন্টিফিক প্রোসেসে বিজনেস করে সে। অজ্ঞ মূর্খ নয় নীলু। বিজ্ঞানের প্রথম বছরের কাসে পড়েছে বছর তিন-চার। বাপ না মরলে পাশ করত। কে বলতে পারে, হয়ত বা স্যারের মতো পাড়ার ডাক্তার-কাকতারও হতে পারত নীলমণি। তা পাশ-টাস সবই তো রোজগারের জন্য। যে রোগে ভোগ, মৃত্যু সেই দম আটকে। রোজগারপাতি মন্দ নয় তার। ঠাকুরের ইচ্ছায় দোতলা বাড়ী, মেয়েদের ভাল বিয়ে, ব্যাঙ্কেও আছে নগদ যৎসামান্য।

কানা-খোঁড়া কত মেয়ের বর যোগাড় করে দিচ্ছে সে। এটা?

'এটা দেরি হচ্ছে কেন জানেন— মাথা ঢুলকালো নীল ঘটক। 'হিন্দুসমাজটা একেবারে নচ্ছার। মোটেই প্রগতিবাদী নয় লেখা-পড়া জানা লোকগুলোও। স্যারের জন্য এক্ষুণি দিতে পারি বাছা বাছা একশোটা পাত্রী যোগাড় করে দেবযানী দেবীর জন্যই হচ্ছে মুস্কিল।'

'কি মুস্কিল?' নীলমণির কথার সুরটা যে কেমন! মুস্কিলটা জানতে চাইলেন সিদ্ধার্থ।

'মুস্কিল? না না, মুস্কিল আর কি।' চাঁদির পয়জার মেরে সব মুস্কিল ঠাণ্ডা করে দেবে নীলমণি। আচ্ছা, ঐ কথাই রইল সামনের রবিবার পাত্রী দেখাবার ব্যবস্থা হবে স্বাধীন পাত্রকে।

হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে গেল নীলমণি।

প্রস্তাবিত সম্বন্ধটি মন্দ নয়। বিলেতে ছিল সাত বছর। ভাল কনসার্নে চাকরি করছে। কোয়ালিফিকেশন্ যখন আছে, সিদ্ধার্থও করতে পারবেন তার জন্য কিছু।

গতানুগতিকভাবে মেয়ে দেখা পছন্দ নয় পাত্রের। তারই প্রস্তাব অনুসারে স্কাইরুম ব্যবস্থা হ'ল লাঞ্চের।

'দেবী যাবে না, আদর দিয়ে দিয়ে তুলেছ। ঠ্যালা সামলাও এখন।'

সশব্দে রাগ প্রকাশ করে বিভা গিয়ে ঢুকল তার ঠাকুরঘরে।

'কি ব্যাপার?' দেবীর ঘরে ঢুকলেন সিদ্ধার্থ। খাটের উপর চুপ করে বসে আছে দেবী। সঙ্গে যাবে ব'লে প্রস্তুত হয়ে এসেছে নীরা। রাশি রাশি শাড়ি রেখেছে খাটের উপর, কিন্তু দেবীদি হাত লাগাতে দিচ্ছে না মোটে।

'আরে! সাজ কর নি? দেরি হয়ে যাচ্ছে যে!'

'আমি তো যাব না।' নিশ্চিন্তভাবে উত্তর দিল দেবী।

'যাবে না কি রকম! এই নীল শাড়িটা মন্দ নয়, কি বলিস নীরু?'

খুব ভাল। সব শাড়িই ভয়ানক পছন্দ নীরার। কি যে দেবীদিটা!

'ওঠ ও দেবী। শীগ্‌গির কর।' হাত ধরে দেবীকে তুললেন সিদ্ধার্থ।

'বলছি যাব না।' হাত ছাড়াল দেবী।

'আঃ দেবী! অপ্রস্তুত হতে হবে আমাকে।'

অবাক হয়ে গেল নীরা। বাঘের মতো জ্যাঠামণি, পিসিও ভয় পায় যাঁকে, তিনি অবিকল নীরার ওর মতো দেবীদিকে খোসামোদ করছেন।

অনেক সাধ্য-সাধনার পর দেবী উঠল। কিন্তু সেখানেও রইল মুখ ভারি করে। নী ভীষণ খুশী। এমন জায়গায় কক্ষণো যায় নি সে। কি আদুদে ভদ্রলোক! দেবীদিটা একদম ইয়ে। সারাক্ষণ রই মুখ গম্ভীর করে

।। এই মুহূর্তের কর্তব্য ।।

পাকিস্তানের ভারত-আক্রমণের মোকাবিলা অবশ্যই করতে হবে

"আরও কঠিন দিনের সম্মুখীন হওয়ার জন্য দেশবাসীকে প্রস্তুত থাকতে হবে। প্রত্যেককেই পুরোপুরিভাবে ও বিশ্বস্ততার সঙ্গে নিজের কর্তব্য পালন করতে হবে।"

—প্রধানমন্ত্রী

কিন্তু কী ভাবে তা করবেন?

- কর্তব্যনিষ্ঠ সৈনিকের মনোভাব নিয়ে অসামরিক প্রতিরক্ষার কাজে লাগুন
- দলে দলে হোমগার্ডে যোগ দিন
- খেতখামারে ও কলকারখানায় উৎপাদন বাড়িয়ে চলুন
- শিল্পে শান্তি বজায় রাখুন
- যোগাযোগ-ব্যবস্থার কাজ, বন্দরের কাজ ও সরবরাহের কাজগুলি আরও নিপুণভাবে সম্পাদন করুন
- জনসাধারণের ব্যবহার্য নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের সরবরাহ অব্যাহত রাখুন
- জিনিসপত্রের দাম কোনমতেই বাড়তে দেবেন না—দাম কমিয়ে আনুন

Space Donated by :—

Motor & Machinery Manufacturers Ltd.

10, Jawpore Road, Dum Dum, Calcutta-30

Phone No. 57-2479, 57-3282 & 57-3284

ঋত্বিকের

নারী (কাব্যগ্রন্থ) ··· দুই টাকা। চুম্বন (ঐ) ··· তিন টাকা।

নূতন প্রকাশিত গ্রন্থ

ঐক্যের আস্বাদ (ঐ) ··· ··· ··· ··· তিন টাকা।

ছোটদের জন্য লেখা

নানান দেশের মজার গল্প দেড় টাকা। যখন তাঁরা বালক ছিলেন দুই টাকা।

শীঘ্রই প্রকাশিত হবে

ছন্দমালা (কবিতার বই) কথা ও ছবি

ত্রিবেণী প্রকাশন—১২২/১বি, মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

প্রস্তুত কারক
এল,এল,দাস এণ্ড সন্স
কলিকাতা- ৬
ফোন: ৩৪-২৭৪১ গ্রাম: এলশিমেট

সকলকে জানাই আমাদের আন্তরিক
শারদীয় শুভেচ্ছা
সবার মুখে এককথা
বাদলরামের
"পান বাদশা" জর্দা
স্বাদে ও গন্ধে অতুলনীয়

বাদলরাম লক্ষ্মীনারায়ণ
১৪৪এ, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৭

সাথে চিন্ময় দত্ত কথা বলতে চাইল সিদ্ধার্থর সঙ্গে। পাত্রী পছন্দ, আবার কথা কি! দেনা-পাওনা সম্বন্ধে কথা? প্রচুর, প্রচুর দেবেন সিদ্ধার্থ। গাড়ী, বাড়ী? তাও।

তবু আছে দরকারী কথা। কি এমন কথা! যাকগে। দিন স্থির হ'ল। রাজভোগ, রাবড়ি। আবার মাছের ফ্রাই, চাউমিয়েন। পালিশ জুতো নিখুঁত টাই, চিন্ময় এল সন্ধ্যাবেলা সিদ্ধার্থর সঙ্গে কথা বলতে।

এক ঘণ্টা ধরে কথা বলবার পর চিন্ময় বিদায় নিল, আর সিদ্ধার্থ শুয়ে পড়লেন লম্বা ডিভানটার উপর। দরজা বন্ধ।

জীবনে অনেক ধাক্কা খেয়েছেন সিদ্ধার্থ রায়। অনেক বিপরীত পরিস্থিতি আয়ত্তে এনেছেন কিন্তু এমন দিশেহারা হয়ে পড়েন নি কখনো।

কথা বলতে বসে চিন্ময় নিজেকে পরিচয় দিয়েছে প্রোগ্রেসিভ মাইণ্ডের বলে। কোনো সংস্কারে বদ্ধ নয় তার মন। শুনে খুশী হয়েছিলেন সিদ্ধার্থ।

না, কোনো প্রেজুডিস্ নেই। এবং সেই জন্যই এই বিয়েতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে প্রস্তুত হয়েছে। ডাইভোর্স করা মেয়ে যদি আবার বিয়ে করতে পারে, বিধবা মেয়েকে যদি বিয়ে করতে আপত্তি না থাকে, তবে দেবযানীর বেলা কেন যে আপত্তি উঠবে ভেবে পায় না চিন্ময়।

তার মানে? আশ্চর্য হয়ে গেলেন সিদ্ধার্থ।

'মানে আর কিছুই নয় ডক্টর রয়। সিম্পল অ্যাণ্ড কিন। সি ইজ লিভিং উইথ ইট, গাট ইউ আর টায়ার্ড অব হার কম্পানী। ইউ হ্যাভ সেটল্ড্ দি ম্যাটার ভেরি নাইসলি। আই থিঙ্ক ইট ইজ ভেরি, ভেরি ফাইন। হাউএভার, আই হ্যাভ নো অবজেক্শন। আই অ্যাম রেডি টু ম্যারি হার। আমিও লণ্ডনে চার বছর কাটিয়েছি একটি মেয়ের সঙ্গে। মোস্ট চারমিং গার্ল ইন দি লোকালিটি। বাট ওয়ান থিঙ্—আমি জানতে চাই মেয়েটি বেশী রকম মুডী কিনা এবং আপনার সম্বন্ধে ওর মন ক্রি হয়েছে কিনা। আই অ্যাম নিয়ার অ্যাবাউট থারটি এইট। একটা পারমানেণ্ট সেটলমেণ্ট করতে চাই এখন। আগে যাই ঘটে থাকুক না কেন, বিয়ের পর আমার স্ত্রী কেবল আমা সম্বন্ধেই উৎসাহী থাকবে।'

স্তম্ভিত হয়ে বসে রইলেন সিদ্ধার্থ। চিন্ময় দত্ত কি যে বলে গেল এক ঘণ্টা ধরে, কিছুই যেন তাঁর বোধগম্য হ'ল না। মাথা ঘুরছিল। শুয়ে পড়লেন চিন্ময় চলে যেতে।

এই, এইজন্যই দেবযানীর বিয়ে দিতে পারছেন না সিদ্ধার্থ। এই ইঙ্গিত করেছিল নীলমণি ঘটক। দেবযানীর সঙ্গে তাঁর একটা কুৎসিত সম্পর্ক জেনে বসে আছে সবাই। কেন! কেন জেনেছে? কাকে আর দায়ী করবেন এর জন্য সিদ্ধার্থ নিজেকে ছাড়া?

আপনার
পরিবারের
উপযোগী

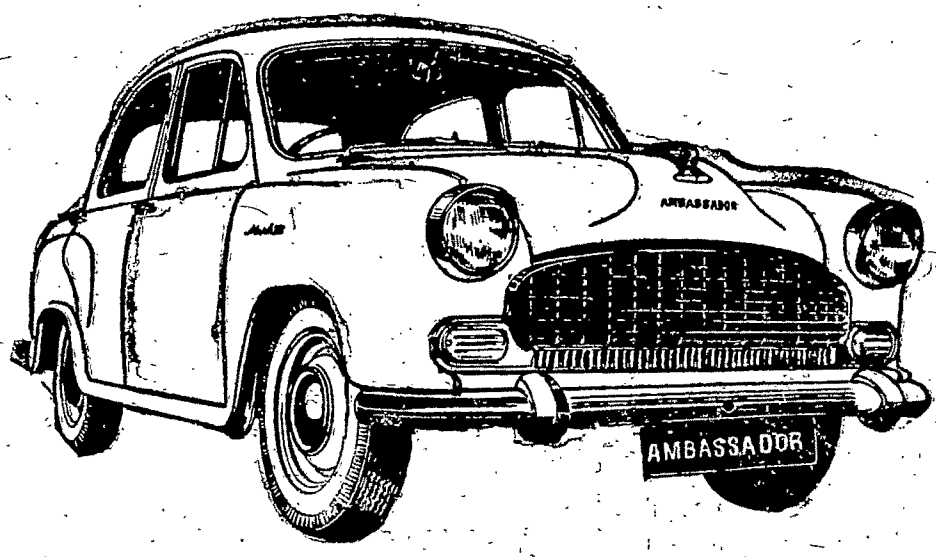

গাড়ী

ASP/HM—106

Ambassador
Mark II

HM
HINDUSTAN MOTORS

হিন্দুস্তান মোটরস লিঃ, কলিকাতা

তিনি ম্যানেজিং ডিরেক্টর বলেই চাকরি ছাড়তে হয় মেয়ে-ক্যানভাসারদের। দেবযানীর বিয়ের সম্বন্ধ ভেঙে যায়।

একটা তীব্র গ্লানিতে ভরে গেল সমস্ত মন। পৃথিবীর ঘৃণ্যতম জীব। দুষ্ট সংক্রামক ব্যাধি—গ্যাংরিন তিনি। যা আছে তাঁর চারপাশে, সব দূষিত হবে, নষ্ট হবে।

উঠে দাঁড়ালেন সিদ্ধার্থ রায়। পাংশু মুখ, কি এক প্রতিজ্ঞায় দৃঢ় হয়েছে অধর। আরো কি বেঁচে থাকবার অধিকার আছে তাঁর? এমন সুন্দরী পৃথিবী যে কৎসিত হয়ে গেল সিদ্ধার্থর স্পর্শ লেগে। টেবিলের ড্রয়ারে পিস্তল। ড্রয়ার খুললেন সিদ্ধার্থ। পিস্তল, সুন্দর। ঝক্‌ঝক্ করছে। হাসিমুখে ডাকছে—এস, এস, আমায় চুম্বন নাও। সকল গ্লানিমোচন, কলঙ্কনাশন মৃত্যু দিয়ে মুছে দেব তোমার সর্বাঙ্গের গলিত ক্ষ।

হাতে পিস্তল তুলে নিলেন সিদ্ধার্থ। মা, মা, নয়নতারা মা, তুমি এসে দাঁড়াও সামনে। তোমার চোখের আলোয় সিদ্ধার্থর সব ভয় কেটে যাক। কোথায় তোমার ঠাণ্ডা আঁচলটি। আমাকে ধর। একেবারে কোলের মধ্যে, বুকের মধ্যে ঢেকে নাও আমাকে। যেমন করে প্রথম ভ্রূণ সিদ্ধার্থকে রক্ষা করেছিলে তোমার শরীরের গোপন গুহায় লুকিয়ে, তেমনি করে আবার লুকিয়ে রাখ আমাকে।

'এতক্ষণ দরজা বন্ধ কেন? দরজা খুলুন।' বন্ধ দরজার ওপাশে ধাক্কা দিচ্ছে দেবযানী।

সম্বিৎ ফিরল সিদ্ধার্থর। দেবী ডাকছে। মনে ছিল না, একটা কাজ বাকী আছে।

'পিস্তল! পিস্তল কেন? কি ভেবেছো? ওগো, কি ভেবেছো তুমি?' দু'হাত বিস্তার ক'রে সিদ্ধার্থের বুকের উপর আছড়ে পড়ল দেবযানী।

ওর কাছ হতে বিদায় নিতে হবে। ওকে বলতে হবে—আমাকে ক্ষমা কর। তোমাকে ভালবেসেছি। কুৎসিত গলিত পাপের মতো আমার ভালবাসা ছুঁয়েছে তোমাকে। পৃথিবীর কাছে তাই তুমি অস্পৃশ্য, অপবিত্র হয়ে গিয়েছ। তীক্ষ্ণ তীব্র ঘৃণার বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে চারদিকে। কোথাও কণামাত্র নেই করুণার সঞ্চার। তোমার পায়ে রাখলাম আমার জীবন-মৃত্যু, স্বর্গ-নরক, ইহকাল-পরকাল। আমাকে উত্তীর্ণ হয়ে যাও তুমি। অশুচি রক্তে যেন ভেজে না পা দু'টি।

দরজা খুলে দিলেন সিদ্ধার্থ।

—'কি, কি করছেন আপনি? টেবিলের কাছে ছুটে গেল দেবী।

'পিস্তল! পিস্তল কেন? কি ভেবেছো? ওগো, কি ভেবেছো তুমি?'

দু'হাত বিস্তার ক'রে সিদ্ধার্থর বুকের উপর আছড়ে পড়ল দেবযানী।

পৃথিবীতে যুগান্তর ঘটে গিয়েছে। সিদ্ধার্থর বুকের মধ্যে মিলিয়ে গিয়েছে দেবী। চোখের জলে গলে সিদ্ধার্থর সঙ্গে একেবারে মিশে যেতে চাইছে সে।

রোদে জ্বলা প্রান্তর, আগুন পৃথিবী, বাতাসের তপ্ত শ্বাস। দেখা দিয়েছে আকাশ ছেয়ে জল-ভরা জীবন-জুড়ানো মেঘ। শ্রাবণের শ্যাম সমারোহ। এখনি নামবে ধারায় ধারায়, পান করবে ঝলসে-যাওয়া দেবদারু। সর্বাঙ্গ ভরে যাবে গুচ্ছ গুচ্ছ নবপত্রে।

॥ সমাপ্ত ॥

সবিনয় নিবেদন

শারদীয়া দৈনিক বসুমতী পরিকল্পনা ও সম্পাদনা করিয়াছেন রবিবারের দৈনিক বসুমতীর সাময়িকী বিভাগের সম্পাদক শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক।

এই বিশেষ সংখ্যাটি প্রকাশে যাঁহারা আন্তরিক সাহায্য ও সহযোগিতা করিয়াছেন তন্মধ্যে লেখক, লেখিকা, শিল্পী, বিজ্ঞাপন-দাতা ও পৃষ্ঠপোষকবৃন্দকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।

- উল্লেখ থাকে যে, এই সংখ্যায় কোন রচনাই স্বেচ্ছায় কোথাও ছাপা হয় নাই। মুদ্রণ পারিপাট্য ও রচনা প্রাপ্তির সুবিধানুযায়ী সংখ্যাটি অলঙ্কৃত করা হইয়াছে।
- সম্পাদনা কার্যে ও রচনা সংগ্রহ প্রভৃতিতে সাহায্য করিয়াছেন শ্রীকল্যাণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীশান্তিকুমার চট্টোপাধ্যায়।
- সংখ্যাটি অলঙ্কৃত করিয়াছেন সর্বশ্রী সূর্য রায়, রেবতীভূষণ ঘোষ, অমল ঘোষ, রবীন্দ্রনাথ দত্ত, শুচিব্রত ঘোষ, অনিট ঘোষ, মৈত্রেয়ী মুখোপাধ্যায়, হীরেন সেন, সমীরকুমার নাথ, রঞ্জনকুমার দাস প্রভৃতি।

শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়
সম্পাদক
(দৈনিক বসুমতী)

বিচিত্র বস্ত্র সম্ভারে
ব্যানার্জি ব্রাদার্স
২২৫, মহাত্মা গান্ধী রোড
বড়বাজার • কলিকাতা-৭
ফোন: ৩৩-৯০৭৪

সাধুর দান—
দৃষ্টিশক্তি
ভারতীয় ভেষজজাত মহৌষধ।
রাধারমণ ঔষধালয়
৫৫, বাগবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৩
ফোন: ৫৫-৫৫১৯ মূল্য—৬৲ টাকা

যাবতীয় ইলেকট্রিকের দ্রব্যাদি পাইবার, নির্ভরযোগ্য স্থান। ফিলিপস ওয়াটার হিটারের একমাত্র পরিবেশক। ফিলিপস রেডিও ডিলার।
চ্যাটার্জী ব্রাদার্স
৭ নং পলক ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১
ফোন: ২২-৭১৬৮ রেডেড: ২২-৬৩০৭

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার * বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড * ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

Tagore Commercial Corporation Private Ltd.

Registered Office :

42A, Beadon Row, Calcutta-6.

Phone—55-3665

Government Controlled Stockist of all Sorts of Iron and Steel

Place your indent against permits for Controlled Categories

Send enquiries for free Sale Categories too.

এবার পূজায় আপনাকে আনন্দ দিতে

...এবং পছন্দ করার জন্যে আরও অনেক রকম আছে

আপনাকে শুধু সপরিবারে আপনার নিকটস্থ মারফি ডীলারের কাছে গিয়ে আপনার মনোমত মডেলটি পছন্দ করতে হবে। মনে রাখবেন, সারা দেশময় ৮০০র বেশি বন্ধুভাবাপন্ন যেকোন মারফি ডীলারের কাছে নানারকমের অনেক নানান দামের পছন্দ করার মত মারফি মডেল রয়েছে। এবার পূজায় আপনার পরিবারের সবাইকে তৃপ্তিতে শোনার জন্যে এই রেডিওটি উপহার দিন।

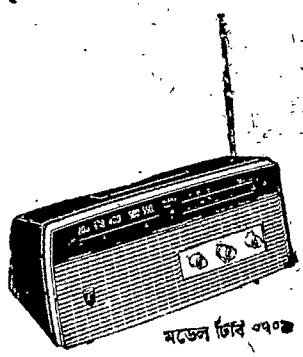

মডেল টিবি ০৭০৩

মডেল টিবি ০৫৮৩

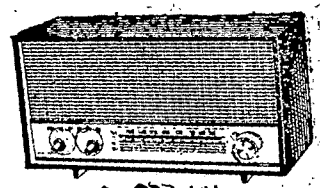

মডেল টিএ/টিইউ ০৮২২

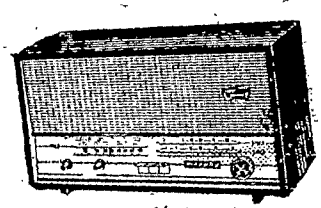

মডেল টিএ/টিইউ ০৯২২

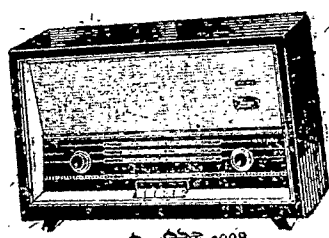

মডেল টিএ/টিইউ ০৭৭৪

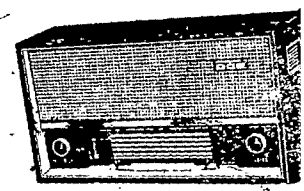

মডেল টিএ ০৩৬৬

murphy radio

মারফি রেডিও গৃহকে আনন্দমুখর রাখে!

Murphy sets the standard

আরও ৩টি নতুন মারফি মডেল

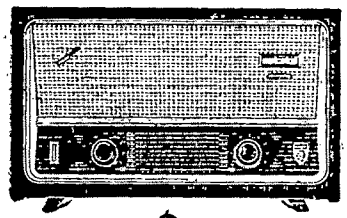

মডেল টিএ ০৯২৬

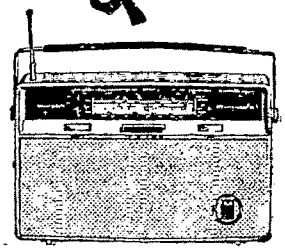

মডেল টিবি ০৮১৬

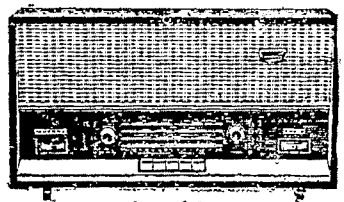

মডেল টিএ/টিইউ ০৭৭৫

শর্মিলা ঠাকুর,
বি. আর ফিল্মসের
'ওয়াক্ত' চিত্রের তারকা

THE BRITISH INDIA CORPORATION LIMITED

KANPUR

MANUFACTURERS OF QUALITY PRODUCTS THAT ARE HOUSEHOLD NAMES!

LALIMLI AND DHARIWAL

Pure-Wool Products

- *SUPERIOR QUALITY WOOLLEN & WORSTED SUITING CLOTHS*
- *LADIES COATING MATERIALS*
- *TWEEDS*
- *BLAZER CLOTHS & FLANNELS*
- *KNITTING YARNS*
- *WOOLLEN HOSIERY GOODS*
- *BLANKETS & RUGS*
- *UNIFORM MATERIALS*

FLEX

Famous Footwear

- **Strong, Stylish and Durable Shoes for the Whole Family**

N.W.T.

- **Leather Handbags and Travel Goods to Last You a Life-Time**

ELGIN

The Best in Cotton

- **Towels**
- **Bed-Sheets**
- **'Sanforized' Drills and Shirtings**
- **Poplins**
- **Casement, Etc., Etc.**

আনন্দ উৎসবে

আমাদের অভিনন্দন

জামান মঞ্জিল

৩৭, বটু সরকার লেন

কলিকাতা—১

ফোন নং—৩৪-৩১৪৭

শারদীয়া শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন—

এম, কে, মুখার্জী এণ্ড কোং

আমদানী ও রপ্তানীকারক

কাষ্ঠ-ব্যবসায়ী ও করাত-কল

গভর্ণমেণ্ট ও রেলওয়ে কণ্ট্রাক্টর

অফিস ঃ ১৮০, আপার চিৎপুর রোড

কারখানা ঃ ২৫৭, আপার চিৎপুর রোড

কলিকাতা—৩

৫৫-৫৭০৫

টেলিগ্রাম ঃ SAWDRILL

টেলিফোন ঃ ৫৫-৭৩৬৮

৫৫-৭৩৭২

—সকলের প্রিয়—

রায়ের চা

প্রাপ্তিস্থান ঃ

বসন্ত কেবিন
ফোন ঃ ৩৪-২৯২২

রায়ের চা
ফোন ঃ ৫৫-৩৯৪৮

ফ্রেণ্ডস অটো ইঞ্জিনীয়ারস

||

মোটর রিপেয়ারিং হাউস

৮৬।এ, আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড,
কলিকাতা—১৪ ফোন ঃ ২৪-১১০৪

মোটর রিপেয়ারিং, গাড়ীর রং, বডী তৈয়ারী প্রভৃতি যাবতীয় কাজ অভিজ্ঞ এঞ্জিনীয়ারের পর্য্যবেক্ষণে সযত্নে করা হয়।

(ইণ্ডানী মার্কেটের নিকটে)
লোকসেবক বিল্ডিং

উজ্জয়িনীর সেই বিশ্ব-চিত্তজয়ী বিশ্ববিমোহন মহাকবি—
শরদ্ঋতুঞ্জের পুণ্যজ্যোৎস্না—সাহিত্য-জগজ্জ্যোতি—
প্রতিভা ও মনীষার অবতার—সরস্বতীর বরপুত্র—
সৌন্দর্য্যের মহাকবি—

কালিদাসের গ্রন্থাবলী

সর্ব্বাঙ্গসুন্দর রাজাধিরাজ সংস্করণ
অনুবাদক—বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সাহিত্য রস-সুরসিক
পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ

প্রথম ভাগে :—রঘুবংশ, মালবিকাগ্নিমিত্র, ঋতুসংহার, পুষ্পবাণবিলাস, শৃঙ্গার-তিলক, শৃঙ্গার-রসাষ্টক। মূল্য ৩৲।
দ্বিতীয় ভাগে :—কুমারসম্ভব, নলোদয়, মেঘদূত। মূল্য ৩৲
তৃতীয় ভাগে :—শকুন্তলা, বিক্রমোর্ব্বশী, শ্রুতবোধ, দ্বাত্রিংশৎ-পুত্তলিকা, কালিদাস-প্রশস্তি। মূল্য ৩৲।

ভক্তসাধক, কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেনের
ভক্তিমাধুরী-রঞ্জিত

রামপ্রসাদ গ্রন্থাবলী

শ্রীশ্রীকালী-কীর্ত্তন, বিদ্যাসুন্দর, পদাবলী, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, সীতা-বিলাপ, আগমনী, বিজয়া, অপূর্ব্ব প্রকাশিত কবিতাবলী, কবির জীবনী।
একত্রে মূল্য ১৷৷০

জাতীয় চারণ কবি

মুকুন্দদাসের গ্রন্থাবলী

মূল্য—দুই টাকা

মুকুন্দদাস বিপ্লবী নব অভ্যুত্থানের প্রচারক। স্বদেশী যুগের সুরেন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র, অশ্বিনীকুমার যেমন শিক্ষিত যুব সাধারণকে আহ্বান করিয়াছিলেন, কবি মুকুন্দদাস তেমনি স্বাধীনতার বাণী পৌঁছাইয়া দিয়াছিলেন জনসাধারণের কানে। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ ভীত হইয়া তাঁহাকে সুদীর্ঘ কাল সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে। বাংলার এই জাতীয় কবির নাটকগুলি যাহাতে প্রত্যেক বাঙ্গালীর গৃহে মর্য্যাদার সহিত পঠিত হয়, তজ্জন্য গ্রন্থাবলী-আকারে প্রকাশিত করা হইল।

প্রাচীন-সাহিত্যের-গৌরব-মুকুট—
সাহিত্যের চির-সমাদৃত কোকিল—
রায়গুণাকর

ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী

অন্নদামঙ্গল, বিদ্যাসুন্দর, মানসিংহ, চোরপঞ্চাশৎ, রসমঞ্জরী, ধেড়েভেড়ের কৌতুক, ফর্দ্দরফৎ, হিন্দী কবিতালহরী, বলির নাগাষ্টক, সংস্কৃত, পার্শী, হিন্দী নানা ভাষায় কবিতাবলী, জীবনী, ঋতু-বর্ণনা, রাধাকৃষ্ণের প্রেমালাপ, কবিতাবলী
মূল্য দুই টাকা।

অন্ধ সাহিত্যিক যদুনাথ তাঁহার যুগে অত্যন্ত জনপ্রিয় বাংলাকে জাতীয়ভাবে সমৃদ্ধ করিবার পক্ষে তাঁহার দান কম
যদুনাথ ভট্টাচার্য্যের

যদুনাথ গ্রন্থাবলী

দ্বিতীয় ভাগ :—বঙ্গবিজয় (হিন্দুরাজত্বের অবস
স্ত্রী—(মহিমার মূর্ত্তিতে শুদ্ধান্তঃপুর সমুজ্জ্বল) :
শচীপতি (বীরত্বের অবসান), ২৲, এই
মূল্যের সুপবিত্র উপন্যাসরাজি মাত্র ৸০ আনা

—কেবলমাত্র প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য—
: যৌনশাস্ত্র ও যৌনমনস্তত্ত্ব সম্পর্কে সুবিস্তৃত ও নির্ভরযোগ্য
॥ জটিল প্রশ্নগুলির প্রাঞ্জল বিশ্লেষণ
পাঁচটি খণ্ডে গভীর তত্ত্ব ও প্রচুর তথ্যের অভাবনীয় স
অধ্যাপক ত্রিদিবনাথ রায় সম্পাদিত

যৌন মনোবিজ্ঞান

(নরনারীর দাম্পত্য মিলনের বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে বিশ্লে
২য় ভাগে : **স্বয়ংরতি**—৪·০০ ॥ ৩য় ভাগে : **কাম**
বিশ্লেষণ—৩·০০ ॥ ৪র্থ ভাগে : **প্রেম ও পীড়া**—
৫ম ভাগে : **কামাবেগের নিয়ত কার্য্যি**
ব্যাপারসমূহ—৪·৫০ ॥ ৬ষ্ঠ ভাগে : **রমণীর**
আবেগ—৪·০০ ॥

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড : ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২